শারদীয়া ১৪০০

শুকতারা

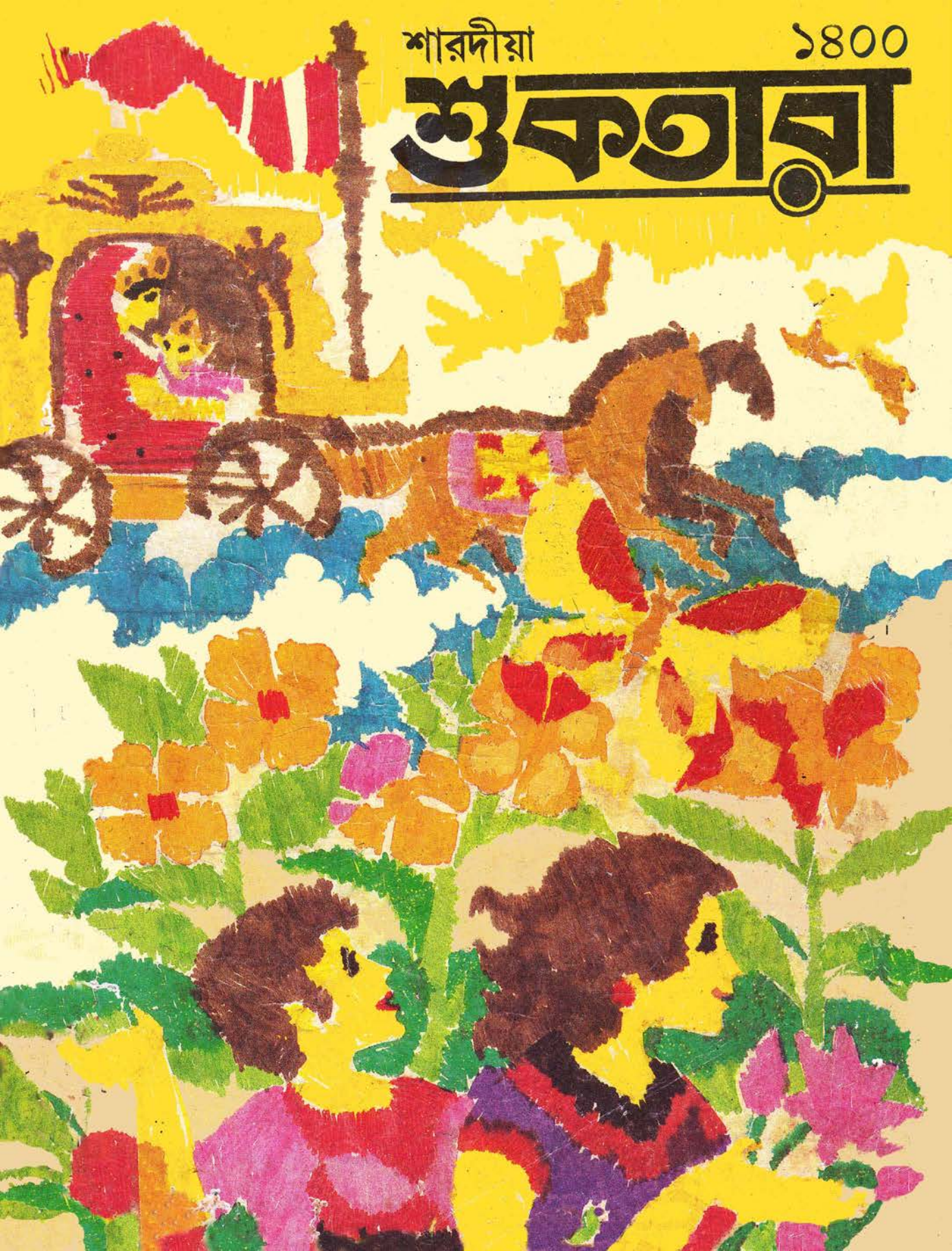

ধুলোখেলা
অতীতের সাগর সেঁচা মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

অম্লরোগ ? ক্ষুধামান্দ ? কোষ্ঠ্যকাঠিন্য ?

পেটের গোলমাল ?

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

সর্বাধিক রোগের কারণ পেটের গণ্ডগোল
ও অসুস্থ লিভার। যদি সুস্বাস্থ্য চান –
পেটের গোলমাল সারান
আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

... ডাঃ সরকার

পেটের গোলমাল সারাতে আর লিভারের সুরক্ষায়

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার–
আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

লিভোসিন

ব্যবহার বিধি ঃ

দু-চা চামচ করে লিভোসিন এক গ্লাস অল্প গরম
জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে
সেবন করুন, যতদিন না-বুক জ্বালা সারে,
হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়,
পেটের গোলমাল সারে আর লিভার সুস্থ হয়।

লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের
সহযোগী সংস্থা Jupiter -এর
আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ
২৫, ইডেন হস্পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩
ফোনঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪

Jupiter
Emars Allen
allen's india
Dr. Sarkar Group

অ্যালোপ্যাথিক
আয়ুর্বেদিক
হোমিওপ্যাথিক
ওষুধ প্রস্তুতকারক

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Marketed by :
allen's india
Allen's Ind
Marketing Pvt. L
ArnikaPlus Apartment, Seald
35, A. P. C. Road, Calcutta-
Phone : 350-9026
Allen Apt : 351-0062

Allen's Au india

পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ শর্মা (বৈদ্যভূষণ) এর আয়ুর্বেদিক উপহার

আয়ুর্বেদিক ফর্মূলায় তৈরী হিমতাজ এক আশ্চর্য উপকারী তেল। মাথা ব্যথায় এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে দারুণ কাজ দেয়। সারাদিন মাথা ঠাণ্ডা, শরীর সতেজ ও মন প্রফুল্ল রাখে। এই তেল চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। চুল দীর্ঘ, ঘন ও কালো রাখতে এ তেল অদ্বিতীয়। এ জন্যই সবার পছন্দ আয়ুর্বেদিক হিমতাজ তেল।

শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিকল্প নেই

হিমতাজ তেল

আয়ুর্বেদিক ঔষধ নির্মাতা
পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ শর্মা
(বৈদ্যভূষণ)
১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
(বাঙ্গুর বিল্ডিং)
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

আশ্বিন ১৪০০ সূচীপত্র সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

সম্পূর্ণ উপন্যাস □

আশাপূর্ণা দেবী—সময়ই পাওয়া গেল না ২২
চিত্তরঞ্জন মাইতি—মুমবা ১১২
শিশিরকুমার মজুমদার—চন্দ্র সরোবর প্রজেক্ট ১৪৮
পরেশ ভট্টাচার্য—বনের হাতি বনে ৭২
অনিল ভৌমিক—কাউন্ট রজারের গুপ্তধন ১৯৪
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—পাতালঘরের রহস্য ২৬৪

বিশেষ আকর্ষণ □

রবি ঘোষ—পায় পড়ি বাঘমামা ১৪

গল্প □

লীলা মজুমদার—গাঁজাখুরি গল্প নয় ২৩৩
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—বন্দিনী ১৬
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়—ফেরা ৩৪
বুদ্ধদেব গুহ—ঋজুদার সঙ্গে রুদ্র, তিতির আর ভটকাই ৪২
মহাশ্বেতা দেবী—রথের দিনে ১২৯
নবনীতা দেবসেন—দুলালের গল্প ২৪৯
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রূপকুমারীর ছেলেমেয়ে ৯৩
নলিনী দাশ—তিন কন্যা ১৩৯
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়—প্রাণের প্রদীপ ২৮৮
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—দেখা না-দেখা ২৯২
নটরাজন—পাহারাদার ১৮৪
অগ্নিমিত্র—নর্দ ১২৭
ডাঃ অরুণকুমার দত্ত—মনের গহনে ২১৭

কল্পবিজ্ঞান ও হাসির গল্প □

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—বিধুবাবুর গাড়ি ২০
শক্তিপদ রাজগুরু—পটলার বসন্তোৎসব ৪৫

ভূতের গল্প □

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়—পরোপকারী ভূত ২৪১
মানবেন্দ্র পাল—ভৈরব ১৭৯
অজেয় রায়—ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতের খোঁজে ৯৯
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভয়ঙ্কর সেই রাতে ২৫৫
গৌরী দে—অকশন ২৫৭

গোয়েন্দা ও রহস্য গল্প □

প্রফুল্ল রায়—নবাবের হীরে ৩৭
মনোরঞ্জন ঘোষ—এক টিপ নস্যি ১৪৩
সঙ্কর্ষণ রায়—খনি-রহস্য ১০৮

রূপকথা ও অলৌকিক গল্প □

শৈলেন ঘোষ—এর নাম ভগবানের হাত ৮৭
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—পৈশাচিক ১৩৫
কমল লাহিড়ী—যা হয় না ২৪৭

জঙ্গল ও শিকারের গল্প □

মঞ্জিল সেন—বনবিবির দরগা ২৫১
পরেশ দত্ত—গেছো বাঘের কবলে ৪৭

বিদেশী ও ইতিহাসের গল্প □

সুকুমার ভট্টাচার্য—এক ভীতু মানুষের গল্প ১৭৪
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়—একটি শিশুর জন্য ১৮৮

পৌরাণিক গল্প □

প্রণবেশ চক্রবর্তী—মা দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের বাহন ১০
আরতি বসু—ঘরে ফেরা ২৬০

আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের গল্প □

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়—একটি আবিষ্কারের কাহিনী ৩১
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—হত্যা থেকে রহস্য ২২৮
জ্যোতির্ময় মজুমদার—বসন্ত বিদায় ২৮১
শৈলেন দত্ত—লুকোচুরি ২৪৪

বিস্ময় বিচিত্রা □

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ৭০
সুরভি বসু—ছিনতাই বিমানে ৫৫ ঘণ্টা ৬৪
প্রসিত রায়চৌধুরী—বাংলা সালের জন্মকথা ১৯৩
প্রদীপ মিত্র—কে ওই কিশোর? ১৩

বিশ্ববিচিত্রা □

অমিয়কুমার হাটি—হিংসুক কারা? বনের প্রাণী না আমরা ২১৯
সমীর গোস্বামী—কু ঝিক ঝিক ২২৩
সুনীত রায়—জানা-অজানা ২৯১
হারিয়ে যাচ্ছে যারা ৪৯

ট্রেকিং ও অ্যাডভেঞ্চার □

তপনকুমার দাস—কালিন্দী অভিযান ৫২
রাহুল মজুমদার—নরক থেকে ফিরে ১৭১

কবিতা ও ছড়া □

অন্নদাশঙ্কর রায়—ভোজবাজি ৯
সুভাষ মুখোপাধ্যায়—দ্যাখো তো হে ১৩
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—টোটার ছুটি ১৫

শুকতারা

আশ্বিন ১৪০০ সূচীপত্র সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

সুনির্মল বসু—রসারক ২৬৩
দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়—রূপকথার মন ২৮৩
কৃষ্ণ ধর—আরে ধ্যুৎ! আরে ধ্যুৎ! ৩৬
আশিস সান্যাল—এক যে ছিল ১২৮
রূপক চট্টরাজ—সেই ছানাটি ১৪৭
অশোক সী—হাসতে ভুলে যাচ্ছ কেন? ১২৬
সুখেন্দু মজুমদার—সোনার ছেলে ১৩৪
অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রাপ্তিযোগ ২২২
সলিল মিত্র—পুজোয় কোথায়? ৬৯
সুখেন্দু ভট্টাচার্য—সুভাষিতানি ২৫৯
জ্যোতিভূষণ চাকী—পুজোর ছড়া ২৫৬
দীপ মুখোপাধ্যায়—ডিম ২৮০
রবিদাস সাহারায়—পূজা ঃ ১৪০০ সাল ২৪০
মুস্তাফা নাশাদ—নাচনি ১৯৩
শ্যামাপ্রসাদ সরকার—ভুবনডাঙার পুজো ৯২
অপূর্ব দত্ত—দশমীর সন্ধ্যে ১৮৩
লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস—সত্যি-মিথ্যে ১৮৭
সরল দে—বুলুমাসির কুলুমানালি ভ্রমণ ১৩৮
গৌরাঙ্গ ভৌমিক—কুমড়োডিহির তিনটি বুড়ো ১৪২
রমেন দাস—মাসি-পিসির ছড়া ২১৮
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়—হায় বেচারা ২৪৬
দীপঙ্কর বিশ্বাস—গোঁফের চোপ্ ২৫০
কার্তিক ঘোষ—আসল কথা ২১
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—দেবী দুর্গার আসা-যাওয়া ৩০
নারায়ণ সাহা—পাগলা পেঁচোর ভাই ২০৮
ধূর্জটি চন্দ—ব্যাঙের বিয়ে ২৩২
হান্নান আহসান—কী কাণ্ড! ৮৬
সঞ্জীবকুমার দে—অসম ছড়া ২৪৬
দিলীপ রায়—সেই সব হীরে মানিক ৪১

খেলা ও জাগলিং □
প্রসূন ব্যানার্জী—রাজার সঙ্গে ২৯৭
গৌতম সরকার—খেলতে খেলতে ২৯৮
দিব্যেন্দু বড়ুয়া—আনন্দই ভবিষ্যতের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ২৯৯
রাজু মুখার্জী—খেলতে হলে ৩০১
তপন দাম—স্বপ্ন দেখছেন লিয়েন্ডার ৩০২
অভয় মিত্র—জাগলিং-এর আসরে ২০৮

ম্যাজিক □
যাদুকর পি· সি· সরকার (জুনিয়র)—সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ফেরা (রঙিন কমিকসে) ৬০

বিভাগীয় লেখা □
দাদুমণির চিঠি ২০৯
তোমাদের পাতা ২১০

মজার পাতা □
ধাঁধা ইত্যাদি ৩০৪
শব্দ জব্দ—নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায় ৩০৪

কমিক্স □
নারায়ণ দেবনাথ—বাঁটুল দি গ্রেট ৪
নারায়ণ দেবনাথ—হাঁদা-ভোঁদা ২৮৪
নারায়ণ দেবনাথ—বাহাদুর বেড়াল ৫০
রতন মুখোপাধ্যায়—মোল্লা নাসিরুদ্দীন ২১১
সুফি—ক্রীড়া-কৌতুক ৩০৩

প্রচ্ছদ □ সরোজ সরকার

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO 456 (17) TBC (Dated 5.7.88)

Annual Subscription
Bangladesh – Rs. 235.00
UK and USA – By Sea Mail Rs. 327.00
By Air Mail Rs. 552.00

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ
বুক পোস্টে—১১০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে—১৭০ টাকা।

R. N. I. Registration No 2621/57

দামঃ ৩৪ টাকা

বাঁটুল দি গ্রেট

স্যার! এই পত্রবাহকও নিপাত্তা! অনেক খোঁজ করেও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি!
এই নিয়ে চারজন বিশ্বস্ত লোক লোপাট হয়ে গেলো!
এবার তাহলে কি উপায় করা যায় মিঃ শুইরাম? মালুম হচ্ছে এসব উগ্রপন্থীদের কাম। ওরাই এদের লোপাট করে দিয়েছে!
তবুও স্যার কাউকে তো আবার পাঠাতেই হবে। এবার বেশ তাগড়াই দেখে কাউকে পাঠান।
বেশ! তাহলে আমাদের সেরা স্ট্রং ম্যান হোঁদল হাতিকে পাঠিয়ে দিন। ওযদি চিঠি পৌঁছে কাজ হাসিল করে ছাতি ফুলিয়ে ফিরতে পারে।
ঠিক আছে, স্যার! আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।
ওদিকে
কি সাংঘাতিক ব্যাপার! গুরুত্বপূর্ণ পত্রসহ পর পর চারজন বাহকই লোপাট! লিখেছে উগ্রপন্থীদের কাজ। ব্যাপারটা একটু দেখতে হবে।
স্যার! আমাকে কি করতে হবে, বলুন?
সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে ওখানকার ডারপ্রাপ্ত অফিসারকে এটা দেবে। কিন্তু সাবধান, তোমার আগে এই কাজ করতে গিয়ে চারজন লোপাট হয়ে গেছে।
হেঃ হেঃ! আমি হোঁদল হাতি। আমার সঙ্গে নস্যাবাজি করতে এলে লাথি মেরে ছাতি দুমড়ে কুঁচকে দেবো!
ভিতরে আসতে পারি?

খবরের কাগজে যা লিখেছে সে ব্যাপারে আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?
না,আমাদের কারোর কোন সাহায্যের দরকার নেই! আমাদের এই স্ট্রং ম্যানই এবার সব হাসিল করবে!
আমি হোঁদল হাতি! কেউ আমার সামনে এসে কাজে বাগড়া দিলে সে যতো তাগড়া হোক না কেন তাকে দুমড়ে কুঁচকে দেবো। তাই এখানে তোমার নাক না গলালেও চলবে! হেঃ হেঃ!
পাঁচ নম্বর মাল আসছে রে, ছেরুলাল!
কোন চিন্তা নেই। আপেরগুলির মতো এটারও খাল খিঁচে লোপাট করার ব্যবস্থা করছি।
আপেরগুলির মতো এই এক নম্বর দাওয়াইয়েতেই কাজ হয়ে যাবে।
ঢং করে সং সেজে এটা আবার কি আসছে? অ্যাই! রাস্তা থেকে সরে দাঁড়া!
ইরক্! অ্যাই! একি হচ্ছে? ছেড়ে দে বলছি, হতচ্ছাড়া!
দমাস!

তাজ্জব! স্ট্রংম্যান হোঁদল হাতি গেলো কোথায়? পাতি পাতি করে খুঁজেও দেখতে পেলুম না!
এটা ছ'নম্বর, বোধহয় পাঁচ নম্বরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।
খোঁজাচ্ছি। খুঁজে পাবার আগেই ওকে মাটিতে গুঁজে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি!
আরে! স্ট্রংম্যান হোঁদল হাতি! আপনার এই অধোগতি কি করে হোলো?
বেশী কথা না বলে আগে আমাকে বের করো শিগগির!
এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।
দমাস!
হাঃহাঃ! ছ'নম্বর এতোক্ষণে কাত, নির্ঘাত!
এক নম্বর দাওয়াইয়েতেই বাজিমাত! হিঃহিঃ!
উফ্!
ওফ্!
ইস্! পা দিয়ে মাটি দাবানোটা একটু জোরে হওয়ায় বেচারা ছিটকে বেরিয়ে গেলো!
গদাম!
ধ্যাৎ! পিঠে আবার কিসে টোকা মারছে!
ইরক্! ওদের আটকাবার পয়লানম্বর দাওয়াইকেই ছ'নম্বরীটা চূর্ণ করে দিয়েছে। শিগগির আমাদের দুনম্বর মোক্ষম দাওয়াইয়ের জায়গায় চল!

সারেঃ! এটা তো দেখছি একটা যন্ত্র-মানুষ! তাহলে এটাই হোঁদল হাতিকে কিলিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলো!
ও আমাদের যন্ত্রমানবকে চূর্ণ করেছে, কিন্তু এবার আমাদের প্রচণ্ড শক্তিশালী এই লাড্ডু মিসাইল ওর আশা পূর্ণ করতে দেবে না! হাঃ হাঃ!
ঐ যাচ্ছে আমাদের লাড্ডু মিসাইল! হাঃ হাঃ!
এটা আবার কি উড়ে আসছে?
আরিব্বাস! এটা তো বোমা বলে মনে হচ্ছে!
তাই বুঝি! তবে যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফেরত পাঠিয়ে দি!
হাঃ হাঃ! যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাবি! আর সেই সঙ্গে ওরও জারিজুরি খতম!
দুড়ুম!
আর কোন বাধা নেই। আপনার পত্র যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। এই দুটোই ছিলো নাটের পাণ্ডা, অবশ্য এখন এরা ঠাণ্ডা! আপনার চার পত্রবাহককে এরাই ডবের পার করে দিয়েছে। হোঁদল হাতি স্রেফ বলে শুধু একটু কুঁচকে গিয়েছে!
ফুক! আমাদের পাঠানো মিসাইল আবার আমাদের কাছেই কি করে ফিরে এলো বলতো?
ফুক!

নকল হইতে

আমার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম
ও অভিজ্ঞতায়
তালমিছরি
অর্ধশতাব্দী ধরে
আসছেন
কেনার সময়
সাবধান
শিশি ও প্যাকের
ও সই সহ আসল

প্রস্তুত যে
আপনারা
ব্যবহার করে
এখন থেকে তা
নকল থেকে
হওয়ার জন্য
গায়ে আমার ছবি
তালমিছরি কিনুন।

বিনীত

ছবি ও সই দেখে
আসল
দুলাল চন্দ্র ভড়ের
তালমিছরি
কিনুন

প্রস্তুত কারক
শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়
২৮, বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোনঃ ৩৮-৮২৮৪, ৩৮৮১৯৩

STANDARD

ব্যবসায়িক যোগাযোগঃ ৫ নং মনোহর দাস স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা-৭

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী,রমন, বিল্লু,
পিঙ্কী, আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন
এবং আকর্ষণীয় কান্ডকারখানা।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী ওনার কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার প্রধান সাহায্যকারী। শক্তি ও বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দেবে।

মধ্যবিত্ত কেরাণীর সমস্যা-গুলোর সঙ্গে অনবরত লড়াই চালাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে আনন্দও দিয়ে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের অদ্ভূত চরিত্র রমন। পেটে খিল ধরিয়ে দেবার মত হাসিতে ভরপুর রমনের নতুন কমিকস্।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি পিঙ্কী ওর দাদু আর ঝপটজীকে সঙ্গে নিয়ে অদ্ভূত-অদ্ভূত কান্ডকারখানা করে তোমাদের তো বটেই, অত্যন্ত গোমড়া-মুখোদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ানকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য বুকষ্টলে হাজির হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনোরঞ্জক। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু এবং অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত' ফ্যান্টমের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক্।

ডায়মন্ড কমিকস্-এর নবতম নিবেদন

ব্রহ্মান্ডের অধিপতি 'থ্রী-ম্যান' এখন বাংলাতেও ডায়মন্ড মিনি কমিকসে প্রকাশিত হয়েছে!

সংখ্যা ঃ 1-12

প্রতি সংখ্যার মূল্য ঃ 3/-

বিশ্ববিখ্যাত কমিকস্ 'স্পাইডার-ম্যান' এখন বাংলাতেও! সংখ্যা 1-2 স্টলে হাজির হয়ে গেছে।

মূল্যঃ 8/-

স্টীকার ফ্রী

DIAMOND COMICS (P) LTD.

2715, Darya Ganj New Delhi-110 002.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4 TOTTEE LANE CALCUTTA-16

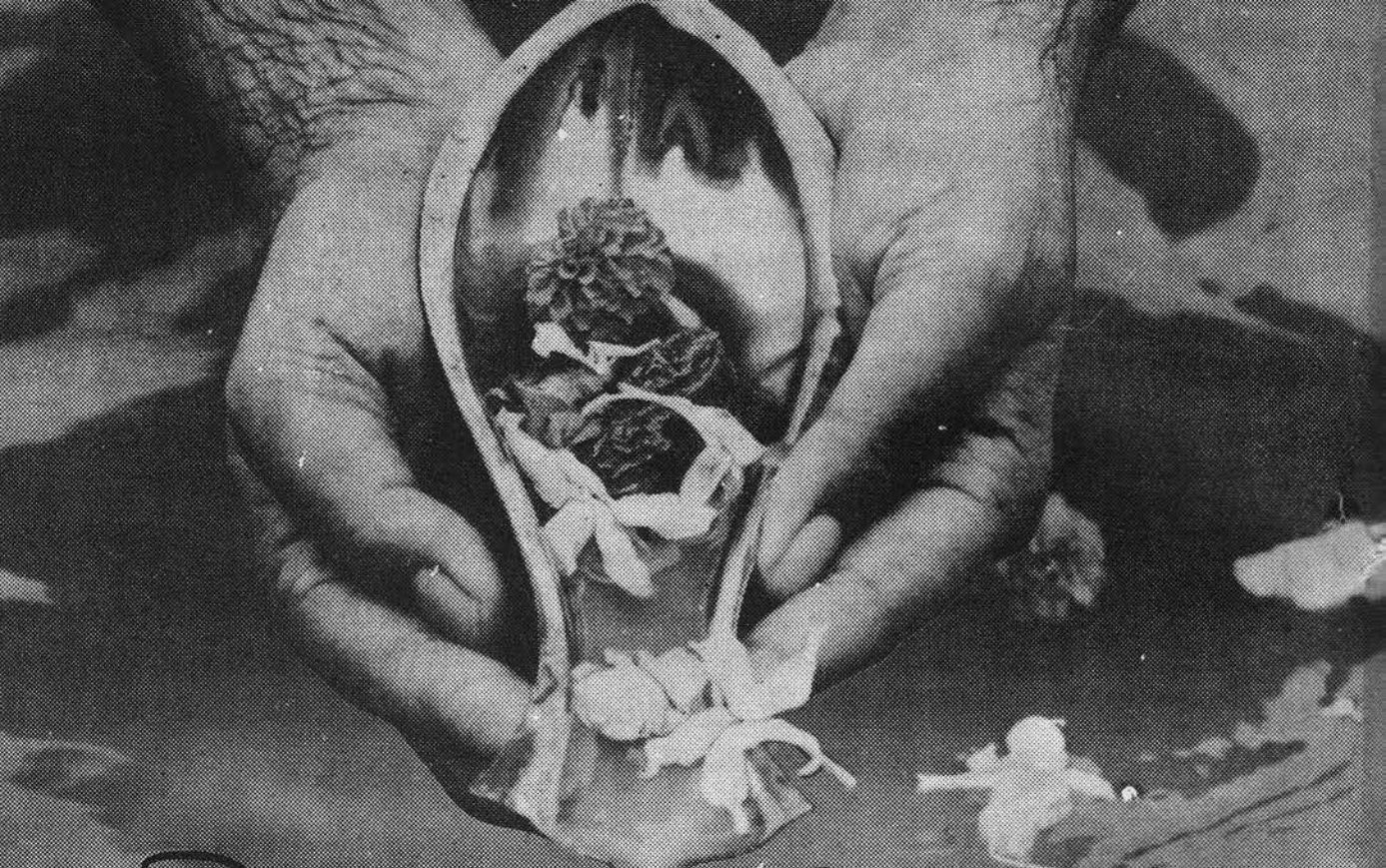

প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা

পুণ্য মহালয়া। পিতৃপক্ষের শেষ দিন।
গঙ্গাবক্ষে অজস্র পুণ্যার্থীর পিতৃতর্পণের মহালগ্ন।
পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী পিতৃপক্ষের কয়েকদিন ধরে
আমাদের স্বর্গত পিতৃপুরুষগণ তাঁদের অনন্তধাম
ত্যাগ করে মর্ত্যলোকের কাছাকাছি বিচরণ করেন,
সন্তান সন্ততির কাছ থেকে পুণ্যবারিতে
তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে। তারপর, পিতৃপক্ষের
শেষ দিনে অমাবস্যায় সেই তৃপ্ত পুরুষগণ
ফিরে যান তাঁদের মহান আলয়ে। সেই অনন্তধামে।
সেই থেকে এই তিথির নাম মহালয়া।
পিতৃপক্ষের শেষদিনে স্বর্গলোকের আশীর্বাদে
ভরে ওঠে পৃথিবী। তারপর শুরু হয় দেবীপক্ষ।
একবছরের আকুল প্রতীক্ষার অবসান।
আনন্দময়ীর আসার সময় হল। পুনরাগমনায় চ।

শারদ শুভেচ্ছায় বঙ্গজীবনের অঙ্গ

বোরোলীন

Response 1094

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস

শুকতারা

৪৬শ বর্ষ ● শারদীয়া সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪০০/সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

ভোজবাজি

অন্নদাশঙ্কর রায়

বাজিকর। এই দেখ দুই হাত খালি
এই দেখ দুই হাত মুঠো
এই দেখ দুই মুঠো খোলা
উড়ে গেল বুলবুলি দুটো।

খোকা। তাজ্জব!

বাজিকর। এই দেখ দুই চোখ বাঁধা
এই দেখ দুই চোখ খোলা
দু' চোখের দুইটি গোলক
হয়ে গেছে দুটি সোনার গোলা।

খোকা। তাজ্জব!

বাজিকর। কাঁউরি হাড়ের নাম শুনেছ কি, খোকা
এই হাড় নিয়ে আমি দিতে পারি ধোঁকা।
কোথাও যায় না পাওয়া এ কাঁউরি হাড়
পেতে হলে যেতে হয় কামাখ্যা পাহাড়।

খোকা। আমি যদি যাই?

বাজিকর। আরে, না, না, ভাই!
কামরূপে যেই যায় বনে যায় ভেড়া
জীবনে হয় না তার আর বাড়ি ফেরা।

খোকা। ফিরেছ তুমি তো।

বাজিকর। আমি জানি মন্তর, ভেড়া বনিনি তো।
আগে তুমি বড় হও, শেখাব মন্তর
আনবে কাঁউরি হাড়, হবে বাজিকর।

ছবি : সুফি

হাতে গুনে গুনে মোট ১০১টি দুর্গা ঠাকুর দেখেছিল টুকলো গতবার। তবুও ঠিক আশা মেটেনি। আরো দেখলে আরো ভালো লাগত। শুধু তো মা দুর্গাকে দেখা নয়, সঙ্গে আছেন মায়ের চারটি ছেলেমেয়ে। দুর্গার ডানদিকে লক্ষ্মী এবং গণেশ। আর বাঁ দিকে সরস্বতী আর কার্ত্তিক। সবাইকে ঠিকমতো দেখতে গেলে অনেকটা সময় লাগে। তাছাড়া সামনে পরীক্ষা। সরস্বতীকে একটু খুশি করতেই হয়।

তার উপর আছে অসুর, সিংহ, গলাকাটা মহিষ এবং দুর্গার আড়ালে মহাদেব। খুঁজেপেতে সবকিছু মিলিয়ে দেখতে গেলে এক মণ্ডপেই এক

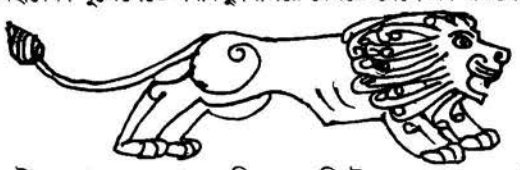

ঘন্টা লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার কি উপায় আছে? বাবা মিনিট তিনেক পরেই বলবেন, 'চল, খুব ভিড় হয়ে গেছে।' ফলে অনেক সময় অসুরের হাত-পায়ের মাসলগুলো দেখা হয় না, দেখা হয় না সিংহের দু'পা তুলে লাফটাও। ঠিকমতো তুলনা করা যায় না এক ঠাকুরের সঙ্গে অন্য ঠাকুরের। এভাবে কি ভালো লাগে?

সমস্যায় পড়ে গেল। সে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে।

বাবা বুঝিয়ে দেন, যা দিয়ে বহন করা হয়, অথবা যাতে চড়ে যাওয়া যায়, যাকে বলে যান, সেটাই বাহন। মা দুর্গা সিংহের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেন, যাতায়াত করেন, সেইজন্য সিংহই মা দুর্গার বাহন। পৌরাণিক যুগে সেই কারণেই প্রায় সব দেব-দেবীর একটি করে বাহন ছিল। এখনও সেই বাহনই চলে আসছে। তাছাড়া দেখা যায়, যে দেবতার সঙ্গে যে বাহন সুযোগ্য হয়, সেই দেবতার সঙ্গে ঠিক সেই বাহনই যুক্ত হয়েছে। দেবতার প্রতিমা বা মূর্তি যেমন একটা প্রতীক, তাঁর বাহনও তেমনি এক প্রতীক। বাহনটিকে দেখলেই দেবতাকে চেনা জানা যায়।

টুকলো অবাক হয়ে বাবার কথা শুনতে থাকে। শুধু দুর্গা ঠাকুর দেখলেই হয় না, তার সঙ্গে অনেক কিছু জানতে হয়—বাবার কথা শুনতে শুনতে তার এই ধারণা হতে থাকে।

বাবা বললেন, আমাদের সমাজ প্রাচীনকাল থেকে চারটি ভাগে বিভক্ত। গুণ এবং কাজ দিয়ে এই ভাগ করা হয়েছে। সেই ভাগগুলি

মা দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের বাহন

প্রণবেশ চক্রবর্তী

এবার তাই টুকলো ঠিকই করে নিয়েছে, ১০১টা ঠাকুর যদি না দেখা যায়, ক্ষতি নেই, দশটা দেখলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সবগুলি ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। এমনকি প্যাণ্ডেল, আলো এবং দুর্গা ঠাকুরের অস্ত্রশস্ত্রও এবার বাদ দেবে না। এই কথাটাই সে বাবাকে বলছিল। বাবা সবকিছু শুনে বললেন, 'খুব ভালো কথা, কিন্তু ঠাকুর দেখলে তো ঠাকুরের বাহনও দেখতে হয়। আর সেই সঙ্গে জানতে হয়, কোন দেবতার কী বাহন এবং কেন এই বাহন?'

কথাটা টুকলোরও মনে ধরে। সত্যিই তো এতদিন এ কথাটা তো মনে হয়নি। মা দুর্গার বাহন কেন সিংহ? মা লক্ষ্মীর বাহন কেন পেঁচা?

অতবড় হাতির মুখওয়ালা গণেশের কেন অতটুকু ইঁদুর বাহন? অথবা দেব সেনাপতি কার্ত্তিকের বাহন ঘোড়া না হয়ে একটা ময়ূর কেন হলো? কিংবা হাঁস কেন সরস্বতীর বাহন?

তাছাড়া প্রশ্ন তো আরেকটাও আছে। ঠাকুরদেবতাদের একটা করে বাহন থাকারই বা দরকারটা কি? ব্যাপারটা নিয়ে টুকলো রীতিমতো

হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। মা দুর্গার চার ছেলে-মেয়ে এই চারটি ভাগের প্রতীক। সরস্বতী হলেন জ্ঞান বা বিদ্যার দেবী। ব্রাহ্মণও আমাদের সমাজে জ্ঞানের প্রতীক। যিনি জ্ঞানী, তিনিই ব্রাহ্মণ। তাই সরস্বতী সেই ব্রাহ্মণের প্রতীক। কার্ত্তিক হলেন দেব সেনাপতি, যুদ্ধ বিগ্রহ করেন, রাজ্য রক্ষা করেন। তিনি হলেন ক্ষত্রিয়ের প্রতীক। মা লক্ষ্মী ধন, সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী। বৈশ্য বা ব্যবসায়ীরা হলেন সেই ধন ও সম্পদের প্রতিনিধি। সেইজন্য মা লক্ষ্মী হলেন বৈশ্যের প্রতীক। গণেশ হলেন গণ+ঈশ। অর্থাৎ জনগণের দেবতা। তিনি হলেন শ্রমশক্তি বা শূদ্রশক্তির প্রতীক।

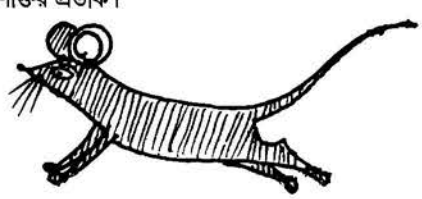

টুকলো বাবাকে প্রশ্ন করে: আচ্ছা সিংহ কেন মা দুর্গার বাহন?

বাবা বলতে থাকেন, মা দুর্গা হলেন বিশ্বজগতের জননী বা অধীশ্বরী। আর সিংহ হলো পশুরাজ। সেইজন্যই তিনি দেবীর বাহন। শক্তির দিক থেকেও সিংহ মহাশক্তিময়ী দেবীর বাহন হওয়ার যোগ্যতা রাখে। দেবী দুর্গা মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে প্রবল

পরাক্রান্ত অসুরদের নিধন করে স্বর্গরাজ্যকে নিরাপদ করেছিলেন। এইসব ভয়ঙ্কর অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় সিংহের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী বাহন না হলে কি দেবী দুর্গার পক্ষে যুদ্ধে জেতা সহজ হতো? মহিষাসুর এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্যে দারুণ অত্যাচার চালাতে থাকে। শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতাদের প্রাণ যায় যায়। স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে কোথায় যাবেন তাঁরা? অসুরদের অত্যাচারে সবাই যে একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে গেলেন। তখন তাঁরা করলেন কি, সবাই মিলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেবী দুর্গার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাতে শুরু করলেন: 'হে দেবী, আমাদের বাঁচাও, আমাদের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দাও।' দেবতাদের এই কান্না শুনে দেবী দুর্গা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দেবতাদের রক্ষা করার জন্য চারদিক আলোকিত করে হিমাচল প্রদেশে আবির্ভূতা হলেন। দেবীর সেই জ্যোতি দেখে সকলেই মুগ্ধ। সকলেই বিস্মিত।

ওদিকে শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ওই ভুবন-ভোলানো রূপ দেখে একেবারে হতবাক। তারা ছুটে গিয়ে তাদের রাজা শুম্ভ-নিশুম্ভকে খবরটা দিল। তারা তো খবরটা শুনে আর দেরি করল না। তাদের দূত সুগ্রীবকে পাঠালো দেবীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। তারা দেবীকে বিয়ে করতে চায়। সুগ্রীব দেবীর সঙ্গে দেখা করে এই প্রস্তাব দিল। দেবী সব শুনেটুনে বললেন, 'আসল কথা কি জান, আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে। প্রতিজ্ঞাটা হচ্ছে, যে আমাকে যুদ্ধে হারাতে পারবে, বা আমার সমান সমান হতে পারবে, আমি তাকেই বিয়ে করব।'

সুগ্রীব সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভকে এই খবরটা দিল। দেবীর এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে দুই অসুরভাই বলল, 'এই কথা, দেখাচ্ছি মজা।' তখনই তাদের সেনাপতি ধূম্রলোচনকে পাঠিয়ে দিল ষাট হাজার সৈন্য দিয়ে, বলে দিল, 'যেভাবে পারো ওই দেবীকে বন্দী করে আনতে হবে।' কিন্তু ষাট হাজার সেনাসহ ধূম্রলোচন হলো কুপোকাৎ। এবার গেল চণ্ড ও মুণ্ড। তারাও দেবীর কাছে হেরে ভূত। পাঠানো হলো রক্তবীজকে—যার এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লেই আবার নতুন নতুন সৈন্য জন্ম নেয়। সেই রক্তবীজও খতম।

এবার দুই ভাই শুম্ভ ও নিশুম্ভ সব সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিজেরাই চলল দেবীকে পরাস্ত করতে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে দেবতারা নিজের নিজের শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সাহায্য করতে থাকেন। সেই সময় পর্বতরাজ হিমালয় সিংহকে বাহনরূপে দেবীর হাতে সমর্পণ করেন। হিমালয়ের আসল উদ্দেশ্য, এই শক্তিশালী বাহন নিয়ে দেবী অসুরদের পরাস্ত করুন।

শেষ পর্যন্ত দেবীর হাতে প্রথমে নিশুম্ভ এবং পরে শুম্ভ নিহত হলো। সেই থেকে সিংহ হলো দেবীর বাহন। আবার আরেকটা মত আছে 'কালিকাপুরাণে'। তাতে বলা হয়েছে, ভগবান হরিই (নারায়ণ) সিংহরূপে দেবীকে বহন করছেন। এখানে মনে রাখা দরকার হরি শব্দের একটা অর্থ সিংহ। 'দেবীপুরাণ' নামে এক শাস্ত্রগ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রবল শক্তিশালী সিংহের অঙ্গে অঙ্গে নানা দেবতার শক্তি আছে। তাই সিংহ হচ্ছে দেবীর বাহন। দেবীর হাতে সব দেবতাই নিজেদের শক্তি তুলে দিয়েছেন।

টুকলো এতক্ষণ চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিল অসুর ও দেবীর যুদ্ধ, শুনতে পাচ্ছিল সিংহের গর্জন। বাবার কথা থামতেই সে সম্বিত ফিরে পেল। বলল, দেবী দুর্গার পক্ষে সিংহই উপযুক্ত বাহন। এটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে মা লক্ষ্মীর মতো অমন সুন্দর দেবীর সঙ্গে পেঁচার মতো একটা পাখি বাহন কেন?

টুকলোর প্রশ্ন শুনে বাবা হেসে উঠলেন, বললেন, হ্যাঁ, এটা হয়তো বেমানান বলেই মনে হতে পারে। কারণ, লক্ষ্মী হলেন শ্রী, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের দেবী। তাঁর বাহন কেন হবে নিশাচর পেঁচা? তাই না? বিশেষ করে পেঁচা দিনে দেখতে পায় না, এই পাখিটার স্বভাবও খুব হিংস্র, দেখতেও ততো ভাল নয় আর গলার আওয়াজও কর্কশ। কেন এমন হলো? যদি ঠিকমতো ভেবে দেখা যায়, তাহলে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে পেঁচা ঠিকই হয়েছে। কারণ, লক্ষ্মী হলেন ফসলের দেবী। লক্ষ্মীপূজায় তাই ধানের ছড়া দিতে হয়। ধানের শত্রু হলো ইঁদুর। আর সেই ইঁদুরের চরম শত্রু হচ্ছে পেঁচা। অর্থাৎ, ইঁদুর ধ্বংস করে পেঁচা ফসল রক্ষা করে।

এখানে আরেকটা বিষয়ও মনে রাখা দরকার। কথায় বলে, লক্ষ্মী হলেন চঞ্চলা। কোথাও বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। তাই আজ যিনি বড়লোক, কাল তিনি ফকির, আজ যিনি লক্ষ্মীমন্ত, কাল তিনি লক্ষ্মীছাড়া। অসৎ লোকেরা অন্ধকার পথে, চোরাপথে, রাতের অন্ধকারে কালোবাজারি, প্রতারণা ও চুরি করে করে অর্থ উপার্জন করে। লক্ষ্মী এদের ঘরেও গিয়ে ঢোকেন। ওইসব অসৎ লোকগুলির সঙ্গে পেঁচার একটা অদ্ভুত মিল আছে।

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা আবার যমেরও দূত। এখানে পেঁচা যেন মা লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে, বলছে, কাউকে ঠকিয়ে টাকা-পয়সা রোজগার করো না। তাহলে যমরাজ তোমাদের শাস্তি দেবেন। সেদিক থেকে লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে পেঁচা খুবই উপযুক্ত হয়েছে।

বাবার যুক্তি টুকলোরও মনে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন দেখা দিল, পেঁচার ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তাই বলে মা সরস্বতী তো আর জলের দেবী নন, তাহলে হাঁস কেন হলো সরস্বতীর বাহন?

বাবা বললেন, এর পেছনে আছে অন্য কারণ। সেটাই বলছি। বাবা বলতে থাকেন, সরস্বতী কথার অর্থই হচ্ছে আলোকময়ী। তিনি সর্বশুক্লা। আমরা বিদ্যাদেবীর যে সকল স্তব পাঠ করি, তাতেই বলা হয়েছে, তিনি সর্বশুক্লা, তাঁর হাতে লেখনী, পুস্তক ও বীণা। তিনি শ্বেতপদ্মফুলের উপর বসে আছেন। তাঁর বাহন হংস বা হাঁস। তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আবার তিনিই সঙ্গীত ও শিল্পের দেবী।

আমাদের বেদে কখনও সরস্বতীকে বলা হয়েছে 'দেবীতমে', কখনও বলা হয়েছে 'অম্বিতমে', আবার কখনও বলা হয়েছে 'নদীতমে'। অর্থাৎ তিনিই দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, মায়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং নদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে সরস্বতী নামে একটি পবিত্র নদী ছিল। প্রাচীনকালে আমাদের আর্যঋষিরা এই নদীর তীরে বাস করতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। ইউরোপ-আমেরিকা যখন অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তখন এই নদীর তীরেই শোনা গিয়েছিল বিশ্বের প্রথম সামগান। আর্যঋষিরা এই নদীকেই দেবীরূপে পূজা করতেন। নদীই হয়ে গিয়েছিল তাঁদের বিদ্যাচর্চার দেবী। পরবর্তীকালে আর্যঋষিরা সরস্বতী নদীর তীর ছেড়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে বসতিস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা সরস্বতী নদীকে ভুলতে পারেননি। তখন তাঁরা সরস্বতীকে একটি মূর্তিতে রূপ দেন। স্বচ্ছ, সুন্দর, পবিত্র এবং অপরূপ নদীর রূপ হিসেবেই দেবী সরস্বতীর রূপ হলো শুভ্র। কারণ, শুভ্রই পবিত্র। সরস্বতী নদীতে রাজহংস ঘুরে বেড়াত এবং ফুটে থাকত অপূর্ব সব পদ্মফুল। তাই দেবী সরস্বতীকে বসানো হলো পদ্মফুলের উপর এবং তাঁর বাহন হলো হাঁস।

আর দেবী যেহেতু বিদ্যা, সঙ্গীত এবং জ্ঞানের দেবী, তাই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো বীণা, বই এবং কলম। এভাবেই সরস্বতী পূজার হলো প্রচলন।

সরস্বতীর বাহন হাঁস, দেবীর মতোই শুভ্র। জ্ঞানের গতি যেমন জলে, স্থলে এবং মহাশূন্যে, তেমনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর বাহন হাঁসের গতিও জলে, স্থলে এবং শূন্যে। প্রকৃত জ্ঞানী কে? যিনি আসল সত্যকে চিনে নিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী। হাঁসও ঠিক তাই। দুধ আর জল মিশিয়ে দিলে হাঁস অনায়াসেই জলটাকে রেখে দুধটাকে খেয়ে নিতে পারে। এই গুণের জন্যই হাঁস সরস্বতীর বাহন। হাঁস জলে থাকলেও এক বিন্দু জল হাঁসের পালকে লাগে না।

বাবার কথা থামিয়ে দিয়ে টুকলো বলে ওঠে, সরস্বতী যেমন দেখতে সুন্দর, হাঁসও তেমনি দেখতে সুন্দর। সরস্বতীর বাহনটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কথা বলতে বলতে টুকলো মনে মনে একবার সরস্বতী ও তাঁর বাহন হাঁসকে প্রণাম ঠুকে জানিয়ে দেয়, 'সামনেই পরীক্ষা, একটু আমার দিকে নজর দিও কিন্তু।' টুকলোকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বললেন, কী হলো, চুপ করে কি ভাবছিস?

টুকলো নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আচ্ছা বাবা, কার্ত্তিক তো দেব-সেনাপতি। তাঁকে যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে হয়। তাহলে তাঁর বাহন একটা ঘোড়া হলেই কি ভালো হতো না? ময়ূরটা বড় শৌখিন, তাই না?

বাবা বলতে থাকেন, তবে শোন। তারক নামে এক ভয়ঙ্কর অসুর প্রবল বিক্রমে একবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করেছিল। তারকাসুরের আক্রমণে দেবতারা হলেন পরাস্ত এবং স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। তখন অসহায় দেবতারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য একজন বীর নায়ক, বীর সেনাপতির সন্ধান করতে থাকেন। সেইসময় মহাদেব ও গৌরীর একটি পুত্র হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই সদ্যোজাত পুত্রটি পড়ে থাকে একটা শরবনে। তীর-ধনুকের তীরকেও বলা হয় শর। ভবিষ্যতে যিনি দেবসেনাপতি হবেন, তিনিই শিশু অবস্থায় পড়েছিলেন শরবনে। সেই পথ দিয়ে কয়েকজন কৃত্তিকা যাচ্ছিলেন। তাঁদের চোখে পড়ল সুন্দর শিশুসন্তানটি। তাঁরাই শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে বড় করেছিলেন। কৃত্তিকারা পালন করেছিলেন বলেই শিশুটির নাম হলো কার্ত্তিক। পরবর্তীকালে এই কার্ত্তিকই হয়েছিলেন দেবসেনাপতি এবং তাঁর হাতেই পরাস্ত হয়েছিল তারকাসুর। দেবতারা ফিরে পেয়েছিলেন স্বর্গরাজ্য।

কার্ত্তিক হলেন সাহস ও সুন্দরের প্রতীক। তাঁর বাহন ময়ূরও সাহসী এবং সুন্দর। মহাভারতে বলা হয়েছে, কার্ত্তিককে এই বাহনটি উপহার দিয়েছিলেন অগ্নি। ময়ূরের মধ্যে আছে ক্ষত্রিয়ের গুণ। বিরাট বিরাট বিষধর সাপকে ময়ূর সুকৌশলে হত্যা করে এবং সাপের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে দারুণ বীরত্বের পরিচয় দেয়। মোরগের মতো ময়ূরও কেকাধ্বনি করে ভোর হওয়ার কথা ঘোষণা করে। ময়ূরও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং পরিবার-পরিজন রক্ষায় জীবনপণ সংগ্রাম করে। ময়ূরের অস্ত্র হচ্ছে ঠোঁট এবং নখ। তার পাখনা হচ্ছে ঢাল। যুদ্ধবিদ্যায় তার দক্ষতা ঠিক ক্ষত্রিয়ের মতো। তাই ময়ূর হচ্ছে দেবসেনাপতির সার্থক বাহন।

টুকলো ময়ূরের এতসব গুণপনার কথা শুনে রীতিমতো অবাক হয়। সে অনেকবার ময়ূর দেখেছে, আকাশে মেঘ দেখে ময়ূরকে পেখম ধরতেও দেখেছে, ময়ূরকে নাচতেও দেখেছে। কিন্তু ময়ূর যে একটা যোদ্ধা-পাখি, এ খবরটাই সে জানত না। তাই, এখন সে কার্ত্তিকের বাহন হিসেবে ময়ূরকে মেনে নিতে রাজী আছে। কিন্তু তাই বলে ইঁদুর কি করে গণেশের বাহন হয়? হঠাৎ টুকলোর মনে পড়ে যায় সেই গল্পটা। একবার মা দুর্গা তাঁর দুই ছেলে কার্ত্তিক ও গণেশকে পৃথিবীটা ঘুরে আসতে বললেন। মায়ের আদেশ শুনে কার্ত্তিক আর এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। তাড়াতাড়ি নিজের বাহনে উঠে আকাশে উড়ে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, গণেশের বাহন তো ইঁদুর। ইঁদুরে চেপে গণেশ যতক্ষণে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবেন, ততক্ষণে তিনি ময়ূরে চেপে দশবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসবেন। যথাসময়ে কার্ত্তিক পৃথিবী ঘুরে মায়ের কাছে এসে দেখেন, গণেশ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপারটা কি? তাহলে কি গণেশ প্রদক্ষিণ করতে যাননি? আসলে গণেশ কিন্তু দারুণ একটা চালাকি করেছিলেন। কার্ত্তিক ময়ূরের পিঠে চেপে উড়ে যাওয়ার পরই গণেশ ইঁদুরের পিঠে চেপে একবার মা দুর্গাকে প্রদক্ষিণ করে বললেন: মাগো, তুমিই তো জগতের মা, তুমিই পৃথিবী। তাই আমি তোমাকেই প্রদক্ষিণ করলাম। কার্ত্তিক যখন সব ব্যাপারটা শুনলেন, তখন তাঁর মুখে আর কথা নেই। তিনি ভাবতেই পারেননি যে, গণেশের মাথায় এত বুদ্ধি!

এই গণেশের জন্ম হওয়ার পর সব দেবতারা এসেছেন পার্বতীর পুত্রকে দেখতে। এসেছেন শনি ঠাকুরও। তবে শনি ঠাকুর গণেশের দিকে তাকাচ্ছেন না। কারণ, তাঁর দৃষ্টি বড় ভয়ঙ্কর। যেদিকে তিনি তাকাবেন, সেদিকেই একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। কথায় বলে শনির দৃষ্টি। তাই তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন। এতে পার্বতী খুব দুঃখ পেলেন। তাঁর ছেলেকে শনি ঠাকুর একবার দেখবেন না? বারবার পার্বতী শনিকে অনুরোধ করতে থাকেন। শেষটায় যে-ই না শনি গণেশের দিকে তাকিয়েছেন, অমনি গণেশের মাথাটা খসে গেল। পার্বতী এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললেন। এবার উপায়? উপায় করলেন বিষ্ণু। তিনি এক ঐরাবতের মাথাটা কেটে এনে গণেশের মাথায় বসিয়ে দিলেন। সেই থেকে গণেশ হয়ে গেলেন গজানন।

গণেশ হলেন জনগণের দেবতা। ইঁদুর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। এইসব সাধারণ মানুষ বা ক্ষুদ্র প্রাণীকে কেউ মূল্য দিতে চায় না। কিন্তু গণেশ তো সাধারণেরই দেবতা। তাই তিনি দুর্বল এবং সাধারণের প্রতীক হিসেবে ইঁদুরকে নিজের বাহন করেছেন। ইঁদুর ছোট প্রাণী হলেও এর ছেদন দন্তগুলি খুবই শক্ত। এই শক্ত দাঁত দিয়ে ইঁদুর পাথরেও গর্ত করতে পারে। একটা সিংহ এবং একটা ইঁদুর যদি শক্ত জালে বন্দী হয়, তাহলে বলশালী সিংহ অসহায় হয়ে পড়লেও ইঁদুর জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। সকল জাল এবং সকল বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির পথ তৈরি করার ক্ষমতা ইঁদুরের আছে বলেই জনগণের দেবতা গণেশের বাহন হচ্ছে এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি। মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন, আকারে ক্ষুদ্র হলেও সবকিছুই আসলে ক্ষুদ্র নয়। অপমানিত শূদ্রের মধ্যেও আছে বিরাটের পরিচয়। গণেশ তারই প্রতীক।

বাবার কথা শুনতে শুনতে টুকলো যেন নতুন আলো দেখতে পায়। দুর্গা ঠাকুর দেখা মানে অনেক কিছু শেখা। তাই টুকলো মনে মনে ঠিক করে ফেলে, এবার ১১০টা ঠাকুর দেখতেই হবে।

ছবি: রাহুল মজুমদার

কে ওই কিশোর ?

প্রদীপ মিত্র

মেট্রোপলিটান স্কুল।

ছাত্ররা সবাই ব্যস্ত। পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। সভাপতির আসনে বসে আছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরস্কার দেওয়া শেষ হলেই সম্বর্ধনা জানানো হবে স্কুলের এক বিদায়ী শিক্ষককে। ছাত্ররাই তার আয়োজন করেছে।

কিন্তু ছাত্ররা এ ওর মুখের দিকে চাইছে! সব তো ঠিক আছে, একজন ছাত্রকে কিছু বলতে হবে। কে জানাবে সেই বিদায় অভিনন্দন? যাকেই বলা হয় সেই পিছিয়ে যায়। অত বড় বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের সামনে মুখ খুলতে কেউ রাজী নয়। ওদিকে পুরস্কার দেওয়াও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ নির্ভীক এক কিশোর সব ছাত্রের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল মঞ্চে। মাথা উঁচু করে সেই কিশোর ছাত্রটি দাঁড়ালো সভাপতির আসনের সামনে। স্কুলের সব ছাত্রদের বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে। ও আমাদের বাঁচাতে পারবে তো? সকলের মনেই সেই ভয়। ভুলভাল বললে আর লজ্জার শেষ থাকবে না!

কিন্তু শ্রদ্ধেয় সভাপতিকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে চমৎকার ইংরেজিতে দীপ্ত কণ্ঠে সে বলতে লাগলো। ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই তার মনে। সকলে মুগ্ধ হয়ে শুনছে তার বক্তৃতা।

বিদায়ী শিক্ষকের গুণাবলীর কথা আলোচনার পর সে বলতে শুরু করল তাঁর চলে যাওয়ার জন্য ছাত্ররা কতটা ব্যথিত। দরদভরা কণ্ঠে আধঘণ্টা ধরে বলার পর সে থামল। বক্তৃতা শুনে খুব খুশি হলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাকে আশীর্বাদ করলেন প্রাণভরে।

উপস্থিত শিক্ষক আর ছাত্ররা তার ইংরেজি জ্ঞান দেখে চমকে

উঠলো। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তার বক্তৃতা করার ক্ষমতা দেখে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সবাই।

কিন্তু কে এই নির্ভীক ও বাগ্মী কিশোর? এই কিশোর আর কেউ নয়—আমাদের বিলে, মানে নরেন্দ্রনাথ দত্ত। যে কোনো কাজে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহসই তাকে করেছিল বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ।

দ্যাখো তো হে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বেশ ছিল, শুধুমুধু
কেন দিলে তাড়িয়ে?
চাল মোটে এই ক'টা?
অত ধান কাঁড়িয়ে?
কী বললে? এ আমার
ব'ড়ে-টেপা দাবা না?

দ্যাখো তো হে, ওই দূরে
আগুনের আভা না?
আল্‌সেয় চার চিল ব'সে আছে?
নাকি আছে দাঁড়িয়ে?
মুখে দিয়ে হাভানা?

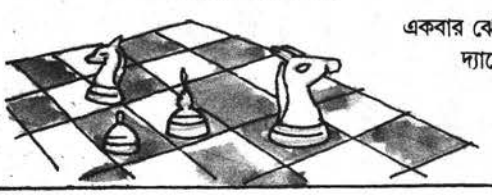

দ্যাখো তো হে, কাছেপিঠে
তবলা বাজাতে পারে
আছে কেউ?
কেউ কি পড়েছে ঘাড়ে?
এত রাতে কুত্তারা
করে কেন কেঁউ কেঁউ?

একবার ঝোপঝাড়ে
দ্যাখো তো হে
শেয়ালেরা কাকে দেখে ডাকে ফেউ?

ছবি: সুফি

পায় পড়ি বাঘমামা

রবি ঘোষ

সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে বাঘের সঙ্গে বাঘা। ছবিঃ নিমাই ঘোষ।

গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির শূটিং-এর সময় মানিকদা (সত্যজিৎ রায়) একদিন বললেন, তোমাদের সামান্য একটু কাজ আছে বাঘের সঙ্গে। ভয় নেই, বাঘ অনেক দূরে থাকবে এবং তাও বাঁধা থাকবে একটা ভয়ঙ্কর শক্ত খুঁটির সঙ্গে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী দিয়ে বাঘটা বাঁধা থাকবে, দড়ি দিয়ে ?

মানিকদা হেসে বললেন, না না—দড়ি দিয়ে বাঘকে বাঁধা যায় না। একটা বিশেষ ধরনের তারের দড়ি তৈরি করা হয়েছে যা দিয়ে কুড়ি টন মাল তোলা যায়। আর সেই তারের দড়ি দিয়েই বাঘটাকে বাঁধা হবে।

আমরা নিশ্চিন্ত হলাম এবং শটটাও ভালভাবে হয়ে গেল। বাঘটা আমাদের থেকে প্রায় একশ গজ দূরে ছিল। এর দশ বছর পর আবার শুরু হলো হীরক রাজার দেশের শূটিং। এবারও বাঘের সঙ্গে শূটিং, তবে এবারের শূটিংটা মাদ্রাজে প্রসাদ স্টুডিওতে হবে।

ঠিক পুজোর আগে সদলবলে আমরা করমণ্ডলে রওনা দিলাম। শূটিংটা সপ্তমী এবং অষ্টমীর দিন। মাদ্রাজে পৌঁছেই বিকেলবেলা মানিকদার সঙ্গে বাঘ দেখতে গেলাম। এবার বাঘের কাছে দাঁড়িয়ে শূটিং এবং আমার একার। তাই বাঘ সম্পর্কে আমার ভয়টা কাটাবার জন্যই মানিকদা আগের দিন আমাকে বাঘের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে গেলেন। আমি, মানিকদা এবং ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় গেলাম। বাঘটা বুড়ো এবং একটা চোখেও কম দেখে। তাই আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম। একবার বাঘের গায়ে একটু হাতও দিলাম এবং আমার সাহসে আমি নিজেই তখন চমৎকৃত। খুব নিশ্চিন্ত মনে সবাই হোটেলে ফিরে এলাম। এর পরের পরের দিন শূটিং। পরের দিন সকালে ঘরে বসে আছি। সৌমেন্দু ঘরে ঢুকল এবং বলল, রবিদা, গতকালের বাঘটা ক্যানসেল্ড। মানিকদার একেবারেই বাঘটাকে পছন্দ হয়নি। এবার যে বাঘটা পেয়েছেন সেটা দারুণ, রয়াল বেঙ্গল টাইগার।

কথাটা শোনামাত্র আমার সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। হঠাৎ কিরকম ভয় ভয় করতে লাগলো। পরের দিন শূটিং। সকালে

বৈজ্ঞানিকের ল্যাবোরেটারিতে গুপী (তপেন চট্টোপাধ্যায়) ও বাঘা (রবি ঘোষ)

উঠেই মানিকদা বললেন, রবি, এবারের বাঘটা দারুণ। ভয়ের কিছু নেই। খুব ট্রেন্ড।

কিন্তু আমার তো আর ভয় যায় না। বুকের মধ্যেটা কিরকম করছে। করবে না? তোমরাই বলো, হাজার হলেও রয়াল বেঙ্গল টাইগার তো!

তবু পরের দিন সকালে রেডি হয়ে বসে আছি শূটিংয়ে যাবার জন্য। আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত রঞ্জিত সেনগুপ্ত। মানিকদার খুব প্রিয়পাত্র এবং আমাদের মাদ্রাজের সর্বময় কর্তা। তিনি ধর্মভীরু মানুষ। আমায় বললেন, আজ মহাষ্টমী। একবার মাকে দর্শন করে শূটিংয়ে যাবেন। হাজার হলেও বাঘের সঙ্গে কাজ তো! আমি বললাম, দাদা, আমি তো ঈশ্বরবিশ্বাসী নই। কী হবে? তবু ওঁর কথায় একবার মণ্ডপ হয়ে প্রসাদ স্টুডিওতে গেলাম। কীরকম যেন মনে হচ্ছিল, সবাই আমায় দেখছে। বিশেষ করে আমার প্রতিক্রিয়া। আমি চুপচাপ মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ঠিক বেলা বারোটার সময় বিরাট হৈহৈ করে একটা বড় খাঁচায় করে 'বাঘ মামাকে' ফ্লোরে আনা হলো। এই প্রথম মানিকদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী রবি, কেমন? এসো একবার গায়ে হাত দাও দেখি। প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো খাঁচার গরাদের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একবার বাঘটা ছুঁলাম। কী বিশাল চেহারা! কী ভয়ঙ্কর মুখ! কী বিরাট থাবা। ভাবাই যায় না।

ফ্লোরে বাঘকে নামান হলো। বাঘটা এক লাফে দেয়ালের গায়ে গিয়ে দাঁড়ালো। সাত-আটজন লোক কী সব আওয়াজ করতেই বাঘটা বসে পড়লো। পরে আবার দাঁড়ালো। ফের আওয়াজে বসে পড়ে। মানিকদা একটু দূরে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে বসে আছেন। পাশে আমি দাঁড়িয়ে। ঠিক তাঁর পাশেই বৌদি একটা চেয়ারে বসে আমায় দেখছেন। আর সব তখন কে কোথায় জানিই না। একমাত্র মানিকদার প্রধান সহকারীকে দেখছিলাম দূরে একটা মাচার ওপরে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। এই সময় বাঘের ট্রেনার জিজ্ঞাসা করল, কৌন কাম করেগা বাঘকা সাথ?

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে পড়ল, ম্যায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে আমায় বাঘের কাছে যেতে বলল। আমিও ঠিক বাঘের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঘ একঝলক আমায় দেখল। কিছু বলল না। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, বোধহয় আমায় চিনতে পেরেছে, বাঙালি বলে। ও-ও তো বাঙলার বাঘ—রয়াল বেঙ্গল টাইগার!

তারপর চলল আমার ট্রেনিং বাঘের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। এত সুন্দর জীব বোধহয় আর হয় না। বাঘের পা ধরে টানলাম। ঘাড় ঘোরালাম। গালে গাল রাখলাম। কিন্তু সবসময় একটা নাম উচ্চারণ করে যেতে হয়েছিল। সেটা হলো 'উম্মা'। এটা বাঘমামার নাম। সাড়ে দশ ফুট লম্বা ছিলেন তিনি। একটা পা একবার ঘোরালেই আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যেত। কিন্তু আশ্চর্য, বাঘটা ভীষণ ভালো ব্যবহার করল।

এই সময় মানিকদা দূর থেকে বললেন, রবি, শট নেব?

তখন আমি অন্য মার্গে। বললাম, হ্যাঁ, মানিকদা, নিন। বাঘ বোধহয় আমার কন্ট্রোলে। শুরু হলো—'দয়া করে বাঘমামা কোরো নাকো রাগ'। মহাআনন্দে সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে সব কাজ শেষ করে মানিকদা সবাইকে নিয়ে হৈহৈ করতে করতে হোটেলে ফিরলেন।

পরে একজনকে বলেছিলাম, বাঘের হাতে মরতেও ভয় পাই না। কারণ, ইতিহাসে তাহলে লেখা থাকবে—'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির শূটিং করতে গিয়ে রবি ঘোষের পতন ও মৃত্যু। কিন্তু বাঘ যদি আমাকে খেতে শুরু করত—তাহলে? ওরে বাবা, থাক! ওসব অলুক্ষণে কথা না ভাবাই ভালো। তার চেয়ে বরং বলি—পায় পড়ি বাঘমামা...

টোটার ছুটি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাক্স-প্যাটরা-বিছানা তোল্,
টোটাবাবু যাবে আসানসোল।
আপাতত তার ইচ্ছে এই
ছুটিটা কাটাবে সেইখানেই।
কেন যে সেখানে যেতে সে চায়,
বোঝে না সে-কথা পাঁচজনায়।

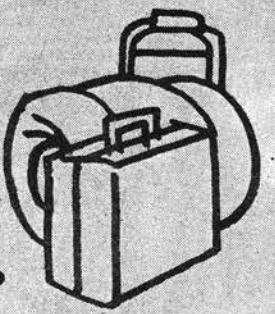

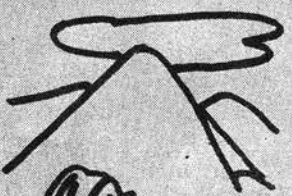

ক্লাসের বন্ধু দীপক সিং,
বলে, "আমি যাব দার্জিলিং।"
অর্কের বাড়ি তিনবিঘায়,
তারা যাবে পুরী, নয় দীঘায়।
চাঁদুদের আছে ট্যাকের জোর,
তারা প্লেনে যাবে বাঙ্গালোর।

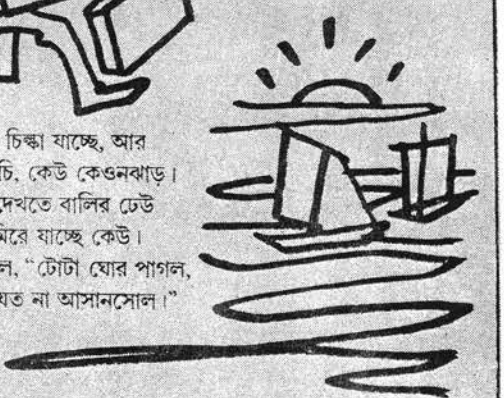

কেউ বা চিল্কা যাচ্ছে, আর
কেউ রাঁচি, কেউ কেওনঝাড়।
মরুতে দেখতে বালির ঢেউ
জয়শলমিরে যাচ্ছে কেউ।
তারা বলে, "টোটা ঘোর পাগল,
নইলে যেত না আসানসোল।"

টোটা বলে, "কেন সেখানে যাই
বললে বুঝবি তোরা সবাই।
দাদুন থাকেন সেখানে, তাঁর
মজার গল্পে রাত কাবার।
ঠাম্মাও দেখি বানান বেশ
মিঠাই-মণ্ডা পিঠে-পায়েস।"

হিসেবে ঘটেনি গণ্ডগোল,
তাই টোটা যায় আসানসোল।

ছবি : সুফি

বন্দিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লোহার গেটটা বন্ধ। তার বাইরে মহিমবাবু যেই সাইকেল রিকশা থেকে নামলেন, অমনি ভেতর থেকে একটা কুকুর হিংস্রভাবে ডাকতে ডাকতে তেড়ে এলো। সাধারণ খয়েরি রঙের নেড়ি কুত্তা, কিন্তু তার গলায় খুব তেজ!

মহিমবাবু প্যান্ট-শার্ট পরা, রোদ্দুরের জন্য মাথায় দিয়েছেন একটা তালপাতার টুপি। তিনি কুকুর-টুকুর বিশেষ পছন্দ করেন না।

কুকুরটা ঘাউ ঘাউ করে ডেকেই চলেছে। মহিমবাবু বললেন, কী আপদ! এখানে আবার একটা কুকুর এলো কী করে?

রিকশা থেকে পরে নামলেন তাঁর স্ত্রী সুজাতা দেবী। রিকশার ভাড়া তিনিই চুকিয়ে দিতে দিতে বললেন, ভালোই তো। একটা কুকুর থাকলে বাড়ির পাহারা হয়, যাকে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

মহিম বললেন, এ যে আমাকেই ঢুকতে দিচ্ছে না! কামড়ে-টামড়ে দেবে নাকি?

সুজাতা কোনো কুকুরকেই ভয় পান না। তিনি গেট খুলে চুঃ চুঃ শব্দ করতেই কুকুরটা ডাক থামিয়ে দিল।

সুজাতা ডাকলেন, সরদার! সরদার!

বাড়ির পেছন দিক থেকে এলো একজন কুচকুচে কালো মাঝ-বয়েসী লোক। সে একজন সাঁওতাল। সে এই বাড়ির কেয়ার-টেকার।

সুজাতা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো, সরদার?

সাঁওতালরা সাধারণত খুব হাসি-খুশি ধরনের মানুষ হয়। কিন্তু এই মানুষটি গম্ভীর ধরনের। সে সহজে কথা বলে না। সুজাতার প্রশ্ন শুনে সে মুখে কিছু না বলে শুধু ঘাড়টা হেলালো। এই সময় কোথা থেকে আর একটা কুকুর লেজ নাড়তে লাগলো সরদারের পাশে এসে।

একেবারে নূতন ঝকঝকে বাড়ি। সামনের বাগানে অনেক ফুল ফুটেছে। পাশে একটা ছোট্ট পুকুর। তাতে টলটল করছে জল।

মহিম নিজেই বাড়িটা দেখে অবাক। অনবরত বাঃ বাঃ বলতে লাগলেন।

বছর খানেক আগে কেনা হয়েছিল জমি। তখন জায়গাটা ছিল এবড়ো-খেবড়ো মাঠের মতন। আর ছিল কয়েকটা তাল গাছ। বাড়ি তৈরির জন্য যখন সবেমাত্র খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছে, তখন অফিসের একটা কাজে মহিমকে চলে যেতে হলো আফ্রিকায়। সেখানেই থেকে যেতে হলো আট মাস। এর মধ্যে সুজাতা নিজেই দেখাশুনো করে শান্তিনিকেতনে এই বাড়িটা বানিয়ে ফেলেছেন।

মহিমের কাছে তাই সবকিছুই নতুন। তাঁর মনে হচ্ছে, যেন আলাদিনের দৈত্য মাঠের মধ্যে একটা বাড়ি বসিয়ে দিয়েছে।

চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

চুল নিয়ে সমস্যা ?

এগুলি চুলের কোন রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই সমাধানের জন্য মাথায় লাগানোর ওষুধের সঙ্গে সঠিক খাওয়ার ওষুধেরও প্রয়োজন।

.... ডাঃ সরকার

খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান, আর্ণিকাপ্লাস লাগান আর ট্রায়োফার খান। এ দুটি চুল পড়া বন্ধ করে, চুলের পুষ্টি জোগায়, অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়, চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়। রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়, আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার—
''আর্ণিকাপ্লাস-তেলবিহীন হেয়ার লোশন ও ট্রায়োফার ট্যাবলেট-হোমিও হেয়ার টনিক''
একই অভিনব প্যাকে।
প্যাক: ৬০ মিলি ও ১০০ মিলি।

ব্যবহার বিধি:
প্যাকের ভিতর দ্রষ্টব্য।

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল্ অ্যাক্শন্ হেয়ার ভাইট্যালাইজার

কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোমিও ওষুধ

লিভোসিন নির্মাতাদের
সহযোগী সংস্থা Allen -এর
হোমিও গবেষণার একটি উপহার।

এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
এ্যালেন হাউস ঃ কলি-৫৪, ফোন ঃ ৩৬-৩০৯৬
এ্যালেন ভবন ঃ কলি-৫৯ ফোন ঃ ৫৯-৪০৫১

Jupiter
Emars Allen
allen's india
Dr. Sarkar Group

অ্যালোপ্যাথিক
আয়ুর্বেদিক
হোমিওপ্যাথিক
ওষুধ প্রস্তুতকারক

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Marketed by :
allen's india
Allen's India Marketing Pvt. Ltd.
ArnikaPlus Apartment, Sealdah
35, A. P. C. Road, Calcutta-9
Phone : 350-9026
Allen Apt : 351-0062

Allen's Ad. India

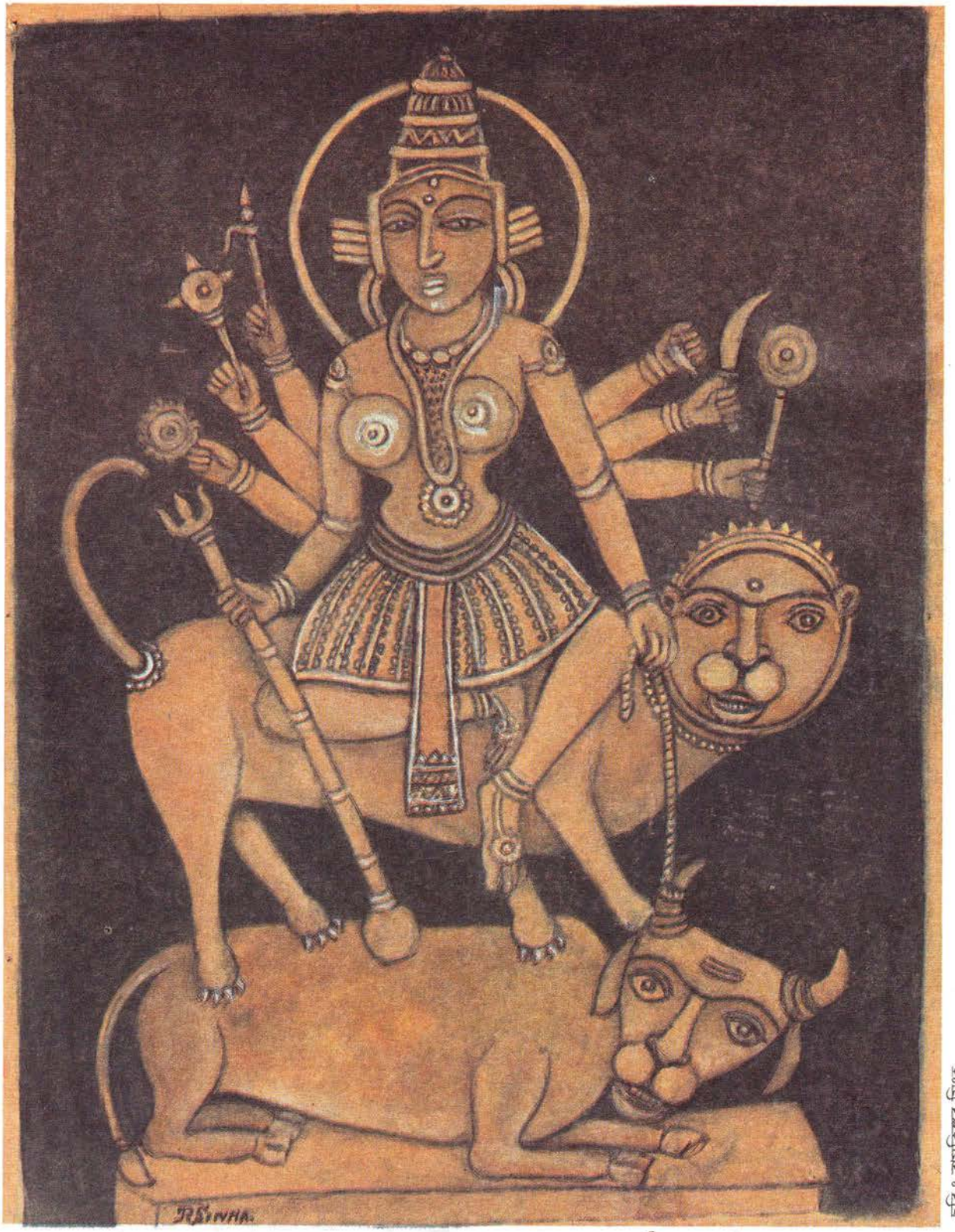

ছবি ঃ রামকিঙ্কর সিংহ

অশান্ত বিশ্বমনের কানায় কানায় ভরে উঠুক তোমার করুণা ধারার শান্তিবারি।
আহ্বানে-আগমনে হয়ে উঠুক চতুর্দিক আনন্দমুখর। তোমায় প্রণাম। প্রণাম তোমায়।

সবই বেশ পছন্দ হয়েছে মহিমের। শুধু অনবরত কুকুরের ডাক শুনলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। দুটো কুকুর যখন তখন ডাকে, ঝগড়া করে, খেলা করে। কুকুর দুটো মহিমের পা চাটবার চেষ্টা করলে তিনি খানিকটা ভয় পেয়ে আর খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, এই যাঃ যাঃ!

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে মহিম হয়তো আকাশের মেঘ দেখে গুনগুন করে গান গাইছেন, এমন সময় কুকুর দুটো হুটোপাটি করে তাঁর সামনে এসে তাঁর গায়ের গন্ধ শুঁকতে চায়। কুকুরদের এই উপদ্রবে তাঁর গান বন্ধ হয়ে যায়।

তিনি সুজাতাকে ডেকে বললেন, এ বাড়িতে কুকুর দরকার নেই। তুমি ওদের তাড়াও।

সুজাতা বললেন, সে কি! ও দুটো তো সরদারের পোষা কুকুর। সাঁওতালরা কুকুর ছাড়া থাকতে পারে না, তুমি জানো না?

মহিম বললেন, একটা কুকুরই তো যথেষ্ট, আবার দুটো কেন?

সুজাতা বললেন, দুটোই যে ওর আগে থেকে পোষা।

মহিম বললেন, ওর যদি একটা পোষা বাঘ থাকতো, সেটাও কি আমাদের এই বাড়িতে রাখতে হতো?

এ কথা শুনে হেসে ফেললেন সুজাতা।

এই নতুন বাড়ির সবকিছুই পছন্দ মহিমের। শুধু কুকুর দুটো ছাড়া। ওদের আবার বন্ধু আছে। এক এক সময় আরও কুকুর ঢুকে আসে বাড়ির মধ্যে।

শান্তিনিকেতনের এই বাড়িতে তো একটানা বেশিদিন থাকা যায় না। কলকাতায় কাজকর্ম আছে। তবে মহিম আর সুজাতা একটু ছুটি পেলেই চলে আসেন এখানে।

কয়েক মাস বাদে সরদার হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল। কোনো কারণ নেই, ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি, এমনিই সে বললো, নিজের গ্রামে ফিরে যাবে।

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল সরদার। সুজাতা বিপদে পড়ে গেলেন। এরপর বাড়ির দেখাশুনো করবে কে? খালি বাড়ি ফেলে রাখলেই চোর আসবে।

মহিম কিন্তু খুশি। কুকুর দুটো তো বিদায় হয়েছে।

চেনাশুনো লোকদের ধরাধরি করে আর একটি লোক পাওয়া গেল। তার নাম রাখাল। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস, খুব চটপটে, বাগানের কাজ জানে, রান্না জানে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, রাখাল খুবই উপযুক্ত ছেলে। সুজাতার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। মহিমের আরও পছন্দ, রাখালের কোনো পোষা কুকুর নেই।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মহিম পাখির ডাক শুনছেন। এত পাখি কলকাতায় দেখা যায় না। বুলবুলি, দোয়েল, মুনিয়া। মহিম ঘুমোন দোতলার ঘরে। জানলা দিয়ে পুকুরটা দেখা যায়। পুকুরের ধারে ধারে ছোট ছোট গাছ। একটা কদম গাছ এর মধ্যেই অনেকটা বড় হয়েছে। সেই গাছটায় পাখিরা এসে বসে। একদিন এসেছিল একটা ইস্টকুটুম পাখি। পায়রা আর বকেরা পুকুরের জল খেতে আসে।

পাখির ডাক শুনতে শুনতে মহিম একটা কুঁই কুঁই শব্দ শুনতে পেলেন। এটা আবার কিসের শব্দ? তিনি নেমে এলেন নিচে। বাইরের বারান্দায় এসে দেখলেন, সুজাতা বিস্কুট ভেঙে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আর সেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে খাচ্ছে একটা বাচ্চা কুকুর। খুবই বাচ্চা, মোটে তিন-চার মাস বয়েস হবে, কালো-সাদা রং, একটা পশমের বলের মতন।

মহিম ভুরু তুলে বললেন, আবার কুকুর?

সুজাতা বললেন, দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর কুকুরটা। কী রকম তুলতুলে। আর কী সুন্দর চোখ দুটো।

মহিম বললেন, এটাকে আবার কোথায় পেলে?

সুজাতা বললেন, এমনিই গেটের তলা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। এইটুকু কুকুর, কিন্তু কী বুদ্ধি দেখবে?

একখানা আস্ত বিস্কুট উঁচু করে ধরে সুজাতা বললেন, এই শুয়ে পড়, শুয়ে পড়! না হলে পাবি না।

কুকুরটা অমনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। পাগুলো গুটিয়ে রাখলো, আর মাথাটা ঘোরাতে লাগলো এদিক ওদিক।

সুজাতা ওকে টপ করে বুকে তুলে নিয়ে বললেন, কী লক্ষ্মী কুকুর। এটাকে আমি পুষবো।

মহিম বিরক্ত হয়ে বললেন, আবার কুকুরের ঝামেলা কেন?

সুজাতা ধমক দিয়ে বললেন, তুমি এইটুকু একটা কুকুরছানাকেও ভয় পাও নাকি?

মহিম বললেন, না, ভয়ের কী আছে? তবে এটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো বাড়ির পোষা কুকুর। গেটের বাইরে রেখে আসাই ভালো!

সুজাতা ঝংকার দিয়ে বললেন, তোমাকে অত ভাবতে হবে না। অন্য কেউ চাইতে এলে দিয়ে দেবো। বাড়িতে একটা কুকুর রাখা খুব দরকার।

মহিম আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। দু' তিন দিনের মধ্যে কেউ চাইতেও এলো না কুকুরটাকে।

বাচ্চা কুকুরটা সারাক্ষণ খেলে বেড়ায়, বেশি ডাকাডাকি করে না। শুধু দুপুরবেলা মহিম আর সুজাতা যখন খেতে বসেন, সে তখন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভুক ভুক শব্দ করে। যেন সে বলতে চায়, আমাকে খেতে দিতে ভুলে যেও না যেন!

সেই যে প্রথম দিন সুজাতা ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, লক্ষ্মী কুকুর। সেই থেকে ওর নাম হয়ে গেল লক্ষ্মী।

সুজাতার খুব মায়া পড়ে গেছে লক্ষ্মীর ওপর। মহিমও মাঝে মাঝে এখন ওকে বিস্কুট খেতে দেন। হঠাৎ কোনো সময় লক্ষ্মী তাঁর পায়ের ওপর এসে লুটোপুটি খেলে রাগ করার বদলে হেসে ফেলেন তিনি।

রাখাল কিন্তু প্রথম থেকেই কুকুরটাকে অপছন্দ করেছে। সে বললো, এটা মেয়ে-কুকুর। বাড়িতে মেয়ে-কুকুর রাখা ভালো নয়, তাতে অনেক ঝামেলা হয়!

সুজাতা ধমক দিয়ে বললেন, মেয়ে-কুকুর আর ছেলে-কুকুর কী রে? মেয়ে বলে বুঝি মানুষ নয়?

তাই শুনে মহিম খুব হাসতে লাগলেন।

সুজাতা সেই হাসি অগ্রাহ্য করে বললেন, ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। লক্ষ্মী এ বাড়িতেই থাকবে। আমরা যখন থাকবো না, তখনো ওকে ভালো করে খেতেটেতে দেবে।

দু' দিন বাদে সুজাতা আর মহিম ফিরে গেলেন কলকাতায়। তারপর আর বেশ কিছুদিন ফেরা হলো না শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় অনেক কাজ।

মাস দেড়েক বাদে আবার ওঁরা এলেন শান্তিনিকেতনে। এবার বেশ বড় দল। মহিমের মা এসেছেন সঙ্গে। ওঁদের ছেলে বাপ্পা খড়্গপুরে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে, সেও এসেছে গরমের

ছুটিতে। সুজাতার দিদি-জামাইবাবু এসেছেন বেড়াতে।

ঘরের জিনিসপত্র ঠিক-ঠাক করে সাজাতে সাজাতে হঠাৎ সুজাতার খেয়াল হলো, লক্ষ্মীকে তো একবারও দেখা যায়নি!

রাখালকে সেই কথা জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, ও মাঝে মাঝেই বাইরে চলে যায়। বাড়িটাড়ি কিছু পাহারা দেয় না। বাইরে বাইরেই থাকে!

সুজাতা বললেন, নিশ্চয়ই তুই ওকে খেতে দিস না। তাই ও বাইরে চলে যায়।

সুজাতা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দু'বার ডাকলেন লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

তখন দেখা গেল দূরের মাঠ পেরিয়ে তীরের মতন ছুটে আসছে একটা বাচ্চা কুকুর। কাছাকাছি এসে এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়লো সুজাতার পায়ের ওপর। সুজাতা তাকে কোলে তুলে নিয়েই বললেন, ইস, দেখেছো কত ময়লা মেখেছে গায়ে!

একটুক্ষণের মধ্যেই ঘাসে কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল লক্ষ্মী।

বাপ্পা কুকুর ভালোবাসে। সে একটা বল নিয়ে খেলতে লাগলো। যতবার বলটা ছুঁড়ে দেয়, লক্ষ্মী দৌড়ে গিয়ে বলটা মুখে করে আনে। বাপ্পা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও লক্ষ্মী তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

কুকুরটা খুব দুরন্ত কিন্তু অসভ্য নয়। খাবার দিলেই চেটেপুটে খায়, অথচ হ্যাংলামি নেই একটুও। দেখতেও বেশ সুন্দর। সবারই পছন্দ হয়ে গেল ওকে।

শুধু মা বললেন, ওর নাম লক্ষ্মী রেখেছো কেন? ঠাকুর-দেবতার নাম নিয়ে ইয়ার্কি করতে নেই। তার বদলে ওর নাম দাও রক্ষী। বাড়ি পাহারা দেবে, তাই রক্ষী নামটাই মানাবে।

সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে নামটা পছন্দ করে ফেললেন। রক্ষী বলে ডাকলেই ও সাড়া দেয়। ও লক্ষ্মী আর রক্ষীর বিশেষ তফাৎ বুঝবে না। কয়েকবার তিনি রক্ষী রক্ষী বলে ডাকলেন, অমনি সে ছুটে এলো।

বাপ্পা শুধু বললো, ঠাম্মি, কুকুরটা তো মেয়ে। তাহলে রক্ষীর বদলে ওর নাম রক্ষিনী রাখতে হয়।

বাপ্পার ঠাকুমা বললেন, রক্ষিনী শুনতে বিচ্ছিরি। ওসব রক্ষিনী-যক্ষিনী দরকার নেই। শুধু রক্ষীই ভালো।

লক্ষ্মী সেদিন থেকে রক্ষী হয়ে গেল।

সুজাতার ধারণা অন্য সব কুকুরের চেয়ে রক্ষীর বুদ্ধি বেশি। একদিন সকালে তার কিছুটা প্রমাণও পাওয়া গেল।

আগের রাতে পাঁঠার মাংস খাওয়া হয়েছিল। তার প্রচুর হাড় রক্ষী খেয়েছে। পাঁঠার মাংসের হাড় কুকুরদের বেশি পছন্দ।

সকালবেলা সবাই যখন বারান্দায় চা খেতে বসে, তখন রক্ষী কাছে এসে লাফালাফি করে। প্রত্যেকেই খানিকটা বিস্কুটের টুকরো দেয় ওকে।

সেই সকালে রক্ষীর যেন বিস্কুট খাওয়ার তেমন উৎসাহ নেই। ছুটে ছুটে বিস্কুট কুড়োচ্ছে না। সুজাতা বললেন, কাল রাত্তিরে রক্ষী এত মাংস খেয়েছে যে এখনো ওর খিদে পায়নি।

বাপ্পা তবু আস্ত একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিল একটু দূরে।

রক্ষী কয়েক পলক সেই বিস্কুটটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর সেটা মুখে নিয়ে ছুটে গেল ফুলবাগানে। সেখানকার নরম মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত বানিয়ে ফেলে তার মধ্যে রাখলো বিস্কুটটা। আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল!

বাপ্পা বললো, ও কি বিস্কুটটাকে পুঁতলো নাকি? ভাবছে, বিস্কুটের গাছ হবে?

মহিম বললেন, না রে! ও বিস্কুটটাকে জমিয়ে রেখে দিল, পরে খাবে।

বাপ্পা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাবা, জন্তু-জানোয়াররা এরকম খাবার জমাতে জানে? আগে তো কখনো দেখিনি!

সুজাতা বললেন, দেখলে, ওর কত বুদ্ধি?

শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার সময় সকলেরই একটু একটু মন খারাপ লাগে। রক্ষী প্রত্যেকের পায়ে এমন মাথা ঘষে, যেন বলতে চায়, যেও না, যেও না।

তবু তো যেতেই হয়।

এক মাস বাদে আবার ফিরে এসে সুজাতা দেখলেন রক্ষী বাড়িতে নেই। এবার গেটের কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করতেও সে এলো না।

রাখালকে জিজ্ঞেস করতেই সে বললো, ও কুকুরটা কিছুতেই বাড়ির মধ্যে থাকতে চায় না। গেটের তলা দিয়ে যখন তখন বেরিয়ে যায়। অন্য বাড়ি গিয়ে বসে থাকে।

সুজাতা ধমক দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি ভালো করে ওকে খেতে দাও না। না হলে অন্য বাড়িতে যাবে কেন? ওর খাবার জন্য তোমাকে আলাদা টাকা দিই!

মহিম বুঝলেন, রাখালকে ধমকে লাভ নেই। রাখাল কুকুর ভালোবাসে না। রক্ষীকে ও প্রথম থেকেই অপছন্দ করেছে। সেই জন্যই মনে করে নিয়মিত খাবার দেয় না। কুকুরেরা ঠিক বুঝতে পারে, কে ভালোবাসে আর কে ভালোবাসে না।

পোষা কুকুর নিজে শিকার করে খেতে জানে না। মানুষ যদি খাদ্য না দেয়, তাহলে ওরা অসহায়। শান্তিনিকেতনের এই দিকটায় বেশির ভাগ বাড়ি প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকে। মালিকরা না এলে কুকুররা মুশকিলে পড়ে যায়।

সুজাতা অনেকক্ষণ রাগারাগি করলেন, তারপর নিজে পাড়া খুঁজতে বেরোলেন। রক্ষীকে পাওয়া গেল না। অন্য দু'তিনটে কুকুর খাদ্যের লোভে সন্ধ্যের দিকে বাড়ির বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো।

পরদিন সকালবেলা দেখা গেল গেটের কাছে শুয়ে আছে রক্ষী।

তার অবস্থা দেখে মহিম আর সুজাতা আঁতকে উঠলেন। তার চোখের দৃষ্টি করুণ। সুজাতাকে দেখে সে কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলো, কয়েক পা এসেই ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

এই এক মাসের মধ্যেই সে অনেকটা রোগা আর লম্বাটে হয়ে গেছে। আর তার পেটের একদিকে বিরাট ঘা। সেই ঘা একেবারে দগদগ করছে, রস গড়াচ্ছে। দেখলে ঘেন্না করে।

কান্না এসে গেল সুজাতার। তিনি বললেন, এ রকম অবস্থা কী করে হলো ওর? কে ওকে মারলো?

সুজাতার ঘেন্না নেই। তিনি রক্ষীকে কোলে তুলে এনে শুইয়ে দিলেন বারান্দায়। নিশ্চয়ই রক্ষী অনেকদিন খেতে পায়নি, তিনি কয়েকখানা বিস্কুট এনে রাখলেন তার সামনে। রক্ষী খাবার চেষ্টা করেও পারলো না। যেন বিস্কুট চিবোবার শক্তিও তার নেই। তখন সুজাতা নিয়ে এলেন এক বাটি দুধ। এমন একটা কুঁ-উ-উ শব্দ করলো রক্ষী, যেন সুজাতা তার মা, আর সে সুজাতার মেয়ে।

কাছাকাছি অন্য একটা বাড়ির কেয়ারটেকার ভৈরব এসে বললো,

গোয়ালপাড়ায় একটা বাড়ির লোক রক্ষীর গায়ে গরম ফ্যান ঢেলে দিয়েছে। সেইজন্য রক্ষীর ওরকম ঘা হয়েছে।

তা শুনে সুজাতার চোখে কান্না এলো আবার। ঐটুকু একটা কুকুর, অমন সুন্দর চোখ, তার গায়ে কেউ গরম ফ্যান ঢেলে দিতে পারে? মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়?

সুজাতা নিজের হাতে ওর সেবা করতে লাগলেন। গরম জলে তুলো ভিজিয়ে ওর ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর যেই মলম লাগিয়ে দিতে গেলেন, রক্ষী অমনি তা চেটে খেয়ে ফেললো। সুজাতা আবার মলম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন সেখানে। বারবার রক্ষীকে খাওয়াতে লাগলেন দুধ।

এক একসময় ক্ষত স্থানটার যন্ত্রণায় রক্ষী আর্তনাদ করে, সুজাতার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায়।

সুজাতা বোলপুরে গিয়ে কুকুরের ডাক্তারের খোঁজ করলেন, তা অবশ্য পাওয়া গেল না। একটি ডাক্তারখানার লোক বললো, মানুষের ওষুধেই কুকুরের কাজ হয়।

এবারে বেশিদিন থাকার উপায় নেই। মহিমকে আবার বিদেশ যেতে হবে, এবার সুজাতাও সঙ্গে যাবেন। ছ'মাসের জন্য। কিন্তু সুজাতার মন খুব খারাপ। রক্ষীকে এইভাবে রেখে যাবেন কী করে? রক্ষীকে সঙ্গে করে কলকাতাতে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

মহিম বললেন, তিন-চারদিনে রক্ষী তো অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেছে। দেশি কুকুর, ওরা কত মার খায়, এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে।

সুজাতা আরও বেশি টাকা বরাদ্দ করে গেলেন রক্ষীর জন্য। রাখালকে বার বার বললেন, প্রত্যেকদিন যেন দু'বেলা দুধ খাওয়ানো হয় ওকে। সপ্তাহে দু'দিন অন্তত মাংস।

ছ'মাস বাদে ফিরে এসে শোনা গেল রক্ষী মারা গেছে। ঠিক কী ভাবে সে মরেছে, তা বলতে পারলো না রাখাল। সুজাতারা চলে যাবার দু'দিনের মধ্যেই রক্ষী আবার বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। কে যেন বলেছিল, খালের ধারে মরে পড়ে আছে একটা কুকুর। সেটা আর দেখতে যায়নি রাখাল।

এবার আর কাঁদলেন না সুজাতা। মরেই গেছে যখন, তখন আর ভেবে লাভ কী? তিনি নিজেও তো রক্ষীকে পুরো সেবা-যত্ন করতে পারেননি। রাখাল রক্ষীর যত্ন করবে না, এ তো জানা কথাই।

আস্তে আস্তে রক্ষীর কথা মন থেকে মুছে গেল।

তারপর কেটে গেল আরও এক বছর।

একদিন দুপুরবেলা সারা আকাশ ঢেকে গেছে কালো মেঘে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তারই মধ্যে মহিমের বেড়াতে যাবার শখ হলো—কলকাতা শহরে তো এতখানি বর্ষার আকাশ দেখা যায় না! মাঝপথে বৃষ্টি এলেও ক্ষতি নেই, একদিন না হয় ভেজা যাবে।

সুজাতার বাড়ির পেছনটায় ফাঁকা মাঠ ছিল। এখন দূরে দূরে দুটো একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। তারও পরে গাছপালা ঘেরা একটা গ্রাম।

সেইদিকেই বেড়াতে গেলেন মহিম আর সুজাতা। হাঁটছেন আস্তে আস্তে। নতুন বাড়িগুলো দেখছেন। হঠাৎ একটা বাড়ির পাশ থেকে একটা বেশ বড়সড় কুকুর জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে ছুটে এলো, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সুজাতার ওপর!

সুজাতা ভয় পেয়ে বাবা-গো, মা-গো বলে বসে পড়লেন মাটিতে। কুকুরটা তার গায়ের ওপর লাফাতে লাগলো।

মহিমও বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। এটা বোধহয় পাগলা কুকুর। পাগলা কুকুর কামড়ালে অনেকগুলো ইঞ্জেকশন নিতে হয়। নিজের স্ত্রীকে বাঁচাতে হবে। একলা পালালে চলবে না। কোনো রকমে বীরত্ব সঞ্চয় করে কুকুরটার সঙ্গে লড়বার জন্য তিনি একটা ইঁট খুঁজতে লাগলেন।

কুকুরটা সুজাতাকে ঘিরে লাফাচ্ছে বটে, কিন্তু কামড়াচ্ছে না তো! সুজাতা মুখ থেকে হাত সরালেন, তারপর দারুণ অবাক হয়ে বললেন, ওমা, এ তো রক্ষী!

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কুঁ কুঁ করতে লাগলো।

এবার দেখা গেল, তার পেটের একদিকে অনেকখানি পোড়া দাগ, এখন আর ঘা নেই। এ কুকুরটা তা হলে সেই রক্ষী, সে মরেনি! এতদিন পরেও সে সুজাতাকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছে।

রক্ষী অবশ্য এখন অনেকটা বড় হয়ে গেছে, তাকে কোলে তোলা যায় না। সুজাতা আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, মানুষই মানুষকে বেশিদিন মনে রাখে না। কুকুরটা আমাদের মনে রেখেছে। ওকে এবার কলকাতায় নিয়ে যাবো। আর কোনোদিন চোখের আড়াল করবো না।

ঠিক তখুনি চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ছেলে একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলো, দুখিয়া! দুখিয়া!

কুকুরটা তখন সুজাতাকে ছেড়ে ছেলেটার কাছে চলে গেল। আবার সুজাতার কাছে ফিরে এসে তার পায়ে মাথা ঘষলো।

মহিম ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা তোমার কুকুর নাকি?

ছেলেটি বলল, হুঁ।

সুজাতা বললেন, এটা আসলে ছিল আমাদের কুকুর। তুমি খুব ভালো ছেলে ওকে বাঁচিয়েছো—

ছেলেটি আর কোনো কথা বললো না। ও কুকুরটাকে আবার দু'বার দুখিয়া বলে ডাকলো। তারপর কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। বন্ধ করে দিল লোহার গেট।

সুজাতা হাহাকার করে বললেন, ও কি, ও রক্ষীকে ফেরৎ দেবে না?

মহিম বললেন, রক্ষী তো আর নেই, ওর নাম এখন দুখিয়া। ছেলেটা ওকে বাঁচিয়েছে, আমরা ফেরৎ চাইবো কী করে বলো?

সুজাতা ডাকলেন, রক্ষী, রক্ষী।

লোহার গেটের ওপাশে কুকুরটা এমনভাবে লাফালাফি করছে, যেন কারাগারের কোনো বন্দিনী।

সুজাতার ডাক শুনে সে এমনভাবে ডেকে উঠলো, যেন ঠিক কান্নার মতন।

আবার ছেলেটা ভেতর থেকে ডাকলো, দুখিয়া, দুখিয়া! তখন কুকুরটা কান্না থামিয়ে ছেলেটার দিকে ছুটে গেল।

মহিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের চেয়ে ঐ ছেলেটার দাবি বেশি। চলো যাই।

দু'জনে ফিরে চললেন। সুজাতা পেছন ফিরে তাকাতে লাগলেন বারবার। কুকুরটা আবার গেটের কাছে পা তুলে দাঁড়িয়েছে। আর ডাকছে ঠিক কান্নার মতন।

ছবি ঃ ধ্রুব রায়

বিধুবাবুর গাড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিধুবাবুর একখানা পুরনো মডেলের অস্টিন গাড়ি আছে। স্পেয়ার পার্টস পাওয়া কঠিন। প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে। বুড়ো মিস্ত্রি ইরফান সারিয়ে টারিয়ে দেয় বটে, কিন্তু প্রায়ই বলে, এ গাড়ি আর বেশি দিন নয়। গাড়িটা তাঁর বাবার। বড্ড মায়া। গাড়িটা বেচে দিলে হয়তো কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই মায়ার জন্যই পারেন না। পথে ঘাটে গাড়িটা নিয়ে মাঝে মাঝে খুবই বিপদে পড়তে হয়। বাড়িতেও অশান্তি হচ্ছে খুব।

সেইরকমই একটা বিপদে পড়লেন আজ। মফস্বল থেকে কলকাতা ফিরছেন। রাত ন'টা বেজে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ তোড়ে বৃষ্টি এল। এমন বৃষ্টি যে দু' হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। ওয়াইপারটা কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনে জল ঢুকে সেটাও গেল থেমে। বাড়ি এখনও ঘণ্টা খানেকের পথ। গাড়ির মধ্যে বসে বিধুবাবু দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেলেন। এ যা বৃষ্টি সহজে থামবে না। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে চারদিকে জল দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

অসহায় বিধুবাবু চুপ করে বসে রইলেন। গাড়িটারই দোষ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধুবাবু গাড়ির ওপর রাগ করলেন না। গাড়িটার বয়স হয়েছে, যন্ত্রপাতিরও অমিল, কী আর করা যাবে? তিনি স্টিয়ারিঙে নরম করে হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু, তোমাকে কি ছাড়তে পারি?

কথাটা বলার কারণ আছে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীরা অনেকদিন ধরেই গাড়িটা বেচে দেওয়ার কথা বলছে। ইদানীং বিধুবাবুর স্ত্রীও খুব ধরেছেন গাড়িটা বেচে দেওয়ার জন্য। একজন বড়লোক নাকি এটিকে ভিন্টেজ কার হিসেবে কিনতে চান। বেশ ভালো দাম দেবেন। এই নিয়ে বিধুবাবুর সঙ্গে তাঁর গিন্নীর রোজই ঝগড়া হচ্ছে। বিধুবাবুর স্ত্রী গাড়িটা বিদায় করার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছেন যে, হবু খদ্দেরের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা অবধি নিয়ে ফেলেছেন। বিধুবাবুর আরও দু'খানা নতুন ঝকঝকে গাড়ি আছে। সুতরাং পুরনো গাড়িটার যে আর দরকার নেই, এটাই বাড়ির লোকের অভিমত।

বিধুবাবু অচল গাড়ির মধ্যে বসে ভাবছেন, গাড়িটাকে কি করে হস্তান্তর থেকে বাঁচানো যায়। কোনও উপায় তাঁর মাথায় আসছে না। এই যে গাড়িটা খারাপ হলো, এর ফলে আজ রাতে তিনি হয়তো বাড়িতে ফিরতে পারবেন না। তার ফলে পুরনো গাড়ির বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের অভিমত আরও জোরদার হবে। বিধুবাবু অন্ধকার গাড়ির মধ্যে বসে বিষণ্ণ মনে গাড়িটার ভবিতব্য নিয়েই ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে হলো, অন্ধকারে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিবে গেল। না, বিদ্যুতের আলো নয়। অনেকটা টর্চের আলোর মতো, তবে অনেক বেশি জোরালো। মনে হলো আলোটা এল ওপর থেকে। বিধুবাবু একটু ভাবিত হলেন। নির্জন রাস্তা, জঙ্গল, বিপদ হতে কতক্ষণ?

এরপর বিধুবাবু টের পেলেন, তাঁর গাড়িটা একটা বেশ বড় রকমের ঝাঁকুনি খেল। ঠিক যেন, গাড়ির ছাদে একটা ভারী জিনিস এসে পড়ল। গাড়ির কাচ তোলা, বিধুবাবু কাচটা একটু নামিয়ে গলা তুলে বললেন, কে রে? কে গাড়ির ছাদে?

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু একটু বাদেই গাড়ির ছাদ থেকে একটা কে যেন লাফ দিয়ে নেমে এল। বিধুবাবু গাড়ির গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট

থেকে টর্চ বের করে জ্বাললেন। তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

যা দেখলেন তার চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু আর কিছু হতে পারে না। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে একটা ডল পুতুল রাস্তায় দাঁড় করানো রয়েছে। প্রায় দুই ফুট উঁচু ফুটফুটে একটা মেয়ে-পুতুল। কিন্তু যেটা অবাক কাণ্ড সেটা হলো, পুতুলটা তাঁর দিকে চেয়ে একটা হাত তুলে নাড়ছে। তাঁকে যেন কিছু বলতে চায়। তা বিদেশে কলের পুতুল অনেকদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। এটা সেরকমই একটা রিমোট কন্ট্রোল পুতুল কি? হলেই বা এই জঙ্গলে, বৃষ্টির মধ্যে এটা এল কোথা থেকে?

বিধুবাবু একটু ভয় খেলেন। ঘটনার পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র নেই তো! থাকলেও তাঁর উপায় নেই। তিনি জানালার কাচটা নামালেন।

পুতুলটা তুমুল বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই বলল, তুমি চিন্তা করো না। চুপচাপ বসে থাকো।

বিধুবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, তুমি কি পুতুল?

হ্যাঁ, আমি কলের পুতুল।

আমার কথা বুঝতে পারছো কেমন করে? পুতুল কি কথা বুঝতে পারে?

আমরা অন্য জগতের পুতুল।

তার মানে?

আমরা যন্ত্রগ্রহের পুতুল।

বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।

পুতুলটা গুটগুট করে এগিয়ে এল। তারপর একটা লাফ দিয়ে জানালার ওপর উঠে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে বলল, সব কথা কি তুমি বুঝবে?

বিধুবাবু সিঁটিয়ে গিয়ে বললেন, আমি বুঝবার চেষ্টা করব।

একান্ন আলো-বছর দূরে একটা গ্রহ আছে। সেখানে ঠিক আমাদের মতো দেখতে মানুষেরা বাস করে। তারাই আমাদের তৈরি করেছে। আমরা কলের পুতুল কিন্তু তারা সব মানুষ। মানুষগুলো একটু কুঁড়ে। আমাদের দিয়ে সব কাজ করায় আর নিজেরা কেবল বিশ্রাম করে, আর

ফুর্তি করে।

বিধুবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, এখানে এলে কি করে?

বাঃ, আমাদের বুঝি গাড়ি নেই? আমরা তো প্রায়ই তোমাদের গ্রহে আসি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো। আমাদের গ্রহের মানুষেরা খুব শৌখিন। সেখানকার শাকপাতা খেয়ে তারা খুশি নয়, নতুন নতুন জিনিস চায়। তাই আমরা ঘুরে ঘুরে তাদের জন্য শাকপাতা, ভালো মাছ, মাখন, মুর্গী, ঘি, দুধ, মিষ্টি, চকোলেট নিয়ে যাই। শুধু তোমাদের গ্রহ নয়, অন্য সব গ্রহ থেকেও অনেক জিনিস আনি। কিন্তু সেগুলো কী জিনিস তা তুমি বুঝবে না।

বিধুবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বললেন, এখানে এই বৃষ্টির মধ্যে এলে কি করে?

ওই তো কাণ্ড। আমাদের গাড়িটা ওই জঙ্গলের মধ্যে খারাপ হয়ে গেল যে। তখনই আমরা তোমাকে দেখলাম। আমরা কলকব্জা খুব ভাল জানি। গাড়িটা আমরা সারিয়ে ফেলেছি। এবার চলে যাবো। তোমাকে দেখে একটু মায়া হলো। ভাবলাম তোমার গাড়িটাও সারিয়ে দিয়ে যাই। আহা, কত পুরনো আমলের গাড়ি!

তুমি বাংলা বলছো যে!

ওমা! বলব না? প্রায়ই আসি যে। শুনতে শুনতে শিখে গেছি। আমরা যে অন্য গ্রহের পুতুল তা তো কেউ বুঝতে পারে না। ধরা পড়ার ভাব দেখলেই আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি।

বিধুবাবু একটা ঢোঁক গিলে বললেন, আমার গাড়ির ছাদে কী একটা রয়েছে বলো তো!

পুতুলটা হেসে বলল, আমাদের গাড়িটা। আমার বন্ধুরা তোমার গাড়িটা একটু দেখে নিচ্ছে। এখনই কাজ শুরু করবে।

বলতে বলতেই ঝুপ ঝুপ করে দশ-বারোটা ছেলে এবং মেয়ে পুতুল ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। হাতে নানারকম যন্ত্রপাতি, তারা বনেট খুলে ফেলে গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, এ গাড়িটাকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু তুমি তো জানো না, এ গাড়ি বেশিদিন রাখতে পারব না। সবাই বলছে বেচে দিতে।

পুতুলটা হাসল, তুমি যে গাড়িটাকে ভালবাস তা আমরা জানি। তোমার মনের ভাব আমাদের সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। যারা যন্ত্রকে ভালবাসে তাদের আমরাও ভালবাসি। যন্ত্র নিষ্প্রাণ বটে, কিন্তু ভালবাসা সেও ঠিক টের পায়, ভালবাসার শক্তিই আলাদা, কী বলো!

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভালবাসা দিয়েও কি গাড়িটাকে বাঁচাতে পারব? তোমরা না হয় আজ সারিয়ে দিলে, দুদিন পর আবার খারাপ হবে।

পুতুলটা মাথা নেড়ে বলল, আর খারাপ হবে না।

কোনওদিন না?

পুতুলটা হেসে বলল, খারাপ তো হবেই না, এমনকি এখন থেকে আর গাড়িতে পেট্রল নিতে হবে না, ব্যাটারি বদল করতে হবে না, চাকায় হাওয়া দিতে হবে না। লক্ষ লক্ষ মাইল চললেও না।

সত্যি?

সত্যিই। তোমার পুরনো গাড়িতে আমরা আমাদের সব যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। গাড়িটা হাতছাড়া করো না কিন্তু।

হাতছাড়া করব না? কিন্তু আমি যখন থাকব না, তখন?

পুতুলটা হাসল, সেও আমরা টের পাব। পেয়ে, এসে আমাদের যন্ত্রগুলো খুলে নিয়ে যাবো। গাড়ি আবার অচল হয়ে যাবে।

বিধুবাবু চোখ কচলে বললেন, এসব কি সত্যি বলছো? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি?

পুতুলটা শুধু খিলখিল করে হাসল, তারপর কয়েক মিনিট বাদেই পুতুলরা ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এসে বনেট বন্ধ করে দিল। জানালার পুতুলটা বলল,চলি, এবার নিশ্চিন্তমনে বাড়ি যাও।

চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, আবার হয়তো দেখা হবে। নাও হতে পারে।

গাড়ির ছাদ থেকে হঠাৎ একটি ভারী বস্তু মচাৎ করে শব্দ তুলে চলে গেল। বিধুবাবু গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কী সুন্দর মোলায়েম শব্দে গাড়ি স্টার্ট নিল। হেডলাইট জ্বলল। গাড়ি চমৎকার ছুটতে লাগল।

না, বিধুবাবুকে আর গাড়িটা বেচতে হয়নি। বিনা তেলে, বিনা মেরামতিতে, বিনা হাওয়ায় গাড়িটা চলছে তো চলছেই।

ছবি : ধ্রুব রায়

আসল কথা

কার্তিক ঘোষ

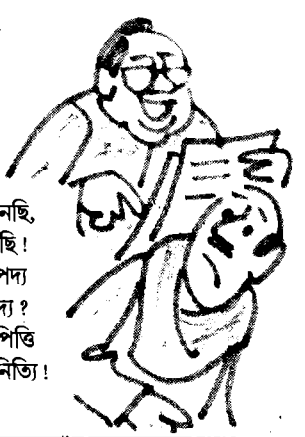

এই যে দাদা, শুনুন শুনুন—কী সব নাকি শুনছি,
শুনেই আমি অবশ্য আজ দেশের বিপদ গুনছি!
দেশটা কোথায় যাচ্ছে ভাবুন, হচ্ছে কী সব পদ্য
আপনি বলুন, আমার মতো ক'জন লেখে গদ্য?
আরে মশাই, তাই তো বলি—শুনেই জ্বলে পিত্তি
লেখা-টেখার হাল কী বলুন, তলিয়ে যাচ্ছে নিত্যি!

হেদোর কাছে একটা প্রেসে সেই যে নেদো থাকতো,
সে না কী রোজ ছুটির পরে কী সব লিখে রাখতো!
গল্প না ছাই, হিজির বিজির—ইল্লি না হয় বিল্লি
সে সব লিখেই যাচ্ছে শুনি প্রাইজ নিতে দিল্লি?
আরে মশাই, শুনুন বলি—থাকলে তেমন ইচ্ছে,
দিতুম নেড়ে কলকাঠিটা, প্রাইজ যারা দিচ্ছে
সবাই তারা বন্ধু আমার—হোমরা এবং চোমরা,
কেউ এডিটর, কেউ বা টিভির, ভারিক্কি-মুখ গোমড়া।
আসল কথা শুনুন বলি, প্রাইজটা খুব সস্তা
কে বলেছে সোনার মেডেল? এক্কেবারে দস্তা!

সেই কারণেই দেয়নি আমায়, হয়তো কিছু ভাববো
আপনি বলুন, সত্যি ক'জন বোঝেন আমার কাব্য?

ছবি : সুফি

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সময়ই পাওয়া গেল না

আশাপূর্ণা দেবী

রেলগাড়িতে চড়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের মধ্যে জায়গা দখল নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা থেকে তুমুল ঝগড়ায় পৌঁছনো—এ তো চিরকালীন ব্যাপার।

তায় আবার যদি কামরাটা সেকেন্ড ক্লাশ (এ যুগের 'সেকেন্ড ক্লাশ' অবশ্য) হয়, আর স্বভাবতই গুড়ের নাগরি ঠাসা অবস্থা হয়।

হতেই হয়!

এ গাড়ি যে এখন তীর্থযাত্রীতে বোঝাই। আর তীর্থযাত্রীরা যে হক্ সামলাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন, এ আর কার অজানা! এ গাড়িখানা 'রথযাত্রা স্পেশাল'। সবাই ছুটছেন রথের রশিতে একটু হাত ছোঁয়াবার সংকল্পে।

সকলের মুখেই মাঝে মাঝে ধ্বনি 'জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!'

তার সঙ্গে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, অন্যের পোঁটলাপুঁটলিকে অছেদ্দায় দূরে নিক্ষেপ!

এর মধ্যে অনেকেই তো পয়সাকড়ি খরচা করে আরামে বসবার, আর রাতে শোবার জন্যে সীট রিজার্ভ করে রেখেছে, তারাও এখন কোণঠাসা। গুড়ের নাগরি ঠাসা। কে কার কড়ি ধারে?

বাকিরা তো সবাই সদ্য টিকিট কিনে গাড়িতে চড়ে বসা রাশির মাল।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর সাধারণত মোটামুটি ঝগড়া একটু থিতোয়। কেমন করে যেন সকলেই একখানা পা রাখবার মতোও অন্তত জায়গা পেয়ে যায়। আর তখন হিসেব করতে বসে মাল মোট সব যথাযথ এসে গাড়িতে উঠেছে কি না।

কিন্তু আজ এই 'রথযাত্রা স্পেশাল'টির এই কামরাখানাতে দুই বৃদ্ধের ঝগড়া আর থামছে না। ক্রমেই যেন তুঙ্গে উঠছে। কেউ কাউকেই ছেড়ে কথা কইছে না। ভাবটা দুর্যোধনের প্রতিজ্ঞার মতো 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'।

দুই বৃদ্ধের এমন তাল ঠোকা বেশ হাসাকরই। অন্য যাত্রীরা ভিড়ে

চিড়েচ্যাপ্টা হয়েও দিব্যি মজা দেখছে।

মাঝে মাঝে কেউ কেউ আবার একটু একটু টক ঝাল নোনতা মন্তব্য করে আগুনে বারুদের মশলা ফেলছে!

কিন্তু হঠাৎ কি থেকে যে কী হলো! আগুনে জল পড়লো।

ফাইট যখন একেবারে তুঙ্গ সীমার মগডালে উঠে পড়েছে, তখনই এক বৃদ্ধের হুঙ্কার ধ্বনিতেই এই অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটে গেল।

সেই বৃদ্ধের ফুলহাতা ডোরাকাটা ছিটের শার্টের গোটানো আস্তিনের পাকটি এলিয়ে গেলো, আর অপর বৃদ্ধের থ্রি-কোয়ার্টার হাতা সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবির আস্তিনটা আধ-গোটানো হয়েই থেমে গেলো।

কিন্তু কী সেই হুঙ্কার ধ্বনি? যাতে এমন অভাবিত ঘটনাটি ঘটে যেতে পারে?

এমন কিছুই নয়।

'তোকে খুন করে ফাঁসি যাবো' বা 'তোকে ডালকুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবো'—এ ধরনের কোনো সংকল্প ঘোষণা নয়।

হুঙ্কারটি ছেড়েছিলেন ফুলহাতা শার্টই।

বলে উঠেছিলেন, 'কী? বরিশালের জঙ্গলবাগান পাড়ার হরবোলা চক্কোত্তীকে তুই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিবি? অ্যাঁ। দেখি তো কতো হিম্মত?'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে থ্রি-কোয়ার্টার হাতার দু'খানা হাত প্রায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে গিয়ে, হাতের মালিক বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ? কী কইলা? বরিশালের জঙ্গলবাগান পাড়ার হরবোলা চক্কোত্তী? ডাক্তার পাড়ার পাশের জঙ্গলবাগান পাড়া?... মানে চক্কোত্তী বাড়ির? অ্যাঁ? মানে—'

বার কয়েক ওই 'অ্যাঁ' আর 'মানে'র পর হঠাৎ দুই বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠে পরস্পরকে জাপটে ধরে বলে ওঠেন, 'আর—আমরা দুই মূর্খ্য এতোক্ষণ কেজিয়া করে মরছি?'

তারপর?

আবেগ আতিশয্যে আর আক্ষেপের বন্যায় প্রায় ভেসেই যেতে বসেন দু'জনে।

'বলি কতো বৎসর দেশ ছাড়া?'

'তা হইলো চল্লিশ বৎসর সাত মাস। তুই?'

'আমি? আমার এই দুই বৎসর চাপান দেওয়া চাল্লিশ। জ্যাঠা মরে গেলো, বাবা আর কার ভরসায় রইবে?'

মজা দেখনেওয়ালা লোকেরা ওই 'সম্মুখ সমরের' উত্তাল মুহূর্তে এমন স্যাঁতসেঁতে পরিণতি দেখে আর ওদিকে মন না দিয়ে যে যার নিজের ব্যবস্থায় মন দিলো। তবে ছোট ছেলেমেয়েগুলো দুই বুড়োর হঠাৎ হঠাৎ হুঙ্কার মেরে উঠে জাপটাজাপটি দেখে হেসেই অস্থির!

'অ্যাঁ! তুইও ঘোড়াপুকুরে ছিপ ফেলতে যেতিস? আর আমরা কিনা এতোক্ষণ—'

'অ্যাঁ! তুইও লোচন ফকিরের আখড়ায় গেছলি একদিন? হায়! হায়! আমরা এই দু'ঘণ্টা কাল সময় কী বরবাদ দেলাম গো।'

অতএব একক্ষেপ করে আবার জাপটাজাপটি।

'গড়াই! তুই বোধকরি আমার থেকে বছর দুতিনের ছোট!'

'তা হতি পারে। বয়েস নিয়ে কে আর রোজ রোজ হিসেব করতে বসতেছে?'

'বলি তুই কি ওই জঙ্গলবাগান পাড়ার হাইস্কুলে পড়তিস?'

'হাই ইস্কুলে? শোনো কথা! গড়াইবাড়ির ছাওয়ালরা আবার ইস্কুল পাঠশালায় গেছে কবে? জ্ঞান অবদিই তো বাপজ্যাঠার তামুক সেজেছি, আর তেনাদের ভুষিমালের দোকানে গিয়ে বসেছি দোকান আগলাতে। তো আপনি বুঝি—'

'এই মরেছে! আপনি আবার কী রে? অ্যাঁ? হঠাৎ আবার শহুরে কেতায় আপনি আজ্ঞে ক্যানো? বেশ তো চলছিলো! কতো কাল তুই তোকারি করে কথা কইতি পাইনি রে!'

'তো বরিশাল কি আর গেরাম ছিলো চক্কোত্তী? ষোলো আনা শহরই তো।'

'তা হোক! এমন রস-নিংড়ানো শহর ছিলো না।'

গাড়ি ছুটে চলে পূর্ণ বেগে রাতের অন্ধকার ভেদ করে।

অতঃপর এই দুই বৃদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন চলে আরো অধিক বেগে।

এই চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরকাল কে কোথায় থেকেছে, আর জীবনযাত্রায় কে কোন পথে গিয়েছে, মাঝে মাঝে সে সব কথা হলেও বেশির ভাগ কথাই সেই বরিশালভিত্তিক।

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, এঁদের একজন সেই 'জঙ্গলবাগান পাড়া' ছেড়ে এসেছেন বছর পনেরো বয়সে আর অপর জন বছর তেরোয়।

পাকসিটে আর থলথলে, এই দু'ধরনের চেহারাতে দু'জনকেই বয়সের অপেক্ষা বৃদ্ধ দেখিয়েছে।

এখন অবশ্য আর তা দেখাচ্ছে না।

দু'জনেরই মুখে চোখে যেন সেই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগেকার লাবণ্য ঝলসে উঠছে মাঝে মধ্যেই।

সহপাঠী নয়, সমবয়সীও নয়, পরিচয়ে এক শ্রেণীরও নয়। তবু এই কামরাভর্তি লোকের মধ্যে দু'জনে যে কেমন করে দিব্যি আমে দুধে মিশে গিয়ে বিভোর হয়ে বসে আছেন দেখবার মতো। শোবার চেষ্টা নেই, ঘুমের চিন্তা নেই। গল্প আর গল্প! কারণ?

কারণ আর কিছুই নয়, দু'জনেই বরিশালের এবং প্রায় একই পাড়ার।

এ কথা মানতেই হবে পদ্মার ওপারের লোকেরা যেমন 'দেশোয়ালি' ভক্ত, পদ্মার এপারেররা তার ধারে কাছেও যায় না।

দেশ-টেশ-এর ধারও ধারে না এরা তেমন।

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার জন্যে যারা দীর্ঘদিন আর তাদের ছেলেবেলার গ্রামে ফিরে যেতে পায়নি তাদের কতো হা-হুতাশ, কতো কবিতা, গল্প, স্মৃতিচারণ, হাহাকারের সাহিত্য।... অথচ যাদের ওসব ভাগ টাগ হয়নি, তারা কলকাতায় বসে থেকেই কলকাতা থেকে হয়তো ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরের ছেলেবেলার গ্রামে ত্রিশ-চল্লিশ বছরে একবারও যায়নি, যায় না—তার জন্যে মনকেমনের বালাইও দেখা যায় না।

এনাদের ব্যাপারই আলাদা। পদ্মার ওপারের জনেদের! এঁরা মন-কেমনেই সারা।

কাজেই বরিশালের শ্যাম গড়াই আর হরবোলা চক্কোত্তী দু'জনে দু'জনকে একবার যখন হাতে পেয়েছে তখন আর ছাড়ে?

হরবোলার আসল নাম অবশ্য 'হরবোলা' নয় হরনাথ। ছেলেবেলায় নানান পশুপাখির ডাক ডাকতে পারতো, মুখেই চলন্ত রেলগাড়ির আওয়াজ তুলতে পারতো। পালকি বেহারার, গরুরগাড়ির গাড়োয়ানের বোলচাল ছাড়তো, তাই সবাই ওই নামটা দিয়েছিলো। তদবধি ওঁর নিজেরই বলে বলে অভ্যাস হয়ে গেছে।

গড়াই বললেন, 'তাহলে যাচ্ছো কোথায় চক্কোত্তী?'

চক্কোত্তী বললেন, 'শোনো কথা। চেপেছি 'রথযাত্রা স্পেশালে', আর যাচ্ছি কোথায়?'

'এসে না না। বলছি ওখানে গিয়ে উঠবে কোথায়?'

'এখনো ঠিক করিনি! দেখি যদি কোনো ভালো ধর্মশালা-টালা পাই, নচেৎ হোটেলে।'

শ্যাম গড়াই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'ধর্মশালা? কোন যুগের কথা বলছো হে চক্কোত্তী? এ যুগে আর ভব্যিযুক্ত কোনো ধর্মশালা তুমি পাবে? তাও এই রথের সময় শ্রীক্ষেত্রয়! হুঁ! হোটেলও তো আগে থেকে বুক করে না রাখলে ঠাঁই পাবে না। তো বলছি কি এই গরীবের চক্রতীর্থের কাছে একখানা কুঁড়ে আছে, এখন রথযাত্রা বলে সেখানে আমার ফ্যামিলি এসে রয়েছে, দু'বেলা হাঁড়ি চড়ছে। যদি সেখানেই এসে ওঠো দয়া করে।'

'আরে ছি ছি! দয়া আবার কী! এতে তো আমারই সুবিধে। তবে কিনা তোমার বাড়ির লোকেরা যখন সেখানে এসে রয়েছেন এখন, হঠাৎ উটকো একটা লোক গিয়ে ঢুকলে অসুবিধা বোধ করবেন তো তাঁরা?'

'আঃ! রাম! রাম! বলি যখন শুনবে বরিশালের লোক, তখন উটকো ভাববে? আমার পরিবারও তো বরিশালেরই মেয়ে গো! তোমায় দেখলে আহ্লাদে আটখানা হবে। আর থাকবে শুনলে মাথায় করে নাচবে। না না, পেয়েছি যখন, তখন আর ছাড়ি!'

না, তিনি আর ছাড়লেন না। ওই থলথলে গড়ন, টাকমাথা শ্যাম গড়াই পাকসিটে চেহারার হরবোলা চক্কোত্তীকে সাট্রে পাট্টে ধরে নিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গে।

তা শ্যাম গড়াই ভুল বলেননি। গড়াইগিন্নী সত্যিই উটকো লোকটা বরিশালের জঙ্গলবাগান পাড়ার ছেলে শুনে আহ্লাদে প্রায় কেঁদেই ফেললেন। ওই 'জঙ্গলবাগান পাড়া' যে তাঁর মামার বাড়ি।

তারপর আর কী?

দুই পরিবার এক পরিবার। অর্থাৎ চক্কোত্তীই গড়াই পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। একসঙ্গে মন্দির দর্শন, জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্রস্নান, খাওয়া মাখা!

গড়াইগিন্নী এক একবার বলেন, 'দুই বন্ধুতে একথালায় জলখাবার খাওয়া? আপনি হচ্ছেন দাদা ব্রাহ্মণ মানুষ, আর আমরা—'

হরবোলা হা হা করে হাসেন, 'আরে বাবা, রাখো তো দিদি তোমার ব্রাহ্মণ মানুষ। হরবোলার অতো বামনাই নেই। বামুনের যুগ্যি কাজ করছি? একখানা ছাতা জুতোর দোকান দিয়ে তো বসে আছি।'

আহ্লাদ! আহ্লাদ! আহ্লাদের সাগরে ভাসাভাসি। কিন্তু—এঁদেরই এতো আমোদ আহ্লাদ। শ্যাম গড়াইয়ের বাড়ির লোকেরা তেমন মানে তাঁর ছেলে, ছেলের বৌ আর নাতি-নাতনী দুটো—এরা মোটেই তেমন সন্তুষ্ট নয়।

একে তো নাতি-নাতনীরা দাদুকে আদৌ পাচ্ছে না। দিদাও প্রায় বেহাত। মামার বাড়ির পাড়ার ছাওয়ালের আদর-যত্ন আপ্যায়ন অভ্যর্থনা নিয়ে। আবার এদের মাকেও ওই বুড়োর জন্যে বেশ খাটতে হচ্ছে। দাদুর যখন তখন অর্ডার, 'বৌমা, তোমার নতুন জ্যেঠুকে সেই খাবারটা খাওয়াও তো মা আজ। সেই, যেটা তুমি খুব ভালো বানাও।'

কী সেটা?

হবে হয়তো একটা কিছু। দাদু তার নামটি ভুলে বসে আছেন। তাতে কী! মা তো হরেক রকম ভালো রান্নাই জানেন। করুন যেটা ভালো মনে করেন। তাতেই ওই দুটো বুড়ো মোহিত!

তাহলে?

এর জন্যে ঘণ্টু আর মন্টি দু' ভাইবোনের মায়ের খাটুনি না? বেড়াতে যাবার সময় নেই, দোকানে যাবার সময় হয় না।

পুরীতে অবশ্য ওদের এই প্রথম আসা নয়। বারবারই এসেছে। নিজেদের এমন সুন্দর একখানা বাড়ি রয়েছে যখন সমুদ্রের ধারে! তা হলেও কোথাও এলে দোকানে যাওয়া হবে না এ তো আর হয় না? কেনা কাটাই যদি না হলো তো বেড়াতে আসা কেন?

রথ মিটে গেলে আরো বেশ কিছুদিন থাকার কথা। অর্থাৎ ঘণ্টু-মন্টির যতোদিন ছুটি থাকবে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? ওই বুড়োও তাই থাকবে নাকি?

ঘণ্টু চুপিচুপি বলেই ফেলে,'দিদি! ওই হরবোলা বুড়োও থাকবে নাকি ততোদিন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। দাদুর ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে হয়তো কলকাতার বাড়িতেও নিয়ে যাবে! বাপীও তো অফিসের ছুটি ফুরিয়ে গেলো বলে ফিরে গেলো। আমাদের কী হবে?'

'আচ্ছা দিদি! দাদু ওই বুড়োটার মধ্যে কী এতো আনন্দ পায় রে!'

'ভগবান জানেন। কথার মধ্যে তো সেই 'আমাদের বরিশাল' আর 'পদ্মা মেঘনা'। দুই বুড়ো সেদিন কী বলাবলি করছিলো, শুনেছিলি?'

'কী?'

'বলছিলো কি না, সমুদ্দুর খুবই ভালো। তবে পদ্মার কাছে লাগে না।'

'অ্যাঁ। হি হি হি! যতো সব বোকা বোকা কথা।'

'গল্পের মধ্যে তো সেই গোয়ালন্দের ইস্টিমারের গল্প। যা শুনে শুনে কান পচে গেছে। এখন দুই বুড়োয় রোজই নতুন করে সেই গল্প। সেই মাঝি-মাল্লাদের রান্না, অপূর্ব ডিমের ঝোল ভাত আর ইলিশ ভাজা। সেই 'পাতক্ষীর' আর 'প্রাণহরা সন্দেশ'! সেই বাখরখানি না কী যেন। শুনলে মনে হবে পৃথিবীতে অমন সুখাদ্য আর হয়নি হবে না! রোজ একই গল্প! কী করে যে ভালো লাগে।'

'তা লাগুক গে। কিন্তু ওই শুঁটকো বুড়ো যদি শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, নির্ঘাৎ দাদু ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কলকাতার বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করবে।'

'ওর ঘর-সংসার নেই?'

'কে জানে?'

'নাঃ, এবারের ছুটিটাই মাটি!'

'কী করে বুড়োকে ভাগানো যায় বল তো? সমুদ্দুরের ধার থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁকড়াদের এনে ওর জুতোর মধ্যে ভরে রেখে দেবো? শামুক কুড়িয়ে এনে বিছানার চাদরের তলায় ঢুকিয়ে রাখবো? ধুতি-গুলো ফালা ফালা করে ছিঁড়ে রাখবো?'

'দূর হাঁদারাম। ধরা পড়ে যাবি না? আর ধরা পড়ে গেলে কী দশা হবে ভাব। সমুদ্দুরে ডুবে মরতে হবে।'

মন্টি ভেবে-চিন্তে বলে, 'আচ্ছা,দাদু একদিন এখানের পোস্ট অফিস থেকে বাবাকে ফোন করেছিলো না?'

'তা তো করেছিলো। তাতে কী? তুই বাবাকে ফোন করে সাবধান করে দিবি দাদু তার 'বরিশাল'কে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে?'

মন্টি ভাইকে নস্যাৎ করে বলে, 'আরে দুর! আমার অন্য মতলব। রঞ্জনদাকে একটা ফোন করে ঘটনাটা জানিয়ে কী ভাবে প্রতিকার হতে পারে তার পরামর্শ নেবো।'

রঞ্জন এদের মামাতো দাদা। সকল পরামর্শের গুরু। রঞ্জনের বুদ্ধি-কৌশলে ওরা অনেক সময় অনেক সমস্যা-সাগর পার হয়েছে।

পুজোর আনন্দে সংসদের বই

বাঘিয়ার গল্প	১২.৫০	আবোল তাবোল	১২.০০	**জানা-অজানা বিষয়**	
জানোয়ার	১৫.০০	চেঙা-বেঙা	৫.০০		
বেড়ালের গল্প	১২.০০	নাকাল নেংটি	৫.০০	জলযানের ইতিহাস	১০.০০
পটকা চোর	১২.৫০	চালাক বোকা	৫.০০	আকাশযানের কথা	২৫.০০
টিপুর ওপর টিপ্পুনি	১২.৫০	হিজিরিং বিজিরিং	১০.০০	আকাশ ভরা সূর্য তারা	১০.০০
ভিজে রঙ	১২.৫০	বাঘ বেরোল	১০.০০	ভূমিকম্প	১৫.০০
মধুকুঠির মারকুটে মৌমাছি	১২.৫০	ছবির খেলা	১২.০০	গুহা থেকে স্কাইস্ক্রেপার	১৮.০০
আম গো ! আম !	১২.৫০	তিনটে তামার পয়সা	৭.০০	গাবলুর বিজ্ঞান ডায়েরী	৪০.০০
ছুটির গন্ধ	১৫.০০	পঞ্চতন্ত্র	১৮.০০	গ্রহের নাম পৃথিবী	৩৫.০০
হালুম হুলুম	১৫.০০	নীল পুকুরের মাছ	১৫.০০	সভ্যতার ইতিহাস	২৭.৫০
ভূত ভূত অদ্ভুত	১৫.০০	শিকারের জার্নাল	১০.০০		
ভূত পুরাণ	১৫.০০	কাজলরেখা	১২.৫০		
রাঙাদির রূপকথা	২০.০০	ধনপতি শ্রীমন্ত	১২.৫০		
পূর্বাচলের রূপকথা	১৫.০০	কালকেতু	১২.৫০		
পাগলা দাশু	২০.০০	ভারতের উপকথা	২০.০০		
		কবিতার সহজপাঠ	২০.০০		

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলকাতা-৭০০০০৯

আপনাকে এক গেলাস দুধ ফাউ খাওয়াতো ?

'রঞ্জনদা' বলতে এরা অজ্ঞান। ছেলেটা যেমন দেখতে হাসিখুশি মাখন মাখা মতো, তেমনি ভিতরে ভিতরে ফিচেল মার্কা!

ঘণ্টুর থেকে ছ' বছরের আর মন্টির থেকে চার বছরের বড়।

মন্টি বলে, 'তোর মনে আছে ঘণ্টু ? সেবারে আমাদের শুধু মা, বাবা তোরা আর আমার গোয়ায় বেড়াতে যাবার সময় আমাদের সেই গুঁফো পিসেমশাই আমাদের সঙ্গে যাবে বলে ধরে বসলো, তখন রঞ্জনদা কেমন বুদ্ধি করে সেটি বন্ধ করে দিলো!'

'উঁউঁউঁ! বোধ হয় মনে আছে। গুঁফো পিসে সঙ্গে যাবে শুনে আমাদের তো হয়ে গেছলো। তো কী করে ফোন করা হবে ?'

'কী করে আবার ? সোজা গিয়ে একটা দু'টাকার নোট গুঁজে দিয়ে রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে—'

'তুই পারবি ?'

'কেন পারবো না ? সেদিন দাদুর সঙ্গে যাইনি বুঝি ? দেখে শিখে এসেছি।'

'মার কাছ থেকে একটা দু'টাকার নোট হাতিয়ে আন তাহলে ?'

মন্টি সতেজে বলে, 'কেন ? মার কাছ থেকে কেন ? আমার নেই বুঝি ? দাখনা আমার মানিব্যাগে কতো টাকা!'

ঘণ্টু একটু ভিমেনভাবে বলে, 'সত্যি দিদি, তুই বেশ আছিস! তোকে না 'পকেট মানি' বলে পুরো দশ দশটা টাকা দেয় মাসে মাসে। আর আমার বেলায় ? ছেলেমানুষ টাকা পয়সা নিয়ে কী করবে ? যা দরকার তা বললেই তো পেয়ে যাও। যেন 'দরকার' ছাড়া মানুষের আর কিছু দরকার থাকতে পারে না! তো কখন যাবি ?'

'দেখি কখন কী ছুতো করে বেরোনো যায়।'

এই হেন গুরুতর বিষয় আলোচনার সময় কিনা সমুদ্রমুখী এই বারান্দাটায় দুই বৃদ্ধের আবির্ভাব। একেবারে ছন্দপতনের মতো!

শ্যাম গড়াই হরবোলা চক্কোত্তীকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসে বলে ওঠেন, 'এই যে চক্কোত্তী, তুমি আমার এই নাতিটার বিশ্বাস করাও তো আমাদের ছেলেবেলায় বরিশালে টাকায় আঠারো সের খাঁটি গরুর দুধ মিলতো কিনা ? ছওয়ালটা আমার কথা বিশ্বেস করে না। বলে দাদুর সব গুল্‌তাপ্পি। দাদুর হিসেবপত্তরের ঠিক নাই।...আবার তামাসা করে, দাদু, তোমার ছেলেবেলায় তোমাদের বরিশালে পয়সায় দশটা ল্যাংড়া বোম্বাই আম পাওয়া যেতো না ? চার আনায় ইয়া একজোড়া ইলিশ ?'

ব্যস।

সঙ্গে সঙ্গে হরবোলা উদ্দীপ্ত।

'তা তামাসার কী আছে হে নাতিসাহেব ? অবিশ্যি ল্যাংড়া বোম্বায়ের অতো চলন ছিলো না ওখানে। ছিল হিমসাগর, গোপালভোগ, কিষেণভোগ, নবাবপছন্দ, কালো মানিক! পয়সায় দশটা, এ আর বেশি কী ? দু'আনা দশ পয়সায় একখানা ইয়া পেল্লাই ঝোড়াই বসিয়ে দিয়ে যেতো। আবার খোকাবাবুরা খাবে বলে বাড়তি দু' চারটে দিয়ে যেতো। দুধের কথা বিশ্বেস করছো না দাদা ? নিয্যস ছিলো টাকায় আঠারো সের। আর সে কী দুধ! একেবারে বটের আঠা। তোদের এখানের গোয়ালা হলে তাকে 'ওয়াটার প্লাস' করে এক সেরকে পাঁচ সের করে তুলতো!

আরে ভাই তখন তো আর অদৃশ্য একশো পয়সায় টাকা ছিলো না। ছিলো ষোলো আনায় টাকা। চকচকে চৌষট্টি খানা তামার পয়সা। তার মান্যই আলাদা। তো ওই যে আমাদের দুধ দিতে আসতো ইলাবক্স গোয়ালা! সেও ঘটির মাপে দুধ মেপে-টেপে দিয়ে হাঁক পাড়তো—'খোঁকাবাবু তোমরা গিলাস আনো।'

আমার গিলাস মানে হচ্ছে ও আমার জন্যে বাড়তি এক পোয়া দুধ ফাউ দিতো। তো সেই এক পোয়া মাপের গেলাসটা মজুত রাখতে হতো। ঢেলে দিয়েই আবার বলতো,'কিছু বাদে তুলবে খোঁকা।' কারণ কী ? না দুধের ওপর চুড়ো করে ফেনা থাকতো। তখন নাড়াচাড়া করলে উপচে পড়ে যাবে, তাই।'

ঘণ্টু সতেজে বলে, 'রোজ আপনাকে এক গেলাস দুধ ফাউ খাওয়াতো। আর আপনি তাই খেতেন ? তাতে আপনার মান থাকতো ? বাড়ির লোকেরও তো সেটা অপমান।'

হরবোলা অবাক হয়ে বলেন, 'মান থাকবে না ? অপমান ? তার মানে ?'

'বাঃ রোজ রোজ একজনের কাছে বিনা পয়সায় কিছু খাওয়া। এটা খুব মান্যের ? তাও সে হচ্ছে গরীব লোক।'

হরবোলা চক্কোত্তী গম্ভীরভাবে বলেন, 'গরীব সে ছিলো না ভাই! 'ভালোবাসায়' মস্ত ধনী ছিলো। আমরা যদি বলতাম, বিনা পয়সায় রোজ দুধ নেবো কেন ? তাহলে সে অভিমানে মরে যেতো না ? তার মান যেতো না ? যাদের সঙ্গে আমাদের সর্বদা কারবার ছিলো, তাদের কাউকেই আমরা 'গরীব লোক' ভাবতুম না, আপনজন ভাবতুম! গোয়ালা, ধোবা, পরামানিক, ছুতোর, কামার, কুমোর, তাঁতী সবাইয়ের সঙ্গে এক একটা সম্পর্ক পাতানো ছিলো। চাচা, দাদা, জ্যাঠা, মামু, পিসা এইসব। সেই ছেলেবেলায় আমরা জানতুম ওরা সত্যিই আমাদের আত্মীয়!'

মন্টি বলে ওঠে, 'আহা গো। আপনাদের যেন জাত পাতের কট্টর গোঁড়ামি ছিলো না ? হিন্দু না অহিন্দু এইসব বিচার ছিলো না ? জানি না বুঝি ?'

শ্যাম গড়াই দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'ওই তো! ওই নিয়েই আমার সঙ্গে রাতদিন তক্কো! ওদের সঙ্গে যে আমাদের সম্পর্কটি কেমন ছিলো, বোঝাতে পারি না। বাইরের আচারে আচরণে হয়তো একটু দূরত্ব

ছিলো, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোনো দূরত্ব ছিলো না! আমার পিসি আর জ্যেঠি ছিলো দুর্দান্ত শুচিবাই। বাড়িতে মিস্ত্রী লাগলে, ঘর সংসারের জিনিসপত্তর সরিয়ে রাখতে কী তোলপাড় কাণ্ড! পাছে কিছু ছোঁওয়া যায়, পাছে কিছুতে চুনকামের বুরুশের জলের ছিটে লাগে। কিন্তু—'

ঘণ্টু হি-হি করে হেসে উঠে বলে, 'সেই কথাই তো বলছে দিদি। যতোসব ছুঁৎমার্গ।'

হরবোলা চক্কোত্তী আবার গভীর গম্ভীর ভাবে বলেন, 'সে ব্যাপার আমাদের বাড়িতেও দেখেছি ভাই। ওটাই ছিলো তখন প্রথা। কিন্তু আবার এও দেখেছি—মিস্তিরীদের কাজ চুকে গেলে ঠাকুমা একদিন তাদের সকলকে নেমন্তন্ন করে, তা সে যোগাড়েটাকে পর্যন্ত, কাছে বসে যত্ন করে খাওয়াতেন। মিস্তিরী বলে আজেবাজে খাওয়া নয়! তাদের জন্যে হয়তো বা সেদিন পুকুরে জাল ফেলা হতো। অনেক রকম রান্না না হোক ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, টক আর তার সঙ্গে ঢালাও মাছ। ঠাকুমা বলতেন, ওরা এমন বাহার করে বাড়ি বানিয়ে দেয় তাই না আমাদের থাকার এতো বাহার! কতো দিন আগের কথা, তবু যেন সেই মিস্তিরীদের কারো কারো চেহারা চোখে ভেসে ওঠে। সেই বাহার, আবদুল, রশিদ, বুড়ো মিঞা—'

গড়াই বলে ওঠেন, 'আরে! এরা তো আমাদের বাড়িতেও আসতে দেখছি। অ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ রশিদ, আবদুল, বুড়ো মিঞা—'

নেহাৎ নাতি-নাতনীর সামনে তাই, নচেৎ রেলগাড়ির কামরার মতো জাপটাজাপটি হয়ে বসতো!

তবে 'অ্যাঁ? সত্যি? সেই পাকাদাড়ি বুড়ো মিঞা?' ইত্যাদি বলতে বলতে যা উচ্ছ্বাস! ওঃ!

উচ্ছ্বাস আর থামে না।

কথা চলেই চলে। 'আসলে কী জানো ভাই, সেকালে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ছিলো! সকলের সঙ্গেই সকলের একটা বন্ধন, একটা টান। একটু ভালোবাসা! জমিদারে প্রজায় ভালোবাসা ছিলো, মনিবে ভৃত্যে ভালোবাসা ছিলো, পড়শীতে পড়শীতে ভালোবাসা ছিলো! হাটুরে বাজারে ফড়েদের সঙ্গে মহাজনদের ভালোবাসা ছিলো! নৌকোর মাঝি-মাল্লা, চাষীবাসী ঘর-গেরস্থী সকলের মধ্যেই সেই একটা ভালোবাসা ভালোবাসার ভাব। ছিলো না রে?

বাড়িতে কোনো কুটুম কি আত্মীয় বেড়াতে এলে সহজে ফিরতে পারতো সে? দু'দিনের জন্যে এসে দু'হপ্তা পার।

কেবলই অনুরোধ উপরোধ, আর দুটো দিন থেকে যাও। এক একটা দিন থেকে যাও। নিদেন আর একটা বেলাও থেকে যাও। এ গাড়িতে না গিয়ে পরের গাড়িতে যেও তবু আর দু' ঘণ্টা থাকা হবে জনে জনে সব্বাই সেই অনুরোধের ধুয়ো ধরে চলেছে! এমন কি বাড়ির কাজকরুনি লোকেরাও বলতে থাকবে— মাসিমা আর দুটা দিন থেকে যান না। পিসিমা আর কডা দিন থেকে যান না। মামাবাবু, পিসে- ঠাকুর আর কডা দিন থেকে গেলে ভালো হতো! আর বাড়ির ছোট ছেলেরা? তারা তো যেতে না দেবার ফন্দিতে অতিথিদের জুতো লুকিয়ে রাখছে, ঘড়ি, চশমা, ব্যাগ, ছাতা সরিয়ে ফেলে লুকিয়ে রাখছে, যদি ওতেই যাওয়াটা আটকায়। সকলের মধ্যেই ছিলো এমনি আগ্রহ আর ভালোবাসা।'

ঘণ্টু আর মন্টি ভয়ে ভয়ে মুখোমুখি করে।

কী রে বাবা! ঠাকুর কী এদের দু'ভাইবোনের ষড়যন্ত্র শুনে ফেলেছেন নাকি? এসব কথা কেন?

বাঃ। তা কী করে হতে পারে? এরা তো এই এখানে চুপি চুপি পরামর্শ করছিলো।

ও কিছু না।

ওঁদের সেই নাটুকেপনা স্বভাবের বশেই এতো কথা বলে চলেছেন।

বাবাঃ! সাধে ষড়যন্ত্র। সবসময় এতো আবেগ আদিখ্যেতা ভালো লাগে?

পৃথিবীতে যেন আর কোনো কথা নেই।

'আচ্ছা চক্কোত্তী, তোমার মনে আছে— ডাক্তারপাড়ায় যে একটা পীরবাবার দরগা ছিলো—'

'আচ্ছা গড়াই তোমার মনে আছে, সেই যে—'

ঘণ্টু মন্টি চিমটি কাটাকাটি করে।

অর্থাৎ 'ওই হলো আরম্ভ। ওঃ! অসহ্য! বুড়ো দুটোর ওই আদেখলেপনা আর নাটুকেপনা দেখলে মাথা জ্বলে যায়!'

শুধু কি ওইটুকুই?

আরো কত কী!

রাগও ধরে, আবার হাসিও পায়।

দুই ভাইবোন তাদের মায়ের কাছে গিয়ে হেসে লুটোপুটি।

'মা! মামণি! দাদু পদ্য লিখেছে। আর সেটি বন্ধুকে দেখাচ্ছে!'

'শুধু দেখানো? প্রেজেন্ট করছে তো! বলছে, নাও না চক্কোত্তী এটা তোমার কাছেই রাখো। ও মা—ভাবতে পারো? দাদু পদ্য লিখছে।'

ওদের মা কষ্টে হাসি চেপে বলে, 'অ্যাই হচ্ছেটা কী? গুরুজনকে নিয়ে ঠাট্টা।'

'ঠাট্টা কি গো মা? সত্যি সত্যি। শুনবে? আমার তো শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেলো—

বরিশাল। বরিশাল।
দেখি নাই তোমারে যে কতো কাল!
জানি না এখন তোমার হইয়াছে কি বা হাল!
বরিশাল। বরিশাল।'

'মা! দাদু যদি ওই 'বরিশাল'কে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যায়?'

মা সাবধানে বলে, 'গেলে আর উপায় কী? তো ওঁর নিজেরও তো ঘরসংসার আছে? না কি নেই?'

ওইটুকুই যা ভরসা!

কোনো মতে আরো দুটো দিন কাটে।

ইতিমধ্যে শ্যাম গড়াই নাকি আরো একটি পদ্য লিখে ফেলেছেন!

এবং ঘণ্টু তক্কে তক্কে থেকে সেটিকে একেবারে বাগিয়ে এনে মায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি।

মুশকিল এই, দিদাও ওই বোকাটেদের দলে।

বাবাও কলকাতা চলে গেছেন।

মা ছাড়া আর গতি নেই।

'ওমা! শোনো, শোনো—

হরবোলা ভাই হরবোলা!
এতোটা কাল কোথায় ছিলে তোর ঝোলা?
সে ঝোলা নতুই ছুলিস, তবুই অবাক!
কতো ছিলে তুমি!
সেথা কেঁপে, মুকো ঠোঁটে, পরম খুশির বোল!

হি হি হি! 'বোমা।' দাদুকে জিজ্ঞেস না করে পারিনি। 'দাদু, ভালো, জিনিসের সঙ্গে বোমার তুলনা কেন?' তো দাদুর কী জবাব জানো? 'ওরে ওইসব ভালো ভালো জিনিসই যেই এক একটা করে বার করছে বুকের মধ্যে যেন বোমা দাগছে। খবরের কাগজে যাকে বলে 'বিস্ফোরণ' না কি, তাই হচ্ছে ভেতরে। ওই হরবোলাও নাকি মাঝ রাত্তিরে উঠে প্যাঁচা ধরার চেষ্টা করতো! তা'লে বল? শুনলে বুকে বোমা দাগবে না?'

'প্যাঁচা! প্যাঁচা ধরে কী হবে দাদু? প্যাঁচাকে কি খাঁচায় ভরে পোষা যায়? পুষলেই বা কী লাভ? যা বিচ্ছিরী ডাক।'

'আরে না না! কালো প্যাঁচা তো নয়। লক্ষ্মী প্যাঁচা! একবার যদি একটাকে ধরে এনে ধানের গোলার মাথায় বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সাত পুরুষ ধরে নাকি চিরকালের জন্যে লক্ষ্মীমন্ত থাকা যায়। কক্ষণো গরীব হতে হয় না। তো পিসি এই কথা বলেছিলো বলে আমি ওই প্যাঁচা ধরার তাল করতাম। কিন্তু সে তো আমার পিসি আমাকে বলেছিলো। হরবোলাও কি না তার ঠাকুমার কাছে তাই শুনে ওই কর্ম করেছে। তাহলে ভাব? শুনে আহ্লাদে প্রাণ উথলোবে না? সেটাই বোমাতুল্য।'

চলছিলো এই পদ্যর বোমা দাগাদাগির কথা।

হঠাৎ দুম করে ডাকপিওনের হাতে একখানি বোমা এসে পড়ে ফাটলো।

তা বলতে গেলে সে তো বোমাই।

দুই বন্ধু সবে জগন্নাথ দর্শন করে ফিরেছেন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির!

আগে হাতে নিলেন শ্যাম গড়াই-ই। কারণ তাঁর ঠিকানাতেই তো এসেছে। কিন্তু সেটা খুলে চোখের সামনে ধরেই তাঁর থলথলে মুখখানি শুকিয়ে আমসি।

'এ আবার কী লিখেছে গো? অ চক্কোত্তী তুমি দ্যাখো তো! আমি বাবা ইংরিজি মিংরিজি তেমন বুঝি না। এ যেন বড় বিপদের বার্তা।'

বলে হাতটা বাড়িয়ে চক্রবর্তীর হাতে ধরিয়ে দিলেন টেলিগ্রাম-খানা।

কিন্তু চক্রবর্তী?

তিনি তো এক নজর দেখেই হো হো করে হেসে ওঠেন। 'আরে-ব্বাস! একেই বলে মাথা নাই তার মাথাব্যথা! হা হা হা!'

গড়াই ওঁর হাসি দেখে একটু স্বস্তি পেয়ে বলেন, 'ব্যাপারটা কী বল তো? কে কী খবর জানিয়েছে?'

চক্রবর্তী বলেন, 'কে তা জানি না, তবে কী খবর জানিস? হা হা হা—বলেছে, হরনাথ চক্রবর্তী শীঘ্র ফিরে এসো। তোমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়।'

'অ্যাঁ।'

'এই মরেছে চমকাচ্ছিস কেন? স্ত্রী কোথায়? যে মরতে বসবে? জীবনে বিয়ে থা করবার ফুরসৎ পেয়েছি? কেউ একটা বদ তামাসা করেছে।'

গড়াইয়ের প্রশ্ন, 'কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচা করে কে তোমার সঙ্গে তামাসা করতে বসবে বলো তো হরবোলা?'

'সেই তো কথা। কে, তবে নেহাৎ কাঁচা কেউ। জানেই না যে আমার স্ত্রী-টির বালাই নাই।'

গড়াইগিন্নী একবার বলে উঠলেন, 'আচ্ছা ওই নামে এই চক্রতীর্থে অন্য কেউ নাই তো? তাঁর টেলিগ্রামটা এখানে দিয়ে গেছে হয় তো।'

গড়াই সে কথা উড়িয়ে দেন, 'দূর। পষ্ট আমার ঠিকানা।'

অনেক চিন্তা করা হলো। তবে আন্দাজ করতে পারা গেল না, কলকাতাতেই বা গড়াইয়ের এমন কে আছে? যে লোক জানে, তার এখানে হরনাথ চক্রবর্তী নামের একজন ক'দিন রয়েছে।

তাজ্জব!

মন্টি ঘণ্টু অবশ্য এতো কথার কিছু জানে না। কী করে জানবে? তারা তো সেই কখন থেকে বাড়ির ছাতে উঠে বইখাতা নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া করছে।

করতে হবে না?

ছুটি ফুরিয়ে এলো না? গিয়েই ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা না?

তারা নিচে নেমে এসে তো এই মজার খবরটা শুনে হাঁ হয়েই হেসে কুটিকুটি।

'কী বললেন নতুন দাদু। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! হি হি হি।'

কিন্তু আড়ালে গিয়ে? দু'জনে মাথায় হাত।

'দিদি! কী হবে? যদি ধরা পড়ে যাই?'

'জানি না বাবা! রঞ্জনদা যে এমন একখানা বিদ্‌কুটে কাণ্ড করবে তা কে জানতো!'

'ফোনে তুই বলে দিসনি কেন, ওনার বৌ নেই।'

'বাঃ, চমৎকার। আমি কি জানি রঞ্জনদা এই লাইনে প্রতিকার করতে বসবে!'

'আচ্ছা দিদি?'

'কী কেবল দিদি দিদি। বল কী বলছিস?'

'মানে বলছি কি লোকে আমাদের সন্দেহ করতে যাবে কেন? আমরা কি পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করেছি? ওটা তো কলকাতা থেকে এসেছে।'

'তা অবশ্য। দ্যাট্‌স্ রাইট। আমাদের ওপর সন্দেহ পড়বার কোনো কারণই নেই।'

'কিন্তু দিদি! বুকের মধ্যে যে ভীষণ ভয় ভয় করছে।'

'সেই তো মুশকিল। আমারও!'

'ওই হরবোলা আমাদের দিকে কীরকম করে যেন তাকাচ্ছিলেন না?'

'কই? কখন? তুই একটা ভীতুর রাজা। আমাদের সঙ্গে কী? কে ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে কে জানে। আমরা কোথা থেকে আসছি এর মধ্যে?'

'ঠিক বলেছিস? আচ্ছা দিদি, আজ থেকে আমরা ওঁর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করি কী বল?'

'আরে! তুইও ওই কথা ভাবছিস? আমিও তাই ভাবছিলাম।'

কিন্তু কী ভাবে সেই ভালো ব্যবহারটি করা যাবে?

জল্পনা কল্পনা চলে। কী বলবে?

'নতুন দাদু, আপনার পাকা চুল তুলে দেব?'

'দূর। সে ভারী বোকা বোকা লাগবে।'

'আমরাও ওনার ছেলেবেলার গল্প শুনতে চাইবো।'

'ধ্যাৎ! সে তো শুনে শুনে কান পচে গেছে!'

'নতুন দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে যাওয়া হবে?'

'হ্যাৎ। একলা নতুন দাদুকে পাবো কোথায়? সব সময়ই তো বাড়ির দাদুর সঙ্গে সেঁটে আছেন।'

অবশেষে ঠিক করা হলো। থাকুন দু'জনে সেঁটে। বলা হবে, 'নতুন

দাদু, সেকালে পাড়াগাঁয়ে তো গাছপালায় ভূত থাকতো, আপনাদের জঙ্গলবাগান পাড়ায় ভূত-টুত থাকতো না? বলুন একটা ভূতের গল্প। দাদু ভূতের গল্প জানেন না?'

তারপর দেখা যাক কী বলেন!

এও ঠিক করে ফেলা হলো, যদি তেমন ঘোরালো আর জোরালো কোনো ভূতের গল্প নাও বলতে পারেন, নেহাৎ অর্ডিনারি বেলগাছের বেহ্মদত্যি কি শ্যাওড়া গাছের পেতনীর গল্পও হয়, তা হলেও খুব ভয় পাওয়া পাওয়া ভাব করতে হবে।

আর বাড়ির দাদুকেও না হয় একটু ডাউন করা যাবে, 'তুমি এতো লোমহর্ষক ভূতের গল্প বলতে জানো না!'

পরামর্শটি করে মনের মধ্যে যেন একটু শান্তি এলো।

'আজ সন্ধ্যেবেলাই অ্যাকশান শুরু হোক কী বলিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভালো। আর তারপর রোজ সন্ধ্যাতেই—'

কিন্তু হায়!

সাধু সংকল্প আর সহজে কার্যকরী হয়ে ওঠে, কবে কার?

সন্ধ্যাবেলা খোঁজ নিতে জানা গেলো দুই বৃদ্ধই হাওয়া।

কোথায় গেছেন?

না হরবোলা চক্কোত্তীর জন্যে ট্রেনের টিকিট কাটতে।

সে কী! মানে?

টিকিট কাটতে মানে?

মানে আর কী? মনটা আর বসছে না তাঁর।

কে অমন একখানা উড়ো টেলিগ্রাম করলো। দোকানটার কোনো শত্রুপক্ষ কি-না! ভাগ্নেটাই বা কেমন আছে!

গড়াইয়ের বড়বাজারের ভুষিমালের ব্যবসার মতো রমরমা না হলেও চক্রবর্তীর ছাতা ও জুতোর দোকানেরও আয় উন্নতি মন্দ নয়!

গড়াইগিন্নী বলেছিলেন, 'দোকান নিয়ে চিন্তা কী? দোকান তো আপনার ভাগনে দেখে দাদা।'

'তা দেখে। প্রাণতুল্য করেই দেখে। দেখবে না কেন? জানে তো এই বুড়োটা পটল তুললে সবই ওর হবে। তবে ওরই কোনো শত্রুপক্ষ এটা করেছে কি-না কে জানে! আজকাল তো যখন তখন দোকানে বাজারে আগুন লাগা একটা ফ্যাশান হয়েছে।'

এদিকে শুনতে শুনতে মন্টির কান মাথা আগুন হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

আর ঘন্টুর?

তার ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'না না, ওসব কিছু না। আসলে—'

কিন্তু বলা তো আর যায় না?

অতএব ট্রেনের টিকিট কেনা হয়ে গেলো!

তবু গড়াইগিন্নী বলতে থাকেন, 'কেনা হলো তো কী হলো? ফেরৎ দেওয়া যায় না নাকি? আর কটা দিন থেকে যান দাদা! আপনাকে গোকুল পিঠে খাওয়াবো ভেবে রেখেছি। ভালো মতো নারকেল পাচ্ছি না বলে হয়ে ওঠেনি—'

হরবোলা হেসে উঠে বলেন, 'পেটে তো দুশো পাঁচশো রকমের জিনিস খেলুম দিদি, পিঠে আর নাই খেলুম।'

নাঃ, আটকানো গেল না!

হরবোলা বললেন, 'মনটা যখন একবার চঞ্চল হয়েছে তখন রওনা দেওয়াই ভালো। কিন্তু ভেবে তাজ্জব হচ্ছি ওই কলকেতা শহরে

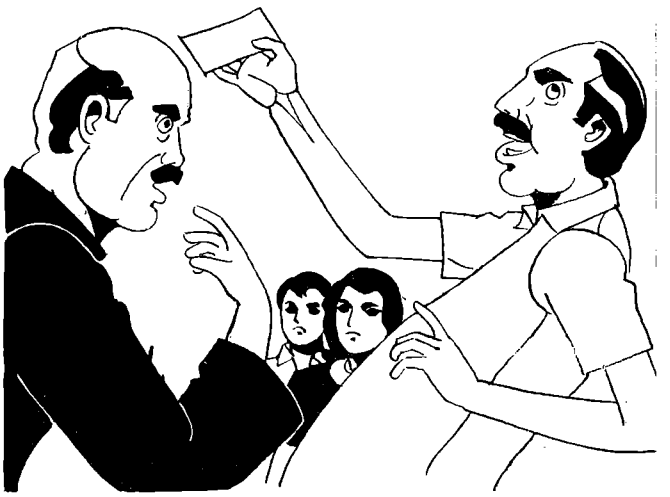

এক নজর দেখেই হেসে ওঠেন।

দুজনায় এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর চরে বেড়াচ্ছি, কেউ কারো টিকিটি দেখি নাই কোনোদিন!'

গড়াই বলেন, 'আমিও তো হরদম তাই ভেবে চলেছি। তো ওখানে গিয়ে দেখা হবে এবার কী বলো?'

'ভগবান জানেন।'

গড়াইগিন্নী বলেন, 'কেন দাদা? ঠিকানা তো জানাজানি হয়ে গেছে।'

'শুধু ঠিকানা জানাজানিই কি সব দিদি? ঠিক সময়টি আসা চাই। ওই যে রথযাত্রা স্পেশালে চড়ে বসে দেখা হলো, আর ফাটাফাটি কাণ্ড করতে করতে যোগাযোগ হয়ে গেলো, তার রহস্যই আলাদা।'

'শ্যাম গড়াইয়ের চক্রতীর্থের এই বাড়িখানা তো তোমারও হরবোলা। যখন ইচ্ছে চলে আসতে পারো। থাকতে পারো।'

হরবোলা বললেন, 'প্রভু জগন্নাথের ইচ্ছে।'

অতএব আর কী!

জিনিসপত্র গোছগাছ বাঁধাছাঁদা। দোতলা থেকে সব নামিয়ে এনে নিচের তলার ঘরে এসে বসা হয় রিকশা আসার অপেক্ষায়।

হরবোলা গাঢ় গভীর গলায় বলেন, 'তোর বাড়িতে এসে এই মাসখানেক সময় যে আনন্দে কাটলো শ্যাম, বাকি জীবনভোর তা ভুলব না। আহা! কী সোনার সংসারটি তোর! দেখে চোখ জুড়োয়, প্রাণ জুড়োয়। তোর গিন্নী না হয় আমাদের ওখানের মেয়ে। আমায় আপনজন ভাবতেই পারে, কিন্তু তোর ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনী? কী ভাবে এই একটা উটকো লোককে আপন করে নিয়েছিলো। বৌমাটি তো লক্ষ্মী প্রতিমা। পরকে এতো যত্ন! আর নাতি-নাতনী দুটি! দেবশিশু। যেমন সোনার চাঁদের মতো দেখতে, তেমনি আচার আচরণ। দেখে দেখে ইচ্ছে হতো আমার ভাগনার ছেলেমেয়েগুলোকে ডেকে এনে দেখাই! উঃ কী বিচ্ছু মার্কা ছেলেপুলে সব! যখন 'অ্যাই মামাদাদু' বলে ডাক দেয়, মনে হয় যেন ঢিল ছুঁড়ে মারলো। আর তোর নাতি-নাতনীরা? যখন 'নতুন দাদু' বলে ডাকে কানে যেন মধু বর্ষায়। বড় ভাগ্যবান রে তুই গড়াই।'

আহা উনি তো এদের 'ভালোই' বলছেন? তবে কেন দুটো ভাইবোনের এমন ভয়ঙ্কর একটা অস্বস্তি হচ্ছে?

এ অস্বস্তি কিসের?

লজ্জার না ভয়ের?

রিকশা এসে গেলো।

উঠে পড়তে হলো!

গড়াইগিন্নী আঁচলে নাক মুছতে মুছতে 'দাদা'কে একটা প্রণাম ঠুকে হাতে একটা মস্ত টিফিন কৌটো ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এর মধ্যে গাড়ির খাবার রইলো দাদা। আর দু'খানা গোকুল পিঠেও। খাবেন নিশ্চয়।'

হরবোলা চক্কোত্তী প্রায় আঁৎকে উঠে বলেন, 'গাড়ির খাবার। ওইভাবে পেট চিরে খেয়ে আবার গাড়ির খাবার। আমাকে কি রাক্ষস ঠাউরেছো দিদি? একেবারে বক রাক্ষস!'

আশ্চর্য ঘণ্টু এ কথায় হেসে না ফেলে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'নিন না নতুন দাদু। রেলগাড়িতে চাপলেই খিদে পায়, দেখবেন।'

রিকশাওলা ঘণ্টি দিচ্ছে।

গড়াই হাফ হাতা পাঞ্জাবিটার হাতার ধারটা দিয়ে চোখ ঘষে নিয়ে বলেন, 'চলো, তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।'

বলে হরবোলার ব্যাগটা হাতে তুলে নেন।

এগিয়ে গিয়ে দু' জনেই জিনিসপত্র গুছিয়ে একটা রিকশায় উঠে ঠেসেঠুসে বসেন।

রিকশা ছেড়ে দেয়!

গড়াইগিন্নী এখন রীতিমতো ফ্যাঁসফ্যাঁস করতে করতে আর নাকের জলে চোখের জলে আঁচলটা সপসপিয়ে ভিজিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

মন্টি-ঘণ্টুর মাও আস্তে আস্তে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

আর এরা দু'জন।

হঠাৎ ছুটে দোতলায় উঠে গিয়ে সেই কোণের দিকের বারান্দাটায় এসে দাঁড়ায়। যেখান থেকে প্রায় রাস্তার শেষ সীমা পর্যন্ত দেখা যায়।

কিন্তু যখন আর দেখা গেলো না, তখনও দাঁড়িয়েই থাকে। অনেক, অনেকক্ষণ। চুপিচুপি!

হঠাৎ ঘণ্টু একসময় আপন মনে বলে ওঠে, 'আচ্ছা উনি থাকায় আমাদের কী ক্ষতি হচ্ছিলো!'

জিগ্যেসও নয়। 'দিদি' বলে ডেকেও নয়।

তবু মন্টি ছিটকে উঠে বলে, 'আমি কি জানি? তুই-ই তো কেবলই— জুতোর মধ্যে কাঁকড়া পুরে রাখবো? বিছানার মধ্যে—' আর কথা যোগায় না।

ঘণ্টুও চুপচাপ হয়ে যায়।

শুধু সমুদ্রের শব্দ আর ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ!

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ দু'জনেই একই সঙ্গে রাগ দুঃখ ক্ষোভের গলায় বলে উঠলো, 'এতো দুম করে চলে যাবার দরকারটা কী ছিলো? একটু ভালো ব্যবহার করার সময়ই পাওয়া গেলো না।'

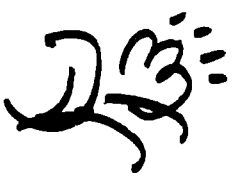

ছবি ঃ মদন সরকার

দেবী দুর্গার আসা-যাওয়া

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

যদি দুর্গা আসেন ঘোড়ায়!
শিব আর অসুর কুস্তি লড়ে মনুমেন্টের গোড়ায়
গণ্‌শা-কেতো গড়ের মাঠে গিয়েই ঘুড়ি ওড়ায়!
যদি দুর্গা আসেন ঘোড়ায়!!

যদি দুর্গা আসেন দোলায়!
দ্বিতীয় সেতুর মাথায় চড়েই অসুর 'মাসল্' ফোলায়
নন্দী-ভৃঙ্গী হতাশ-শিবের ভুঁড়িতে হাত বোলায়!
যদি দুর্গা আসেন দোলায়!!

যদি দুর্গা আসেন হেঁটে!
লক্ষ্মী-সুরো ঘুগ্‌নি কিনেই শালপাতা খায় চেটে
গণ্‌শা-কেতো যায় সিনেমায় লুকিয়ে টিকিট কেটে!
যদি দুর্গা আসেন হেঁটে!!

যদি দুর্গা আসেন বাসে!
শিব আর অসুর ছাদে বসেই আনন্দে খুব হাসে
লক্ষ্মী-সুরো বেড়ায় ঘুরেই ভিক্টোরিয়ার পাশে!
যদি দুর্গা আসেন বাসে!!

যদি দুর্গা আসেন ট্রামে!
ট্র্যাফিক-জ্যামে আটকে সবাই দর-দর-দর ঘামে
শিব রেগে কয় ঃ চল্ আর নয়, ফিরি কৈলাসধামে!
যদি দুর্গা আসেন ট্রামে!!

ছবি ঃ সুফি

একটি আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

শুভ্রা ও তার বান্ধবীরা প্রত্যেকে একটি করে গাছ পুঁতলো। বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গাটা ছোট ছোট গাছে ভর্তি হয়ে গেল। সকলে কাছের পুকুর থেকে ঘটি ভরে জল এনে গাছের গোড়ায় দিয়ে পুরো জায়গাটা ভিজিয়ে দিল। অনেকটা জল জায়গা ভাসিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তার ওপারে পুকুর। জলধারা রাস্তা ভাসিয়ে পুকুরে পড়তে লাগল।

লতিফ মিঞা ধানের বস্তা বোঝাই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। শুভ্রাদের কাণ্ড দেখে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ও দিদিমণিরা, রাস্তায় এতো জল দিচ্ছ কেন? রাস্তা যে পিচ্ছিল হয়ে যাবে। গাড়িঘোড়া কিচ্ছু যেতে পারবে না। সব আছাড় খেয়ে পড়বে।

শুভ্রা গাড়ির কাছে এসে বলল, জানো না লতিফ চাচা, আজ বনমহোৎসব। দিদিমণি বলেছেন, আজ গাছ পুঁততে। তাই আমরা এই জায়গাতে গাছ পুঁতছি।

বনমোচ্ছব! লতিফের সহকারী রহিম বারো বছরের শুভ্রার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মোচ্ছবে তো খাওয়া-দাওয়া হয়, তোমরা আমাদের খাওয়াবে?

শুভ্রা বাড়ির দিকে তাকিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, রহিম চাচারা খেতে চাইছে।

হরিদাসবাবু বারান্দায় বসে তামাক খেতে খেতে শুভ্রাদের বনমহোৎসব দেখছিলেন। তিনি বললেন, বিকেলে এসো, মিষ্টি খাওয়াবো।

আর জল দিতে হবে না। লতিফ শুভ্রাকে বলল। আবার কাল দিয়ো। বেশি জল দিলে গাছের গোড়া পচে যাবে।

হরিদাসবাবুও মেয়েদের ডাকলেন। খুকু, এবার তোমরা বাড়িতে এসো। ভাল করে হাত-পা ধুয়ে ফেল, নইলে গায়ে হাতে যে মাটি লেগেছে, তা থেকে অসুখ করতে পারে।

আমরা সাবান মেখে স্নান করে নেব।

শুভ্রা তার দলবলকে বলল, চল। বাড়ির ভেতর যাই। ওরা সকলে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

বিকেলবেলায় সত্যিই লতিফ রহিম হরিদাসবাবুর বাড়ি এসে হাজির। এসে দেখে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমণিরাও এসেছেন। চার-পাঁচ জন দিদিমণি। প্রধান দিদিমণির বয়স সবচেয়ে বেশি। চুল কাঁচা-পাকা, কিন্তু মনটি এখনো সবচেয়ে নরম। নাম মমতা। মমতা ভট্টাচার্য। তাঁর কথাবার্তা ব্যবহারে সত্যিই মমতা ফুটে বেরোয়।

শুভ্রার মা সকলকে চা জলখাবার খাওয়ালেন। হরিদাসবাবু বললেন, আমায় কিছু দেবে না?

তোমার রক্তে চিনি বেশি। ডাক্তারবাবু তোমায় মিষ্টি খেতে বারণ করেছেন।

গ্রামের ডাক্তার গোপাল সামন্ত সাইকেলে যাচ্ছিলেন, হরিদাসবাবুর বাড়িতে ভিড় দেখে সাইকেল থেকে নেমে, সাইকেলটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে, ঘরে ঢুকে বললেন, কি ব্যাপার হরিদাসবাবু? আপনার বাড়িতে কিসের উৎসব? সকলে মিষ্টি খাচ্ছে, আমি বাদ পড়ে যাব?

তাই কখনও হয়? এসো, এসো, ডাক্তার।

হরিদাসবাবু গোপাল ডাক্তারকে আপ্যায়ন করে চেয়ারে বসতে দিলেন। নিজে লতিফ মিঞার পাশে খাটে বসলেন।

আজ মেয়েরা বনমহোৎসব করেছে, তাই দিদিমণিদের, লতিফ, রহিমকে নেমন্তন্ন করেছে। তোমার বউদি সকলকে মিষ্টি দিচ্ছে আমাকে দিচ্ছে না, তুমি নাকি মিষ্টি দিতে বারণ করেছ!

শুভ্রার মা গোপাল ডাক্তারের মিষ্টির থালা এনে ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললেন, বলো ডাক্তার ঠাকুরপো, তুমি বারণ করোনি?

ডাক্তার আমতা আমতা করে বললেন, তা করেছি, তবে—

হরিদাসবাবু রাগের ঝাঁঝে বললেন, তবে আর কি? আমাকে এক প্লেট উচ্ছে-করলাসেদ্ধ এনে দাও। ওদের সঙ্গে খেয়ে আনন্দ করি।

না, বৌদি! ওঁকে মিষ্টি দিন। একদিন মিষ্টি দিলে কোনো ক্ষতি হবে না, বরং আজকের মিষ্টি উৎসবটায় ওঁকে মিষ্টি না দিলে তেতো হয়ে যাবে।

শুভ্রার মা হাসতে হাসতে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন।

শুভ্রা তার পড়ার ঘর থেকে একটা টিনের ওপর লাল হলদে রঙ দিয়ে লেখা একটা বোর্ড নিয়ে এল। তার ওপর লেখা ঃ

একটি গাছ ঃ একটি প্রাণ।

মমতা দিদিমণি দেখে বললেন, বাঃ! ভারি সুন্দর হয়েছে। কিন্তু লাগাবে কি করে? তাছাড়া জায়গাটায় বেড়া না দিলে গরু-ছাগলে সব গাছ খেয়ে যাবে।

ঠিক, ঠিক! লতিফ মিঞা মিষ্টি খেতে খেতে বলল, কাল ভোরেই আমি বাঁশ আর তার দিয়ে জায়গাটায় বেড়া দিয়ে দিচ্ছি। সেই বেড়ায় একটা গেট তৈরি করে দেব। তুমি সেই গেটে তোমার ওই লেখাটা ঝুলিয়ে দিও।

ঝুলিয়ে দিলে কেউ নিয়ে পালিয়ে যাবে। শুভ্রা চিন্তিত স্বরে বলল।

ঠিক, ঠিক। লতিফ মিঞা মাথা নেড়ে উত্তর দিল, ভুল আমারই হয়েছে। গরু-ছাগলরা গাছ খায়, চোরেরা টিন খায়। আমি পেরেক দিয়ে বেড়ার সঙ্গে তোমার লেখা এমনভাবে সেঁটে দেব যে, কেউ আর খুলতে পারবে না।

শুভ্রার মা ইতিমধ্যে হরিদাসবাবুর মিষ্টির থালা আর চিনি ছাড়া চা এনে দিয়েছেন।

বউদি! আপনি খাবেন না? গোপাল ডাক্তারের জিজ্ঞাসা।

তোমরা খাও। আমি পরে খাব।

তা হবে না। এমন সুন্দর বিকেলে সকলকে একসঙ্গে খেতে হবে।

আচ্ছা আমি খাচ্ছি। হরিদাসবাবুর থালা থেকে একটা মিষ্টি তুলে মুখে পুরে দিলেন শুভ্রার মা।

দেখেছো, আমার ভাগ কমিয়ে দিল। হরিদাসবাবু বলে উঠলেন।

তোমার ভাগ কমানোর জন্যেই তো এ বাড়িতে এসেছি। নাও, আর অশান্তি না বাড়িয়ে হাসিখুশিতে গল্প কর।

হ্যাঁ। রসগোল্লার বেলায় যত ভাব, কই এমন করে তো উচ্ছে-করলা-সেদ্ধ খাবার সময় হাসিমুখে ভাগ বসাও না!

সবাই হেসে উঠল।

আচ্ছা শুভ্রা। একটা প্রশ্ন করব?

ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে কথা বললেন।

বলুন।

এই যে লিখেছ 'একটি গাছ ঃ একটি প্রাণ'। কেন লিখেছ জানো?

জানি—

কি করে জানলে?

দিদিমণিরা শিখিয়েছেন।

বল তো শুনি! তোমরা তো এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে।

শুভ্রা মমতা দিদিমণির দিকে তাকিয়ে বলল, দিদিমণি! আমি বলছি। ভুল হলে আপনি ঠিক করে দেবেন।

দেব। বল তুমি!

শুভ্রা বলতে শুরু করল,

এই পৃথিবী বহুকাল আগে আগুনের পিণ্ড ছিল। তখন কোনো প্রাণীই পৃথিবীতে বাস করত না। অনেককাল পরে পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে এল। দীর্ঘকাল ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হলো পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর যে অংশ নিচু ছিল, সে অংশ জলে ভরে গেল, আর সেই সব জায়গায় সমুদ্র মহাসমুদ্র সৃষ্টি হলো।

এর বহুদিন পরে পৃথিবীর চারপাশে একটা বায়বীয় বলয়ের সৃষ্টি হলো, বৈজ্ঞানিকরা পরবর্তীকালে এর নাম দিলেন 'ওজন বলয়'(O_3)। 'ওজন বলয়' পৃথিবীকে সুস্নিগ্ধ করল, পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে উত্তপ্ত অনুভূতি দূর করল এবং শীতল মধুময় করে তুলল। সূর্য থেকে বিষাক্ত রশ্মিগুলো আটকে দিল। এরও বহুদিন পরে জলে প্রথম জন্মাল শ্যাওলা। তারপর জলজ শাক-সবজি, তারপর ধীরে ধীরে বনাঞ্চল তৈরি হলো।

এতটা বলে শুভ্রা মমতা দিদিমণির দিকে তাকাল। দিদিমণি ইশারায় জানালেন শুভ্রা ঠিক বলছে।

শুভ্রা নিজের ফ্রকটা টেনে সোজা করে বলতে লাগল, তারপর পৃথিবীতে জীবের জন্ম হয়েছে এবং সবশেষে গড়ে উঠেছে মানুষের জীবন।

এখন, মানুষের জীবনের সঙ্গে গাছের জীবনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, বৈজ্ঞানিকরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁদের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পৃথিবীতে আগে বনজ সম্পদ এসেছে, তারপর প্রাণীজগতের জন্ম, তাই, নিশ্চয়ই বনজীবনের সঙ্গে প্রাণীজীবনের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে।

বৈজ্ঞানিকরা দেখলেন গাছ পুঁতলে, তার গোড়ায় মাটি দিলে, জল দিলে, সার দিলে গাছ ক্রমশঃ বড় হয়। ফলের গাছ ফল দেয়, ফুলের গাছ ফুল ফোটায়। যেসব গাছ ফল-ফুল দেয় না, সেগুলিও খুব বড় হয়, ছায়া দেয়, মাটিকে শিকড় দিয়ে আঁটোসাঁটো করে বেঁধে রাখে। মাটিতে ধস নামে না।

বৈজ্ঞানিকরা প্রথমে ভাবলেন গাছ মাটি থেকে নিজেদের পুষ্টি গ্রহণ করে। তখন ধারণা ছিল গাছ যত বড় হবে, মাটি তত কমে যাবে।

একজন বৈজ্ঞানিক একটা মস্ত বড় কাচের টবে মেপে সাড়ে তিনশো পাউণ্ডের মতো মাটি দিয়ে একটা ওক গাছের চারা পুঁতে দিলেন।

চার মাস পরে বৈজ্ঞানিক দেখলেন ওক গাছটি যত বড় হয়েছে, সে অনুপাতে মাটি কমে যায়নি। মাটি মাত্র দু পাউণ্ড কমেছে, কিন্তু গাছটি বিরাট হয়ে গেছে। তখন বৈজ্ঞানিকদের মাথায় এল মাটি ছাড়াও, অন্য কোনো উৎস থেকে গাছ পুষ্টি ও এনার্জি সংগ্রহ করে।

এমন সময় লর্ড ল্যাভায়সিওর আবিষ্কার করলেন শুদ্ধ বায়ু আর অশুদ্ধ বায়ু। ল্যাভায়সিওর জমিদার বংশের সন্তান ছিলেন, তখন ফরাসী বিপ্লব হচ্ছিল। বিপ্লবে সাধারণ মানুষের দল ল্যাভায়সিওরকে ধরে গিলোটিনে হত্যা করেন। সেই প্রকাশ্য স্থানে একজন জার্মান গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এরা যে মাথাটি কেটে ফেলতে এক মিনিটের কম সময় নিল, সেইরকম একটি মস্তিষ্ক আবার তৈরি হতে পৃথিবীতে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে।

তারপর প্রিসলি আবিষ্কার করলেন ল্যাভায়সিওরের শুদ্ধ বায়ু হলো অক্সিজেন এবং অশুদ্ধ বায়ু হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড।

শুভ্রা থামল। সমস্ত ঘর থমথম করছে। কিছুক্ষণ পরে লতিফ মিঞা বলল, কিগো? এ কিসের বিপ্লব? অমন ভালমানুষটাকে কেটে ফেলে দিল?

ইতিহাসের নিয়মই তো তাই। মমতা দিদিমণি চোখ মুছে বললেন, ইতিহাসের নির্মম হিসেবে কত ভালমানুষ নির্মম অত্যাচার সহ্য করে, আবার কত খারাপ মানুষ হেসে-খেলে দিন কাটিয়ে যায়।

না দিদিমণি, ডাক্তারবাবু বললেন, কত কোটি কোটি মানুষ হেসে-খেলে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে, তাদের কজনকে ইতিহাস মনে রেখেছে? কিন্তু যাঁরা পরের উপকারের জন্য নিজেদের জীবন চরম কষ্টে কাটিয়ে গেছেন, তাঁদের কথাই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

হরিদাসবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ওসব গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গ এখন থাক। আমরা এখনও বুঝিনি কেন লেখা হয়েছে 'একটি গাছ ঃ একটি প্রাণ'।

ঠিক, ঠিক! মমতা দিদিমণি বললেন, শুভ্রা এতক্ষণ তার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভূমিকা করল। এইবার আসল বিষয়ে সে বলবে। বল শুভ্রা।

শুভ্রা বলতে শুরু করল, এবার আমার বক্তব্য বলতে গেলে ব্ল্যাক বোর্ড আর চক লাগবে।

ওসব এখন পাবো কোথায়? হরিদাসবাবু বললেন, তুমি তোমার ড্রইং খাতা আর রঙিন পেনসিল নিয়ে এস। যেখানে দরকার এঁকে বুঝিয়ে দেবে।

এক্ষুণি আনছি, শুভ্রা পড়ার ঘর থেকে ড্রইং খাতা পেনসিল নিয়ে এসে বান্ধবী শম্পার হাতে দিয়ে বলল, তুই ধর। যখন দরকার তখন আঁকবো।

শুভ্রা সকলের দিকে তাকিয়ে অনেকটা দিদিমণির ঢঙে বলতে আরম্ভ করল,

আমরা গাছ পুঁতলাম। গাছের শিকড় মাটির মধ্যে গেঁথে গিয়ে গাছকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে, এ ছাড়া শিকড় মাটি থেকে জল সংগ্রহ করে গাছের কাণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। কাণ্ড থেকে সেই জল পাতা এবং সবুজ রঙের জায়গায় উপস্থিত হয়।

জলের কেমিকেল ফরমুলা আমরা সকলেই জানি। লিখলে অনেকটা এইরকম হয়—

এই বলে শুভ্রা তার ড্রইং খাতায় লিখল H_2O।

এই জল ক্রমশঃ গাছের ওপর দিকে উঠতে লাগল। গাছ নিজের খাদ্য ও পুষ্টি নিজেই তৈরি করে নিতে পারে, সেইজন্যে ইংরিজীতে এদের বলা হয় অটোট্রপস (autotrophs)। তবে নিজের খাদ্য ও এনার্জি তৈরি করার জন্য সূর্যের কিরণ একান্তভাবে দরকার। সূর্যের তাপ গাছের ওপর পড়লে, বিশেষ করে পাতার ওপর পড়লে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। আমি আগে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি, তারপর টুকরো টুকরো করে কেমিকেল রি-অ্যাকশনগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব, কেন লিখেছি 'একটি গাছ ঃ একটি প্রাণ'।

এবার সকলে যে ছবিটা আমি আঁকছি, সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। আমার আঁকা ততো ভাল নয়, তবু আমার মনে হয় ব্যাপারটা

আপনাদের বোঝাতে পারবো।

শুভ্রা তার খাতায় ছবিটা আঁকল।

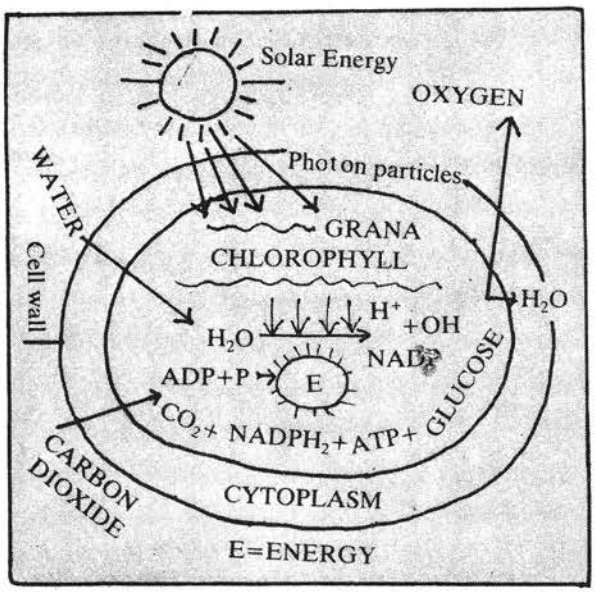

এই ছবিটা থেকে আমি বোঝাতে চেয়েছি বাতাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) থাকে, গাছের পাতার মধ্যে তা প্রবেশ করে। শুধু পাতা নয়, যেসব জায়গায় সবুজ রঙ থাকে সেইসব জায়গায় সূর্যকিরণের প্রভাবে ক্লোরোফিল নামক সবুজ রঙের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে Adenosine Triphosphate (ATP), Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADP) এবং NADPH ও Glucose প্রভৃতি পুষ্টি, খাদ্য, এনার্জি সৃষ্টি করে নেয়। যে CO_2 আমরা বাতাসে ছেড়ে বাতাসকে দূষিত করি, গাছ সেই CO_2-কে গ্রহণ করে নিজের কাজে লাগিয়ে বিশুদ্ধ Oxygen আবার বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। সহজ করে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া আঁকলে এই রকম হবে ঃ

বাইরে থেকে গাছ গ্রহণ করে	$6CO_2+6H_2O$ কার্বন + জল ডাই-অক্সাইড	Light energy → Chlorophyll গাছের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া	$C_6H_{12}O_6+6H_20+6O_2$ গ্লুকোজ + জল + অক্সিজেন বেরিয়ে যায় বাতাসে

যেহেতু এই প্রক্রিয়া সূর্যকিরণের মাধ্যমে হয়, তাই এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Photosynthesis।

অন্ধকারেও গাছের মধ্যে প্রতিক্রিয়া চলে সবটা বলার সময় এখন নেই, তাই সংক্ষেপে বলছি বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃশব্দে পাতার Stoma -র মধ্যে প্রবেশ করে, তারপর ক্লোরোপ্লাস্ট-এর মধ্যে ঢোকে। ক্লোরোপ্লাস্ট মেসোফিল কোষের মধ্যে অবস্থিত। কার্বন ডাই-অক্সাইডকে তক্ষুণি Ribulose diphosphate (RuDP) গ্রহণ করে, তারপর ছয় কার্বন কম্পাউন্ড এবং Phosphoglyceric Acid (PGA)-তে রূপান্তরিত হয়।

(১) $CO_2+RuDP \rightarrow 2PGA$
(1C) (5C) (2×3C)

(২) $6CO_2+6RuDP \rightarrow 12PGA$

ফসফোগ্লুকোরিক অ্যাসিড থেকে অ্যালডিহাইড হয়ে অন্ধকারের মধ্যেও নিজেদের এনার্জি তৈরি করে নেয়, আবার বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড কমিয়ে দেয় বা দূর করে দেয়।

তাহলে আমরা কি দেখছি? আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে পরিত্যাগ করি। কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসকে দূষিত করে। গাছ সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে নিজের খাদ্য ও পুষ্টি সৃষ্টি করে আবার অক্সিজেনকে বাতাসে বার করে দেয়। একটি গাছ যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে নিজের জীবন রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে বাতাসকে পরিশুদ্ধ করে একটি মানুষের জীবন বাঁচায়, কারণ মানুষ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না।

সেইজন্যেই আমরা লিখেছি 'একটি গাছ ঃ একটি প্রাণ'।

ব্রেভো! ব্রেভো! ডাক্তার সামন্ত হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, আজ ছোট ছোট মেয়েদের কাছে যে আবিষ্কারের কাহিনী শুনলাম, তা সত্যিই অপূর্ব। অনেক পাকা বৈজ্ঞানিকও এমন সুন্দরভাবে বোঝাতে পারবেন না। আমি শুধু আর একটু যোগ করব। গাছ অনেক বিষাক্ত জীবাণুকে হত্যা করে আমাদের জীবনকে আরও সুস্থ করে তোলে। বর্তমানে অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, তার সঙ্গে বনসম্পদ কমে যাওয়ায় মানুষের নানারকমের অদ্ভুত রোগ হচ্ছে, যা সাধারণ ওষুধে সারানো যাচ্ছে না এবং এই ধরনের রোগ নিয়ে চিকিৎসক মহল বিশেষভাবে চিন্তিত। তাই বলব শুভ্রার মতো প্রতি ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা যেন গাছ পোঁতে, তাতে পৃথিবী আবার নীরোগ হয়ে উঠবে।

মুখোপাধ্যায় • মান্না • দত্ত
উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান
(হায়ার সেকেণ্ডারী • জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স • সর্বভারতীয়
বায়োলজী পরীক্ষার্থীদের জন্য যুগোপযোগী গ্রন্থ)
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
(প্রশ্নোত্তরে)
সংসদের নমুনা প্রশ্ন ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসা
প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত নমুনা কপি না পেয়ে থাকলে
সরাসরি লিখুন
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

ফেরা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন পরে আমি আমার ছেলেবেলার জায়গায় ফিরে এলুম। আমি এখন দূর বিদেশে থাকি। কি করব? ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই তো যেতে হবে। কয়েকদিনের জন্যে এসেছি, মন ভীষণ টানল, তাই চলে এলুম। এখানে আমার আপনজন কেউ থাকে না। সবাই মারা গেছেন। আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, আমার দিদি। কেউ আর বেঁচে নেই। এক একটা পরিবার এইরকম থাকে, যে পরিবারের সবাই মারা যায়। তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই। একসঙ্গে এক জায়গায় বসে সব গল্প হবে, মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া হবে, ঠাকুরঘরে পুজোর ঘণ্টা বাজবে, রান্নাঘর থেকে ভাল গন্ধ ভেসে আসবে। এইসব সুখ তাদের কপালে লেখা নেই। আমি সেইরকম একজন মানুষ। মৃত্যু আমার জীবন থেকে সকলকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি একেবারে একা। আমার কিছুই নেই, আছে একগাদা গল্প। বাবার গল্প, মায়ের গল্প, আমার দিদির গল্প। লিখতে জানলে কত কি লেখা যেত!

ছেলেবেলার এই জায়গাটা গঙ্গার ধারে। সেই গঙ্গার ধারেই আমাদের স্কুল। খুব পুরনো স্কুল। স্কুলটা এখনো আছে; কিন্তু এ কী অবস্থা! বাড়িটায় কত দিন রং পড়েনি। এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সামনেই সেই দরোয়ানের ঘর। তালা বন্ধ। আমি যখন ছাত্র ছিলুম তখন এই ঘরে রামাধর থাকত আর থাকত তার ভাই কেশোরাম। দুজনেই ভীষণ ভাল ছিল। গরমকালে আমাদের মর্নিংস্কুল হতো। গেটের দু'দিকে দুটো চাঁপা গাছ ছিল। ভোরে তার কী সুগন্ধ! গাছ দুটো এখন আর নেই। রামাধর, কেশোরামেরও থাকার কথা নয়। তারাও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। গেটের পাশে রামাধর ছোলাকাবলি বিক্রি করত। বাবা রোজ আমাকে এক আনা পয়সা দিতেন। সেই এক আনায় ছোলাকাবলি হতো কাঁচা শালপাতায়। ঝালঝাল, পেঁয়াজটেঁয়াজ দেওয়া। স্বাদটা এখনো মুখে লেগে আছে। ছেলেবেলার খাওয়া তো ভোলা যায় না। এখন মর্নিংস্কুল নেই, রামাধর নেই, ছোলাকাবলি খাওয়ার ছেলেও নেই। যুগ পাল্টে গেছে। বড় শান্ত, রামভক্ত মানুষ ছিল রামাধর। কেশোরামের বয়েস কম ছিল। সে সবসময় হাসত। বন্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে তাদের কথা মনে পড়ে গেল। এই ঘরটায় এখন কেউ থাকে কি!

পাথর বাঁধানো ছোট্ট পথটুকু পেরিয়ে স্কুলের গাড়িবারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালুম। পরপর চারটে লম্বা চওড়া ধাপ। ভেঙেচুরে গেছে। অপরিষ্কার। কতদিন ঝাঁট পড়েনি। ডানপাশের দেয়ালে মার্বেল পাথরের ফলক। এই স্কুলের কৃতী ছাত্রদের নাম, পরবর্তী জীবনে যাঁরা গণ্যমান্য হয়েছেন। পঞ্চাশ সালের পর আর কারো নাম নেই। সেই ফলকটা পুরো পড়লুম। পড়ে ভেতরে ঢুকলুম। করিডর। দুপাশে বড় বড় ক্লাসরুম। খড়খড়ি পাল্লার দরজা। ভেঙেচুরে গেছে। ভেতরে সার সার বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ। ময়লা, ক্ষতবিক্ষত। জানলার ধারে ধারে কত বছরের আবর্জনার স্তূপ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লেগে গেল। মনে হলো ক্লাসরুম ছেলেতে ভরে গেছে। সেকেন্ড বেঞ্চের ধারে আমি বসে আছি। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছেন কুমুদবাবু। প্রথমে রোলকল করছেন। ওয়ান, টু। যেই সেভন বললেন, আমি অমনি দাঁড়িয়ে উঠে ইয়েস স্যার বলছি। বোর্ডে চক দিয়ে অঙ্ক লেখার খসখস শব্দ। টেবিলের ওপর ডাস্টার ঠোকার খটাস খটাস। একটা সরল কর লিখেছেন। এখনি আমার ডাক পড়বে—বোর্ডে আয়। অঙ্কটা কর। করতে পারলে দু'চোখ ভরা আনন্দ নিয়ে তাকাবেন। বলবেন, ভেরি গুড। না পারলে দু'চোখে জল—এই সামান্য অঙ্কটা পারলি না! লেখাপড়া একেবারেই করছিস না রে! তোদের ক'জনের ওপর আমার যে বড় আশা ছিল রে!

হঠাৎ চটকাটা ভেঙে গেল। কেউ কোথাও নেই। শূন্য, অপরিষ্কার ক্লাসরুম। ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ব্ল্যাকবোর্ডটা হেলে আছে। ছুটির আগে খড়ি দিয়ে কে লিখে গেছে—পার্থ পাঁঠা। আমরাও এই সব লিখতুম। আমার সহপাঠী কিশোর ভীষণ ভাল কার্টুন আঁকত, শুনেছি সে এখন

প্যারিসে আছে। মস্ত বড় চাকরি করে, ফরেন সার্ভিস। কে জানত কিশোর এত বড় হবে। প্রায় রোজই ক্লাসে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকত দুষ্টুমি করার অপরাধে। দুষ্টুমিতে কিশোরের মাথা খুব খেলত। মাস্টারমশাইরা মেজাজ ভাল থাকলে বলতেন—কিশোর এই মাথাটা যদি পড়ায় লাগাতে পারিস, তোকে আর আটকায় কে?

একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। কিশোরের ঠিক সামনে বসত সত্যেন। সত্যেনের স্বভাব ছিল শিক্ষকমশাই ক্লাস থেকে বেরলেই যে কোনো একটা প্রশ্ন নিয়ে, স্যার স্যার করে তাঁর পেছন পেছন যাওয়া। দেখাতে চাইত, সে কত উৎসাহী ভাল ছাত্র! কী ভীষণ তার জানার আগ্রহ! আমরা বলতুম, সত্যেনের একস্ট্রা কারিক্যুলার অ্যাকটিভিটি। সেদিন ইতিহাসের ক্লাস শেষ হলো। দ্বিজেনবাবু ক্লাস থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন, সত্যেন যথারীতি পেছনে ছুটেছে। তার প্যান্টের পেছনের বগলসে লম্বা একটা দড়ি বাঁধা, সেই দড়ির শেষে একটা খালি টিনের কৌটো। কৌটোটা ঢ্যাং ঢ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং শব্দে লাট খেতে খেতে চলেছে। যেন দমকল যাচ্ছে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হইহই করে হাসছে। দ্বিজেনবাবু পেছনে ওই শব্দ শুনে ভয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়চ্ছেন। কিশোর চিৎকার করছে, ফায়ার, ফায়ার। হেডমাস্টারমশাই হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছেন। সত্যেন তখনো বোঝেনি ব্যাপারটা কী। শব্দটা কেন হচ্ছে। ফায়ার, ফায়ার শুনেছে, দ্বিজেনবাবু প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছেন দেখেছে। এইবার সত্যেন নিজেই চিৎকার শুরু করল, আগুন, আগুন। সেই সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠছে, আর খালি টিনের কৌটো আরো শব্দ করছে। এইবার হেডমাস্টারমশাই সত্যেনের চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক পেটানি শুরু করলেন। সত্যেন তারস্বরে চিৎকার করছে, আর বলছে, 'আমি কি করেছি স্যার, আমাকে কেন মারছেন, আমি তো স্যারের কাছে সিপাই বিদ্রোহের ভেতরের কথাটা জানতে আসছিলুম।' 'লেজে কৌটো বেঁধে সিপাহি বিদ্রোহ! হনুমান। ছাগল।' আবার ধোলাই। রামাধর এসে সত্যেনকে বাঁচাল। পেছন থেকে দড়ি-কৌটো খুলে দিল। কিশোর তখন ভীষণ মনোযোগী ছাত্র! ব্যাকরণ খুলে শব্দরূপ পড়ছে। পরের ক্লাসেই নির্মলবাবুর বাংলা ব্যাকরণ।

সেই সত্যেন এখন কোথায়! শুনেছি কোনো এক বড় কলেজে লাইব্রেরিয়ান হয়েছে। সরকারী চাকরি। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম। সিঁড়ির সেই বাঁক, যে বাঁকে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টারমশাই সত্যেনকে পিটেছিলেন। মারটা খাওয়া উচিত ছিল কিশোরের। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে কিশোর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। আমি রাজসাক্ষী হলে কিশোরের সাজা হতো। সত্যেনের পাকামি চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ির ধাপ, হাতল আর আগের মতো নেই। সর্বত্র দৈন্য আর অবহেলার ছাপ। পঞ্চাশ বছর বয়েস বেড়েছে। জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। এত ছেলে তৈরি করেছে এই স্কুল, কেউ এই বৃদ্ধের সেবা করে না। সবাই সেই অর্থে কুপুত্র। দোতলার কোনো একটা ঘর থেকে টাইপরাইটারের শব্দ আসছে। দোতলায় লবিতে শিক্ষকমশাইদের বসার সেই বিশাল টেবলটা আছে। মেহগনি কাঠের। আমাদের সময় ঝকঝক করত। এখন একেবারে কালো ভূত। একগাদা চা-খাওয়া এঁটো ভাঁড় পড়ে আছে উল্টেপাল্টে। মনে হচ্ছিল, টেবিলটাকে পরিষ্কার করি। এক সময় দেশের কত নামকরা বিখ্যাত শিক্ষক এখানে বসে গেছেন। বড় বড় পণ্ডিত। যশ, খ্যাতি, পুরস্কার, সরকারী অনুগ্রহ, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেননি তাঁরা। তাঁরা শুধু জ্ঞান দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে ভাল ছাত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অতীতের সেই সব মহান শিক্ষকদের আমি দেখতে পাচ্ছি। ওই তো বসে আছেন, প্রাণধনবাবু, বঙ্কিমবাবু, নির্মলবাবু, অনিলবাবু, ডঃ কাঞ্জিলাল, পণ্ডিত ভুজঙ্গবাবু। সবাই যেন একসঙ্গে বসে আছেন। সুপণ্ডিত নলিনীবাবু গম্ভীর মুখে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে কিছু বলছেন। সবাই গভীর আগ্রহে শুনছেন।

শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বললেন, 'কী চাই? এখানে কি করছেন? স্কুলের এখন ছুটি।'

'পঞ্চাশ বছর আগে এই স্কুলে আমি প্রথম ভর্তি হয়েছিলুম; তখন কাঞ্জিলাল স্যার হেডমাস্টারমশাই ছিলেন।'

'ছিলেন ছিলেন। এখন আর তিনি এখানে থাকেন না।'

'সে আমি জানি। তিনি ভবপারে। আমি এখন বিদেশে থাকি। তিরিশ বছর পরে এসেছি, ভাবলুম পুরনো স্কুলটা একবার দেখে যাই। আপনি কী শিক্ষক?'

'না, আমি ক্লার্ক।'

'আমাদের সময় পাঁচুবাবু ছিলেন হেডক্লার্ক। ভারি সুন্দর মানুষ ছিলেন। দেশে তাঁর অনেক নারকেল গাছ ছিল। আমাদের পুজোর পর স্কুল খুললে খুব নারকেল নাড়ু খাওয়াতেন।'

'স্কুল দেখতে এসেছেন তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হাতে করে কিছু এনেছেন, সন্দেশটন্দেশ?'

'কই না তো!'

'কবে আক্কেল হবে? খালি হাতে গুরুজনের কাছে আসতে আছে? চা, কেক খাওয়ান।'

'কোথায় পাবো?'

'পয়সা ছাড়লেই পাওয়া যাবে। দশটা টাকা দিন।'

'সে আমি দিচ্ছি। দশ কেন পঞ্চাশ দিচ্ছি।'

'অত কাণ্ডেনি ভাল নয়, রয়েসয়ে খরচ করতে হয়। দিনকাল ব্যাড, ভেরি ভেরি ব্যাড।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'আমার নাম মোহন মিত্তির।'

মোহন মিত্তির একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'জগা।' বুলেটের মতো তিরিশ-বত্রিশ বছরের এক ছোকরা যে-ঘরে টাইপ হচ্ছিল সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মোহনবাবু বললেন, 'যাও, চা আর খাস্তা নিমকি বিস্কুট নিয়ে এস। স্বাস্থ্য অবহেলা কোরো না। সুযোগ পেলেই খাবে। ইনি আমাদের এক্স স্টুডেন্ট। কি নাম আপনার?'

'প্রশান্ত চ্যাটার্জি।'

'কি করেন?'

'আমি আমেরিকায় চাকরি করি।'

'এই স্কুলের ছেলে আমেরিকায়। তাজ্জব কি বাত!'

'কেন স্কুলটা খারাপ না কী? নিচের ওই মার্বেল ফলকের নামগুলো দেখেননি?'

'দেখবো না কেন? এ-দেশ হলো এক পিসের দেশ।'

'তার মানে?'

'মানে সব ওয়ান পিস। এক পিস রবীন্দ্রনাথ, এক পিস নজরুল, এক পিস শরৎচন্দ্র, নেতাজী সুভাষ। ভাঙিয়ে যদ্দিন চলে। এ-বছর

আমাদের রেজাল্ট জানেন? সেন্ট পারসেন্ট।'

'সেন্ট পারসেন্ট পাশ!'

'আজ্ঞে না। সেন্ট পারসেন্ট ফেল। পকেটে বিলিতি সিগারেট নেই?'

'আছে।'

'চেপে রেখেছেন কেন ভাই? মনটাকে কখনো সঙ্কীর্ণ করবেন না। ওই জন্যেই বাঙালি তলিয়ে যাচ্ছে।'

এক প্যাকেট মার্লব্রো ছিল পকেটে মোহন মিত্তিরকে দিতেই খুব খুশি। ঘরে গিয়ে বসেই সেই গানটা মনে পড়ল, ধূলায় ধূলায় ধূসর হব। এত ধুলো কল্পনা করা যায় না। পঞ্চাশ বছরের ধুলো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'মোহনবাবু মাঝেসাঝে ঝাড়াঝাড়ি করলে কেমন হয়।'

'খুব খারাপ হয়। ধুলো মানেই ইনফেকসান, জার্ম। যত ঝাড়বেন তত উড়বে। সাবধানে রেখে দিলে ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে মশাই অনেক বড় বড় জিনিস আছে সামান্য ধুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! বুঝেছি, বিদেশে থেকে আপনার বাতিক হয়েছে। এদেশে তো থাকতে পারবেন না। এখানে ধুলো, ধোঁয়া, কাদা, গর্ত, গু, গোবর এই সব নিয়েই তো থাকতে হবে।'

চা-বিস্কুট খাওয়া হলো। মোহন মিত্তিরকে বেশ লাগছে। মজার মানুষ। জগা ছেলেটিও ভাল। তবে রামাধর, কেশোরামের সঙ্গে তুলনা চলে না। তারা ছিল সাধু চরিত্রের মানুষ। অবশ্য সেই যুগটা ছিল—দেবতাদের যুগ। মোহনবাবুকে বললুম, 'একবার হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরটা দেখাবেন! আমার খুব প্রিয় ঘর ছিল।'

'সে আর এমন কথা কী! জগা ঘরটা খুলে দে।'

ঘরটা খোলামাত্রই বদ্ধ একটা বাতাস বেরিয়ে এল। শিক্ষার ডেডবডি থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। আলমারিগুলো আছে, বই একখানাও নেই। ডানদিকের আলমারিতে ছিল এনসাইক্লোপেডিয়ার সেট। লোপাট। মোহন মিত্তিরকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের সেই বিখ্যাত বড় চেয়ারটা কী হলো?

'মোহনবাবু, চেয়ারটা?'

'সেই সুন্দর বড় চেয়ারটা? সেটা মাস্টারমশাইরা মারামারি করে ভেঙে ফেলেছেন।'

'মাস্টারমশাইরা মারামারি!'

'ও আপনি তো বিদেশে থাকেন, জানবেন কি করে? স্কুলে যে এখন রাজনীতি ঢুকেছে। ডান আর বাঁ, দু'হাতে এখন তালি বাজছে। আর ছাত্ররা ধরে সানাইয়ের পোঁ।'

মোহন মিত্তির আবার টাইপরাইটারে বসে গেলেন আর জগা বসে গেল খাতা সেলাই করতে। সামনেই মনে হয় পরীক্ষা আসছে। আমি স্কুলের ছোট্ট খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালুম। কতকালের প্রাচীন সেই বিশাল মেহগনি গাছটা এখনো আছে। এই গাছের তলায় আমি আর কিশোর কতদিন বসেছি! গল্প হচ্ছে তো হচ্ছেই। নলিনীবাবু আমাদের ভূগোলের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কত দেশ, কত মানুষ, কত নদী, পাহাড়, সমুদ্র। আমরা কল্পনায় সেই সব জায়গায় চলে যেতুম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নেমে আসত। বিশাল উঁচু গাছ, মাথায় টিয়ার ঝাঁক।

গাছটার তলায় বসলুম। ভীষণ একা লাগল। কিশোর নেই, সত্যেন নেই, সন্তোষ নেই, তরুণ নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, দেখি তো আছে কি না! মেহগনি গাছের ওধারে যে ধারটা পাঁচিলের দিকে, সেই ধারে একবার দোলের আগের দিন আমি আর কিশোর ছুরি দিয়ে আমাদের নাম খোদাই করেছিলুম। সেই বছরটাই ছিল আমাদের শেষ বছর। দেখি তো সেই নাম দুটো আছে কি না! আশ্চর্য! নাম দুটো ঠিকই আছে—কিশোর প্রশান্ত। নাম দুটো পাশাপাশি, মানুষ দুটো কত দূরে! জীবনেও আর দেখা হবে না।

যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে এসে আর শেষ হয় না। জীবন নদীর মতো। সেই যে একবার চলতে বেরলো, আর ফেরার নাম নেই। সামনে, আরো সামনে। সমুদ্রে গিয়ে শেষ। হয়তো আর আমার দেশে ফেরা হবে না। পকেটে একটা ছুরি ছিল। বিদেশী ছুরি। বের করলুম সেটাকে। জানি পাগলামি, তবু সেই সেদিন যেমন খোদাই করেছিলুম, সেইভাবে ধরে ধরে লিখলুম—এসেছিলুম। কিশোর যদি কোনোদিন আসে, আর যদি মনে করে দেখে, তাহলে দেখবে আমি এসেছিলুম, মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আবার ফিরে গিয়েছিলুম আমাদের ছেলেবেলায়।

ছবি: রাহুল মজুমদার

আরে ধ্যুৎ! আরে ধ্যুৎ!

কৃষ্ণ ধর

লোডশেডিং-এ ঘটনাটা ঘটলো অদ্ভুত
গোবিনমামার চোখের সামনে
আস্ত একটা ভূত!
(আরে ধ্যুৎ! আরে ধ্যুৎ!)
শোনোই না গল্পটা তার
ঘটলো যা তা চমৎকার
বারান্দায় ঘোরে ফেরে কেটা?
নিশ্চয় হবে কোনো পেত্নির বেটা।
আসে যায় হাত নাড়ে, হঠাৎ সটকে পড়ে
সুরুৎ সুরুৎ?
(আরে ধ্যুৎ! আরে ধ্যুৎ!)

কী যে বলো আজগুবি
হাসি পায় শুনে খুবই
তবু বলা চাই তার গল্পটা ভূতের
যেন বা নামতা পড়ে ছয়ের সাতের।
এইসব কালো ছায়া বিতিকিচ্ছিরি
ভূতেরা নৃত্য করে কী বা তার ছিরি
ভূতের শরীর কেমন? নরম, লোমশ?
মুখটা দেখেছো তার কিংবা মুখোশ?
ক'টা হাত? ক'টা পা?
আছে নাকি রণপা?
নাকিসুরে কাঁদে, নাকি
বাজে জগঝম্পা?

বলো বলো সাফ কথা
ভূত নিয়ে মাথাব্যথা
হাসালে গোবিনমামার কাহিনী কিম্ভূত
ভূতেরাও শুনে হাসে
ছিল যারা আশেপাশে
হঠাৎ চমকে উঠে,
জ্বলেছে বিদ্যুৎ!
কোথা ভূত? কোথা ভূত?
(আরে ধ্যুৎ! আরে ধ্যুৎ!)

ছবি: সুফি

নবাবের হীরে

প্রফুল্ল রায়

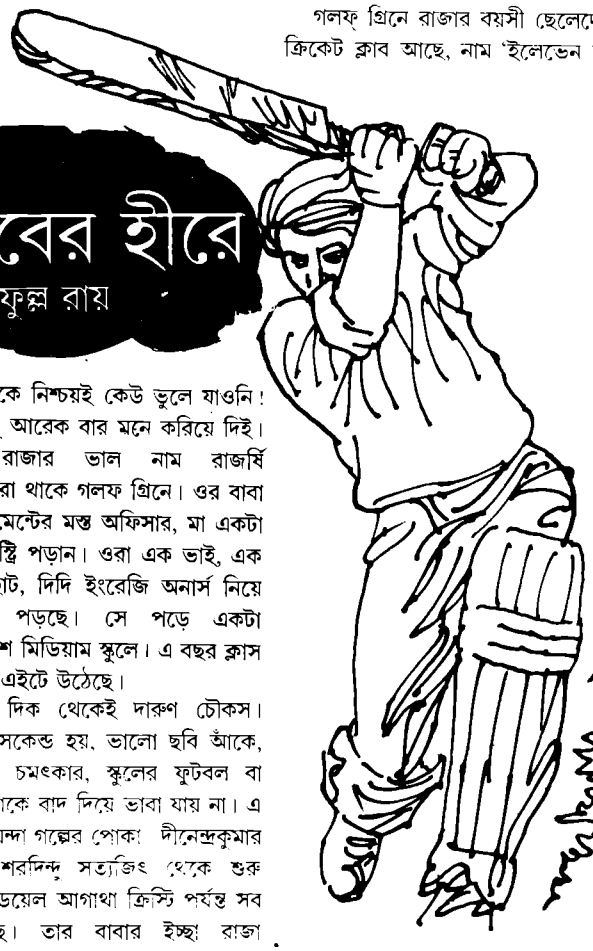

রাজাকে নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাওনি! তবু আরেক বার মনে করিয়ে দিই। রাজার ভাল নাম রাজর্ষি দত্তচৌধুরী। ওরা থাকে গলফ গ্রিনে। ওর বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মস্ত অফিসার, মা একটা কলেজে কেমিস্ট্রি পড়ান। ওরা এক ভাই, এক বোন। সে ছোট, দিদি ইংরেজি অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে। সে পড়ে একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। এ বছর ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠেছে।

রাজা সব দিক থেকেই দারুণ চৌকস। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়, ভালো ছবি আঁকে, গানের গলাও চমৎকার, স্কুলের ফুটবল বা ক্রিকেট টিম তাকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। এ ছাড়া সে গোয়েন্দা গল্পের পোকা। দীনেন্দ্রকুমার হেমেন্দ্রকুমার শরদিন্দু সত্যজিৎ থেকে শুরু করে কোনান ডয়েল আগাথা ক্রিস্টি পর্যন্ত সব গুলে খেয়েছে। তার বাবার ইচ্ছা রাজা ইঞ্জিনীয়ার হোক, মা চান ছেলে ডাক্তার হবে। রাজা নিজে চায় আরেকজন শার্লক হোমস হতে। মনে মনে এই জগদ্বিখ্যাত গোয়েন্দাটিকে সে প্রায় পুজোই করে। এ ব্যাপারে যিনি তাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়ে থাকেন তিনি প্রবীরকাকু। প্রবীরকাকু বাবার বন্ধু এবং লালবাজারের একজন ঝানু অফিসার।

এরই মধ্যে দু-তিনটে মারাত্মক খুনী আর ব্যাঙ্ক ডাকাতকে সে ধরে ফেলেছে, অবশ্য প্রবীরকাকুর সাহায্য নিয়ে! এ ব্যাপারে তার বেশ নামও হয়েছে। রাজার ছোট কাকা থাকেন আমেরিকায়। প্রতি বছর একবার তিনি দেশে আসেন, তখন সবাইকে দামী দামী উপহার দিয়ে যান। এবার তার জন্য এনেছিলেন একটা দারুণ শক্তিশালী টেপ রেকর্ডার। ন'ইঞ্চি লম্বা, চার ইঞ্চি চওড়া এই রেকর্ডারটা দিয়ে পঁচিশ তিরিশ গজ দূরের কোনও শব্দ পরিষ্কার ধরা যায়। এটা পাওয়ার পর নতুন একটা শখ তার মাথায় চেপেছে. পড়াটড়ার ফাঁকে সময় পেলেই নানা পশুপাখির গলার আওয়াজ রেকর্ড করে রাখছে।

গলফ্ গ্রিনে রাজার বয়সী ছেলেদের একটা ক্রিকেট ক্লাব আছে, নাম 'ইলেভেন বুলেটস'। মাঝে মাঝেই তারা নানা টুর্নামেন্টে তো খেলেই, তাছাড়া বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচও খেলে থাকে।

আজ লেকে নর্থ ক্যালকাটার 'শিবাজী সঙ্ঘ'-এর সঙ্গে তাদের সে রকম একটা ওয়ান-ডে ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। দুটো টিমই পঞ্চাশ ওভার করে ব্যাট করবে।

রাজা ন'টার মধ্যেই একটা বড় ব্যাগে ক্রিকেটের সাদা ধবধবে শার্ট ট্রাউজার মোজা স্পোর্টস-শু আর সেই টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে মাঠে চলে এসেছিল। লেকের যেদিকটায় খেলা হবে তার পাশেই প্রচুর গাছপালা, ঝোপঝাড়। এই শীতের সময়টা সেখানে সকাল থেকেই অগুনতি পাখি চলে আসে। রাজা ভেবে রেখেছে খেলা শুরুর আগে একটা ঘন ঝোপের ভেতর টেপ রেকর্ডারটা চালু করে লুকিয়ে রাখবে। খেলা শেষ হলে বাড়ি ফিরে রাত্তিরে রেকর্ড-করা পাখির ডাক শুনবে। সেই অনুযায়ী রেকর্ডারটা একটু দূরের একটা ঝোপে রেখে আসে রাজা।

একসময় খেলা শুরু হয়ে যায়। টসে হেরে যাওয়ায় প্রথমে তাদের ফিল্ডিং করতে হয়। ব্যাটসম্যান এবং বলের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে রাখতে প্রায়ই রাজার চোখ চলে যাচ্ছিল সেই ঝোপটার দিকে। কেননা তার চিন্তা ছিল, কেউ তাকে রেকর্ডারটা রাখতে দেখে থাকলে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু না, কাউকে ওধারে যেতে দেখা গেল না।

সাড়ে বারোটা পর্যন্ত খেলার পর লাঞ্চ। 'শিবাজী সঙ্ঘ' পঞ্চাশ ওভারে দু শ' দশ রান করেছে।

লাঞ্চের পর 'ইলেভেন বুলেটস'-এর ব্যাটিং। ওপেনিং করতে এল রাজা আর শুভাশিস। শুভাশিস গলফ গ্রিনে থাকলেও পড়ে অন্য স্কুলে।

'শিবাজী সঙ্ঘ' বেশ ভাল টিম। ব্যাটিং, ফিল্ডিং, বোলিং—সব দিক থেকেই ব্যালান্সড। কাজেই খুব সতর্কভাবে বলের ওপর চোখ রেখে খেলতে হচ্ছিল রাজাকে। তার আর শুভাশিসের ওপর তাদের টিম অনেকখানি ভরসা করে। যদি ফার্স্ট উইকেট পার্টনারশিপে ভাল রান পাওয়া যায়, ম্যাচটা জেতা যাবে। আর যদি রাজা কি শুভাশিস অল্প রানে পড়ে যায়, পরের দিকের ব্যাটসম্যানদের ওপর ভীষণ চাপ পড়বে।

ব্যাটিং করতে করতে রাজার চোখ চলে যাচ্ছিল ঝোপটার দিকে। হঠাৎ সে দেখতে পায় ঝোপটার গা ঘেঁষে দুটো লোক বসে আছে। কখন তারা ওখানে গেছে, আগে লক্ষ্য করেনি রাজা।

ওদের কী মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঝোপের দিকে নয়, মাঠের দিকে মুখ করে বসেছে এবং হাত-পা নেড়ে কি যেন আলোচনা করছে। এতদূর থেকে তার একটি শব্দও বোঝার উপায় নেই।

তবে লোকদুটোর চোখমুখ চেহারা মোটামুটি ভালোই দেখা যাচ্ছে। বয়স তিরিশ বত্রিশের বেশি হবে না। একজন বেশ ঢ্যাঙা, ফলে রোগাটে দেখায়। মুখময় খাপচা খাপচা দাড়ি। দু নম্বর লোকটা তুলনায় বেঁটে কিন্তু দারুণ স্বাস্থ্য। তার গায়ে যে প্রচণ্ড জোর সেটা তার শরীরের মজবুত কাঠামো দেখে টের পাওয়া যায়। দুটো লোকই চোয়াড়ে মার্কা।

বার বার ওদের দিকে চোখ চলে যাওয়ায় মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল রাজার। 'শিবাজী সঙ্ঘ'-এর দুই মিডিয়াম ফাস্ট বোলার দুর্দান্ত বল করছিল। বেশ কয়েক বার বলের লাইন আর লেংথ মিস করে ফেলে রাজা। উইকেটের আধ ইঞ্চি কি এক ইঞ্চি দূর দিয়ে সাঁ সাঁ করে বলগুলো বেরিয়ে যায়।

মাঠের ধারে বসে থাকা তাদের ক্লাবের সেক্রেটারি সমীরদা—সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফিজিক্সে ফোর্থ ইয়ার—চিৎকার করে বলতে থাকে, 'কী করছিস রাজা! বল দেখে খেল—'

গলফ গ্রিন থেকে রাজারই বয়সী এক দঙ্গল সাপোর্টার এসেছিল, তারা চেঁচাতে থাকে, 'ডোবাস না রাজা। আমাদের প্রেসটিজ তোর ওপর।'

হঠাৎ যেন ঝাঁকুনি লাগে রাজার। এবার সে খেলার দিকে মন দেয়। 'শিবাজী সঙ্ঘ'-এর কাছে হারাটা কোনো কাজের কথা নয়। প্রথমে বল দেখে দেখে সতর্কভাবে ব্যাটিং করতে থাকে সে, একটা দুটো করে খুচখাচ রান উঠতে থাকে। পাঁচ সাত ওভার এভাবে চলার পর চার আর ছয়ের বন্যা বইয়ে দিতে শুরু করে রাজা। তার ফুটওয়ার্ক চমৎকার। নিখুঁত কভার ড্রাইভ, স্কোয়ার কাট, সুইপ, বা পুল করে করে বল সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তার স্ট্রোকের এত জোর, মনে হয় সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে লাল বল বিদ্যুৎচমকের মতো ছুটে যায়।

কুড়ি ওভারে দলের স্কোর যখন একশ' আট, তার মধ্যে রাজার নিজস্ব রান সাতাত্তর, সেই সময় দু স্টেপ এগিয়ে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে টাইমিংটা ঠিক হয় না। বল ব্যাটের কানায় লেগে ক্যাচ উঠে যায়। একটা ফিল্ডার প্রায় কুড়ি গজের মতো দৌড়ে গিয়ে ক্যাচটা ধরে ফেলে। রাজা আউট। এক উইকেটে একশ'র ওপর রান ওঠায় টিম এখন নিশ্চিন্ত। হাতে ন'টা উইকেট রয়েছে। তেমন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে এই ম্যাচ তারা জিতছেই।

রাজা যতক্ষণ উইকেটে ছিল, ইনিংসের গোড়ার কয়েকটা ওভার বাদ দিলে ব্যাটিং ছাড়া অন্য কোনো দিকে তার মন ছিল না। ঝোপের পাশের সেই লোকদুটো শুরুতে তাকে কিছুটা অন্যমনস্ক করে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু পরে তাদের কথা আর খেয়াল ছিল না।

আউট হয়ে মাঠের বাইরে যেতে যেতে লোকদুটোকে আবার মনে পড়ে রাজার। তার চোখ ঝোপের দিকে চলে যায়। কিন্তু সেখানে লোক দুটো নেই। সে যখন চুটিয়ে ব্যাট করছে সেই সময় যে ওরা চলে গেছে, টের পাওয়া যায়নি। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে রাজার। তাহলে কি টেপ রেকর্ডার নিয়ে কোনো এক ফাঁকে তারা সটকান দিয়েছে?

রাজা শুধু ঝোপের দিকটাই না, চারপাশে যতদূর চোখ যায়, দেখতে থাকে। কিন্তু না, কোথাও নেই লোকদুটো।

মাঠের বাইরে যেখানে 'ইলেভেন বুলেটস'-এর অন্য সবাই বসে ছিল সেখানে চলে আসে রাজা। দুর্দান্ত ব্যাটিং-এর জন্য তাকে ঘিরে হইচই বাধিয়ে দেয়। কেউ বলে, 'আজ যা ব্যাট করেছিস না—ফ্যান্টাসটিক।' কেউ বলে, 'এক্সট্রা কভারে যে বাউন্ডারিটা মেরেছিস, ওরকম স্ট্রোক গাভাসকার ছাড়া ইন্ডিয়াতে আর কেউ করতে পারে না।'

এসব দিকে কান ছিল না রাজার। ঝোপের দিকে নজর রেখে আস্তে আস্তে হাতের ব্যাট নামিয়ে রেখে প্যাড খুলে বন্ধুদের পাশে বসে পড়ে।

পরের ব্যাটসম্যান বুবান মাঠে নেমে গেছে। ব্যাটিংয়ের যে একটা নিয়মকানুন আছে, সে তার ধার ধারে না। প্রথম বল থেকেই ইন্ডিয়ার এক সময়ের দুর্ধর্ষ ওপেনার মুস্তাক আলির মতো বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে যাচ্ছিল। এর দুটো দিক আছে। ঠিকমতো ব্যাটে-বলে হলে ঝড়ের গতিতে রান ওঠে, নইলে যে কোনো মুহূর্তে আউট হবার সম্ভাবনা। বুবান সেঞ্চুরিও করেছে, আবার কত বার যে গোল্লা করে আউট হয়েছে তার হিসেব নেই।

আজ কিন্তু বলগুলো তার ব্যাটের ঠিক মাঝখানে লাগছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বাউন্ডারি লাইনের বাইরে বন্দুকের গুলির মতো ছুটে যাচ্ছিল। ফলে বন্ধুদের চোখ এখন বুবানের দিকে। তারা আকাশের দিকে হাতের মুঠি ছুঁড়ে ছুঁড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'চালিয়ে যা বুবান, চালিয়ে যা। বাক আপ, বাক আপ—'

রাজা উঠে পড়ে। তার পর সোজা সেই ঝোপটার কাছে চলে আসে। না, টেপ রেকর্ডারের হদিস ওরা পায়নি, সেটা ঝোপের ভেতরেই আছে।

রাজার দুশ্চিন্তা কেটে যায়। টেপ রেকর্ডারটা বার করে সুইচ টিপে বন্ধ করে দেয়, তারপর বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে।

পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলতে হয়নি, দশ ওভার বাকি থাকতে থাকতেই 'ইলেভেন বুলেটস' ন' উইকেটে জিতে যায়। তারপর হই-হুল্লোড় করতে করতে রাজারা যখন গলফ গ্রিনে ফিরে আসে, সন্ধে নেমে গেছে।

কাঁধে কিট ব্যাগ ঝুলিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে ঢুকতেই রাজা দেখতে পায়, দিদি আর মা কলেজ থেকে ফিরে এসেছেন, আজ শনিবার, টিভিতে বাংলা ছবি চলছে। ড্রইংরুমে বসে ওঁরা তাই দেখছেন।

বাবার অফিস শনি আর রবিবার ছুটি থাকে। এই দু'দিন তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। বাবার তাস আর গলফের প্রচণ্ড নেশা। ছুটির দিনে সকালে উঠে হয় গলফ ক্লাবে, নইলে কোনও বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাস নিয়ে বসে পড়েন, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।

রাজার পড়াশোনা খেলাধুলো সম্পর্কে মা-বাবার প্রবল আগ্রহ। মা টিভি'র পর্দায় চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করেন, 'কি রে, আজ তোদের ম্যাচের কী রেজাল্ট হলো?'

রাজা বলে, 'ন উইকেটে জিতেছি মা।'

দিদিটা তার শত্রু। মুখটা সামান্য বাঁকিয়ে বলে, 'জিতেছে না, ছাই—'

রাজার মেজাজ গরম হয়ে যায়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'জিতেছি কিনা আমাদের সেক্রেটারি সমীরদাকে জিজ্ঞেস করে আয় বাঁদরী—'

মা দিদিকে একটু ধমক দিয়ে বলেন, 'আ রুণা, কেন ওকে রাগাচ্ছিস? হ্যাঁ রে রাজা, তুই কত রান করলি?'

রাজা কিছু বলার আগেই রুণা ফের বলে, 'কত আর করেছে—জেড ই আর ও।'

রাজা খেপে ওঠে, 'আমি জিরো করেছি! তুই জানিস—'

মা এবার দিদির ওপর রেগে যান। বলেন, 'তোর স্বভাবটা আর বদলালো না, সব সময় ভাইয়ের পেছনে লাগা!'

রুণা বলে, 'ও আমার পেছনে লাগে না? ছেলের দোষ তুমি দেখতে পাও না!'

মা বলেন, 'তোমরা দু'জনেই সমান। তবে এখন কিন্তু রাজা কিছু করেনি, অন্যায়টা তোমারই হয়েছে।' রাজার দিকে ফিরে বলেন, 'যা, তোর ঘরে গিয়ে জামা প্যান্ট বদলে নে। সুধাকে বলছি খাবার দিয়ে আসতে।' সুধা তাঁদের কাজের মেয়ে।

রাজা আর কিছু বলে না, চোখের আগুনে দিদিকে প্রায় ভস্ম করতে করতে নিজের ঘরের

দিকে পা বাড়ায়।

রুণা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মুখ কুঁচকে রাজাকে একবার দেখেই ফের টিভিতে সিনেমা দেখতে থাকে।

সারাদিন খেলার পর ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল, নইলে ওভাবে তাকানোর জন্য দিদিকে কিছুতেই ছাড়ত না রাজা।

ঘরে এসে ব্যাগটা একধারে রেখে হাত মুখ-টুখ ধুয়ে জামা-প্যান্ট পাল্টে প্রথমটা খাটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে রাজা। ড্রইংরুম থেকে ধুম-ধাড়াক্কা মিউজিকের সঙ্গে গানের সুর ভেসে আসছে। হিন্দি ছবির যাচ্ছেতাই নকল করে এখন বাংলা ফিল্মের গান পিকচারাইজেসন হয়। সেই রকমই কিছু একটা চলছে টিভিতে।

এখনকার বাংলা ছবি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই রাজার। এ সব রাবিশ তার একদম দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কেমিস্ট্রির ডক্টরেট মা আর ইংলিশ অনার্সের স্টুডেন্ট দিদিটা যে কী করে প্রতি সপ্তাহে এগুলো দেখে কে জানে।

একসময় সুধা বড় প্লেটে লুচি, তরকারি আর বড় এক গেলাস দুধ দিয়ে যায়।

খেয়েটেয়ে আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে রাজা। কাল রবিবার, তাই পড়ার খুব চাপ নেই। শনিবার সন্ধ্যেবেলাটা খুব একটা টেক্সট বইটই পড়ে না রাজা। ক্যাসেটে গান শুনে বা ক্রাইম স্টোরি পড়ে কাটিয়ে দেয়। সোমবারের ক্লাসের পড়াটা রবিবার সারাদিনে কমপ্লীট করে।

শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টেপ রেকর্ডারটার কথা মনে পড়ে যায়। আস্তে আস্তে উঠে বসে রাজা। কী কী পাখির ডাক রেকর্ড হলো সেটা শোনা দরকার। গলা শুনে সে চিনতে পারে কোনটা চড়ুই, কোনটা শালিক, কোনটা চন্দনা।

কিট ব্যাগ থেকে টেপ রেকর্ডার বার করে চালিয়ে দেয় রাজা। অচেনা কোনো পাখি নয়, শালিক আর চড়ুই-এর গলাই শুধু ভেসে আসছে।

হঠাৎ পাখির ডাক ছাপিয়ে একটা মোটা ভারী গলা শোনা যায়, 'হীরেটা চৌধুরীদের বাড়িতেই আছে, ঠিক জানিস নরেশ?'

এবার যে কণ্ঠস্বরটি টেপ রেকর্ডার থেকে উঠে আসে সেটা মোটামুটি স্বাভাবিক, তবে একটু খোনা মতো। এই গলার অধিকারী অর্থাৎ নরেশ বলে, 'সিওর। অপরেশ চৌধুরী একজিবিশনে ওদের হীরে দিয়েছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আসছে কাল রবিবার, ব্যাঙ্ক বন্ধ। আজ আঁর কাল সারাদিন হীরেটা চৌধুরীদের পার্ক অ্যাভেনিউর বাড়িতে থাকবে। পরশু ওরা ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসবে। বুঝলি সুখেন, এটা একেবারে পাক্কা খবর।'

সুখেন, মানে যার গলার স্বর মোটা, বলে, 'তা হলে মাঝখানে মোটে একটা দিন, তার মধ্যেই যা প্ল্যান করার করে ফেলতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

তারপর সুখেন বলে, 'শুনেছি হীরেটা নাকি নবাব আলীবর্দীর কাছ থেকে চৌধুরীরা পেয়েছিল।'

নরেশ বলে, 'আমিও তাই শুনেছি।'

'কি রকম দাম হবে মনে হচ্ছে?'

'ও জিনিসের কত দাম কেউ জানে না। তবে চৌরঙ্গীর এক জুয়েলার দয়ারাম মগনভাইয়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দশ লাখ পর্যন্ত সে দিতে রাজী।'

নরেশ বলে, 'ঐ টাকাটা পেলে সারাজীবন আমাদের আর কিছু করতে হবে না।'

সুখেন বলে, 'আমাদের গ্যাংয়ে আরো তিনজন আছে—ভল্টা, যতীন আর সুধীর। তাদের বখরা দিতে হবে না?'

নরেশ মুখে মুখে হিসেব কষে বলে, 'পাঁচ জনে দশ লাখ। তা হলে একেক জনের ভাগে পড়ল দু'লাখ করে। কম হলো গুরু?'

'কিন্তু—'

'কী?'

'পরশু চৌধুরীদের হীরেটা লকারে রেখে আসার কথা। কে রাখতে যাবে?'

'যা শুনছি, চৌধুরীরা তিন ভাই। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সেই অপরেশ চৌধুরী হীরে নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবে।'

'সঙ্গে আর্মড গার্ড থাকবে নিশ্চয়ই?'

'তা তো থাকবেই। ঠিক সেই সময় হীরেটা ছেনতাই করতে হবে।'

'দিনের বেলায় রাস্তায় প্রচুর গাড়ি-ফাড়ি, লোকজন থাকবে। থাকবে রাইফেল হাতে পাহারাদার। তার ভেতর ছেনতাই করা—'

'আরে বাবা, রিস্ক নিতেই হবে। দশ মিনিটের অপারেশনটা সাকসেসফুল হলে দশ লাখ টাকা! জান তো লড়াতেই হবে।'

ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ এবং পাখিদের একটানা কিচিরমিচির।

তারপর নরেশ বলে, 'হীরেটা ছেনতাইয়ের প্ল্যান করেছিস?'

'স্লাইট ভেবেছি। আজই যতীনদের নিয়ে বসে ব্যাপারটা পাক্কা করে ফেলতে হবে। এখান থেকে স্ট্রেট ধর্মতলার ঠেকে চলে যাব। ওখানে ওদের পাওয়া যাবে।'

'কী ভেবেছিস তাই শুনি।'

'চৌধুরীদের বাড়িটা ওল্ড বালিগঞ্জের পার্ক অ্যাভেনিউতে। তার সামনে বিরাট একটা পার্ক। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কের ডান পাশ ঘেঁষে ঘুরে বড় রাস্তায় আসতে হয়। এই রাস্তাতেই একটা ব্যাঙ্কে ওদের হীরেটা থাকে। অপরেশ চৌধুরী যখন গাড়িতে করে পার্কের ধারে আসবে...না থাক, আমার প্ল্যানে গলতি থাকতে পারে। সবাই মিলে বসে ঠিক করতে হবে। নে, বডি তোল—'

এরপর শুধুই পাখির চেঁচামেচি, মানুষের গলা আর পাওয়া যায় না।

টেপটা বন্ধ করে দেয় রাজা। এতক্ষণ সে যা শুনল তাতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে রাজার, তার সারা শরীরে শিহরন খেলে যায়। ঐ লোকদুটো এবং তাদের গ্যাংয়ের বাকি তিনজন যে ধরনের বেপরোয়া তাতে পরশু হীরে ছিনিয়ে নিতে গিয়ে নির্ঘাৎ খুন-টুন ঘটিয়ে বসবে। হীরে ডাকাতিটা যেভাবে হোক বন্ধ করতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? খাটে আধশোয়া হয়ে টেপ রেকর্ডারটা শুনছিল রাজা, এবার আস্তে আস্তে নিচে নামে, অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ প্রবীরকাকুর কথা মনে পড়ে যায় তার। তাঁকে একবার ফোন করা দরকার। রাজাদের টেলিফোনটা থাকে ড্রইংরুমের পাশের চওড়া প্যাসেজে, একটা উঁচু টুলের ওপর। পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে ফোনটা তুলে বোতাম টিপে টিপে লালবাজারে প্রবীরকাকুকে ধরে ফেলে। বলে, 'খুব সীরিয়াস ব্যাপার কাকু।'

প্রবীর হালকা গলায় বলেন, 'কী হয়েছে মাস্টার শার্লক হোমস?' রাজাকে ঐ নামেই ডাকেন তিনি।

'মন দিয়ে শুনুন—'

'শুনছি, তুমি বলে যাও।'

লেকে পাখির ডাক রেকর্ড করতে গিয়ে কী পাওয়া গেছে, সংক্ষেপে সবটা জানিয়ে দেয় রাজা।

প্রবীর বলেন, 'সত্যি খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। টেপ রেকর্ডারটা খুব ভাল করে শুনতে হবে।'

রাজা বলে, 'আমাদের এখানে চলে আসুন।'

'উঁহু। বৌদি আছেন না?'

রাজার মাকে বৌদি বলেন প্রবীর। ছেলে ডিটেকটিভ গল্প যত ইচ্ছা পড়ুক মায়ের আপত্তি নেই কিন্তু সে সত্যি সত্যি গোয়েন্দাগিরি করবে, ডাকাত বা খুনী ধরার মতো বিপজ্জনক ঘটনায়

জড়িয়ে পড়বে, তা একেবারেই চান না তিনি। তাই যেটুকু যা করতে হয় সবই প্রায় গোপনে। তবে শেষ পর্যন্ত মা কিন্তু জেনে ফেলেন। রাজা জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে টেপটা শুনবেন কী করে?'

প্রবীর বলে, 'এক কাজ কর, ঠিক আধঘণ্টা বাদে টিভি সেন্টারের মেইন গেটের সামনে এসে টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে ওয়েট করবে। আমি আসছি।'

রাজার ঘরে একটা চমৎকার ওয়াল ক্লক রয়েছে। এখন সেটায় ছ'টা বেজে চল্লিশ। ঠিক সাতটা পাঁচে টেপ রেকর্ডারটা খবরের কাগজে মুড়ে সে ড্রইংরুমে আসে। তাদের এখান থেকে টিভি সেন্টারের গেটে পৌঁছুতে মিনিট পাঁচেক লাগবে। এখনও ছবিটা চলছে। মা আর দিদি যাকে বলে তন্ময় হয়ে যাওয়া, ঠিক সেইভাবেই দেখছে। সন্ধ্যের পর মা কি বাবার পারমিশান না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ। রাজা বলে, 'মা, পালুর কাছ থেকে একটা বই নিয়ে আসছি।' পালু তার সঙ্গে এক স্কুলে এবং একই ক্লাসে পড়ে। পরে ধরা পড়তে না হয় তাই প্রবীরকাকুর সঙ্গে দেখা করে সে একবার পালুদের ফ্ল্যাট হয়ে আসবে।

টিভি'র ওপর চোখ রেখে মা বলেন, 'তাড়াতাড়ি আসবি।'

রাজার ভয় ছিল দিদিটা বেরুনোর ব্যাপারে বাগড়া দিতে পারে। কিন্তু টিভি'র ছবিটা এখন বোধ হয় দারুণ জমে উঠেছে, তাই অন্য তুচ্ছ বিষয়ে মন দেবার সময় নেই তার। রাজা বলে, 'হ্যাঁ মা, তাড়াতাড়িই আসব।' বলেই বেরিয়ে পড়ে।

টিভি সেন্টারের গেটের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ে প্রবীরকাকু একটা জীপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা জিজ্ঞেস করে, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

প্রবীর বলেন, 'এক মিনিটও হয়নি। জীপে বসেই টেপটা শোনা যাক। উঠে পড়।'

প্রবীরের সঙ্গে আর কেউ ছিল না; গাড়িটা তিনিই চালিয়ে এনেছেন। জীপে উঠে টেপ চালিয়ে দেয় রাজা। একবার না, দু-তিন বার সুখেন আর নরেশের কথাগুলো শোনেন প্রবীর। তারপর বলেন, 'এরা একটা ডেঞ্জারাস গ্যাং।'

রাজা জিজ্ঞেস করে, 'এদের কথা জানেন?'

'জানবো না? এদের কীর্তিকলাপের যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা দিয়ে দু'খানা মোটা খাতা বোঝাই হয়ে গেছে। এরা দামী দামী স্টোন, মানে হীরে, চুনী, পান্না—এই সব ডাকাতি করে। গ্যাংটার একজনকেও এখন পর্যন্ত আমরা চোখে দেখিনি, ধরা তো দূরের কথা। ভীষণ ধূর্ত। কখন কিভাবে ডাকাতি করবে, একেবারেই বোঝার উপায় নেই। তোমার টেপ রেকর্ডারটা কী হেল্প যে করেছে, ভাবতে পারবে না। এই প্রথম আমরা আগে থেকে জানতে পারলাম, ওরা কী করতে যাচ্ছে।' এক দমে কথাগুলো বলে যান প্রবীর, 'এই চান্সটা কিছুতেই ছাড়া চলবে না, যেভাবেই হোক গ্যাংটাকে এবার জালে ফেলতেই হবে।'

'কিভাবে?'

'সেটা এখনও ঠিক করতে পারিনি। তুমি কিছু ভেবেছ?'

'না। হাতে কিন্তু শুধু কালকের দিনটা আছে।'

'হুঁ। সেটাই তো সমস্যা। তুমি এখন বাড়ি যাও, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ ডাকাতগুলোকে ধরার মতো একটা প্ল্যান বার করতে পারো কিনা। আমিও সারারাত ভাবব। যদি কিছু তোমার মাথায় আসে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করবে।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা কাকু—'

'বল—'

'ওরা যে একজিবিশনের কথা বলছিল সেটা কী?'

'খবরের কাগজেই তো বেরিয়েছে। পড়নি?'

'না, মানে—'

প্রবীর এবার বুঝিয়ে দেন, গত সপ্তাহে কলকাতার জুয়েলার অর্থাৎ রত্নব্যবসায়ীরা একটা হীরের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সেখানে সারা দেশ থেকে ঐতিহাসিক সব হীরে পাঠানো হয়েছিল। এই হীরেগুলোর দাম শুনলে মাথা ঘুরে যায়।

রাজা জিজ্ঞেস করে, 'একজিবিশনে চৌধুরীরা যে হীরেটা পাঠিয়েছিলেন সেটা নাকি নবাব আলীবর্দী খান ওঁদের দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ওটা সম্পর্কে কাগজে একটা লেখা বেরিয়েছিল। চৌধুরীদের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন আরবি ভাষা এবং সাহিত্যের একজন মস্ত পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে নবাব আলীবর্দী ঐ হীরেটা এবং প্রচুর জমিজায়গা ওঁদের দেন। ঐ হীরেটা আসার পর চৌধুরী বংশের বিরাট উন্নতি হয়। নবাবের হীরেটাকে তাঁরা দেবতার মতো পুজো করে আসছেন।'

প্রবীর বলেন, 'ঠিক আছে, এবার তুমি বাড়ি যাও।'

রাজা জীপ থেকে নেমে পড়ে। প্রবীর চলে যান। পালুদের ফ্ল্যাট ঘুরে কিছুক্ষণ বাদে নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে আসে রাজা।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়েছিল রাজা। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। এপাশ ওপাশ করে উঠে পড়ে। একবার গিয়ে পড়ার টেবিলে বসে, আবার উঠে ঘরময় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে, তারপর ফের বিছানায় গিয়ে দুই হাত চোখের ওপর আড়াআড়ি করে রেখে শুয়ে পড়ে। আর তখনই বিদ্যুৎচমকের মতো একটা প্ল্যান তার মাথায় এসে যায়। এক্ষুণি প্রবীরকাকুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে রাজা বাইরে চলে আসে। মা-বাবা, দিদি বা কাজের মেয়ে সুধার ঘর বন্ধ। ওরা সবাই শুয়ে পড়েছে। খুব সন্তর্পণে প্লাগ খুলে টেলিফোনটা প্যাসেজ থেকে নিজের ঘরে এনে একটা পয়েন্টে লাগিয়ে দেয়। কেননা প্যাসেজের গা ঘেঁষেই মা-বাবার বেডরুম। ওখানে বসে কথা বললে ওঁরা শুনতে পাবেন। লালবাজারে প্রবীরের কোয়ার্টার। ফোনে তাঁকে ধরে নিজের প্ল্যানটার কথা বলে রাজা। প্রবীর প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, 'ফ্যানটাস্টিক। এতেই কাজ হবে। কাল সকালে থিয়েটার কি সিনেমার একজন মেক-আপ ম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারপর সোমবার 'অপারেশন নবাব আলীবর্দী ডায়মন্ড'।

'অপারেশনের সময় আমাকে সঙ্গে নেবেন তো?'

'না। এখনও তুমি ছোট, খুনী-ডাকাতেরা তোমাকে চিনে ফেলুক, এটা আমি চাই না।'

এর আগেও দু-দু'বার অপারেশনের সময় রাজাকে সঙ্গে নেননি প্রবীরকাকু। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় তার। তার মনের অবস্থাটা যেন বুঝতে পারেন প্রবীর। বলেন, 'তোমার প্ল্যান অনুযায়ী অপারেশনটা হবে। আসল ব্রেন তো তুমিই। আমরা শুধু কাজটা করে যাব।'

'ঠিক আছে।'

পরের দিনও পাঁচ ছ'বার প্রবীরের সঙ্গে ফোনে কথা হলো রাজার। প্রবীর প্রতিবারই জানালেন, সে যেমনটি বলেছে ঠিক সেইভাবেই কাজ এগুচ্ছে।

সোমবার স্কুলে গেল না রাজা। পেট খারাপ বলে বাড়িতেই থেকে গেল। আসলে প্রবীরকাকুর সঙ্গে কথা হয়েছে, অপারেশনটা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফোনে তিনি সব জানাবেন।

অপারেশনটা হবার কথা দশটা থেকে দুটোর মধ্যে, কেননা ঐ চারঘণ্টা সময় কাস্টমারদের জন্য ব্যাঙ্ক খোলা থাকে। সকাল থেকেই প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে রাজা। পড়তে বসেছিল—ভাল লাগল না। হেমন্তর গানের

ক্যাসেট চালাল, এক মিনিট চলতে না চলতেই বন্ধ করে দিল। এইভাবে দশটা, এগারোটা, বারোটা, একটা এবং শেষ পর্যন্ত দুটোও বেজে গেল। কিন্তু প্রবীরকাকুর ফোন আর আসে না।

পেট খারাপের কারণে মা সুধাদিকে মাগুর মাছের ঝোল করে দিতে বলেছেন। আর আছে ঘরে-পাতা দই। মাগুর মাছ আর দই দিয়ে ভাত খেয়ে টেলিফোনটাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকে রাজা। চারটে বেজে সতের মিনিটে প্রবীরকাকুর ফোন আসে। দারুণ খুশির গলায় তিনি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'দারুণ প্ল্যান দিয়েছিলে রাজা, অপারেশন সাকসেসফুল। এবার শোন তোমার ছক অনুযায়ী আমরা কী করেছি।'

তিনি যা বলেন তা এই রকম। গতকাল অর্থাৎ রবিবার সকালে প্রথমে তিনি ওল্ড বালিগঞ্জে গিয়ে অপরেশ চৌধুরীকে সুখেনদের হীরে ছেনতাইয়ের ব্যাপারটা জানান। শুনে অপরেশবাবু ভীষণ ভয় পেয়ে যান। বলেন, আজ তিনি হীরে নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাবেন না। তখন প্রবীর বলেন, তাঁর থাকার দরকার নেই। তবে অপরেশবাবুর মতো মেক-আপ নিয়ে তিনি ওঁদের গাড়িতে করে চৌধুরী পরিবারের বিশাল বাড়ি 'চৌধুরী ম্যানসন' থেকে বেরুবেন। যাতে হীরে-ডাকাতরা যেন মনে করে অপরেশবাবুই ব্যাঙ্কে যাচ্ছেন। প্রবীরকাকু তাঁকে সতর্ক করে দেন, এই বিষয়টা যেন জানাজানি না হয়, সম্পূর্ণ গোপন থাকে। তারপর তিনি লালবাজারের ক'জন এক্সপার্ট জুনিয়র অফিসারকে বেছে নেন। তাঁরা খুব সাধারণ পোশাকে চৌধুরীদের বাড়ির সামনের রাস্তায় এবং পার্কের ধারে অপেক্ষা করতে থাকবেন। তাঁদের সবার সঙ্গে অবশ্যই থাকবে একটা করে লোডেড রিভলবার। 'চৌধুরী ম্যানসন' থেকে অপরেশ চৌধুরীর ছদ্মবেশে গাড়িতে করে প্রবীরকাকু বেরিয়ে এলে সুখেনের গ্যাং যখন হামলা চালাবে, সেই সময় চারপাশ থেকে অফিসাররা তাদের ঘিরে ফেলবে।

আজ সকালে অপরেশ চৌধুরীর একখানা ফোটো নিয়ে মেক-আপ ম্যানের কাছে যান প্রবীরকাকু। মেক-আপ ম্যান তাঁর চেহারাটা এমনভাবে পালটে দেন যে কার সাধ্য বোঝে তিনি অপরেশ চৌধুরী নন!

মেক-আপ সেরে দশটার অনেক আগেই প্রবীর ওল্ড বালিগঞ্জে চলে যান। তারপর যেমন যেমন ঠিক করা ছিল তেমনটিই ঘটে। ফাঁদে পড়ার পর সুখেনরা পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তখন বেপরোয়া হয়ে তারা গুলি চালাতে শুরু করে, তাতে দু'জন অফিসার জখম হন। নিরুপায় হয়ে ফায়ার করতে হয়েছিল প্রবীরকাকুদেরও। তাতে সুখেনদের গ্যাংয়ের একজন মারা যায়। কথা শেষ করে প্রবীরকাকু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'থ্রি চিয়ার্স ফর—' তারপরই নিজেই বাকিটা পূরণ করে দেন, 'হিপ হিপ হুররে—'

এর ঠিক এক সপ্তাহ বাদে একদিন সন্ধ্যেবেলায় একটা ঢাউস প্লাস্টিকের ব্যাগে ক্যাথলিনের জিভে জল-আনা পঞ্চাশটা বড় বড় কেক, ফুলের মস্ত একটা তোড়া আর সুন্দর বাক্সে ছোট্ট একটা হীরের আংটি নিয়ে হাজির প্রবীরকাকু। বাবা, মা, এবং দিদি—তিনজনেই বাড়িতে ছিল। প্রবীরকাকু প্লাস্টিকের ব্যাগ ট্যাগ রাজাকে দিতে দিতে বলে, 'কেক আর ফুলের তোড়াটা আমার উপহার। আর এই আংটিটা পাঠিয়েছেন অপরেশবাবু, তাঁদের বংশের নবাবী হীরেটা ডাকাতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।'

রাজার বাবা খুব অবাক হয়ে বলেন, 'এ সব কী ব্যাপার প্রবীর?'

প্রবীর বলেন, 'পরে তোমাকে বলছি।'

রাজার মায়ের ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই রাজা খুনী-ডাকাতদের ব্যাপারে কিছু একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে! কোনদিন যে বিপদ হবে!'

প্রবীর প্রবলবেগে দু'হাত নাড়তে নাড়তে বলেন, 'না না বৌদি, ও সামনে গিয়ে কিচ্ছু করেনি। আমাকে শুধু একটা প্ল্যান করে দিয়েছিল, তাতেই কেল্লা ফতে।'

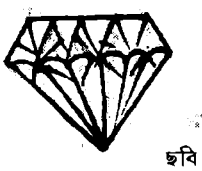

ছবি : সুফি

সেই সব হীরে মানিক

দিলীপ রায়

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর
কোথায় গেল তারা,
আমার মনের সঙ্গোপনে
জড়িয়ে আছে যারা?

কোথায় গেল রাজপুত্তুর
হুতুম-ভুতুম কই,
কোথায় আছে মন-কাড়া সব
গল্পো লেখা বই?

কোথায় আছে 'দুগ্‌গা', 'অপু'
'চাঁদের পাহাড়', 'ভোম্বল',
বড় হওয়া বুড়ো মনে
এই টুকুনি সম্বল।

শিউলি ঝরা শরৎকালে
আগমনীর গান,
আজ যে কেবল দূর অতীতে
মন করে আনচান।

গা ছমছম বর্ষা রাতে
ঘুমপাড়ানি গান,
আম-কাঁঠালের যুঁই বকুলের
জ্যৈষ্ঠ দিনের ঘ্রাণ।

হারিয়ে যাওয়া এমনি দিনের
স্মৃতির রেখায় আঁকা,
হীরে মানিক জ্বলে উঠে
হারিয়ে যায় সে কোথা!

ছবি : সুফি

ঋজুদার সঙ্গে রুদ্র, তিতির আর ভটকাই

বুদ্ধদেব গুহ

বাড়ি ফিরেই খেতে বসার পরই মা বললেন, নয়না এসেছিল। তোর জন্যে একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

আমার জন্যে?

অবাক হয়ে বললাম।

হ্যাঁ।

নয়না মাসী লিখেছে?

না। হাতে করে এনেছে নয়না। বলল তো যে, ঋজু দিয়েছে।

ঋজুদা?

কী ব্যাপার! কান ঘুরিয়ে নাক ধরল ঋজুদা। একটা ফোন করলেই তো পারত!

ফোন করবেটা কি করে? বাড়ির কত খবরই রাখো! সেই সে সকালে বলে বেরোও আর সারা দিন টো-টো কোম্পানী করে ফেরো তো সেই সন্ধ্যের পরে। বাড়ির ফোনটা যে গত রাত থেকেই খারাপ তার কি কোনো খোঁজ রাখো?

তাই?

আমি বললাম, মন্দবাক্য গায়ে না মেখে; বাঁ কনুই দিয়ে চিঠিটাকে চেপে ধরে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে খামের মুখটা খোলবার চেষ্টা করতে করতে। ডান হাতটা তো এঁটো হয়ে রয়েছে। অথচ ঋজুদার চিঠি বলে কতা! সেই মুহূর্তে না খুলতে পারলেই নয়।

মা বললেন, চিঠিটা রাখো। ভাল করে খাও আগে। তারপর ঘরে গিয়ে চিঠি পড়বে হাত ধুয়ে। ভাবখানা এমন যেন সিগনাল-কপ্ থেকে মেসেজ এসেছে!

এই শুরু হলো মায়ের। দাদু আর্মির লেফটেনান্ট কর্নেল ছিলেন বলে মায়ের কথাবার্তা, মানে টার্মিনোলজিতে আর্মির অনেক কথা শিশুকাল থেকেই ঢুকে গেছে। তবে সেই সব শব্দ এখন তামাদি হয়ে গেছে। এখন আর মটর সাইকেল ভটভটিয়ে মেসেঞ্জার টাইপ করা মেসেজ বা টেলিগ্রাম নিয়ে আসে না। এখন ইলেট্রনিকস্-এর যুগ। যুদ্ধ আর সেই মান্ধাতার আমলের ব্যাপার নেই।

বোতাম টেপাটেপির ব্যাপার হয়ে গেছে।

তবু আরও একবার অপচেষ্টা করলাম আমি কিন্তু মা এবার সত্যিই রেগে বললেন, দুপুরে টিফিনটাও তো নিজে একা খাও না। বন্ধু-বান্ধবদের দিয়ে কতটুকু খাও তা তুমিই জানো। রাতের খাবারটাও তো ভাল করে খাবে। ক্যাপসিকাম দিয়ে মুগের ডাল রেঁধেছে বীণা উপাদেয় করে।

আমার তখন সময় নষ্ট করার সময় ছিল না। বললাম, দারুণ হয়েছে। বোলো, বীণাদিকে। কোথায়?

পদ্মপুকুরে রথের মেলাতে গেছে বেলুন-চাকি কিনতে।

আমার বাবা ব্যারিস্টার বটেন তবে কোনো মক্কেল-টক্কেল উনি পছন্দ করেন না। এটাই স্বাভাবিক যে মক্কেলরাও বাবাকে পছন্দ করেন না। বাবা কোনো ব্যাপারেই কোনো কথা বলেন না। মনে হয়, লাইব্রেরী ঘরের আরেকটি টিকটিকি যেন। খাবার টেবলএও একটা বই হাতে করে এসে বসেন। আবারও বই হাতে উঠে যান। খাওয়া-টাওয়া, চান-করা এসব ব্যাপারে তাঁর একটুও পড়াশুনোতে ব্যাঘাত ঘটুক তা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। বাবা সাতেও থাকেন না পাঁচেও থাকেন না। এই আমার মস্ত সুবিধে। যে সব ছেলেমেয়ের মা এবং বাবা দুজনেরই নিজস্ব মতামত আছে তাদের স্বাধীনতাতে মেলাই বাধা পদে

পদে। মাকে কোনোমতে ম্যানেজ করলেই আমার হয়ে যায়।

ঘরে গিয়ে, চিঠিটা খুলতেই মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলাম প্রায়। ঋজুদা লিখেছেঃ সব উদ্দীপনা, রাত্রি-জাগরণ, প্রস্তুতির মাথায় জল ঢেলে দিয়ে।

রুদ্র,

কল্যাণীয়েষু,

আর সবাইকেই ফোনে খবর দেওয়া গেল। তোকেই শুধু পাওয়া গেল না ফোনে। নয়না এসেছিল বহুদিন পরে। তার হাতে তোকে চিঠি পাঠালাম। শুনলাম যে, সে তোর মায়ের কাছে যাচ্ছে।

কাল বিকেলে ছ'টা নাগাদ অবশ্যই আসিস। সংবাদ আছে।

ইতি—ঋজুদা

পুনশ্চঃ তোর পাঠানো ঋজুদা সমগ্র (প্রথম খণ্ড) পেয়েছি। তুই তো আমাকে 'বিখ্যাত' করে দিলি। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ঋজুদার যা ছবি এঁকেছে প্রচ্ছদে, দেখে মনে হচ্ছে; স্টুয়ার্ট গ্রাঞ্জার—পাইপ মুখে। তোরা অবশ্য ক্লিন্ট ইস্টউডকেই চিনিস। আমাদের সময়ে স্টুয়ার্ট গ্রাঞ্জার, গ্রেগরী পেক, ডেভিড নিভেন, অ্যান্থনি কুইনদের রবরবা ছিল। আমাদের সময়ের হিরোরাও খারাপ ছিল না খুব।—ঋ

চিঠি পড়ে তো রাতে ঘুম হবে বলে মনে হলো না। দু-একদিনের মধ্যেই আমরা ঋজুদার সঙ্গে চন্দনকাঠের চোরাকারবারী ভীরাপ্পানকে কব্জা করব বলে কোয়েম্বাটোরের দিকে প্লেনে করে উড়ে যাব ঠিক আছে। সেখান থেকে নীলগিরি পর্বতমালায়, কোল্লেগাল, কালাটি, সত্যমঙ্গলম, পেরিয়ার, মুদুমালাই ইত্যাদি কত সব অদেখা গা-ছমছম জঙ্গলে যাব—চাই কি, ভেবেছিলাম, পারলে একবার আজকালকার উঠোগামণ্ডলম্ বা আগেকার 'উটি' বা সাহেবদের 'উটাকামন্ড'—শৈল শহরও দেখে আসব ঠিক এমন সময় কী আবার 'সংবাদ' এলো। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ভীরাপ্পানের দলের সঙ্গে আমাদের।

ভটকাই বলছিল যে ওর বড় পিসের মেজ ভাই নাকি গেছিলেন উটিতে। চন্দনবনের গন্ধমাখা, কৃষ্ণর গায়ের রঙের মতো নীল নীলগিরি না কি দেখার জিনিস বটে। ভীরাপ্পান আগে যে দলে ছিল, জেভিয়ারের দল, তারা নাকি প্রায় পাঁচশ হাতিই মেরেছিল। আর ভীরাপ্পান যে কত কোটি টাকার চন্দনকাঠ কেটে পার করে দিয়েছে তার হিসেব নেই।

॥ ২ ॥

ঋজুদার বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দেখি তিতির আর ভটকাই আগেই গিয়ে পৌঁছেছে। ঋজুদা তার প্রিয় ইজিচেয়ারটাতে বসে পাইপ খাচ্ছে আর ওরা দুজন মুখ ব্যাজার করে বসে আছে।

গদাধরদা দরজা খুলতে খুলতেই বলল, পাঁপড় ভাইজতেচি গরম গরম—চায়ের সঙ্গে দেবো তোমাদের—আজ যে উল্টোরথ গো রুদ্দুর দাদাবাবু!

তাই?

অবাক গলায় বললাম আমি। আজকাল দক্ষিণ কলকাতায় রথ, উল্টোরথ, গাজন, পয়লা বৈশাখ, মহালয়া এসব কোনো কিছুই বোঝা যায় না এক ঋজুদার বাড়ি ছাড়া। আমরা বাঙালীরা যেন কেমন হয়ে গেলাম। অন্য প্রদেশীয়রা কিন্তু কেউই আমাদের মতো নয়। নিজেদের নিজস্বতা ছাড়া আর সব কিছু নিয়েই মেতে উঠেছি আমরা। মন্টুর দিদিমার শ্রাদ্ধের সময়ে একজনও তেমন ভাল কীর্তনীয়া পাওয়া গেল না—অথচ কীর্তন কী অসামান্য জিনিস!—তার তালের কী বৈচিত্র্য। সত্যি! আমরা একেবারেই যাচ্ছেতাই। ভটকাইটা ঠিকই বলে। বাঙালী জাতটা এখনও বেঁচে আছে আর বাঙালিয়ানার সব কিছু শত কষ্ট হলেও বাঁচিয়ে রেখেছে উত্তর কলকাতায়, হাওড়ায়, আর মফস্বলে। "কলকাতার, বিশেষ করে তোদের দক্ষিণ কলকাতার বাঙালীদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।" ভটকাই বলে।

বোধহয়, ঠিকই বলে।

ভটকাইএর মুখ থমথমে। এক ঝলক চেয়েই বুঝলাম যে লক্ষণ শুভ নয়। তিতির মনোযোগ দিয়ে নিজের হাতের নখ দেখছে মুখ নিচু করে। নিজের হাতের নখ কারো কাছেই এমন কিছু দ্রষ্টব্য নয়।

আমি কিছু বলার আগেই ঋজুদা বলল, বুঝলি রুদ্র! ভীরাপ্পানের খোঁজে এখুনি যাওয়া যাচ্ছে না। যাওয়া আদৌ হবে কিনা তারও কোনো স্থিরতা নেই।

কেন?

প্রথমতঃ, সম্ভবতঃ কর্ণাটক আর তামিলনাড়ুর পুলিশের আত্মসম্মানে লেগেছে। না লাগলেও কেউ খুঁচিয়ে ঘা করেছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের মানুষদের তেমনই অবস্থা। তাছাড়া, রোজই যা খবর বেরুচ্ছে বিভিন্ন খবরের কাগজে, ভীরাপ্পানকে ওরা বোধহয় কোণঠাসা করে ফেলেছে। এবারে হয় তাকে মরতে হবে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে, নয় আত্মহত্যা করতে হবে।

যে মানুষ নিজের তিন মাসের মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে সে যে মানসিকভাবে অসুস্থ সে কথাও তো বোঝাই যায়। তাছাড়া খুনখারাপিতেও তো তার কোনোরকম বিকার নেই।

তিতির বলল।

হ্যাঁ। প্রথমে মানুষটার উপরে আমার সমবেদনা ছিল—তার "রবিনহুড ইমেজের" জন্যে—গরীবদের সাহায্য করার জন্যে—কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে যে মানুষটা সম্ভবতঃ একজন সাইকোপ্যাথিক কিলার। তার প্রতি কারোরই সমর্থন থাকা উচিত নয়। তবুও বলব, ওর ইতিহাসের একেবারে গোড়াতে গিয়ে যদি কেউ পৌঁছতে পারে তো দেখা যাবে তাকে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন করে তুলেছে কোনো আপাতসম্ভ্রান্ত 'ভদ্রলোক বড়লোক', নয়তো কোনো অসৎ সরকারী কর্মচারী—সম্ভবতঃ বনবিভাগেরই। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের এই দোষ। আমরা ভীরাপ্পানদের মস্ত করে তুলে আসল অপরাধীদের কথা বেমালুম ভুলে যাই।

ওঁরা কি একেবারে 'না' করে দিয়েছেন আমাদের? ওখানে যেতেই মানা?

না। এখনও 'না' করেননি তবে যাওয়াটা পিছোতে বলেছেন!

কেন?

ওঁদের নানা "আভ্যন্তরীণ অসুবিধের" কারণে। "আভ্যন্তরীণ অসুবিধে" যে কি, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমার।

ঋজুদা বলল।

দুসস্।

এই যাওয়া না-যাওয়ার টানা-পোড়েনের মধ্যে হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে, দেখছি, আমাদেরও গদার খাঁদুদাদুর মতো হাইপারটেনসান হয়ে যাবে। তার চেয়ে যাওয়া হচ্ছে না ধরে নিয়ে চল ছাদে গিয়ে ঘুড়ি ওড়াই। দুজনে খামোখা এলাম পাড়া ছেড়ে।

ভটকাই বলল। আজ উল্টোরথ। পাড়াতে কী টেনসান! ভাট্টাদা ভার্সাস চীনেদার ঘুড়ির লড়াই হবে আজ। ভাট্টাদা ডিম আর কাচের গুঁড়ো দিয়ে যা মাঞ্জা দিয়েছে না! আর চীনেদারটা সিক্রেট। আরে

মেয়েরা পর্যন্ত বিকেল বিকেল সব গা ধুয়ে নিয়ে ছাতে ভিড়ি লাগিয়েছে। নাঃ—দিনটাই বেকার হলো।

ঋজুদা পাইপ মুখ থেকে সরিয়ে গদাধরদার মতো বলল,খপর্দার পাড়া তুলে কথা বলবি না ভটকাই। তারচেয়ে আজ উল্টোরথের দিন তোর আর রুদ্রর কবির লড়াই হোক।

এমন সময়ে গদাধরদা একগাদা মুচমুচে পাঁপড় ভাজা, গরম গরম কালচে কালচে ঘি-জবজব, কিশমিশএর ভিড় লাগানো কড়া করে ভেজে বানানো সুজির হালুয়া নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, চাও আনতেচি। দু হাতে কুলোলোনি।

তুমি কি দশরথ হতে চাও গদাধরদা? না মা দশভুজা?

ভটকাই বলল।

তিতির বলল, চলো, গদাধরদা আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

কেন? তুই কেন? তুই মেয়ে বলে? একদম না। গ্যাঁট হয়ে বসে থাক তুই তিতির। ওরা দুজন যাক। চাটা নিয়ে আসুক।

আ-হা-হা। তাড়াটা কিসের তোমাদের বলো দিকিনি।

গদাধরদা বলল। সবই তো আর একসঙ্গে গিলতেচো না! এগুলো তোমরা সাবড়াতে সাবড়াতে আমিই চা নে আসবখন! নাও, এবারে কথা বন্ধ করে খাও দিকিনি!

কবির লড়াই শুনতে চাইছি, তার কারণ কোল্লেগাল থেকে খবর খারাপ হলেও অন্য কোনো জায়গা থেকে নতুন একটি ভাল খবর এসেছে তোদের জন্যে।

তাই?

বলেই, ভটকাই এমন এক চিৎকার করে লাফ মারল যে গদাধরদার হাত থেকে অত বড় ট্রেটাই পড়ে যেত একটু হলে!

ঋজুদা হাসছিল।

তিতির বলল, কোথা থেকে?

আগে কবির লড়াইটা হোক তারপরে বলা যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণমাত্র কালক্ষেপ না করে লেজবিশিষ্ট হনুমানের মতো আরেক লাফে ঋজুদার সাধের পারসিক গালচেটার মধ্যিখানে পড়ে বলল,

"তবে শোনো শোনো জনগণমন,
শোনো তুমি গদাধরদানো"

কি বললে আমাকে?

গদাধরদা ফুঁসে উঠতেই হাতের ইশারাতে ঋজুদা তাকে থামিয়ে দিল।

ভটকাই চু-কিত্-কিত্ খেলার মতো লাফ মেরে মেরে আবার শুরু করল:

"তবে। শোনো শোনো জনগণমন
শোনো তুমি গদাধরও দানো
কথা ছেল। উষাকালে নীলগিরি যাব
স্বপ্ন মরিয়া গেল, কুটুরে ব্যারেই মতো
পরিবর্তে তার মোরা পাঁপভাজা খাব।"

পাঁপড়টা পাঁপভাজা হলো কি করে?

তিতির বলল।

আর্থপ্রয়োগ। কবিরা, কপিদেরই মতো ইম্প্রোভেটিভ! তাঁদের অনেকেই প্রেরোগেটিভ।

কী ফাজলামি হচ্ছে। থামলি কেন?

বাঃ। এবার তো রুদ্র বলবে। জবাব দেবে না?

ভটকাই বলল।

তাই তো! বল রুদ্র।

আমার ঠোঁটে যেন হিড়িম্বা রাক্ষসী ভর করল। আমিও তড়াক করে কাঁড়িয়া পীরেতের মতো চেয়ার ফুঁড়ে উঠে বললাম,

"ওরে ওরে গোরে গোরে উত্তুরে কলকেতি ভটকাই
হালুয়াতে পাঁপ মেখে আয় তোরে এইখনে চটকাই
মটকাই, ঝটকাই, পটকাই, টটকাই
কথা তো ছিলই যাওয়া হবে সদলেই, কোল্লেগালে
অপয়া চূড়ামণি তুই তো ভেঙে দিলি কপালে।"
"থাম! থাম! ওরে গাধা। যত বাধা,
জানিস যে তোরই অনাসৃষ্টি।
নইলে কি উল্টোরথে হয় না রে এক ফোঁটা বৃষ্টি?
ঋজুদার গল্পো লিখে করেছিস নাম, জানিস কি শেষ পরিণাম?
ঋজুদাই দেবে তোকে আড়ং-ধোলাই, তার পরে দেবে হরিনাম।'

এমন সময় ফোনটা বাজল।

ইয়েস!

ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, বলিয়ে বলিয়ে। পররনাম বিষেণদেওবাবু। আ পৌছা আপ? কব আইয়ে গা হামারা হিঁয়া? আজহি? নেহি। নেহি। কোই অসুয়িস্তা নেহি। মগর খনা হিঁয়াই খনা হোগা। হাঁ হাঁ আপকি চেলা রুদরবাবু হিঁয়াহি মজুদ হ্যায়। ঔর নয়া নয়া দো চেলা ভি আয়ে হুঁয়ে হেঁ। আইয়ে আইয়ে।

বিষেণদেও বাবু কে?

ভটকাই চোখ ভেটকে বলল।

'অ্যালবিনো' রহস্যর মুনিমানৌয়ার বিষেণদেওবাবু। দারুণ লোক। রুদ্রকে খুব পছন্দ করেন উনি। কত দামী হাতিয়ার দান করেছেন ওকে। তোদেরও পছন্দ করবেন।

এসেছেন কেন?

আমি বললাম। আবার কি কোনো খুন টুন? রহস্য?

ঋজুদা বলল, শনৈঃ শনৈঃ বৎস, শনৈঃ শনৈঃ। সময়ে জানতে পারবে। ধৈর্য ধরো। বিষেণদেওবাবু আসুনই আগে। তখনই জানবে সব রহস্যর কথা। তবে যে রহস্য ভেদ করা যাবে কি যাবে না তা বসদেও ভাই জানেন।

বলেই বলল, এই যে গদাধরদা, শুনলে তো? আর তুমি তো ওঁকে চেনোই। নাও। এই নাও আলমারীর চাবি। ভাল ভোজ খাওয়াতে হবে ওঁকে আর তোমার শত্রুরাও তো খাবে। গাড়ি বের করতে বলো হিম্মৎ সিংকে গারাজ থেকে। তাড়াতাড়ি যাও। যা যা আনবার নিয়ে এসো নিউ মার্কেট থেকে।

আচ্ছা। গদাধরদা বলল।

ছবি: রাহুল মজুমদার

পটলার বসন্তোৎসব

শক্তিপদ রাজগুরু

দোলের দিনটা এবছর পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব অর্থাৎ আমাদের পাঁচজনের খুবই দুর্দিন গেছে। গেছে তাও বলা যায় না, এখনও তার জের চলছে। আর এই ঘন তমসার কারণ ওই পটলা।

ওটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। অবশ্য ওই পটলচন্দ্রই আমাদের পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের সেক্রেটারী-কাম-ক্যাশিয়ার-কাম-কামধেনু। অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তাকে দোহন করা যায়। ক্লাবের যাবতীয় খরচখরচা, ফুটবল টিম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভ্রমণ ইত্যাদি দমকা খরচা ছাড়াও দৈনন্দিন খরচা যেমন গুপীর দোকানের চা টোস্ট ওমলেট, ভজুয়ার ঝালমুড়ি, গোকুলের আইসক্রিমের বিল সব ওই পটলাই মিটিয়ে দেয়। অবশ্য ওদের অনেক টাকা। বিশাল বাড়ি, বাবার বিরাট কারখানা, কাকার ব্যবসা, ঠাকমার বিরাট সম্পত্তি, কি নেই! তাই পটলাকে আমাদের দরকার।

তবে পটলার ওই এক দোষ। সব ভালো ওর, কিন্তু মাথায় মাঝে মাঝে উদ্ভট সব খেয়াল চাপে। আর তা মেটাতে গিয়ে নিজে তো বিপদে পড়বেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও বিপদে ফেলবে। এবার দোলের দিন ওর খেয়ালেই নেমে এল পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের ঘোর দুর্দিন।

কুলেপাড়া চ্যালেঞ্জ শীল্ড এই অঞ্চলের নামকরা শীল্ড। আই. এফ. এ. শীল্ডের পরই তার নাকি সাইজ। সেই দুর্লভ শীল্ড আমরা পরপর দুবছর কুলেপাড়া ইলেভন বুলেটসকে কলা দেখিয়ে জিতেছি। এবারও সেমি-ফাইনালে উঠে গেছি, ওদিক থেকে উঠেছে কুলেপাড়া ইলেভন বুলেটস। ফাইনালে আর একবার মুখোমুখি হবো আমরা দুটো টিম। আর এবারও শীল্ড জিতবো আমরাই তা কুলেপাড়াও জানে। এবার শীল্ড জিতলে ওই বিরাট শীল্ড পাকাপাকিভাবে এসে যাবে আমাদের হাতে। এ যেন আকাশের চাঁদ পাওয়া। তারই প্রস্তুতি চলেছে। ন্যাপাদার কোচিং-এ রোজ মাঠে নামছি আমরা। হোঁৎকা ব্যাকে, আমি পটলা ফরোয়ার্ড লাইনে, গোবর্ধন দশাসই চেহারা নিয়ে চায়না ওয়ালের অর্থাৎ দুর্ভেদ্য চীনের প্রাচীরের মতো গোল আটকে দাঁড়ায়। অন্যরা তো আছেই। আমাদের অন্যতম কর্মকর্তা ফটিক খেলাধূলা করে না। ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সে। মাঠে তার দলবল নিয়ে সাধা গলা পঞ্চমে তুলে আমাদের উৎসাহিত করে আর আমরা গোল দিলে মাঠে নেমে কখক নৃত্য পরিবেশন করে। এবার হ্যাটট্রিক করবো তাই ফটিকচন্দ্র মাঠে কোরাস নৃত্যগীত পরিবেশনের প্ল্যান করছে ঢোল সহকারে। কিন্তু বরাতে যে এমনি সর্বনাশ লেখা আছে তা ভাবিনি।

দোল এসে গেছে। বিভিন্ন ক্লাব ওইদিন উৎসব করে। আমরাও এতদিন ক্লাবের মাঠে ফটিকের পরিচালনায় পাড়ার খেঁদি, বুঁচি, ছিপলি, মস্তাদের নিয়ে বসন্তোৎসব করেছি। তা সেদিন পটলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গুপীর দোকানের গরম ফিশ্-কাটলেট আনিয়ে সামনে ধরে।

হোঁৎকা বলে, ফিশ্-কাটলেট! দুইখান দে।

গোবরার দেহটা গিরিগোবর্ধনের মিনি সংস্করণ। কিন্তু বুদ্ধিতে ঈষৎ কম। সে বলে, কাটলেট-এর সঙ্গে রুটিও দিতে বল পটলা। পেটের কোণে পড়ে থাকবে।

তাই এল। পটলা যেন আজ কল্পতরু হয়ে গেছে। যে যা চাইছে তাই দিচ্ছে।

পটলা সঙ্গে এনেছে তার মাসতুতো ভাই আকাশচন্দ্রকে। তার শরীরটা সিটকে লগার মতো, হাওয়ায় কাঁপে। কাঁধ ছাপিয়ে পড়েছে বাবরী চুল। পরনে কাজকরা গুরু পাঞ্জাবি-পায়জামা। বেশ শৌখিনই।

পটলা বলে, এবার দ-দ্-দোলে বসন্তোৎসব হবে নতুন আইডিয়ায়।

ফটিকই এসব করে। তবু জানাই, পটলা, এবার হ্যাটট্রিক করে শীল্ড ঘরে তুলতেই হবে। খরচা আছে অনেক। ব্যান্ড আনতে হবে। দোলে বেশি খরচা করিস না।

পটলা অভয় দেয়, খ-খরচার জন্য ন-নো ফিয়ার। আইডিয়াটা শোন।

হোঁৎকা বলে, খাওয়া হইব তো। বেশ কবজিভোর মাংস-টাংস?

হোঁৎকার নজর খালি খাবারের দিকে। পটলা বলে, হবে।

—তালে ক' তর আইডিয়াটাই শুনি।

পটলা অবশ্য এত কথা একসঙ্গে বলতে গেলে অনেক টাইম নেবে। কারণ জিবটা ওর প্রায় ব্রেক ফেল করে আলটাকরায় সেঁটে যায়। পটলার সেই মাসতুতো ভাই-ই বলে, কারণ আইডিয়াটা আসলে তারই।

আমরা শুনি। শ্রোতামাত্র। ফটিক গানটান নিয়ে থাকে। সে বলে, তা মন্দ হবে না। সকালেই প্রভাতফেরি একেবারে শান্তিনিকেতনী স্টাইলে ওই পবিত্র পোশাকে। শুধুমাত্র সংহতি, মিলনের গান গেয়ে পরিক্রমা। দারুণ হবে।

পটলা বলে, ত-তবে! আকাশদা কি যে সে। দেখবি ক্যামন হবে। এ-একারে নতুন।

ক'দিন ধরে পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব মেতে উঠেছে আগামী বসন্তোৎসবের প্ল্যান নিয়ে। পটলার ছোট কাকার প্রেসে ছাপা বাসন্তী রংয়ের হাজার কয়েক লিফলেট এরই মধ্যে বিতরণ করা হয়ে গেছে পাড়ার সর্বত্র।

ফটিক এখন আকাশদার সঙ্গে ক্লাবের ঘরে পাড়ার কিল্লিবিল্লিদের চকোলেট লজেন্স বিলিয়ে ডেকে এনে তারস্বরে গানের তালিম দিচ্ছে নৃত্য সহযোগে। ফটিক তবলা পিটছে আর আকাশদা ওর লগার মতো হাত-পা আকাশে ছুঁড়ে নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছে, 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে

বনে বনে'। ফাগুন নয়, যেন আগুনের শিখা লকলক করে নাচছে।

পটলা বলে, ব-বলিনি এবার নতুন করে প-পঞ্চপাণ্ডব ক-ক্লাব প্-পাড়ায় আগুন লাগাবে।

দোলের দিন সাতসকালে ক্লাবের মাঠে এসে গেছে ফটিকের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়া কিল্লিবিল্লিদের দল। সকলের পরনে বাসন্তী রংয়ের পোশাক।

পটলার দৌলতে আমাদেরও পরতে হয়েছে বাসন্তী রংয়ের পায়জামা-পাঞ্জাবি আর উড়ুনি। গোববার বিশাল দেহে পাঞ্জাবিটা টিংটিং করছে, পায়জামা উঠেছে হাঁটুর কাছে। হোঁৎকা বেঁটে গোলগাল, তার পাঞ্জাবিটা সেমিজ হয়ে গেছে। হাঁটু ছাড়িয়ে ঝুলছে। আকাশদা-ফটিকও ওই পোশাকে, একেবারে রংয়ের বাহার।

পটলার মুখে আজ খুশির চোটে বাক্য সরছে না। কেবল কয়েকটা স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণই বের হচ্ছে মাত্র।

হোঁৎকা আমাদের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। ওই বাসন্তী রংয়ের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই হুইশেল বাজিয়ে আগে আগে চলেছে সে। পেছনে আকাশদা আর ফটিক। কাঁধে জম্পেশ করে ঝোলানো হারমোনিয়াম। পিছনে গোবরা, আমি, পটলা, অন্যরা, তৎসহ ওই কিল্লিবিল্লির দল। তারস্বরে ফটিক গাইছে। আকাশদাও তার দীর্ঘ সিটকে হাত আকাশে তুলে গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করছে, 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'।

কোথায় ফাগুন, কোথায় বন আর কোথায় ঘিঞ্জি রাস্তা! রাসমণি বাজারের ওদিকে রাস্তার দুদিকে বুকভোর খোলা নর্দমায় কাদা থিকথিক করছে, দুপাশে দোকান, লালার আটাকল, ওদিকে ভুসির আড়ত, সামনে বাজার, তরকারির খোসা, শুকনো পাতা, কপির ডাঁটা, পচা বেগুন-টম্যাটোর স্তূপীকৃত আবর্জনা। এখানেই তবু বসন্তের সাড়া এনেছি আমরা ওই মনোরম সাজে আর বেসুরো চিৎকারে। পথের দুদিকে অটোমেটিক লোক জুটে গেছে। দেখছে ওরা ওই অবাক ব্যাপার।

পথে রং খেলছে অনেকেই। আজ দোলের দিন, রং তো খেলবেই। তবে আমরা আবীর ছড়াচ্ছি। রংয়ের ব্যাপার নেই।

হঠাৎ গলির মুখ থেকে কুলেপাড়ার দল খোল-করতাল মায় তাসাপার্টি নিয়ে ড্যাম কুড়ু কুড়ু বাদ্যি বাজিয়ে আর উন্মাদ নৃত্যে কলরব তুলে একদল পিশাচের মতো হা রে রে রে করে তেড়ে আসে। মুখে বাঁদুরে কালো রং। তারা তৈরি হয়েই এসেছে। বালতি থেকে ইয়া বোম্বা পিচকারিতে লাল খুনখারাবি রং ভরে কয়েকজন মিলে আক্রমণ করে আমাদের। নিমেষের মধ্যে হোঁৎকা, গোবরা, আকাশদা, পটলার রং বদলে করে দেয় একেবারে লাল টুকটুকে।

ওই অতর্কিত আক্রমণে আমরাও দিশাহারা। কিল্লির দল হাউমাউ চিৎকার করতে করতে নিমেষের মধ্যে ফরসা। পিছনে কোরাস গাইবার কেউ নেই। অবশ্য বনে বনে ফাগুন লাগার গানও তখন থেমে গেছে। প্রভাতফেরির দল ছত্রভঙ্গ। ফটিক হারমোনিয়াম বুকে করে সেঁধিয়েছে ভুসিমালের আড়তে। ছিটকে পড়েছে ভুসির গাদার উপর। মুখে গায়ে ভুসি মেখে দেখাচ্ছে একটা মর্কটের মতো।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের বাদবাকিরা পথেই রয়ে গেছি লাল আপেল সেজে। কুলেপাড়ার সভ্যরা 'কাজ সেরে' তৎক্ষণে পলাতক। ওরা আমাদের বনে বনে ফাগুন লাগানোর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে বিজয়ীর মতো পালিয়েছে। কিন্তু আমাদের কপালে যে আগুন লাগিয়ে গেছে সেটা তখনও বুঝিনি। যখন বুঝলাম তখন আর করার কিছুই নেই।

রংয়ের চোটে চোখ জ্বলছে। পথের দুদিকে কৌতূহলী জনতা বিনা খরচায় এমন মজা দেখে বেশ উপভোগ করছে। হঠাৎ কলরব করে ওঠে জনতা—ভাগো, ভাগো, পালা—পালা!

হোঁৎকা চোখ খোলামাত্র দেখে সামনে চার পা তুলে শিং উঁচিয়ে ধেয়ে আসছে রাসমণি বাজারের ভোলানাথ।

ভোলানাথকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে। ও এখানকার পার্মানেন্ট বাসিন্দা। বাজারের ওদিকে মন্দিরের চত্বরেই সে থাকে। আর বাজারের সবজি-আনাজপত্র, লালার দোকানের মুফৎ ভুসি, রেশনের দোকানে জোরজবরদস্তি চাল-গম সেঁটে নধর দেহ আর রাজকীয় মেজাজ নিয়ে ঘোরে।

ভোলানাথের সর্বাঙ্গে কুলেপাড়ার সভ্যরা বালতি কয়েক রং ঢেলে তার মেজাজ গরম করে দিয়েছে। সুখনিদ্রা ভেঙে গিয়ে সেও বের হয়েছে তার শত্রুদের সন্ধানে। এ হেন অবস্থায় সামনেই লালবর্ণ আমাদের ক'জনকে দেখে এবার হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে আসে।

প্রথমেই সে পেয়ে যায় হোঁৎকাকে। ওর বেঁটে গোলগাল দেহটা শূন্যে তুলে একপাক ঘুরিয়ে নিয়েই ছুঁড়ে দেয়। হোঁৎকা খবাৎ করে গিয়ে পড়ে ওদিকের নর্দমার ধারে দণ্ডায়মান লালাজীর নধর ভুঁড়ির উপর, তারপর রিবাউন্ড করে সোজা চলে আসে সবজিওয়ালার কুমড়োর টালে—টালমাটাল হয়ে গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। তখন গোবর্ধনকে দেখা যায় ভোলানাথের শিং-এ চক্কর খাচ্ছে। তারপরেই সে গিয়ে পড়ে খোলা নর্দমার খিঁচের মধ্যে।

পটলার জিবটা আলটাকরায় আটকে গেছে। ব-ব-ব—একটা বিজাতীয় শব্দ ওঠে। পটলা ভোলানাথের শিং-এ চড়ে মাত্তর হাফচক্কর খেয়ে ছিটকে পড়ে পিচরাস্তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে জিবটা খুলে গিয়ে বাকী শব্দটা বের হয়—বাপ রে।

আকাশ অবশ্য করিতকর্মা ছেলে, বেগতিক দেখে সে এর মধ্যে লম্বা পা ফেলে ভোলানাথের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তবু ভোলানাথ তার দিকে শিং চালাতে ওর ঢোলা পায়জামাটাই পেয়ে যায় আর একটানে সেটাকেই শিং-এ জড়িয়ে ফেলে। নেহাৎ আকাশদার পাঞ্জাবিটার ঝুল বেশি ছিল, তাই উইদাউট পায়জামাও পার পেয়ে যায়।

ডামাডোলের মধ্যে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি ভোলানাথের ঘাড়ে কি করে যেন অধিষ্ঠান হয়ে গেছি। কে বলে, বসে থাক। নড়বি না!

ষাঁড় নাকি মহাদেবের বাহন। কিন্তু মহাদেব কি করে ষাঁড়ের পিঠে বসে কৈলাস পাহাড় টপকে মুভমেন্ট করে জানা নেই। এক ঝটকায় ষণ্ডমহারাজ আমাকে ছিটকে ফেলতেই পথের পাশের পত্রহীন বটগাছের ডালটাই ধরার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। হাত ফসকে পড়ি কালভার্টের উপর। তারপর আর হুঁশ নেই কে কোথায় কিভাবে রইল।

জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে। দেখি পাশাপাশি বেড়ে পড়ে আছি পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের চার মূর্তি। ওনলি ফটকে সটকেছিল আর আকাশটাই ওনলি পাঞ্জাবি-পরা অবস্থায় কোনোমতে পটলার বাড়িতে গিয়ে বসন্তোৎসবের 'ফুল রিপোর্ট' দিয়েছিল। জনতা কোনো ঠ্যালাওয়ালাকে ধরে হাসপাতালে আমাদের জমা করেছিল।

হোঁৎকার বাঁ হাত ভেঙেছে, গোবরার গেছে ডান পা। আমার গোড়ালিতে চোট। পটলার সর্বাঙ্গ থেঁতলে গেছে পিচরাস্তায় পড়ে। ফলে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থেকে বের হয়ে এলাম। সেদিন দেখি পাড়ায় বিরাট প্রসেশন করে তিন দল ব্যান্ডপার্টি তাসাপার্টি নিয়ে কুলেপাড়া ইলেভন বুলেটস্ কুলেপাড়া শীল্ড জয়ের বিজয়-উৎসব করছে। পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব এবার সেমি-ফাইনাল থেকেই মাঠে অনুপস্থিত। তারা তখন হাসপাতালে।

পটলার আকাশদা নেই। বনে বনে ফাগুনের আগুন নয়, আমাদের বরাতেই নুড়ো জ্বেলে তিনি বিদায় নিয়েছেন। এখন পটলা বলে, মি-মি-মিসটেক হয়ে গেছল র‍্যা? কে-কে জানতো বসন্তোৎসব এ-এমনি হবে!

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

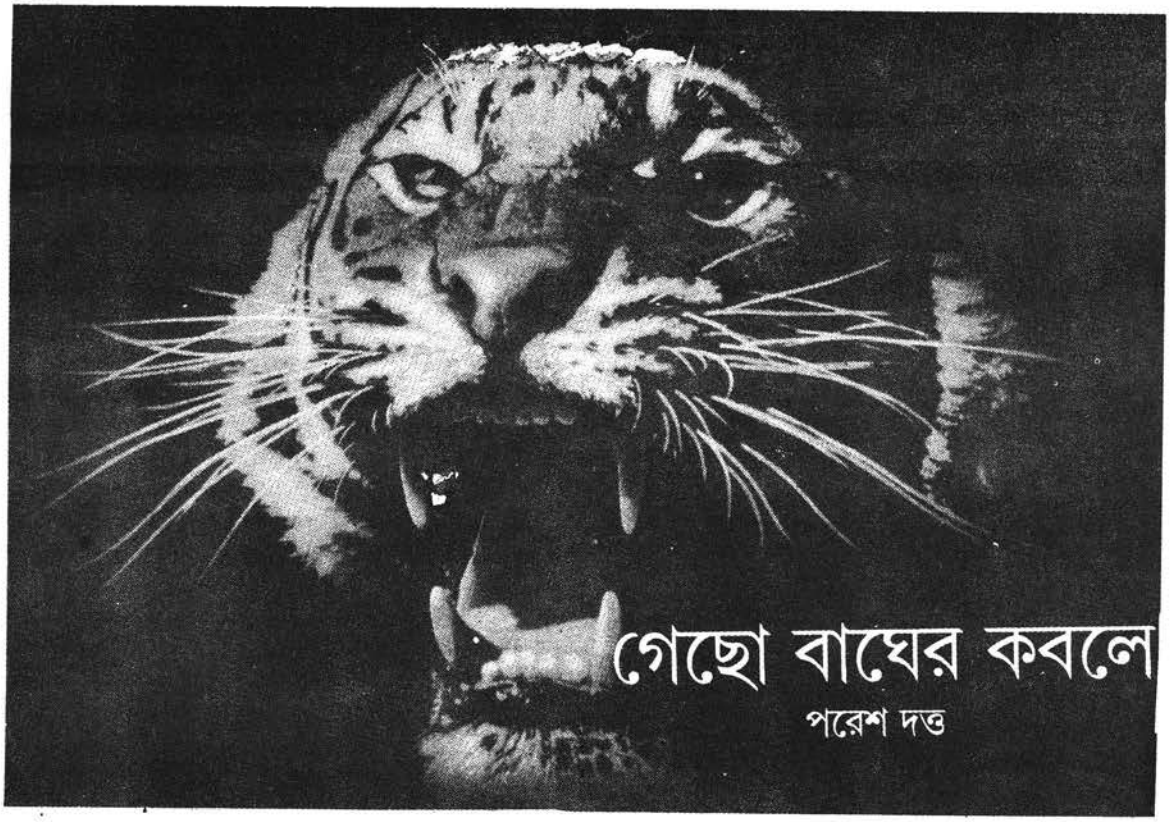

গেছো বাঘের কবলে

পরেশ দত্ত

একালে আমাদের দেশের রাজা, মহারাজা, বাদশারা পরবর্তীকালে বৃটিশরা শিকার অভিযানে বেরুতেন। গভীর জঙ্গলে গা-ছমছম-করা নিস্তব্ধ পরিবেশে যমদূতের মতো ভয়ংকরের মুখোমুখি হতেন। শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেরাই শিকার হতেন। জঙ্গল থেকে আর ঘরে ফেরা হতো না। আবার সামান্যর জন্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও আসতেন কেউ কেউ। হিমালয় অঞ্চলের জঙ্গলে তেমনই এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল বৃটিশ শিকারী ইভলিন স্মাইথিস ও তাঁর স্ত্রী অলিভ স্মাইথিসের জীবনে।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। তুষার-মুকুটপরা হিমালয়ের কোলে উত্তর ভারতের এক গভীর জঙ্গলে এসে পৌঁছলেন স্মাইথিস দম্পতি। চারিদিকে বোল্ডারের ছড়াছড়ি। বন্য বনস্পতির গায়ে জড়াজড়ি করে উঠেছে ঘন লতা। হাওয়ায় দুলছে অর্কিডের বিচিত্র বহুবর্ণ ফুলের স্তবক। এ জঙ্গলে প্রচুর সম্বর হরিণ আছে। মাংসাশী ডোরাকাটারা অতর্কিতে প্রায়ই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। লক্ষ্য ব্যর্থ হয় কদাচিৎ।

বাঘ শিকারের জন্য মিঃ স্মাইথিস যে জায়গাটি বেছেছিলেন দুটো শীর্ণ পাহাড়ী নদী সেখানে এসে মিশেছে। স্বচ্ছ নীলাভ জল উপল-শয্যার ওপর দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। স্মাইথিস খবর পেয়েছেন একটা বড় বাঘ ঘুরছে এই অঞ্চলে। এখানেই টোপ হিসেবে একটা মোষের ছানাকে বেঁধে রাখা হলো।

শিকারীরা জানেন বাঘ তার মড়ি নিয়ে গভীর জঙ্গলে সেঁধিয়ে যায়। সারাদিন শুয়ে বসে আরাম করে শিকার উদরস্থ করে। বিশ্রামের সময় বাঘকে শিকার করা সহজ। হাঁকাওয়ের সময় তাড়া খেয়ে বাঘ যেদিক দিয়ে সরে পড়তে চায় সেদিক থেকে হাঁকাওরা তাকে অন্যদিকে অর্থাৎ শিকারীর মাচানের দিকে তাড়িয়ে আনে।

স্মাইথিস দেখলেন, যে জায়গায় বাঘের লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা বেশি তার বাঁদিকে কিছুটা দূর দিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। নুড়িপাথর ভরা বেলাভূমি আর নদীখাত মিলিয়ে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। বাঘ ঐ খোলা জায়গা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে না। সুতরাং ঐদিকে স্টপার না রাখলেও চলে। ডানদিকে অরণ্যময় পাহাড়ী ঢাল। তার নিচে স্টপারদের একটা লাইন দরকার। যাতে বাঘ পাহাড়ে বা জঙ্গলে গা-ঢাকা দিতে না পারে।

পরদিন সকালে মিঃ স্মাইথিসের বাংলোয় খবর এলো বাঘ মোষের ছানাটাকে মেরে নিয়ে গেছে। মিঃ স্মাইথিস স্টপার, হাতি, রাইফেল নিয়ে তৈরি হলেন। এই শিকার অভিযানে তাঁর সঙ্গিনী হবেন তাঁর স্ত্রী অলিভ স্মাইথিস। তাই গাছের ওপর মাচানে ওঠার জন্য একটা দড়ির ব্যবস্থা করা হলো। মিসেস স্মাইথিস মাচানে বসে বাঘ শিকার দেখবেন। জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্যে তাঁর হাতেও একটা রাইফেল থাকবে।

মড়িটাকে বাঘ যেখানে নিয়ে রেখেছে তার থেকে সিকি মাইল দূরে সকলে হাতির পিঠ থেকে নামলেন। বাঘকে বিরক্ত না করে নিঃশব্দে সার দিয়ে পায়ে হেঁটে মাচানের দিকে এগিয়ে গেলেন। লোক পাঠিয়ে মাচান বাঁধার ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন। বরাতক্রমে বাঘ মড়িটাকে তার কাছাকাছিই এনে রেখে নিজে আরও একটু গভীরে গা-ঢাকা দিয়েছে।

বন্ধুর পথে হেঁটে মাচানের কাছে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন সকলেই গরম বোধ করছেন। কিছুটা ক্লান্ত। প্রথম মাচানটা মিঃ স্মাইথিসের। পেছনে চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে তাঁর স্ত্রীর মাচান। বাঘ জখম হয়ে পালাবার চেষ্টা করলে মিসেস চেষ্টা করবেন তাকে খতম করতে।

মিসেস স্মাইথিসের মাচান বাঁধা হয়েছিল যে গাছটায় তার গোড়ার বেড় চার থেকে পাঁচ ফুট। মাটি থেকে ফুট চোদ্দ উঁচুতে গাছের কাণ্ড যেখানে দু ফাঁক হয়েছে মাচানটা সেখানেই। গাছে হেলান দিয়ে মিসেস স্মাইথিস আরাম করে মাচানে বসলেন। পা দুটো ঝুলতে লাগলো মাচানের নিচে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে আরাম করে দুটি মাচানে বসার পর আরদালি স্টপারদের ঠিক জায়গায় দাঁড় করাতে গেল। ওরা হাঁকাও শুরু হবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিঃ স্মাইথিস মাচানে বসে ঘাসের ও আগাছার ওপর দিয়ে হাতির চলার শব্দ পেলেন। ঠিক তখনি একজন

স্টপার হাততালি দিল।

আ-উ-ফ্!...আ-উ-ফ্!! সঙ্গে সঙ্গে দুবার বাঘের গর্জন শোনা গেল। মাচানের ঠিক সামনে ঘন নারফুল ঘাস ২৫ ফুট গোলাকার জায়গা জুড়ে গজিয়ে উঠেছে। কয়েক মিনিট পর মিঃ স্মাইথিস ওই ঝোপের ভেতর দিয়ে বাঘের এগিয়ে আসার শব্দ পেলেন। তারপর আচমকা দেখতে পেলেন বাঘটাকে। বেশি নয়, মাত্র ২০/২৫ গজ দূরে। মিঃ স্মাইথিস রাইফেল চালালেন।

গুড়ুম...

রাইফেলের নলের মুখে আগুন ঝলসে উঠল। গুলির শব্দে জঙ্গল কেঁপে উঠলো। কিন্তু গুলি বাঘের গায়ে লাগলো না।

কিন্তু ও কি! মিসেস অলিভ স্মাইথিস সভয়ে দেখলেন গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে না পালিয়ে বাঘ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে আসছে নারফুল ঘাসের ঘন ঝোপের দিকে। ফের গুলি চালালেন মিঃ স্মাইথিস। গুলি এবারও বাঘের গায়ে লাগলো না। বাঘকে পুরোপুরি দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্য ভুল হলো। গুলির শব্দে বাঘ ঝোপের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। বাঘকে দেখা না গেলেও শিকারীর কাছাকাছি আড়ালে গরগর করতে লাগলো। ইতিমধ্যে হাতিরা ঘাসের ঝোপের কাছাকাছি এসে পড়াতে অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠলো।

বাঘ পালালো না। উল্টে দারুণ রেগে বারবার রক্ত হিমকরা গর্জন করতে লাগলো। বাঘের ডাকে থরথর করে কেঁপে উঠলো সমস্ত জঙ্গল। কিছুটা ঠাণ্ডা মেজাজের হাতিটাও বারবার চিৎকার করতে লাগলো। দুটো হাতিই তখন গাছপালা উপড়ে ফেলে বাঘটাকে খেদিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পর আরও ভয়ংকর গর্জন করে বাঘ হাতি দুটোর দিকে তেড়ে গেল। ভয় পেয়ে ছোট হাতিটা পালাবার চেষ্টা করলো। তবে মাহুত কোনোক্রমে তাকে থামালো, কিন্তু অন্য হাতিটা ও তার দুঃসাহসী মাহুত বাঘের দিকে তেড়ে গেল। বাঘটা ঘুরে মিঃ স্মাইথিসের মাচানের দিকে ঝড়ের মতো ছুটে এলো। মিঃ স্মাইথিস ফের গুলি চালালেন কিন্তু এবারও তাঁর নিশানা ভুল হলো।

গুলির শব্দে বাঘটা এবার মিসেস স্মাইথিসের মাচানের দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল। মিসেস স্মাইথিস বন্দুক চালালেন। গু-ড়ু-ম! বাঘটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। বুলেট তার শিরদাঁড়া ভেদ করে ছুটে গেছে। মিঃ স্মাইথিস তাঁর স্ত্রীকে আবার গুলি চালাতে বললেন। কিন্তু পরের গুলিটা বাঘের গায়েই লাগলো না। ওদিকে দ্বিতীয় গুলি চালাবার সময় রাইফেলের গর্জনে বাঘের নজর গেছে মাচানে মিসেস স্মাইথিসের দিকে। জখমী বাঘ রাগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর গর্জন করে উঠলো তারপর থাবা দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে প্রকাণ্ড শরীর নিয়েও বেড়ালের মতো গাছের ওপর উঠতে লাগলো।

হায় ভগবান! মিঃ স্মাইথিস আঁতকে উঠে স্ত্রীকে চিৎকার করে বললেন, অলিভ সাবধান! বাঘটা তোমার গাছে উঠছে।

মাচানে সবেগে স্ত্রীর দিকে পাশ ফেরার সময় তাড়াহুড়োয় মিঃ স্মাইথিসের শরীরের ধাক্কা লেগে সব কটা আলগা কার্তুজ মাচান থেকে নিচে পড়ে গেল।

স্ত্রীর গায়ে গুলি লাগার ঝুঁকি নিয়েও মিঃ স্মাইথিস বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। বাঘ তখন গাছের মাঝামাঝি অবধি উঠেছে। গুলিটা বাঘের গা ঘেঁষে ছুটে গেল। ফের রাইফেলে গুলি ভরতে গিয়ে মিঃ স্মাইথিস দেখলেন আর মাত্র একটা কার্তুজই তাঁর হাতে আছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রী মাচানের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বন্দুকের নল বাঘের মুখের ভেতর। ব্যারেলের ওপর বাঘের দাঁত বসে গেছে। বাঘের থাবা ও থুতনি মাচানের একটা দিক আঁকড়ে ধরেছে।

এই ভয়ংকর অবস্থায় মিসেস স্মাইথিস রাইফেলের ট্রিগার টিপলেন। কিন্তু রাইফেলের নল দিয়ে গুলি বেরুলো না। চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নিদারুণ ভয়ে শ্বাসরোধ হয়ে এলো অলিভের।

প্রকাণ্ড বাঘের বেশির ভাগ শরীরের ভার তখন মাচানের ওপর। শুধু পেছনের থাবা ছাড়া বাঘ তখন মাচানের নিচে ঝুলছে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে মাচানের ওপর ওঠার চেষ্টা করছে। ফলে মাচান ভয়ানক তোলপাড় হচ্ছে। মিঃ স্মাইথিস আতঙ্কের সঙ্গে দেখলেন তাঁর মিসেস টাল সামলাতে না পেরে বেসামাল হয়ে খোলা মাচানের পেছনের দিকে টলে পড়ে গেলেন।

বাঘটা বুঝতে পারেনি মিসেস স্মাইথিস মাচানের নিচে পড়ে গেছেন। সে তখনো থাবা ও দাঁত দিয়ে আঁচড়ে কামড়ে মাচানে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো। ধারালো দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে লাগলো মাচানের কাঠ।

মিঃ স্মাইথিসের রাইফেলে তখন একটি মাত্র কার্তুজ। বুলেট বাঘের গায়ে না লাগাতে পারলে বাঘের মুখ থেকে কেউ তাঁর স্ত্রীকে বাঁচাতে পারবে না। ভালভাবে লক্ষ্য স্থির করে রাইফেলের ট্রিগার টেনে দিলেন। এবার আর নিশানা ভুল হলো না। গুলি খাওয়া বাঘ মাচান থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেল। বড় বড় ঘাসের ভেতর তাকে আর দেখা গেল না। মিঃ স্মাইথিস ঠিক বুঝতে পারলেন না বাঘ মরেছে কিনা। স্ত্রীর কথা ভেবে তিনি তখন ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছেন। মাচানের পেছন দিকে পড়ে গেছেন তিনি। আর বাঘ অদৃশ্য হয়ে গেছে মাচানের উল্টোদিকের ঝোপে। হাতে আর একটাও কার্তুজ নেই। সুতরাং বাঘের মুখ থেকে স্ত্রীকে বাঁচানোর আর কোনো উপায়ও নেই। দারুণ আতঙ্কিত ও অসহায় অবস্থায় মিঃ স্মাইথিস অপেক্ষা করে রইলেন একটি আর্ত চিৎকার শোনার জন্য।

ওদিকে মিসেস স্মাইথিস যখন দেখলেন তিনি মাচানের পেছনে নিচের জঙ্গলের ভেতর গড়িয়ে পড়ছেন, তখন তিনি সভয়ে ভাবলেন বুঝিবা সোজাসুজি বাঘের ঘাড়েই পড়বেন। তারপর যখন বুঝতে পারলেন তিনি মাটিতে আছড়ে পড়েছেন তখনি উঠে পড়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগলেন বড় বড় ঘাসের ঝোপের ভেতর দিয়ে। প্রতি মুহূর্তেই ভয় এই বুঝি বাঘটা তাঁর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লো। সেই প্রকাণ্ড হাঁ আর রক্তমাখা দাঁত নিয়ে বাঘটা বুঝি তাড়া করে আসছে তাঁকে।

ছুটতে ছুটতে কখন যে মিসেস স্মাইথিস ঝোপজঙ্গলের বাইরে এসে পড়েছেন নিজেই বুঝতে পারেননি। মিঃ স্মাইথিস ঠিক তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিলেন মাহুতদের যাতে তারা হাতিদুটো নিয়ে এগিয়ে আসে। সেই সময় একেবারে আচমকা দুজনে মুখোমুখি। বিস্ময়ে দুজনেই হতবাক, কেউই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। চমক ভাঙবার পর মিঃ স্মাইথিস দেখলেন তাঁর স্ত্রীর আঘাত খুব সামান্য, কিন্তু আতঙ্কে তাঁর মুখের চেহারা যেন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে।

ততক্ষণে হাতি নিয়ে একজন মাহুত এসে পড়েছে। জখম হওয়া বাঘের কথা না জেনেই সে এগিয়ে এসেছে। মিসেস স্মাইথিসকে সেই হাতির পিঠে চড়িয়ে তাড়াতাড়ি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হলো। চোদ্দ ফুট উঁচু মাচান থেকে নিচে পড়েও দেহের কয়েক জায়গায় সামান্য কেটে ছড়ে যাওয়া ও কব্জি মচকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো আঘাত লাগেনি তাঁর।

একটা গাছের ষাট ফুট ওপর থেকে সমস্ত ঘটনা দেখছিল একজন ব্যাকস্টপ। সে চিৎকার করে জানাল, গুলি খাওয়া বাঘ জঙ্গলের ভেতর পড়ে রয়েছে স্থির হয়ে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মরেছে ওটা।

হারিয়ে যাচ্ছে যারা

একটা সময় ছিল যখন এই মারিকুই বা ব্লন্ড স্পাইডার বানরেরা গাছের ডালে ডালে দোল খেয়ে ব্রাজিলের জঙ্গল [illegible] ৪ লক্ষ বর্গমাইল ছাড়া [illegible] দুই জীবের সেই বিশাল [illegible] ঠিক আরও কত বিচিত্র জীবজন্তু [illegible] ১৬টি প্রজাতি একান্তভাবে [illegible] নিজস্ব সম্পদ। আজ সেই [illegible] ছোট খেকে বড় মাত্র ৮ হাজার বর্গমাইলে এসে বাঁচিয়েছে। আর আর একান্ত আপন ১৬টি প্রজাতির জীবের মধ্যে ১২টি প্রজাতিই হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাচ্ছে বড়সড় চেহারার এই মারিকুই বানরেরা। হারিয়ে যাচ্ছে কাঠবিড়ালী কাঠবিড়ালী চেহারার ছোট্ট সুন্দর গোল্ডেন লায়ন ট্যামারিন, ব্রাজিলিয়ান মারমোসেট, হারিয়ে যাচ্ছে তিন আঙুলে স্লথরা। তিন-চার লক্ষ থেকে কমে এদের এক একটা জাতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫০ থেকে ৬০০। ঠিক এইভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে জায়ান্ট পাণ্ডা, কালো গণ্ডার, কালো ভালুক, ব্যাকট্রিয়ান উট, সবুজ কচ্ছপ, ছোট থাবাওয়ালা ভোঁদড় আর কালো চিতারা। এদের বাঁচাতে হলে সবার আগে দরকার বনজঙ্গল বাঁচানো। বনের সবুজ বাঁচলে তবেই বাঁচবে এই সবুজ রাজ্যের বাসিন্দারা।

ব্রাজিলিয়ান মারমোসেট

গোল্ডেন লায়ন ট্যামারিন

বাহাদুর বেড়াল

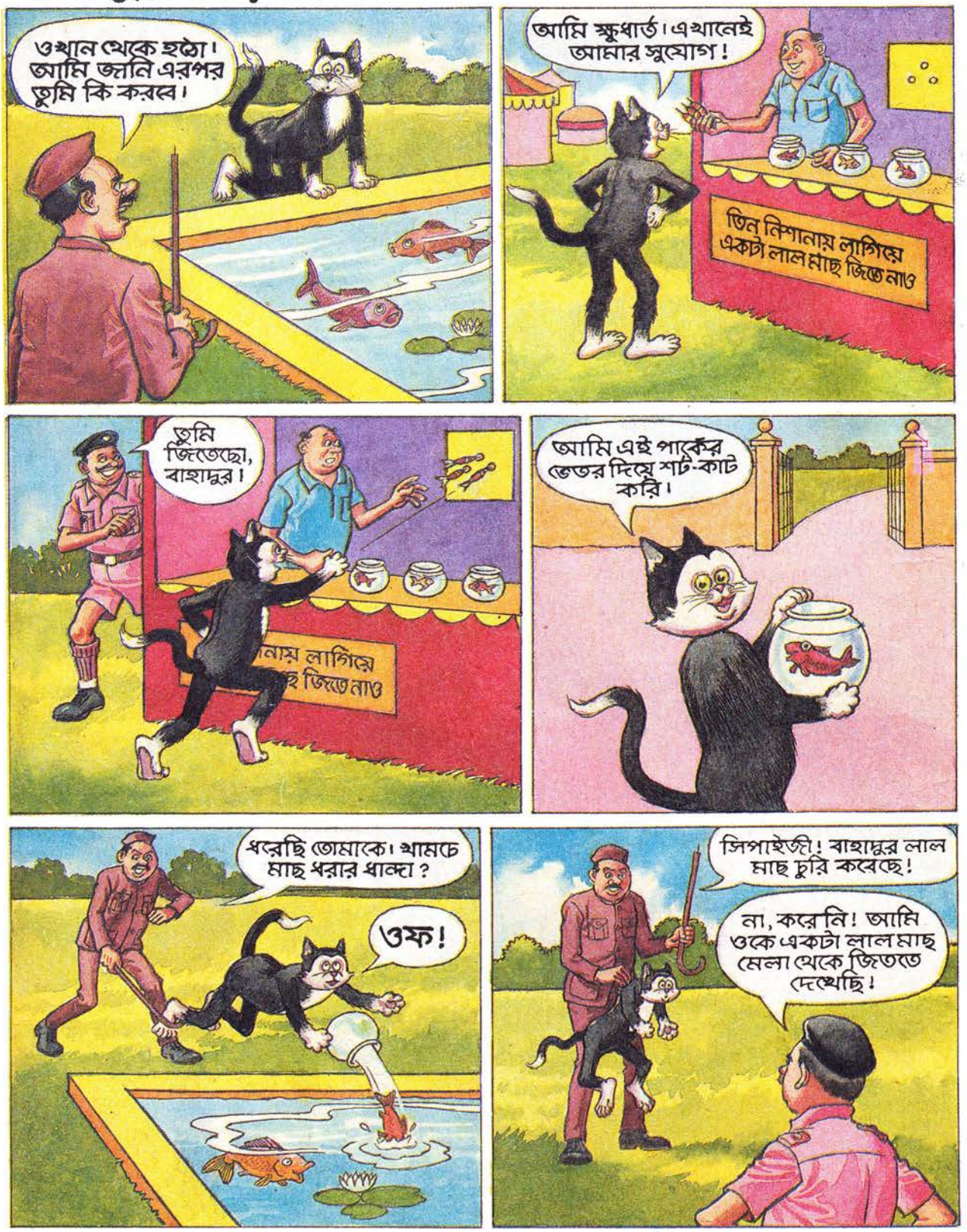
ওখান থেকে হট্টা! আমি জানি এরপর তুমি কি করবে।
আমি ক্ষুধার্ত। এখানেই আমার সুযোগ!
জিন নিশানায় লাগিয়ে একটা লাল মাছ জিতে নাও
তুমি জিতেছো, বাহাদুর!
আমি এই পার্কের ভেতর দিয়ে শর্ট-কাট করি।
ধরেছি তোমাকে। খামচে মাছ ধরার ধান্দা?
ওফ!
সিপাইজী! বাহাদুর লাল মাছ চুরি করেছে!
না, করে নি! আমি ওকে একটা লাল মাছ মেলা থেকে জিততে দেখেছি!

ঠিক আছে। তাহলে তুমি তোমার মাছ ধরে নাও।
বাহাদুরকে খুবই বিশ্বাস করতে পারেন।
কাল আবার আমাকে আসতে হবে। আমার মাছটা আমি খুঁজে পাই নি।
অ্যাঃ!

কালিন্দী অভিযান

তপনকুমার দাস

আমরা তখন সতেরো হাজার ফুটেরও বেশি ওপরে। কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। অত উঁচুতে থাকার জন্য নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া পুরো জায়গাটা ছোট বড় পাথরে ভরা। ম্যাট্রেসের নিচে ছোট-বড় পাথর থাকায় স্বচ্ছন্দে শোয়ার উপায় ছিল না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। রাত্তিরে ধরতে গেলে ঘুমোতেই পারিনি। সকাল থেকে শরীরটা তাই ম্যাজম্যাজ করছে।

কাল সকাল ৮টা নাগাদ আমরা যখন হাঁটতে শুরু করেছিলাম, আকাশ তখন হালকা মেঘে ভরা। ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে খুব সাবধানে আমরা ওপরে উঠছিলাম। পাথরের ওপর পা পড়লেই হড়হড় করে গড়িয়ে যেতে পারি। তাহলে কোথায় কত হাজার ফুট নিচে গিয়ে যে পড়ব তার ঠিক ঠিকানা নেই। আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো এখানে ওখানে বড় বড় গর্ত হাঁ করে আছে। ইংরিজিতে একে 'ক্রিভাস' বলে। এর তল খুঁজে পাওয়া যায় না। পড়লে সোজা হাজার হাজার ফুট নিচে। জুলাই আগস্ট মাসের এই সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় পুরো অঞ্চলটা বরফে ঢাকা থাকে। তখন ক্রিভাসগুলোর মুখ বরফে এমনভাবে ঢাকা থাকে যে বোঝাই যায় না ওইগুলো মরণ ফাঁদ। তাই এই সময়টুকু ছাড়া কালিন্দী পাস কেউ অতিক্রম করতে সাহস করে না।

একটু হাঁটলেই হাঁফ ধরে যাচ্ছে, ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে পড়ার মতন হচ্ছে। আমরা

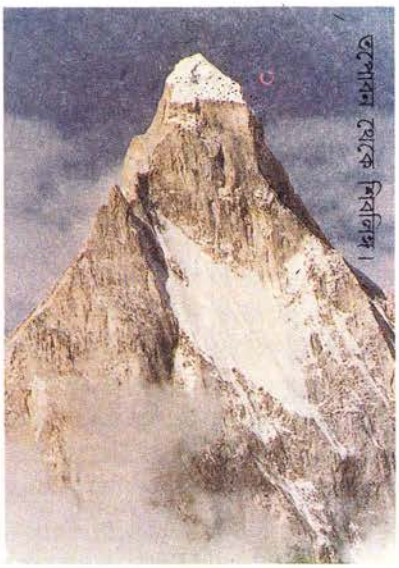

কজন ছাড়া চারপাশে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই, নেই কোনো গাছগাছালি কিংবা পাহাড়ি পশু। মনে হয় যেন আমরা এক পাষাণ পুরীতে দাঁড়িয়ে আছি। কাল বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা যখন সুরালয় বামাকে এসে পৌঁছেছিলাম, তখন আনন্দে মন ভরে উঠেছিল। আমাদের গাইড দেবী সিং হাত তুলে দেখাল, ঐ দেখুন সামনে চন্দ্র পর্বত। ২২০৭৩ ফুট উঁচু বরফে ঢাকা চন্দ্র পর্বত তখন পূর্ণিমার চাঁদের মতনই ঝলমল করছে। মেঘের পাশ ঘেঁষে আসা রোদের ফলা চন্দ্র পর্বতকে চোখ-ঝলসানো রূপ দিয়েছে। পাহাড়ের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে হিমবাহ। তাঁবু ফেলে রাত্তিরে থাকার সব গোছগাছ করে নেবার ফাঁকেই সূর্যদেব বসে পড়েছেন পাটে। বরফের রাজ্যে এবং চন্দ্র পর্বতের ওপর সেই রামধনু রঙ যে মনভোলানো রূপ ধরেছে তা শুধু দু-চোখ ভরে দেখা যায়, লিখে বোঝানো যায় না।

সে যাই হোক ফিরে আসি পুরোনো কথায়। আজ আবার আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালাম দুটি হিমবাহের সঙ্গমস্থলে। চতুরঙ্গী আর শ্বেতা হিমবাহ এখানে এই ১৭ হাজার ৩০০ ফুট উঁচুতে এসে মিশেছে। সামনেই একটি বিরাট বড় গুহা। মনে হচ্ছে যেন এক রূপকথার দৈত্য হাঁ করে আমাদের গিলতে আসছে। দেখলে ভয় লাগে।

হঠাৎ পেছন থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডেকে উঠলেন। পেছনে তাকিয়ে দেখি সুরেখা হাঁপাচ্ছে। পুরো নাম সুরেখা কিঙ্কর। বাড়ি পুনে। পেশায় আইনজীবী। আর নেশা হলো পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। আমরা একসঙ্গে মানস কৈলাসে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই আলাপ, তখন থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

১৯৫১০ ফুট উঁচু কালিন্দী পাসে পৌঁছে পুজো দেওয়া হলো।

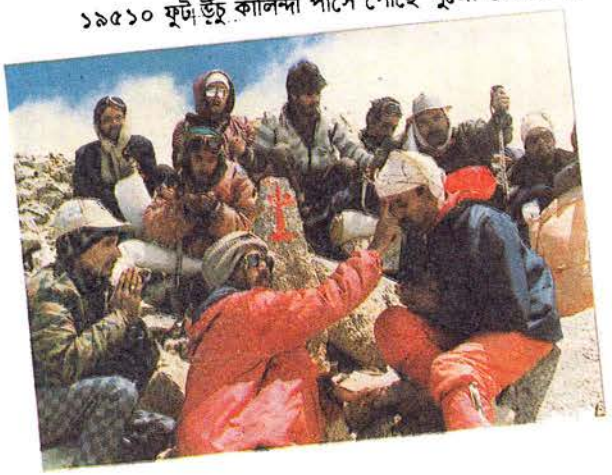

কালিন্দী পাস অতিক্রমের মুহূর্তে।

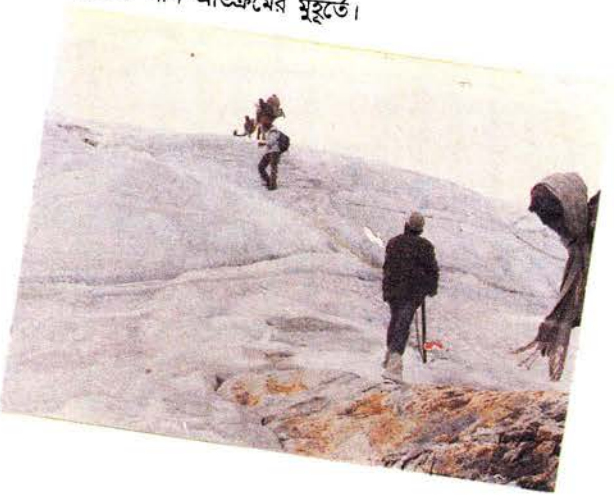

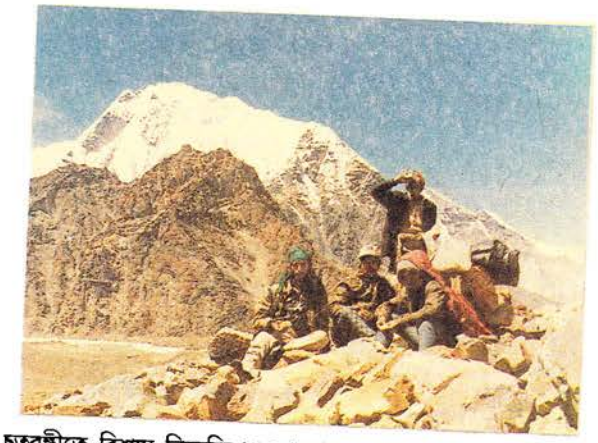

চতুরঙ্গীতে বিশ্রাম নিয়েছিলাম আমরা।

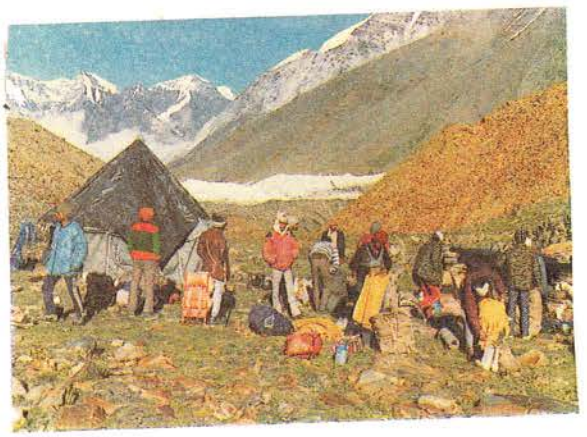

নন্দনবনে রাত্রিবাস।

চার বছর বাদে এবার আবার দেখা হলো কালিন্দী যাবার পথে। কালিন্দী পাসে সুরেখাও আমাদের সঙ্গী।

সুরেখাকে হাঁপাতে দেখে বললাম, চট করে একটু বসে নাও। আমিও একটা বড় পাথরের ওপর সাবধানে বসলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন ভারতোয়ালজী। বললেন, ওঠ ওঠ এখন বসার সময় নয়, চারটের মধ্যে আমাদের কালিন্দী বেস ক্যাম্পে পৌঁছতেই হবে। সুতরাং শুরু হলো আবার হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে সেই নুড়ি পাথর আর ক্রিভাসে ভরা উঁচু ঢালটা ভরে যেতে লাগল বরফে। ঠিক বিকেল চারটের সময় আমরা এসে পৌঁছলাম কালিন্দীর বেস ক্যাম্পে। সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উঁচু জায়গাটা। এখন যেদিকে তাকাই শুধু ধবধবে সাদা বরফ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। সবই জমাট বাঁধা শক্ত বরফ। চারদিকে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে হাওয়া উঠছে। সে হাওয়ার গতি ভয়াবহ রকম বেশি। এখানেই আমাদের তাঁবু পড়ল। কিন্তু রাত্তিরে যথারীতি ঘুমোতে পারলাম না। এখানে শ্বাসকষ্ট বড্ড বেশি।

আজ ১৭ আগস্ট। সকাল ছ'টার সময় আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আরও প্রায় হাজার খানেক ফুট উঠলে তবে আমরা অতিক্রম করতে পারব কালিন্দী পাস। শক্ত বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা বড় কষ্টকর। তাছাড়া চারদিক ভরা ক্রিভাসে। সামান্য ভুলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আমাদের আগে আগে চলেছে কয়েকজন অভিজ্ঞ মালবাহক। তবে সবার আগে দেবী সিং, চারদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। তার হাতে ধরা পাহাড়ে চড়ার শক্ত নাইলন রোপ। বেশ কিছু দূরে দূরে আমরা ওই দড়ি ধরে এগিয়ে চলেছি। প্রত্যেকবার পা ফেলতে হচ্ছে পাথর-গাঁইতি বা আইস অ্যাক্স ঠুকে ঠুকে। কারণ এখানে ভয়ংকর সেই ক্রিভাসগুলোর মুখ বরফে ঢাকা। তবু মাঝে মাঝেই দড়িতে আচমকা টান পড়ছে। চমকে তাকিয়ে দেখছি কেউ না কেউ হাঁটু সমান বরফের মধ্যে চলে গেছে। কিন্তু ওই দড়ির কল্যাণে খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসতে পারছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। চারদিক এতোই নিস্তব্ধ যে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছি। কানের পাশটা এমন ভার হয়ে আছে যেন মনে হচ্ছে তালা লেগে গেছে। হঠাৎ দেবী সিংয়ের চিৎকারে চমকে তাকাই। দেবী সিং আঙুল তুলে একদিকে নির্দেশ করে বলল, দেখিয়ে সাব।

মুখ ফসকে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করলাম, কি দেখব ভাই?

দেবী সিং বলল, ওহি ডেড বডি।

নজরে আসে কিছু দূরে লাল রংয়ের একটি স্লিপিং ব্যাগ। দেখলে মনে হয় ভেতরে কেউ যেন শুয়ে আছে। দেবী সিংয়ের পেছনে পেছনে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম সেই ব্যাগটার সামনে। দেবী সিং আইস অ্যাক্স দিয়ে স্লিপিং ব্যাগটি নাড়া দেয়। ব্যাগটা দুলে ওঠে।

জিজ্ঞেস করি, ওটা কি?

এবার মুখ খোলেন ভারতোয়ালজী। আস্তে আস্তে বলেন, ১৯৮০ সালে পুনে থেকে বারো জনের এক অভিযাত্রী দল কালিন্দী এক্সপিডিশনে এসেছিল। ঠিক এইখানেই তারা তাঁবু ফেলেছিল। দু-তিনটি তাঁবু। অরুন্ধতী যোশী আর বিজয় মহাজন ছিল শেষের তাঁবুটিতে। গভীর রাত্রে আচমকা এক হিমানী সম্প্রপাতে (আচমকা নেমে আসা বিশাল এক তুষারধস) চাপা পড়ে যায় অরুন্ধতী আর বিজয়ের তাঁবুটি। অন্য তাঁবু দুটির কিছু হয়নি। পরদিন সকালে বরফ সরিয়ে অন্য অভিযাত্রীরা খুঁড়ে বের করে অরুন্ধতী আর বিজয়ের দেহ। প্রাণহীন ওই দেহ দুটি একটি স্লিপিং ব্যাগে ভরে ওরা ওইখানেই রেখে যায়। এই সময়ে কয়েকটি দিন ছাড়া প্রায় বারো মাসই স্লিপিং ব্যাগে

বাসুকী তালে পাহাড়ী ফুল।

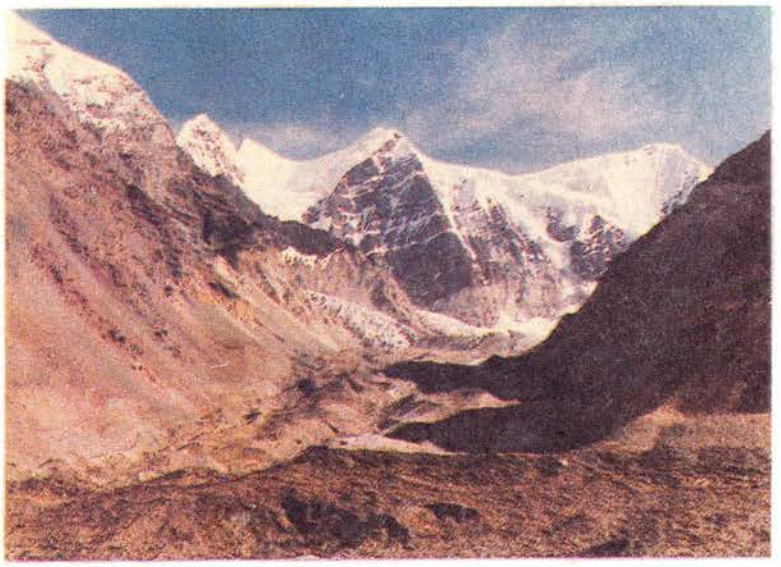

বাসুকী পার হয়ে এলাম আমরা।

ভরা দেহ দুটি থাকে বরফের তলায়। তাই কিছুই হয়নি। যেমন ছিল তেমন আছে অরুন্ধতী আর বিজয়। স্লিপিং ব্যাগটার সামনে আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মন ভারী হয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত একটা কষ্ট কণ্ঠার কাছে দলা পাকিয়েছিল।

সুরেখার ইঙ্গিতে স্লিপিং ব্যাগটির কিছু ওপরে একটি শিলাখণ্ডের দিকে তাকালাম। কিছু একটা যেন চকচক করছে। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, একটি বড় অ্যালুমিনিয়ামের শিট। তার ওপর আঁকা রয়েছে, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের ছবি। ছবির তলায় তাদের নাম ও জন্মমৃত্যুর তারিখ। তার পাশে লেখা আছে ওদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বাণী। আমরা সকলে নীরবে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতী আর বিজয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম।

মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ওদের মতো অবস্থা আমাদের যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে। ওরা তবু বরফে চাপা পড়েছিল। তাই দেহ দুটি আজও আছে। কিন্তু যারা ক্রিভাসে চাপা পড়েছিল তাদের সন্ধান তো কেউ কোনোদিনও পাবে না। ভারতোয়ালজী আবার তাড়া লাগালেন। শুরু হলো দড়ি ধরে আমাদের চড়াই ভাঙা। ওদিকে বেশি উচ্চতার জন্য মাথা ভার হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত পা দুখানা আর বইতে পারছে না অবসন্ন দেহটাকে। তবু অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে আমরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে চলেছি। বেলা বারোটার সময় আমরা উঠে এলাম কালিন্দী পাসে। এখানকার উচ্চতা উনিশ হাজার পাঁচশো দশ ফুট। চারদিকে শুধু বরফ আর বরফ। তারই মাঝে চোখ পড়ে বড় বড় কয়েকটি পাথরের খণ্ডের ওপর। সিঁদুর লেপা আছে তার গায়ে। কানে আসে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি, জয় কালিন্দী মাইকি জয়, জয় কেদারনাথ কি জয়, জয় বদ্রীবিশালকি জয়। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছেছি। আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। মাথার ওপর ঝকঝকে আকাশ, সামনেই কালিন্দী পিক। মনে হয় যেন হাত বাড়ালেই ছোঁওয়া যাবে। আগাগোড়া বরফে মোড়া কালিন্দী পিকের ওপর মধ্যাহ্নের সূর্য যেন সোনা ঝরাচ্ছে।

খেজুর, নারকেল, কিশমিশ আর নকুলদানা দিয়ে পুজো সারা হলো। পুজো শেষ হতে না হতে চারদিক ছেয়ে গেল ঘন কুয়াশায়। ভারতোয়ালজী ছটফট করে উঠলেন, বললেন, শীগগির করুন, এক মিনিট দেরি করবেন না, হোয়াইট আউট হয়ে যাচ্ছে। ভীষণ অসুবিধে হবে।

এবার নামতে হবে নিচে। তাই সতর্কতা আরো বেশি। রোপ ধরে আমরা সাবধানে নামতে থাকি। প্রথমে যিনি চলেছেন তাঁর কোমরে বাঁধা দড়ি। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমাদেরও দাঁড়াতে হলো। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, পথ ভুল হচ্ছে। সামনে বিশাল ক্রিভাস, এখান দিয়ে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। আমরা পাগলের মতো এদিকে ওদিকে পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। ওদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি। রোদ থাকলে এত কষ্ট হতো না। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব উঁকি মেরে পালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেবী সিংয়ের গলা কানে এল। রোকিয়ে, ওদিক দিয়ে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। তারপর চারপাশটা তাকিয়ে আবার বলল, এখান থেকে নামতে হলে, ওই একটাই পথ আছে।

দেবী সিংয়ের দেখানো পথটার দিকে তাকিয়ে আমরা সকলে আঁতকে উঠলাম। সামনে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া পাথরের দেওয়াল। ওই দেওয়াল বেয়েই আমাদের নিচে নামতে হবে। আতঙ্কে, আশঙ্কায় আমরা তখন এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। ওই পাথরের দেওয়াল বেয়ে আমাদের প্রায় ছ'শো ফুট নিচে নামতে হবে! অসম্ভব, কিছুতেই পারবো না। ওদিকে যিনি আমাদের লিড করছিলেন তিনি বেঁকে বসেছেন। বললেন, আমি পারব না, তুমি এসো। দেবী সিং এগিয়ে গিয়ে কোমরে দড়িটা বেঁধে নিল। আমাদের কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করল না। তখন কুয়াশা একটু কমে যাওয়ায় আবার আমরা দূরের জিনিস কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি। ভারতোয়ালজী আমাদের সকলের কোমরে দড়ি বেঁধে দিলেন। প্রথমে দেবী সিং নেমে গেল। তারপর আমরা এক এক করে হুড়মুড়িয়ে কিভাবে যে ছ'শো ফুট নিচে নেমে এলাম জানি না।

আমরা যেখানটায় নামলাম, তার চারদিকে বড় বড় বোল্ডার। এখানেও প্রায় আমাদের খাড়া নামতে হবে। তাই খুব সাবধানে পাথরে পা দিই। পায়ের চাপে পাথর যদি কোনোরকমে নড়ে যায় তাহলেই গড়িয়ে নিচে নেমে যাবে। আগে যাঁরা চলেছেন,

তাঁরা পড়বেন মারাত্মক বিপদের মুখে। টানা এগারো ঘণ্টা হেঁটে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম রাজপরভে। বাঁ দিক দিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে বয়ে চলেছে আধা নদী। ওই নদীর একটু ওপরে ফেলা হলো তাঁবু। তাঁবুর ডানদিকে খাড়া পাঁচিল। হাতের পাতা দুটো এতো ফুলে গেছে যে ঘড়িটা পর্যন্ত খুলতে পারছিলাম না।

পরদিন সকাল আটটায় আবার আমাদের শুরু হলো যাত্রা। চারদিক ছোটবড় পাথরে ভরা। পা ফেলার জায়গা নেই। অতি সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। প্রায় ঘণ্টা তিনেক চলার পর আমরা চলে এলাম নিচে। সামনেই গর্জন করে বয়ে চলেছে একটি পাহাড়ী নদী। চার পাঁচ দিক থেকেই জলধারা এসে মিশেছে সেই নদীতে। গভীর নয় কিন্তু পাথরে ভরা। দড়ি ধরে জিৎ সিং খুব সাবধানে নদী পার হয়ে গেল। তারপর দড়ি ধরে একজন একজন করে আমরাও গিয়ে পৌঁছলাম ওপারে। বরফ গোলা জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়ায় পা দুটোর অবস্থা হয়ে দাঁড়াল সঙ্গীন। মনে হলো কোনো সাড় নেই। আধঘণ্টা চলার পর আবার এসে দাঁড়ালাম একটা নদীর সামনে। মালবাহকরা নির্বিকার চিত্তে পার হয়ে গেল। বোকার মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরাও নামলাম জলে। ওপারে পৌঁছেই জুতো খুলতে গেলাম জল বের করার জন্য। ভারতোয়ালজী বলে উঠলেন, আভি মাত খুলিয়ে। সামনে আউর ভি হ্যায়। আমি বললাম, ঠাণ্ডায় পা দুটো জমে গেছে যে। উনি বললেন, চলনে সে ঠিক হো যায়গা। অগত্যা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চললাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। সঙ্গের জল শেষ হয়ে গেছে কখন। খাবার জল এক ফোঁটাও নেই। কিন্তু জুতোর মধ্যে থেকে জলের ছপছপ আওয়াজ আসছে। পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এসে বসে পড়লাম। আমায় বসতে দেখে সুরেখা ও গ্লেনও বসে পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম, ভারতোয়ালজী ছাড়া আর কেউ নেই। বাকিরা সব গেল কোথায়? ভারতোয়ালজীর মুখে চিন্তার রেখা। আমরা ভুল পথে এসে পড়িনি তো! প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল। এবার কি হবে?

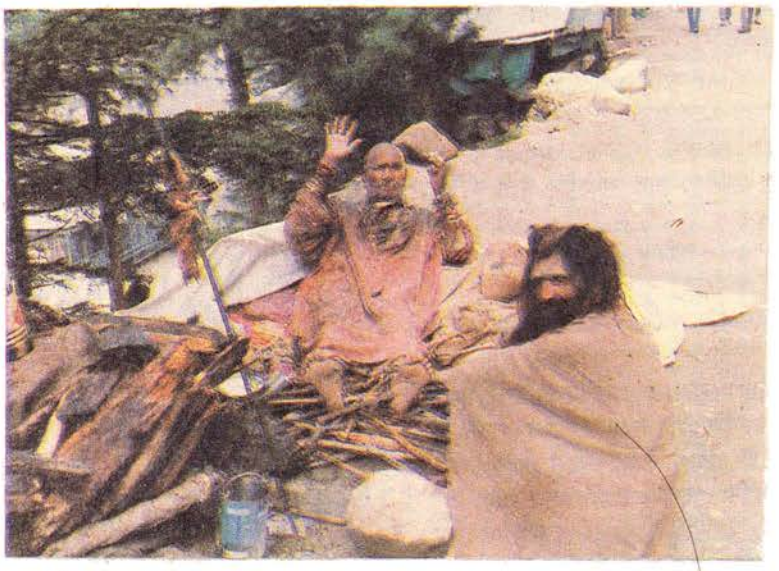

গঙ্গোত্রীতে সাধুদর্শন।

ভারতোয়ালজী জোরে জোরে বারকয়েক শিস দিয়ে উঠলেন। আমরাও জিৎ সিং দেবী সিং-দের নাম ধরে চেঁচাতে লাগলাম। চারপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে আমাদের চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ওদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জানি না এবার কি হবে! আমরা আতঙ্কিত হয়ে চারদিকে যখন তাকাচ্ছি তখনই একজনের ডাক বহুদূর থেকে কানে এল। অনেক দূরে জ্বলে উঠলো টর্চের আলো। তাই দেখে আমরাও প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলাম। আমাদের চিৎকার শুনে জ্বলন্ত টর্চ হাতে নিয়ে এগিয়ে এল জিৎ সিং। ও আমাদেরই খুঁজতে বেরিয়েছে। ওর সঙ্গে খানিক পরেই আমরা এসে পৌঁছলাম ঘাসতলীতে। সরস্বতী আর আধা নদীর সঙ্গমস্থল এই নদী। দূরে সামরিক বাহিনীর ছাউনি। ভারতোয়ালজী তাঁর ডান দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, এই হচ্ছে ভারত আর তিব্বতের সীমারেখা। ছাউনির জওয়ানেরা দিনরাত পাহারা দেয় ওখানে। আবছা অন্ধকারে পরিষ্কার দেখতে পেলাম রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা জওয়ানদের।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। মানাগ্রাম অতিক্রম করে বেলা দুটোর সময় এসে পৌঁছলাম বদ্রীনাথে। শেষ হলো আমাদের যাত্রা। এবার বাড়ি ফেরার পালা।

শেষ দিয়ে শুরু করেছি, এবার পিছিয়ে যাব আমাদের কালিন্দী অভিযানের গোড়ার পর্বে।

বেশিদিন পাহাড়ে না গেলেই মনটা ছটফট করে ওঠে। হিমালয় আমায় টানে। তাই বছরে অন্তত একবার না গিয়ে থাকতে পারি না। গত বছর মানস কৈলাস ঘুরে এসেছি। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু এবার কোথায় যাব?

হঠাৎ সেদিন দীপকদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দীপকদা আমাদের নামুন-পাস, গোঁসাই কুণ্ড আর মাকালু অভিযানের নেতা ছিলেন। তাই দীপকদাকেই জিগ্যেস করলাম, আপনি তো এবার বেরোতে পারবেন না, কিন্তু আমায় কোথাও যেতেই হবে। কোথায় যাই বলুন তো? একটু ভেবে নিয়ে দীপকদা বললেন, তুমি বরং কালিন্দী ঘুরে এস। আমি ভয় পেয়ে গিয়ে বললাম, ওরে বাবা ও পথে কি একা যাওয়া যায়? আমার কথা শেষ হলো না দীপকদা বলে উঠলেন, একটা কাজ করো। তুমি হৃষীকেশে গাড়ওয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের সঙ্গে যোগাযোগ কর। খবর

পেয়েছি ওঁরা কালিন্দীর একটা ট্যুর প্ল্যান করছেন।

সেদিনই আমি হৃষীকেশে চিঠি লিখলাম। জবাবও এসে গেল খুব তাড়াতাড়ি। গঙ্গোত্রী থেকে কালিন্দী অভিযান শুরু হবে, শেষ হবে কালিন্দী খাল অতিক্রম করে বদ্রীনাথ ধামে।

১৯৮৮ সালের ৫ আগস্ট দুন এক্সপ্রেসে যাত্রা করলাম। ৭ তারিখ ভোর ৬টা নাগাদ পৌঁছলাম হরিদ্বারে। স্টেশনের বাইরেই ছিল উত্তরকাশী যাবার বাস। বেলা ৩টে নাগাদ পৌঁছে গেলাম উত্তরকাশীতে। সেই রাতটা উত্তরকাশীতে কাটিয়ে পরদিন অর্থাৎ ৮ আগস্ট সকাল ৭টার বাসে পাড়ি দিলাম গঙ্গোত্রীর পথে। রাস্তায় বেলা সাড়ে ৯টা নাগাদ ভাটোয়ারি পেরিয়ে আসার পরে বাস

কালিন্দীর পথে ছোট্ট জলাশয়। জায়গাটার উচ্চতা ১৫০০০ ফুট।

দাঁড়িয়ে গেল। শুনলাম ধস নেমে রাস্তা বন্ধ। তবে খুব শীগগিরই আবার যাওয়া যাবে, রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ততক্ষণে আকাশ ছেয়ে গেছে ঘন কালো মেঘে। শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, বাস থেকে নামার উপায় নেই। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। হঠাৎ মনে পড়লো হাওড়া স্টেশনে আমার বন্ধু দিলীপ এক বাক্স নাড়ু দিয়েছিল। নাড়ু দেখে আমি হেসেছিলাম। আমায় হাসতে দেখে দিলীপ বলেছিল, দেখবি সময়ে ঠিক কাজে লাগবে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে তাড়াতাড়ি নাড়ুর বাক্সটা বের করে নিলাম। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে বাস আবার চলতে শুরু করলো। বেলা

গোমুখে লেখক।

৩টে নাগাদ ৯৯৫০ ফুট উঁচু গঙ্গোত্রীতে এসে বাস থামলো। তখনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। গাড়ওয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের নির্দেশ মতো গঙ্গার অপর পারে তাদের পর্যটন আবাসে গিয়ে উঠলাম। ঠিক নিচেই গোমুখ থেকে বয়ে আসা গঙ্গার সে কি বিচিত্র রূপ! কি তার নাচের ঘটা!

হঠাৎ মেয়েলি গলায় আমার নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনে, ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম সুরেখা। পুনের সুরেখা কিঙ্কর। খুশি হয়ে বলি, আরে, তুমি!

সুরেখা হাসিমুখে বলে, কালিন্দী যাবো। খুশি হয়ে আমি বললাম, গাড়ওয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের সঙ্গে তো? আমিও যাচ্ছি। সুরেখা বলল, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এতক্ষণে চেনা কাউকে পেলাম। জিগ্যেস করলাম, আমরা কজন যাচ্ছি?

বারো জন। তার মধ্যে কলকাতার ৪ জন। বাকিরা এলাহাবাদ, পুনে, মীরাট আর বোম্বাই-এর।

একটু পরেই গাড়ওয়াল মণ্ডল বিকাশ থেকে আমাদের জানানো হলো, প্রশান্ত নেগী আমাদের ওই দুর্গম পথে নিয়ে যাবেন। তাঁকে সহযোগিতা করবেন যশপাল ভারতোয়ালজী। কিচেন মেট হিসেবে যাচ্ছেন শোভন সিং। পোর্টার দলনেতা দেবী সিং। ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আগামী কাল আমাদের গঙ্গোত্রীতে থাকতে হবে।

৯ আগস্ট সকালবেলায় সুরেখা, গ্লেন রডরিগস্ আর আমি সাধু দর্শনে বের হলাম। গ্লেন বোম্বাই-এর বাসিন্দা; ব্যাঙ্কে কাজ করে। খুব মিশুকে। মা গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। ডানদিকে সাধুদের ছোট ছোট কুঠি। সুরেখা এগিয়ে গিয়েছিল। হাতের ইশারায় আমায় ডাকল, তপন, ইধার আও। সুরেখা দাঁড়িয়েছিল ছোট্ট একটা কুঠিয়ার সামনে। শুকনো কাঠের ডালপালা কেটে তৈরি নানা ধরনের মূর্তি সার সার সাজানো রয়েছে সেখানে। ময়ূর, হাতি থেকে আরম্ভ করে নারীমূর্তি পর্যন্ত সবই আছে। হঠাৎ কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে এলেন গেরুয়া কাপড় পরা এক সন্ন্যাসী। বয়স বছর পঞ্চান্ন হবে। খালি গা, বলিষ্ঠ চেহারা। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। আমাদের দেখে একটু হেসে ভেতরে যাবার জন্য বললেন। দীর্ঘদিন তিনি হিমালয়ে আছেন। এক সময়ে খুব ভাল ছবি তুলতেন। তার নিদর্শন কুঠিয়ার ভেতরে রয়েছে। হিমালয়ের বিচিত্র সব কাহিনী শোনাতে লাগলেন আমাদের। এক ফাঁকে চা বানিয়ে আমাদের খেতেও দিলেন।

একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, স্বামীজি, আপনি চা পান কোথা থেকে?

সুন্দরানন্দজী নির্বিকারভাবে ওপরের দিকে হাত তুলে বললেন, উনিই জুটিয়ে দেন আপনাদেরই মাধ্যমে। সন্ধ্যে নাগাদ আমরা আবার ফিরে এলাম লজে।

পরদিন অর্থাৎ ১০ আগস্ট শুরু হলো আমাদের যাত্রা। সকাল ঠিক ৮টা ১৫ মিনিটে চড়াই উৎরাই পথ ভাঙতে শুরু করলাম আমরা। আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা চলেছে অবিরাম। রোদের ঝলকে দু চোখ ভরে দেখে নিলাম, সুদর্শন ও মাতৃর তুষারশৃঙ্গ। পাইন, চির ও ভুজ গাছের পাশ দিয়ে চলার পথ। ডানদিকে বেগবতী গঙ্গা। বেলা ৩ টের সময় ১৪ কিমি পথ পেরিয়ে পৌঁছলাম ভুজবাসায়। উঠলাম পর্যটক আবাসে। কিছুটা দূরেই লালবাবার আশ্রম। গোমুখ যাত্রীদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে চলেছেন তিনি। একফাঁকে ঘুরে এলাম

লালবাবার আশ্রমে। এর আগে যতবার এসেছি উঠেছি ওঁর ওখানেই। কলকাতায় আমাদের কলেজ স্ট্রীটের বাড়িতেও একবার উনি এসেছেন। এবার ওঁর কাছে থাকা হবে না। ফিরবও অন্য পথে। তাই প্রণামটা সেরে গেলাম।

লজে ফেরার পরেই দেখি স্বামী সুন্দরানন্দজী আসছেন। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে প্রণাম করে জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, ভাবছি তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব। গোমুখ দর্শন সেরে তোমাদের সঙ্গে আরো খানিকটা যাবার ইচ্ছে আছে।

আজ ১১ আগস্ট, সকাল ৮টায় আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। যাবো গোমুখ আর তপোবন। স্বামীজি, গ্লেন, বিস্ট আর আমি চলেছি সবার পেছনে গল্প করতে করতে। পাথরের ওপর দিয়ে চলা, তাই হাঁটতে হয় সাবধানে। এক সময় স্বামীজি হাত তুলে দেখালেন, বললেন, ওই দেখ গোমুখ।

গঙ্গার উৎস। বরফের বিরাট গুহা। প্রায় ৪০০ ফুট উঁচু। চওড়াও ১৫০ ফুটের মতো। সেই গুহামুখ দিয়ে বয়ে আসছে প্রবল জল। গুহামুখ থেকে বড় বড় বরফের চাঙড় দুম্‌দাম্ শব্দ করে ভেঙে পড়ছে জলে। জলের প্রচণ্ড টানে ভেসে চলেছে সেই বরফ-খণ্ডগুলি। বরফগলা জল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। জলের রঙ কিন্তু ঘোলা। ওই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই স্বামীজি আর ডাঃ বিস্ট কৌপিন পরে নেমে পড়লেন জলে। স্নান সেরে ডাঃ বিস্ট পুজোর জন্য একটা বড় পাথরের ওপর বসলেন। খালি গা, গলায় পৈতে। স্বামীজিও ধূপ জ্বালিয়ে বসলেন। ওপর থেকে সমানে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু ওঁদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। গ্লেন আর আমি কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছিলাম ওঁদের দিকে। পুজো সেরে স্বামীজি যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন, অমনি বিরাট একটা পাথর ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে পড়ল। আমাদের থেকে হাত দুয়েক দূরে। স্বামীজি বললেন, ডরো মৎ। তারপর জ্বলন্ত ধূপকাঠি নিয়ে আরতি শুরু করলেন। এক সময় শেষ হলো পূজা-পর্ব। আবার শুরু হলো চলা।

স্বামীজি ও ডাঃ বিস্ট সাবধানে তাঁদের অনুসরণ করতে বলে খাড়া ওপর দিকে

গোমুখে স্নান করতে নামছেন স্বামী সুন্দরানন্দজী।

উঠে চললেন। চলতে হচ্ছে বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে। এর মধ্যে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। তার মধ্যে চলা যে কি কষ্টকর তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন।

এক সময়ে উঠে এলাম হিমবাহের ওপর। না আছে কোনো পথ, না আছে নিশানা। তাই সন্তর্পণে স্বামীজিকে অনুসরণ করি। ওই পথেও স্বামীজি খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন। তাই কিছুটা এগিয়েই ওঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে আমাদের জন্য। একবার কাছে ডেকে বললেন, এই দেখ বরফের ফাটল। একেই বলে ক্রিভাস। সাবধানে হাঁটবে। অনেক ক্রিভাস আছে।

আমি এর আগে দুবার তপোবন এসেছি। কিন্তু এরকম আবহাওয়া ও পথের অবস্থা তখন দেখিনি। এক সময় পৌঁছে গেলাম তপোবনে। ১৪২৮০ ফুট উঁচুতে সবুজ সমতল প্রান্তর। নাম-না-জানা অসংখ্য রঙ-বেরঙের ফুলের সমারোহ। প্রকৃতি দেবী যেন অকৃপণ হাতে সাজিয়েছেন এই দেব-প্রাঙ্গণকে। সামনের দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হলো, জটাজূটধারী স্বয়ং দেবাদিদেব ধ্যানে বসে আছেন। কি তাঁর রূপ! জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। ২১ হাজার ৪৬৬ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ শৃঙ্গের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। সামনে উঁচু গুহাটি চোখে পড়ল। ওই গুহায় আর এক সাধু—সিমলাবাবা থাকেন। বছর তিনেক আগে আমি তপোবনে এসেছিলাম। এখানে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, নাগদত্ত আমায় নিয়ে গিয়েছিল সিমলাবাবার কাছে। সিমলাবাবা বসেছিলেন ধ্যানে। তুষারের এই রাজ্যে তাঁর পরনে ছিল কৌপীন। মাথায় মস্ত বড় জটা। আমার অবস্থা দেখে একটি শিকড় দিয়ে বলেছিলেন, চুষে চুষে খাও। তারপর আগুন জ্বালিয়ে তৈরি করলেন অদ্ভুত স্বাদের এক পানীয়। নিজে হাতে খাইয়ে দিয়েছিলেন আমায়। তারপরই সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম আমি। আমায় সুস্থ হতে দেখে সিমলাবাবা বললেন, আজ

গোমুখে গুহার সামনে ডাঃ বিস্ট।

এখানেই থেকে যাও। স্বর্গের এক প্রান্তে এসেছ। কাল নিয়ে যাব আর এক প্রান্ত নন্দনবনে। সেদিন যেতে পারিনি। আজ চোখের সামনে গুহাটিকে দেখে সিমলাবাবার কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, যাই একবার প্রণাম করে আসি।

কিন্তু তা আর হলো না। স্বামীজি তাড়া লাগালেন। বললেন, জলদি চলো, মৌসম ঠিক নেহি।

সত্যিই তো! আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে! ফিরতে হবে ভুজবাসা। স্বামীজিকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম ভুজবাসার বাংলোর দিকে।

১২ আগস্ট। ঝলমলে সকাল। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল ৮টা নাগাদ আমরা স্টার্ট করলাম।

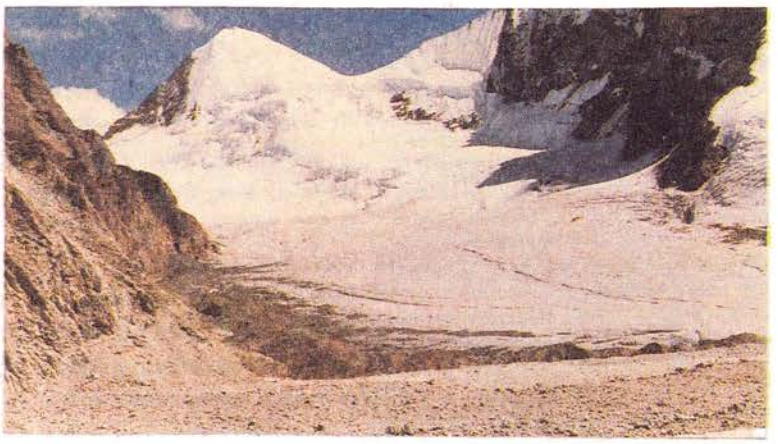

কালিন্দী হিমবাহ।

স্বামীজি ডাঃ বিস্টকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আমি চলেছি গ্লেন আর ছোটুকে নিয়ে। ছোটু আমাদের দলের সর্বকনিষ্ঠ মালবাহক। বাচ্চা ছেলে। বয়স মাত্র ১৭। নাম বলবন্ত সিং।

গোমুখকে ডাইনে রেখে উঠে এলাম হিমবাহের ওপর। বড় বড় পাথরের. চাঁই এখানে ওখানে পড়ে আছে। বাঁদিকে ভুজবাসা গিরিশ্রেণী। একটা পাথর থেকে আরেকটা পাথরে লাফ দিয়ে চলতে হচ্ছে। মিনিট ৪০ চলার পর বিশ্রামের জন্য বসলাম একটা পাথরের খাঁজে।

একটু পরেই চলতে শুরু করেছি। হঠাৎ ছোটু চেঁচিয়ে উঠল, সাব জলদি ভাগো, জলদি ভাগো—বখরা, বখরা। আমাদের ফেলেই প্রাণভয়ে ছোটু এগিয়ে চলেছে। গ্লেন বলল, তপন, উপর দেখো। তাকিয়ে দেখি, উপরে ছোট ছোট বিন্দুর মতো কতগুলো জন্তু। বোধহয় পাহাড়ী ছাগল। পাহাড়ী মানুষ ওদের বড়াল বলে। ওদের পায়ের ধাক্কায় বড় বড় কয়েকটি পাথর গড়িয়ে আসছে। তাই দেখে আমরা দুজনও ছোটুর মতো পড়িমড়ি করে ছুটতে শুরু করলাম। একটু দূরে ছোটু দাঁড়িয়েছিল। কাছে গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানালাম। ও সাবধান করে না দিলে ভীষণ বিপদ হতো।

তপোবনের পথে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ওপর। পাশেই বরফ ফাটল।

একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু হলো। আধ ঘণ্টা চলার পর দেখি বাঁয়ে উত্তর থেকে আসা আরেকটি হিমবাহ গঙ্গোত্রী হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে। হিমবাহটির রং ফিকে লাল। আমরা অবাক হয়ে সেই রক্তবরণ হিমবাহটিকে দেখছিলাম। তাকে বাঁদিকে ফেলে গঙ্গোত্রী হিমবাহের দিকে চললাম। তখনই নজরে পড়ল, ভাগীরথী-২ (২১ হাজার ৩৬৪ ফুট), ভাগীরথী-৩ (২১ হাজার ১৭৬ ফুট), ভাগীরথী-১ (২২ হাজার ৪৯৫ ফুট)। ছোটু চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে আঙুল তুলে নিচে দেখিয়ে বলে, সাব দেখ নিচে ছোটা লেক। বরফগলা ঘন নীল জলের ছোট্ট কুণ্ড মতন। অমরনাথ যাবার পথে শেষনাগে যেমন দেখেছিলাম, অনেকটা সেই রকম। তবে আকারে অনেক ছোট। সামনেই চতুরঙ্গী হিমবাহের সঙ্গে মিলন ঘটেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহের। বিশাল তুষারক্ষেত্র। চারটি রঙের ছটা এই চতুরঙ্গীতে। প্রকৃতি দেবীর এ কী অপূর্ব সৃষ্টি! দুচোখ ভরে দেখলেও যেন আশ মেটে না।

বেলা ৪টে নাগাদ এসে পৌঁছলাম নন্দনবনে। উচ্চতা ১৪ হাজার ২৩০ ফুট। রঙবেরঙের নানা রঙের ফুলে প্রকৃতিদেবী যেন অকৃপণ হাতে সাজিয়েছেন এই স্বর্গরাজ্যকে। সামনে ভাগীরথী শৃঙ্গত্রয়। পেছনে ধ্যানমগ্ন শিবলিঙ্গ। পোর্টাররা চটপট তাঁবু ফেলছে। বুঝলাম আজকের যাত্রা বিরতি এখানেই। তবে ঠাণ্ডা এখানে অনেক বেশি। মিঃ নেগী এসে বললেন, ওপরে আরও ঠাণ্ডা। শরীরকে সইয়ে নেবার জন্য কাল আমাদের এখানেই থাকতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা ছোটুর ডাকে ঘুম ভাঙে। সাব চা পিও। ভারতোয়ালজী এসে তৈরি হয়ে নিতে বললেন। বাসুকীর পথে আমাদের খানিকটা নিয়ে যাওয়া হবে। আলুর পরোটা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বাসুকীর পথে এগিয়ে চললাম। যত এগোই ততই পথের দুর্গমতা বাড়ে। একটু হাঁটলেই হাঁফ ধরে। ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটছি। বাঁয়ে চতুরঙ্গী হিমবাহ। মাঝে মাঝেই কানে আসছে পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। খানিকক্ষণ হাঁটার পর আমরা ফিরে এলাম তাঁবুতে। উচ্চতা ১৬ হাজার ফুট। প্রায় ৫০০ ফুট নিচে বরফের নদী। ছোটু বলল, কাল ওই পথেই আমরা বাসুকী যাব।

১৪ আগস্ট, সকাল ৭.৪০ মিনিট। আমরা বাসুকীতালের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। স্বামীজি আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গঙ্গোত্রী ফিরে গেলেন। বেলা ১১টার মধ্যে গতকাল যতদূর এসেছিলাম, সেখানে পৌঁছে গেলাম। আমরা ৪ জন ছাড়া বাকিরা অনেক পেছনে। মিনিট দশেক পরে সুরেখাকে নিয়ে মিঃ নেগী বসলেন আমাদের কাছে। আরো আধঘণ্টা পরে ভারতোয়ালজী বাকি ৭ জনকে নিয়ে সেখানে এলেন। একটা পাথরের ওপর বসে এলাহাবাদের মিঃ পুরী জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ নেগী, আভি কিধারসে চলনা হ্যায়? মিঃ নেগী মুচকি হেসে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, মিনিট দশেক পরে বলছি।

খানিকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ নেগী। তাঁর মুখ তখন অসম্ভব গম্ভীর। বললেন, সামান্য ৪-৫ কিমি. পথ আসতেই আপনাদের যা অবস্থা হয়েছে তাতো দেখতেই পাচ্ছি। এরপর আমাদের যেতে হবে ভীষণ দুর্গম পথে। এ পথ সাধারণ যাত্রীদের জন্য নয়। এ পথে আছে টেকনিক্যাল ডিফিকালটিস। তাই এ কদিন

আপনাদের কাছ থেকে লক্ষ্য করে আমি ৩-৪ জন ছাড়া কাউকেই কালিন্দী যাবার অনুমতি দিতে পারছি না। কারণ যদি কিছু অঘটন ঘটে, তার জন্য সরকারের কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

মিঃ নেগী চুপ করলেন। কারো মুখে টুঁ শব্দ নেই। সুরেখা, রডরিগস্, হাওড়ার বাসুদেব আর আমাকে দেখিয়ে মিঃ নেগী বললেন, কালিন্দী যাবার অনুমতি আমি শুধু এই ৪ জনকেই দিচ্ছি। বাকি সকলকে ফিরে যেতে হবে আমার সঙ্গে। ভারতোয়ালজী এই ৪ জনকে নিয়ে যাবেন কালিন্দী।

গোমুখ।

একটু পরেই আমরা ৪ জন ভারতোয়ালজীর সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গে যে পোর্টাররা যাবে তারা এগিয়ে গেছে অনেক দূরে। আমরা পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামছি। বালি পাথরের পথ। মাঝে মাঝে পা স্লিপ করছে। তাই অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে আমাদের। একসঙ্গে নেমে এলাম প্রায় ৫০০ ফুট। ডানদিকে বড় হিমবাহ। হু হু করে বরফগলা ঠাণ্ডা জল বয়ে যাচ্ছে। জলের টান ভয়ঙ্কর। কোনোরকমে পার হয়ে এলাম। এবার উঠতে হবে। সামনে খাড়া পাহাড়। সকলের কোমরে বাঁধা দড়ি। আস্তে আস্তে উঠছি। সামান্য অন্যমনস্ক হলেই দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা। মাঝে মাঝেই পাথর গড়িয়ে আসছে ওপর থেকে। এক সময়ে প্রায় ১০০ ফুট খাড়া চড়াই ভেঙে ওপরে উঠে এলাম। নিচের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম। বিশ্বাসই হয় না যে এ পথেই আমরা এসেছি। অনেক দূরে দেখলাম, মিঃ নেগী অন্যদের নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। ছোট ছোট বিন্দুর মতো লাগছে তাঁদের।

বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছলাম বাসুকীতালে। ছোট্ট লেক। জলের রঙ নীল। ভীষণ জোরে হাওয়া বইছে। আকাশ ঢাকা ঘন মেঘে। এক মুহূর্তের জন্য সূর্যদেব উঁকি দিলেন। ভারতোয়ালজী চেঁচিয়ে উঠলেন, দেখুন, দেখুন, বাসুকী পিক। একমুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেল ২২ হাজার ২৮৫ ফুট উঁচু বাসুকী শৃঙ্গ। ঠাণ্ডার প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। তার মধ্যে শোভন সবার হাতে হাতে দিয়ে গেল টমেটো সুপ। চুমুক দিতেই মনে হলো যেন অমৃত।

আজ ১৫ আগস্ট। আমাদের স্বাধীনতার পুণ্যদিন। ৬টার সময় চা-হাতে তাঁবুতে এসে ঢুকল ছোটু। বলল, সাব দাওয়াই হোগা?

কেন রে, মাথা ধরেছে?

মাথা ঝাঁকিয়ে ছোটু বলল, হাঁ। একটা অ্যানালজেসিক দিলাম ওর হাতে। আমরা সবাই মিলে 'জনগণমন' গানটি গেয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করলাম। তারপর চতুরঙ্গীর পথে যাত্রা করলাম। যত এগোই ততই মনে হয় রুকস্যাকের ওজন বেড়ে যাচ্ছে। ক'পা হাঁটলেই ক্লান্তিবোধ করি। কিছুটা চলার পর দেখতে পেলাম, সুন্দর বামাক হিমবাহ এসে মিশেছে চতুরঙ্গীতে। ভারতোয়ালজী আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, উধার সতপন্থ। সুন্দর বামাক হিমবাহের উৎস। আরো একটু এগিয়ে খুব সাবধানে সুরালয় হিমবাহ পার হয়ে একটা বড় চড়াই বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। আমি, দেবী সিং, ছোটু আর তিনচার জন পোর্টার বসলাম বিশ্রাম নিতে। দূরে প্রায় ৬০০ ফুট নিচে ভারতোয়ালজী সুরেখাকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পিঠে বড় রুকস্যাক। দেবী সিং বলল, ছোটু ভারতোয়ালজীর কাছে অনেক সামান। তুই চট্ করে নিয়ে আয়। ছোটু কোনো কথা না বলে দৌড়তে দৌড়তে নিচে নেমে গেল। তারপর ভারতোয়ালজীর কাছ থেকে ভারী রুকস্যাকটা নিয়ে একইভাবে উঠে এল ওপরে। আমি হাঁ করে তাকিয়ে তাই দেখলাম। এরা জন্ম থেকেই পাহাড়ে আছে। তাই পাহাড় আর চড়াই উৎরাইগুলো যেন ওদের বন্ধু। চলতে ফিরতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু আমাদের! বেলা দেড়টা নাগাদ পৌঁছলাম সুরালয় বামাকে। ১৭ হাজার ফুট উঁচু। এখানেই আজকের মতো যাত্রার বিরতি। দেবী সিং হাত তুলে দেখাল, ওই দেখুন চন্দ্র পর্বত। ২২ হাজার ৭৩ ফুট। হিমবাহের ওপর আজ আমাদের রাত্রিবাস। সূর্যদেব পাটে বসেছেন। তাঁর রক্তিম আভা চারপাশে তুষার-শৃঙ্গগুলিকে রঙীন করে তুলেছে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি সেই দিকে।

এর পরের কথা তো আগেই বলেছি।

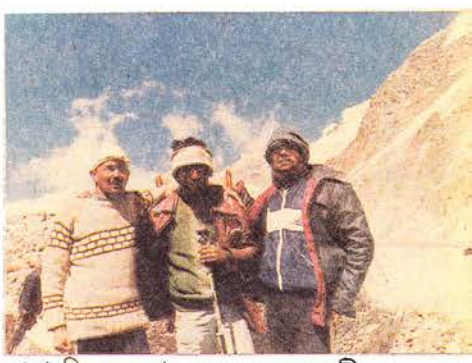

শ্বেতা হিমবাহের উপরে ভারতোয়ালজী, মিঃ গ্লেন ও লেখক।

ছবি : লেখক

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ফেরা

যাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)

ছবি ঃ অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

সেদিন বিকেলবেলায় চন্দ্রনাথবাবুর বাড়িতে জোর আড্ডা বসেছে। যাদুকর প্রদীপ সরকার সময় পেলেই চন্দ্রনাথবাবুর আড্ডায় হাজিরা দেন। সেদিনও এসেছেন তিনি। তাই হাসি-ঠাট্টায় সেদিনের সান্ধ্য আসর আরো জমজমাট।

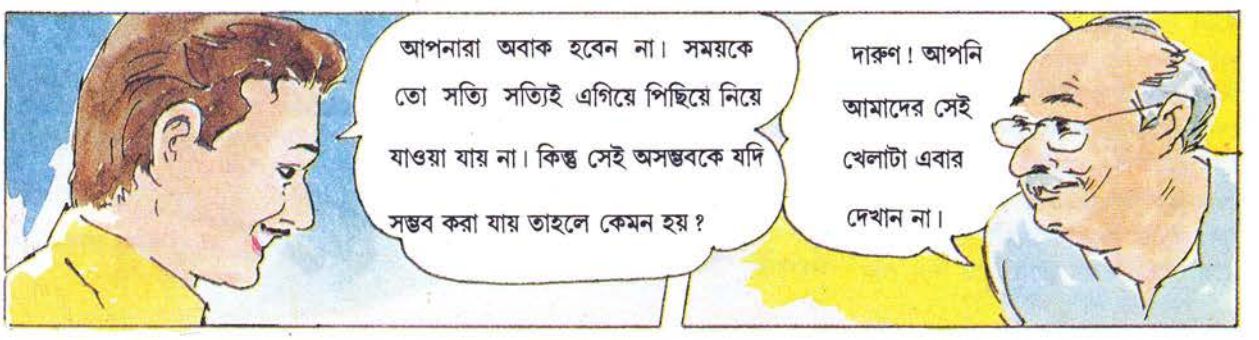

এই দেখুন, এই রকম একটা হাল্কা জিনিস সরাতেই হিমশিম খেতে হয়...সেখানে সময় নামক জগদ্দলকে ঠেলে সরানো কি চাট্টিখানি কথা!
ঠিক আছে! দেখি কি করা যায়!
এই দেখুন, এটা তো একটা সাধারণ তাসের প্যাকেট।
হুম, তাই তো দেখছি।
ভালো করে লক্ষ্য করুন তাসগুলোকে আমি খুব ভালো ভাবে শাফল করে নিচ্ছি।
আপনারা দেখুন, সামনে এই তাসটা আছে। ভালো করে দেখে নিন। মুখে কিছু বলবেন না।
ভালো করে দেখে শুধু মনে রাখুন...
এইবার ঐ টেবিল ঘড়িটা দেখুন— কটা বাজে?
ঠিক চারটে বেজেছে।

তাহলে ঠিক বেলা চারটের সময় এই তাসের প্যাকেটের নিচের তাসটা কি তা আপনারা দেখেছেন...
এবার কেউ ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরিয়ে পাঁচ মিনিট এগিয়ে দিন প্লিজ...
এই দেখুন, কাঁটা ঘুরিয়ে চারটে পাঁচ করে দিয়েছি!
বেশ, এবার আপনারা একটু শান্ত হয়ে বসুন। আমাকে এখন ধ্যানে বসতে হবে। কেউ কথা বলবেন না, শব্দ করবেন না...
একটু পরে...
?!
ঠিক আছে, এবার এই প্যাকেট থেকে যে কোনো একটা তাস টানুন। তাসটা নিজে দেখবেন না, কাউকে দেখাবেনও না...
এইবার তাসটা এই প্যাকেটের নিচে গুঁজে দিন। হ্যাঁ, একেবারে নিচে...
তাহলে চারটের সময় প্যাকেটের নিচে যে তাসটা ছিল এখন আর তা রইলো না। তাই তো?
হ্যাঁ...

এবার যদি সময়কে আবার পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়...মানে আবার
যদি চারটের সময় আমরা ফিরে যাই তাহলে প্যাকেটের নিচে আগের তাসটাই তো থাকবে? কি বলেন?
আমি ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে আবার চারটে করে দিচ্ছি।
এই দেখুন আবার আমরা চারটের সময়ে পৌঁছে গেছি...
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটের নিচের তাসটাও তাহলে পাল্টাবে।
এই দেখুন...আগে যে তাসটা ছিল সেইটাই তো?
আশ্চর্য!
এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার!
কি করে করলেন মশাই?
দারুণ মজার খেলা তাই না? ওঁদের সেদিন বলিনি। আজ তোমাদের কাছে আসল রহস্যটা ফাঁস করে দিচ্ছি। রহস্যটা লুকিয়ে আছে ঐ প্যাকেটের মধ্যে। আসলে প্যাকেটের অর্ধেক তাসই ছিল একইরকম। সাফল করার সময় সেগুলো বাদ দিয়ে বাকীগুলোকে...
সাফল করবে ওপর থেকে। ব্যাপারটা খুব সাবধানে করতে হবে সকলকে কথায় ভুলিয়ে রেখে...
তারপর যখন সময় এগিয়ে দিয়ে আবার তাস বদল করতে বলবে তখন খুব সাবধানে নিচে থেকে এক রকম তাসগুলোকেই মেলে ধরবে টানার জন্যে...
তাহলে নিচের একইরকম তাস থেকে একটা বার করে আবার নিচে রাখা হলো, মানে আগে দেখানো তাসই আবার নিচে থেকে গেলো... তাই তো? সাবধানে খেলাটা দেখাবে। এক জায়গায় কক্ষণো দুবার এই খেলাটা দেখাবে না কিন্তু!

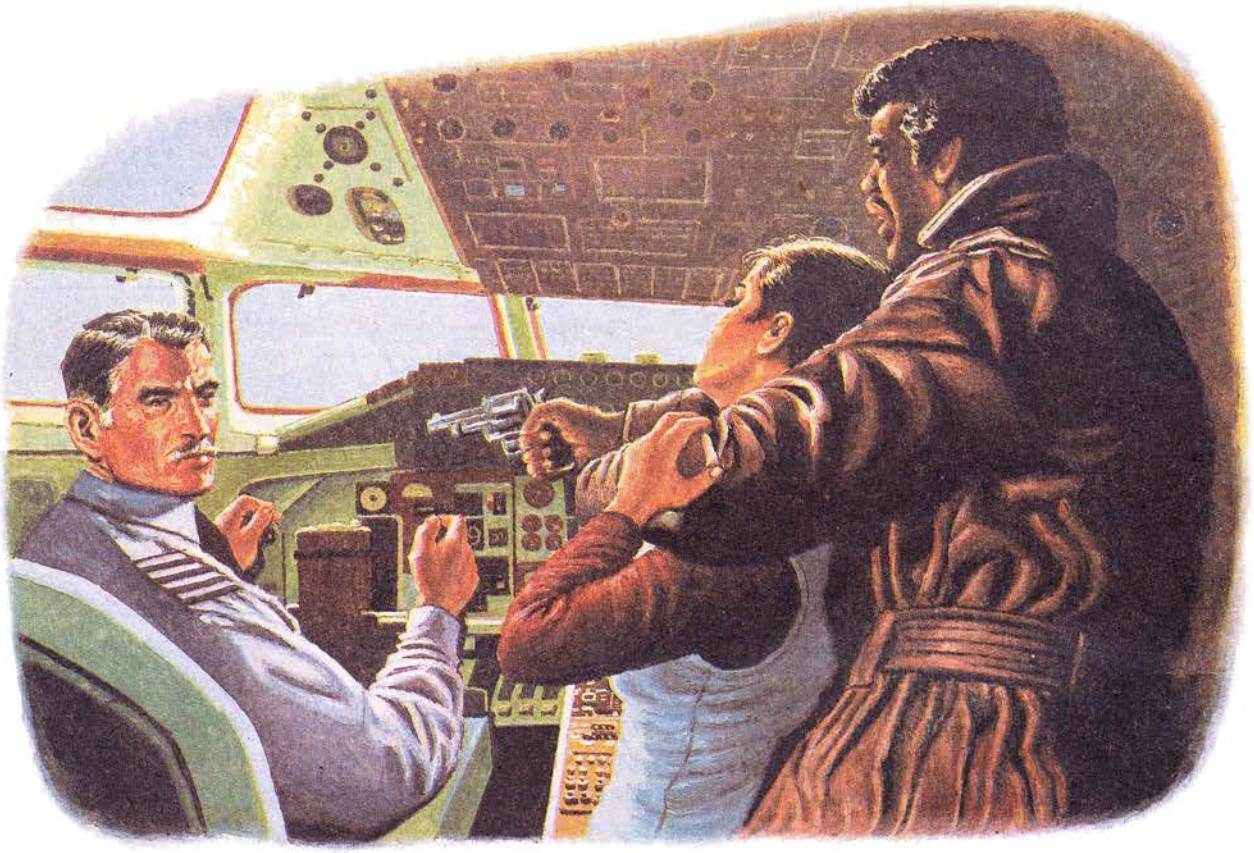

ছিনতাই বিমানে ৫৫ ঘণ্টা

সুরভি বসু

টেনেসির মেমফিস শহরের বিমানবন্দর। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সাদার্ন এয়ারওয়েজ কোম্পানির দু' ইঞ্জিনের একটা ডি সি-৯ জেট বিমান। একটু পরেই রওনা হওয়ার কথা। যাবে ফ্লোরিডার মিয়ামিতে। বিমানের ত্রিশজন যাত্রীর মধ্যে আছেন বিজনেস কনসালটেন্ট ফ্রাঙ্ক মরকিল, কৃষিবিদ্ গেল বুকানন তিরাশি বছরের এক বৃদ্ধ কৃষক অ্যালভিন ফোর্টসন, লম্বা চওড়া দশাসই চেহারার হেনরি জ্যাকসন, লুই মুর আর মেলভিন কেল। পনেরো বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন শ্রীমতী মারজি ব্রেনানও। ওঁদের মধ্যে বৃদ্ধ ফোর্টসনের বিমানে চড়া এই প্রথম। তাই একটু ভয় ভয় করছে তাঁর।

পাইলটের আসনে বসে আছেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম আর হ্যাস। তিনি ছাড়াও বিমানে কর্মী আছেন আরো তিনজন—কো-পাইলট বিলি হ্যালরয়েড জনসন আর দুই বিমানসেবিকা ডনা হলম্যান ও ক্যারেন চেম্বারস। শুক্রবারের এই দিনটিতে বিমান ওড়াবার কথা নয় ক্যাপ্টেন হ্যাসের। যাবার কথা ছিল অন্য একজন পাইলটের। কিন্তু সে এসে ধরেছিল হ্যাসকে তার হয়ে ডিউটিটা করে দেবার জন্যে। অনুরোধ ঠেলতে পারেননি হ্যাস। তাই বন্ধুর বদলে কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটার সময় বিমান নিয়ে তিনিই উড়ে চললেন মিয়ামির উদ্দেশে।

মিয়ামি যাবার পথে বিমানটির আরো কয়েক জায়গায় নামার কথা। আলাবামা স্টেটের বার্মিংহাম শহরে পৌঁছতে এক ঘণ্টাও লাগল না। সেখানে অল্পক্ষণ কাটিয়ে ঠিক ছটার সময় ক্যাপ্টেন হ্যাসের বিমান আবার আকাশে উঠল। এবার লক্ষ্য মন্টগোমারি।

বার্মিংহাম ছাড়ার মিনিট পাঁচেক পর সেবিকা ডনা ককপিটের কাছেই খাবার-দাবার তৈরি করার ছোট ঘরটায় (গ্যালি) ঢুকলেন ক্যাপ্টেনের জন্যে কফি বানাতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসন থেকে

উঠে এল জ্যাকসন। গ্যালিতে ঢুকে কাজে ব্যস্ত ডনার কানে কানে নিচু স্বরে কি যেন বলল, তারপর আচমকা বাঁ হাতে ডনার গলাটা পেঁচিয়ে ধরে তাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল যাত্রীদের মুখোমুখি। ততক্ষণে তার অন্য হাতে উঠে এসেছে ৩৮ ক্যালিবারের একটা স্মিথ ও ওয়েসন পিস্তল।

যাত্রীরা সবাই দেখলেন আস্তে আস্তে ডনার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল তাঁর দৃষ্টি। জ্যাকসন তখন যাত্রীদের উদ্দেশ করে চিৎকার করছে, কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে এতটুকুও নড়বে না। এই বিমান এখন আমাদের। এখন থেকে এটা আমাদের নির্দেশ মতো চলবে। কেউ বীরত্ব দেখাতে এসেছ কি প্রাণে মারা পড়বে।

জ্যাকসনের চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বরে যে ভয়ঙ্কর একটা খুনে মনোভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে মরকিলের বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। শ্রীমতী ব্রেনানের হাত আপনা হতেই এগিয়ে গেল তাঁর ছেলের দিকে। তার হাতটা আঁকড়ে ধরে তিনি আশ্বাস দিলেন, কোনো ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওদিকে উত্তেজনায় বৃদ্ধ ফোর্টসন তখন হাপরের মতো হাঁপাচ্ছেন। তাঁর পুরনো শ্বাসকষ্টটা হঠাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কাশতে শুরু করলেন তিনি। আর জ্যাকসনের দিকে চেয়ে বুকানন তখন ভাবছেন স্ত্রী আজ বাড়িতে যে পার্টি দিয়েছে তাতে বোধহয় তিনি সময়মতো পৌঁছতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে মুর ও কেল তাদের নিরীহ যাত্রীর ভূমিকা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। দুজনের হাতেই বন্দুক। মুর দাঁড়িয়েছে যাত্রীদের আসনের মাঝামাঝি জায়গায়। আর কেল আছে পিছনের দিকে। তার বন্দুকের লক্ষ্য ক্যারেন।

যাত্রীদের বসবার জায়গায় যে নাটক চলছে তা ককপিটে বসে কি করে টের পাবেন ক্যাপ্টেন হ্যাস! তাই দরজায় খুট করে চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনে ভাবলেন ডনা বোধহয় তাঁর কফি নিয়ে এসেছেন। ঘুরে বসলেন তিনি কাপটা নেবার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। কাপ কোথায়! তিনি তাকিয়ে আছেন একটা পিস্তলের নলের দিকে। নল থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন ডনার ভয়ার্ত মুখ। ফিসফিস করে ডনা বললেন, ক্যাপ্টেন এরা আমাদের বিমান ছিনতাই করেছে। আর বুঝি কোনো শব্দ তাঁর গলা থেকে বেরলো না।

অভিজ্ঞ পাইলট ক্যাপ্টেন হ্যাসের বুঝতে বাকী রইল না কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মনের অবস্থা সেই মুহূর্তে তাঁর যাই হোক না কেন মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ হতে দিলেন না তিনি। বিশেষ করে যখন দেখলেন ডনা ভীষণ রকম ভয় পেয়ে গেছেন। এখন তাঁর মধ্যে এতটুকু বিচলতা দেখলে ডনা আরো ঘাবড়ে যাবে। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় তিনি জ্যাকসনকে বললেন, শোন, শোন। উত্তেজিত হয়ো না। আমরা তোমাদের সব কথাই শুনব, কারণ যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না।

ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে জ্যাকসন ডনাকে ছেড়ে দিল। তারপর দুই পাইলটকে হুকুম করল, বিমান ডেট্রয়েটে নিয়ে চলো।

ডেট্রয়েট! সে যে অনেকটা পথ, বললেন ক্যাপ্টেন হ্যাস। ওখানে যেতে হলে বিমানে জ্বালানি ভরতে হবে।

তাতে কি? উত্তর দিল জ্যাকসন। কাছেই মিসিসিপির জ্যাকসন শহরের বিমানবন্দর থেকে জ্বালানি নিয়ে নাও। আর ওদের জানিয়ে দাও বিমান নামলে শুধু জ্বালানির ট্রাকটা ছাড়া এর ধারে কাছে যেন আর কেউ না আসে। এলেই কিন্তু...বলে হাতে ধরা গ্রেনেডটা নাচাতে থাকে জ্যাকসন।

ক্যাপ্টেন হ্যাস কো-পাইলটকে বললেন, জনসন, বিমানবন্দরে জানিয়ে দাও ফ্লাইট ৪৯ ছিনতাই করে ডেট্রয়েটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিমানে জ্বালানি দরকার তাই আমরা ওখানে নামব। ওরা যেন এখুনি সব ব্যবস্থা করে, নাহলে যাত্রীদের জীবন বিপন্ন হবে। আর হ্যাঁ, ওদের আরো বলো বিমান নামলে জ্বালানি ট্রাক ছাড়া ধারে কাছে আর কেউ যেন না আসে।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মতো জনসন বিমানবন্দরে সব কথা জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও জ্যাকসন ককপিট ছেড়ে নড়ল না। গ্রেনেড হাতে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাপ্টেনের পাশে। বিমান নামার পর যতক্ষণ তাতে জ্বালানি ভরা হচ্ছিল ততক্ষণ সে গ্রেনেডটা ধরে রেখেছিল ক্যাপ্টেনের ঠিক কানের কাছে। জ্বালানি ভর্তি করে ট্রাক চলে যেতেই সে ফের হুকুম করল, এবার চলো ডেট্রয়েট। ওই শহরের কাছে আমরা দশ লক্ষ ডলার চাইব। ওখানকার সরকার যদি না দেয় তো বিমানের সব ক'জন যাত্রীকে মেরে ফেলব আমরা।

জ্যাকসনের কথায় হকচকিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন হ্যাস। দশ লক্ষ ডলার! এত অর্থ তারা কেন চাইছে ঐ বিশেষ শহরটার কাছ থেকে?

শুধু ক্যাপ্টেন হ্যাসই নন মুক্তিপণের অঙ্কটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ডেট্রয়েটের মেয়রও। ছিনতাইকারীদের দাবির কথা যখন জানানো হলো বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষকে তখন তাঁরা যোগাযোগ করলেন মেয়রের সঙ্গে। মেয়র তো শুনেই লাফিয়ে ওঠেন, দশ লক্ষ ডলার! কেন তাঁর শহরকে দিতে হবে এই বিপুল অর্থ?

এই কেনর উত্তর পেতে তাঁর বেশি দেরি হলো না। কারণ ততক্ষণে এফ বি আই পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছে। তারা জানাল, হেনরি জ্যাকসন আর লুই মুর ওই শহরেরই দুই পুরনো অপরাধী। একবার কি এক ব্যাপারে পুলিশ তাদের ধরে। তখন পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের ধুয়ো তুলে তারা শহরের কাছ থেকে চার লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ চায়। সে টাকা পায়নি বলেই বিমান ছিনতাই করে তারা চেষ্টা করছে চাপ দিয়ে টাকাটা আদায় করতে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মুরের এক জ্ঞাতি ভাই মেলভিন কেল। সেও দাগী অপরাধী।

মেয়র এবং তাঁর অফিস যখন ছিনতাইকারীদের দাবি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন তখন ডেট্রয়েটের ওপর ক্যাপ্টেন হ্যাস বিমান নিয়ে পাক দিচ্ছেন। প্রায় দুঘণ্টা ধরে চক্কর মারার পর দেখা গেল বিমানের জ্বালানি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। বাধ্য হয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাসকে যেতে হলো ওহিওর ক্লিভল্যান্ড বিমানবন্দরে।

পথে আর এক বিপত্তি। বৃদ্ধ ফোর্টসন বেশ বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিশ্বাসের কষ্ট তো হচ্ছিলই, সেই সঙ্গে শুরু হলো পায়ের যন্ত্রণা। বুকানন উঠে গিয়ে ফোর্টসনের জুতো মোজা খুলে হাত দিয়ে পা ঘষে ঘষে রক্ত সঞ্চালন বাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

এরই মধ্যে বিমানটা ক্লিভল্যান্ডে নেমে জ্বালানি ভরে নিল। বিমান ফের আকাশে উঠতেই জ্যাকসন ক্যাপ্টেনকে জানাল, আর ডেট্রয়েটে নয়, ওদের বলে দাও বিমান কানাডার টরন্টোয় যাচ্ছে। মুক্তিপণ যেন সেখানেই পাঠিয়ে দেয়।

এবার ক্যাপ্টেন হ্যাস প্রমাদ গুনলেন। সময় যত যাচ্ছে তত অধৈর্য হয়ে উঠছে ছিনতাইকারীরা। যাত্রীদের ওপর মানসিক চাপও তত বাড়ছে। এমন অবস্থায় যে কোনো মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। তাই ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি

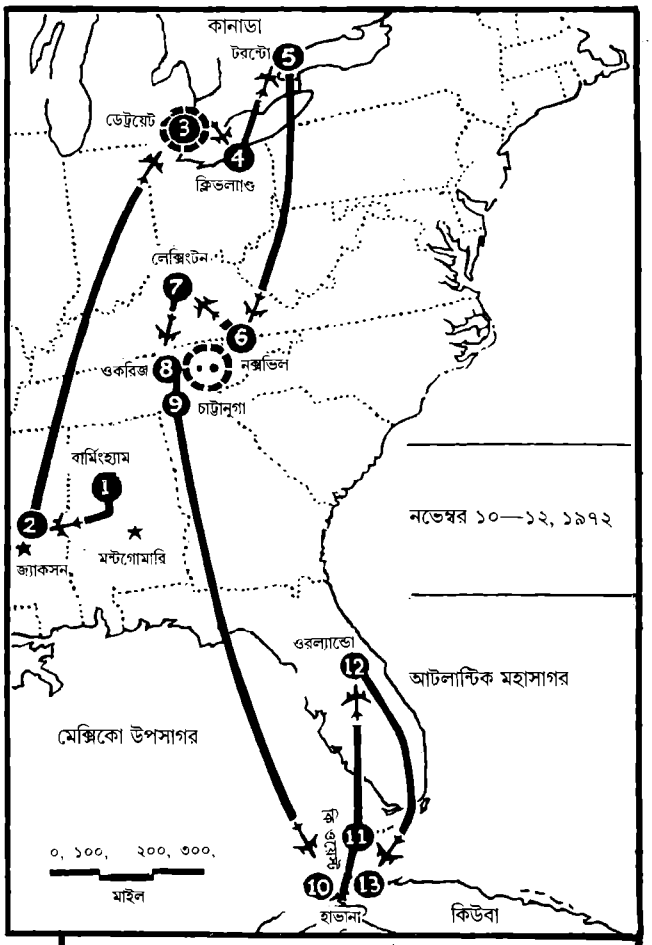

যেসব জায়গায় ডি সি-৯ কে অবতরণ করতে হয়েছিল

কিছুক্ষণের জন্য যাত্রীদের কাছে এলেন। অসুস্থ ফোর্টসনের খোঁজ খবর করলেন, মহিলা যাত্রীদের অভয় দিলেন, পুরুষ যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বললেন। তাঁর হাবভাব দেখে কেউ বুঝতেই পারলেন না বন্দুকের নলের মুখে এতক্ষণ ধরে বিমান চালিয়ে কি উদ্বেগ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। আসলে ক্যাপ্টেন হ্যাস আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন নিজে শান্ত থেকে সকলকে ঠাণ্ডা রাখতে।

বিমান ছিনতাই হবার পর দশ ঘণ্টা কেটে গেছে। শনিবার ভোর চারটে। ক্যাপ্টেন হ্যাস পৌঁছে গেলেন টরন্টোয়। নভেম্বরের আকাশ থেকে দুধ সাদা বরফ ঝরছে শহরের বুকে। তার সঙ্গে চলছে বৃষ্টি। যাত্রীদের বেশিরভাগই ঘুমে ঢুলছেন। শ্রীমতী ব্রেনান বসে আছেন ফোর্টসনের নাড়ি ধরে। অবসন্ন দুর্বল বৃদ্ধ শুয়ে আছেন তিনটি আসন জুড়ে। নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। শ্রীমতী ব্রেনান তাঁর নাড়ির গতি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কেলকে ডেকে বললেন, লোকটা যে মরতে বসেছে। এখুনি অক্সিজেনের ব্যবস্থা করো। কেলের অনুমতি নিয়ে অক্সিজেনের মাস্ক নামানো হলো। উদ্বিগ্ন ব্রেনান তা লাগিয়ে দিলেন ফোর্টসনের মুখে। মনে তাঁর আশা টরন্টোয় নিশ্চয় ছিনতাইকারীদের দাবি পূরণ হবে।

মুক্তিপণ টরন্টোয় এসে পৌঁছেছিল ঠিকই, তবে জ্যাকসনরা যা চেয়েছিল তার অর্ধেক। ক্ষিপ্ত জ্যাকসন তা নিতে অস্বীকার করল। ক্যাপ্টেন হ্যাসকে বলল, বিমানে জ্বালানি ভরে টেনেসির ওকরিজে চল। ওখানে কেন? মনে মনে ভাবলেও মুখে কোনো প্রশ্ন করেননি হ্যাস। জ্যাকসন অবশ্য বেশিক্ষণ তাঁকে অন্ধকারে রাখল না। বিমান চালু হতেই সে জনসনকে বলল, নিচের লোকগুলোকে জানিয়ে দাও যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে। আর না। যদি কাল বেলা বারোটার মধ্যে আমরা পুরো দশ লক্ষ ডলার না পাই তো যাত্রী সমেত এই বিমানকে ওকরিজের একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টারের মধ্যে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করব।

কেঁপে উঠল টরন্টোর কন্ট্রোল টাওয়ারের লোকেরা। সঙ্গে সঙ্গে তারা খবর পাঠাল ওকরিজের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে। বেলা দশটার পর কেনটাকির লেক্সিংটন বিমানবন্দরে জ্বালানি নিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাস যখন হাজির হলেন ওকরিজে তখন পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের তিনটে রিঅ্যাক্টরই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন ছাড়া বাদবাকি আর সব লোককে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওখান থেকে।

সময় এগিয়ে চলেছে। সেইসঙ্গে ক্যাপ্টেন হ্যাসের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হচ্ছে। মুক্তিপণ এখনো আসছে না কেন? কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটায় জ্যাকসন নির্মম গলায় হুকুম করল, ঝাঁপ দাও নিচে।

ক্যাপ্টেন হ্যাস মরিয়াভাবে বলে উঠলেন, আমি পারব না। ভীষণ মেঘ জমেছে নিচে। আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। রিঅ্যাক্টরগুলো যে কোথায় তাও দেখা যাচ্ছে না। দোহাই তোমার, আর এক ঘণ্টা সময় দাও। নিশ্চয় তার মধ্যে মুক্তিপণ এসে যাবে। আসলে আমার কি মনে হয় জানো, টরন্টো আর এখানকার সময়ের মধ্যে যে তফাতটা আছে তাই নিয়েই একটা গণ্ডগোল বেধেছে। তোমরা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখ।

ক্যাপ্টেনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে জ্যাকসন বলল, বেশ, আমি একটা অবধি দেখব। এর মধ্যে আমাদের পুরোটা চাই-ই। তার সঙ্গে সাতটা বুলেট প্রুফ জামা, হেলমেট আর প্রেসিডেন্ট নিকসনের কাছ থেকে একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি যে তিনি আমাদের দশ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করলেন। নিচে জানিয়ে দাও সকলের জন্য খাবারদাবার, পানীয়, ওষুধ যেন পাঠাবার ব্যবস্থা করে। আমাদের কথা অমান্য করা হলে এ নাটকের শেষ হবে কোনো পারমাণবিক কেন্দ্রে।

সাদার্ন এয়ারওয়েজ দেখল মহা বিপদ! এরপর মুক্তিপণ না দিলে ছিনতাইকারীরা কাউকে রেহাই দেবে না। এদিকে তাদের হাতে অত ডলার নেই, আছে মাত্র সাত লক্ষ ডলার। ডেট্রয়েট শহরের দেওয়া পাঁচ লক্ষ আর তাদের নিজেদের সংগ্রহ দু লক্ষ। এটাই তারা ছিনতাইকারীদের দিতে মনস্থ করল এই ভেবে যে সাত লক্ষ ডলার পেলেই হয়ত জ্যাকসনরা হাভানায় পালাবে আর সেক্ষেত্রে পুরো দশ লক্ষ আছে কিনা তা গুনে দেখার সময় পাবে না।

মতলব ঠিক করে একটার কিছু আগে তারা বিমানে খবর পাঠাল টেনেসির চাট্টানুগা শহরের বিমানবন্দরে টাকা দেওয়া হবে, ক্যাপ্টেন হ্যাস যেন ওখানে বিমান নিয়ে চলে যান। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন হ্যাস। যাক, এবার তাহলে যাত্রীরা মুক্তি পাবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক।

চাট্টানুগায় বিমান নামতেই দেখা গেল পাহাড়ের মাথায় লোক চড়ে

বসে আছে। এমনকি বিমানবন্দরের কাছেপিঠে যেসব দোকানবাজার আছে সেখানকার গাড়ি রাখার জায়গাতেও লোক থিকথিক করছে। সবাই হাঁ করে ওপরদিকে চেয়ে বিমানটাকে দেখছে। অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল জ্যাকসনরা। ভিড়ের প্রত্যেকটা মানুষকেই তাদের মনে হতে লাগল এফ বি আইয়ের গোয়েন্দা। ক্যাপ্টেনকে স্পষ্ট বলে দিল জ্যাকসন, ওসব যাত্রী নামানো-টামানো হবে না। মুক্তিপণ হাতে এলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সরে পড়তে চাই এখান থেকে।

দমে গেলেন ক্যাপ্টেন হ্যাস জ্যাকসনের কথা শুনে। মনে উঠল দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার ঝড়। তবে কি এ যাত্রায় কারো রক্ষে নেই!

রানওয়ে ধরে এগিয়ে এসে এক জায়গায় থামতেই দুটো গাড়ি চলে এলো বিমানটির কাছে। একটায় আছে খাবারদাবার আর মুক্তিপণ, অন্যটায় জ্বালানি। ডলার নামানো হচ্ছে গাড়ি থেকে, এমন সময় যে লোকটি জ্বালানি ভরছিলেন তিনি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খাবারের কৌটোগুলোর মধ্যে হোঁচট খেলেন। পড়তে পড়তে তিনি নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিলেও তাঁর পায়ের ধাক্কায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল একগাদা খাবারের প্যাকেট। জ্যাকসনরা একেই ভয়ে ভয়ে ছিল, তার ওপর এই কাণ্ড দেখে ভাবল, লোকটা নিশ্চয় এফ বি আইয়ের গোয়েন্দা, ইচ্ছে করে কাজে দেরি করিয়ে তাদের আটকে রাখতে চাইছে। আর যায় কোথায়! জ্যাকসন নিমেষে বন্দুক তুলল তার দিকে। গুলি বোধহয় সে করেই বসত যদি না ক্যাপ্টেন হ্যাস তাকে সময়মতো বাধা দিতেন। জ্যাকসনকে বোঝালেন, ঘাবড়াচ্ছো কেন? দেখছ না লোকটা তোমারই মতো ভয় পেয়ে গেছে। তাই ওর হাতপায়ের ঠিক নেই। তারপর লোকটার দিকে ফিরে বললেন, তুমি ধীরে সুস্থে কাজ করো, কোনো ভয় নেই। লোকটা কোনোক্রমে জ্বালানি ভর্তি করেই ট্রাক নিয়ে উধাও হলো।

ট্রাক চলে যেতেই জ্যাকসন আদেশ করল এবার আমাদের হাভানায় নিয়ে চলো আর ওখানে বলে রাখ ফিডেল কাস্ত্রো যেন বিমানবন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন।

জনসন মারফৎ বার্তাটা পৌঁছে গেল হাভানার জোসি মারটি বিমানবন্দরে।

হাভানায় এসে বিমান থামতে না থামতেই বন্দুক আর গ্রেনেড হাতে ককপিটের জানালা দিয়ে দড়ি বেয়ে নেমে এল জ্যাকসন আর মুর। কিন্তু কোথায় কাস্ত্রো! তাদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল কিউবার একদল সৈনিক আর সরকারী কর্মচারী। হাতখানেক ব্যবধান রেখে তারা ঘিরে ধরল জ্যাকসনদের। ওরা যত চেঁচায় 'আমরা কাস্ত্রোর সঙ্গে দেখা করতে চাই' বলে, সৈনিকরা তত এগিয়ে আসে তাদের দিকে। বেগতিক দেখে জ্যাকসনরা গ্রেনেড ছোঁড়ার ভয় দেখিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল বিমানে। আর খোলা জানালাপথে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকল, আমরা ফিডেলকে চাই, বিমানে জ্বালানি চাই, যদি না দাও এক এক করে যাত্রীদের মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেব বিমান থেকে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই অবস্থা চলার পর মরকিলের হঠাৎই মনে হলো দুপক্ষই বোধহয় কারো কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। মরকিল স্প্যানিশ ভাষা ভালোই জানতেন। তিনি এগিয়ে এলেন জ্যাকসনের হয়ে কথাবার্তা বলতে। কন্ট্রোল টাওয়ারকে অনুনয় করলেন তিনি, দোহাই আপনাদের, ওদের কথা শুনুন। বাইশ ঘণ্টা হতে চলল এই বিমান ছিনতাই হয়েছে। ওরা ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছে। দোহাই, যা চাইছে তাই দিয়ে এতগুলো যাত্রীর প্রাণ বাঁচান।

বিমান আবার উড়ল আকাশে।

মরকিলের অনুরোধে কাজ হলো। একটা জ্বালানির ট্রাক সঙ্গে সঙ্গে এলো বিমানটার কাছে। কিন্তু কিছুটা মাত্র জ্বালানি ভরেই সেটা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। যেটুকু জ্বালানি পেয়েছিলেন তার ওপর ভরসা করেই জ্যাকসনের নির্দেশে ক্যাপ্টেন হ্যাস এলেন ফ্লোরিডার কি ওয়েস্টে। ওখানে মার্কিন নৌবাহিনীর একটা বিমানঘাঁটি আছে। সেখানে পুরোপুরি জ্বালানি ভরে নেবার পর জ্যাকসন প্রায় একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসল। ক্যাপ্টেন হ্যাসকে সে বলল, এবার সোজা চলো সুইজারল্যান্ড।

অসম্ভব, জ্যাকসনের কথায় প্রতিবাদ করে উঠলেন হ্যাস। বললেই কি যাওয়া যায়! আটলান্টিক পাড়ি দেবার আগে বিমানের সব যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক আছে কিনা তা তো দেখতে হবে। যেমন ধরো এই ডি সি ৯ বিমানের ইঞ্জিন দুটোতে যে বিশেষ ধরনের তেল লাগে তা এই বিমানঘাঁটিতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া পথনির্দেশ করতে যেসব চার্ট দরকার তাও আমাদের কাছে নেই। আমাদের অন্য কোনো বিমানবন্দরে গিয়ে এই বিমান পাল্টাতে হবে। তোমরা জানো না কিন্তু আমি জানি সাদার্ন এয়ারওয়েজ কোম্পানির এটাই হচ্ছে সবথেকে খারাপ বিমান আর আমরা হচ্ছি কোম্পানির সবথেকে অকেজো কর্মী।

জ্যাকসন ক্যাপ্টেনের কথা অগ্রাহ্য করতে সাহস করল না। শুধু বলল, তোমার যা দরকার ওরল্যান্ডোর ম্যাকয়তে বিমানবাহিনীর যে

ঘাঁটি আছে সেখান থেকে নিয়ে নাও।

সুতরাং বিমান আবার উড়ল আকাশে। এবার কিন্তু গেল বুকানন হতাশায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর মন বলছে একমাত্র মৃত্যুতেই বোধহয় এ বিভীষিকার শেষ হবে। কারণ ইঞ্জিনগুলো একটানা আর কতক্ষণ ঠিকমতো চলতে পারবে? দু রাত্রি না ঘুমিয়ে পাইলটরাই বা আর কতক্ষণ পারবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিমান চালাতে? হায় ভগবান! আপন মনেই বিড়বিড় করেন তিনি, মৃত্যু কত দূর?

বুকাননের অজান্তে ওদিকে ম্যাকয় বিমানঘাঁটিতে তখন চলছে এই নাটক খতম করার প্রস্তুতি। বিমান ম্যাকয়তে আসছে শুনেই সেখানকার ভারপ্রাপ্ত এফ বি আই গোয়েন্দা তার প্রধানের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছে যে বিমান নামলে কোনোমতেই যেন তাকে আর উড়তে দেওয়া না হয়। সেই মতো সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ে অধীর আগ্রহে বিমানের জন্য অপেক্ষা করছে গোয়েন্দারা।

দেখতে দেখতে বিমান এসে পৌঁছল ম্যাকয়তে। চারিদিকে অন্ধকার নেমেছে। বিমান থামতেই এগিয়ে গেল জ্বালানির ট্রাক। ট্যাঙ্ক ভরতি করতে শুরু করল। হঠাৎ দেখা গেল রাতের অন্ধকারে মিশে সাবধানে এগিয়ে আসছে কতগুলো ছায়ামূর্তি। বিমানের পেছনদিকে গিয়ে তার তলায় ঘাপটি মেরে বসল সবাই। সংখ্যায় তারা পনেরো জন। এরা সবাই এফ বি আইয়ের গোয়েন্দা। এসেছে বিমানটিকে আটকাতে। জ্বালানি ভর্তি করে ট্রাকটা চলে যেতেই তারা একসঙ্গে গুলি চালাল বিমানের চাকাগুলো লক্ষ্য করে। বাঁদিকের দুটো চাকাই ফুটো হয়ে বসে গেল। অক্ষত রইল ডান দিকের আর সামনের চাকাগুলো।

বিমানের ভেতরে জ্যাকসনরাও শুনতে পেয়েছে একটা চাপা ফটফট শব্দ। উৎকীর্ণ হয়ে উঠল তারা। ও কিসের আওয়াজ! কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিমানের বাঁদিকটা যেন বসে গেল। এবার বুঝতে পারল তারা। বিমূঢ়তার বদলে মুখে ফুটে উঠল আক্রোশ। ছুটে গিয়ে ককপিটের জানলা দিয়ে মুর গুলি চালাল ফিরে যাওয়া ট্রাকটা লক্ষ্য করে। তার দেখাদেখি জ্যাকসনও গুলি ছুঁড়ল অন্য জানলা দিয়ে। গুলি দুটো ক্যাপ্টেনের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কোনোটাই ট্রাকে গিয়ে লাগল না। জ্যাকসন এবার দৌড়ে চলে এল গ্যালিতে। গ্যালির মেঝে ভেদ করে সে দুবার গুলি ছুঁড়ল নিচের লোকগুলোর দিকে। পাগলের মতো সে তখন চেঁচাচ্ছে। দেখাচ্ছি মজা। বিমানের সবকটা লোককে খতম করে ছুঁড়ে ফেলছি তোমাদের সামনে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে দাঁড়াতেই তার চোখ পড়ল জনসনের ওপর। কর্কশ গলায় সে বলে উঠল, এই তুমি, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। টাওয়ারের সঙ্গে তুমিই যোগাযোগ রেখেছিলে, নিশ্চয় ওদের বলেছ এই কাজ করতে। আগে তোমাকেই গুলি করব।

বলতে বলতেই এক হ্যাঁচকা টানে জনসনকে তাঁর জায়গা থেকে তুলে আনল জ্যাকসন আর মুর। যাত্রীদের বসার জায়গায় আসতেই কেঁদে উঠলেন দুই সেবিকা, দোহাই ওঁকে মেরো না। কিন্তু তখন কে শোনে কার কথা। জ্যাকসন ট্রিগারে আঙুল রাখতেই জনসন ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই সারি আসনের মাঝখানে। আসন ভেদ করে গুলি এসে লাগল তাঁর ওপর হাতে। হাড় ভেঙে দিল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন জনসন। জ্যাকসন আবার বন্দুক তুলল কিন্তু এবার বাধা দিল মুর। করো কি! ওকে প্রাণে মেরো না। পরে হয়তো ওকে কাজে লাগানো যেতে পারে। খুনোখুনি না করে চল আগে পালাই এখান থেকে।

মুরের ইশারায় জনসন উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে তাঁর মুখ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জামা। জ্যাকসন তাঁকে ঠেলে ককপিটে পাঠিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাসকে বলল, চলো এখান থেকে।

হ্যাস বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওরা আমাদের চাকা...

তাঁকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে গর্জে ওঠে জ্যাকসন, হয় বিমান ওড়াও নয় সকলে মরো।

দাঁতে দাঁত চেপে দুটো ইঞ্জিনই পুরোদমে চালু করে দিলেন ক্যাপ্টেন হ্যাস। সঙ্গে সঙ্গে একটা জোর হাওয়ার ধাক্কায় নিচের লোকগুলো ঠিক লেবুর মতো গড়িয়ে গেল চারদিকে। বিমানটাও নড়ে উঠে বিশ্রী ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে ছুটে চলল রানওয়ে দিয়ে। সেটার সারা শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে।

ছেঁড়া ফাটা চাকা নিয়ে ছুটছে যেন লাফাতে লাফাতে। মরকিল দেখলেন তাঁদের আর রক্ষে নেই। যে কোনো মুহূর্তে চাকা হড়কে গিয়ে বিমানটা ভেঙে পড়বে, আর পরমুহূর্তেই শোনা যাবে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। তারপর? তারপর আর কি, সব শেষ! বুকাননও চাইছেন এমনই একটা কিছু হয়ে যাক। বিমান ভেঙে পড়ুক, তাতে আগুন লাগুক, যা হয় একটা কিছু হোক। তাহলে অন্তত কিছু যাত্রী পালাবার সুযোগ পাবেন।

সবাইকার সব আশঙ্কা নির্মূল করে বিমানটা একভাবে লাফাতে লাফাতে চলেছে। ঘষটানি লেগে ফাটা টায়ার থেকে ছিঁড়ে এলো রবারের টুকরো। উড়ে গিয়ে ঢুকল বাঁদিকের ইঞ্জিনে। রবার খুলে যেতেই ভেতরের রিম দুটো কেটে বসে যেতে লাগল মাটিতে। আর তাতেই ছুটল আগুনের ফুলকি।

ক্যাপ্টেন হ্যাসের এসব দিকে তাকাবার ফুরসত নেই। তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বিমানের গতি-নির্ধারক যন্ত্রের দিকে। ওই ডি সি ৯ বিমানকে তুলতে যে গতির দরকার হয় তা সাধারণত ঘণ্টায় ১৪০ থেকে ১৫০ মাইল। সেখানে যন্ত্র যখন দেখাল বিমানের গতি ১২০ মাইল তখন রানওয়ে আর কতটা বাকী আছে তা হিসেব করে নিয়ে ক্যাপ্টেন বিমানকে আকাশমুখো করার জন্য থ্রটলে টান দিলেন। মুহূর্তে সমস্ত ঝাঁকুনি বন্ধ হয়ে গেল। বিমানটা আরো কয়েকশ গজ এগিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল আকাশে। ক্যাপ্টেনের মনে হলো ওপর থেকে কেউ যেন বিমানটাকে ধরে তুলে নিল।

ওরল্যান্ডো দূরে মিলিয়ে যেতেই ক্যাপ্টেন হ্যাস তাকালেন জ্যাকসনের দিকে। শান্তভাবে তাকে বললেন, দেখ বিমানটা আর একবার মাত্র নামতে পারবে। তবে সে চেষ্টা করতে গেলে ভেঙেও যেতে পারে। যাই হোক না কেন, তোমাদের জেনে রাখা ভালো এ বিমান আর কিছুতেই উড়তে পারবে না।

অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনের কথার কোনো প্রতিবাদ না করে জ্যাকসন শুধু জানাল, বিমানটা আবার হাভানায় নিয়ে চল।

ইঞ্জিনে যাতে কোনোরকম চাপ না পড়ে সেজন্য বিমানটাকে খুব মন্থর গতিতে দক্ষিণমুখো উড়িয়ে নিয়ে চললেন ক্যাপ্টেন হ্যাস। রাত সাড়ে এগারোটায় তিনি ডেকে পাঠালেন মরকিলকে। বিমানের অবস্থা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, আপনি হাভানায় জানান আমরা জরুরি অবতরণ করব। ওরা যেন রানওয়ের ওপর ফোম ছড়িয়ে রাখে।

মরকিল সে কথা হাভানায় জানাতেই উত্তর এল, পুরো রানওয়েতে ছড়াবার মতো ফোম আমাদের নেই। তবে ফোম ট্রাক আমরা তৈরি রাখছি। অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে সেটা চলে যাবে বিমানের কাছে। তোমাদের এখন কতটা জ্বালানি আছে?

সোয়া এক ঘণ্টা ওড়ার মতো। দুহাজার ফুট উচ্চতায় থেকে

ওটুকু নিঃশেষ করে তবে পাইলট বিমান নামাবেন।

ঠিক আছে। তোমরা কিন্তু শহরের এলাকা থেকে দূরে থেকো।

টাওয়ার যা বলেছে তা ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে মরকিল চলে এলেন নিজের আসনে। সেবিকা দুজন যাত্রীদের জরুরী অবতরণের জন্য তৈরি করছেন। আসনে বসতে বসতেই তিনি শুনতে পেলেন ক্যারেন বলছেন, বিমান নামতে শুরু করলেই মাথাটা হাঁটুর ওপর রাখা বালিশে নামিয়ে আনবেন। দু হাত দিয়ে চেপে ধরবেন দুই গোড়ালি। যতক্ষণ না বিমান পুরোপুরি থামছে ঠিক এইভাবে বসে থাকবেন। বিমান থামলেই আমরা এমারজেন্সি দরজা খুলে দেবো। আপনারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবেন।

যাত্রীদের যথাযথ নির্দেশ দিয়ে ডনা চলে এলেন ককপিটে। ক্যাপ্টেনকে বললেন, আমাদের যা জানা ছিল সব বলেছি। আর কি কিছু বলতে হবে?

ক্যাপ্টেন হ্যাস তাকালেন ডনার দিকে। তিনি বুঝতে পারছেন ডনার মনের অবস্থা। হেসে তাঁকে আশ্বাস দিলেন, ভয় নেই ডনা, তুমি এখনো অনেক দিন বাঁচবে।

ক্যাপ্টেনের কথায় জল এসে গেল ডনা হলম্যানের চোখে। এরকম অভয়বাণী দিতে হয় পাইলটদের। তা বলে তিনি কি করে বিশ্বাস করবেন সে কথা? চোখের জল লুকোতে ডনা তাড়াতাড়ি চলে এলেন যাত্রীদের কাছে।

এদিকে জ্বালানির ট্যাঙ্ক ক্রমশ খালি হয়ে আসছে। ক্যাপ্টেন বিমানকে ঘুরিয়ে নামাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ছিনতাইকারীরা ডলারের প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল সামনের দরজার কাছে, যাতে বিমান থামলেই তারা পালাতে পারে। যাত্রীরা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। শ্রীমতী ব্রেনান বৃদ্ধ ফোর্টসনকে সাহস দিতে তাঁর একটা হাত চেপে ধরলেন। অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে। মার চোখে জল দেখে ছেলে তাঁর হাতটা আঁকড়ে ধরল।

বিমান তখন নামতে নামতে একেবারে মাটির কাছে এসে গেছে। মাটি যেন ভীমবেগে ছুটে এল বিধ্বস্ত বিমানটাকে শেষ আঘাত হানতে। খুব সাবধানে আলতো করে, ঠিক যেমনভাবে সার্কাসের খেলোয়াড়রা উঁচু দড়ির ওপর হাঁটে। ঠিক তেমনিভাবে ক্যাপ্টেন হ্যাস চাকাগুলোকে মাটি স্পর্শ করালেন, মাটি ছোঁওয়ামাত্র বাঁদিকের চাকা দুটো আগুনের ফুলঝুরি ছড়াতে থাকল। বিমানটিও লাফাতে লাফাতে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ছুটে চলল রানওয়ে ধরে। দরজা জানলাগুলো কেঁপে উঠল ঠকঠক ঝনঝন করে। বিমানের ভেতরের দেওয়ালগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল। শেষে আস্তে আস্তে গতি কমতে কমতে বিমানটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তলা দিয়ে তখন ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল তিন ছিনতাইকারী। ডলারের প্যাকেট হাতে তারা দৌড় লাগাল বিমানবন্দরের ধারে লম্বা লম্বা ঘাসবনের দিকে। কিন্তু তিন মিনিটের মধ্যেই তাদের ধরে ফেলল কিউবার সৈনিকেরা। যে নাটক শুরু হয়েছিল টেনেসি স্টেটে ১৯৭২ সালের ১০ নভেম্বর তা শেষ হলো ১২ নভেম্বর রবিবার জোসি মার্টি বিমানবন্দরে রাত্রি বারোটা বত্রিশ মিনিটে। আমেরিকা, কানাডা ঘুরে কিউবায় এসে ফ্লাইট ৪৯ শেষ করল তার যাত্রা।

যাত্রীরা নিরাপদে নেমে এলেন বিমান থেকে। সবশেষে নামলেন ক্যাপ্টেন হ্যাস। নিচে তখন এক দারুণ চমক অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। মাটিতে পা রাখতেই তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল কাস্ত্রো। মরকিল দো-ভাষীর কাজটা সারলেন। ক্যাপ্টেনের দুটো হাত টেনে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট, অপূর্ব! সত্যিই আপনার তুলনা হয় না। যে দক্ষতার সঙ্গে বিমানটাকে নামালেন তাতে করে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। এতগুলো লোকের প্রাণ বেঁচেছে শুধু আপনার জন্যে। আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই।

ফিডেলের প্রশংসায় লজ্জা পেলেন ক্যাপ্টেন হ্যাস। তিনি তো শুধু পাইলটের কর্তব্যটুকু পালন করেছেন। কোনোক্রমে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাউঞ্জের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। দরজা দিয়ে ঢুকতেই প্রচণ্ড করতালির শব্দে চমকে মুখ তুলে দেখলেন বিমানের সমস্ত যাত্রী আর সহকর্মীরা উঠে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে দেখে। সবার চোখে জল। শুধু এই মানুষটির জন্যই আজ সকলে আবার শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াতে পেরেছেন। তাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা উজাড় করে সেই মানুষটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই ভিজে ওঠে ক্যাপ্টেন হ্যাসের দু' চোখের পাতা।

[জোসেফ পি ব্লাঙ্কের 'উই আর টেকিং ওভার দিস প্লেন' অবলম্বনে]

ছবি: বিজন কর্মকার

পুজোয় কোথায়?

সলিল মিত্র

'পুজোয় কোথা যাচ্ছো শুনি?
হরিদ্বার কি রাজগীরে?
নাকি এবার, ছুটির ক'দিন
কাটবে সময় 'তাজ' ঘিরে?

টপকে পাহাড় দার্জিলিঙের
টাইগার হিল? নয়কো তা-ও?
হলদিয়া কি দীঘায় তবে
চটজলদি বেড়িয়ে নাও!
তা-ও যাবে না? তবে কোথায়?'

'বারোয়ারীর অঙ্গনে
পুজোয় ক'দিন নাচবো, যদি
পারিস তো আয়, সঙ্গ নে!'

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

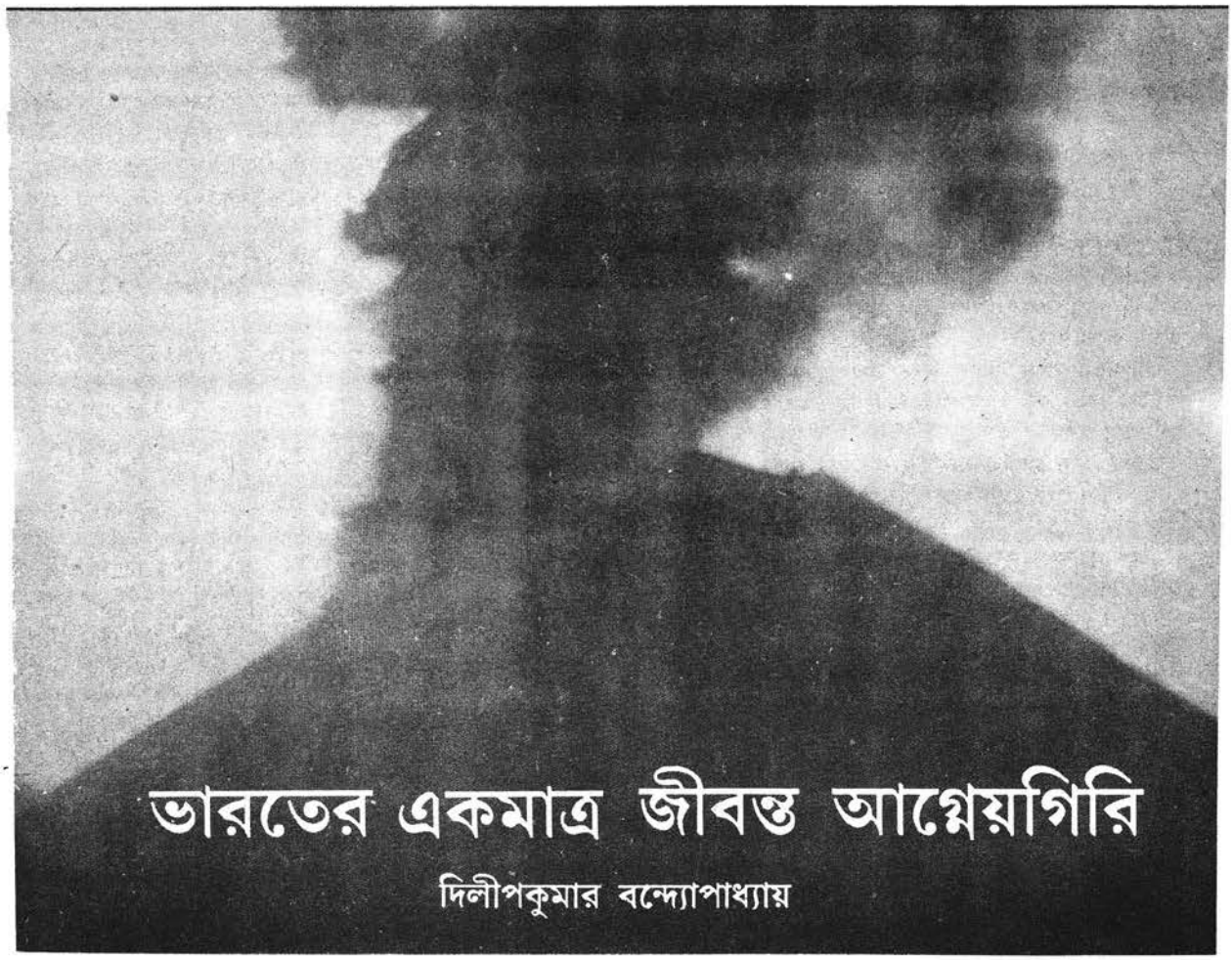

ভারতের একমাত্র জীবন্ত আগ্নেয়গিরি

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নানা দেশের মহাকাব্য বা প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে আগ্নেয়গিরি নিয়ে যত গল্পকাহিনী আছে, প্রাকৃতিক আর কোনো বিপর্যয় নিয়ে তেমনটি নেই। অথচ ভারতের কোনো মহাকাব্য বা পুরাণের কাহিনীতে আগ্নেয়গিরির কথা প্রায় নেই বললেই চলে। কেন নেই? এর কারণ বোধহয় এই, ভারতের মূল ভূখণ্ডে কোনো আগ্নেয়গিরি নেই। ভারতে যে দুটি আগ্নেয়গিরি আছে, তা আছে মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। আর সে দুটি হলো নারকোনডাম ও ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি।

নারকোনডাম দ্বীপের আগ্নেয়গিরিটির নামকরণ 'নরক-কুণ্ডম্' শব্দটি থেকে। নরককুণ্ডই বটে। সে যাই হোক, এটি অগ্ন্যুৎগার করেছিল আজ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে, প্লায়াস্টোসিন (Pleistocene) যুগে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়েছে। সে ঘুম আর ভাঙেনি। এখনও এটি ঘুমন্ত।

এই কিছুদিন আগেও ভূবিজ্ঞানীরা মনে করতেন ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরিটিও বোধহয় ঘুমন্ত, কারণ গত ১৮৮ বছরে এই আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু ১৯৯১ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে রামায়ণের কুম্ভকর্ণের মতো হঠাৎ জেগে উঠে চারিদিক লণ্ডভণ্ড করে ব্যারেন আগ্নেয়গিরি প্রমাণ করেছে সে মরে যায়নি, জেগে আছে। ভূবিজ্ঞানীদের ভাষায় সজীব। সেই অর্থে ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরিই ভারতের একমাত্র সজীব বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার পূর্বদিকে আন্দামান সাগরের জল থেকে মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এই দ্বীপটি। ব্যারেন দ্বীপের সবটাই অবশ্য আগ্নেয়গিরি নয়। ছোট্ট দ্বীপের মাঝখানে প্রায় ৩৫০ মিটার উঁচু শঙ্কু আকৃতির আগ্নেয়গিরি বা আগ্নেয়পর্বত। আগ্নেয়গিরির শরীর গাছপালাহীন হলেও দ্বীপের বাদবাকি জায়গায় ঘন জঙ্গল। এ জঙ্গলে চরে বেড়াত জংলী ছাগল। ঐ দ্বীপে কোনো মিষ্টি জলের উৎস নেই বলে সমুদ্রের নোনা জলই পান করত জংলী ছাগলরা। এই অগ্ন্যুৎপাতে ঐ জংলী ছাগলরা প্রাণ

হারিয়েছে।

১৯৯১ সালে মার্চ মাসের শেষদিকে ব্যারেন দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলেও বাইরের পৃথিবী এই অগ্ন্যুৎপাতের খবর পেয়েছে কিছুদিন পরে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্দামান সমুদ্রের উপকূলরক্ষী বাহিনীর একটি জাহাজের কর্মীরা সমুদ্রে টহলের সময় জাহাজ থেকে প্রথম দেখতে পান আগ্নেয়গিরিটির জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কিন্তু অগ্ন্যুৎপাতের তীব্রতা ক্রমেই বাড়তে থাকে। দিনের পর দিন অগ্ন্যুৎপাতের নানা পর্যায়ে জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসে ফুটন্ত লাভাস্রোত, গরম ছাই, পাথরের টুকরো, জলীয় বাষ্প ও নানা রকম গ্যাস। তারই সঙ্গে আগুনের বড় বড় হলকা আতসবাজির মতো জ্বালামুখের গহ্বর থেকে লাফিয়ে উঠেছে বারবার। লক্ষ লক্ষ আতসবাজি একসঙ্গে পোড়ালে যেমন হয়, অনেকটা সেইরকম। আগুনের ঘন লাল আভা দেখা গেছে দূর সমুদ্রের চলমান জাহাজ থেকেও। ওদিকে অগ্ন্যুৎপাতের তীব্রতা বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একদিন জ্বালামুখটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায় চারিদিকে। ফলে জ্বালামুখটির এখনকার আয়তন আগের চেয়ে প্রায় পাঁচ গুণ বড়।

সিসিলি দ্বীপের উত্তরে লিপারি দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির সঙ্গে ব্যারেন দ্বীপের এই অগ্ন্যুৎপাতের মিল লক্ষ্য করেছেন ভূবিজ্ঞানীরা। প্রায় সাত মাস ধরে একটানা অগ্ন্যুৎপাতের পর অক্টোবরের মাঝামাঝি শেষ পর্যন্ত এই অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হয়।

ক্ষয়ক্ষতির হিসেব কষতে গিয়ে দেখা গেছে প্রায় দেড় বর্গকিলোমিটার জায়গা ডুবে গেছে লাভাস্রোতের নিচে। জ্বালামুখ থেকে জ্বলন্ত লাভা আগ্নেয়গিরির শরীর বেয়ে সমুদ্রে গড়িয়ে পড়ায় সমুদ্রের জল ফুটে উঠেছে টগবগ করে। বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন, কোথাও কোথাও জলের তাপমাত্রা ৬০° সেন্টিগ্রেড-এ পৌঁছে গেছে।

ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি।

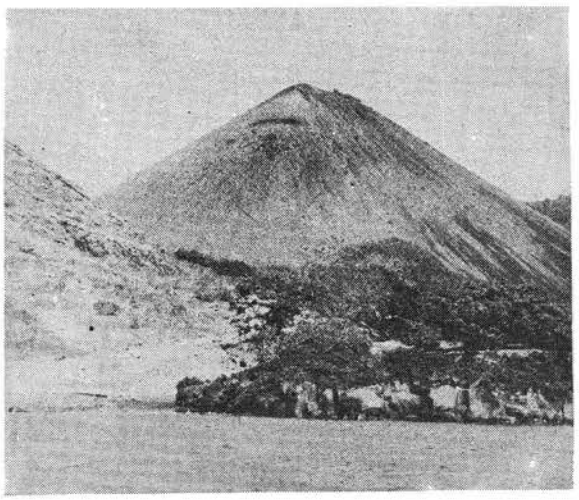

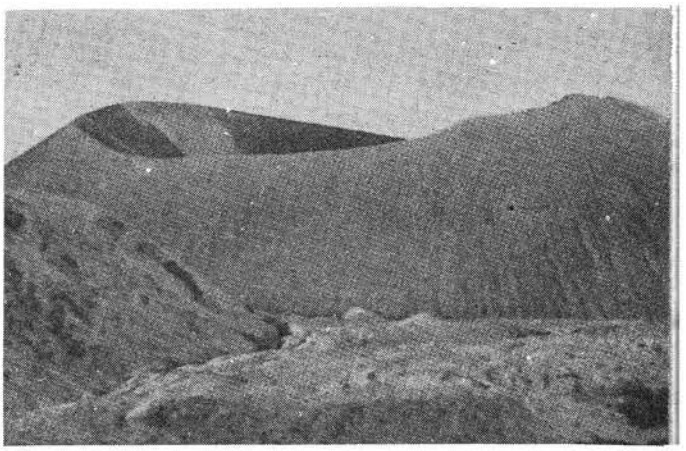

অগ্ন্যুৎপাতের পর আগ্নেয়গিরির শান্ত চেহারা।

দ্বীপে গন্ধকের আস্তরণ জমেছে।

এই অগ্ন্যুৎপাতে লোকজন মারা না গেলেও পরিবেশদূষণ ও মাছচাষের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসা ছাই দূরের দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে শস্যক্ষেতেরও বেশ ক্ষতি করেছে। দ্বীপের পশ্চিমদিকে বারো ফুট উঁচু যে লাইট-হাউসটি ছিল, সেটি ঢাকা পড়ে যায় লাভাস্রোতের নিচে।

জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য বিজ্ঞানসংস্থার বিজ্ঞানীরা ব্যারেন দ্বীপের এই অগ্ন্যুৎপাতের পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য ফলাফল নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। আপাতত ঘুমিয়ে পড়লেও ভবিষ্যতে ব্যারেন আগ্নেয়গিরিটির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার সম্ভাবনা কতখানি, তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা কম চিন্তিত নন।

ছবিঃ ডঃ ডি. হালদার, জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে

বনের হাতি বনে

পরেশ ভট্টাচার্য

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় সূরযপ্রসাদের। পায়ে কে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। উঠে বসলেন সূরযপ্রসাদ। দেখলেন তাঁর পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে বাহাদুর। এদিকে টাইগারও গর্জন করে উঠলো।

বাহাদুর হলো সূরযপ্রসাদের একান্ত প্রিয় একচোখ কানা বানরের নাম। আর টাইগার নামে ডাকেন বিশ্বস্ত আলসেশিয়ানটিকে।

সিংভূম জেলার যদুগোড়া এলাকার জঙ্গলবাবু সূরযপ্রসাদ। বিহারের বিভিন্ন বনাঞ্চল ঘুরে এই এলাকায় এসেছেন বছর সাতেক হলো।

বিজলী বাতি নেই। ঘরে জ্বলছে হ্যারিকেন। তা-ও আলোর জোর কমানো।

বাহাদুরের মাথায় হাত দিয়ে সূরযপ্রসাদ বললেন, যা রে বাহাদুর, আলোটার জোর বাড়িয়ে দিয়ে আয়।

বলার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে গেল বাহাদুর ; আলোটার জোর বাড়িয়ে দিয়ে এলো। টাইগার তখনো জানালার ধারে দু-পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে গর্জে গর্জে উঠছে।

ঘড়ির দিকে তাকালেন সূরযপ্রসাদ। রাত দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। খাটিয়া থেকে নামলেন সূরযপ্রসাদ। আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে জানালার কাছে এলেন। বাইরে ঘন অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা গেল না।

বাহাদুর আর টাইগারকে নিয়ে অফিসঘরেই রাত কাটান সূরযপ্রসাদ। যদিও পাশেই রয়েছে তাঁর কোয়ার্টার। কিন্তু তাঁর কাছে অফিস- ঘরটি প্রিয়।

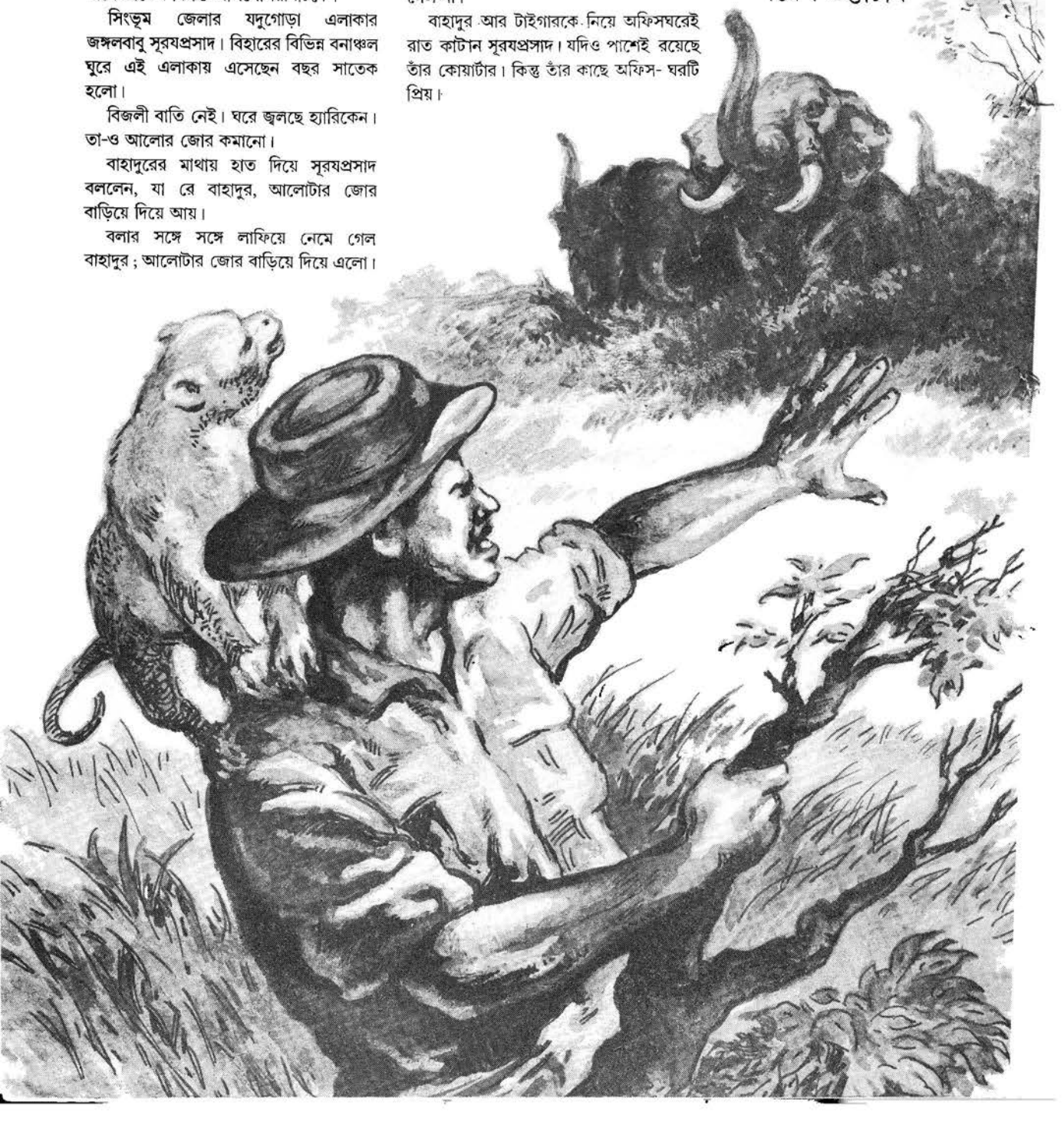

খাটিয়ায় বালিশের পাশেই থাকে রিভলবার আর টর্চ। রাইফেলটা থাকে টেবিলের ওপর।

এবারে সূরযপ্রসাদ জোরালো টর্চটা হাতে নিয়ে জানালার কাছে এলেন। জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেললেন। কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না। ভাবলেন, দরজা খুলে বাইরে না গেলে নয়।

পাহাড়ী এলাকায় গভীর অরণ্যের মধ্যে বন-বিভাগের অফিস। অফিসের চারদিক বড় বড় শালখুঁটি দিয়ে ঘেরা। কাঁটাতারও জড়ানো শাল-খুঁটির গায়ে।

এই বেষ্টনীর মধ্যে বনবিভাগের অফিস এবং কোয়ার্টার্স। আসা-যাওয়ার একটি মাত্র পথ। তা-ও প্রয়োজন ছাড়া খোলা হয় না। লোহার ফটকটি দারুণ মজবুত।

অফিস থেকে আর একটি পথ চলে গেছে কাছেই টিলা পাহাড়টার ওপরে। সেখানে পর্যটক এবং বনবিভাগের বিশেষ পদস্থ ব্যক্তিদের জন্যে একটি ছোট অথচ সুন্দর বাংলো। তবে এই এলাকায় পর্যটক তেমন আসেন না।

দরজা খুলবেন কি খুলবেন না, একটু ভাবলেন সূরযপ্রসাদ। অথচ না খুললেই নয়। কেননা বাহাদুর বিনা কারণে তাঁর ঘুম ভাঙাবে না, আর টাইগারও অকারণে গর্জন করে না।

ভাবলেন, দক্ষিণের জানালা দিয়ে একবার টর্চের আলো ফেললে ভালো হয়। ফেললেনও। কিন্তু এবারেও কোনো কিছু চোখে পড়লো না।

এবারে দরজা খুললেন সূরযপ্রসাদ। টর্চের আলো ফেললেন চারদিকে। না, কোনো কিছু চোখে পড়লো না।

অফিসের বাইরে একফালি বারান্দা। বারান্দার কোণ দিয়ে নিচে নামার কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বুনো হাতির করুণ আর্তনাদ। গভীর রাতে অরণ্যের নীরবতা ভেঙে গেল। একটা নয়, বেশ কয়েকটি হাতির মিলিত আর্তনাদ।

হাতির করুণ আর্তনাদে জঙ্গল অফিসের সান্ত্রীদেরও ঘুম ভেঙেছে। তারাও বেরিয়ে এসেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন সূরযপ্রসাদ। এগিয়ে গেলেন কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। যে দিক থেকে আর্তনাদ আসছে, সে দিকে টর্চের আলো ফেললেন। এবারে চোখে পড়লো চারটি হাতি।

চারটি হাতি আবার শুঁড় তুলে করুণ আর্তনাদ করে উঠলো।

শালখুঁটি আর কাঁটাতারের বেষ্টনীর আরো কাছে এগিয়ে গেলেন সূরযপ্রসাদ। একাধিক টর্চের আলো এখন হাতিদের ওপর। চারটি হাতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। দুটি হাতির চোখ দিয়ে জল ঝরছে। মাঝে মাঝে করুণ আর্তনাদ করে কিছু বোঝাতে চাইছে সূরযপ্রসাদকে।

সূরযপ্রসাদ ভাবছেন কি করবেন, না করবেন। এখন কি ঘেরার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে! তবে একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিত যে, হাতিরা তাঁর কোনো সময়ে ক্ষতি করবে না। আর এটাও বুঝেছেন, নিশ্চয়ই ওরা কোনো বিপদে পড়েছে, যে বিপদের কথা জানাতে এসেছে ওরা।

সূরযপ্রসাদ দেখলেন আরো কয়েকটি হাতি এদিকে আসছে।

জঙ্গলের জন্তুজানোয়ারদের চরিত্র ভালোই জানেন সূরযপ্রসাদ। ওরা জানে কে ওদের বন্ধু আর কে শত্রু।

এই বন এলাকায় সূরযপ্রসাদ আছেন দশ বছর। কর্মজীবন থেকে অবসর নিতে আর বছর দেড়েক বাকি। বাকি সময়টা এই এলাকাতেই থাকতে চান তিনি। বার দুয়েক বদলির নির্দেশ এসেছিল, কিন্তু সূরযপ্রসাদ ওপর মহলে ধরাধরি করে এখানেই রয়ে গেছেন।

হাতিগুলোকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন সূরযপ্রসাদ। কেমন যেন চঞ্চলতা তাদের মধ্যে। সূরযপ্রসাদের স্থির বিশ্বাস, ওরা তাঁর কাছে এসেছে বিশেষ কোনো বিপদের কথা জানাতে।

এবারে সান্ত্রীদের দিকে ফিরে তাকালেন সূরযপ্রসাদ। বললেন, কি—কি বুঝছো তোমরা?

সান্ত্রীরা নিরুত্তর।

সূরযপ্রসাদ বললেন, দরজা খুলে দাও, আমি বাইরে যাবো।

সান্ত্রীরা ইতস্তত করতে লাগলো।

একজন তো বলেই ফেললো, সাহেব, এখন বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না।

'সাহেব' কথাটা অপছন্দ সূরযপ্রসাদের। বারবার সে কথাটা বলেন সকল কর্মীদের। তবে পুরানো অভ্যাস, ওরা ভুল করে মাঝে মাঝে সাহেব শব্দটা যোগ করে কথার মধ্যে।

হাতিরা আবার আর্তনাদ করে উঠলো।

সূরযপ্রসাদ বললেন, কই দরজা খোলো। আমি যাবো ওদের কাছে।

সান্ত্রীরা জানে, ওই মানুষটি দারুণ এক-রোখা। যা ভাববেন, তাই করবেন। তারা ভয়ে ভয়ে হাতির দলের দিকে চায় আর পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

সূরযপ্রসাদ এবার ফটকের দিকে এগিয়ে চললেন।

এবারে একজন সান্ত্রী ছুটে গিয়ে ফটকের চাবি নিয়ে এলো।

দারুণ মজবুত ফটক। লোহার শিকের তৈরি। ফটক খুলতে তিন-চারজন লোক লাগে।

ফটক খোলা হলো।

সূরযপ্রসাদ বাইরে যাবেন এমন সময় রক্ষী কিষণলাল রাইফেল এগিয়ে দিয়ে বললে, স্যার, আপনার রাইফেল।

সূরযপ্রসাদ বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাকালেন কিষণলালের দিকে। বললেন, যাও, রেখে এসো। দরকার হলে বলবো। অতগুলো হাতি, পারবে রাইফেল নিয়ে ওদের মোকাবিলা করতে যদি ওরা ক্ষেপে যায়?

কিষণলাল মাথা নিচু করলো।

সূরযপ্রসাদের জীবনের দর্শনটাই অন্যরকম। তিনি মানুষকে যেমন ভালোবাসেন, তেমনি ভালোবাসেন অরণ্যের জীবজন্তু, পাখ-পাখালি, গাছপালা, ফুল-লতাপাতাকে। তাঁর চোখে এই অরণ্য অঞ্চল আলাদা একটা জগৎ। এখানে প্রকৃতির সত্য রূপ প্রকাশিত। এখানে শান্তি আছে, আনন্দ আছে আর আছে জীবন এবং সৌন্দর্য। আর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা সহজ কথা তিনি বুঝতে পেরেছেন, অরণ্যের পশুপাখিরা মানুষের ভাষা হয়তো বোঝে না কিন্তু ভালোবাসার ভাষা বোঝে। যে ভালোবাসা মুখের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

লৌহফটক উন্মুক্ত হলো।

সূরযপ্রসাদ বাইরে এলেন। হাতির দল চক্রাকারে তাঁকে ঘিরে ধরলো। একটি জোয়ান হাতি এগিয়ে এলো। হাতিটা শুঁড় উঁচু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিনতে পারলেন। ডান দিকের কানের লতিতে একটি ছিদ্র।

বছর চারেক আগে একদল গোপন শিকারীর হাতে একটি হাতি মারা পড়ে। একটি শিশু হাতি কোনোরকমে বেঁচে যায়। বন্দুকের গুলিতে তার একটি কানের লতি ফুটো হয়ে যায়। সেই শিশু হাতিটি কয়েকটা দিন তার মায়ের সঙ্গে ছিল জঙ্গল অফিসের কাছে।

সেই হাতি শিকারীর দলটি ধরা পড়েছিল সূরযপ্রসাদের হাতে। তাদের ধরতে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল তাঁকে এবং তাঁর সান্ত্রী-বাহিনীকে। সেই দলটি ধরা পড়ার পর চোরা-গোপ্তা শিকার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এখনো দূর এলাকায় বনমহলের শান্তি

নষ্ট করতে আসে শিকারীরা। আসে ময়ূর অপহরণকারীরা, আবার কেউ আসে সবুজ বনকে নষ্ট করতে।

সূরযপ্রসাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে তারা তাদের কুকর্ম করে যায়।

বহুবার দুষ্কৃতকারীরা সূরযপ্রসাদকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি।

জোয়ান হাতিটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন সূরযপ্রসাদ। আর আর হাতিরা তখন সূরযপ্রসাদের আরো কাছাকাছি এসে গেছে। তার মধ্যে মা-হাতিটি সবচেয়ে কাছাকাছি এলো। একেবারে মুখোমুখি। মা-হাতিটির দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে যেন শুঁড় নেড়ে কিছু বলতে চাইছে।

জীবজন্তুর চরিত্র সূরযপ্রসাদ ভালোই বোঝেন। বিশেষ করে হাতিদের স্বভাব-চরিত্র। হাতিরা শান্ত এবং নিরীহ। আর ওরা বোঝে কে ওদের বন্ধু, কে ওদের শত্রু। ওরা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে। একের বিপদে অন্যের সহানুভূতির শেষ নেই।

সূরযপ্রসাদের স্থির বিশ্বাস এই মা-হাতিটির সন্তানের কোনো বিপদ হয়েছে। তিনি মা-হাতিটির শুঁড়ে হাত বুলিয়ে বোঝাতে চাইলেন, আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। আমি দেখছি তোমাদের জন্যে কি করতে পারি।

জোয়ান হাতি, যার কানে ছিদ্র, সে এগিয়ে এলো। শুঁড় দুলিয়ে ইঙ্গিত করলো সূরযপ্রসাদকে তার পিঠে ওঠার জন্য।

সূরযপ্রসাদ ঠিক করলেন হাতির দলের সঙ্গে এখনই তিনি রওনা হবেন। সঙ্গে নেবেন কিষণলাল আর সুদাম নামে দুই বিশ্বস্ত রক্ষীকে। ভাবলেন, টাইগারকে সঙ্গে নেবেন কিনা। বাহাদুর তো কোনো কথাই শুনবে না। সে ঠিকই যাবে।

আর কোনো ভাবনা নয়, জোয়ান হাতিটির শুঁড় ধরে তার পিঠে চেপে বসলেন সূরযপ্রসাদ। বাহাদুর তখন মাথার ওপর ছোট একটা গাছের ডালে বসে আছে। আর টাইগার হাতিদের ভিড়ে ঘোরাফেরা করছে। সে সঙ্গে যাবেই।

সুদাম আর কিষণলালও রাইফেল নিয়ে দুটি হাতির পিঠে চেপে বসেছে।

হাতির দল রওনা হলো। প্রথমেই চলেছে দুটি দাঁতালো বড় বড় হাতি। তারপর জোয়ান দাঁতালো হাতির পিঠে সূরযপ্রসাদ। কিষণলাল আর সুদাম পিছনের দিকে দুটি হাতির পিঠে। দেখা গেল, একটি গাছের ডাল থেকে বাহাদুর লাফিয়ে পড়লো সূরযপ্রসাদের হাতির পিঠে। সূরযপ্রসাদের কাঁধে হাত দিয়ে বসে রইলো

একটি জোয়ান হাতি এগিয়ে এলো।

নেহাৎ গোবেচারার মতো।

সূরযপ্রসাদ মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলছেন। দেখছেন, টাইগার চলেছে সবার আগে। মাঝে মাঝে কি যেন শুঁকছে সে।

রাত এখন গভীর। অরণ্যরাজ্য জুড়ে নীরবতা। তারপর কৃষ্ণপক্ষ শেষ হয়ে আসছে। রাত সাড়ে তিনটের আগে চাঁদ উঠবে না।

কখনো পাহাড়ী চড়াই, কখনো উৎরাই। মাঝে মাঝে খানিক সমতলভূমি। তবে অরণ্য এখানে গভীর। শাল, মহুয়া, পলাশ, পিয়াশালের গভীর অরণ্য। এ ছাড়া আরো কত রকমের গাছপালা তার হিসাব নেই।

যদুগোড়া অরণ্য এলাকার গভীরে এখন চলেছেন সূরযপ্রসাদ। এদিকের জঙ্গল এলাকায় কারণে অকারণে বারবার এসেছেন তিনি। তবে অরণ্যের গভীরে এলে কোনো কিছু ঠিক থাকে না। অরণ্যের চিত্র সব জায়গায় একরকম বলে মনে হয়। বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে।

এক জায়গায় পাহাড়ের চড়াই-এ উঠতে উঠতে টাইগার গর্জন করে উঠলো। সূরযপ্রসাদ, কিষণলাল, সুদাম তিনজনের হাতেই টর্চ।

টর্চের চোখ-ধাঁধানো আলো পড়লো চারদিকে। গাছপালার চেহারা শুধু স্পষ্ট হলো। আর কিছু চোখে পড়লো না। তবে টাইগার উত্তেজিত হয়ে গুমরে গুমরে উঠছে। ছুটে যেতে চাইছে। কিন্তু যাচ্ছে না। হাতির দলও থমকে দাঁড়িয়েছে।

সূরযপ্রসাদ নিশ্চিত যে টাইগার কোনো বিপদ বা কোনো কিছু বুঝতে পেরেছে—যার জন্যে সে অমন উত্তেজিত।

হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়লেন সূরযপ্রসাদ। টাইগার যে দিকে যেতে চাইছে সেই দিকে এগিয়ে গেলেন টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে। হঠাৎ আলোর বৃত্তের মধ্যে দেখা গেল একটি বাঘ। বাঘটি পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার এগিয়ে চললো হাতির দল।

এতগুলি হাতি দেখে বাঘের ভয় পেয়ে পালানোই স্বাভাবিক।

বাহাদুর এত সময় হাতির পিঠে ছিল, এবারে সে লাফ দিয়ে একটা গাছে উঠলো।

সূরযপ্রসাদ টর্চের আলো ফেলতেই বাহাদুর বিরক্তি প্রকাশ করলো। ও চায় না তার প্রিয় প্রভু এখন আলো জ্বেলে বাধা সৃষ্টি করুক।

জঙ্গল এলাকায় বিভিন্ন সময়ে সূরযপ্রসাদের সাথী হয়েছে বাহাদুর। কত সময় কত বিপদ-সংকেত ও আগেই জানিয়েছে।

বাহাদুর বেশ কয়েক বছর হলো রয়েছে সূরযপ্রসাদের কাছে। আদিবাসীরা বানর হত্যা করে না। তবে একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর এসে বিঁধেছিল একটি শিশু বানরের চোখে। যন্ত্রণায় মাটিতে ছটফট করছিল বানরশিশুটি। কাছেপিঠে অন্য কোনো বানর চোখে পড়েনি সূরযপ্রসাদের। আহত বানরশিশুটিকে তিনি নিয়ে আসেন অফিসে। পশুচিকিৎসালয়েও নিয়ে যান। বানরশিশুটির চোখের ক্ষত সেরে যায়। কিন্তু একটি চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো।

সূরযপ্রসাদ ভেবেছিলেন, বনের পশু বনেই থাক। বানরশিশুটিকে ছেড়েও দিয়ে এসেছিলেন বনের মধ্যে। কিন্তু ছাড়লে কি হবে, তিনি অফিসে পৌঁছে দেখেন বানর শিশুটি তাঁর আসার আগেভাগেই এসে বসে আছে অফিসের নির্দিষ্ট ঘরটিতে। সেই থেকে বানরশিশুটি আছে তাঁর কাছে। বাহাদুর নামটি তাঁরই দেওয়া।

বাহাদুরকে কখনো বন্দীজীবন কাটাতে হয়নি। ও ছাড়াই থাকে। নিজের খেয়াল-খুশিমতো ঘুরে বেড়ায় বনে, আবার ইচ্ছেমতো চলেও আসে। তবে সন্ধ্যের পর কোথাও বেরোয় না। বন-অফিসের চৌহদ্দির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। সূরযপ্রসাদ যখন ঘুমোতে আসেন, সে-ও চলে আসে চার দেওয়ালের মধ্যে।

টাইগার আর বাহাদুর সূরযপ্রসাদের রাতের সঙ্গী। এদের দুই-এর মধ্যে অদ্ভুত মিতালি। বাহাদুর যেমন যখন তখন সূরযপ্রসাদের কাঁধে

এতগুলি হাতি দেখে পালানোই স্বাভাবিক।

চেপে বসে তেমনি খেয়াল হলে সে টাইগারের পিঠে চেপে বসে। যখন ঘোড়া নিয়ে সূরযপ্রসাদ বন এলাকা টহল দিতে যান, তখন টাইগারের পিঠে চেপে বাহাদুরও সঙ্গে সঙ্গে চলে।

বাহাদুর এখন গাছের ডালে। নিচে হাতির দলের আগেভাগে টাইগার গুমরে গুমরে উঠছে।

সূরযপ্রসাদ স্থিরনিশ্চিত যে, এবারে কোনো ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে। একটা আর্তনাদ কানে এলো। এ আর্ত কণ্ঠস্বর কোনো জন্তুজানোয়ারের নয়, মানুষের। বাহাদুর গাছের মগডাল থেকে মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করলো। সঙ্গে সঙ্গে টাইগার ছুটে গেল সামনের দিকে। সেই সঙ্গে হাতির দল।

এবারে সূরযপ্রসাদ এবং তাঁর সাত্রীদের হাতের টর্চ আবর্তিত হতে লাগলো। দেখা গেল পাহাড়ের একটু ওপরের দিকে একটি গুহামুখ।

আর্তকণ্ঠ ভেসে আসছে ওই গুহার ভিতর থেকে।

সূরযপ্রসাদ হাতির পিঠ থেকে নামলেন সাত্রীদের নিষেধ সত্ত্বেও। শেষ পর্যন্ত সাত্রীরাও নেমে এলো। সূরযপ্রসাদের হাতে টর্চ ছাড়া কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তবে সাত্রীদের হাতে উদ্যত রাইফেল। দেখা গেল, বাহাদুর গুহামুখের কাছে গাছের মগডালে চেপে বসেছে। একটি ডাল নাড়ছে বেশ জোরে জোরে।

সূরযপ্রসাদ একাই এগিয়ে যাচ্ছেন। এখন আর আর্তকণ্ঠ নয়, একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

এই গুহা এর আগেও দেখেছেন সূরযপ্রসাদ। বন এলাকায় যারা দুষ্কর্ম করে বেড়ায়, তারা অনেক সময় এই গুহায় আত্মগোপন করে থাকে। একবার এই গুহা থেকে একদল ময়ূর শিকারীকে তিনি পাকড়াও করেছিলেন। বছরখানেক আগে পশুচামড়ার একদল কারবারীকে কাঁচা চামড়াসমেত এই গুহা থেকে পাকড়াও করেছিলেন তিনি।

বন এলাকার আশপাশের এলাকায় অনেক দুষ্কৃতকারী আছে, যারা বনচারী পশুদের নির্বিচারে হত্যা করে সেইসব পশুর চামড়া চড়া দামে বিক্রি করে। চিতা, হায়েনা, নেকড়ে এবং বাঘের চামড়া রীতিমতো চড়াদামে বিকোয়। ময়ূর ধরার জন্যে একদল মানুষ তৎপর।

সূরযপ্রসাদ এই বন এলাকার মধ্যে এমন একজন মানুষ যাঁকে দুষ্কৃতকারীরা ভয় করে। বহুবার তাঁর জীবননাশের চেষ্টাও হয়েছে। কয়েকবার তো আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষা পেয়েছেন।

সূরযপ্রসাদ দেখলেন, টাইগার গুহার দিকে খানিক ছুটে গিয়ে আবার ক্ষিপ্রগতিতে পিছিয়ে এলো। এখন গুহার কাছাকাছি সূরযপ্রসাদ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, গোঙানির আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না।

শুধু টাইগার নয়, হাতির দলও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সূরযপ্রসাদ টর্চ জ্বেলে গুহার আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। চমকে উঠলেন মাটিতে, পাথরের টুকরোর গায়ে রক্তের দাগ দেখে। এদিক ওদিক তাকাতে দেখতে পেলেন পোড়া সিগারেটের টুকরো, সিগারেটের খালি প্যাকেট।

একটু অন্যমনস্ক সূরযপ্রসাদ। চমক ভাঙলো টাইগারের উচ্চকণ্ঠের চিৎকারে। টর্চের আলো ফেললেন সূরযপ্রসাদ। দেখলেন একপাল নেকড়ে ছুটে পালাচ্ছে। মুহূর্তে তারা আলোর বৃত্তের বাইরে চলে গেল।

সূরযপ্রসাদ আগেভাগে। পিছনে উদ্যত রাইফেল হাতে কিষণলাল আর সুদাম। টাইগার একটু পিছনে।

সূরযপ্রসাদ গুহার ভিতরে ঢুকলেন। গুহার মুখটি সংকীর্ণ, কিন্তু ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। এখানেও পাওয়া গেল সিগারেটের টুকরো, শালপাতা, খাবারের চিহ্ন এবং একটি লাল রুমাল।

রুমালটি হাতে তুলে নিলেন সূরযপ্রসাদ। রুমালের কোণে লেখা একটি নাম, মনোহর কিস্কু।

নামটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূরযপ্রসাদের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। লোকটিকে চোখে দেখেননি তিনি, তবে নামটা রীতিমতো পরিচিত। জঙ্গল অফিসের খাতাপত্রে কালো তালিকাভুক্ত নাম। শুনেছেন, কিছুদিন আগে পালামৌ অঞ্চলের জঙ্গলে ধরা পড়ে বছর তিনেক কয়েদ ছিল। কিছুদিন আগে ছাড়া পেয়েছে।

মনোহর কিস্কুর চর ছড়িয়ে আছে বিহারের বিভিন্ন অরণ্য এলাকায়। লোকটি পশুচামড়ার কারবারী। বিষ প্রয়োগে বনচারী পশুদের হত্যা করে সেইসব পশু চামড়া বিক্রি করে। এ ছাড়া হাতি ধরে সার্কাস পার্টিকে বিক্রি করার অভিযোগও তার বিরুদ্ধে আছে। রুমালটি পেয়ে সূরযপ্রসাদ নিশ্চিত হলেন যে, মনোহর কিস্কু এখানে এসেছিল।

টাইগারকে কিছু বলতে হলো না, সেই এসে রুমালটি বারবার শুঁকতে লাগলো। গুহার আরো ভিতরে ঢুকলেন সূরযপ্রসাদ। সঙ্গী এখন একমাত্র টাইগার। কিছুটা এসে দেখতে পেলেন একটি আদিবাসী তরুণ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তরুণটি এখন অচেতন। বুঝতে পারলেন, একটু আগে এ নেকড়ের কবলে পড়েছিল। এরই আর্তকণ্ঠ এবং গোঙানির আওয়াজ তাঁরা শুনেছেন।

ঝুঁকে পড়ে তরুণটির নাকের কাছে হাত দিলেন সূরযপ্রসাদ। নিঃশ্বাস মোটামুটি স্বাভাবিক। হাত রাখলেন বুকের ওপর। হৃদযন্ত্র যথারীতি চলছে। তরুণটির কাঁধের কাছে খানিকটা মাংস নেই। দুটি পা-ও ক্ষতবিক্ষত।

এবারে চিৎকার করে ডাকলেন দুই সাত্রীকে। সূরযপ্রসাদের ডাক শুনে তারা ছুটে এলো।

সূরযপ্রসাদ বললেন, চলো—একে বাইরে

নিয়ে চলো।

সান্ত্রী দুজন ধরাধরি করে অচেতন তরুণকে বাইরে নিয়ে এলো। হাতির দল চঞ্চল হলো তরুণটিকে দেখে। সূরযপ্রসাদ প্রতিটি হাতির কাছে গেলেন। তাদের শুঁড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে চাইলেন, তোমরা শান্ত থাকো।

জঙ্গলের পশুচরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সূরযপ্রসাদ তাঁর বনবিভাগের চাকুরিতে ঢুকে। হাতিদের আচরণ দেখে অনুমান করলেন এই আদিবাসী তরুণটি তাদের শত্রুপক্ষের একজন।

হাতিরা যেমন শান্ত, তেমনি ভয়ংকর। ওরা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে, ওরা ভালোবাসার কাঙাল। কিন্তু কোনো মানুষ কিংবা জন্তুজানোয়ার যদি ওদের ক্ষতি করে তখন ওরা ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

হাতির দল এখন শান্ত। কেবল মা-হাতিটি, যার চোখে জল সে-ই কিছুটা চঞ্চল। সূরযপ্রসাদের নিশ্চিত ধারণা, ওই মা-হাতিটির সন্তান হারিয়ে গেছে।

সূরযপ্রসাদ সান্ত্রী দুজনকে কাছে ডাকলেন। তাদেরকে বললেন, ওই আহত-অচেতন লোকটিকে যেভাবে হোক অফিসে নিয়ে যেতে। তারপর ওখান থেকে যেন ঘাটশীলার হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সান্ত্রী কিষণলাল বললে, কিন্তু স্যার—

সূরযপ্রসাদ বললেন, ভাবছো এই জঙ্গলের গভীরে বন্য জন্তুদের রাজত্বে আমাকে একা ছেড়ে যাবে কেমন করে? আমার জন্যে চিন্তা করো না। আমার জঙ্গলের জীবন তো কম দিনের নয়। আর তোমরা তো আমাকে অনেকদিনই দেখছো—তোমরা আমাকে তো বোঝো—যাও, আমি যা বলছি শোনো। এখানে আমার হাতি বন্ধুরা আছে। ওরাই আমার রক্ষা-কবচ। টাইগার আর বাহাদুর তো আছেই।

কিষণলাল আর সুদাম আর কথা বাড়ালো না। তারা দুজনে অচেতন লোকটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আবার হাতির দলের সঙ্গে রওনা হলেন সূরযপ্রসাদ। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাতিরা চলেছে সারিবদ্ধভাবে। সামনে বিরাটাকার দাঁতালো হাতিটি। সে-ই যেন সেনাপতি।

সূরযপ্রসাদ একটি হাতির পিঠে বসে আছেন। টাইগার হাতির দলের সঙ্গে। হাতিদের সঙ্গে তার বেশ মিতালি হয়ে গেছে।

টাইগারের ওপর অনেক ভরসা সূরযপ্রসাদের। তাকে নানাভাবে তালিম দিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে।

পরপর বেশ কয়েকটা টিলা পাহাড় পার হয়ে এবারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলো হাতির দল।

যদুগোড়া এলাকার জঙ্গল সবচেয়ে গভীর। হাতিরা এই এলাকাতেই বেশি থাকে।

অন্ধকার এখন তেমন নেই। হোক কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতের ভাঙা চাঁদ, তবু তার আলো আছে।

চাঁদের আলো যদিও ম্লান, তবু তার স্পর্শ পড়েছে অরণ্যের সবুজে। সবুজ অরণ্য এখন শিশিরসিক্ত। শিশিরবিন্দুতে ম্লান চাঁদের আলোর ছোঁয়া—অরণ্য এখন অপরূপ হয়ে উঠেছে।

শেষ কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। আর কিছুক্ষণ বাদেই ডুবে যাবে। সেইসঙ্গে শেষ হবে রাত।

এ-পাহাড় সে-পাহাড় ডিঙিয়ে হাতির দল এলো উৎরাই-এ। এদিকেও জঙ্গল বেশ গভীর। হাতির দল চলেছে সারিবদ্ধভাবে। দেখা গেল এ-গাছ সে-গাছের ওপর দিয়ে বাহাদুরও চলেছে। মাঝে মাঝে গাছের ডাল নেড়ে মুখে আওয়াজ করে জানিয়ে দিচ্ছে সে আছে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। চাঁদ এখন পাহাড়ের আড়ালে ডুবুডুবু। পুবদিগন্তে দিনের আভাস। আর কিছুক্ষণ বাদেই সূর্য উঠবে।

অরণ্যে নানাজাতের পাখ-পাখালি। তাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। আর একটু বাদেই ওরা নীড় ছাড়বে। ডানা মেলবে আকাশে।

হাতির দল ডানদিকে মোড় ঘুরলো। সূরযপ্রসাদ বুঝতে পারছেন না ওরা তাঁকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে।

কিছুটা এগিয়ে টাইগার গর্জে উঠলো। ছুটে গেল কিছুটা। সেইসঙ্গে হাতির দলও।

আবার এগিয়ে গেল টাইগার। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠে সূরযপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। হাতির পিঠ থেকে নামলেন সূরযপ্রসাদ। এগিয়ে গেলেন পায়ে পায়ে।

একটি গর্তের সামনে টাইগার। গর্তটি ছিল না। খোঁড়া হয়েছে। গর্তের চারপাশে শুকনো ডালপালা। নিশ্চয়ই এই ডালপালা দিয়ে গর্তটি সুন্দরভাবে ঢাকা ছিল।

টাইগার গর্তটির চারপাশ শুঁকছে আর গুমরে গুমরে উঠছে। টাইগার এখন বেশ উত্তেজিত।

আচমকা টাইগার ছুটে এলো সূরযপ্রসাদের কাছে। সূরযপ্রসাদের প্যান্টের পকেটে মুখ ঢুকিয়ে মনোহর কিস্‌কুর লাল রুমালটি টেনে বার করলো।

সূরযপ্রসাদের নিশ্চিত ধারণা হলো, মনোহর কিস্‌কু এখানে এসেছিল।

গর্তের কাছে এলেন সূরযপ্রসাদ। হাতিগুলি ঘিরে আছে গর্তের চারদিক। যে মা-হাতিটি কাঁদছিল, সে শুঁড় তুলে আর্তনাদ করলো। সে আর্তনাদ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। এবারে সূরযপ্রসাদ সন্তর্পণে গর্তের ভিতরে নামলেন। গর্তটি বেশ প্রশস্ত এবং ছ-সাত ফুট গভীর। গর্তের নিচে মাটির ওপর হাতির পায়ের দাগ।

হাতির দল তখনো গর্তটি ঘিরে।

সূরযপ্রসাদ আবার উঠে এলেন ওপরে। বুঝতে পারলেন এই গর্তটি শিশু-হাতি ধরার জন্যে খোঁড়া হয়েছে। এবং একটি শিশু-হাতি যে ধরাও পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

টাইগার আবার কোত্থেকে সিগারেটের একটা খালি প্যাকেট মুখে নিয়ে ছুটে এলো।

প্যাকেটটি পকেটে রাখলেন সূরযপ্রসাদ।

বাহাদুর কখন গাছের মগডালে উঠেছে সূরযপ্রসাদ তা লক্ষ্য করেননি। সামনেই একটা শালগাছের মগডালে উঠে ডাল নেড়ে বাহাদুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সূরযপ্রসাদের।

সূরযপ্রসাদ চিৎকার করে ডাকলেন, নিচে নেমে আয় বাহাদুর।

বাহাদুর বোঝে তার প্রভুর ভাষা। ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তরতরিয়ে নেমে এলো নিচে। নিচে নেমেই সূরযপ্রসাদের হাত ধরে টানতে আরম্ভ করলো। বুঝলেন তাঁকে কোনো কিছু দেখাতে চাইছে বাহাদুর। বাহাদুরের মাথায় হাত বুলিয়ে সূরযপ্রসাদ তাকে শান্ত হতে বললেন।

এখন সবকিছু মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে সূরযপ্রসাদের কাছে। কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর একটাই প্রশ্ন, এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটি ছোট হাতিকে কিভাবে নিয়ে গেল দুষ্কৃতকারীরা। নিশ্চয়ই হাতির দলকে তারা বিভ্রান্ত করেছিল। নয়তো হাতির এলাকা থেকে হাতি চুরি খুব সহজ নয়।

হাতির দল এখনো দাঁড়িয়ে গর্তটিকে ঘিরে। বাহাদুর আবার তাঁর হাত ধরে টানতে আরম্ভ করলো। টাইগারও কিছুটা চঞ্চল হয়ে দক্ষিণে উৎরাই-এ যেতে চাইছে।

এদিকে ভোর হয়ে এলো। অরণ্যে আর অন্ধকার নেই। পাখ-পাখালিরা ডানা মেলেছে আকাশে। ময়ূরের কেকাধ্বনি কানে আসছে। প্রজাপতিরা বনফুলের মধুর নেশায় রঙিন পাখা নাড়িয়ে আকাশে সাঁতার কেটে ফুলে ফুলে বসছে। অরণ্যকে ভালোবাসেন সূরযপ্রসাদ। বনের জীবজন্তু, পাখ-পাখালি আর অরণ্যের গাছপালাও তাঁর প্রিয়।

সূরযপ্রসাদ উৎরাই পথে নেমে চলেছেন। হাতির দলও সেই সঙ্গে। বন এলাকা তিনি চষে

বেড়িয়েছেন। তবে রাতের অন্ধকারে সবকিছু ঠিক করা যায় না। এখন বুঝতে পারছেন সামনে যে পাহাড়টা আছে ওর ওপারেই আছে জামশেদপুর যাওয়ার রাস্তা। এবং আর কিছুটা এগোলেই পড়বে সুবর্ণরেখা নদী।

বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে আবার একটি গর্ত দেখতে পেলেন। যে গর্তটা দেখে এসেছেন ঠিক অনুরূপ গর্ত। এবং এখানেও একটি শিশু-হাতি গর্তের মধ্যে পড়েছিল। তবে গর্তের ওপরে মানুষের পায়ের ছাপ খুব বেশি নেই। চোখে পড়লো হাতির পায়ের ছাপ।

সূরযপ্রসাদ দেখলেন এই গর্তের কাছে এসে হাতিরা তেমন চঞ্চল হলো না। গর্তের কাছে গেলেন সূরযপ্রসাদ। নিচেও নামলেন। এখানে কোনো শিশু-হাতি পড়েছিল, তবে সে শিশু-হাতিটিকে হাতিরাই উদ্ধার করেছে।

সূরযপ্রসাদ একটু চিন্তা করলেন। তারপর একটা সিদ্ধান্তে এলেন। একই সঙ্গে দুদিকে ফাঁদ পাতা হয় শিশু-হাতি ধরার জন্যে। দুটি গর্তেই শিশু হাতি পড়ে যায়। হাতির দল যে কারণেই হোক, একটি হাতিকে উদ্ধার করতে আসে প্রথমে। তারপর দ্বিতীয় গর্তের দিকে যায়। ততক্ষণে দ্বিতীয় গর্তের হাতিটিকে দুষ্কৃতকারীর দল বন্দী করে নিয়ে যায় নিরাপদ এলাকায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন সূরযপ্রসাদ। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, যে দিক থেকে এসেছেন আবার ওই দিকেই ফিরে যাবেন। কারণ, ওদিক থেকে বনবিভাগের একটি রাস্তা বেরিয়ে গেছে, যে রাস্তায় তাঁরা মাঝে মাঝে জিপ ছুটিয়ে টহল দিতে আসেন। অরণ্যের এই এলাকায় হাতির সংখ্যা বেশি।

এদিকটায় জঙ্গল তেমন ঘন নয়। এখানে অনেক ময়ূরও আছে। নেকড়েরাও কি জানি এই এলাকাটা পছন্দ করে।

বনবিভাগের রাস্তায় এসে পৌঁছলেন সূরযপ্রসাদ। প্রায় মাসখানেক তিনি এই এলাকায় আসেননি। তবে রক্ষীবাহিনীর লোকজন মাঝে মাঝে এই এলাকা টহল দিয়ে যায়।

পথ ধরে চলছেন সূরযপ্রসাদ। এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। লরির চাকার দাগ। ছ' চাকার গাড়ি। তবে বড় নয়—ছোট।

আর দেখে মনে হলো দুটি ছোট লরি এখানে ঘোরানো হয়েছে। এক জায়গায় হাতির পায়ের দাগ আর মলও দেখা গেল। খানিকটা নাইলনের দড়ি এবং একটি ব্লেড কুড়িয়ে পেলেন। কিছু পোড়া সিগারেটের টুকরো। সিগারেটের টুকরো, লরির চাকার স্পষ্ট দাগ দেখে সূরযপ্রসাদ বুঝতে পারলেন ঘটনা যা কিছু ঘটেছে গত সন্ধ্যায় কিংবা তার কিছু আগে।

সূরযপ্রসাদ নিশ্চিত যে হাতিটিকে এখনো দূরে কোথাও পাচার করতে পারেনি দুষ্কৃতকারীরা। জঙ্গল এলাকার বাইরে কোনো গাঁয়ে বা গাঁয়ের কাছাকাছি কোথাও তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

রীতিমতো চিন্তিত সূরযপ্রসাদ। এই মুহূর্তে এর বেশি এগোনো সম্ভব হলেও উচিত নয়। এখন একবার নিজের দপ্তরে যাওয়া ভালো। তারপর যা কিছু ব্যবস্থা। তাছাড়া সেই আহত তরুণটি যদি কিছু স্বীকারোক্তি করে থাকে, তা-ও জানা দরকার।

যে দিক থেকে আসা, আবার সেই দিক দিয়েই ফিরে চলা।

হাতির দল তখনো সেই গর্তটিকে ঘিরে। সূরযপ্রসাদ হাতির দলের কাছাকাছি হয়ে তাদের শুঁড়ে এবং গায়ে হাত বুলিয়ে বোঝাতে চাইলেন, চিন্তা নেই তোমাদের, আমি আছি তোমাদের জন্যে।

সেই মা-হাতিটি শুঁড় তুলে চাপা সুরে করুণ ভঙ্গিতে যেন বলতে চাইলো, জঙ্গলবাবু, তুমিই পারবে আমার সন্তানটিকে ফিরিয়ে দিতে।

সূরযপ্রসাদের মনটাও ভিজে উঠলো। এই অরণ্যচারী পশুদের চরিত্র তিনি বোঝেন। অনেক সময় বুঝতেও পারেন ওদের কথা।

হাতির গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন সূরযপ্রসাদ।

কিছুটা শান্ত হলো হাতিটি।

আর অপেক্ষা নয়, এবারে সূরযপ্রসাদের ফিরে যাবার পালা। যে পথ ধরে এসেছিলেন, সেই পথ ধরেই পায়ে হেঁটে ফিরছেন।

আচমকা টাইগার ডেকে উঠলো। সূরযপ্রসাদ পিছন দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন দুটি হাতি ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। নিশ্চয়ই ওরা তাঁকে জঙ্গলের অফিস অব্দি পৌঁছে দেবে বলে আসছে।

বড় হাতিটি সূরযপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সূরযপ্রসাদ তার শুঁড় বেয়ে পিঠে চেপে বসলেন। ওদিকে আর একটি হাতির পিঠে চেপে বসলো বাহাদুর।

টাইগার বেশ আনন্দের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে চলেছে। বাহাদুর কোথাও কিছু নয়, হাতির পিঠ থেকে টাইগারের পিঠে চেপে বসলো। টাইগার আর বাহাদুরের মধ্যে অদ্ভুত মিতালি।

চলতে চলতে এক জায়গায় টাইগার থমকে দাঁড়িয়ে চাপা গর্জন করে উঠলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা তীর এসে হাতির সামনে পড়লো। সূরযপ্রসাদ হাতির পিঠ থেকে নেমে এলেন। তীরের ডগায় বাঁধা একটুকরো কাগজ। সূরযপ্রসাদকে উদ্দেশ করে কয়েকটি কথা লেখা—'জঙ্গলবাবু, সামান্য একটা হাতির বাচ্চার জন্যে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি এটা হুঁশিয়ারী মনে করবেন।' নিচে কোনো নাম নেই।

বাহাদুর ক্ষিপ্রগতিতে গাছের মগডালে গিয়ে উঠলো। তারপর এ-গাছ ও-গাছ করে ছোট পাহাড়টার ওপরদিকে উঠে গেল।

সূরযপ্রসাদ তখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। বাহাদুর না আসা পর্যন্ত তিনি যেতেও পারছেন না। টাইগারও ছুটে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু সূরযপ্রসাদ তাকে কাছছাড়া করলেন না।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদেই বাহাদুর ফিরে এলো। আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলো সে শত্রুর হদিস পেয়েছে। কিন্তু এখন সেদিকে যেতে নিষেধও করছে।

বাহাদুর আর টাইগারের ভাষা বেশ ভালোই বোঝেন সূরযপ্রসাদ। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি সাধারণত যেতে চান না। কেননা, ওদের চেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু তাঁর নেই।

আবার শুরু হলো জঙ্গলের অফিসের দিকে এগিয়ে চলা।

জঙ্গলের অফিসে পৌঁছে সূরযপ্রসাদের প্রথম কাজ হলো সেই আহত আদিবাসী তরুণটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। খোঁজ নিয়ে জানলেন, লোকটির শরীরে যেরকম রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তাতে তার অবস্থা রীতিমতো সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। অফিসের জিপেই তাকে পৌঁছে দেওয়া হয় শেষ পর্যন্ত জামশেদপুরের হাসপাতালে। যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে আধা-অচেতন অবস্থায় কিছু কথা আপনমনে বলে। যার মধ্যে একবার মনোহর কিস্কুর নামটা উচ্চারণ করে। আর সে যে নেকড়ের ডেরায় হানা দিতে এসেছিল, তারও আভাস তার কথার মধ্যে ছিল। লোকটির জামার পকেটে 'ভারত সার্কাস'-এর পাসও পাওয়া গেছে।

কিছুদিন আগে জামশেদপুরে ভারত সার্কাস-এর তাঁবু পড়েছিল। সূরযপ্রসাদ ভারত সার্কাস-এর হ্যাণ্ডবিলও দেখেছেন। অনেক রকম জন্তুজানোয়ারের সংগ্রহ আছে ওই সার্কাসের।

সূরযপ্রসাদের মনে হলো, এই শিশু-হাতি ধরার সঙ্গে সার্কাস দলের কোনো সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই ধারণার কথা কাউকে

বললেন না। সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে প্রবাদটা মিথ্যে নয়। যারা জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার, ময়ূর ইত্যাদি শিকার করে বা ধরে, তাদের সঙ্গে জঙ্গল অফিসের কোনো-না-কোনো কর্মীর যোগ থাকে। নইলে জঙ্গলে হানা দিয়ে এসব দুষ্কর্ম করা সম্ভব হয় না।

সূরযপ্রসাদ অফিসে পৌঁছে একথা সেকথা জানার পর স্নানাহার সারলেন। ইতিমধ্যে আরো খবর এলো, আহত লোকটির চেতনা ফিরেছে। এখন ডাক্তাররা আশা করছেন লোকটি হয়তো বেঁচে যাবে।

সূরযপ্রসাদ অফিসের মধ্যেই বিশ্রামের মেজাজে বসেছিলেন। সেই সময় সহকারী দেওকীনন্দন এলেন। এসেই একটি চিরকুট ধরিয়ে দিলেন সূরযপ্রসাদের হাতে। চিরকুটটি লেখা জঙ্গলরক্ষী ব্রীজমোহনের। সে আজ ভোরে এটি দেওকীনন্দনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে জামশেদপুর চলে গেছে। দেওকীনন্দন আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তা সে শোনেনি।

সূরযপ্রসাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। ব্রীজমোহনের হঠাৎ জামশেদপুর যাওয়ার দরকার পড়লো কেন?

দেওকীনন্দন তখনো দাঁড়িয়ে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, প্রসাদজী, একটা কথা বলবো?

—বলুন।

দেওকীনন্দন মানুষটি সিধে সরল। কিছুটা দুর্বল চিত্তের। বললেন, আমার মনে হয় একটা ভয়ংকর দুষ্টচক্র এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে।

সূরযপ্রসাদ বললেন, কি করে বুঝলেন?

দেওকীনন্দন যদিও ভালোমানুষ এবং দুর্বল মনের, কিন্তু বুদ্ধিতে কারো চেয়ে কম নন। আবার তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। একটু ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বললেন, অফিসে বসেই তার আঁচ পাই প্রসাদজী। কি করে পাই তা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না। মনে আছে প্রসাদজী, সেবারে, মানে বছর দুয়েক আগে বুরুডির জঙ্গলের লাগোয়া গাঁয়ে হানা দিয়ে আমরা বিশ-পঁচিশটা নেকড়ে আর বাঘের চামড়া উদ্ধার করি এক বাড়ি থেকে। মনে আছে সেই ভাল্লুকবাচ্চা দুটির কথা। তারপর—

সূরযপ্রসাদ চোখ ইশারা করতে থেমে গেলেন দেওকীনন্দন। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন কেরানীবাবু শান্তিলাল। লোকটিকে কোনোদিন সুনজরে দেখেন না সূরযপ্রসাদ। ব্রীজমোহনের সঙ্গে শান্তিলালের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

সূরযপ্রসাদের পাশেই শুয়েছিল টাইগার। তার দৃষ্টি শান্তিলালের দিকে। টাইগার অফিসের

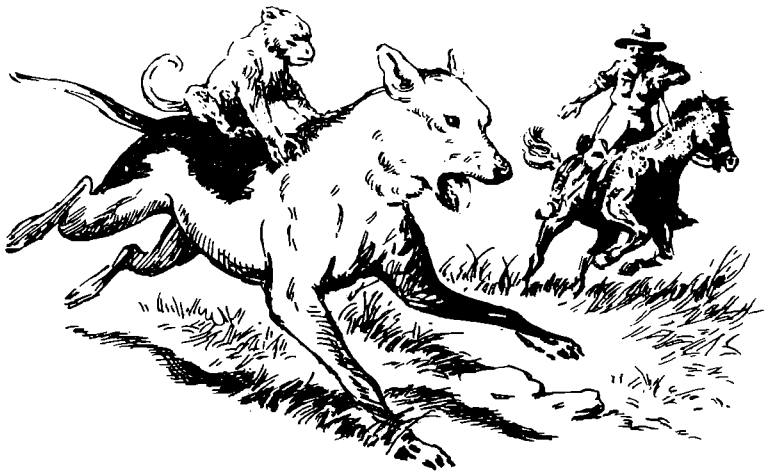

টাইগারের পিঠে চেপে বাহাদুর সঙ্গে চলে।

অনেককে সহ্য করতে পারে না। তার মধ্যে শান্তিলাল একজন।

দরজা পেরোতে ভয় পাচ্ছেন শান্তিলাল।

সূরযপ্রসাদ হেসে বললেন, এখনো আপনি টাইগারকে ভয় পান শান্তিলালজী। আশ্চর্য, যাক কিছু বলবেন নিশ্চয়ই।

শান্তিলাল পকেট থেকে একটি কাগজ বার করলেন। বললেন. স্যার, আমাকে দুদিনের ছুটি দিতে হবে। বাড়ি যাবো। মাত্র দুদিনের ছুটি—আপনি 'না' করবেন না স্যার।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আপনার বাড়ি যেন কোথায়?

শান্তিলাল বললেন, দ্বারভাঙ্গা।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আপনি অবাক করলেন দেখছি। দ্বারভাঙ্গা যাতায়াত করা কি দুদিনে যায়? যাক, আর নতুন করে মিথ্যে বলবেন না একটা মিথ্যে ঢাকতে।

শান্তিলালের মুখের চেহারা বদলে গেল। দু হাত কচলাতে আরম্ভ করলেন, না স্যার, আমি একটু ভুল বলেছি, আমার ছোট ভাইয়ের বাড়ি যাবো—সে বাড়ি করেছে গিরিডিতে।

সূরযপ্রসাদ সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, একটা কথা জেনে রাখুন, আপনাকে কাল আমার সঙ্গে যেতে হতে পারে। হয়তো চাঁইবাসা।

শান্তিলালের চোখমুখ হঠাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সূরযপ্রসাদ তা লক্ষ্য করলেন। দেওকীনন্দনও তা লক্ষ্য করেছেন।

ঠিক আছে, যাচ্ছি স্যার। বলে শান্তিলাল চলে গেলেন।

দেওকীনন্দন আবার ইতিউতি তাকালেন। এবারেও মাথা নিচু করে চাপা গলায় বললেন, প্রসাদজী, ঘরে বাইরে আপনার শত্রু। সামান্য একটা হাতি কি বাঘের বাচ্চার জন্যে—

—কি বলতে চান আপনি? সূরযপ্রসাদ চটে উঠলেন—একটা হাতির জীবন কি জীবন নয়? আর বাঘ? তারাও তো বনচারী জীব। এই জঙ্গল এলাকা তাদের। আমাদের মতো তাদেরও জীবন আছে, সুখদুঃখ আছে। হিসেব করে দেখুন তো, তাদের জন্যে পৃথিবীতে আমরা কতটুকু জায়গা রেখেছি?

দেওকীনন্দন বললেন, আমি সবই বুঝি। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ নামে শয়তান আছে, তারা যে কী ভয়ংকর তা তো আপনি জানেন। ওরা আপনাকে কতবার খতম করতে চেষ্টা করেছে বলুন তো? আপনার জন্যে আমার চিন্তা হয় স্যার।

সূরযপ্রসাদ হেসে বললেন, এখনো তো বেঁচে আছি দেওকীনন্দনজী। গায়ে কেউ এখনো আঁচড় কাটতে পারেনি। যাক ওসব কথা। এখন শুনে রাখুন, দুষ্টচক্রের মোকাবিলা আমাদেরকে করতে হবে। আমি দেখতে চাই মনোহর কিস্কু কত বুদ্ধিমান! বনচারী পশুদের ওপর অত্যাচার আমি বরদাস্ত করবো না।

সেদিন আর কোথাও বেরোলেন না সূরযপ্রসাদ। সারাদিনে অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন। কিভাবে এগোবেন তাও ঠিক করেছেন মোটামুটি।

এই এলাকার জঙ্গল থেকে বেশ কিছু বাঘের বাচ্চা ধরে নিয়ে গেছে শয়তানের দল। আর কয়েকটি বাঘ যে মারা পড়েছে সে খবর আগেই পেয়েছেন। যা কিছু ঘটেছে তিনি ছুটিতে থাকাকালীন। মাঝে দুমাসের ছুটি নিয়ে তিনি দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর দেশ গাড়োয়ালে। এ ছাড়া হাতির ব্যাপারটা তো টাটকা।

যাই হোক, একটা দিন কাটলো।

পরদিন সকালেই শান্তিলালকে ডেকে পাঠালেন সূরযপ্রসাদ। হাতে একটা সিল-করা খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ইচ্ছে ছিল আমিও যাবো, কিন্তু পারছি না। আপনি এই খামটা চাঁইবাসা অফিসে মজুমদারবাবুর হাতে দেবেন। চিঠিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই আপনার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছি। তারপর আপনি পারেন তো দুটো দিন গিরিডি কাটিয়ে আসবেন।

শান্তিলাল বেশ খুশিমনে বেরিয়ে গেলেন।

সূরযপ্রসাদ মনে মনে বললেন, শান্তিলালজী—দেখবো আপনি কি করতে পারেন। শয়তান সে নিজের জালেই নিজে জড়ায়।

সূরযপ্রসাদ জানেন চাঁইবাসা থেকে ঝুমরিতিলাইয়া, এই এলাকাতেই মনোহর কিস্কুর শক্ত ঘাঁটি। এই এলাকাতেই সে বেশি থাকে। তবে এখন যে সেদিকেই থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। শান্তিলাল যে চাঁইবাসায় গিয়ে মনোহর কিস্কু কিংবা তার দলের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এ বিষয়ে সূরযপ্রসাদ নিশ্চিত। আর এমনও হতে পারে শান্তিলালজী জামশেদপুরে আসবেন। কেননা, আহত আদিবাসী তরুণটি এখন ওখানকার হাসপাতালে। ব্রীজমোহনও নিশ্চয়ই দুষ্টচক্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেছে।

বেলা এখন দশটা।

সূরযপ্রসাদ অফিসের বাইরে গুলমোহর গাছের নিচে বাঁধানো বেদীর ওপর বসে আছেন। এই জায়গাটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। সময় পেলেই এসে বসেন। আজও বসেছেন। তবে মাথায় একরাশ চিন্তা।

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। কদিন বিকল ছিল ফোনের লাইন।

ফোন ধরতে উঠে গেলেন সূরযপ্রসাদ।

বুরুডির জঙ্গল অফিস থেকে ফোন এসেছে। ভয়ংকর একটি খবর নিয়ে। ধারাগিরির জঙ্গল এলাকার হাতির দল হানা দিয়েছে সুখনডিহি গাঁয়ে। হাতিরা গ্রামে ঢুকেছিল দলবদ্ধভাবে। কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর করেছে। তছনছ করেছে ফসল। এ ছাড়া আরো খবর, হাতিরা নাকি তিনটি শিশুকে ধরে নিয়ে গেছে।

সূরযপ্রসাদের কেমন সন্দেহ হলো শেষ খবরটা শুনে। হাতিদের ওপর অত্যাচার হলে তারা নানাভাবে প্রতিশোধ নেয়, এ কথা সত্যি। কিন্তু তিনটি শিশুকে তারা শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে নিয়ে যাবে, এ খবরটা কেমন যেন বিভ্রান্তিকর। এ খবর যদি সত্যি হয়, তাহলে জনমত বনবিভাগের বিরুদ্ধে যেতে পারে।

খবরটা শুনলেন সূরযপ্রসাদ। তারপরই রিসিভার রেখে দিয়ে ঘাটশীলার থানায় ফোন করলেন। জানতে পারলেন একদল হাতি গ্রামে ঢুকেছিল এ খবর তাঁরা জানেন। সশস্ত্র পুলিশও পাঠিয়েছেন। কিন্তু হাতিরা শিশু অপহরণ করেছে এ খবর কেউ থানায় নথিভুক্ত করেনি। এখন হাতির দল গ্রামের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

সূরযপ্রসাদ ভাবলেন, বুরুডি অফিস থেকে যে ফোন করেছে, তার সঙ্গে দুষ্টচক্রের কোনো যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। আর বুরুডি অফিসের কর্তাব্যক্তিটি অত্যন্ত ধুরন্ধর। সূরযপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কোনোদিনই মধুর নয়।

সূরযপ্রসাদ নিজে থেকে সুখনডিহি গ্রামের ঘটনার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখালেন না। ওখানে বনবিভাগের অফিস আছে, ব্যাপারটা এখনো তাদের এক্তিয়ারে। ও ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো।

সূরযপ্রসাদ ঠিক করলেন, তিনি দেওকীনন্দনজীর ওপর অফিসের দায়িত্ব দিয়ে চলে যাবেন জামশেদপুর। সঙ্গে নেবেন বিশ্বস্ত দুই রক্ষী কিষণলাল আর সুদাম মাহাতোকে।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সূরযপ্রসাদ জিপ নিয়ে রওনা হলেন জামশেদপুরের পথে। কিষণলাল আর সুদাম আছে। টাইগারকেও নিয়েছেন। তবে বাহাদুরকে রেখে এসেছেন।

বেলা তিনটা নাগাদ ওঁরা জামশেদপুর পৌঁছলেন। সরকারি বাংলোয় না গিয়ে তিনি হাসপাতালের কাছেই একটি আবাসিক হোটেলে উঠলেন।

দিনের বাকি সময় এবং রাতটুকু এখানেই কাটাবেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস আহতের সঙ্গীসাথীদের কেউ-না-কেউ এই হোটেলে না হোক, কাছাকাছি কোথাও আছে। তারা নিশ্চয়ই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। আর শান্তিলালজীও এখানে আসতে পারেন। হয়তো ব্রীজমোহনও।

হোটেলের একটি ঘরে সূরযপ্রসাদও টাইগার পাশের অন্য ঘরে আছে দুই সশস্ত্র রক্ষী কিষণলাল আর সুদাম।

রাত গভীর। সূরযপ্রসাদ অনেক সময় জেগেছিলেন। ঘুম আসছিল না। চিন্তার বোঝা মাথায় থাকলে ঘুম আসে না।

তবু শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লেন সূরযপ্রসাদ। কিন্তু হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল টাইগারের গুমরে ওঠার শব্দে।

সূরযপ্রসাদ উঠে বসলেন। রিভলবারটা মাথার নিচে ছিল, হাতে নিলেন।

এই মুহূর্তে ঘরের দরজা খুললেন না সূরযপ্রসাদ। একটু সময় নিলেন। টাইগারের মাথায় হাত দিয়ে তাকে চুপ থাকতে বললেন। কথা শোনে টাইগার। সে জিব বার করে ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে প্রভু সূরযপ্রসাদের কোলের ওপর দুটি থাবা দিয়ে। টাইগারের মুখ সূরযপ্রসাদের মুখের কাছে।

মিনিট পাঁচেক সময় নিয়ে দরজা খুললেন সূরযপ্রসাদ। টাইগারও বেরিয়ে এসেছে। সূরযপ্রসাদের ইঙ্গিতে টাইগার বারান্দা দিয়ে ছুটে গেল। ফিরে এলো বারান্দার শেষপ্রান্তের ঘরটির বন্ধ দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়ে।

সূরযপ্রসাদ বুঝলেন ওই কোণের ঘরটিতে সন্দেহভাজন কেউ আছে। আর এটাও ঠিক, তার মধ্যে কেউ না কেউ টাইগারের পরিচিত। ওরা ঘ্রাণশক্তিতে অনেক কিছু বুঝতে পারে।

কিন্তু এই রাতে এখন চুপচাপ থাকাই ভালো।

বাকি রাতটুকু আধো ঘুমে, আধো জাগরণে কাটালেন সূরযপ্রসাদ। ভোর হতে না হতেই দরজা খুলে বাইরে এলেন। বারান্দা দিয়ে শেষ প্রান্তের ঘরটির কাছে গেলেন। ঘরটির দরজা বন্ধ। কোনো জানালাও খোলা নেই।

এবারে হোটেলের অফিসে এলেন সূরযপ্রসাদ। অফিসে কেউ নেই। একটু অপেক্ষা করলেন। একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এলেন। হোটেলের অফিসকর্মী।

দোতলার কোণের ঘরটির নম্বর আগেই দেখে এসেছেন সূরযপ্রসাদ। এগারো নম্বর ঘর। ঘরে কারা আছে, তাদের নাম জানতে চাইলেন অফিসকর্মীর কাছে।

প্রথমে নাম জানাতে চাইলেন না ভদ্রলোক। শেষে পরিচয় দিতে তিনি রেজিস্টার খুলে এগারো নম্বর ঘরের অতিথিদের নাম-ঠিকানা জানালেন। একজনের নাম জোসেফ মহীতোষ হেমব্রম, অন্যজনের নাম আসগর আলী। দুজনেরই ঠিকানা দেয়া ধানবাদের।

সূরযপ্রসাদ শুনলেন এই পর্যন্ত। তাঁর ধারণা দুজনের নাম-ঠিকানা দুই-ই ভুয়ো। আর ও ঘরে যে তৃতীয় ব্যক্তি আছে এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিত, যে গভীর রাতে এই হোটেলে আসে। যদিও হোটেলের দরজা রাত বারোটায় বন্ধ হয়ে যায়, তবে যোগাযোগ থাকলে তারপরেও হোটেলে ঢোকার গোপন দরজা খোলা হয়।

আরো ধারণা সূরযপ্রসাদের, তৃতীয় ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ। যার জন্যে টাইগার গভীর রাতে গুমরে উঠেছিল।

বাসক, পিপুল আর তুলসীর গুণে সমৃদ্ধ কাফ সিরাপ

বাইটোকাফ

বাসক, পিপুল, তুলসী, যষ্টিমধু এবং নানাবিধ ভেষজ গুণে ভরপুর এক উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক কাফ সিরাপ-বাইটোকাফ। যা সাধারণ কাশি, ঠাণ্ডা লাগা, গলা খুশখুশ ইত্যাদিকে দূর করতে সহায়তা করে।

প্রস্তুতকারক:
ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড
কলিকাতা-৭০০০৩১

বিশদ বিবরণ ও পুস্তিকার জন্য লিখুন

সর্দি কাশিতে অসহিষ্ণু

- আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী?
- আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে?
- আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন?
- আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না?

তাহলে এখনই আপনার প্রয়োজন

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য গড়ের বাজার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস

১৩ মহারাজা টেগোর রোড, কলিকাতা-৩১ ফোন: ৪১০০৬৯

বাজে ঢাক ড্যাম কুড়কুড়
পুজোয় এবার দেখছ ঠাকুর
সকাল থেকে রাত্রি দুপুর
হৈ চৈ আর খেলা।
রাজুর সাজে মোরা ভরপুর
সবাই পিছনে করে ঘুরঘুর
জানে গেছে তাই সবে এক সুর
এবার পুজোয় মেলা

RAJU
গেঞ্জি মোজা
জাঙ্গিয়া

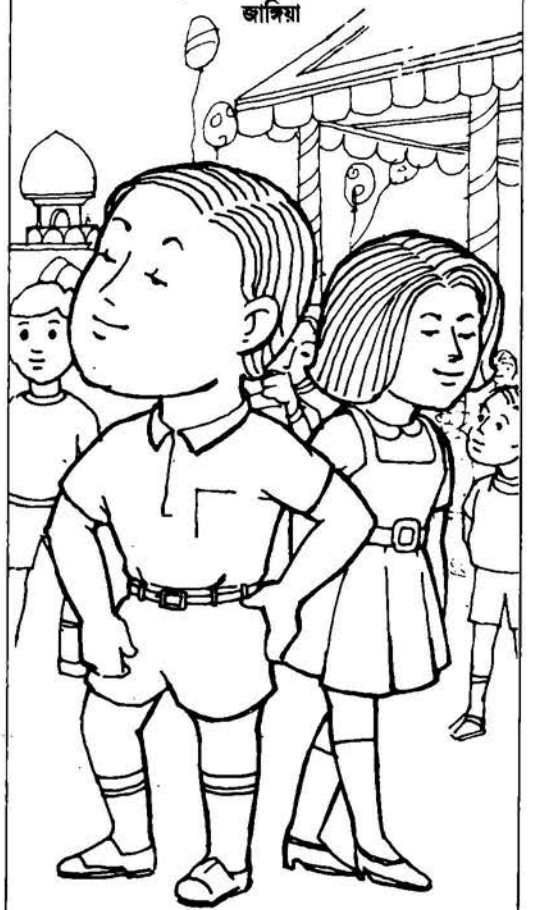

সর্বকর্মে সিদ্ধিদাত্রী
অন্তরে সবার
ধরিত্রী মাঝারে
গড়ে তোলো
জননী সুখদা
তোমারে জানাই

ঐশ্বর্য-জীবন ধাত্রী
বিরাজে তোমারে
সমৃদ্ধি-সঞ্চয় করে
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
প্রসন্ন বরদা
শতকোটি প্রণাম !!

সুখ-সম্পদে ঘর ভরে, সঞ্চয়ের সুফল দু'গুণ করে।

স্টেট ব্যাঙ্ক

স্পেশাল টার্ম ডিপোজিট যোজনা

Chaitra Leo Burnett B SBI 2189/93 BEN

আবার ঘরে ফিরে এলেন সূরযপ্রসাদ।

কিষণলাল আর সুদামকে এগারো নম্বর ঘরের দিকে নজর রাখতে বলে সূরযপ্রসাদ নিজেই জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন হাসপাতালে সেই আহত লোকটির সঙ্গে দেখা করতে।

ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে সূরযপ্রসাদ গেলেন আহতের কাছে।

আহত আদিবাসী তরুণটি জেগেই ছিল।

সূরযপ্রসাদ তার কাছে গেলেন। তরুণটির অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। তার দু-চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

তরুণটির নাম জীবন মাহাতো। বাড়ি কোকপাড়ায়। বেশি কথা বলার মতো অবস্থা তার নয়। সে জানালো রুজির ধান্দায় সে এই কাজে নেমেছিল। দলের লোকেরা—সে নেকড়ের খপ্পরে পড়েছে দেখেও বাঁচাতে চেষ্টা করেনি।

অনেক টাকা রোজগার করবে, তার অভাব ঘুচবে এই আশায় সে দুষ্টচক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভয়ংকর কাজে নেমেছিল। তাও বেশি-দিন আসেনি। মাস তিনেক হলো এই কাজে নেমেছে। জঙ্গলের পশুশিকারী যারা, যারা নেকড়ে, চিতা, হায়েনা, খরগোশ, গোসাপের চামড়ার চোরাকারবার করে, যারা বাঘ, ভাল্লুকের বাচ্চা ধরে গোপনে পাচার করে, সে তাদের দলে নাম লিখিয়েছিল। এবারে তারা যদুগোড়ার জঙ্গল থেকে একটি শিশু-হাতিও ধরেছে। কিন্তু নেকড়ের বাচ্চা ধরতে গিয়ে তার এই বিপদ।

এত কথা বললে জীবন, কিন্তু দলের কোনো লোকের নাম সে উচ্চারণ করলো না।

সূরযপ্রসাদ যখন দলনেতার নাম জানতে চাইলেন, তখন জীবনের মুখচোখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে ভয়-কাতর কণ্ঠে বললে, বাবুজী, তারা নেকড়ের চেয়ে ভয়ংকর। তারা আমাকে খতম করে দেবে। আমার কাছে আর কিছু জানতে চাইবেন না।

সূরযপ্রসাদ অভয় দিলেন, তোমার কোনো ভয় নেই তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমি তোমাকে জঙ্গল অফিসের ঠিকা কাজে লাগিয়ে দেবো। তুমি বলো কে এই দলের কর্তা।

খুব নিচু গলায় মনোহর কিস্কুর নাম উচ্চারণ করে বললে, তারা এই শহরেই আছে বাবুজী।

জীবন মাহাতোর দু-চোখে এখন জলের ঢল। সূরযপ্রসাদ তার কপালে হাত রেখে বললেন, আমি থাকতে তোমার কোনো ভয় নেই ভাই। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। মনকে চাঙ্গা রাখো।

সূরযপ্রসাদ আর কিছু জানতে চাইলেন না জীবন মাহাতোর কাছে। চারদিকে চোখ রেখে হাসপাতালের বাইরে এলেন।

হাসপাতালের বাইরে এসেই সূরযপ্রসাদ দেখলেন, ছাই রঙের অ্যামবাসাডার থেকে শান্তিলাল নামছেন। তখনো গাড়িটির স্টিয়ারিং ধরে ফেল্ট হ্যাট পরা একজন তাগড়াই চেহারার জোয়ান। ফেল্ট হ্যাটটি কপালের ওপর এমন ভাবে নামানো, মুখটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পিছনে বসে ছুঁচলো দাড়িওয়ালা একজন মধ্যবয়সী লোক।

সূরযপ্রসাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে শান্তিলালের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সূরযপ্রসাদ দাঁড়ালেন না, সোজা জিপ ছুটিয়ে চলে এলেন পুলিশ দপ্তরে।

রজনী শর্মা জাঁদরেল পুলিশ অফিসার এবং অত্যন্ত ধুরন্ধর। তাঁকে আনুপূর্বিক সব ঘটনা অবহিত করলেন সূরযপ্রসাদ। আর একটি অনুরোধ বিশেষভাবে রাখলেন, হাসপাতালে ভর্তি আছে জীবন মাহাতো, তার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

রজনী শর্মা হাসিমুখে জানালেন, এ ঘটনা সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। গতরাতেই রাজ্যের বনঅধিকর্তা আমাকে টেলিফোনে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছেন, আমরা যেন বনবিভাগ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দপ্তরকে সব রকমে সাহায্য করি। আপনার নিরাপত্তার দিকটাও তিনি দেখতে অনুরোধ করেছেন প্রসাদজী।

রজনী শর্মা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন সূরযপ্রসাদের দিকে।

উষ্ণ করমর্দন করলেন দুজনে। দুজনের মুখেই হাসি।

শেষ বিকালে জামশেদপুর থেকে বেরোবার মুখে একটি দৈনিক পত্রিকার সান্ধ্য সংখ্যা দেখলেন সূরযপ্রসাদ। শিরোনামে রয়েছে একটি জবর খবর। ধারাগিরির কাছে বুরুডির পাশের গ্রাম সুখনডিহি ঘেরাও করে রেখেছে বুনো হাতির দল। হাতির দল গাঁয়ের মধ্যে ঢোকেনি, কিন্তু চারদিক থেকে গ্রাম অবরোধ করে রেখেছে। কোনো মানুষ গ্রামে ঢুকতে বা বেরোতে পারছে না। খবরে আরো প্রকাশ পেয়েছে, একটি একচোখ কানা বানরকে দেখা গেছে হাতির দলের সঙ্গে। ধারাগিরির জঙ্গল-মহলের হাতির দল তো আছে, যদুগোড়ার জঙ্গল থেকেও হাতিরা এসেছে এবং আসছে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে।

খবর পড়ে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলেন সূরযপ্রসাদ। তবে কি সবটাই তাঁর বাহাদুরের কেরামতি! হাতির দলের নানা ধরনের আচরণের কথা তিনি জানেন, কিন্তু তাঁর এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি।

খবরে আরো জানা গেল রাজ্যের বন-অধিকর্তা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছেন। বনরক্ষী বাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলে। সবই শান্তি এবং জীবনরক্ষার জন্যে।

সূরযপ্রসাদ আর সময় নষ্ট করতে চান না। দুই সান্ত্রী এবং টাইগারকে নিয়ে জিপ ছুটিয়ে নিয়ে চললেন অকুস্থলের দিকে।

পথেই সন্ধ্যা হলো।

যদুগোড়ার বিখ্যাত রংকিনী মন্দিরের কাছে পাহাড়ী পথ বাঁক রয়েছে। জায়গাটা যেমন নির্জন, তেমনি বিপদজনক।

বাঁক ঘোরার মুখেই পাহাড়ের ওপর থেকে একটি শব্দ পেলেন সূরযপ্রসাদ। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলেন না।

এই মুহূর্তে কোনোমতে জিপ দাঁড় করানো ঠিক নয়। আরো দ্রুতগতিতে জিপ ছোটালেন।

বিপরীত দিক থেকে একটা লরি ছুটে আসছে। লরির হেডলাইটে দেখা গেল বিরাট একটা পাথরের চাঁই গড়িয়ে পড়লো পথের ওপর। লরিটা দাঁড়িয়ে পড়লো। সূরযপ্রসাদ বাঁদিকে গভীর খাদ জেনেও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জিপ চালিয়ে নিয়ে গেলেন।

সুরদা ক্রসিং পেরিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন সূরযপ্রসাদ। আর একটু এগোলেই সুবর্ণরেখার সেতু। মৌভাণ্ডারের আলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। সুবর্ণরেখা পেরিয়ে মৌভাণ্ডার, ঘাটশীলা শহর ছুঁয়ে তবে যেতে হবে ধারাগিরির পাদদেশে বুরুডিতে।

বুরুডি গ্রামে ঢোকার মুখে সূরযপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাজ্য বনঅধিকর্তা মাথুর সাহেবের সঙ্গে। ভারতীয় ফরেস্ট সার্ভিসের কেদার মাথুর। বয়সে তরুণ। সূরযপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও মধুর। সূরযপ্রসাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

সূরযপ্রসাদ জিপ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে মাথুর সাহেব তাঁর করমর্দন করে বললেন, আপনার আদরের হাতিদের কাণ্ড দেখুন। সকাল নটা থেকে সুখনডিহি গ্রাম অবরোধ করে বসে আছে। আর ওদের সেনাপতি তো আপনার প্রিয় বানরটি।

টাইগারও জিপ থেকে নেমে মাথুর সাহেবের সামনে গিয়ে জিব বার করে লেজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। মাথুর সাহেব টাইগারের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,

এটিকেও বেশ তালিম দিয়েছেন মনে হচ্ছে। আপনি বেশ আছেন প্রসাদজী। আপনার কথা তো বন এলাকায় রূপকথার মতো শোনা যায়।

সূরযপ্রসাদ বললেন, স্যার আপনি বোধহয় আমাকে একটু বেশি ভালোবাসেন। কে কি বলে জানি না, আমার মনে হয় বনচারী প্রাণীদের সত্যি যদি ভালোবাসতে পারতাম, তাহলে একটা রূপকথার রাজ্য গড়ে তুলতে পারতাম।

কেদার মাথুর ও সূরযপ্রসাদ একসঙ্গে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন।

এই সময় হঠাৎ বাহাদুর এসে হাজির হলো।

মাথুর বললেন, এটি তো আপনার বিশ্বস্ত অনুচর।

—তার চেয়ে বেশি। সূরযপ্রসাদ বললেন, ও আমার বন্ধু। আর একটিকে তো দেখছেন আপনার সামনেই।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টাইগার বিচিত্র ভঙ্গিতে জিব বার করে মাথুরের বুকের ওপর দুটি পা দিয়ে দাঁড়ালো। মনে হলো, টাইগার যেন পরম খুশিতে হাসছে।

ধারাগিরির পাদদেশে ছোট গ্রাম বুরুডি। আদিবাসীদের বাস। সম্প্রতি এখানে নির্মিত হয়েছে জলাধার। যেখান থেকে কাছাকাছি কৃষি এলাকায় সেচের জল সরবরাহ করা হয়।

গাঁয়ের নামও বুরুডি। আদিবাসীদের বাস। গাঁয়ের তিন দিক পাহাড়ঘেরা। ধারাগিরির দিকে অরণ্য গভীর। হাতিদের প্রিয় জায়গা ধারাগিরির অরণ্য। ওরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে চলে যায় সুবর্ণরেখা পেরিয়ে ওপারের জঙ্গলে। তবে বর্ষার মরশুমে সাধারণত আপন এলাকা ছেড়ে বেরোয় না। আবার ওপারে যদুগোড়ার বন এলাকার হাতিরাও আসে এই তল্লাটে।

সূরযপ্রসাদ আর মাথুর সাহেব পায়ে হেঁটে চলতে আরম্ভ করেছেন। যাবেন বুরুডির লাগোয়া সুখনডিহি। টাইগার সঙ্গে আছে। আর জন কয়েক সান্ত্রী তো আছেই।

সুখনডিহি গাঁয়ের চারদিকে হাতিরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চলার পথে কোনো কোনো হাতি শুঁড় দুলিয়ে সূরযপ্রসাদকে তাদের ভালোবাসা জানালো।

বনঅধিকর্তা মাথুর রীতিমতো অবাক এবং অভিভূত হাতিদের সঙ্গে সূরযপ্রসাদের মিতালি দেখে। একসময় বললেন, প্রসাদজী, সত্যি আপনি আশ্চর্য পশুপ্রেমিক। এতদিন আপনার কথা শুনেছি, কিন্তু আজ চোখে দেখলাম।

হঠাৎ দুজনে থমকে দাঁড়ালেন। দেখা গেল কান্নারত হাতিটি, সেই শোকাতুরা মা-হাতিটিকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে মা-হাতিটি করুণ আর্তনাদ করে উঠলো।

সূরযপ্রসাদ তার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ভাষা তো বুঝবে না, তবু আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন, তোমাদের চিন্তা নেই। আশা করছি তোমার হারানো সন্তানকে ফিরে পাবে।

মাথুরের দিকে তাকিয়ে সূরযপ্রসাদ বললেন, জানেন স্যার, বনের পশুদের ভাষা ভালোবাসা দিয়ে বোঝা যায়। আবার ওরাও বুঝতে পারে আমাদের কথা। ভালোবাসার ভাষাটা মানুষই হোক, পশুরই হোক—এক।

দুজনে কথা বলতে বলতে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছেন। গাঁয়ের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে—কিন্তু মানুষ নেই ঘরের বাইরে। মনে হয় যেন একটি মৃত গ্রাম।

টাইগার এবং রক্ষীরা পিছনে আসছে। মাঝে মাঝে মাটি শুঁকছে টাইগার। সময় সময় গুমরে উঠছে। কখনো-বা থমকে দাঁড়িয়ে সূরযপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে লাল চোখ মেলে।

মাথুর সাহেব ও সূরযপ্রসাদ দুজনেই চিন্তা করছেন বুনো হাতির দলকে কি করে ফেরানো যায়। এখনো ওরা শান্ত আছে, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ওরা ক্ষেপে যেতে পারে। ওরা যদি ক্ষেপে যায়, তা হলে রক্ষে নেই। গোটা গ্রাম তছনছ করে দেবে।

সূরযপ্রসাদের ধারণা, শিশু-হাতিটিকে দুষ্কৃতকারীরা পাচার করতে পারেনি। গ্রামের মধ্যে কোথাও তাকে রাখা আছে।

মাথুর আর সূরযপ্রসাদ নানাভাবে আলোচনা করে ঠিক করলেন, ওঁরা গ্রামের মধ্যে ঢুকবেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ওঁরা কিন্তু গ্রামে ঢুকতে বাধা পেলেন না হাতিদের কাছ থেকে।

লোকালয়ে ঢুকলেন ওঁরা। অধিকাংশ ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করতে তবে কেউ কেউ জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালো। প্রত্যেককে একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন ওঁরা, বাচ্চা হাতির কথা কেউ জানে কিনা। কিন্তু সবারই এক কথা, কিছু জানে না।

কিন্তু সূরযপ্রসাদের ধারণা, গাঁয়ের লোক জানে হাতির ব্যাপারটা। ভয়ে তারা মুখ খুলছে না।

হঠাৎ এক জায়গায় টাইগার গুমরে উঠলো। তাকে উত্তেজিতও মনে হলো। একটু এগিয়ে গেল টাইগার। চিৎকার করে সূরযপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

এগিয়ে গেলেন সূরযপ্রসাদ আর মাথুর। দুজনেই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, স্যাঁতসেঁতে মাটির ওপর হাতির পায়ের দাগ। মলও রয়েছে। রয়েছে বেশ কিছু মানুষের এলোমেলো পায়ের দাগ।

জায়গাটার কাছেপিঠে বাড়িঘর নেই। অদূরেই টিলা পাহাড়। পাহাড়ের নিচে কয়েকটি বাড়ি।

আবার এগিয়ে চললেন মাথুর আর সূরযপ্রসাদ। এখন তাঁরা টাইগারকে অনুসরণ করছেন।

একটি খোলা ছাওয়া বাড়ির কাছে এসে টাইগার উত্তেজিত হয়ে গর্জাতে আরম্ভ করলো। ঘরটির দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ছোট ছোট খুপরি জানালার একটিও খোলা নেই। টাইগার উচ্চকণ্ঠে ডাকা শুধু নয়, বন্ধ দরজা আঁচড়াতে আরম্ভ করলো।

প্রতিবেশীদের মধ্যে দুজন লোক এলো। কিছুক্ষণ গোয়েচারার মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

মাথুর জানতে চাইলেন, এ বাড়িতে কেউ নেই?

একজন কিছুটা তিরিক্কি মেজাজে বলে উঠলো, দেখছেন তো দরজা তালাবন্ধ।

মাথুর একটু বিরক্তই হলেন লোকটির কথা বলার ভঙ্গিতে। কিন্তু কিছু বললেন না।

সূরযপ্রসাদ কিছু বললেন মাথুর সাহেবের কানে কানে। মাথুরের দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

যে দুজন লোক এসেছিল, তারা চলে যাচ্ছিল। সূরযপ্রসাদ বললেন, যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকো চুপচাপ।

দুজনেরই মুখের চেহারা বদলে গেল। টাইগার একটি লোকের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাতে লাগলো।

একজনকে কাছে ডাকলেন সূরযপ্রসাদ। বললেন, তোমাদের ভয় নেই। এখন সামান্য একটি কাজ করো তো। কয়েকটা শুকনো লঙ্কা এনে দাও।

লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করলে, শুকনো লঙ্কা কি হবে সাহেব?

সূরযপ্রসাদ বললেন, দেখতে পাবে কি হবে। যাক, চলো—আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

কাছেই লোকটির বাড়ি। সূরযপ্রসাদ তার সঙ্গে গেলেন। একমুঠো শুকনো লঙ্কা নিয়ে তবে এলেন। লোকটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

এবারে মাটির পাত্র যোগাড় করে তার ওপর কাগজের টুকরো জ্বেলে শুকনো লঙ্কা সেই আগুনে ফেলে দিলেন। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে খোলায় ছাওয়া চালের ফাঁক দিয়ে জ্বলন্ত

লঙ্কাগুলো ফেলে দিলেন ঘরের ভিতরে। ঠিকমতো কাজ হয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে আসছে কয়েকটি কণ্ঠের দমফাটা কাশির আওয়াজ।

মাথুর বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে বললেন, কেউ পালাবার চেষ্টা কোরো না পিছনের দরজা দিয়ে।

বলেই মাথুর ঘরের পিছন দিকে গেলেন।

তাজ্জব কাণ্ড। দেখা গেল চারটি তাগড়াই চেহারার হাতি ছুটতে ছুটতে আসছে। সঙ্গে লাফাতে লাফাতে আসছে বাহাদুর। হাতিদের মধ্যে সেই মা-হাতিটিও আছে।

দুটি হাতি শুঁড় জড়িয়ে ঘরের বারান্দার শালের খুঁটি উপড়ে ফেললো। খোলার চালের খানিকটা অংশ ভেঙে পড়লো।

সূরযপ্রসাদ এগিয়ে যেতে সাহস করছেন না। কিন্তু না এগোলেই নয়। হাতিরা যদি দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে, তাহলে ওরা পায়ের চাপে পিষে মেরে ফেলবে ভিতরের মানুষগুলোকে।

জীবনে এর চেয়ে অনেক ভয়ংকর ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন সূরযপ্রসাদ। কিন্তু বিপদ কখনো তাঁকে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি। এবারেও সাহসের সঙ্গে প্রথমে এগিয়ে গেলেন মা-হাতিটির কাছে। হাতিটি যেন জাদুকরের মুখোমুখি। একদম শান্ত হয়ে গেল। শুধু একবার শুঁড় তুলে করুণ সুরে ডেকে উঠলো।

সূরযপ্রসাদ হাতিটিকে আদর করে দরজার কাছে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, যারা ভিতরে আছো শোনো, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ো। পালাবার চেষ্টা কোরো না। ওখানে মাথুর সাহেব আছেন—আমাদের সাত্রীরাও আছে। ভুল করেও অস্ত্র ব্যবহার কোরো না। খুব সাবধানে বেরোবে, যেন দরজার আওয়াজ না হয়।

টাইগার কি বুঝলো সে-ই জানে। সে-ও ছুটে গেল পিছনের দরজার দিকে। হাতিরাও দারুণ বুদ্ধিমান। তারাও পিছনদিকে যেতে চাইছে। কিন্তু সূরযপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছেন দুহাত প্রসারিত করে। সূরযপ্রসাদের ভালোবাসার বাধা তারা অতিক্রম করতে পারছে না।

সূরযপ্রসাদ বুঝতে পারছেন না ঘটনার গতি কোন দিকে যাবে।

পিছনের দরজা খোলার সামান্য আওয়াজ হলো। চঞ্চল হলো হাতিরা। তারা সূরযপ্রসাদের বাধা মানলো না, পায়ের চাপে সামনের পলকা দরজা ভেঙে ফেললো। ঘরের জিনিসপত্তর তছনছ করতে আরম্ভ করলো।

সূরযপ্রসাদ দেখলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া চারজনকে নিয়ে মাথুর অন্যদিকে চলে যাবার উদ্যোগ করছেন। সূরযপ্রসাদ চিৎকার করে বললেন, ওদের নিয়ে যাবেন না—হাতিরা ক্ষেপে যাবে। একবার ক্ষেপে গেলে মুশকিল। আপনি বরং ওদেরকেও নিয়ে আসুন, তারপর আমি দেখছি।

বেশ কয়েকটি হাতি এখানে ভিড় করেছে। সূরযপ্রসাদ এক-এক করে হাতিদের কাছে যাচ্ছেন। একটি হাতি তো সূরযপ্রসাদকে শুঁড়ে জড়াতে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে এমনভাবে আদর করলেন যে, হাতিটি শান্ত না হয়ে পারলো না।

সূরযপ্রসাদ মনে মনে ভাবছেন, শিশু-হাতিটিকে খুঁজে বার করে না আনতে পারলে সমূহ বিপদ। এখনো ওরা নির্ভর করে আছে তাঁদের ওপর। কিন্তু ওদের ধৈর্যেরও সীমা আছে। যদি ওরা ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে তাহলে প্রলয়কাণ্ড বাধাবে। বনরক্ষী বাহিনী আর ওই পুলিশ বাহিনী গ্রামের মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবে না।

সূরযপ্রসাদ একরকম নিশ্চিত যে, শিশু হাতি তা সে একটি হোক, দুটি হোক—এই গ্রামেই আছে। নয়তো হাতির দল জঙ্গল ছেড়ে এসে এই গ্রাম অবরোধ করতো না।

কিন্তু কোথায় আছে শিশু-হাতিটি?

সূরযপ্রসাদের বিশ্বাস তাঁর বাহাদুরই পারবে শেষ পর্যন্ত সন্ধান দিতে। বাহাদুর এখন কাছেপিঠে নেই। সে নিশ্চয়ই তার কাজে আছে।

এবারে ঘরটির চারদিকে চোখ বোলালেন সূরযপ্রসাদ। এতক্ষণে খেয়াল হয়নি, এখন কেমন যেন—একটা চামসা গন্ধ পাচ্ছেন ঘরের বাতাসে।

বেশ কয়েকটি কাঠের বড় বড় বাক্স রয়েছে। প্রতিটি বাক্স তালাবন্ধ। ইচ্ছে করেই হাতিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে বাক্সের ওপর লাথি মারলেন সূরযপ্রসাদ। এবারে হাতিরা এগিয়ে এলো। পায়ের চাপে সবক'টি বাক্স ভেঙে ফেললো। ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এলো। দেখা গেল, প্রতিটি বাক্সে বন্যপশুর চামড়া। চামড়া খুব বেশিদিনের নয়—এখনো গা-গুলোনো চামসা গন্ধ রয়েছে। লক্ষ্য করলেন সূরযপ্রসাদ, বাঘ, হায়েনা, খরগোশ, গোসাপ প্রভৃতির চামড়া রয়েছে।

এই এলাকায় পশুশিকারী এবং পশুচামড়ার কারবারীদের আস্তানা—এ কথা বনবিভাগের অজানা নয়। বনবিভাগের লোক এ গ্রামে মাঝে মাঝে হানাও দিয়েছে। সূরযপ্রসাদও দু-দুবার বুরুডি এবং সুখনডিহিতে অতর্কিতে হানা দিয়ে বেশ কিছু পশুর চামড়া পেয়েছেন এবং কয়েকজনকে পাকড়াও-ও করেছেন। কিন্তু একসঙ্গে সাতটি বাক্সভর্তি পশুর চামড়া—এটা অভাবনীয় ব্যাপার।

সূরযপ্রসাদ ঘরের বাইরে এলেন। যে চারজন ঘরে আত্মগোপন করেছিল তাদের কাছে গেলেন। চারজনের নামধাম জানতে চাইলেন। দুজন এই গাঁয়ের বাসিন্দা, আর দুজন যদুগোড়া এলাকার।

ওদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেল, মনোহর কিস্কুর দলের লোক ওরা। আগে ওরা কেউ মজুরী খাটতো, কেউ লরির খালাসি ছিল। এখন বেশি টাকার লোভে ওরা মনোহর কিস্কুর দলে নাম লিখিয়েছে। অভাবেই ওরা এই অন্ধকার পথে এসেছে।

ওদের কথাতেই প্রকাশ পেল তিন দিন আগে ওরা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যদুগোড়ার জঙ্গল থেকে একটি শিশু-হাতিকে ধরে। ধরে বনের বাইরেও নিয়ে আসে। রাতের অন্ধকারে সুরদা ক্রসিং-এর কাছে একটি ত্রিপলঢাকা লরিতেও তোলে। কিন্তু গালুডি যাওয়ার পথে ফুলডুংরির কাছে লরির সামনের চাকা ফেটে যায়। তারপর তারা হাতিটিকে এই গাঁয়ে সুখরাম মাঝির পাঁচিলঘেরা বাড়িতে রাখে। বাচ্চা হাতির পায়ে লোহার শিকল বাঁধা। পালাবার উপায় তার নেই। সুখরাম মাঝি পুরানো ঘুঘু। একসময় সে-ই ছিল জঙ্গল এলাকার এক নম্বর দুশমন। এখন বুড়ো হলেও তার দলবল সক্রিয়। মনোহর কিস্কু তারই হাতে গড়া।

কথায় কথায় এই ধরা-পড়া লোকগুলির মুখে জঙ্গল অফিসের শান্তিলালের নামও শোনা গেল। জঙ্গলমহলে কোন দিকে বনরক্ষী বাহিনী যাবে না যাবে সে খবর আগাম জানিয়ে দেন শান্তিলাল। মনোহর কিস্কুর কাছ থেকে মাস গেলে সে মোটা টাকা পায়।

আরো জানা গেল, বাক্সভর্তি পশুর চামড়া আজ রাতেই পাচার করার কথা ছিল গালুডির জয়রামজীর লরিতে। জয়রামজী ওই চামড়া পৌঁছে দিত কলকাতায়।

জয়রামজীর নাম প্রথম শুনলেন সূরযপ্রসাদ।

সূরযপ্রসাদ এবার কেন্দুরি মাথুরের এখন সবচেয়ে বড় কাজ শিশু-হাতিটিকে উদ্ধার করা। কেননা হাতির বাচ্চাকে উদ্ধার না করতে পারলে গ্রাম তছনছ করে দেবে হাতির দল। তাতে নানাদিক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা।

ভাবনার এই মুহূর্তে দেখা গেল বাহাদুরকে।

সে লাফাতে লাফাতে আসছে।

কাছে এলো বাহাদুর। আকারে ইঙ্গিতে কত কি বললে সূরযপ্রসাদকে।

সূরযপ্রসাদ বাহাদুরের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, চলুন স্যার—কোথায় হাতি বন্দী আছে, ও-ই দেখিয়ে দেবে।

পায়ে হেঁটে এগিয়ে চললেন সূরযপ্রসাদ আর কেদার মাথুর। সেই চারটি লোককে তার আগে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছেন। বাহাদুর চলেছে আগেভাগে লাফাতে লাফাতে। জয়ের আনন্দ তার মুখে-চোখে।

সূরযপ্রসাদ একসময় জঙ্গলবিভাগে চাকরি পাওয়ার আগে দিনকতক সার্কাস দলে ছিলেন। সেইসময় কৌতূহল মেটাতে তিনি জন্তুজানোয়ারদের খেলার সময় সেখানে থাকতেন। তখন থেকে তাঁর পশুপ্রীতি জন্মায় এবং সার্কাসের জন্তুজানোয়ারদের বন্দীদশা তিনি মনেপ্রাণে কোনোদিনই পছন্দ করেননি। তাঁর কষ্ট হতো তাদের অবস্থা দেখে। তাই বনবিভাগে চাকরি নেবার পরই তিনি ঠিক করলেন, শুধু অরণ্যের পাখ-পাখালি, জীবজন্তু নয়—অরণ্যকেও তিনি ভালোবাসবেন। আজও পর্যন্ত তিনি তাই করেছেন। ভালোবেসে পেয়েছেনও অনেক কিছু। যে পাওয়ার কথা তিনি কাউকে বলতে চান না। বলেনও না।

গাঁয়ের প্রান্তে একটা বেশ উঁচু টিলার পাদদেশে সুখরাম মাঝির বাড়ি। এ গাঁয়ের অবস্থাপন্ন মানুষ সুখরাম। বাড়ি মাটির। কিন্তু পাঁচিল পাথরের।

পিছনে টিলার পাদদেশ দিয়ে চলে গেছে একটি রাস্তা। জিপ বা অটো রিকশা তো যাতায়াত করেই, মাঝেমাঝে লরিও চলে এ পথে। তবে রাস্তা ঠিক লরি চলাচলের উপযোগী নয়।

ওই টিলা পাহাড়টির ওপারে কোনো জনপদ নেই। ওদিকে জঙ্গল এলাকা। যে জঙ্গল এলাকা চলে গেছে বহুদূরে। ওই জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই কোকাপাড়া ধলভূমগড়, চাকুলিয়া হয়ে রাস্তাটা চলে গেছে বিহার পেরিয়ে পশ্চিম বাংলায়। রাস্তাটা পশুর চোরাচালানকারী এবং বেআইনী কাঠপাচারকারীদের কাছে কিছুটা নিরাপদ। জঙ্গলমহলের এই এলাকায় বনবিভাগের লোকজন কিছুটা কমই আছে।

সুখরাম মাঝির বাড়ির পাঁচিলের দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে যেতে কোনো অসুবিধা হলো না।

বৃদ্ধ সুখরাম বাড়ির ভিতর উঠানে একটা খাটিয়ায় বসে বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হুঁকা টানছিলেন। সূরযপ্রসাদ আর কেদার মাথুর ভিতরে ঢুকলেন। সুখরাম একবার তাকালেন এই পর্যন্ত, ভালোমন্দ কোনো কথা বললেন না। মাথুর সোজা এগিয়ে গেলেন সুখরামের কাছে। কোনো ভূমিকা না করেই জানতে চাইলেন, শিশু-হাতিটি কোথা?

সুখরাম বেশ বিস্ময় নিয়ে তাকালো মাথুরের দিকে। বললে, হাতিরা তো বনে থাকে। এখানে কেন?

ইতিমধ্যে সূরযপ্রসাদ বাড়ির প্রাঙ্গণটি ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন। বাড়ির উঠোন যে ঝাঁটা দিয়ে খুব ভালো করে সাফ করা হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। হাতি যে এখানে

দড়িটা কুড়িয়ে নিলেন।

ছিল, এই ঝকঝকে পরিষ্কার উঠোনই তা প্রমাণ করছে। হাতির পায়ের দাগ, মলমূত্র বা অন্য কোনো চিহ্ন নেই।

টাইগার তখন উঠোন শুঁকছে।

এক জায়গায় নাইলনের দড়ির টুকরো পাওয়া গেল। দড়িটা কুড়িয়ে নিলেন সূরযপ্রসাদ।

এবারে সূরযপ্রসাদ এলেন সুখরামের কাছে। সুখরাম একবার মুখ তুলে তাকালেন সূরযপ্রসাদের দিকে। বললেন, জঙ্গলবাবু, আপনাকে আমি চিনি। শুনেছি আপনার কথা। একবার গালুডির কাছে দূর থেকে দেখেছিলামও। তা আপনি একজন ঝানু লোক হয়ে এই বুড়ো মানুষটার বাড়ি হাতির বাচ্চা খুঁজতে এলেন! আমার হাসি পাচ্ছে। ছাগলের কিংবা ভেড়ার বাচ্চা হলে কথা ছিল—আপনি এসেছেন হাতির বাচ্চা খুঁজতে!

সূরযপ্রসাদ মনে মনে যতই চটুন, বাইরে তার প্রকাশ নেই। সূরযপ্রসাদ বুঝলেন, এই মানুষটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনো লাভ হবে না। রীতিমতো ঘুঘু মানুষ সুখরাম। বয়সে বুড়ো হলেও এখনো শয়তানী বুদ্ধিটা ঠিকই আছে।

টাইগার ডেকে উঠলো উচ্চকণ্ঠে। সেইসঙ্গে শোনা গেল মানুষের আর্তনাদ এবং চিৎকার।

মাথুর ও সূরযপ্রসাদ বেরিয়ে এলেন সুখরামের বাড়ি থেকে। দেখলেন হাতির দল ছুটতে ছুটতে আসছে।

যা ভেবেছিলেন তা নয়, সুখরামের বাড়ি হানা না দিয়ে হাতির দল ফসল এবং সবজি-ক্ষেতের ওপর দিয়ে ছুটছে টিলার দিকে।

বাহাদুরকে দেখা গেল একটি হাতির পিঠে।

আর এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়। সূরযপ্রসাদ এবং মাথুরও চললেন। রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন রাইফেল নিয়ে সেই সঙ্গে। আর টাইগার তো আছেই।

টিলা পাহাড়ের খানিকটা জলা জায়গা।

হাতিরা স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে গেল জলাভূমি। সূরযপ্রসাদ এবং মাথুরও হাঁটুজল ভেঙে টিলার নিচে এলেন।

হাতিরা এবারে টিলার ওপর দিকে উঠতে লাগলো। সেইসঙ্গে সূরযপ্রসাদ এবং মাথুর। রক্ষীবাহিনীর লোকেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে এদিক-ওদিক। এটা সূরযপ্রসাদের নির্দেশেই।

সূরযপ্রসাদ ভাবছেন, এটা তাঁর জীবনের একটা পরীক্ষা। এইরকম ঘটনার মুখোমুখি তাঁকে কখনো পড়তে হয়নি। দেখা যাক, ঘটনার চাকা কোন দিকে ঘোরে।

আরো হাতিরা ছুটতে ছুটতে আসছে। তাদের পথ এখন একটাই।

সূরযপ্রসাদ এবং মাথুর দুজনে আরো ভাবছেন, যদি হাতির বাচ্চাটি ফিরে পায় মা-হাতি, তাহলে ওরা দল বেঁধে আবার ওদের রাজ্যে ফিরে যাবে। কিন্তু যদি ফিরে না পায়, তাহলে হয়তো সুখনডিহি গ্রাম তছনছ করে দেবে।

টিলা পেরিয়ে হাতিরা এখন নিচের দিকে নামছে।

হঠাৎ শোনা গেল গুলির আওয়াজ।

কে কাকে গুলি করলো!

সূরযপ্রসাদ এবং মাথুর কয়েকজন রাইফেলধারী সান্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত পা চালালেন। প্রায় ছুটে চলার মতো।

টিলা পাহাড়ের নিচে বনবিভাগের রাস্তা।

পাহাড় থেকে নামার মুখেই সূরযপ্রসাদ, মাথুর এবং রক্ষীবাহিনীর লোক দেখতে পেলেন হাতিরা একটি লরি ভাঙচুর করছে। একটি

অটো রিকশাও ছিল, সেটিকে দুমড়ে দিয়েছে হাতিরা।

তখনো রহস্য, গুলির আওয়াজ কোত্থেকে এলো!

মাথুর বললেন, এখন কি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে প্রসাদজী?

সূরযপ্রসাদ বললেন, চিন্তা কিসের? হাতিরা জানে কে তাদের বন্ধু আর কে শত্রু। চলুন, কোনো ভয় নেই। আমার মনে হয়েছে, বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ওরা হাতির বাচ্চাটি পাচার করতে চেয়েছিল।

এবারে দেখা গেল সুন্দর একটি দৃশ্য। ভাঙা লরির ওপর একটি বাচ্চা হাতি। যার পায়ে শিকল এবং সর্বাঙ্গ নাইলনের দড়ি দিয়ে জড়ানো। লরির নিচে কয়েকজন মানুষ, যার মধ্যে রয়েছে সূরযপ্রসাদের অফিসের শান্তিলাল। হাতিরা তাদের ঘিরে রেখেছে।

টাইগার এগিয়ে গিয়েছিল।

আবার সে ফিরে এলো। সামনের দুটি পা সূরযপ্রসাদের বুকের ওপর দিয়ে কি যেন বোঝাতে চাইছে সে।

হঠাৎ সূরযপ্রসাদের মনে প্রশ্ন জাগলো, বাহাদুর কোথায়?

'বাহাদুর, বাহাদুর' বলে চিৎকার করলেন সূরযপ্রসাদ। সঙ্গে সঙ্গে টাইগার মাথা উঁচু করে করুণ আর্তনাদ করলো।

দেখলেন সূরযপ্রসাদ টাইগারের দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে।

সূরযপ্রসাদ অস্থির হয়ে উঠলেন। নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয় অনুচর বাহাদুরের কোনো বিপদ হয়েছে।

কারো নিষেধ কানে নিলেন না। টাইগারকে নিয়ে চললেন ঘটনাস্থলের দিকে।

বেশিদূর যেতে হলো না। দেখলেন সূরযপ্রসাদ একটি দাঁতালো জোয়ান হাতি বাহাদুরকে আলতোভাবে শুঁড়ে জড়িয়ে এদিকেই আসছে।

কাছে এলো হাতিটি। বাহাদুরকে তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো।

সূরযপ্রসাদ দেখলেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাহাদুরের দেহ। তার ডান দিকের কাঁধের ওপর গুলি লেগেছে। আহত যন্ত্রণাকাতর বাহাদুর, তবু জয়ের আনন্দ তার মুখে-চোখে।

সূরযপ্রসাদ ঝুঁকে পড়লেন বাহাদুরের মুখের ওপর। বাহাদুরের চোখে জল। তার মধ্যেও আনন্দের রেখা তার মুখে। সূরযপ্রসাদের দু-চোখও জলে ভরে উঠলো। এখন একটাই চিন্তা, এখনই বাহাদুরকে পশু-চিকিৎসালয়ে পাঠাতে হবে।

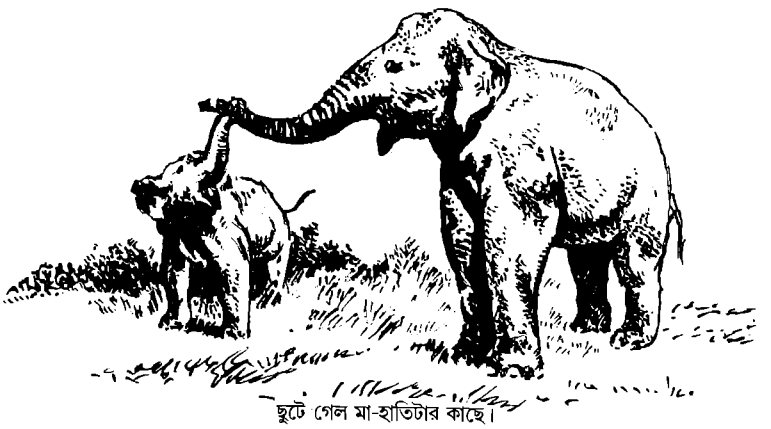

ছুটে গেল মা-হাতিটার কাছে।

দুজন সান্ত্রীকে ডাকলেন। বললেন, গাঁয়ের বাইরে যাও—অফিসের জিপে এখনি ওকে নিয়ে যাও পশু চিকিৎসালয়ে।

আহত বাহাদুরকে নিয়ে দুজন সান্ত্রী চলে গেল। সূরযপ্রসাদের এখন একটা চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছে, বাহাদুর বাঁচবে কিনা।

মাথুরকে নিয়ে সূরযপ্রসাদ এলেন ঘটনাস্থলে।

জানতে পারলেন বাহাদুরের কেরামতির কথা। একজন নিরীহ দেহাতি সব বললে। সে শুকনো কাঠ নিয়ে যাচ্ছিল, সবই চোখে দেখেছে। লরিটি স্টার্ট দেবার মুখে বাহাদুর একটি গাছের ডালে অদ্ভুতভাবে দোল খেয়ে লাফিয়ে পড়ে ড্রাইভারের কেবিনে। ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট দেবার মুখে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে। স্টিয়ারিংটিও ঘুরিয়ে দিতে যায়। ড্রাইভার গুলি করে বাহাদুরকে। সেই অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাহাদুর কেড়ে নেয় ড্রাইভারের হাতের রিভলবার। ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাইরে। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নেমে এসে রিভলবারটি কুড়িয়ে নিতে যায়। তার মধ্যে একটি হাতি এগিয়ে এসে রিভলবারটি পায়ের চাপে নষ্ট করে দিয়েছে।

লরির মানুষগুলোকে হাতির দল চিঁড়ে চ্যাপটা করে পিষে ফেলতে পারতো, কিন্তু তারা তা করেনি। দেহাতি লোকটি অবাক হয়ে এইসব কাণ্ড দেখেছে।

পায়ে পায়ে হাতির দলের দিকে এগিয়ে গেলেন সূরযপ্রসাদ। কেদার মাথুর একটু ভয়ই পেয়েছিলেন। প্রথমটা ওদিকে যেতে ইতস্তত করছিলেন, এবারে সাহস পেয়ে এগিয়ে গেলেন।

একদল হাতি ঘেরাও করে রেখেছে আটজন মানুষকে। তার মধ্যে রয়েছে বাহাদুরের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত মনোহর কিস্কু। একান্তে বনবিভাগের কর্মী শান্তিলালজীও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

কাছেই আর একদল হাতি লরিটিকে ভাঙচুর করছে। লরির পাটাতনে বাচ্চা হাতিটা রয়েছে বন্দীদশায়।

মাথুর জিজ্ঞাসা করলেন সূরযপ্রসাদকে, এখন কি করবেন প্রসাদজী?

সূরযপ্রসাদ বললেন, দুটি কাজই তো আছে। হাতির বাচ্চাটিকে মুক্ত করে দেওয়া, আর শয়তানগুলোকে থানার লকআপে পুরে দেওয়া। আর শান্তিলালজীর ব্যাপারটা আপনিই ভাবুন।

মাথুর বললেন, ওর কথা আর আলাদা করে ভাবছি না। আমার কাছে মনোহর কিস্কুর চেয়ে ওই বেশি অপরাধী।

সূরযপ্রসাদ বললেন, আমি যাই—বন্দী হাতিটিকে আগে মুক্ত করি। ওকে নিয়ে ফিরে যাক বনের হাতিরা বনে। তারপর অন্য কাজ।

রক্ষীবাহিনীর লোকেরা বন্দী হাতিটিকে মুক্ত করলো। হাতিটি ছুটে গেল প্রথমে মা-হাতিটির কাছে। আর হাতিরা শুঁড় তুলে ডেকে উঠলো। যে-সব হাতিরা এখানে আসেনি, গ্রাম ঘেরাও করেছিল, তারা এদিক-ওদিক থেকে ছুটতে ছুটতে এলো।

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

কেদার মাথুর তো সূরযপ্রসাদকে দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, সত্যি আপনি বনচারী ওই পশুদের ভালোবেসেছেন। ভালোবাসার যে কী দাম তা আজই বুঝলাম। প্রসাদজী, কামনা করুন আমি যেন ওদের এই-রকম ভালোবাসতে পারি।

সূরযপ্রসাদ অন্যমনস্ক।

মাথুর জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছেন?

সূরযপ্রসাদ বললেন, ভাবছি বাহাদুরের কথা। সে ছিল বলেই তো সবকিছু এত সহজে মিটলো। জানি না সে সুস্থ হবে কিনা । স্যার, আপনি এদিকটা দেখুন, আমি বরং যাই, বাহাদুরকে দেখে আসি।

মাথুর বললেন, ঠিক আছে। আপনাকে আমি বাধা দেবো না। তবে আমার ইচ্ছে মনোহর কিস্‌কুর কাছে একবারটি যান।

কয়েকটি হাতি তখনো ঘিরে আছে দুষ্কৃতকারীর দলকে।

মনোহর কিস্‌কু দাঁড়িয়ে আছে। বাহাদুরের আঁচড়-কামড়ে তার মুখ ক্ষত-বিক্ষত। জামাও ছিঁড়ে গেছে। সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ। আর শান্তিলালও দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে।

সূরযপ্রসাদ হাতির দলের মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। প্রথমেই গেলেন শান্তিলালজীর কাছে। বললেন, কি শান্তিলালজী, এখন কি ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছেন? নাকি অন্য কিছু!

শান্তিলাল আছড়ে পড়লেন সূরযপ্রসাদের পায়ের ওপর। বললেন, আমায় ক্ষমা করুন স্যার।

আপনাকে ক্ষমা! সূরযপ্রসাদ বললেন, একটা কথা শুনে রাখুন, যে অপরাধ আপনি করেছেন, তার উপযুক্ত শাস্তি আপনাকে পেতে হবে। পা ছাড়ুন।

সূরযপ্রসাদ এবারে এলেন মনোহর কিস্‌কুর কাছে।

মনোহরের চোখে-মুখে অনুতাপের কোনো চিহ্ন নেই। কোনো কথাই সে বললো না, শুধু একবার সূরযপ্রসাদের মুখের দিকে তাকালো।

একটি দাঁতালো হাতি এগিয়ে আসছে মনোহরের দিকে। এবারে মনোহর ভয়ে কুঁকড়ে গেল। এবারে সে সূরযপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্তকণ্ঠে বলে উঠলো, আপনি আমাকে বাঁচান স্যার।

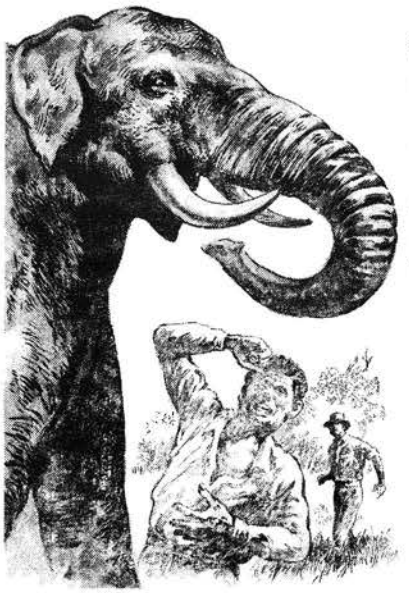

একটা দাঁতাল হাতি এগিয়ে আসছে।

সূরযপ্রসাদ একবার হেসে উঠলেন। দাঁতালো হাতিটির সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার শুঁড়ে হাত বুলোতে লাগলেন। হাতিটা পায়ে পায়ে পিছু হটলো।

হাতির দল এবারে বনে যাবার জন্য তৈরি। তবু তারা দাঁড়িয়ে আছে।

সূরযপ্রসাদ বুঝতে পারলেন, হাতিরা তাঁর অনুমতির অপেক্ষা করছে।

কাছেপিঠে যে ক'টি হাতি ছিল, সূরযপ্রসাদ তার প্রতিটির কাছে গেলেন। প্রত্যেকের শুঁড়ে কিংবা গায়ে হাত বুলিয়ে বোঝাতে চাইলেন, এবারে তোমরা তোমাদের রাজ্যে ফিরে যাও।

হাতিরা আনন্দে শুঁড় তুলে চিৎকার করলো।

যে হাতিরা তখনো গাঁয়ের বাইরে-ভিতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তারা ছুটে এলো। তারপর শিশু-হাতিটিকে মাঝখানে রেখে তারা সারি-বেঁধে চলতে আরম্ভ করলো।

সূরযপ্রসাদ এবং কেদার মাথুর অবাক চোখে সেই দৃশ্য দেখলেন।

হাতিরা চলে গেল। ওরা এখন যাবে ওদের এলাকায়। ওরা কেউ যাবে ধারাগিরির জঙ্গলে, কেউ যাবে সুবর্ণরেখা পার হয়ে যদুগোড়ার নিবিড় অরণ্যে।

টাইগার একবার মুখ তুলে করুণ আওয়াজ করলো। আর কেউ না বুঝুক, সূরযপ্রসাদ বুঝলেন, কেন এমন করুণ আওয়াজ করলো টাইগার। তার প্রিয় বানর বন্ধু বাহাদুর এখন এখানে নেই—এই তার দুঃখ।

সেই দুঃখ সূরযপ্রসাদের মনেও। তাঁর মনেও চিন্তা, বাহাদুর এখন কেমন আছে।

দুষ্কৃতকারীদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে কেদার মাথুরকে সঙ্গে করে সেদিন রাতেই সূরযপ্রসাদ এলেন ঘাটশীলার পশু-চিকিৎসালয়ে। গেলেন আহত বাহাদুরকে দেখতে।

বাহাদুরের বুকের ওপর দিকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে চুপচাপ বসে আছে।

সূরযপ্রসাদ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে-চোখে খুশি যেন উপচে উঠলো।

সূরযপ্রসাদের সঙ্গে কেদার মাথুরও তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

টাইগারের মুখে-চোখেও খুশির চিহ্ন। সে আনন্দ প্রকাশ করলো বাহাদুরের মুখ চেটে দিয়ে।

বাহাদুরকে এখনো কয়েকটা দিন এখানে থাকতে হবে।

ছবি : প্রসাদ রায়

কী কান্ড ! হান্নান আহসান

হারিকুরি মারিজুয়া তাকাস'নে কুজুকি
চারজনে কিনে নিয়ে ইয়া বড়ো সুজুকি
ঢুকেছিল ভারতে
কয়লার আড়তে
কালিঝুলি মেখে তারা হয়ে বলে, জুজু কি ?

তালিপমা কালিপমা মালিপমা ভাদুরা
হেঁটে হেঁটে গিয়েছিল খালি পায়ে মাদুরা
কিনতে কী ? নেড়ুয়া
সব তারা ভেড়ুয়া
হেসে হেসে লুটোপুটি ছেলেমেয়ে দাদুরা।

ছবি : প্রণবকুমার হাজরা

এর নাম ভগবানের হাত

শৈলেন ঘোষ

রাজা কাক্কাবোক্কা যখন অকাতরে ঘুমোন তখন যা দেখতে লাগে! সেই সময় যদি আবার ভোরের হাওয়া ফুরফুর করে বয়ে যায়, তাহলে তো আর কথাই নেই। শোবেন তিনি চিত হয়ে। নাক ডাকাবেন ভুরভুর করে। নিশ্বেসের তালে-তালে পেটটি একবার উঠবে একবার নামবে। দেখলে হেসে মরে যাই।

তা দেখি না তোমার মুরোদ! একবার হাসো! রাজার যদি ঘুম ভেঙে যায়, আর, তোমাকে হাসতে দ্যাখেন, ব্যাস, ঘটে যাবে মহাপ্রলয়। তোমার হাসা তো চুকে যাবেই, এমন কী প্রাণটিও যদি ফুস হয়ে যায়, কিছু বলার নেই। কে বলবে? যে বলবে সে-ও মরবে। শখ করে কে আর মরতে চায় বলো?

কেন, একবার তো হলোও তাই। হলো-তো-হলো সেই মন্ত্রীমশায়ের ওপরই হলো। তা ঠিক আছে, তুমি ঘুমোচ্ছ, নাক ডাকাচ্ছ, কি থেকে-থেকে ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছ, এসব দেখে না-হয় নাই হাসলুম। কিন্তু তুমি যদি একটি বাছুরের পেছনে ছুটতে গিয়ে লাথি খাও! কিংবা ধরো লাথি খেয়ে চিতপটাং হয়ে ছিটকে পড়ো, তখন কে না-হেসে থাকে শুনি! তার ওপর তুমি রাজা। তা, রাজা বাছুরের লাথি খাচ্ছে, ডিগবাজি মারছে, আর আমরা তাই দেখে প্যাঁচার মতো মুখ ভার করে বসে আছি, এমন কথা কে কবে শুনেছে! তুমি হয়তো শুনলে অবাক হবে, যে-বাছুরটির কথা বলছি, সেটি রাজার চোখের সমুখেই জন্মাল। রাজার পাশেই ছিলেন মন্ত্রীমশাই। তাঁকে কিছু না বলেই রাজা ধরতে গেলেন বাছুরটিকে। কী আশ্চর্য, বাছুরটি সঙ্গে সঙ্গে তিড়িং বিড়িং শুরু করে দিলে! ব্যাটার নাকে পৃথিবীর নোংরা-হাওয়া সেঁদুতেই, বাছুর চার পা তুলে নাচ জুড়ে দিলে! শাবাশ! তা, তুমি রাজা! তুমিও তার সঙ্গে নাচানাচি শুরু করে দিলে কী বলে! ঘরে রাজলক্ষ্মী আছে। গাছে কাক-পক্ষী আছে। পাশে মন্ত্রী আছে। ছিঃ, ছিঃ, রাজার মান-সম্মান বলে তো একটা 'ইয়ে' আছে! তা তুমি সে সব কিছু মানবে না! তুমি কী বলে বাছুরের সঙ্গে নাচো! বলতে নেই, রাজাকে বাছুরের সঙ্গে নাচতে দেখে গোশালের লোকজন একটুও হাসেনি। অবিশ্যি তারা ভেতরে-ভেতরে হাসছিল কিনা, তা বাপু তাদের ভেতরে না ঢুকলে কে বলবে! কিন্তু রাজাকে বাছুরের লাথি খেতে দেখে মন্ত্রীমশাই আর থাকতে পারেননি। তার ওপর বাছুরের লাথির ধাক্কায় রাজামশাই যখন আছাড় খেলেন, তখন মন্ত্রীমশাই একেবারে অট্টহাস্য করে উঠলেন, হা-হা-হা!

ব্যাস! সেই হা-হা-হা থেকেই শুরু হয়ে গেল হাহাকার। সিপাই-সান্ত্রী ছুটল রাজাকে সামাল দিতে। দাস-দাসী ছুটল রানীকে খবর দিতে। পাত্র-মিত্র ছুটল রাজ-কবিরাজকে ডাক দিতে। সে এক হলুস্থূল কাণ্ড! কিন্তু মন্ত্রীমশায়ের 'হা-হা' শুনে কোন ফাঁকে যে রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীর মুখের দিকে কটমট করে চোখের দৃষ্টি হানলেন, সে এক মন্ত্রীমশাই ছাড়া আর কেউ টের পেল না। রাজা কাক্কাবোক্কার সেই ভয়ংকর

চক্ষু দেখেই মন্ত্রীমশায়ের রক্ত হিম। আর হাসি! এবার ফাঁসির হুকুম হলো বলে!

খুব রক্ষে বলতে হবে। কপালের জোর না থাকলে এমন বিপদ থেকে মানুষ বাঁচে না। কেননা, অমন কটমট করে তাকিয়েই ঝপ করে চোখ বোজালেন রাজা কাক্কাবোক্কা। আসলে, তিনি যে শখ করে চোখ বোজালেন, তা যেন ভেবো না। তিনি মূর্ছা গেলেন। বাছুরের লাথি খেয়ে এক আছাড়েই রাজার কম্ম সারা। রাজার কাঁকাল ভাঙল, না, ঘাড় মটকাল সেটা তৎক্ষণাৎ বলবার মতো কবরেজ তখনও সেখানে উপস্থিত হননি। তিনি হয়তো তখনও পথে ছুটছেন। সেই ফাঁকে রাজাকে চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে আনা হলো গোশাল থেকে তাঁর শয়নকক্ষে।

মন্ত্রীর তখন দুরু-দুরু বুক। মুখখানা তাঁর রোদে পোড়া শুঁটকি মাছের মতো চিমসে গেছে। তাঁর মনের ভেতরটা যতবারই 'হে ভগবান, হা ভগবান' করে কেঁদে উঠছিল, ততবারই তাঁর চোখের ওপর রাজা কাক্কাবোক্কার সেই কটমট করা চাউনিটা ভেসে-ভেসে উঁকি মারছিল। রাজা যদি অক্কা পান, তবে, তিনি যে ভূত হয়ে মন্ত্রীমশায়ের ঘাড় মটকাবেন, এ-কথাটা একজন উদোও জানে। তেমনি তিনি যদি চক্ষু কপালে না-তোলেন, তবে, মন্ত্রীমশাইকে যে মন্ত্রীত্ব খুইয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে, এটাও কারো অজানা নয়। এ হেন অবস্থায় রাজা কাক্কাবোক্কার মরা না বাঁচা কোনটা উচিত, মন্ত্রীমশাই সেটা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না। তবে, বাছুরের লাথি খেয়ে একজন রাজা পটল তুলবেন, এটা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে রাজা যখন মানুষ। বাছুরের ঠ্যাং-এর ঠোক্করে রাজা নামের এই মানুষটি মরলে, পৃথিবীতে অন্য রাজারা মুখ দেখাবেন কেমন করে! তবে কি মনে করতে হবে, মানুষের ক্ষমতার চেয়ে বাছুরের লাথির তাকত বেশি?

যাকগে যাক, সে যাই হোক, আনন্দের কথা হচ্ছে রাজা কাক্কাবোক্কা বেঁচে গেছেন। বোঝা গেল, তাঁর আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। কেন না, রাজা আপনা-আপনিই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। আরও আনন্দের খবর হচ্ছে, তাঁর কোমর-কাঁকাল অটুট আছে। ভাঙা-ফাটার লক্ষণ নেই। এটাও একটা কম তাজ্জব ব্যাপার নয়। রাজা কাক্কাবোক্কার অতবড় দেহটা ধপাস করে পড়ল, অথচ ফটাস করে ফাটল না, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না। তবে রাজার জ্ঞান ফিরতে একটু সময় নিয়েছে। তা নিক। তিনি যে শেষ পর্যন্ত কথা কইতে পেরেছেন, এও কম কথা নয়!

জ্ঞান ফিরতে, প্রথমেই রাজা একটি ঢোঁক গিলে রানীর মুখের দিকে চোখ ফেরালেন। রানী আঁকপাঁকিয়ে রাজার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়তেই রাজা ফোঁস করে উঠলেন। মানে, নিঃশ্বাস ফেললেন। রানী চমকে উঠে 'আউ' করে ছিটকে গেলেন। রাজা তারপরই কথা কইলেন, 'এখন কত রাত?'

রানী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে রাত তো নয়, এখন দুপুর।'

রানীর উত্তর শুনে রাজা অবাক-চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর বললেন, 'ছিঃ, ছিঃ, আজ আমি একদম ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! বেলা দুপুর হয়ে গেল!'

রানী বললেন, 'না রাজামশাই, আপনি ঘুমিয়ে পড়েননি, আপনি গড়িয়ে পড়েছিলেন।'

রাজা কাক্কাবোক্কা উত্তর দিলেন, 'ওই হলো, যাহা ঘুমোন, তাহাই গড়ান।'

রানী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বুকে পিঠে ব্যথা হয়নি তো?'

রাজা কাক্কাবোক্কা গোঁফভর্তি নাকের নিচটা দুবার নাচিয়ে নিয়ে ঝপ করে উঠে বসলেন। বসেই তিনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। কেননা, তিনি দেখলেন, একঘর লোক তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে। দেখলেন, পাত্র-মিত্র, সভাসদ, সেনাপতি, সান্ত্রী-সেপাই সবাইকে। মন্ত্রীমশাই তো আছেনই। রাজা অস্ফুটস্বরে রানীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

রানী বললেন, 'আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

'কেন?'

রানী উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে আপনি এঁদের রাজা। আপনি দুর্ঘটনায় পড়লে, এঁরা তো দেখতে আসবেনই।

'দুর্ঘটনা!' রাজা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'কীসের দুর্ঘটনা?'

মন্ত্রীমশাই ঝট করে এগিয়ে এসে বলে বসলেন, 'আজ্ঞে আপনি বাছুরের লাথি খেয়ে—এরই মধ্যে ভুলে গেলেন!'

আচ্ছা, কথাটা আগ বাড়িয়ে তোমার বলার কী দরকার ছিল! আরে বাবা কথা হচ্ছে রানীর সঙ্গে রাজার, তোমায় কে ওস্তাদি করতে বলেছে! কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে তাকে খণ্ডাবে! বাছুরের লাথি খাওয়ার কথাটা হয়তো রাজা ভুলেই যেতেন। হয়তো ভুলে যেতেন মন্ত্রীমশায়ের সেই হা-হা করে হাসির কথাটাও। এখন আবার সেই মন্ত্রীই খুঁচিয়ে ঘা করে বসলেন। রাজার চোখ আবার ঝলসে উঠল। কটমটিয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। সেই মূর্তি দেখেই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া! পালা, পালা! ঘর-ভর্তি লোক চোখের পলকে হাওয়া! মন্ত্রী-সান্ত্রী, সিপাই-সেনা যে যেখানে ছিল, মারল ছুট।

তাদের যেই না ছুটতে দেখা, অমনি রাজার চিৎকার, 'পাকড়ো!' বলেই, ধপাস করে আবার বিছানায় গড়াগড়ি।

ঘরে তখন শুধু রানী একা। তিনি ব্যস্ত হলেন। রাজার কানের কাছে মুখ এনে আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, আপনার কি আবার মূর্ছা, মূর্ছা লাগছে?'

'না-আ-আ!' চিল চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা, 'মন্ত্রীকে পাকড়ে আনতে বলো!'

তা, হুকুম বলে হুকুম, রাজার হুকুম। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। অবশ্য মন্ত্রীকে পাকড়াতে হলো না। রাজার হুকুম মন্ত্রীর কানে সেঁদুতেই তিনি নিজেই উপস্থিত। সেই সময় রাজার সামনে উপস্থিত হওয়া তো নয়, যেন জলহস্তীর মুখের গর্তে মুণ্ডু পেতে দেওয়া। তা হলে কী! উপায় তো নেই। মন্ত্রীমশাই মাথা হেঁট করে রাজার সামনে দাঁড়ালেন। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন ভয়ে। তা এইরকম একজন বুড়ো মানুষকে অমন করে হাঁপাতে দেখে রানীর নিজেরই এমন লজ্জা-লজ্জা পাচ্ছিল যে, তিনি আর ঘরে থাকতে পারলেন না। পাছে মন্ত্রীমশাই তাঁর লজ্জাটা দেখে নিজে লজ্জা পান,

তাই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই রে, এইবারেই বিপদ! তবু ঘরে একটা মানুষ ছিল। যদিও রানী মেয়েমানুষ, তবুও মানুষ তো বটে। রাজা উল্টো-পাল্টা কিছু বললে, রানী কি আর মন্ত্রীর হয়ে দু-একটা কথা বলতেন না! নিশ্চয়ই বলতেন। কিন্তু এখন! হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

হঠাৎ রাজা কাক্কাবোক্কা মন্ত্রীকে খোঁচা মারলেন, 'কী হলো? বরের মতো মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আর একবার হা-হা করে হাসুন!'

মন্ত্রীমশাই কথা বলতে সাহস করলেন না।

রাজা কাক্কাবোক্কা এবার গাঁক করে উঠলেন, 'ভাবছেন, মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে থাকলে পার পেয়ে যাবেন! বাছুরে আমায় লাথি মেরেছে, এবার আমি আপনাকে–' পরের কথাটা বলতে গিয়েও তিনি বললেন না। কেননা, তাঁর মনে হলো রাজার মুখে এমন কথা শোভা পায় না। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা পাড়লেন, 'আমাকে বাছুরে লাথি মেরেছে, এ-কথাটা রানীর সামনে কে আপনাকে বলতে বলেছিল? জানেন না, রানীর সামনে এমত কথাবার্তা হলে রাজা-বাদশারা কতখানি অপমানিত বোধ করেন?'

মন্ত্রীমশাই এবার মাথা তুলে রাজার মুখের দিকে চাইলেন। চোখদুটি তাঁর পিটপিট করে উঠল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আজ্ঞে তিনি তো আমাদের সকলের মহারানী। আমাদের সকলের মা।'

'আপনাদের সকলের মা হতে পারেন, কিন্তু তিনি তো আর আমার মা নন!' রাজা কড়কে উঠলেন। 'তিনি মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের সামনে মুখ ফসকে যে কোনো কথা বলা উচিত নয়, এ-বুদ্ধিটা আপনার এখনও হলো না!'

'কিন্তু মহারাজ, আপনি যে বাছুরের লাথি খেয়েছেন, এ-কথাটা তো মিথ্যে নয়।'

'চোপ!' চিৎকার করে ধমকে উঠলেন রাজা কাক্কাবোক্কা। 'কে বলেছে আমি বাছুরের লাথি খেয়েছি! ডাহা মিথ্যে কথা।'

'আজ্ঞে রাজাসুদ্ধু সবাই জানে।' খুবই ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিলেন মন্ত্রী।

'সবাইটা জানল কেমন করে?' তেমনি তিরিক্ষি মেজাজে জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

মন্ত্রী বললেন, 'আজ্ঞে আপনি রাজা। এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা সে কি চাপা থাকে!'

রাজা হুংকার ছাড়লেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি, আমার নামে এইসব মিথ্যেকথা আপনিই রটিয়েছেন!'

রাজার হুংকার শুনে মন্ত্রীমশাই ভয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে ফেললেন, 'আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি মহারাজ।'

আগুনে যেন ঘি পড়ল। রাজা কাক্কাবোক্কা দপ করে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'বলেন কী, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি! এ্যাঁ! এর পরে বলবেন, বাছুরটা জন্মেই উঠে দাঁড়াল, এটা আমি বুঝতে পারিনি! উঠে দাঁড়িয়েই সে ছুটতে আরম্ভ করল, এই আজব ব্যাপারটাও আমি বুঝতে পারিনি! ছুটতে-ছুটতে সে লাফাতে লাগল, আমি তাকে ধরতে গেলুম, সে আমাকে লাথি মারল, আমি তাও বুঝতে পারিনি! ভাল!'

বরের মতো দাঁড়িয়ে কেন?

হঠাৎ মন্ত্রীমশাই রাজা কাক্কাবোক্কার কথার শেষে খুবই উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই তো মহারাজ, আপনি নিজেই তো স্বীকার করছেন বাছুরটা আপনাকে লাথি মেরেছে।'

রাজা চটে লাল, 'আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়! আপনি আমাকে মিথ্যুক ঠাওরান! লাথি খাওয়া আর লাথি মারা এক হলো! আমি তো আপনাকে লাথি মারার কথা বলেছি। লাথি খাওয়ার কথা তো বলিনি। আপনিই তো লাথি খাওয়ার কথা বলছেন।'

রাজার কথা শুনে মন্ত্রীমশাই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেল। তিনি কী বলবেন, না-বলবেন ভেবে ওঠার আগেই রাজা কাক্কাবোক্কা বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আমি আপনার পেটে একখানি ঘুষো মারি। আপনার বিবেচনায় সেটি যদি খাওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই আপনার পেটও ভরবে!'

মন্ত্রীমশাই ঢোঁক গিললেন। বলে উঠলেন, 'আজ্ঞে, এ-ক্ষেত্রে ঘুষো খাওয়ার কথা ওঠে না।'

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কী খাওয়ার কথা ওঠে?'

মন্ত্রী বললেন, 'আজ্ঞে, লাথি খাওয়ার কথা।'

রাজা গাঁক করে উঠলেন, 'ঠিক আছে। তাহলে আপনাকে লাথিই–' বলতে গিয়ে আবার সামলে গেলেন রাজা কাক্কাবোক্কা। তিনি অজান্তে জিব কেটে ফেললেন।

কিন্তু সামলাতে পারলেন না মন্ত্রীমশাই। রাজাকে অমন করে জিব কাটতে দেখে, তাঁর ভয়-মাখানো মুখের ওপর ফিক করে এক টুকরো হাসি পিছলে পড়ল। ব্যস! উল্টা বুঝিলি রাম! রাজা রেগে টং। জিজ্ঞেস করলেন, 'ফিক করে হাসা হলো কেন?'

আর হাসি! মন্ত্রীর তখন বুকের ধুকধুকি ধকধক করতে শুরু করে দিয়েছে। ইস! বে-আক্কেলে হাসিটা কি হাসবার আর সময় পেল না! এখন কী উত্তর দেবেন তিনি!

তাঁকে আর উত্তর দিতে হলো না। রাজাই আবার কড়কে উঠলেন, 'ফিক করে হাসা হলো কেন?'

আর কথা না বলে উপায় নেই মন্ত্রীমশায়ের। তিনি অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'মহারাজ, মাপ করবেন। আমি হাসতে

চাইনি। হাসিটাই আমার সংগে শত্রুতা করে হেসে দিয়েছে!'

'বটে!' রাজা কাক্কাবোক্কা কড়কে উঠলেন। 'বেশ রসিকতা করতে শিখেছেন তো! হাসিটা আপনার সংগে শত্রুতা করে হাসিয়ে দিল! এ্যাঁ! এ কী ছেলেমানুষের হাসি যে, হাসি না পেলে হাসিটাই হাসিয়ে দেবে! আপনি মশায় একটা ধুমসো লোক! আপনাকে হাসিটা হাসিয়ে দিল! এ আমায় বিশ্বাস করতে হবে! আমাকে আপনি বোকা ঠাওরেছেন! ভেবেছেন এই বলে পার পেয়ে যাবেন! আমি বুঝতে পেরেছি, এর পেছনে আপনাদের গভীর ষড়যন্ত্র আছে। আমি এক এক করে সক্কলকে দেখে নেব।'

মন্ত্রীমশায়ের গলা শুকিয়ে গেল ভয়ে। তিনি খকখক করে কেশে উঠে বললেন, 'বিশ্বাস করুন মহারাজ, আমি কোনো ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই।'

রাজা কাক্কাবোক্কা চোখ টেরিয়ে দেখে নিলেন মন্ত্রীমশাইকে। তারপর সন্দেহে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই! তবে বাছুরটা আমায় লাথি মারল কেন?'

'আজ্ঞে, আপনি তাকে ধরতে গেলেন বলেই তো সে আপনাকে মারল।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা এবার ভয়ংকর চটিতং। তিনি হাঁকাড় দিলেন, 'নিজেরা দোষ করে এখন দোষটা আমার ঘাড়ে চালান করে দিচ্ছেন। বাঃ! খুব কায়দা শিখেছেন তো! আমি যদি বলি বাছুরটাকে আপনারা আমার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে আমাকে হত্যা করার ফন্দি এঁটেছিলেন!'

মন্ত্রীমশাই আর থাকতে পারলেন না। সটান ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রাজামশাই গো, এমন কথা কেন বললেন গো! আমি আপনার গোঁফের দিব্যি করে বলছি, এমন ফন্দি আমি জীবনে করিনি!'

'তবে বাছুরটা লাফায় কেন? আপনাদের উসকানি না থাকলে ব্যাটা জন্মেই পা ছোঁড়ে! আমায় লাথি মারে!'

মন্ত্রীমশাই তেমনি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাস করুন মহারাজ, বাছুরের লাফালাফিতে আমার কোনো উসকানিও নেই, ফুসফাসানিও নেই। আমি নির্দোষ! এ-ব্যাপারে আমার কোনোই হাত নেই!'

রাজা কাক্কাবোক্কা এবার ঠেস দিয়ে কথা বললেন, 'এই তো পথে আসুন। আপনি নির্দোষ! এ্যাঁ? আপনার কোনো হাত নেই! আপনি তাহলে নিশ্চয়ই জানেন কার হাত আছে?'

কী ফ্যাসাদ দ্যাখো দিকিনি! বুড়ো মন্ত্রীকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়লেন। আচ্ছা, মন্ত্রীমশায়ের নিজের হাত নেই বলার মানে কী আর কার হাত আছে সেটা জানা! আশ্চর্য যুক্তি!

'কী হলো!' হঠাৎ রাজা কাক্কাবোক্কা গর্জে উঠলেন, 'কথা বলছেন না কেন?'

এরকমভাবে অন্যায় বকাবকি করলে মানুষের মেজাজ কি ঠিক থাকে! কিন্তু মন্ত্রীমশাই একটুও রাগ করলেন না। করলেও সেটা মনের মধ্যে চেপে রাখলেন। তারপর খুবই ইনিয়ে-বিনিয়ে বললেন, 'এর পেছনে ভগবানের ছাড়া আর কার হাত থাকতে পারে বলুন!'

'ভগবানের?' রাজার কপালের চামড়া কোঁচকাল।

'আজ্ঞে।' উত্তর দিলেন মন্ত্রী।

'তার আসকারায় বাছুর আমাকে লাথি মেরেছে?'

'আজ্ঞে।'

'ভগবানের হাতের এত জোর?'

'আজ্ঞে।'

'তার হাতটা আমার চাই। যেমন করে পারেন সেই হাত ভেঙে আনার ব্যবস্থা করুন!'

'আজ্ঞে, হুজুর!' চমকে উঠলেন মন্ত্রী।

'কোনো কথা নয়!' ধমক দিলেন রাজা। 'কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না আমি। যার হাতের জোরে আমি লাথি খাই, তার হাত আমার চাই-ই চাই!'

মন্ত্রীমশাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। আরে বাবা, কী বলতে চেয়েছিলেন তিনি, সে তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। ভগবানের হাত কোথায় আছে, সে ভগবানের দেখা না-পেলে কে ভেঙে আনবে! আরে বাবা, বাঘা-বাঘা মানুষ তার কোনোদিন দেখা পেল না এখনও পর্যন্ত তো এই বুড়ো মন্ত্রী! কী হ্যাগা বলো দিকি! আর, এ এমন একগুঁয়ে রাজা, একবার যেটি মাথায় ঢুকবে, তার হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ান নেই। সত্যি, খুবই ভেঙে পড়লেন মন্ত্রীমশাই।

ভাঙা মন নিয়ে তিনি রাজার ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এদিকেই আসছিলেন, তখন দেখা হয়ে গেল রাজবাড়ির ওস্তাগরের সংগে। ওস্তাগরেরও বয়েস হয়েছে। মন্ত্রীকে অমন মনমরা হয়ে হাঁটতে দেখে, ওস্তাগর থমকে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'মন্ত্রীমশাই, অমন শুকনো মুখে কোথায় চললেন?'

'আর বলো কেন ভাই, আমার ভীষণ বিপদ।'

'কীসের বিপদ?'

'রাজামশাই বলেছেন, তাঁর ভগবানের হাত চাই। আচ্ছা বলো তো, এমন অসম্ভব আবদার আমি কেমন করে মেটাই!'

মন্ত্রীমশায়ের কথা শুনে ওস্তাগর হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, 'ও, তাই বলুন! এই জন্যেই আপনার মন খারাপ। কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে, কী করে বলছ ভাই?'

ওস্তাগর উত্তর দিল, 'বলছি কেন জানেন, আপনার ওই ভগবানের হাত আমার কাছে আছে বলেই বলছি!'

মন্ত্রীমশাই ফ্যাকাশে মুখে একটু কষ্ট করে হেসে বললেন, 'তুমি কি আমার সংগে তামাশা করছ ভাই?'

'তামাশা কি সাচ্চা, সেটা আমি প্রমাণ করে দিলেই তো হলো!' হাসতে-হাসতেই উত্তর দিল ওস্তাগর।

'সাচ্চা, কী করে বলছ ভাই? ভগবানের হাত এ তো কথার কথা।' মন্ত্রীমশাই জবাব দিলেন।

'এখন রাজামশাই যদি এই কথার-কথাটাকেই সত্যি বলে মনে করেন, তখন তার জবাবটাও তো সেই কথার মতোই হওয়া চাই।' উত্তর দিল ওস্তাগর। তারপর বলল, 'এখন আপনি ঘরে যান। খানিক পরে আমি নিজে ভগবানের হাত আপনাকে দিয়ে আসব।'

ওস্তাগরের আশ্বাস পেয়ে মন্ত্রীমশাই নিজের ঘরে ফিরে গেলেন ঠিকই, কিন্তু মন তাঁর কিছুতেই ওস্তাগরের কথায় বিশ্বাস করতে পারছিল না। ভগবানের হাত, সে আবার কি!

সে-হাত ওস্তাগর কোথা থেকে পাবে!'

যেমন কথা ছিল, ঠিক সেই কথা মতোই খানিক পরে ওস্তাগর মন্ত্রীমশায়ের ঘরে হাজির। হাতে একটি বেতের তৈরি টুকরি। আঁটসাঁট করে মুখ ঢাকা। ঝলমলে রেশমি কাপড় দিয়ে চমৎকার করে বাঁধা। মন্ত্রীমশাই তো উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেই ছিলেন। ওস্তাগর ঘরে ঢুকতেই মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত হয়ে তাকে কাছে ডেকে নিলেন। বসল ওস্তাগর। মন্ত্রী তার হাতের টুকরিটার দিকে কেমন যেন হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন। অবশ্য মন্ত্রীমশাইকে কিছু বলতে হলো না। ওস্তাগরই মন্ত্রীমশাইয়ের মুখের চেহারা দেখে নিজেই বলল, 'ভাবছেন বোধহয়, আমার হাতে এটা কী?' তারপরে নিজেই হাসতে-হাসতে বলল, 'এর ভেতরই ভগবানের হাত আছে।'

ছ্যাঁত করে উঠল মন্ত্রীমশায়ের বুকের ভেতরটা। অবাক হয়ে, সেই রেশমি কাপড়-বাঁধা টুকরিটা দেখতে দেখতে নিজেই ভাবতে লাগলেন, 'কী বলে লোকটা!'

ওস্তাগর এমনই সময় বলে উঠল, 'আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি যেমনটি যেমনটি বলব, ঠিক তেমনটি আপনাকে অক্ষরে অক্ষরে করতে হবে। আপনি খুব সাবধানে এই টুকরিটি রাজামশায়ের কাছে নিয়ে যান। তাঁকে বলবেন, এই টুকরির মধ্যেই আছে ভগবানের হাত। বলবেন, আজও নয়, কালও নয়, পরশুদিন সূর্য ওঠার ঠিক আগে, এই টুকরির বাঁধন খুলতে হবে। তার আগেও নয়, পরেও নয়। তাহলেই কিন্তু সব গুবলেট হয়ে যাবে। আর তাঁকে সাবধান করে দেবেন, তিনি ছাড়া ভগবানের হাতের এই খবরটি অন্য কেউ যেন না জানতে পারে। টুকরিটি কেউ দেখতে না পায়। এমন কী রানীও।'

মন্ত্রীমশাই কেমন যেন একটা সন্দেহ-মেশানো গলায় উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা, তুমি যা বলছ তাই করব।'

মিথ্যে বলব না, সন্দেহ হলেও মন্ত্রীমশাই টুকরিটি রাজার কাছে তক্ষুণি-তক্ষুণি নিয়ে গেলেন। ওস্তাগর যেমন যেমন শিখিয়ে পড়িয়ে টুকরিটি রাজাকে দিতে বলেছিল, সেগুলি সব ঠিক-ঠিক তিনি বলেওছিলেন। কিন্তু এ এক আশ্চর্য বোকা রাজা! মন্ত্রীমশায়ের হাত থেকে টুকরিটি পেয়ে তিনি সত্যিই ধরে নিলেন, এর মধ্যে ভগবানের হাত আছে। তিনি শুধু নাচতেই বাকি রাখলেন! প্রথমটা তিনি হেসেও ফেলেছিলেন খুব জোরে, খুশিতে। তারপর সামলে গেলেন মন্ত্রীমশায়ের চোখ-মটকানিতে।

না, রানী কেন, রাজবাড়ির একটি প্রাণীও জানতে পারল না, ভগবানের হাতের সেই টুকরির কথা। এমন জায়গায় রাজা কাক্কাবোক্কা লুকিয়ে রাখলেন, কার সাধ্যি টের পায়! কিন্তু তাহলে কী হবে, রাজা নিজেকে নিয়েই নিজে মুশকিলে পড়লেন। সারাদিন যেমন-তেমন। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই মনটা তাঁর এমন ছুঁকছুঁক করতে লাগল! বারবার মনে হচ্ছিল টুকরিটা খুলে এখনই তিনি ভগবানের হাতটা একবার দেখে নেন। না, বাবা, কাজ নেই। মিছিমিছি লোভ ভাল নয়। পরশুদিন তো আর খুব দূরে নয়। আজ রাতটা, তারপর কালকের রাত। তারপরেই কেল্লা ফতে। অবিশ্যি টুকরিটা একটু নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে। উঁহু, একদম নয়। হুট করে কখন যে রানী ঘরে ঢুকে পড়বে কেউ জানে না। তার চেয়ে ধৈর্য ধরাই ভাল।

কিন্তু রাজার মন মানে কই। কোনোরকমে মনকে প্রবোধ দিয়ে তিনি রাতে শুয়ে পড়লেন! কিন্তু শুলে কী হবে, কখনও তিনি উঠে বসেন। কখনও তিনি বালিশ নিয়ে ধামসা-ধামসি করেন। কখনও হাই তোলেন। কখনও জল খান। রাজামশায়ের দোষ নেই। তোমার আমার ঘরেও যদি এমনি করে ভগবানের হাত লুকোনো থাকত, আমাদেরও এই দুর্ভোগে পড়তে হতো। চোখ বুজত না ঘুমে। মন বসত না কাজে। আমাদেরও নাস্তানাবুদ হতে হতো।

সত্যি চোখে সেদিন রাজা কাক্কাবোক্কার ঘুম এল না। হঠাৎ একটি পাখি ডেকে উঠল বাইরের বাগানে। ব্যস! অনিদ্রায় রাত কেটে গেল রাজা কাক্কাবোক্কার। মন তাঁর ওই ভগবানের হাতের টুকরিটির জন্যে এমনই উচাটন হয়ে উঠল যে, তিনি কিছুতেই আর থাকতে পারছেন না। এ খুব অন্যায়। এমন করে তিন দিনের সময় নেওয়া খুবই অনুচিত! একটা রাত তাঁর ঘুমই হলো না। আবার আজকের রাতেও তো রাজার চোখে ঘুম না আসতে পারে। ঘুম না আসা মানে, আবার সেই ছটফটানি। আচ্ছা, আজকের ভোরের সঙ্গে কালকের ভোরের তফাতটা কোথায়! আজকের ভোর যা কালকের ভোরও তা। আজকে যেমনভাবে আকাশ রাঙিয়ে সূর্য উঠবে, কালও তো তেমন করেই সূর্য উঠবে। তবে শুধুমুধু শরীরকে কষ্ট দেওয়া কেন? রাজা কাক্কাবোক্কা এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বিছানা ছেড়ে বাগানের অলিন্দের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সূর্য এখনও ওঠেনি। আকাশ লাল হচ্ছে। পাখির কিচির-মিচির শুরু হয়ে গেছে। গোশালে গরুর ডাকাডাকি কানে আসছে। হ্যাঁ, গরুর ডাক শুনেই রাজার মনে পড়ে গেছে সূর্য উঠে পড়বে। রাজা কাক্কাবোক্কা তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি দেরাজের পেছন থেকে লুকোনো রেশমি-বাঁধা টুকরিটা বার করে আনলেন। ঝটপট খুলে ফেললেন রেশমি কাপড়ের আস্তরণ। চটপট করে টুকরির ঢাকাটা খুলতেই হঠাৎ রাজার শয়নকক্ষের দরজা ঠেলে রানী ঢুকে পড়লেন। রাজা থতমত খেয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি টুকরিটাকে সরিয়ে ফেলে, তিনি নিজেও দেরাজের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

রাজা যে রানীর ভয়ে লুকিয়ে পড়বেন, এ-কথা আর কে ভাবে! রানী তাই বিছানায় রাজাকে না-দেখে নরম গলায় ডাকছিলেন, 'মহারাজ!'

মহারাজের সাড়া নেই।

আবার ডাকলেন, 'মহারাজ!' মহারাজের তবু সাড়া নেই।

মহারানীর কেমন যেন আশ্চর্য লাগল। এই ভোরে রাজামশাই কোথায় গেলেন! তিনি আবার ডাকলেন। এবারও সাড়া পেলেন না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাজার শয়নকক্ষের প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ ঘরে নেই, কোথায় গেছেন দেখেছ?'

'আজ্ঞে না তো। তিনি তো ঘর থেকে বেরোননি।' উত্তর দিল প্রহরী।

'তিনি তো ঘরে নেই।' রানী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

প্রহরী ভড়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক দেখেছেন?'

দুশ্চিন্তায় অস্থির রানী উত্তর দিলেন, 'দেখেছি, ডেকেছি।

দেখাও পাইনি, সাড়াও দেননি।'

প্রহরী রানীর কথা শুনে ঘরে ঢুকল। 'মহারাজ, মহারাজ' বলে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। কিন্তু কে সাড়া দেবে! যিনি সাড়া দেবেন, তিনি তখন দেরাজের পেছনে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছেন। হঠাৎ প্রহরী থমকে দাঁড়াল। তার নজরে পড়ে গেল, সেই টুকরিটার দিকে। দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'রানীমা, এটা কী?'

রানীমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। দেখলেন, একটা বেতের টুকরি। খালি। দেখলেন, খানিকটা রেশমি কাপড়। অবাক হয়ে বললেন, 'তাই তো!'

ঠিক এই সময়ে রাজা কাৎকাবোৎকা দেরাজের আড়াল থেকে উঁকি মারলেন। তাঁর বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। তিনি না পারলেন বেরোতে, না পারলেন চেঁচাতে! তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন, 'টুকরিটা খালি কেন?'

এদিকে হৈহৈ কান্ড। সবার মুখে এক কথা, রাজামশাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মন্ত্রীমশায়ের কানে এমন একটা গুরুতর কথা পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। কথা শুনে তাঁর তো বুক শুকিয়ে কাঠ। কীরে বাবা, ভগবানের হাত নিয়ে শেষে কিছু একটা ভয়ংকর বিপদ ঘটে গেল নাকি! তিনিও ছুটলেন। একেবারে রাজার শয়নকক্ষে। ঘর ফাঁকা, এমন কী রানী পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অন্য ঘরে খোঁজ চালাচ্ছেন। তিনি শয়নকক্ষে ঢুকে যেই 'মহারাজ' বলে ডাক ছেড়েছেন, মহারাজ দেরাজের আড়াল থেকে দেখতে পেয়েছেন। দেখতে পেয়ে রেগে আগুন! মন্ত্রীমশাই ঘরের এদিক-সেদিক খুঁজতে-খুঁজতে পালংকের নিচে যেই মাথা গলিয়েছেন, ব্যস! অমনি আর এক কান্ড! দেরাজের পেছন থেকে রাজা কাৎকাবোৎকা ঝপ করে বেরিয়ে এসে, খপ করে মন্ত্রীর গলাটা খামচে ধরেছেন। মন্ত্রী 'ওরে বাপরে' বলে ভয়ে আঁতকে উঠতেই, রাজা চেপে ধরেছেন তাঁর মুখখানা। চেপে ধরেই রাজা চাপাস্বরে ধমক দিলেন, 'চুপ!'

মন্ত্রী চুপ করলেন না। ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন, 'ছেড়ে দিন মহারাজ! আমার ঘাড়ে লাগছে!'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলে উঠলেন, 'আমাকে বিপদে ফেলার সময় মনে ছিল না! আমার সঙ্গে টোৎকা-ফোৎকা খেলা!' বলে মন্ত্রীর ঘাড়ে মারলেন এক ঝটকা। মন্ত্রী হুমড়ি খেয়ে পালংকের নিচে গড়াগড়ি খেলেন। খেয়েই চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর চিৎকার শুনে রাজা কাৎকাবোৎকা আবার কড়কে উঠলেন, 'চেঁচানো হচ্ছে!'

মন্ত্রীমশাই তবু থামলেন না। তিনি চেঁচাতেই লাগলেন, 'ওরে বাবারে!'

রাজা মন্ত্রীমশায়ের চিৎকার থামাতে তাঁর বুকের ওপর চেপে বসলেন। মন্ত্রীর তো দফা শেষ। তিনি একে বুড়ো, তার ওপর একগাল দাড়ি। বুড়োর দম আটকে আসছে, দাড়িতেও টান লাগছে। তিনি আর না-পারছেন চেঁচাতে না-পারছেন ছাড়াতে। শেষে যখন মনে হলো দম ফেটে তিনি বুঝি মরে যান, তখন মারলেন এক ঠেলা। মন্ত্রীর বুক থেকে রাজা ছিটকে ধপাস! তারপর লেগে গেল ধস্তাধস্তি। পালংকের নিচে সে এক ধুন্ধুমার কান্ড। প্রথমটা হচ্ছিল চাপা গলায় তড়পানি। তারপর কাঁপা গলায় কড়কানি। শেষে হুহুংকার, আর্তনাদ। রাজা আর মন্ত্রীতে সে কী লড়াই! দুজনেই বেপরোয়া! লড়তে লড়তে দুজনেই এমন বেঁহুশ হয়ে গেলেন, ঘরে যে কখন রানীমা এসেছেন, কারো খেয়াল হয়নি! প্রথমটা রানীমা তাঁদের দেখতে পাননি। শুধু তাঁদের তড়পানি শুনতে পাচ্ছিলেন। রানীমা এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে যখন পালংকের নিচে উঁকি মেরেছেন, তখন তো তিনি থ! দুটো ধুমসো লোকের এ কী কান্ড! দেখে তাঁর চক্ষু ছানাবড়া! তিনি কী করবেন, কী বলবেন ভেবে না পেয়ে মারলেন এক ধমক, 'কী হচ্ছে আপনাদের?'

রানীর এক ধমকেই কাজ। দুজনেই থতমত খেয়ে থমকে গেছেন। দুজনেই চোখ ঘুরিয়ে রানীকে দেখে, এ ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছেন। পালংকের নিচে মাথা ঝুলিয়ে পিটপিট করে দেখতে লেগেছেন। ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা! দুজনেই লজ্জায় মরে যান আর কী! যতই হোক, কথাটা তো বলার মতো নয়। একটা পালংকের নিচে রাজা আর মন্ত্রী মারামারি করছেন, আর রানী তাই দেখে তাঁদের ধমক দিয়ে থামাচ্ছেন, এ-কথা বলতেও লজ্জা, শুনতেও লজ্জা। সুতরাং দুজনেরই মাথা হেঁট। হেঁট মাথায় তখন তাঁরা হয়তো দুজনেই ভাবছিলেন, এরই নাম বোধহয় ভগবানের হাত! ভগবানের হাত আছে বলেই লড়াইটা লাগল, লড়াইটা থামল। সে-হাত দেখা যায় না।

ছবি: অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

ভুবনডাঙ্গার পুজো

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

এক জোড়া ফড়িংয়ের ঢুলুঢুলু চোখ
নাচছে নাচছে শুধু নাচছে।
আয় বাবা রণধীর, গান গাই আরামে
হাম্বা হাম্বা গরু ডাকছে॥

পুজো পুজো এই ভোরে ফুলকপি চোখে পড়ে
বাঁধের আড়াল জুড়ে শাদা মাছ।
কৈকেয়ী গান গায়, দিদিভাই ছুটে আয়
দেহলীতে জেগে রয় গুপীচাঁদ॥

উত্তরায়ণ জুড়ে শিশুদের ফুলঝুরি
চারিদিকে হৈহৈ হল্লা।
মাটির বাড়িতে নাচে চন্দনা, অর্পিতা
ভুবনডাঙ্গার মন চঞ্চলা॥

ছবি: সুফি

রূপকুমারীর ছেলেমেয়ে

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ অঞ্চল ছিল গ্রামের মতো, কিন্তু এটা এখন কলকাতার অংশ হয়েছে। খুব বড়ো বাজার হয়েছে। বাজারের ওপরে ফ্ল্যাট। সেখানে একদিকে ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিস প্রভৃতি, অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন ফ্ল্যাটে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বাস। রাস্তাঘাট হয়েছে অনেক, সবই পিচ ঢালা, তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে বাস, মিনি-বাস, ট্যাক্সি, অটোরিকশা, স্কুটার। এছাড়া সাইকেল, সাইকেল-রিকশা আর অন্য সব গাড়ি। এক কথায়, জায়গাটা সবসময় জমজমাট, শুধু রাত যখন একটু বেশি হয়, তখন দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, বাজারের দরজায় দরজায় তালা পড়ে, জায়গাটা নিশুতি হয়ে যায়। তখন দেখা যায় কোনো কোনো ফুটপাথ ঘেঁষে ভিখারীর দল এসে শুয়ে পড়েছে। তাদের জিনিসপত্তরগুলো দিনের বেলা তেমন চোখে পড়ে না। কোথায় কোথায় যে সেগুলো গুটিয়ে রেখে ওরা যে যার ধান্দায় বেরিয়ে পড়ে, তার হদিস পাওয়া যায় না।

ভিখারী ছাড়া আর যাদের চোখে পড়ে তারা হচ্ছে কুকুর। দিনমানে তারা এদিক-ওদিক কোথায় ঘুরঘুর করে কে জানে, রাত্রে তাদের দেখা যায়। রাস্তায় গাড়িটাড়ি যাচ্ছে না দেখে তারা রাস্তার ওপরই জড়ো হয় বেশি। সবকটাই হলদে রঙের গাঁট্টাগোট্টা চেহারার কুকুর, তাদের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইরের কুকুর এসে পড়ায় সবকটা একসঙ্গে ঘেউঘেউ করতে করতে তার দিকে তেড়ে গেল। খুব রোগা একটা কুকুর, কালো আর সাদায় মেশানো, সারা গায়ে দগদগে ঘা, যাকে বলে হাড়জিরজিরে চেহারা। ওদের মধ্যে পড়ে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল, লেজটা পেটের দিকে গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে ঘুরপাক খেতে লাগলো। কুকুররা বেগতিক দেখলে এমনিভাবেই বুঝি হার মানে। কুকুরদের যেটা সর্দার, সেটা ওর দিকে তেড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ও হার মানতেই সে আর কামড়াকামড়ি করল না বরং ওকে আড়াল করে অন্য কুকুরগুলোকে 'গরর্-গরর্' আওয়াজ তুলে যেন বলে উঠলো, এই খবরদার, ও বশ মেনেছে, সেজন্য ওর সঙ্গে আর ঝগড়াঝাঁটি করা চলবে না। এত তাড়াতাড়ি সন্ধি করার অন্য কুকুরদের আপত্তি ছিল, কিন্তু সর্দার রুখে দাঁড়ালো দেখে তারা আর এগোতে সাহস পেলো না, সামান্য একটু আওয়াজ তুলে তারা এদিক-ওদিক সরে গেল।

কিন্তু পরদিন দোকানদাররা ঐ ঘেয়ো কুকুরটাকে দেখে দূর-দূর করে তাড়াতে লাগলো। মাংসের দোকানের দিকে যায়, তো তারা তাড়ায়। মাছের দোকানের দিকে যায়, তো তারা তাড়ায়। বেচারা করবে কী? পেটে কিছু না দিলে তারই বা চলবে কী করে? সে অগত্যা কী আর করবে, ডাস্টবিনগুলোর দিকে ঘুরঘুর করতে লাগলো। হয়তো কিছু পেলো, দেখা গেল ও অন্য কুকুরদের সঙ্গে বাজারে বা বাজারের আনাচে-কানাচেই রয়ে গেল। দোকানদাররা তাকে চিনে ফেললো। তারা ওর নাম কেউ দিলো 'ঘিয়ে ভাজা', কেউ দিলো আরও সরেস নাম, 'জলে সেদ্ধ'।

দিনের পরে দিন যায়, দোকানদারদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে সে যে কী করে বেঁচে আছে কে জানে। ঐ যে ভিখারীর দল বিকেল হতেই দুটি একটি করে জুটতে থাকে, দেওয়াল বা দেওয়ালের কোনো কোণ ঘেঁষে তারা ইঁট পেতে উনুন ধরায়, চাল-টাল সেদ্ধ করে, হয়তো তারাই যা-হোক কিছু ওকে দেয়, কারণ দেখা যায়, ওরা এসে পড়লেই জলে সেদ্ধ এক পা এক পা করে তাদের কাছে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে।

ও নিজে যেমন জলে সেদ্ধ, ঠিক ঐরকম হাড়জিরজিরে চেহারার একটা ভিখারিনীকে দেখা যায়, সে যেন ধুঁকতে ধুঁকতে ইঁট পেতে উনুন করে তাতে কাঠকুটো ঢুকিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা মাটির হাঁড়ি বসিয়ে তাতে জল ঢেলে কিছু চাল, ডাল আর দুটো একটা আলু-পটল তাতে ফেলে দিয়ে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে।

জলে সেন্ধ তাকে বোধহয় চিনে রেখেছে। সে ওকে দেখেই আস্তে আস্তে এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর মনের ভাব লক্ষ্য করে যখন বুঝল ওর দিক থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই, তখন যতটা সম্ভব ওর কাছাকাছি হয়ে ফুটপাথ ঘেঁষে রাস্তার ওপর সামনের দুই পা এগিয়ে দিয়ে বসে পড়ে অল্প অল্প লেজটা নাড়াতে লাগলো। ভিখারী মেয়েমানুষটার শরীর যে খারাপ তা ওর মুখ দেখে বোঝা যায়। মাঝেমাঝেই খুকখুক করে কাশছে আর সারাগায়ে ছেঁড়া শাড়িটা ঢেকেঢুকে রাখবার চেষ্টা করছে। চোখের নিচে কালি, চুল লালচে আর জটপাকানো, সারা শরীর একটু পরে পরেই কেঁপে উঠছে থরথর করে। তার কাছে আর একটা থুত্থুরে বুড়ি এসে জায়গা নিয়েছিল, সে-ও বোধহয় ঐরকম ইটের উনুনে কিছু একটা চড়িয়েছে। একটা ছেঁড়া হাতপাখা কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে প্রাণপণে উনুনে হাওয়া করছে। হাওয়া করতে করতেই সে ঐ ভিখারী মেয়েটার দিকে তাকালো, বললে, কী লো বউ, অমনধারা কাঁপছিস কেন? আবার কি হাড় কাঁপিয়ে জ্বরটর এলো নাকি?

মেয়েটা সত্যিই ধুঁকছিল, বললে, ও আর আসবে কি দিদি? ও তো এসে বসেই আছে, তবে আজ বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি।

বুড়ি বললে, তা তুই সরে আয় না, আমি তোরটা করে দিচ্ছি।

মেয়েটা বললে, না দিদি, ও আমি বসে বসে ঠিক করে নেবো। তুমি ভেবো না।

বুড়ির তখন চোখ পড়লো জলে সেন্ধর ওপর। বললে, ও মা! ঐ ঘেয়ো কুকুরটা আবার এসে জুটেছে বুঝি? ঢিল মার ঢিল মার!

মেয়েটি বললে, না দিদি ওকে তাড়িয়ো না। ওরও আমার মতো অবস্থা। সবাই দূর দূর করে। আমার ভাতটা হয়ে যাক, ওর থেকে ওকে কিছুটা দেবো, আহা! সারাদিন হয়তো কিছু জোটেনি বেচারীর। দুবলা কুকুর সেয়ানা কুকুরদের মতো কেড়ে-বিগড়ে খেতে পারে না তো, তাই ভিখিরির কাছে ভিক্ষের হাত পেতে এসে বসে আছে। দেখলেও মায়া হয়।

ভিখারী মেয়েটির জ্বরই হোক আর কাশিই হোক, সকাল হলেই বেরিয়ে যায়। কোথায় কোথায় যে ঘুরে ঘুরে তারা ভিক্ষা করে, তার খোঁজ কেউ রাখে না। কিন্তু মেয়েটার মতো জলে সেন্ধটা বাইরে দূরে ভয়ে যেতে পারে না যদি বে-পাড়ার কুকুররা তাকে মেরে দেয়? এ-পাড়ার কুকুরদের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে, ওদের খাবারে সে ভাগ না বসালে ওকে তারা কিছু বলবে না। তাই দিনে ওর সম্বল ডাস্টবিন, আর রাতের সম্বল ঐ ভিখারী মেয়েটা। সে যা পায়, যেটুকু পায়, তার থেকে কিছু সে জলে-সেন্ধকে দেবেই। বাজারের সবাই ওকে জলে সেন্ধ বলে ডাকে, কিন্তু মেয়েটি ওকে ও-নামে ডাকতে পারে না, সে মনে মনে রেখেছে ওর অদ্ভুত একটা নাম। সেই দূরের যে সিনেমা-ঘরটার কাছে সে প্রায়ই ভিক্ষা করতে যায়, সেই সিনেমাতে একটা ছবি এসেছিল, বাইরে একটা মেয়ের মুখ বড়ো করে এঁকে দিয়েছিল। খুব সুন্দরী একটা মেয়ের মুখ। দেখে তার খুব ভালো লেগেছিল। সে তো আর সিনেমা দেখেনি, ওখানকার চিনেবাদামওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, ছবির নাম রূপকুমারী। ছবির রূপকুমারী কেমন ছিল কে জানে, সে এই ভীরু, দুর্বল, অসুস্থ কুকুরটার চোখে যে করুণ ভাব দেখতে পেতো, তাতে তার মায়া হতো। সেই মায়ার বশেই একদিন সে ওর নাম দিয়ে বসলো, রূপকুমারী। এ নাম কাউকে সে বলতো না, থুত্থুরে সেই বুড়িটাকেও না। কুকুরটা কাছে এসে যখন সামনের দু-পা ছড়িয়ে বসতো, তখন খুব নিচু গলায় ওর দিকে তাকিয়ে ডাকতো, রূপকুমারী।

বাজারের সবাই তাকে জলে সেন্ধ বলে যে ডাকে, তা সে প্রথম বুঝতে পারতো না, পরে সে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিল। সে একটা কুকুর মাত্র, মানুষের ভাষা সে বুঝবে কেমন করে? তবে ভাবগতিতে বুঝতো, লোকে তাকেই 'জলে সেন্ধ' বলে ডাকছে। আর তা যে ডাকছে, তা খুব আদর করে ডাকছে না। সেজন্য ও ডাকে সে মুখ ফিরিয়ে, যে ডাকছে, তাকে দেখতো, কিন্তু ভয়ে সে কাছে ঘেঁষতো না। কিন্তু এই মেয়েটি তাকে খেতে দেয়, তাকে যে নামে ডাকে, তার মানে সে বুঝতো না বটে, কিন্তু এটুকু সে বুঝতো, ঐ নামে মেয়েটি তাকেই ডাকছে। আর ডাকার সময় মেয়েটির গলার স্বর কোমল হয়ে উঠছে বলে সে বুঝতো এটা তার আদরের ডাক। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে লেজটা ঘনঘন নাড়তো, আর 'কুঁই-কুঁই' করে একটু শব্দ করে উঠতো।

এইভাবে দিন যায়। রোজ কিছু কিছু খেতে পায় বলে জলে সেন্ধর গায়ের ঘা সেরে গেল, আস্তে আস্তে তার শরীরও একটু পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। সে তুলনায় মেয়েটির কিন্তু শরীর সারালো না, দিন দিন সে আরও দুর্বল, আরও অক্ষম হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত সে আর ভিক্ষেয় বেরুতে পারতো না, দেওয়াল ঘেঁষে একটা চট গায়ে দিয়ে হু-হু করে কাঁপতো, বোধহয় জ্বরের ঘোরে। সারাদিন পরে ঐ বুড়িটাই ফিরে এসে তার ভাত রেঁধে দিতো। মেয়েটি সেই ভাতের অংশ তার রূপকুমারীকে না দিয়ে খেতো না।

বাজারের লোকেরা তখনো তাদের জলে সেন্ধকে দূরদূর করতো, কিন্তু একদিন তারা অবাক হয়ে দেখলো, তাদের 'জলে সেন্ধ'র চারটি ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। ডাস্টবিনের ধারে সে শুয়ে আছে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে। দোকানদারদের মায়া হলো। একজন একটা বড়ো চুবড়িতে চট পেতে বাচ্চাগুলোকে রাখলো, সেই সঙ্গে তাদের জলে সেন্ধও এসে সেই চুবড়িটার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো বাচ্চাগুলোকে নিয়ে। বাচ্চাগুলোর কোনোটা হলদে, কোনোটা সাদা-হলদের ছাপ মেশানো, দেখতে খুব সুন্দর। একটারও গায়ে কোনো কালো ছোপ নেই। বাস্তবিক, বাচ্চা হবার পর জলে সেন্ধর আদর বেড়ে গেল। দোকানদাররাই তাকে খাবার দিতো। আর দোকানদারদের কাছেই সে থাকতো আর খাবার পেতো বলে সেই ভিখারী মেয়েটার কাছে আর যেতো না।

দিন যায়। ভিখারী মেয়েটারও একদিন একটা বাচ্চা হলো। রাত্রি তখন গভীর। সেই বুড়িটা ছাড়া আর কেউ কাছে ছিল না। ওরা ফুটপাথের লোক, ওরা হাসপাতাল-টাতাল বুঝতো না। যা করবার ঐ বুড়িই করলো। এ-ও সুন্দর একটা বাচ্চা। রঙ লাল দেখাচ্ছে, হয়তো কালো হবে, কিন্তু নাক-চোখ-টোখ

হয়েছে দেখবার মতো। বুড়ি একবার ডেকে ওকে বললে, ওরে, তোর ছেলে হয়েছে, ফুটফুটে ছেলে। কিন্তু কে শুনবে তার কথা? সে তো জ্বরে ধুঁকছে! কিন্তু তবু সে লড়াই করছে প্রাণপণে বেঁচে থাকবার জন্য। সে বেঁচে না থাকলে তার ছেলেকে কে দেখবে? তাকে কে বাঁচাবে? যেটুকু দেখবার ঐ বুড়িই দেখে। বাজারে এতলোক, তারা পথ চলতে চলতে কখনো বা একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কাছে এসে দেখা, কিংবা মেয়েটির কিছু চাই কিনা, তা জিজ্ঞেস করা, এসব কেউ করল না। যারা কুকুর বাচ্চাদের ওপর মায়া করে তাদের এটা চুবড়িতে রেখেছিল যত্ন করে তারাও অদ্ভুত মানুষ, মানুষের বাচ্চাকে তারা দেখলো না। মেয়েটি একটা কোণের দেওয়াল ঘেঁষে তার চটের বিছানায় তার ছেলেকে নিয়ে শুয়ে থাকে আর জ্বরে কাতরায়। এই অবস্থায় একদিন তার চোখে পড়লো তার রূপকুমারী বেরিয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে তার ছোট ছোট চারটে বাচ্চা। সেগুলো সবে হাঁটতে শিখেছে, এখনো জোরে দৌড়তে গেলে টলে টলে পড়ে। মেয়েটির চোখে স্নেহ ঝরে পড়ে। আস্তে আস্তে সে ডাকে, রূপকুমারী!

রূপকুমারী ঠিক শুনতে পায়! সে দৌড়ে আসে। মুখে তার কুঁই কুঁই শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে চলছে তার লেজ নাড়া। তার পিছনে পিছনে বাচ্চাগুলো ছুটে এসেছে, কিন্তু তাদের মা তাদের আগলে রাখলো পাছে এদিকে এসে বাচ্চার গায়ে গিয়ে পড়ে, বা তার অনিষ্ট করে।

মেয়েটির ক্ষীণ কণ্ঠ। সে বললে, এখন কোথায় থাকিস? খেতেটেতে পাস তো?

রূপকুমারী আদরে গলে গিয়ে সেই আগের মতো সামনের দুটো পা এগিয়ে দিয়ে বসে পড়লো। মুখে আবার একটা আওয়াজ করলো, ঘনঘন লেজও নাড়াতে লাগলো।

মেয়েটি বললো, খেতেটেতে নিশ্চয়ই পাস, তোর চেহারা দেখেই বোঝা যায়। বাচ্চাগুলোর যত্ন করিস।

কুকুর কি এসব বোঝে? কিন্তু এটুকু অবশ্যই বোঝে যে মেয়েটি তাকে যে কথাগুলো বলছে তা স্নেহের সুরেই বলছে, ওতে কোনো ধমকটমক নেই।

সেটা বুঝে সে আরও একটু জোরে আওয়াজ করে উঠলো। না, ঘেউ ঘেউ নয়, বরং আলতো উচ্চারণে 'হোউ হোউ' মতন একটা আদুরে আওয়াজ।

কিন্তু কেউ কিছু বোঝবার আগেই একটা অঘটন ঘটলো, মেয়েটি মারা গেল। বুড়ি যত তাড়াতাড়ি পারে তার ধান্দা থেকে ফিরে আসতো। এদিন এসে দেখলো মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে। ও বউ, কেমন আছিস আজ?

কিন্তু বুড়ির ডাকে কেউ সাড়া দিলো না। বুড়ি চোখে ভালো দেখতে পায় না। কাছে এলে ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখলো একেবারে ঠান্ডা বরফ, নাক দিয়েও নিশ্বাস পড়ছে না। অথচ তার ছেলেটা নিশ্চিন্তে তার বুক ঘেঁষে শুয়ে আছে। বেচারা জানতেও পারলো না, তার মা কোথায় চলে গেছে।

বুড়ি তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো। মা-টা তো গেছে, এখন এটাকে নিয়ে সে করে কী? এটাকে তো বাঁচাতে হবে? চেয়েচিন্তে দুধ এনে সলতে পাকিয়ে সেই সলতে ভিজিয়ে ওর মুখে দিতে লাগলো। খিদের চোটে ঐ দুধ-ভিজানো সলতেই বাচ্চাটা চুকচুক করে খেতে লাগলো।

ততক্ষণে বুড়ির হাঁকাহাঁকিতে লোক জড়ো হয়েছে। তারা ভিড় করে এসে দেখতে লাগলো, কিন্তু কেউ এগিয়ে যে কিছু করবে সে লক্ষণ দেখা গেল না। বড়ো রাস্তাটার ওপারে যে ডাক্তারখানা! সেখানকার ডাক্তার আগে কোনো খোঁজ-খবর নেননি বা জানতেও পারেননি, এবার নিজে এসে পরীক্ষা টরিক্ষা করলেন, যেখানে ফোন করবার তা করলেন, করপোরেশন থেকে লোক এসে মেয়েটিকে নিয়ে গেল। বাচ্চাটা রইল বুড়ির কোলে।

এসব যখন হচ্ছিল, তখন সকালবেলা। ডাক্তারখানার দোতলায় যারা থাকে, তাদের মেয়েরা রাস্তার দিককার বারান্দায় এসে সব দেখতে লাগলো। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হলো, তখন সব ফরসা। ওখানে যে সকালে অমন কান্ড ঘটে গেছে, বিকেলে তার চিহ্নমাত্র নেই। দোকানপাট যেমন চলবার, তেমনি চলছে। অটোরিকশা থেকে সাইকেল-রিকশা, স্কুটার থেকে বাস, সবই যেমন বেগে ছুটে যায়, তেমনি ছুটতে লাগলো। শুধু কে যেন একজন বুড়িকে হেঁকে বলেছে, ভিখিরি মেয়েটার কী হয়েছিল?

জ্বর।

জ্বর—তা ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পারোনি?

বুড়ি অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকালো, বললো, আমরা ফুটপাথের মনিষ্যি, আমরা কবে ডাক্তার আর হাসপাতাল করেছি গো? আমরা ফুটপাথে জন্মাই, ফুটপাথে মরি। জানো না? আর তাছাড়া, ওর জ্বর হয়েছে, দিন তিন-চার-পাঁচ একটু কোঁ কোঁ করবে, তারপরে সেরে যাবে। হঠাৎ যে এভাবে চলে যাবে, তা কে জানবে? গুঁড়োটার জন্য তার একটু মায়া হলোনি গা?

যেন 'গুঁড়ো' বা বাচ্চাটার মা জেনেশুনে ইচ্ছে করেই মরে গেছে। বুড়ি বললে, বুঝলেনি? আমাকে জব্দ করবার জন্য। এখন আমি কি করি? আমার ধান্দায় আমি যাবো, না গুঁড়োটা দেখবো?

সেদিন বিকেলেই একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটলো। ডাক্তারখানার দোতলার বারান্দা থেকে এ বাড়ির একটি মেয়ে হঠাৎ দেখতে পেলো, চটের বিছানায় বাচ্চাটাকে ফেলে রেখে বুড়িটা কাছে পিঠে কোথাও গেছে, এমন সময় একটা কুকুর গুটি গুটি বাচ্চাটার দিকে এগোতে লাগল। বাচ্চাটা তখন ক্ষীণ গলায় 'ওঁয়া ওঁয়া' করে কাঁদছিল। কুকুটার পিছনে ছিল তার বাচ্চাগুলো। মেয়েটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব্যাপার দেখে আঁতকে উঠলো। কুকুরটা বাচ্চাটার কাছে এসে ওকে শুঁকছে! এক্ষুণি না ওকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে! কুকুরদের কি বিশ্বাস আছে? বিশেষ করে রাস্তার কুকুর? সে ওখান থেকেই 'হেই-হেই-যা' বলে চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু তার চিৎকার কি কেউ শুনতে পেলো? রাস্তা দিয়ে অটো যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, কে কার দিকে তাকায়, বা কে কার কথা শোনে?

কুকুরটা বাচ্চাটাকে শুঁকতে শুঁকতে খুব কাছে এগিয়ে এলো। বাচ্চাটা চিত হয়ে কাঁদছিল। বারান্দার মেয়েটি অবাক হয়ে দেখলো, কুকুরটা বাচ্চাকে কামড়ালো না, বরং তার খুদে

শরীরটার চারপাশে তার চারটি পা ছড়িয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়াল, আর বাচ্চাটার মুখে নরম নরম কিছু ঠেকতেই সে তার মায়ের বুক মনে করে মুখ লাগিয়ে চকচক করে খেতে লাগলো। এই অদ্ভুত কান্ড দেখে মেয়েটি তার মাকে, তার পিসীকে ডেকে আনলো, তারা বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে এ-দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল। ততক্ষণে ওপাশ থেকে সেই বুড়িটাও এসে গেছে। সে প্রথমটা বুঝতে পারেনি। সে একটা বাটিতে করে কার কাছ থেকে চেয়ে যেন একটু দুধ নিয়ে আসছিল, তাই কুকুর দেখে হটহট করে উঠলো। কুকুরটার বাচ্চাগুলো পিছনেই ছিল, তারা পর্যন্ত মায়ের কান্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। মায়ের শাসনে তারা এগিয়েও আসতে পারছে না! তারা আলতো সুরে কেউ বা কুঁই কুঁই, কেউ বা ঘেউ-ঘেউ করে উঠলো। বুড়ির তাড়াতেও কুকুরটা সরছে না দেখে বুড়ি একটা চড় উঁচিয়ে কাছে গেল, এইবার তার চোখে পড়লো ব্যাপারটা।

ওমা! আমি কোথা যাবো গো! এমন কান্ড কেউ কখনো দেখেছে নাকি গো! বলে বুড়ি চিৎকার জুড়ে দিলো। কিন্তু তার চিৎকার শুনে লোকজন জড়ো হতে না হতেই কুকুরটা তার কাজ শেষ করে পালিয়ে গেল। তার বাচ্চারা গেল তার পিছনে পিছনে।

এই দৃশ্য দেখতে যে সব দোকানদাররা ছুটে এসেছিল, তাদের মধ্যে একটি কাপড়ের দোকানের দোকানদার রাধারমণ ছিলেন অন্যতম। তিনি সবার আগে এসেছিলেন বলে ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছিলেন। তারা দু-তিনজন কুকুর-মায়ের এই কীর্তি দেখলেও অন্যরা দেখেনি। আর দেখেনি বলে বিশ্বাসও করেনি। তারা এসব শুনেটুনে বললে, গাঁজায় দম দেবার আর জায়গা পেলে না? এরকম কখনো হয় নাকি?

বেধে গেল তর্কাতর্কি। বইয়ের দোকানের মালিক সুভাষ তার মধ্যে একজন। দেশবিদেশের নানান বই সে বেচে, বই পড়েও বটে! সে বললে, কে বললে গাঁজা? কেন, রমুলাসের গল্প পড়োনি? নেকড়ে বাঘের দুধ খেয়ে সে শুধু বেঁচে থাকেনি, রীতিমতো মানুষ হয়ে উঠেছিল? কেন, টার্জন দি এপম্যান? এসব কি গুল, না, গাঁজা?

একজন তার্কিক বললে, বই পড়া আর চোখে দেখা অন্য জিনিস। হ্যাঁ, চোখে দেখাও, বিশ্বাস করতে রাজী আছি।

আর একজন বললে, রাজী যখন, তখন বাজী ধরো।

ততক্ষণে রাস্তার ওপারের সেই দোতলা বাড়ির মেয়েটাও ভিড় দেখে নেমে এসেছে। বারো ক্লাসের ছাত্রী, ভালো নাম যাই থাক, চেনাজানা যারা, তারা সবাই 'টুসি' বলে ডাকে। প্রায়ই সুভাষের দোকানে আসে বই, খাতাপত্র আর ডটপেনের 'রিফিল' কিনতে। সে বললে, সুভাষদা, বাজী ধরুন, জিতে যাবেন। আমি ওপরের বারান্দা থেকে সব দেখেছি, আমার মাও দেখেছে, পিসীও দেখেছে। সত্যিই ঐ কেলে কুকুরটা ওকে দুধ খাওয়াচ্ছিল।

বাচ্চাটা তখন বুড়ির কোলে। দুধ-টুধ খেয়ে এখন তার কান্না নেই, মাত্র চারদিনের বাচ্চা, তাই পেটে কিছু পড়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছে। কচি বাচ্চারা তাই করে। সব সময় ঘুমোয়, শুধু খিদে পেলেই 'কুঁই কুঁই' করে।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। 'বাজী'র দল তখনো লড়ে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে রাধারমণবাবুই প্রবীণ। তিনি এর ফয়সালা করলেন। বললেন, বাজী-টাজী রাখুন। এখন বাচ্চাটাকে নিয়ে কী করা যায় সেটা ভাবুন। আমাদের 'জলে সেদ্ধ' যখন ওকে একবার দুধ খাইয়েছে, তখন আরও খাওয়াবে। সেটা ওয়াচ করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়!

কী করে ওয়াচ করবো? কখন করবো?

রাধারমণ বললেন, সেটা একটা কথা বটে। ভিড় করে ওয়াচ করতে গেলে কুকুরটা ভয় পাবে। আপনারা ওয়াচ করবেন দূর থেকে, তাও এক এক করে, কখনো এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন না।

বেশ। তাহলে এই কথাই রইলো।

বলে, তারা একে একে সরে পড়তে লাগলো।

রাধারমণবাবু করলেন কী, বুড়িটাকে ডেকে তাঁদের দোকানের কাছকাছি একটা নিভৃত জায়গায় তাদের স্থান করে দিলেন। বাজারের দারোয়ানকে বলে দিলেন ওকে যেন সে না তাড়ায়। বাচ্চাটার মা মারা গেছে। এই বুড়িটাই এখন ওর ভরসা।

দারোয়ান প্রথমে রাজী হয়নি, পরে সবাই অনেক করে বলতে ও রাজী হলো।

এইভাবে বুড়ি আর বাচ্চাটাকে একটু স্থিত করে ওঁরা জলে সেদ্ধর সন্ধানে বেরোলেন। ডাস্টবিনের গা ঘেঁষে আগে থাকতো, এখন মাছের বাজারের কাছে যে অস্থায়ী ফলের দোকান আছে, তার বারান্দার এক কোণে বিশালকায় একটা চুবড়ি রাখা আছে, সেই চুবড়ির ভিতরে চট পাতা। এই চুবড়িতেই বাচ্চারা থাকে। আর বাচ্চাদের টানে মা-ও এসে ওদের কাছে থাকে। দেখা গেল, ভিতরের একটা গলি দিয়ে অনায়াসেই সেই বুড়ির আস্তানায় যাওয়া যায়। জলে সেদ্ধকে সন্ধানটা দিলেই হয়তো সে নিজেই রাস্তাটা চিনে নেবে। ফলের দোকানের লোকটিই জলে সেদ্ধকে ইদানীং রুটি-টুটি খেতে দিতো। তাই ওকে সে চিনে গিয়েছিল। সে-ই ওকে রুটির টুকরো খাইয়ে এবং হাতে অন্য টুকরো নিয়ে ঐ গলি দিয়ে যাতায়াত করে জলে সেদ্ধকে বুড়ির আস্তানা ভালো করে চিনিয়ে দিলো।

রাধারমণবাবুরা ওখানকার স্থানীয় লোক নন, দোকানদারদের অধিকাংশই তাই নন। কাপড়ের দোকানদারদের কেউই সকাল সাড়ে আটটার আগে আসেন না, বাড়ি ফেরেন রাত সাড়ে-আটটা কি নটায় দোকান বন্ধ করে। মাঝে একটা দেড়টা থেকে চারটে সাড়ে চারটে পর্যন্ত দোকান বন্ধ থাকে। অবশ্য পাল-পার্বণে, বা পুজোর সময়-টময় অন্যরকম। সেজন্য ওঁদের পক্ষে সবসময় কুকুরটাকে বা বুড়িটাকে লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। বুড়ি তার ধান্দা থেকে ফিরতো সন্ধ্যার সময়। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরতো। বাচ্চাটাকে সে সঙ্গে নিয়ে বেরুতো না। কী করে বেরুবে? তাকে কোলে করে হেঁটে হেঁটে ভিক্ষে করবে? তাহলে বাচ্চাটা খাবে কী? বাচ্চাটা দুধে ভিজানো সলতে আর পছন্দ করে না। দুধে একবার মুখ দিয়েই ফেলে দেয়, আর কাঁদতে আরম্ভ করে। আবার বুড়ি কাছে থাকলে কুকুরটা কিছুতেই কাছে আসবে না। কখনো-কখনো এ-ও দেখা যেতো, বুড়ি কাছে নেই, বাচ্চাটা

একলা শুয়ে আছে, জলে সেন্ধ এসে তার কাছে পাহারায় বসে আছে, তার নিজের বাচ্চারাও তাকে ঘিরে বসে আছে। অন্য কুকুররা শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসে বটে, কেন আসে কে জানে, জলে সেন্ধ তখন রাগে গরগর করে ওঠে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠে তাদের তাড়িয়ে দেয়। আর মাকে রাগতে দেখে ওর বাচ্চা চারটিই তখন অন্য কুকুরদের লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। আগে আগে বাচ্চাটার দিকে রাধারমণবাবুরা লক্ষ্য রাখতেন, কিন্তু পরে দেখলেন, বাচ্চাটার বিছানার কাছে জলে সেন্ধ নিজেই এসে জায়গা করে নিয়েছে। তার নিজের বাচ্চারাও আর চুবড়িতে ফিরে যায় না, মায়ের কাছেই থাকে। আর, এই যখন অবস্থা, তখন দেখা গেল বুড়িটাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার ধান্দায় গিয়ে সে আর ফেরেনি। সে সেখানেই আস্তানা করলো, না, মরে গেল, তা কেউ বলতে পারলো না। তাছাড়া, বুড়িটাকে নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না, তাদের যত কৌতূহল ঐ কুকুরটাকে নিয়ে। তখন কুকুরটাকে পুরোপুরি ওখানে অধিষ্ঠিত দেখে তারা নাম দিলো, 'জলে সেন্ধর ছেলেমেয়ে'। ওকে যে রূপকুমারী বলে ডাকতো সে তো বেঁচে নেই, সে থাকলে বলতো, 'রূপকুমারীর ছেলেমেয়ে'।

আর একজন ছুটেছুটে আসতো খোঁজখবর নিতে। সে হচ্ছে সেই ডাক্তারখানার ওপরতলার মেয়ে টুসি। বারো ক্লাস থেকে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ফাঁক পেলেই সে ছুটে ছুটে আসতো। বাচ্চাটা একটু বড়ো হয়েছে। তবু সে কুকুর-মায়ের দুধ খায়। উপুড় হতে পারে। হামা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। টুসি তাকে কোলে নিয়ে যে একটু আদর করবে, তার উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুর-মা ছুটে আসবে রাগে গরগর করতে করতে। তার ওপর তার বাচ্চাগুলো তো আছেই। মা যখন না থাকে, তখন তার বাচ্চাগুলো ওকে পাহারা দেয়।

কিন্তু এ-দৃশ্য দেখে আনন্দ করা টুসির সহ্য হলো না। তার বাবা হঠাৎ বদলি হলেন সুদূর বোম্বাইতে। অগত্যা টুসি ও তার মাকেও যেতে হলো বাবার সঙ্গে বোম্বাই। এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে সে বোম্বাইয়ের কলেজেই ভর্তি হলো। ওখানে গিয়ে সে জল সেন্ধ আর তার ছেলেমেয়েদের ভুলতে পারতো না, বন্ধুদের কাছে খুব গল্প করতো, আর তারা হাঁ করে শুনতো। চারপাশে এত মানুষ, তবু একটা অসহায় মানুষের বাচ্চাকে কেউ কোলে তুলে নিলো না, তাকে 'মানুষ' করতে লাগলো একটা 'কুকুর' এ বড়ো আশ্চর্যের কথা নয় কী?

কিন্তু বোম্বাইতে টুসির বাবার মন টিকছিল না। তিনি কর্তাদের ধরাধরি করে আবার কলকাতায় ফিরতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই চেষ্টা ফলবতী হতে হতে তিন বছর কেটে গেল। কলকাতায় তাঁদের নিজেদের বাড়ি, নিজেদের চেনা জায়গা, এখানে এসে সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। এখানে এসে টুসি ছুটলো বাজারের দিকে– জলে সেন্ধর ছেলেমেয়েকে দেখতে। কিন্তু কোথায় কে? তারা কেউ কোথাও নেই। সুভাষদার দোকান তখন বন্ধ ছিল, সে গেল রাধারমণবাবুর কাছে। এ-দোকান থেকে টুসিরা হরদম কাপড়-চোপড় কিনতো তাই ওকে রাধারমণবাবুরা চিনবেন না কেন? রাধারমণবাবুকে

বাচ্চাগুলো ওকে পাহারা দেয়।

সে কাকা বলে ডাকতো। জিজ্ঞাসা করলো, কাকা, সেই জলে সেন্ধর খবর কী? তার বাচ্চারা?

রাধারমণবাবু বললেন, জলে সেন্ধ মারা গেছে হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে। তার বাচ্চারা এখন রীতিমতো বড়ো। এই এধারে ওধারে ঘোরাঘুরি করে।

আর সেই ভিখিরিদের ছেলেটা?

রাধারমণবাবু বললেন, সে-ও এক তিন বছরের খোকা। আমরা একটা জাঙিয়া কিনে দিয়েছি, সেটাই সে পরে। কোনো জামা দিলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ও-ও এধারে-উধারে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দর দেখতে হয়েছে। গোলগাল চেহারা, রঙটা কালো হলে হবে কী! চোখদুটো দেখবার মতো, ভাসাভাসা টানাটানা চোখ। মাথার চুলও বেশ, কালো কালো নরম নরম চুল–বেশ কোঁকড়া-কোঁকড়া। বাজারের এমন কোনো দোকানদার নেই যে ওকে ভালোবাসে না। কিন্তু কেউ ওরা রাখতে পারে না। তুমি ওকে নিয়ে যাও, যত্ন করে খাওয়াও দাওয়াও, কিন্তু কিছুতেই কারও কাছে ও থাকবে না। ওর নাম দেওয়া হয়েছে 'গোপাল'। ওপরের ফ্ল্যাটে এক ঠাকুমা থাকেন, তিনি তো গোপাল বলতে অজ্ঞান। কাছে নিয়ে কতবার রেখেছেন। কিন্তু ও থাকেনি, ঠিক পালিয়ে এসেছে। ওকে নাড়ু খেতে দিয়েছেন, পায়েস খেতে দিয়েছেন, ও কিছু মুখে দেয়নি।

টুসি জিজ্ঞাসা করলো, এখন কী খায় ও? দুধ?

এখন দুধ কোথায় পাবে? ঠাকুমা গেলাসে করে দুধ দিয়েছেন, খায়নি। জোর করে খাওয়াতে গেছেন, থু-থু করে ফেলে দিয়েছে।

তাহলে ও কী খায়?

রাধারমণবাবু বললেন, কী খায় তা তুমি নিজের চোখেই

রুটি নিয়ে ছুটে পালাল।

দেখতে পাবে। সন্ধ্যাবেলায় আসতে পারবে?

হ্যাঁ আসবো।

সন্ধ্যাবেলায় এসে টুসি রাধারমণবাবুর দোকানে বসে রইল। একটু পরেই গোপাল এলো। কালো, গোলগাল চেহারা, নাক, চোখ, চুল সব সুন্দর। দেখলেই মায়া লাগে, ওকে কোলে নিতে ইচ্ছে করে। চুপ করে এক কোণে এসে দাঁড়ালো, খালি গা, কোমরে নীল রঙের একটা জাঙিয়া। নীরবেই হাত পাতলো, রাধারমণ ওর হাতে একটা রুটি দিলেন। সেটা নিয়ে চলে গেল।

রাধারমণবাবু ফিসফিস করে বললেন, পিছনে পিছনে যাও, দাঁড়োনা নিয়ে কী করে?

টুসি ওর পিছনে পিছনে গেল। একটু দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করতে লাগলো। সে ছুটে গিয়ে রাজাদের যে গোডাউনটা আছে রাস্তার ওপর, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো, দোকানদার দেখতে পেয়েই ছুটে ওর কাছে এলো। আট আনাটা নিয়ে ওকে বড়ো ঠোঙায় কিছু তরকারি আর গোটা ষোলো-সতেরো রুটি দিলো। সেই রুটি নিয়ে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে যে কোথায় ছুটে পালালো, তা আর দেখা গেল না।

টুসি ফিরে এলো রাধারমণবাবুর দোকানে। তার বিস্ময় এই যে, আট আনায় অতগুলি রুটি দোকানদার ওকে দেয় কী করে?

রাধারমণবাবু বললেন, আট আনাটা নিমিত্ত মাত্র। ওটা না দিলেও দোকানদার ওকে ঐ অতগুলো রুটিই দিতো। অমনিই দিতো কিন্তু ও যে পয়সা না দিয়ে কিছু নেবে না! এই যে আমার কাছ থেকে ও আট আনা নেয়, ওর বেশি কিছুতেই নেবে না। দিলেও ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

সবার কাছ থেকেই এরকম নেয় বুঝি?

রাধারমণবাবু বললেন, না গো মা, শুধু আমাকেই ও কৃপা করে, দয়া করে নেয়। ও নেয় বলেই আমার দোকানের এই বাড়বাড়ন্ত। ওই হোটেলটারও বাড়বাড়ন্ত ও রুটি নেয় বলে। দু-বেলা ঐ রুটিই বরাদ্দ। সকালবেলা পয়সা না নিয়েই দোকানদার রুটি দেয়। কিন্তু রাত্রে ওকে পয়সা নিতে হয়। না নিলে রুটি ছুঁড়ে দেবে, সারাদিন মুখ গোঁজ করে থাকবে, কিছু খাবে না। ও তো পয়সার হিসেব বোঝে না, ওর ধারণা ওই আধুলিটাই সব। আধুলি দিলেই দুবেলার রুটির দাম দেওয়া হয়ে গেল, এই ওর ধারণা।

অদ্ভুত তো!

রাধারমণবাবু বললেন, অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! যে কোনো দোকানদার ওকে আট আনা দিতে রাজী। কিন্তু আমার কাছ থেকে ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে নেবে না। কেন কে জানে! ঠাকুরের দয়া!

বলে, তিনি দোকানে-রাখা এক ঠাকুরের ফটোর উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

টুসি বললো, আচ্ছা কাকা, তারপরে ও কী করে? নিজে খায় তো?

রাধারমণবাবু বললেন, তোমাদের বাড়ির পিছন দিককার গলিতে ঢুকে যাও, গিয়ে দেখতে পাবে। ওখানেই ওর খাওয়া–ওখানেই ওর দাওয়া!

টুসি তাই করলো। ওদের বাড়ির পুব দিকে যে গলি ঢুকে গেছে, সেই গলিরও তস্য গলির মধ্যে একটা বাড়ির পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় চালা করা আছে। সেই চালার মধ্যে সপ বিছিয়ে–চট বিছিয়ে একটা ছোটখাটো আস্তানা করে দেওয়া হয়েছে। ও দূর থেকে উঁকি মেরে দেখল, গোপাল তার চার ভাইবোনের সঙ্গে রুটিগুলো ভাগ করে খাচ্ছে।

রাধারমণবাবুর কথা শুনে হাতে টর্চ নিয়ে রাত্রেও একবার টুসি গিয়ে ওদের আস্তানায় উঁকি দিয়েছিল। চার ভাইবোনদের মাঝখানে গোপাল আরাম করে শুয়ে আছে। মানুষের সন্তান হয়েও কেন যে সে মানুষদের থেকে এরকম মুখ ফিরিয়ে থাকে, কে জানে!

ছবি: ধ্রুব রায়

ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতের খোঁজে

অজেয় রায়

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেস। দুপুর দুটো নাগাদ।

শ্রীনিকেতন রোডের ওপর ভবানী প্রেসের লম্বা একতলা ঘরখানায় খটাখট করে ছাপাখানার কাজ চলছে। ঘরের একদিকে চেয়ারে বসে নিজের লেখার প্রুফ দেখছিল দীপক।

ঘরের এক কোণে কাঠের পার্টিশান ঘেরা একখানা ছোট্ট কামরা। তার দরজায় লেখা–সম্পাদকঃ বঙ্গবার্তা।

দু'জন ভদ্রলোক এসে প্রেসের দরজার সামনে দাঁড়াল। দু'জনেই ফুলপ্যান্ট শার্ট পরা। ফিটফাট। একজন বেশ লম্বা চওড়া। ময়লা রং।

দ্বিতীয় জনের রং ফর্সা। মাঝারি হাইট। ঢেউ খেলানো চুল। কাটা কাটা মুখে হাসি হাসি ভাব।

দু'জনেরই কাঁধে ঝুলছে একটা করে কিট্‌ব্যাগ। দশাসই লোকটির কাঁধে আবার একটা ক্যামেরা।

দীপক তাদের এক নজরে দেখে বুঝল যে এরা বোলপুরের বাসিন্দা নয়। দু'জনেই দীপকের বয়সী বা সামান্য বড় হতে পারে। এই বছর ত্রিশ হবে।

লোক দুটি ইতিউতি চায়। লম্বাজন প্রেসের পিয়ন হারুকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা এটা তো ভবানী প্রেস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', জানায় হারু।

'এখানেই তো সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা কাগজের অফিস?'

'হ্যাঁ।' হারু ঘাড় নাড়ে।

'আচ্ছা কৃঞ্জবিহারীবাবু আছেন?'

'আছেন।' হারু জানায়।

ফর্সা লোকটি বলে, 'আমরা একবার দেখা করতে চাই। দরকার আছে।'

হারু ঢুকে যায় পার্টিশান ঘেরা কামরায়। ভবানী প্রেসের মালিক এবং বঙ্গবার্তা কাগজের সম্পাদক শ্রীকৃঞ্জবিহারী মাইতির অফিস ঘর। একটু বাদে বেরিয়ে এসে হারু ডাকল,'আসুন।'

লোক দুটি ঢুকে যায় সুইং-ডোর ঠেলে কৃঞ্জবাবুর কামরায়।

দীপক আড়চোখে লক্ষ্য করছিল লোক দুটিকে। কাস্টমার? প্রেসে ছাপানোর কাজে এসেছে নাকি? না, বঙ্গবার্তায় কোনো খবর ছাপাতে?

কৃঞ্জবাবুর হেঁড়ে গলা শোনা যাচ্ছে। তবে সব কথা বোঝা যাচ্ছে না। টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসে 'নমস্কার। নমস্কার....ও আচ্ছা আচ্ছা.... ও বেশ বেশ....হ্যাঁ, তারপর কি কচ্ছে?....ওঃ অনেকদিন হলো।....'

আগন্তুক দু'জনের কথা কিন্তু কিছুই ধরা যায় না। তারা বেশ নিচু সুরে কথা বলে।

'এ্যাঁ, ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। বলেন কি....হ্যাঁ হ্যাঁ শুনি'....বলতে বলতে কৃঞ্জবিহারীর গমগমে গলা হঠাৎ খাদে নেমে যায়। দু'পক্ষে কিসব কথা চলে। মাঝে মাঝে কৃঞ্জবাবুর গলা চড়লেও গোটা বাক্য বোঝা যায় না। প্রথমে কৌতূহলী হলেও পরে দীপক নিজের কাজে মন দেয়।

দু'কাপ চা গেল সম্পাদকের কামরায়।

মিনিট দশেক বাদে দীপকের চটক ভাঙে কৃঞ্জবাবুর হুংকারে, 'দীপক দীপক, শুনে যাও।'

দীপক কাগজপত্র টেবিলে রেখে উঠে পড়ে। সম্পাদকের কামরায় ঢোকে।

কৃঞ্জবিহারী মাইতি মাঝবয়সী, গাট্টাগোট্টা, মাঝারি লম্বা শ্যামবর্ণ পুরুষ। ভারিক্কি মুখে আশ্ব মুখুজ্যে পার্টার্নের পুরুষ্টু ঝোলা গোঁফ। মোটা ভুরু। পরনে যথারীতি ধুতি ও শার্ট। গোল গোল চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। মনে হয় কোনও কারণে উত্তেজিত। তিনি বলে উঠলেন, 'বস দীপক। আলাপ করিয়ে দিই। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্টি।'

সম্পাদকের টেবিলের সামনে বসেছিল সেই দুই ভদ্রলোক। দীপক পাশের দিকে একটা চেয়ারে বসে।

কৃঞ্জবাবু লম্বা চওড়া লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন শ্রীগোলকপতি দাস' এবং ফর্সাজনকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁর নাম শ্রীঅলোকনাথ

দত্ত। কলকাতা থেকে আসছেন। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বঙ্গবার্তার একজন রিপোর্টার। গ্রাজুয়েট। এই লাইনে ভেরি প্রমিসিং ইয়ংম্যান।'

দীপক জোড়হাত করে নমস্কার জানায়। আগন্তুকরাও প্রতিনমস্কার করে।

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'এই অলোক দত্তর কাকা বঙ্কু আমার বিশেষ পরিচিত। বঙ্কুর কাছে আমার নাম ঠিকানা জেনে এখানে এসেছেন। একটা দরকারে আমার হেল্প চান। ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এঁদের একটা অদ্ভুত শখ আছে।'

কুঞ্জবাবু হঠাৎ কথা থামিয়ে, গোঁফ ভুরু নাচিয়ে, চোখ ছোট করে, গলার স্বর নামিয়ে রহস্যময় হেসে বললেন, 'কি শখ জান? এঁদের শখ হচ্ছে ভূত খোঁজা।'

দীপক চমকে তাকায় দুই আগন্তুকের পানে। তারা মিটিমিটি হাসে।

কুঞ্জবাবু বলে চলেন, 'হ্যাঁ শখটা অদ্ভুত। কি বল? সেই উদ্দেশ্যেই আগমন। ভেদিয়ায় এক গ্রামে একটা পোড়োবাড়ির সন্ধান পেয়েছেন, সেটায় নাকি ভূত আছে। তাই পরখ করতে এয়েছেন।

'গ্রামটার ডিরেকশন নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ভেদিয়া তো যাননি আগে। তাই আমার কাছে এসেছেন ভাল করে বুঝে নিতে। কি নাম জানি বললেন গ্রামটার?'

'নন্দনপুর।' উত্তর যোগায় গোলকপতি।

'হুঁ, নন্দনপুর। চেন গ্রামটা? তোমার তো প্রচুর জায়গায় ঘোরাঘুরি।'

নন্দনপুর? খানিক ভাবে দীপক। তারপর বলে, 'হুঁ, ওই নামে একটা গ্রাম আছে বটে ভেদিয়ায়। অজয় নদের ধারে। স্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে।'

'রাইট, নদীর ধারে। অজয় নদের ধারে। তাই বলেছে।' গোলকপতি সায় দেয়, 'ওখানে নাকি একটা মস্ত বাড়ি আছে। রায়বাড়ি। পরিত্যক্ত। ফাঁকা পড়ে আছে বহুকাল। ওই অঞ্চলের জমিদারদের বাড়ি ছিল ওটা। বাড়িটা নাকি হন্টেড। ভূতুড়ে।'

'আমি নন্দনপুর গেছি একবার', দীপক জানায়, 'রায়বাড়ি দেখেছি দূর থেকে। বাড়িটা বিরাট। পোড়োবাড়ি মনে হয়েছিল। তবে ভূত আছে কিনা জানি না। মানে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করিনি কাউকে। তা আপনারা জানলেন কি করে?'

কুঞ্জবিহারী আগন্তুকদের উৎসাহ দিলেন, 'বলুন বলুন। দীপককে সব খুলে বলুন। ওর এ ব্যাপারে খুব এক্সপিরিয়েন্স।' তিনি চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দেন। মুখে স্মিত হাসি।

সম্পাদকের কথাটা খচ্ করে কানে বাজল দীপকের। ওঁর রকমসকম সুবিধের ঠেকল না। কুঞ্জবিহারী খটখটে মানুষ। এত বিগলিত ভাব দেখাবার কারণ? যা হোক সে অলোকনাথের কথায় মন দেয়–

'আমাদের পাড়ার গগনেন্দ্র রায়ের কাছ থেকে এই বাড়িটার সন্ধান পেয়েছি। গগন রায়ের পূর্বপুরুষের ভিটে ওই বাড়ি। বহুকাল ফাঁকা পড়ে আছে। কেউ থাকে না। প্রায় পঁচাত্তর বছর।

দীপক ভুরু কুঁচকে বলে, 'একটা প্রশ্ন করব?'

'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। করবেন বৈকি', বলল অলোকনাথ।

'আপনাদের এই অদ্ভুত শখের কারণ? মানে ভূতের সন্ধান। এই রকম ভূত-প্রেতচর্চার ক্লাব আছে শুনেছি। আপনারা কি সেরকম কোনও ক্লাবের?'

'আরে না না', অলোক দত্ত বাধা দেয়, 'আমরা কোনও ভূত-প্রেত অনুসন্ধানী ক্লাবের মেম্বার নই। এটা স্রেফ আমাদের দু'জনের শখ। দু'জনে একই অফিসে চাকরি করি। অনেক দিনের ফ্রেন্ড। হঠাৎই শখটা গজাল।'

'হঠাৎ এই অদ্ভুত শখ!' বিড়বিড় করে দীপক।

'সে মশাই এক হিস্ট্রি', অলোক দত্ত হাত মুখ নেড়ে বলে, 'একদিন অফিসে তক্ক হচ্ছিল টিফিনে–ভূত আছে কি নেই? বেশির ভাগই বলল যে আছে। কয়েকজন বলল, তাদের পরিচিত কেউ কেউ ভূত দেখেছে নিজের চোখে।

'আমি আর গোলক বললাম–ভূত নেই। বিশ্বাস করি না ভূতে। তক্কাতক্কি হতে হতে বেট রাখা হলো। আরও দু'একজন অবিশ্যি আমাদের সাপোর্ট করেছিল।

'ভূতে বিশ্বাসীদের একজন বলল যে, দমদমে নাকি একটা মস্ত পোড়োবাড়ি আছে। বহু পুরনো। লর্ড ক্লাইভের আমলের। বাড়িটায় রাতে কেউ থাকতে চায় না। কারণ নাকি সাহেব ভূতরা সেখানে পায়চারি করে রাতে। আমাদের ওই বাড়িতে রাত কাটাতে চ্যালেঞ্জ জানাল। আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম।

'গেলাম সেই বাড়িতে। তবে আমি এবং গোলক ছাড়া ভূতে অবিশ্বাসীরা আর কেউ যায়নি শেষ অবধি। যাহোক থাকলাম সেখানে রাতে। নির্বিঘ্নেই কাটালাম। কিন্তু ভূতের দর্শন মিলল না।

'সেই মশাই শুরু। বেশ নেশা ধরে গেল। ভূতুড়েবাড়ির খোঁজ পেলেই সেখানে গিয়ে রাত কাটাই। ভেদিয়ারটা হবে আমাদের আট নম্বর কেস।'

'কিছু দেখেননি?' প্রশ্নটা করেন কুঞ্জবিহারী।

'নাঃ।' মাথা নাড়ে অলোক দত্ত, 'তবে ট্রাই করে যাচ্ছি।'

গোলকপতি বলে ওঠে, 'দেখিনি বটে, তবে বলতে পারেন কিছু শুনেছি।'

'কি রকম?' কুঞ্জবিহারী খাড়া হয়ে বসেন।

'এই অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু আওয়াজ।'

'ওগুলো সত্যি সত্যি ভৌতিক আওয়াজ কিনা প্রমাণ হয়নি।' অলোকনাথ দাবড়ে দেয় গোলকপতিকে।

'তা বটে, তা বটে।' মিনমিন করে গোলকপতি।

'নন্দনপুরে রায়বাড়ি এদ্দিন ধরে খালি পড়ে আছে কেন?' দীপক কৌতূহলী।

'সে এক হিস্ট্রি মশাই', জানায় অলোকনাথ, 'ওই গগন রায়ের কাছে শোনা।

'প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে রায়বাড়ি ছিল জমজমাট। একবার অন্নপ্রাশন হয় ওই বাড়ির একটি মেয়ের। বড় রায়কর্তার প্রথম নাতনি। খুব ধুমধাম হচ্ছে। অনেক লোকজন এসেছে বাড়িতে। সন্ধ্যের সময় হঠাৎ কলেরা শুরু হলো বাড়িতে। দুদিনেই ওই বাড়িতে দশ-বারোজন মারা যায় ওলাউঠায়। ওই বংশের ছয় সাতজন আর কাজের লোক মানে এই ঝি চাকর দারোয়ান জনা চার পাঁচ। যার অন্নপ্রাশন সেই ছোট্ট মেয়েটিরও মৃত্যু হয়। আর মারা যান বড়কর্তা স্বয়ং। উৎসব বাড়িতে হাহাকার উঠল। গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল রোগ। মারা যায় কিছু গ্রামের অন্য লোক। বেশির ভাগ লোকই গ্রাম ছেড়ে পালায়। জানেন তো তখন এই মারাত্মক রোগের তেমন কোনও

চিকিৎসাই ছিল না।

'যাহোক এই দুর্ঘটনার কিছুদিন বাদে গ্রামের লোক আবার ফিরে আসে নিজের নিজের ভিটেয়। কিন্তু শোকার্ত রায়রা মাসখানেকের মধ্যে চিরকালের মতো ওই বাড়ি ত্যাগ করে। ওই বংশের কেউ আর কখনো ওই বাড়িতে রাত কাটায়নি। বাড়ির দামী দামী জিনিস যতটা পারে সঙ্গে নিয়ে যায়। কিছু বিক্রি করে। জমিদারির বেশির ভাগটাই বেচে দেয়।

'একজন কেয়ারটেকার রেখেছিল। কিন্তু সেও নাকি রাতে থাকত না বাড়ির ভিতর। শেষে ও বাড়ি দেখাশুনা করারও কেউ রইল না। বাড়িটা নাকি একদম ভুতুড়ে হয়ে গেছে। হানাবাড়ি।

'গগন রায় নিজে কখনো যায়নি নন্দনপুর। সে কলকাতাতেই জন্মেছে, বড় হয়েছে। এসব তার বাবার কাছে শোনা।'

'ওখানে ভুতুড়ে কান্ড কি হয়?' জানতে চান কুঞ্জবাবু।

অলোকনাথ বলল, 'তা খুব বলতে পারেনি গগন। কি সব নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হয়। কি সব নাকি দেখা যায়। আসলে এ নিয়ে ওর বাবা বিশেষ কিছু বলতে চাইতেন না।'

দীপক বলল, 'বাঃ এত কথা তো জানতাম না। তাহলে সেদিন বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিতাম।'

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'দীপক, এনাদের নন্দনপুরে কিভাবে যেতে হয় বুঝিয়ে দাও ভাল করে। আর–আর–আমার একটা আইডিয়া এসেছে। যদি তুমিও ওদের সঙ্গে যাও মন্দ হয় না। রাতে থেকে যাবে একসঙ্গে। মানে রিপোর্টার হিসেবে। তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে দারুণ একখানা স্টোরি হবে বঙ্গবার্তায়। হেডিং দেব–ভুতুড়ে বাড়িতে ভূতের খোঁজে। কি আপনাদের কোনও আপত্তি আছে, কাগজের কেউ গেলে?'

অলোকনাথ বলল, 'না না, আপত্তির কি? ভালই তো। দলে একজন বাড়বে।'

কুঞ্জবিহারীর এই প্যাঁচটাই আশঙ্কা করছিল দীপক। তাকে এদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেবার মতলব। সে গুম মেরে যায়। কথা বলে না।

কুঞ্জবিহারী দীপকের রকম দেখে বললেন, 'অবশ্য তোমার যদি কোনও ইয়ে থাকে, জোর করব না। দেখি আমিই না

অবশ্য জোর করব না।

হয় যাব তাহলে।'

দীপকের মাথায় চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল। সদ্য পরিচিত লোকগুলির সামনে এমন ডাউন দেওয়া? ওই ইয়ের মানেটা যে কি–যে কেউ ধরতে পারবে। অর্থাৎ সম্পাদক বলতে চান যে দীপক সঙ্গে না গেলে বুঝতে হবে যে সে ভয় পাচ্ছে। ভূতের ভয়। তাই যেতে চাইছে না।

দীপক গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল অলোকনাথকে, 'আপনারা কবে নন্দনপুর যেতে চান?'

'আসছে কাল। আজ শুক্রবার। শনি রবি ছুটি আছে অফিসে। কাল রায়বাড়িতে রাত কাটিয়ে, রবিবার কলকাতা ফিরব।'

'ঠিক আছে, আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।' নেহাৎ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জানায় দীপক।

কুঞ্জবাবু অমনি দীপকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন,'সাব্বাস্! আমি জানতাম যে তুমি এমন চান্স ছাড়বে না। যাক, এঁদের সঙ্গে প্রোগ্রামটা ঠিক করে নাও। হ্যাঁ, আপনারা আজ কোথায় থাকছেন?'

অলোকনাথ বলল, 'আমরা কোনও হোটেলে থাকব।'

কুঞ্জবাবু বললেন, 'অলরাইট। দীপক ওঁদের বোলপুর নিবাসে নিয়ে যাও। আমার নাম করে ভাল ঘর দিতে বল।'

শনিবার। সকাল ন'টা নাগাদ ভেদিয়া স্টেশনে নামল তিনজন–দীপক, অলোকনাথ এবং গোলকপতি।

স্টেশন থেকে নন্দনপুর যেতে দুটো সাইকেল রিকশা ভাড়া করা হলো। একটায় গোলকপতি। অন্যটায় অলোকনাথ ও দীপক।

আঁকাবাঁকা মেঠো পথ ধরে যেতে যেতে রিকশাওলা জিজ্ঞেস করল দীপকদের, 'নন্দনপুরে কার কাছে যাবেন?

'শচীন কর্মকার', জবাব দেয় অলোকনাথ। নন্দনপুরে শচীন কর্মকারের নামে একটা চিঠি দিয়েছে গগন রায়। কলকাতায় একটা কাজে এসে গগনদের বাড়িতে এসেছিলেন শচীনবাবু। তখন সামান্য আলাপ হয় গগনের সঙ্গে।

'শচীনদার কুটুম বুঝি?' রিকশাওলার কৌতূহল।

'না না, চেনা লোক। আসতে বলেছিলেন একটা কাজে।' সামাল দেয় দীপক।

গ্রামের বাইরে থেকেই দীপকরা ভাড়া মিটিয়ে বিদায় দেয় রিকশা। তারপর হেঁটে গাঁয়ে ঢোকে।

একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করতেই একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে চলল শচীন কর্মকারের বাড়ি। দেখতে দেখতে পথে কুচোকাঁচার দল জুটে যায় শহুরে বাবুদের পিছু পিছু।

শচীন কর্মকারের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ছোটখাটো নিরীহদর্শন মানুষ। গগন রায়ের চিঠি পড়ে এবং পরিচয় পেয়ে খাতির করে বসালেন। চা মুড়ি খাওয়ালেন।

গগনের চিঠিতে অলোকনাথ এবং গোলকপতির নন্দনপুরে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য লেখা ছিল না। অলোকনাথের মুখে তাদের আগমনের কারণটা জেনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন শচীনবাবু। ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, 'এসব নিয়ে খোঁচাখুঁচি করা, তেনাদের ত্যক্ত করা কি উচিত হবে?'

অলোকনাথ তাড়াতাড়ি বোঝায়, 'না না আমরা কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। আমরা যুক্তিবাদী। ভূত-প্রেত মানে তেনারা সত্যি সত্যি আছেন কিনা তার প্রমাণ খুঁজছি। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কিছু পাইনি। তাই এসেছি'–

'প্রমাণ?' ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলে জানান শচীন্দ্রনাথ, 'এসব প্রমাণ কি সহজে মেলে? ভাগ্য চাই। আর এসব প্রমাণ সহ্য করার মতন মনের বলও থাকে না সবার।'

এবার গোলকপতি মোটা গলায় মন্তব্য ছাড়ে, 'দেখুন, মনের জোর আমাদের নেহাৎ কম নয়। সত্যি তেমন প্রমাণ মিললে ভিরমি খাব না, একটু ভরসা রাখতে পারেন।'

কর্মকারমশাই পিটপিট করে গোলকপতির দশাসই চেহারাখানায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'তা বেশ। আমার যা বলার বললাম।'

দীপক এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলে, 'রায়বাড়িতে কি হয়? মানে কিছু দেখা-টেখা যায় কি? কেন লোকে থাকে না রাতে?'

কর্মকারমশাই বললেন, 'বুড়ো কত্তার খড়মের আওয়াজ শুনেছে অনেকে। ওই বাড়ির ভিতর হেঁটে বেড়াচ্ছেন রাত্তিরে– খট্‌খট্ করে। রাতে ওই বাড়ির ছাদের কিনারে ছায়ামূর্তি দেখেছে কেউ কেউ। শোনা গেছে কান্নার আওয়াজ। যেন বাচ্চা কাঁদছে। আমি অবশ্য নিজে কিছু দেখিনি বা শুনিনি। আসলে ওবাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষি না সন্ধ্যের পর। কি দরকার মশাই, অনাবশ্যক কৌতূহল মেটাতে গিয়ে কি বিপদে পড়ব?'

দীপক অলোকনাথ ও গোলকপতিকে বলল, 'চলুন না, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে আসি।'

'অফকোর্স।' অলোকনাথরা উঠে পড়ে। শচীনবাবু পথ দেখিয়ে চলেন।

একপাল বাচ্চা ছেলে-মেয়ে পিছু নিল তাদের। গ্রামের অন্য বাড়ি থেকে বয়স্ক লোকেরাও উঁকিঝুঁকি মারে।

রায়বাড়ি নন্দনপুর গ্রামের অন্য বাড়িগুলির সীমানা থেকে বেশ খানিক তফাতে। একদম ফাঁকায়। বাড়িটা ঘিরে ছোট বড় অনেক গাছ। ঝোপঝাড়। দূর থেকেই নজর পড়ে বাড়িটা।

রায়বাড়ি থেকে অজয় নদের কূল মাত্র শ'দুই গজ। আগে নাকি অজয় নদ ঢের দূরে ছিল।

জমিদার বাড়িই বটে। মস্ত বড়। দোতলা। দো মহলা। অট্টালিকা ঘিরে বিরাট এলাকা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিল অবশ্য বহু জায়গায় এখন ভাঙা। পাঁচিলের গা ঘেঁষে অনেকগুলো ঘর সারি সারি। ঘরগুলো কোনওটাই আস্ত নেই। ওগুলো ছিল কাছারিবাড়ি, অতিথিশালা, নাটমন্দির ইত্যাদি।

একটা প্রকান্ড জাম গাছ বাড়িটার প্রায় ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে অট্টালিকার ছাদে। পলস্তরা খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে প্রায় গোটা বাড়ির দেয়ালে। কয়েকটা অশত্থ গাছ জন্মেছে বাড়িটার গায়ে। অট্টালিকার পেছন দিকে একটা মজা পুকুর। একটা কুয়োও রয়েছে। তবে কুয়োর জল ঘোলাটে নোংরা।

কবাটহীন প্রকান্ড সদর দরজার হাঁ-এর ভিতরে ঢোকে চারজন। পিছু নেওয়া বাচ্চার দল কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢোকে না। বোধহয় সঙ্কোচে।

ঢুকেই চৌকো বাঁধানো মস্ত উঠোন। উঠোন অনেক জায়গাতেই খোবলানো। ইঁট মাটি বেরিয়ে পড়েছে। উইয়ের ঢিবি উঠেছে। উঠোন ঘিরে উঁচু বারান্দা তিন দিকে। বারান্দা পেরিয়ে পরপর ঘর।

দোতলাতেও একই রকম চওড়া বারান্দা আর ঘরের সারি। মোটা মোটা গোল গোল থাম দোতলার বারান্দার ভার কাঁধে নিয়ে আজও সটান খাড়া। দুই কোণ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

বাড়িটা যে অভিশপ্ত ঢুকেই যেন টের পাওয়া যায়। কেমন গা ছমছম করে এই বিশাল নির্জন অট্টালিকার অন্দরে প্রবেশ করেই।

একতলার বারান্দা ধরে ওরা হাঁটতে লাগল।

এই জনমানবহীন অট্টালিকার বাসিন্দা এখন অজস্র পায়রা শালিক আর চামচিকে। আরও নিশ্চয় থাকে কিছু সরীসৃপ কীট পতঙ্গ। তাদের সহজে চোখে পড়ে না।

সহসা জুতোর শব্দে বিরক্ত ভীতচকিত কিছু পায়রা শালিক উড়তে লাগল ঘুলঘুলি আর কড়িবরগার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে। সাঁ সাঁ করে এলোমেলো পাক খায় শূন্যে কয়েকটা চামচিকে।

একতলার বেশির ভাগ ঘরের দরজা জানলায় কবাট নেই। কোথাও কোথাও মাত্র কাঠের ফ্রেমের কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। কোনও দরজা জানলায় ভাঙা পাল্লার খানিক অংশ কোনও মতে ঝুলে আছে। নোংরা মেঝে। ছাদ ঝুলে ভর্তি। তবে থামের গায়ে, বারান্দার কার্ণিশে, দেয়ালে কিছু অপূর্ব কারুকার্য এই অট্টালিকার অতীত সৌন্দর্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শচীন কর্মকার জানালেন, 'এ বাড়ি যে কবে তৈরি হয়েছে গাঁয়ে কেউ আজ বলতে পারে না সঠিক। তবে সোয়া-শ বছরের পুরনো তো বটেই।'

ঠিক সদর দরজার মুখ পেরিয়ে বাঁয়ে দেখা গেল একটা মস্ত হলঘর। কর্মকারমশাই জানালেন যে, এটা নাকি ছিল বৈঠকখানা। গান বাজনার আসরও বসত ওই ঘরে।

ঘরখানায় তখনো রয়েছে, প্রাচীন আমলের কয়েকটা বড় বড় চেয়ার। একটা গোল কাঠের টেবিল। দেয়ালে ঝুলছে একটা বড় ভাঙা আয়না এবং একটি মস্ত হাতে আঁকা ছবি। অয়েল পেন্টিং। রায়বংশের কারও প্রতিকৃতি। ছবির ওপর ধুলো ময়লা জমেছে। বোঝা যায় এক রাশভারী মধ্যবয়স্ক পুরুষের বুক অবধি চেহারা।

কর্মকার বললেন, 'শুনেছি ওটা বড়কর্তার ছবি।' ওলাউঠায় মারা গেছলেন সেইবার।'

হলঘর থেকে বেরিয়ে গোলকপতি দেখাল, 'ওরে ব্বাপ্ ওই দেখুন।'

সকলে দেখল, চত্বরের এক কোণে লম্বা একটা সাপের খোলস।

শচীনবাবু বললেন, 'হুঁ পোড়োবাড়ি।

খরিস সাপ বাসা বেঁধেছে। শুধু কি তেনাদের ভয়? এনাদের ভয়ও কম নয়। সাবধানে থাকবেন।

দোতলায় ওঠা হলো।

বারান্দায় লোহার জাফরি লাগানো ঘের। কোমর সমান উঁচু জাফরিতে মরচে পড়েছে। নড়বড়ে। তবে নকশা চমৎকার।

দোতলার ঘরগুলোয় উঁকি মারে দীপকরা। নিচের তলার মতোই অবস্থা।

সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে। শচীনবাবু বারণ করলেন, উপরে যেতে। ভাঙা সিঁড়ি। তা বটে। দোতলার ছাদেও বড় বড় ফাটল ধরেছে। নেহাতই খুব পুরু দেয়াল, মজবুত করে বানানো বাড়ি, তাই এতকাল খাড়া রয়েছে, এত অবহেলা সত্ত্বেও।

সবাই নিচে নেমে এল।

'এ বাড়িতে লোক ঢোকে', দীপক মন্তব্য করে, 'ওই দেখুন পোড়া বিড়ির টুকরো উঠোনে।'

'হুঁ', শচীনবাবু জানান, 'দিনেরবেলা বাগাল ছেলেগুলো ঢোকে হয়তো। কিন্তু রাতে?' তিনি মাথা নাড়েন।

বাড়িটা দেখতে দেখতে দীপকের মনে একটা সন্দেহ জাগে। রাতে চোর-ডাকাত লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনাদের এদিকে চুরি-ডাকাতি কেমন হয়?'

'তা হয় বৈকি', জানান শচীনবাবু, 'চুরি-ডাকাতি আজকাল কোথায় না হয়। তবে আমাদের গাঁয়ে ডাকাতি হয়নি বহুকাল। ছিঁচকে চুরি হয় মাঝে মধ্যে। গাঁয়ে তেমন বড়লোক কে? সোনা-দানা কি আর মিলবে?'

একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে দ্বিতীয় মহলে যাবার রাস্তা। সেদিকে একবার উঁকি দিল দীপকরা। বাড়ির ওই অংশের অবস্থা আরও খারাপ। আরও জরাজীর্ণ। আরও নোংরা।

দীপকরা ঠিক করল যে, প্রথম মহলেই কাটাবে রাত।

কোথায় থাকা যায়, পরামর্শ করে তিনজনে।

শচীনবাবু শুকনো মুখে বললেন, 'আপনারা কি সত্যি থাকবেন এখানে? মানে রাতে?'

'নিশ্চয়ই।' অলোকনাথের মন্তব্য।

'ভয় হচ্ছে, কিছু দুর্ঘটনা ঘটলে লোকে আমায় দুষবে।'

'না না, আপনাকে দোষ দেবে কেন? বলেন তো লিখে দিয়ে যাব।' অলোকনাথ ভরসা দেয়।

শচীনবাবু হতাশভাবে মাথা নাড়েন।

নিচের হলঘরটায় রাতে থাকা ঠিক হলো। বড় বড় জানলার ফোকর দিয়ে ঘরখানা ভেসে যাচ্ছে দিনের আলোয়। দূরে দেখা যাচ্ছে অজয় নদের পাড়।

অলোকনাথ বলল শচীনবাবুকে, 'একটি লোক যোগাড় করতে পারেন? ঘরখানা একটু ঝাঁটপাট দিয়ে সাফ করে দেবে। আর দুটো মাদুর বা চাটাই পেলে ভাল হয়। কখনো কখনো একটু গড়িয়ে নেব।'

'ঠিক আছে, হয়ে যাবে।' কর্মকারমশাই আশ্বাস দেন। 'আহারটা কিন্তু আমার বাড়িতে করতে হবে।'

অলোকনাথরা প্রথমে আপত্তি জানায়, 'পাঁউরুটি আছে আমাদের সঙ্গে। গ্রামে মুড়ি পাওয়া যাবে! তাতেই হবে।'

শচীনবাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'সে কি, আপনারা অতিথি। গগনের বন্ধু। মুড়ি খেয়ে কাটাবেন? তা হয় না। সামান্য দুটো অন্ন যোগাতে পারব না?'

দীপকরা রাজী হয় অগত্যা।

'বেশ দুপুরে আপনার কাছে খাচ্ছি। রাতে কিন্তু কোনও ব্যবস্থা করবেন না। পাঁউরুটি খাব। ভাত খেলে ঘুম আসবে।'

কর্মকারমশাই গেলেন নিজের বাড়িতে। দীপকরা তিনজনে গেল অজয় নদের তীরে বেড়াতে।

বৈশাখ মাস। অজয় নদেতে তখন জল খুব কম। প্রশস্ত নদীগর্ভে বালির চড়া পড়েছে। ক্ষীণ একটা স্রোত বইছে এক ধার ঘেঁষে। জলের বুকে সবচেয়ে গভীরেও হাঁটু জলের বেশি নয়। মানুষজন গোরু-মোষ দিব্যি হেঁটে পার হচ্ছে নদী। ওপারে দেখা যাচ্ছে গাছ-গাছালিতে ঢাকা কয়েকটি গ্রাম।

বেলা এগারোটা নাগাদ, তিনজনে গ্রামে ফেরে।

শচীনবাবুর বাড়ি পৌঁছে দেখে যে রীতিমতো এক জটলা তাঁর বাসার সামনে। শচীন কর্মকারও রয়েছেন তার মধ্যে। দীপকরা হাজির হতে ভিড়ে গুঞ্জন ওঠে। কর্মকারমশাই আহ্বান জানান দীপকদের, 'একটু জিরিয়ে নিন। তারপর আলাপ-পরিচয় করবেন।'

বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে বসেছে দীপকরা অভ্যর্থনার চেয়ারে। এক বৃদ্ধ এসে বসেন তাদের কাছে। বাইরের ভিড়টা তখন জানলা দরজায় উপচে পড়ছে।

শচীনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমাদের মণ্ডলমশাই।'

বৃদ্ধ বার দুই গলা খেঁকরে নিয়ে গম্ভীর সুরে বললেন, 'হুঁ শুনলাম সব। তা আপনারা কি সত্যি ওই বাড়িতে রাত কাটাবেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', সবিনয় নিবেদন করে গোলকপতি, 'সেই উদ্দেশ্যেই যে এসেছি।'

'ভিতরে না থেকে, বাড়িটার বাইরে মানে নাটমন্দিরের সামনে চত্বরে থাকলে হয় না?' বৃদ্ধ বলেন।

'আজ্ঞে না। ভিতরে থাকতেই যে চাই।' অলোকনাথ দৃঢ়কণ্ঠে জানায়।

'সাপখোপের ভয়ও তো আছে। পোড়োবাড়ি।' বৃদ্ধ নিরস্ত করার চেষ্টা চালান।

'আজ্ঞে আছে বৈকি। আমরা সতর্ক থাকব। লাঠি রাখব।' গোলকপতি তার পেশীবহুল বাহু তুলে এমন ভঙ্গি করে যার অর্থ, শুধু সাপখোপ কেন, অশরীরীদের বিরুদ্ধেও তারা প্রস্তুত।

'হুম্। আপনারা শহুরে মানুষ। তবু অনুরোধ করছি, একটিবার ভেবে দেখবেন।'

'নিশ্চয়।' অলোকনাথের বিনীত আশ্বাস।

বৃদ্ধ উঠে গেলেন।

ঘরের বাইরে দাওয়ায় তখন জোর আড্ডা বসে। জামা জুতো খুলে বসে জিরিয়ে নিতে নিতে দীপকদের কানে আসে ভয়াবহ সব ভৌতিক ঘটনার বর্ণনা। রায়বাড়ি নিয়েও গল্প হচ্ছিল।

বিকেল বিকেল দীপকরা বেরিয়ে পড়ে রায়বাড়ির উদ্দেশে।

তাড়াতাড়ি বেরোবার কারণ শচীনবাবুর বাসার সামনে তাদের জন্য সবসময় যে পরিমাণ ভিড় লেগে আছে সেটা গৃহকর্তার পক্ষে বিরক্তিকর হচ্ছে।

গ্রামের একটা দল কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। তাতে সব বয়সী মানুষ। শচীন কর্মকারও রয়েছেন।

অট্টালিকার বাইরে নাটমন্দিরের চাতালে বসল দীপকরা।

অলোকনাথ ব্যাগ থেকে একটা টেপ রেকর্ডার বের করে নতুন খালি ক্যাসেট ভরে। চালিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে।

গোলকপতি তার ফ্ল্যাশ-বাল্ব লাগানো ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগল।

'এসব কি করতে এনেছেন?' জিজ্ঞেস করেছিল দীপক।

ওরা বলেছিল যে কোনও মূর্তির ছবি তোলার দরকার হয় যদি? কোনও অদ্ভুত শব্দ বা কণ্ঠস্বর শুনে রেকর্ড করে রাখা যায় যদি–তাই নিয়েছি।

দু'জনের কাছে আরও দুটি জিনিস আছে গোপনে। দুটো বড় বড় ধারাল ছুরি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। দীপক একটা লাঠি এনেছে।

গ্রামের ভিড়টা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মহা কৌতূহলে দেখছে আগন্তুকদের কার্যকলাপ। দু'জন বয়স্ক লোক বসে গেলেন চাতালের এক কোণে।

'গান শুনবেন বুঝি?'

টেপ-রেকর্ডারটা দেখিয়ে এক ছোকরা প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, রাত জাগতে হবে যে।' অলোকনাথ হেসে জানায়।

গ্রামের একটি ছেলে, মুখে সরা চাপা ছোট একটা মাটির কলসি কাঁধে হাজির হলো। তার পিছনে আর একটি ছেলের হাতে একটা হ্যারিকেন।

'এগুলো কোথায় রাখব?' জিজ্ঞেস করে তারা।

দীপক বলল, 'নিচে হলঘরটায় রেখে এস ভাই। কলসিতে জল ভরে এনেছ তো?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে ওরা ঢুকে যায় রায়বাড়ির ভিতর। একটু বাদে জিনিস দুটো রেখে বেরিয়ে আসে।

আইডিয়াটা দীপকের। অলোকনাথদের সঙ্গে একটা জলের বোতল আছে বটে। তবে এই গরমকালে তিনজনের এক বোতল জলে তেষ্টা মিটবে না। তাই কর্মকারমশাইকে কলসির ব্যবস্থা করতে বলেছিল।

মোমবাতি ওদের সঙ্গে আছে। কিন্তু বাড়িটায় যা হাওয়া খেলে মোমবাতি নিবে যেতে পারে। তাই হ্যারিকেনের ব্যবস্থা কর্মকারমশাইয়ের কৃপায়।

দীপক ভাবল, আর একবার বাড়িটার ভেতর দেখে আসি। সে একাই ঢুকে যায় রায়বাড়িতে।

হলঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, সব ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছেন শচীনবাবু। ঘরটা খানিক সাফ হয়েছে। দুটো মাদুর বিছানো রয়েছে মেঝেতে। দরজার পাশে জলভরা কলসি এবং লণ্ঠনটা রাখা।

দীপক দোতলায় ওঠে।

একটা ঘরে ঢুকে সে নদী দেখছে জানলা দিয়ে। হঠাৎ–খট্-খট্-খট্ শব্দে চমকে যায়। ঠিক যেন খড়ম পায়ে চলার আওয়াজ। এমন দিনের বেলা! ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুক।

ফের সেরকম শব্দ হয় দুবার। শব্দটা যেন ঘরে অন্য জানলাটার কাছ থেকে আসছে। ওই জানলায় একখানা মাত্র খড়খড়ি দেওয়া পাল্লা ভাঙা অবস্থায় কোনও রকমে টিকে আছে আজও।

দমকা বাতাস আসে। দীপক লক্ষ্য করে যে অমনি এক টুকরো ভাঙা ঝুলেপড়া কাঠ পাশে একটা কাঠের গায়ে দুলে দুলে আঘাত করে হাওয়ার ধাক্কায়। আওয়াজ হয়–খট্ খট্।

ওঃ এই ব্যাপার। এই বুঝি খড়ম পায়ে বড়কর্তার পায়চারি করার রহস্য। এবাড়িতে এমনি ভাঙাচোরা জানলা দরজার পাল্লা অজস্র। হাওয়ার ধাক্কায় তারাই শব্দ করে নিশ্চয়। নিস্তব্ধ রাতে সে শব্দ স্পষ্ট শোনায়। লোকে ভাবে খড়ম পায়ে বড়কর্তার ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসি পেল দীপকের। অলৌকিক রহস্যগুলো বেশিরভাগই এইভাবে সৃষ্টি হয়।

দীপক বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসল অলোকনাথদের কাছে চাতালে। ওরা তখন ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডারের কাজ শেষ করে চুপচাপ বসে।

গ্রামের ভিড়টা ঠায় রয়েছে। গুজগুজ করছে নিজেদের মধ্যে।

গোলকপতি ফিসফিস করে, 'আচ্ছা জ্বালালে। লোকগুলো যে নড়ে না। কি রকম ড্যাবড্যাব করে দেখছে। এখানে একটু রেস্ট নিয়ে সন্ধ্যের পর বাড়িটায় ঢুকব ভেবেছিলুম।'

দীপক মুচকি হেসে বলল, 'শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। কাল তো আর আমাদের জ্যান্তো দেখার আশা কম।'

গোলকপতি রাগে মুখ ভেটকায়।

দিনের আলো ক্রমে নিভে আসে। ঝাঁকড়া গাছগুলোর ছায়া ঘিরে ধরছে বাড়িটাকে। বাতাসের বেগ আর শোঁ শোঁ আওয়াজ বাড়ছে। থমথমে হয়ে উঠছে চারপাশ।

দীপক রায়বাড়ির ছাদে ঝুঁকেপড়া গাছের ডালপালার নড়াচড়া দেখতে দেখতে ভাবে–ওই ছায়া, ওই আলো-আঁধারিকে ভুল করা অসম্ভব নয়। যেন রাতে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। চলাফেরা করছে কিনার ঘেঁষে।

গ্রামের বয়স্করা উসখুস করে এবার। শচীন কর্মকার উঠে পড়লেন, 'তাহলে আমি চলি। একটু কাজ আছে বাসায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের আর আটকাব না। কাল দেখা হবে।' অলোকনাথ তৎক্ষণাৎ বিদায় জানায়।

আস্তে আস্তে বয়স্ক লোকেরা চলে যায়, কিন্তু ছেলে-ছোকরার দল তখনো নড়ে না।

গোলকপতি সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'ছোঁড়াগুলো বাড়ির ভিতর অবধি পিছু নেবে না তো? তাহলে আর বড়কর্তার দর্শন পেয়েছি?'

'দেখা যাক', দীপক উঠে পড়ে, 'চলুন বাড়ির ভিতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিই।'

সঙ্গী দু'জনও উঠে পড়ে। গ্রামের ছেলেরা কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢোকে না।

আপাতত হলঘরে বসে না দীপকরা। ঘরের ভিতর খুব হাওয়া। তবু একটা বোটকা গন্ধ ভাসছে। ওরা বাইরে বারান্দায় খবরের কাগজ পেতে পা ছড়িয়ে বসে, থামে ঠেস দিয়ে।

হঠাৎ কোত্থেকে একটি লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

মানুষটি ছোটখাটো। রং কালো। মাঝবয়সী। পরনে খাটো ধুতি ও ফতুয়া। পা খালি। মুখে বিনয়ী লাজুক হাসি।

সে হাত কচলাতে কচলাতে মৃদু নরম সুরে বলল, 'আজ্ঞে শুনলেম। তাই এলেম দেখতে।'

'কি শুনলে?' দীপক অবাক হয়ে বলে।

'আজ্ঞে, আপনারা নাকি এখানে রাত কাটাবেন?'

'হুঁ।' অলোকনাথের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তা বেশ।' লোকটি ইতিউতি চেয়ে হলঘরটা দেখিয়ে বলে, 'ওই ঘরে থাকবেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ঘরে বড়কত্তার ছবিখানা দেখেছেন?' লোকটি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করে।

'হুঁম্।' দায়সারা জবাব দেয় অলোকনাথ। বিরক্ত হচ্ছে। এ আপদ আবার কোত্থেকে জুটল?

'ভারি মানী লোক ছিলেন বড়কত্তা। যেমন দাপট। আবার দান-ধ্যানও ছিল খুব। আহা ছারখার হয়ে গেল অমন সোনার সংসার।' লোকটি নিজের মনেই বকে চলে।

দীপকরা নিস্পৃহভাবে বসে থাকে। সাড়া দেয় না।

লোকটি হঠাৎ বলল, 'বাবু এবাড়ি আমায় ভীষণ টানে। এবাড়ির কত যে কাহিনী জানি। ফুরসৎ পেলেই বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিই। বড়কর্তার ছবিটা দেখি। পেন্নাম জানাই।'

দীপকরা এবার বেশ অবাক হয়। দীপক বলে, 'তুমি কি এখানেই থাক? এই গাঁয়ে?'

'আজ্ঞে।' ঘাড় হেলায় লোকটি।

'কি নাম তোমার?'

'আজ্ঞে অভয়পদ হাজরা।' বলেই লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'যাই বড়কত্তার ছবিটা একবার দর্শন করে আসি। আলো কমে আসছে।'

অভয়পদ লঘু পায়ে ঢুকে যায় হলঘরে। দীপকরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কত বিচিত্র মানুষ যে আছে! আজও রায়বাড়ির প্রাচীন গৌরব নিয়ে রোমন্থন করে।

খানিক বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে ফের সামনে আসে অভয়পদ। মুখ উজ্জ্বল। বলে, 'ওঃ, সাক্ষাৎ পুরুষসিংহ। কি দৃষ্টি। যেন বর্শাফলক। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, কত্তা ভাল মানুষদের অপকার করেন না।'

গোলকপতি রসিকতা করে, 'অভয় তোমার তো খুব সাহস। সন্ধ্যে হলে নাকি এ বাড়িতে কেউ ঢোকে না।'

অভয়পদ বিনীত হাস্যে নীরবে প্রশংসাটা হজম করে। তারপর বলে, 'আজ্ঞে চলি এখন।'

সে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। সদর দিয়ে গেল না। গেল খিড়কি পথ দিয়ে। বাড়ির পিছন দিকে।

থামের আড়ালে একটা মোমবাতি জ্বেলে তিনজন চুপচাপ বসে থাকে বারান্দায়। কেন জানি না, কথাবার্তা কইতে ইচ্ছে করে না।

দিনের আলোর শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যায়। মাথার ওপর আকাশে ফুটে ওঠে একটি দুটি করে তারা। হালকা জ্যোৎস্নার রুপোলী আভা স্পষ্ট হয়।

বাড়ির পরিবেশ রীতিমতো ছমছমে হয়ে ওঠে।

অদৃশ্য পায়রাগুলি ঝটপট করে। অন্ধকার চিরে শূন্যে পাক খায় চামচিকেরা। চাঁদের আলো আর বাড়ির নানা অংশের ছায়া জাল বোনে উঠোনে, দেয়ালের গায়ে।

সোঁ সোঁ করে ধেয়ে আসা বাতাস অট্টালিকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। বাড়ির অজস্র ফাটল আর ফাঁক-ফোকরে হাওয়া ঢুকে শব্দ তোলে! মনে হয় যেন গোটা বাড়িখানা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন।

অন্ধকারের আড়াল থেকে কত বিচিত্র আওয়াজ ভেসে আসে।

চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ। তীক্ষ্ণ আওয়াজে তিনজন শিউরে ওঠে সহসা। ঠিক যেন মানবশিশুর কান্না। তারপরই দীপক হেসে বলে, 'শকুনের ছানার ডাক। আমি আগে শুনেছি।'কাছে কোথাও বাসা আছে শকুনের।'

শুধু অনেক অজানা শব্দ নয়, অনেক অদৃশ্য নড়াচড়া টের পায় তারা। স্নায়ু টানটান। সজাগ তাদের চোখ, সতর্ক কান। অস্বস্তি বাড়ে। কেবলই অনুভব করে, অট্টালিকার কোণে কোণে জমাট আঁধার ফুঁড়ে কাদের চোখ যেন লক্ষ্য করছে তাদের।

ওরা উঠে পড়ে। এবার হলঘরে ঢোকে। হ্যারিকেনটা জ্বালে। মোমবাতিটাও জ্বলছে। তবে শিখাটা লাফাচ্ছে বাতাসে। যে কোনও সময়ে দপ্ করে শেষ নিশ্বাস ফেলবে।

রাতের খাওয়া সেরে নেয় দীপকরা। পাঁউরুটি-মাখন আর কলা। জল খায়।

খানিক বাদে গোলকপতি বড় বড় হাই তুলতে লাগল। আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আঃ, ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন রেস্ট হয়নি।'

সে মাদুরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'একটু ঘুমিয়ে নিই। ঘণ্টাখানেক বাদে ডেকে দিও। এখন তো মোটে আটটা। তেনারা তো শুনেছি মাঝরাতের আগে দেখা দেন না।'

ব্যস, গোলকপতি ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমাতে লাগল।

খানিক পরে অলোকনাথও শুয়ে পড়ল গোলকপতির পাশে। হাই তুলে বলল, 'সত্যি খুব টায়ার্ড লাগছে। একটু গড়িয়ে নিই।'

একটু পরে দীপক দেখে অলোকনাথও ঘুমাচ্ছে।

সে ভাবল, বাঃ এরা তো আচ্ছা লোক। ভূত দেখতে এসে পোড়োবাড়িতে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুম মারল। নার্ভ বটে।

দীপকেরও ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। তবে তার রাত জাগা অভ্যেস আছে। খবরের কাগজে অনেক সময় কাজ করতে হয় রাত জেগে। সে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসল খোলা জানলার সামনে। সঙ্গে ফ্লাস্কে চা আছে। মাঝরাতে খাওয়া যাবে আর ভোরবেলা।

হালকা চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে বাইরে ধু-ধু মাঠ, নদীর উঁচু পাড়, কালো কালো ঝোপঝাড় গাছ। ভারি রহস্যময় প্রকৃতি। আকাশে অগুনতি টিপটিপ্ আলো জ্বলা তারা। খট্-খট্-খট্—সেই রকম কাঠে কাঠে ঠোক্কর লাগার শব্দ দোতলায়। যেন কেউ খড়ম পায়ে হাঁটছে।

বড়কর্তার ছবিখানার দিকে তাকাল দীপক। ঘরের স্বল্প আলোয় তাঁর বড় বড় চোখের তীব্র দৃষ্টি যেন লক্ষ্য করছে দীপককে। গা ছমছম করে।

জল তেষ্টা পাচ্ছিল। দীপক উঠে জল খেল কলসি থেকে।

বাতাসে গ্রীষ্ম দিনের গরম ভাপ আর নেই। নদীর দিক থেকে আসা হু-হু হাওয়ায় চমৎকার শীতল ভাব। মোলায়েম স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে গায়ে মুখে। দীপকের ঢুলুনি আসতে থাকে। সে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে।

দীপক চোখ মেলে চমকে খাড়া হয়ে বসল।

মুখে সূর্যের আলো পড়ছে। সে চেয়ারে বসে। ঘাড়ে বেশ ব্যথা।

তার মানে? ভোর হয়ে গেছে! রাত কাবার! সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে গোটা রাত এই চেয়ারেই!

দীপক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে যে গোলকপতি এবং অলোকনাথ মেঝেতে

মাদুরে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দীপক তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের ঠেলা মারে, 'ও মশাই, উঠুন উঠুন। ভোর হয়ে গেছে।'

অলোকনাথ ধড়মড় করে উঠে বসে বলে, 'এ্যাঁ সত্যি তো! ডাকেননি কেন?'

দীপক বলে, 'ডাকব কি? আমিও যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

গোলকপতি উঠতে চায় না। অলোকনাথের রাম ধাক্কা খেয়ে তার নিদ্রাসুখ ঘুচল। উঠে বসে, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গোল গোল চোখে বলল, 'যাঃ, ভূত দেখা মিস্ হয়ে গেল যে। বড়কর্তা হয়তো ঘুরে গেছেন। অতিথিরা ঘুমোচ্ছে দেখে আর ডিসটার্ব করেননি। যাকগে চা দে। দেখি ফ্লাস্কটা।'

কিন্তু ফ্লাস্ক কৈ?

তারপরই আবিষ্কার হলো যে শুধু ফ্লাস্কটা নয়, তাদের ক্যামেরা টেপ-রেকর্ডারও নেই। মেঝেতে তাদের পাশেই রাখা ছিল। সব হাওয়া।

'এ্যাঁ, আমার ঘড়ি?' দীপক নিজের বাঁ হাতের কব্জি দেখে আঁতকায়।

দেখা গেল, বাকি দু'জনেরও রিস্ট-ওয়াচ নেই হাতে।

কে সরাল?

তিনজন বেরোয় তাড়াতাড়ি।

আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকে গোটা বাড়ি। নাঃ কোথাও নেই তাদের জিনিস। বাড়ি যথারীতি জনমানবহীন।

তারা বেরোয় সদর দিয়ে।

ভাঙা পাঁচিলের কাছে এক দল গ্রামের লোক জড়ো হয়েছে সেই ভোরে। বোধহয় আগন্তুকদের খোঁজে বাড়িটায় ঢুকবে কিনা প্ল্যান করছিল। দীপকদের দেখে ছুটে আসে।

দীপকরা তাদের দিকে দৃকপাত না করে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজতে থাকে। তিনজন তিন দিকে।

একটু পরেই দীপকের ডাক শোনা যায়। বাড়ির পিছনে খিড়কির দিক থেকে, 'ও গোলকবাবু, ও অলোকবাবু, এদিকে আসুন। শীগগির।'

গোলকপতি এবং অলোকনাথ ডাক লক্ষ্য করে ছোটে। তাদের পিছু নেয় গাঁয়ের লোক।

বাড়ির খিড়কি-দরজা থেকে সামান্য দূরে একটা দৃশ্য দেখে থমকে যায় সবাই।

সেই অভয়পদ মাটিতে পড়ে আছে। একদম বেহুঁশ। তার কাছে উবু হয়ে বসে দীপক একটা চটের থলি থেকে বের করছে ক্যামেরা। টেপ-রেকর্ডার ও ফ্লাস্কটা রয়েছে পাশে। মাটিতে।

'একি! এ তো আমাদের জিনিসগুলো।' গোলকপতি অলোকনাথ সরবে চেঁচায়।

'হুঁ।' দীপক ঘাড় নেড়ে এবার থলি থেকে বের করে তাদের তিনটি রিস্ট-ওয়াচ।

'এখানে কি করে এল? কে আনল?' উত্তেজিত গোলকপতির প্রশ্ন।

দীপক বলল, 'জানি না তবে মনে হচ্ছে এরই কীর্তি।' দীপক অভয়পদকে দেখায়।

'আরে ঘেঁটু!' কয়েকজন গাঁয়ের লোক অভয়পদকে দেখে অবাক হয়ে বলে ওঠে।

অভয়পদর মুখে চোখে খানিকক্ষণ জলের ঝাপটা দেবার পর সে চোখ মেলে। ফ্যালফ্যালে চাউনি। বসানো হয়

পথ আগলে দাঁড়ায় এক ছায়ামূর্তি।

তাকে। হঠাৎ সে একটা চিৎকার দিয়ে উঠে ছুটে পালাতে যায়। গাঁয়ের লোকেরা তাকে জাপটে ধরে। অভয়পদ বিকৃত কণ্ঠে হাঁউমাউ করতে থাকে। তাকে তখন নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের ভিতর। সে খানিক ধাতস্থ হলে ঘটনাটা জানা যায় একটু একটু করে। পরের সংখ্যা বংগবার্তায় প্রকাশিত দীপকের রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। পাঠক বুঝতে পারবেন আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছিল।

অভয়পদর বাড়ি মোটেই নন্দনপুর নয়। সে থাকে অজয় নদের ওপারে। ও একজন দাগী চোর। অভয়পদ ওর আসল নাম নয়। ওর আসল নাম বংশীবদন। তবে ও ঘেঁটু নামেই পরিচিত।

সেদিন ঘেঁটু নন্দনপুরে গিয়েছিল একটা দরকারে। তখন আমাদের তিনজনকে দেখে। শোনে আমাদের উদ্দেশ্য। ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে নজর করে আমাদের দামী ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ডার, ঘড়ি। অমনি মতলব খেলে যায় তার মাথায়। তখুনি চলে যায় পাশের গ্রামে তার এক স্যাংগাতের বাসায়। সেখান থেকে যোগাড় করে ঘুমের ওষুধ। তারপর ফিরে আসে। সুযোগ মতো অন্যদের চোখ এড়িয়ে রায়বাড়িতে ঢুকে একা আলাপ জমায় আমাদের সংগে। বড়কর্তার ছবি দেখার ছল করে হলঘরে ঢুকে সে কলসিতে আমাদের খাবার জলে মিশিয়ে দেয় ঘুমের ওষুধ....ওই জল খেয়েই আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি....

ঘেঁটু ওরফে অভয়পদ লুকিয়ে ছিল কাছেই। বাইরে একটা গাছে চড়ে নজর রেখেছিল হলঘরের ভিতর।

আমরা ঘুমিয়ে পড়তে সে খিড়কি দিয়ে ঢোকে। আমাদের ক্যামেরা ইত্যাদি দামী জিনিস হস্তগত করে।

ঘেঁটু খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যখন পালাচ্ছে হঠাৎ নাকি দু'হাত মেলে তার পথ আগলে দাঁড়ায় মিশকালো এক বিশাল ছায়ামূর্তি। চাপা রক্তহিম করা গলায় সে হুংকার দেয়, 'এই ব্যাটা।'

ঘেঁটু কাঠ হয়ে যায় ভয়ে।

ছায়া দানব ঘড়ঘড়ে চাপা কণ্ঠে গর্জায়, 'রায়বাড়িতে চুরি করে পালাবি? কি ভেবেছিস? কেন, ভৈরব সর্দার কি নেই? শয়তান –'

বলতে বলতেই সেই ছায়ামূর্তি নাকি এক হাত বাড়িয়ে বরফ শীতল বজ্রকঠিন মুঠিতে ঘেঁটুর চুলের গোছা পাকড়ে তুলে তাকে আছড়ে ফেলে দেয় মাটিতে। ঘেঁটু তখুনি জ্ঞান হারায়.....

নন্দনপুরের লোকেদের কাছে জানা গেছে যে ভৈরব সর্দার ছিল রায়বাড়ির এক দুর্ধর্ষ লেঠেল। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে সেই কলেরার মড়কে ভৈরবও মারা যায়।

ঘেঁটু এখনো সারেনি। মাঝে মাঝে পাগলের মতো করছে। চেঁচিয়ে উঠছে আতংকে। অন্ধকারে কিছুতেই একা থাকতে চায় না। ডাক্তার বলেছে, ওর নার্ভে প্রচন্ড শক্ লেগেছে। হয়তো ও সুস্থ হবে। তবে সময় লাগবে।

ঘেঁটুকে চুরির দায়ে আর পুলিশে দেওয়া হয়নি। কারণ এযাত্রা তার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।

ছবি: রাহুল মজুমদার

নিউ বেঙ্গলের অভিজাত অভিধান
আবার পাওয়া যাচ্ছে
Subal Chandra Mitra's
Dictionaries for Students and Teachers
An ideal book for learning and writinggood English
The Student's Constant Companion Price Rs. 80.00
Pocket Bengali to English Dictionary
সরল বাংলা অভিধান মূল্য— টাঃ ২৪০·০০
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

খনি-রহস্য

সংকর্ষণ রায়

গিরিডি থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে খড়গদিহাতে ক্যাম্প করে তেজস্ক্রিয় খনিজের খোঁজ নিচ্ছি। খড়গদিহা কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে ঘুরছি, নদী-নালা-পাহাড়-জংগল পরিক্রমা করছি। তখন ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাস।

একদিন সকালে ক্যাম্প থেকে বেরোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় গিরিডি থেকে সমীর সামন্ত তার জিপে করে এসে হাজির হলো। সমীর আমার কলেজের বন্ধু। গিরিডিতে তার

বাবার অভ্রের কারবার আছে। এম. এস-সি পাশ করে সে এই কারবারের কাজে তার বাবাকে সাহায্য করছে।

আমার 'কাবুল-পাল' তাঁবুর মধ্যে ঢুকেই সমীর বললে, আমার সংগে গিরিডি যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও। ওখানে সপ্তাহখানেক থাকতে হবে তোমাকে।

কেন, কি ব্যাপার? আমি প্রশ্ন করি।

খুবই জরুরি ব্যাপার। গতকাল থেকে আমার বাবা নিরুদ্দেশ। তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে।

নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে খুঁজে বের করা তো পুলিশের কাজ। পুলিশে খবর দাও গিয়ে....

না। আমার আন্তরিক বিশ্বাস তুমি ও আমি দুজনে মিলে বাবাকে খুঁজে বের করতে পারব, পুলিশের সাহায্য নেওয়ার কোনো দরকারই নেই।

কিন্তু আমার এখানকার কাজের কি হবে?

তোমার কাজ তো খনিজ খুঁজে বের করা। আমার নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে খনিজ খোঁজার কাজ তোমার চলতেই থাকবে। তোমার কর্তৃপক্ষকে তুমি জানিয়ে দাও যে সপ্তাহখানেক তুমি গিরিডি শহর কেন্দ্র করে তোমার কাজ চালাবে।

সমীরের মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, তুমি বলতে চাও যে তোমার নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার খনিজ খোঁজার কাজ চলতেই থাকবে!

সমীর বললে, নিশ্চয়ই। কারণ আমার বাবা খনিজ ও খনির ধান্দাতেই নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার আগে এই চিঠি রেখে গিয়েছেন তিনি....

বলে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিল সমীর।

সমীরকে সম্বোধন করে তার বাবা সুখময় লিখেছেন, আমার মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু ডক্টর অধীর দের সংগে একটা খনির খোঁজে বেরোলাম। অভ্রের খনি ও কারখানার কাজকর্ম তো তুমি ভালোভাবেই দেখাশুনা করছ, কাজেই কিছুদিনের জন্য আমাদের কারবার থেকে ছুটি নিচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানাব না, শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে গিরিডি থেকে বেশি দূরে যাব না। আমার ইচ্ছে, খনিটাকে খুঁজে বের করে চালু করে দিয়ে তোমাদের সারপ্রাইজ দেব....

চিঠিটা পড়ে আমি বললাম, মনে হচ্ছে গিরিডির কাছাকাছি কোনো একটা পরিত্যক্ত খনি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন ডক্টর দে এবং তোমার বাবা। খনিটাকে খুঁজে বের করতে

পারলেই তোমার বাবাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, তাই না?

ঠিক তাই। সমীর বললে, তাই তোমাকে বলছিলাম যে বাবাকে খুঁজে বের করা তোমার মিনারেল এক্সপ্লোরেশনেরই আওতায় আসবে। শুধু এইটুকু মনে রেখো যে খনিটা যা কিছুরই হোক না কেন, অভ্রের নয়। একটানা ত্রিশ বছর ধরে অভ্রের খনি ও কারবার চালিয়ে বাবার অভ্রে অরুচি ধরে গিয়েছে। আমার ধারণা, গিরিডির কাছাকাছি ডক্টর দে একটা ধাতুর খনির খোঁজ পেয়েছেন। তারই পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন বোধহয় তাঁরা....

পুনরুদ্ধার করেই তো তোমাদের সারপ্রাইজ দেবেন। অর্থাৎ কাজ শেষ করেই ফিরে আসবেন। কাজেই তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার তো কিছু নেই। তাছাড়া তাঁর বন্ধু ডক্টর দে আছেন তাঁর সঙ্গে....

আমি নয়, আমার মা খুবই উদ্বিগ্ন। ডক্টর দের পরামর্শমতো এক লক্ষ টাকা সঙ্গে নিয়েছেন বাবা। মা মনে করেন যে এতগুলো টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করা এ অঞ্চলে একটুও নিরাপদ নয়....

আমিও তাই মনে করি। এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনো দরকার ছিল বলে মনে হচ্ছে না। খনি চালু করার পর গিরিডিতে এসে প্রয়োজন মতো টাকা তুলে নেওয়া যেত।

ডক্টর দের পরামর্শমতোই টাকাটা সঙ্গে নিয়েছিলেন বাবা। ডক্টর দে বোধহয় তাঁকে বুঝিয়েছেন যে পরিত্যক্ত খনিটাকে চালু করতে প্রথমেই এক লাখ টাকা লাগবে।

ডক্টর দে মানুষটি কি রকম জানো?

বাবা তো তাঁকে খুবই ভালো মানুষ বলে মনে করেন। তাঁর বিশেষ বন্ধু, উপরন্তু বিশিষ্ট খনিবিজ্ঞানী....

তাঁর বাড়ি তো গিরিডিতেই, তাই না?

হ্যাঁ। বাড়ির সঙ্গে ল্যাবোরেটোরি আছে। এ বাড়িতে তিনি অবশ্য একাই থাকেন। তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় আছেন।

গিরিডিতে এসে সমীর ও আমি তার বাবার কাগজপত্র ঘেঁটে খনিটার সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করি। কাগজপত্রের অধিকাংশই অভ্রের খনি ও কারবার সংক্রান্ত। তাদের মধ্যে কোথাও অন্য কোনো খনির হদিস নেই।

খনির হদিস না থাকলেও প্রায় পঞ্চাশটি পাথরের নমুনার একটি টাইপ করা তালিকার কার্বন-কপি দেখতে পেলাম। তার সঙ্গে ডক্টর দে'কে লেখা একটা চিঠির কপিও আছে। চিঠিতে সুখময় সামন্ত লিখছেন, সিংজী নমুনাগুলো পাঠিয়েছেন। আপনি তাড়াতাড়ি এ্যানালিসিস করে ফেলুন।

ডক্টর দে যে নমুনাগুলো পাওয়ামাত্র এ্যানালিসিস করে ফেলেছিলেন তা তাঁর লেখা একটা চিঠি থেকে বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন, ফলাফল বিস্ময়কর, পত্রপাঠ চলে আসুন আমার ল্যাবোরেটোরিতে....

কেমিক্যাল এ্যানালিসিসের বিস্ময়কর ফলাফলই বোধহয় সুখময় সামন্ত ও অধীর দেকে ঘরছাড়া করেছে। অধীর দের বাড়ির গ্যারেজে স্টেশন ওয়াগনটা নেই, কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐ স্টেশন ওয়াগনে করেই খনির খোঁজে বেরিয়েছেন তাঁরা।

সুখময় সামন্তর কাগজপত্রের মধ্যে কেমিক্যাল এ্যানালিসিসের ফলাফল কোথাও লেখা নেই, কাজেই তাঁর কাগজপত্র ঘেঁটে কিসের খনি বোঝার উপায় নেই।

হঠাৎ আমার মনে হলো, সুখময়ের কাগজপত্রে যা নেই অধীর দের ল্যাবোরেটোরিতে তার হদিস পাওয়া যেতে পারে।

অধীর দের ল্যাবোরেটোরিটা কোথায় বলতে পার? অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

তাঁর বাড়ির সঙ্গে একটা গুদোমঘরের মতো ঘর আছে, ঐটেই তাঁর ল্যাবোরেটোরি। সমীর জবাব দিল।

চল, তাঁর ল্যাবোরেটোরিতে যাই। হয়তো ওখানেই খনিটার কোনো রকম হদিস পাওয়া যেতে পারে....

কিন্তু ল্যাবোরেটোরিতে ঢুকব কী করে আমরা! তাঁর বাড়িতে লোকজন কেউই নেই....

সোজাসুজি ঢুকতে না পারলে চোরের মতো সিঁদ কাটব। গেটের তালা ভাঙতেও পারি....

সেদিনই সমীর ও আমি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অধীর দের ল্যাবোরেটোরিতে গিয়ে হাজির হলাম।

ল্যাবোরেটোরির দরজা বড়ো একটা তালা দিয়ে বন্ধ। চারদিকে ঘন ঘাসের জঙ্গল। এদিকে বোধহয় কখনো মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে না, ডক্টর দে ছাড়া কেউই হয়তো আসে না এখানে। ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে ল্যাবোরেটোরির গেটের সামনে এসে দাঁড়াই। গেটে লাগানো প্রকাণ্ড বড় তালাটিকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারি যে তা ভাঙা কঠিন। অগত্যা দেয়াল বেয়ে উঠে গেলাম আমরা ল্যাবোরেটোরির ছাতের ওপরে। টালির ছাত। তার একটা অংশ আইভি লতার ঝোপের আড়ালে চাপা পড়ে আছে। হামাগুড়ি দিয়ে এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে চটপট কয়েকটা টালি সরিয়ে ফেললাম আমরা।

টালি সরাতেই কড়ি-বরগার ফাঁকে চৌকো গহ্বর চোখে পড়ল। অন্ধকার হলেও গহ্বরের আয়তনের মোটামুটি আভাস পাই। আমাদের শরীরের অনুপাতে বড়ো বলেই মনে হচ্ছে। গলে যেতে অসুবিধে হবে না।

মেঝে থেকে অস্ফুট আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই আলোতে কতখানি নামলে পরে মেঝের নাগাল পাব তা বুঝতে পারি। মনে হলো, আট-দশ ফুটের বেশি নামতে হবে না। কাজেই লাফিয়ে পড়ি নিশ্চিন্ত মনে।

দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচ টিপে আলো জ্বালাই। ডেস্কের ওপরে নানারকম সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ছাড়া পোর্সেলিনের পাত্রে সাজানো কয়েকটি মাটি ও পাথরের নমুনা দেখতে পাই। গ্র্যানিট এবং গ্র্যানিটের গুঁড়ো বলে সনাক্ত করি নমুনাগুলিকে। গুঁড়িয়ে যাওয়া দানাগুলির মধ্যে কোয়ার্টজ (Quartz) ও ফেল্‌স্পার (Felspar) চোখে পড়ল। তাছাড়া আছে ইলমেনাইট (Ilmenite) ও গারনেট (Garnet)। গাঢ় লাল রঙের গারনেট-এর দানাগুলি আমাদের চোখে চমক লাগায়। এরকম গারনেট গত বছর পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে নুরুংগো গ্রামে দেখেছিলাম আমরা। এই সব নমুনা ওখানে থেকেই আনা হয়েছে বলে মনে হলো।

ছোট আকারের এই গারনেট-এর দানাগুলি কোনো কাজে

কয়েকটি নমুনা তুলে নিয়ে

লাগবে বলে মনে হয় না। গারনেট-এর সঙ্গে হয়তো কোনো মূল্যবান খনিজের সম্ভাবনা রয়েছে। যা আছে তা হয়তো অদৃশ্যভাবে রয়েছে–তাকে চিনে নিতে হবে কেমিক্যাল এ্যানালিসিস করে।

নমুনাগুলো পরীক্ষা করতে করতে আমাদের দুজনেরই মনে হলো হয়তো নুরুংগোতেই খনি পত্তনে উদ্যোগী হয়েছেন সুখময় সামন্ত ও অধীর দে। আমরা ঠিক করলাম পরদিন সকালেই যাব ওখানে।

নুরুংগো যাবার আগে গিরিডির একজন বৃদ্ধ ভূতাত্ত্বিকের কাছে শুনলাম যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নুরুংগোতে ওট্স্ নামে একজন ইংরেজ টিন-এর খনি গড়ে তুলেছিলেন। প্রচুর পরিমাণে টিন-যুক্ত ক্যাসিটেরাইট (Cassiterite) খনন করে বের করেছিলেন তিনি। মাটির নিচে দু তিনশো ফুট গভীর পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন, তার থেকেই আন্দাজ করা যায় যে টিনযুক্ত ক্যাসিটেরাইট-এর বিপুল ভাণ্ডার ছিল নুরুংগোর মাটির তলায়।

পরদিন খুব ভোরে নুরুংগোতে পৌঁছে ওট্স্-এর পরিত্যক্ত খনির পাশে খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন দেখতে পাই। নুরুংগো গ্রামের সত্তর বছরের বুড়ো মুখিয়া গুলাব সিংয়ের কাছে শুনলাম যে, দুজন বাঙ্গালীবাবু এখানে নতুন টিন-এর খাদান করতে উদ্যোগী হয়েছেন। গুলাব সিং বাঙ্গালীবাবু দুটির চেহারার যে বর্ণনা দিলে তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তাঁরা অধীর দে ও সুখময় সামন্ত ছাড়া আর কেউ নন।

গুলাব সিং বললে, বাঙ্গালীবাবু দুজন অবশ্য এখানে থাকেন না–তাঁরা আছেন বনবিভাগের বাংলোতে। একটু বেলা হলে আসবেন। এখানে খাদানের কাজ শুরু হলে তার দায়িত্ব বাবুরা আমাকেই দেবেন....

দায়িত্ব আমরাও নিতে পারি। আমি বললাম, আমার সঙ্গের এই বাবুটি এই খাদানের যিনি আসল মালিক, তাঁরই ছেলে–আমি ওর বন্ধু।

সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু এতজন মিলে দায়িত্ব নেবার কোনো দরকার হবে না, যা করার সব আমিই করব। ওট্স্ সাহেবের খাদানের কাজও আমি করিয়েছি আমার লোকেদের দিয়ে–ওট্স্ সাহেব বেঁচে থাকলে জানতে পারতেন যে আমার কাজে কোনো খুঁত ছিল না।

তোমার কাজে যে কোনো খুঁত ছিল না তা তো এই সব খোঁড়াখুঁড়ি দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা কথা, ওট্স্ সাহেব তাঁর খনিটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন?

মাল পাওয়া যাচ্ছিল না বলেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ওট্স্ সাহেবের খনির পাশেই তোমরা খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছ–এখানে কী মাল পাওয়ার আশা রাখ?

প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে যায় গুলাব সিং। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঢোক গিলে সে বললে, আশা রাখা, না-রাখা তো বাবুদের ব্যাপার, আশা রাখেন বলেই তাঁরা খোঁড়াখুঁড়ি করাচ্ছেন....

আমি বললাম, তোমার খাদান আমরা একটু পরীক্ষা করব গুলাব সিং....

বলে গুলাব সিং কিছু বলার আগেই সমীর ও আমি নেমে পড়লাম খাদের মধ্যে।

ক্ষয়ে যাওয়া গ্র্যানিট এবং মাইকা-সিস্টের (mica-schist) স্তরকে কেটে খাদটি কয়েকটি এবড়ো-খেবড়ো গহ্বর সৃষ্টি করেছে। মাইকা-সিস্ট-এর মধ্যে ঝলমল করছে রক্তের মতো লাল রঙের গারনেট। এই গারনেট-এর নমুনা দেখেছি অধীর দের ল্যাবোরেটারির মধ্যে।

খুব দ্রুত কয়েকটি গ্র্যানিট ও মাইকা-সিস্ট-এর নমুনা তুলে নিয়ে ছোট ছোট পলিথিনের ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলি। মৃদু আপত্তি জানায় গুলাব সিং–কিন্তু তাতে আমরা কর্ণপাতও করি না।

তারপর জিপে করে ফিরে আসি গিরিডিতে।

চাঁদমল রাজগেরিয়ার একটি ল্যাবোরেটারি আছে গিরিডিতে। নুরুংগোর খনি এবং ডক্টর দের ল্যাবোরেটারি থেকে তুলে আনা নমুনাগুলি সেখানে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করা হলো। টাইটেনিয়াম (Titanium) ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর লক্ষণ দেখা যায় না তাদের মধ্যে। টিনও নেই। নুরুংগোর খনিটা টিনের খনি নামে পরিচিত হলেও পাথরের নমুনাগুলোর মধ্যে টিন নেই।

টিনহীন টিনের খনি!–সমীর উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ডক্টর

দের ল্যাবোরেটারির নমুনাগুলোর মধ্যেও টিন নেই ! নুরুংগোর ঐ খনিটা তাহলে কিসের খনি ?

টিনেরই খনি। আমি বললাম, গুলাব সিং বলছিল না যে মাল, অর্থাৎ টিন শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই খনি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে টিন নেই জেনেও কেন ডক্টর দে তোমার বাবাকে দিয়ে খনিটাকে আবার চালু করার চেষ্টা করছেন ?

বাবার টাকার লোভে। সমীর জবাব দিল, ডক্টর দের নির্দেশ মতো তো বাবা এক লাখ টাকা নিয়ে গিয়েছেন তাঁর সংগে, ঐ খনিতে কাজের ভান করে, টাকাটা তিনি আত্মসাৎ করতে চান ! আর দেরি নয়, এখনই চল, বাবাকে ঐ প্রতারকের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে....

সমীর তাদের দারোয়ানদের মধ্যে থেকে দুজন লাঠিয়াল পালোয়ানকে বেছে নিয়ে তার জিপে তুলে নেয়। তারপর নুরুংগোর দিকে যাত্রা।

ডুমরির সড়ক ছেড়ে নুরুংগোর বনপথ ধরে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখি যে বিপরীত দিক থেকে একটি স্টেশন ওয়াগন আসছে। তার চালকের আসনে ডক্টর অধীর দে। আর কেউ নেই তাতে।

একা একা কোথায় চললেন ডক্টর দে ? সমীর বললে। বাবাকে নুরুংগোতে ফেলে রেখে পালাচ্ছেন না তো ! হাত তুলে গাড়ি থামাবার জন্য ইশারা কর....

কিন্তু আমার হাত তোলায় কোনো ফল হয় না। জিপের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে স্টেশন ওয়াগনটি।

তখন সমীর তার জিপটাকে স্টেশন ওয়াগনটার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। সংগে সংগে ব্রেক কষে স্টেশন ওয়াগনটিকে থামিয়ে দেন ডক্টর দে। সমীরের মুখের ওপরে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, ব্যাপার কি ? মনে হচ্ছে মারাত্মকরকম দুর্ঘটনা ঘটাতে চাইছ !

দুর্ঘটনা তো আপনিই ঘটাতে চাইছেন ডক্টর দে। সমীর বললে, আমার বন্ধু হাত তুলে ইশারা করা সত্ত্বেও গাড়ি থামাচ্ছেন না !

তোমাদের ইশারায় আমি গাড়ি থামাতে বাধ্য নই। জরুরী কাজ আছে....

জরুরী কাজ আছে না বাবাকে ফেলে রেখে তাঁর লাখ টাকা নিয়ে পালাচ্ছেন !

কি বললে ! চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর দে। তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ! জানো তোমার থোঁতা মুখ আমি....

সমীরের চোখের ইশারায় ভোজপুরী দারোয়ান দুজন ডক্টর দেকে জাপটে ধরতে তাঁর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়।

ওঁকে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে তোলো তোমরা ! সমীর হুকুম দিল, দুজনে দুপাশে দুহাত ধরে বসে থাকো। পালাতে দিয়ো না....

আমাকে জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে ! চিৎকার করে যেতে থাকেন ডক্টর দে। কিডন্যাপার....কে কোথায় আছ, বাঁচাও আমাকে....

চুপ ! ধমক দিয়ে উঠল সমীর। মুখ খুলেছেন কি মুখে কাপড় গুঁজে দেব....

বলতে বলতে স্টেশন ওয়াগনের চালকের আসনে বসল সমীর। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে, জিপটা তুমিই চালাও....চল নুরুংগো....

নুরুংগোর খনির পুরনো একটি শ্যাফ্টের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সুখময় সামন্ত। তাঁর সামনে মাথায় পাগড়ি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল গুলাব সিং। আমরা সেখানে পৌঁছতেই সে বললে, এই যে আপনারা এসে গিয়েছেন ! বড় সাহেবও ফিরে এসেছেন ! এখন আপনারা পরামর্শ করে কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলুন....

কাজের প্রোগ্রাম তো আমিই ঠিক করে রেখেছি ! ডক্টর দে ঝাঁজালো স্বরে বললেন, কাজ চালু করার জন্য যন্ত্রপাতি কিনতে যাচ্ছিলাম কলকাতায়। এরা আমাকে ধরে বেঁধে ফিরিয়ে নিয়ে এল !

বলো কি ! সুখময়ের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। সমীর, ব্যাপার কি তোমাদের ! ডক্টর দের মতো মান্যগণ্য মানুষের সংগে এমনি ব্যবহার করছ ! জানো, কত বড় একটা কাজ করতে যাচ্ছেন তিনি ! নুরুংগো টিন মাইন্স্টাকে পুনরুদ্ধার করবেন, তার জন্য মাইনিং মেশিনারি কিনে আনতে যাচ্ছিলেন....

কাকে পুনরুদ্ধার করবেন ডক্টর দে ! আমি বললাম, উদ্ধার করার মতো কিছু কি অবশিষ্ট আছে ! নিঃশেষে সব টিন তুলে নেওয়ার পরই খনি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। খনির মধ্যে কোথাও টিনের ছিটেফোঁটারও লক্ষণ দেখা যায় না। ডক্টর দে নিজে খনি থেকে অনেক নমুনা তুলে নিয়ে এসেছিলেন, গুলাব সিংয়ের সাহায্যে আপনিও পঞ্চাশটি পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন, সেগুলোর রাসায়নিক পরীক্ষা করে ডক্টর দে বিন্দুমাত্রও টিনের অস্তিত্বের আভাস পাননি ! সেই সব নমুনা এবং আমাদের সংগ্রহ করা নমুনা পরীক্ষা করে আমরাও টিনের কোনো চিহ্ন দেখতে পাইনি। কাজেই এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে এই খনি পুনরুদ্ধারের নাম করে ডক্টর দে আপনার কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ করতে চাইছিলেন। বোধহয় বেশ কিছু টাকা নিয়ে যন্ত্রপাতি কিনতে যাচ্ছিলেন, তাই না ?

দেখতে দেখতে কঠোর হয়ে ওঠে সুখময় সামন্তর মুখের ভাব। ডক্টর দের মুখের ওপরে অগ্নিদৃষ্টি হেনে চলতে শুরু করলেন তিনি তাঁর জিপের দিকে।

আমাকে মাপ করো ভাই ! অধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন অধীর দে। আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি তোমার অভ্রের খনিতে কাজ করে করব।

তার মানে ! থমকে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে তাকালেন সুখময় ডক্টর দের মুখের পানে।

তোমার অভ্রের খনিতে তো অনেক সমস্যা। সেই সব সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব আমি।

সাময়িকভাবে দুঃখময় হলেও আবার সুখময় হয়ে উঠলেন সুখময় সামন্ত। ফিরে এসে ডক্টর দের হাত ধরে বললেন, চলো এখন গিরিডি ফিরে যাই....

ছবি : সুফি

মুম্‌বা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

হল্‌কা তুলে তীর বেগে বয়ে যাচ্ছিল গরম হাওয়া। সারা মরুভূমি জুড়ে তৈরি হচ্ছিল তপ্ত বালুর ঘূর্ণি। মাথার ওপর জ্বলছিল ভর দুপুরের গনগনে সূর্যটা।

চল্লিশটা লোক মাথা নিচু করে চলেছিল বালি ভেঙে ভেঙে। গায়ে তাদের প্রায় কোনো আচ্ছাদনই ছিল না। ঝলসানো মাংসের মতো ঝলসে যাচ্ছিল পিঠের চামড়া। প্রত্যেকের গলায় ধাতুর গলাবন্ধ। একটা লোহার শেকলে প্রতিটি গলাবন্ধ বাঁধা পড়েছে। ওরা ক্রীতদাস। ওদের ঘিরে নিয়ে চলেছে সশস্ত্র দশজন মানুষ। একটু তফাতে একসারি উট পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে ঢিমে তালে।

চল্লিশ জন ক্রীতদাসের সঙ্গে দুটি বছর বারো বয়েসের ছেলেও হাঁটছে। ঠা ঠা রোদ্দুরের তাপে কাঠ হয়ে গেছে ওদের গলা।

একটি ছেলে ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠল, একটু জল।

পাশের একটি লোক জলের নামে জিভ বুলিয়ে নিল ঠোঁটে। থুতুটুকুও মুখে আর অবশিষ্ট নেই। সে ভাঙা গলায় বলল, ছাতি ফেটে গেলেও এরা জল দেবে না এক ফোঁটা। সেই ডেরায় পৌঁছে খাবারের সঙ্গে দু'ঢোক জল পাবি।

আবার জিজ্ঞেস করে ছেলেটা, আর কতদূর যেতে হবে চাচা?

লোকটি বলে, আমাদের শুধু চলতে হয়রে বেটা। দূরে কাছে বলে কিছু নেই। আমাদের থেমে যাওয়া মানেই মরে যাওয়া।

অন্য ছেলেটি সবকিছু দেখে আর শোনে, কোনো কথা বলে না। কদিন আগেই তাকে একটা নদীর ধার থেকে ধরে এনেছে দালালরা। ও মাছ ধরার জন্য জলে নেমেছিল, তিনটে ঘোড়সওয়ার হঠাৎ এসে ওকে ঘিরে ধরল। ও ডুব দিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে একবার মাথা তুলতেই ওরা চিৎকার করে উঠল, উঠে আয় বেটা, নইলে

কুমীরের পেটে চলে যাবি। বেশি ফট্টাই করিস তো তীর গেঁথে দেব চোখে।

মুমবা শেষ পর্যন্ত কুমীরের ভয়েই উঠে এসেছিল। তারপর থেকেই শুরু হলো পথ চলা। পরিচিত হাটমাঠঘাট পড়ে রইল পেছনে। পরিচিত মুখগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। একটা ডেরায় পৌঁছে ও দেখতে পেল এই মানুষগুলোকে। প্রত্যেকে বাঁধা পড়ে আছে একটিমাত্র লোহার শেকলে। তারই মতো আর একটি ছেলে বসেছিল মনমরা হয়ে। মুমবা যেতেই দুজনার গলায় পেতলের

এ কথারও কোনো জবাব দেয়নি মুমবা। সে মাথা নিচু করে গিলে যাচ্ছিল যব আর গমের মণ্ড।

আজও সে জলের জন্য গন্নার মতো বায়না ধরেনি। বুক ফেটে গেলেও মুখ ফোটেনি মুমবার।

সূর্য অস্তে চলেছে এখন। পশ্চিমের আকাশটা দগদগে আঙরার মতো ঝলসাচ্ছে। বুকফাটা রোদে সারাদিনের দগ্ধ মানুষগুলো ক্লান্ত শরীরগুলোকে এখন কোনো রকমে টেনে নিয়ে চলেছে। ঠিক যেন একপাল

পাহাড়ের কোলে লম্বা টানা কয়েকটা গুহার আশ্রয়। একটা মশাল জ্বলে উঠল। তার কাঁপা কাঁপা আলোয় গুহার মুখগুলো দেখা গেল। ভেতরে চাপ চাপ অন্ধকার বসেছিল গুড়ি মেরে। পাহারাদারগুলো তারই ভেতর ভাগ করে ঢুকিয়ে দিলে ক্রীতদাসগুলোকে।

গলায় শেকল বাঁধা অবস্থায় সারাদিনের ক্লান্তির পর গুহার মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল ওরা।

গলাবন্ধ পরান হলো। তারপর একই শেকলে বাঁধা পড়ল দুটি গলাবন্ধ।

এরপর চলা, শুধুই চলা। নদীর জল, মাঠের সবুজ পেরিয়ে ওরা ঢুকল মরুভূমির বালুরাশির মধ্যে। দুটো ভয়ংকর দিন পার করে ওরা এখন এসে পৌঁছেছে তৃতীয় দিনটিতে। আজ সন্ধ্যার মুখে নাকি গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে ওরা।

সবাই নানাভাবে তাদের কষ্টের কথা প্রচার করছিল, কিন্তু ওদের ভেতর একজনমাত্র পথ চলছিল নীরবে। সে মুমবা। গতদিন সন্ধ্যায় খাবার সময় সে তার ভাগের জলের অর্ধেকটাই দিয়ে দিয়েছিল সঙ্গী গন্নাকে। যে পাহারাদারটা খাবার দিচ্ছিল সে ঐ দৃশ্য দেখে হৈ হৈ করে উঠেছিল, ব্যাটা খয়রাতি করছিস, মরবি যে রে!

জানোয়ার মুখ নিচু করে চার পায়ে বালি আঁচড়ে আঁচড়ে এগিয়ে চলেছে রাতের আস্তানার দিকে।

হঠাৎ উটচালকদের সমবেত গলায় একটা শব্দ উঠল, কালাপা-হা-ড়, কালাপা-হা-ড়।

ক্রীতদাসের দলটা থেমে গেল। তারা এতক্ষণে মুখে তুলে তাকাল দিগন্তের দিকে।

আশ্চর্য! পশ্চিম আকাশের লাল পটভূমির বুকে জেগে উঠেছে তিনটে কালো কালো পাহাড়। যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য মুহূর্তে বসিয়ে দিয়েছে ঐ পাহাড়গুলো।

সূর্যের লাল রঙ মুছে যাবার পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঢেকে ফেলল পাহাড় তিনটেকে। আর সেই অন্ধকারের ভেতর কাঁকর ছড়ানো পথের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এসে পৌঁছল পুরো দলটা।

ক্রীতদাসদের খাবার তৈরির নিয়ম নেই। উটচালকরাই খাবার তৈরি করল। তারাই মৃতপ্রায় মানুষগুলোকে ঠেলে তুলে পরিবেশন করল রাতের খাবার।

ভোর হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কাজ। সমস্ত শেকল খুলে ফেলা হলো। এক একজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় চারজন করে শ্রমিক এগিয়ে চলল। সামনের কালো পাহাড়টার কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। আশ্চর্য এই পাহাড়গুলো! কালোর গায়ে খাঁজ বেয়ে যেন গড়িয়ে পড়েছে সাদা বরফের ধারা। আসলে কিন্তু ওগুলো বরফ নয়, শ্বেত পাথরের রেখা। ওগুলোর ওপর সোনালী সূর্যের আলো এসে পড়েছিল।

কাজ শুরু হয়ে গেল ঐ শ্বেত পাথরগুলোর ওপরেই। ওগুলো ফাটিয়ে

কেটে জড়ো করতে হবে। ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে মূল্যবান সোনা।

সমানে গাঁইতির ঘা পড়তে লাগল পাথরের গায়ে। ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে লাগল শ্বেত পাথরের চাঙড়।

কিন্তু কোনো কোনো খাঁজ যখন ভেতর দিকে গভীর আর দু'পাশে সংকীর্ণ হয়ে এলো তখন তার ভেতরে ঢোকানো হলো মুম্‌বা আর গন্‌নাকে। ওরা সেই সংকীর্ণ জায়গায় গুড়িসুড়ি মেরে বসে পাথর ভাঙতে লাগল।

দুজনে ঢুকেছিল দুটো খাঁজে। দিনের শেষে দেখা গেল মুম্‌বার সঞ্চয় গন্‌নার দ্বিগুণে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, তার ঢিবিটা শক্ত-সমর্থ অনেক ক্রীতদাসের ঢিবিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

পাহাড়ের ইজারাদার দুদিন নজর রাখল মুম্‌বার ওপর। পাহারাদারদের চাবুক খেল প্রায় সবাই, কিন্তু বাদ পড়ে গেল মুম্‌বা।

দ্বিতীয় দিন কাজের শেষে মুম্‌বার ডাক এলো ইজারাদারের তাঁবু থেকে। পায়ে পায়ে মুম্‌বা ইজারাদারের তাঁবুর ভেতর ঢুকে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

মুম্‌বাকে আগাপাশতলা ভাল করে একবার দেখে নিয়ে ইজারাদার বলল, ঘরে কে আছে তোর?

ভয়ার্ত চোখে ইজারাদারের দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে মুম্‌বা আবার মাথা নিচু করে অনুচ্চ গলায় বলল, মা।

বাপ কি মরেটরে গেছে নাকি রে?

ধরে নিয়ে গেছে।

কে?

রাজার লোক। অনেকগুলো ঘোড়সওয়ার চারদিক থেকে বাবাকে ঘিরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ধরে নিয়ে গেছে।

কেন? এতগুলো ঘোড়সওয়ারের কি দরকার ছিল?

বাবার গায়ে খুব জোর ছিল। বাবা অনেকদিন খনিতে কাজ করেছিল। তারপর একদিন পালিয়ে আসে।

ইজারাদার তেড়ে বলল, খুব খারাপ কাজ করেছে। তুইও বাপের মতো পালাবার মতলব ভাঁজছিস নাকি?

মুম্‌বা ভয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করল, সে বাপের মতো পালাবে না।

কি করত তোর ঠাকুদ্দা?

মুম্‌বা অমনি বলে উঠল, ঠাকুদ্দা পালায়নি। ঠাকুদ্দাকে তার মালিক অনেকদিন কাজ করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল।

ছেড়ে দিয়েছিল! কেন রে? মালিক তো তার কেনা গোলামকে ছেড়ে দেয় না।

আমার ঠাকুদ্দা মালিকের হুকুমে পাহাড় ভেঙে মাঠ করছিল। হঠাৎ একটা পাথর গড়িয়ে পড়লে পা ভেঙে যায়। মালিক তাই খোঁড়া মানুষটাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

তাই বল, খোঁড়া বলে আর ঝক্কি পোহাতে চায়নি।

মুম্‌বা বলল, আমার ঠাকুদ্দা খুব ভাল কাজ করত। তাই দেশে চলে আসার সময় মালিক তাকে এক থলে দিনার দিয়ে বলেছিল, দেশে গিয়ে জমি জিরাত কিনে সংসার করগে যা।

ইজারাদার বলল, তুই যেন আবার তোর ঠাকুদ্দার মতো হাত পা গুঁড়িয়ে না ফেলিস। এখন যা। হ্যাঁ শোন, নিজের খাবার আর জলের ভাগ মরে গেলেও অন্য কাউকে দিবি না।

মুম্‌বা মাথা নিচু করে ইজারাদারের তাঁবু থেকে একটা পাহারাদারের সঙ্গে তার গুহার দিকে চলে গেল।

তাঁবুর এককোণে বসেছিল উটচালকদের বুড়ো সর্দার। তার দিকে তাকিয়ে ইজারাদার বলল, কি বুঝলে হে? ছোঁড়াটাকে দেখে কি মনে হয়?

বুড়ো বলে উঠল, আসলি 'কোরুউ' মালিক।

কি করে বুঝলে?

তিন পুরুষ ওরা ক্রীতদাসের কাজ করছে, ওদের রক্তে গোলামি। তাছাড়া পথ চলার সময় ওর সহ্যশক্তি দেখে আমি অবাক হয়েছি। কথা বলেনি, আগুন বৃষ্টির ভেতর দিয়ে সারা পথ সকলের আগে আগে হেঁটে এসেছে। ঐটুকু ভাগের জলের কিছুটা আবার ও তার পাশের ছেলেটাকে বিলিয়ে দিয়েছে।

তুমি ঠিকই বলেছ, ও 'কোরুউ' ক্রীতদাস।

উটচালক বলল, বংশ বংশ ক্রীতদাসের কাজ করেছে যারা, তারা মুখ বুজে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। গাধার মতো কষ্টসহিষ্ণু আর ভারবাহী জীব এরা মালিক।

ইজারাদার বলল, তোমার কথায় আমার বিশ্বাসটা বেশ জোরদার হলো। ও ছেলেটা মনে হচ্ছে, খনির একটা দুর্লভ মণি। সম্রাটের কোষাগারেই শোভা পায়।

উটচালক ইজারাদারের শেষ কথাটায় কেমন যেন বেকুব বনে গেল। সে আমতা আমতা করে বলল, সম্রাটের কোষাগারের কথা কি বলছেন হুজুর?

ইজারাদার হেসে বলল, সোনার ভাগ নিয়ে যখন রোমের সম্রাটের দরবারে হাজির হব তখন এই ছেলেটাকে একটুকরো হীরের খণ্ডের মতো সম্রাটকে উপঢৌকন দেব। বহুৎ ইনাম মিলবে।

উটচালক তারিফের ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে লাগল।

সম্রাটের দৌলতখানার খাজাঞ্চীসাহেব মহারানীর জন্য একটি খাস নোকরের বরাত দিয়ে রেখেছেন। ছেলেমানুষ গোলামই চাই। জোয়ান হয়ে গেলে ও খোদ সম্রাটের খিদমদগার হতে পারবে।

উটচালক বলল, ছেলেটা দামী সওদা হবে হুজুর।

এক সপ্তাহ কাজের পরে ইজারাদার মুম্‌বাকে নিজের তাঁবুতে ডেকে নিল। গলাবন্ধ আর শিকলি খুলে দেওয়া হলো তার। রাজবাড়ির সহবত শেখাতে হবে। এক সপ্তাহ ধরে ও যে কঠিন কর্ম করেছে তাতে ওর ধৈর্য, কষ্ট করার ক্ষমতা, আর মুখ বুজে থাকার পরীক্ষা হয়ে গেছে।

খনিতে কাজ হলো তিন মাস। কঠিন পরিশ্রম, কড়া রোদ্দুরের জ্বালা আর চাবুকের ঘা সহ্য করতে না পেরে চোদ্দজন ক্রীতদাস মারা পড়ল। তাদের টেনে ফেলে দিয়ে আসা হলো পাহাড়ের ওপারে। যারা বেঁচে রইল তারা কেবল ধুঁকতে লাগল। কঙ্কালের ওপর এক একখানা চামড়া দিয়ে যেন ঢাকা। যারা মারা গেছে তাদের জন্য দুঃখ না করে তাদের ওপর ঈর্ষা করতে লাগল এরা। মরে গেল মানেই কষ্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। যারা বেঁচে রইল তাদের চোখের সামনে ঝুলতে লাগল মৃত্যুর ভয়ংকর খাঁড়া।

গন্‌নাও বেঁচেছিল, তবে তাকে চেনার কোনো উপায় ছিল না। সারা শরীরটা কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। গলাবন্ধের জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়েছিল দগদগে ঘা। মুখে, পিঠে, পায়ে এলোপাথাড়ি চাবুকের দাগ কেটে বসে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছিল।

ওরা ফিরে চলল তেমনি রোদ্দুরের ভেতর দিয়ে অন্ধপোড়া হয়ে। ফিরতি পথে খাবার আর জলের পরিমাণ আদ্ধেক কমে গিয়েছিল। ওরই ভেতর চার-পাঁচজন মুখ থুবড়ে পড়ল, আর উঠল না। কেউ ফিরেও তাকাল না তাদের দিকে।

ফিরতি যাত্রায় মুমবাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উটের পিঠে। পেট ভরে খেতে দেওয়া হচ্ছিল। পাহারাদারদের মতোই জলের বরাদ্দ ছিল তার। কিন্তু সে উটের পিঠে চড়ে শান্তি পাচ্ছিল না। সঙ্গীদের কষ্ট দেখে তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল বার বার। গন্না জল, জল বলে বালির ওপর পড়ে গেল। মুমবা উট থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটল তার চামড়ার থলেতে জল নিয়ে।

ইজারাদার, পাকড়ো পাকড়ো, বলে হাঁকতেই পাহারাদাররা ছুটল মুমবাকে ধরতে। ততক্ষণে মুমবা গন্নার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সে তার মুখটা ফাঁক করে জলও ঢেলে দিয়েছিল, কিন্তু গন্নাকে সে বাঁচাতে পারেনি। পাহারাদাররা তাকে পাকড়াও করে নিয়ে চলে গিয়েছিল তার বাহন উটটার কাছে।

ইজারাদারের সঙ্গে পালতোলা জাহাজে চেপে একদিন মুমবা এসে পৌঁছল রোম নগরীতে। জাহাজঘাটাতে তখন অনেকগুলো জাহাজ ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। মুমবা জানতে পারল এদের ভেতর বেশির ভাগই বিদেশী মালবোঝাই জাহাজ।

হঠাৎ মুমবা দেখল, পাথর বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে ঘর্‌ঘর্‌ আওয়াজ তুলে জাহাজঘাটার দিকে এগিয়ে আসছে ঘোড়ায় টানা রথ। পাশে দাঁড়ানো পাহারাদারটা মুমবাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে দিচ্ছিল।

একটা নয়, অনেকগুলো রথ এসে পাশাপাশি দাঁড়াল। রথের সাজসজ্জা দেখে অবাক হয়ে গেল মুমবা। সে দেখল, রথের ওপর যে সুন্দর মানুষগুলো বসেছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে মুঠো মুঠো সোনার টাকা শূন্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল। পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল যারা তারা টাকা কুড়োতে লাগল হুড়দাঙ্গা করে।

পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করল মুমবা, রথের মানুষগুলো কি টাকা ছড়িয়ে পথের লোকগুলোকে খয়রাতি করছে?

ফাঁসটা এঁটে গেল গলায়।

পাহারাদারটা লোক ভাল। সে ইতিমধ্যে মুমবাকে ভালবেসে ফেলেছিল। ইজারাদার মুমবাকে ঐ লোকটির হেপাজতে রেখে বেরিয়েছিল খাজাঞ্চীর খোঁজে।

পাহারাদার বলল, আদপেই না। ওরা ওদের বড়লোকিয়ানা দেখাচ্ছে বিদেশী জাহাজের ব্যবসাদারদের।

মুমবা অবাক হয়ে বলল, কেন?

যাতে ব্যবসায়ীগুলো দালালদের খপ্পরে পড়ার আগে ওদের কাছে ভাল ভাল জিনিসগুলো বিক্রি করে। ওরা যে বড়লোক, আগে তো তার প্রমাণ দেখাতে হবে। তাই টাকা ছড়িয়ে বড়লোকি জাহির করছে। আবার যে যত বড়লোক সে টাকা ছড়াচ্ছে তত বেশি। যাতে সবচেয়ে ভাল জিনিসটা তার কাছে আগে ভাগে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইজারাদার ফিরে এল। মুমবাকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। এখানে কয়েকদিন রেখে তারপর চালান করা হবে রাজপ্রাসাদে। খাজাঞ্চীসাহেব ততদিনে কথাবার্তাটা পাকা করে নেবেন।

মুমবা পথে যা কিছু দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে। এমন ঝলমলে দোকানপাট, এমন সব সুদর্শন মেয়ে-পুরুষ, এত যানবাহন সে তার জীবনে একেবারেই দেখেনি।

রাতের বেলা যখন নিঃশব্দ হয়ে যেত চারদিক তখন নিজের বিছানায় বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকত মুমবা। তার চোখের ওপর ভেসে উঠত মায়ের মুখ। তাকে হারিয়ে কেঁদে কেঁদে মা যেন একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। বাবার জন্যেও আকুল হয়ে কাঁদতে দেখেছে তার মাকে।

বাবাকে প্রথম যখন খনির কাজে ধরে নিয়ে যায় তখন মুমবার জন্ম হয়নি। দশ বছর একটানা কাজ করার পর পালিয়ে এল। এবার জন্মাল মুমবা। ছোটবেলায় বাবা তাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিত। সারা শরীরটা তার কেমন যেন শিউরে শিউরে উঠত। এরপর মুমবা অনেকটা বড় হয়ে গেল। বাবা 'মানুষ ধরা'দের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়েই বেড়াত। দূরে কোথাও মানুষ বা জানোয়ারের দ্রুত পায়ের সাড়া পেলেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঝোপেঝাড়ে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করত। বাবা সে সময় বুড়ি ঠাকুমার দেওয়া গলার মাদুলিটা ধরে বিড়বিড় করে কি সব বলে যেত। বুড়ি যখন মারা যায় তখন লালরঙের একটা ফলের বীজের মাদুলি মন্ত্র পড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল নিজের ছেলের গলায়। বলেছিল, এটা তোকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

মুমবা ভাবে, কিন্তু পারল কই রক্ষা করতে? সেদিনটার ছবি সে একেবারেই ভুলতে পারেনি। জলার ধারে বাপ বেটাতে গিয়েছিল পাখি ধরতে। ফাঁদ পেতে বসেছিল

দুজনে। ইতিমধ্যেই দুটো পাখি পড়েছে। ও দুটোর পায়ে লতা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে পেছনের একটা গাছের ডালে। ওরা মাঝে মাঝে মুক্তির জন্য ছটফট করছে। কাঁক্ কাঁক্ আওয়াজ তুলে প্রকাশ করছে অস্থিরতা।

ঠিক এমনি সময়ে পেছনের জঙ্গল থেকে একধরনের শব্দ উঠল। যেন কয়েকটা জানোয়ার হিংস্র জন্তুর তাড়া খেয়ে এদিকে ছুটে আসছে।

বাবা পলকে পেছনে তাকিয়েই বুঝে নিল পরিস্থিতিটা। মুহূর্তে একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল ঝোপঝাড়ে ভরা জলার জলে। নিজে কিন্তু ছুটে চলল ডাঙার ওপর দিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে।

মুম্‌বা পরে বুঝেছিল, তার বাবা 'মানুষ-ধরা'র হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য নিজে উল্টোদিকে দৌড়েছিল, যাতে লোকগুলোর চোখ বাবার দিকেই যায়।

ও ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে পাচ্ছিল, বাবা পরিত্রাহি দৌড় দৌড়চ্ছে, আর ঘোড়সওয়ারগুলো তাকে ধরার জন্য ওদের ঘোড়া নিয়ে চক্রাকারে ঘিরে ধরছে। বাবা এঁকেবেঁকে গলে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একটা ঘোড়সওয়ার বাঁই বাঁই ঘোরাতে ঘোরাতে ছুঁড়ে মারল একটা দড়ির ফাঁস। বাবা হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসটা এঁটে গেল গলায়।

একদিকে ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার বাবাকে টানছে, অন্যদিকে একাই বাবা টানছে ওদের। সে কি বিক্রম বাবার! মুম্‌বা কোনোদিনই ভুলতে পারবে না সে দৃশ্য।

বাবা কিন্তু ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারের শক্তির কাছে হার মানেনি। শেষে হার মানতে হলো, যখন অন্য ঘোড়সওয়ারগুলো এসে তাকে বেঁধে ফেলল।

বাবাকে ধরে নিয়ে চলে যাবার সময় বর্শার ঘায়ে আহত একটা সিংহের মতো বাবা কাতরাচ্ছিল। মাঠের ও প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে বাবার গলায় সে শেষ ডাক শুনেছিল, মুম্‌বা, মুম্‌বা-রে।

আজও গভীর রাতে সে যখন জেগে বসে থাকে তখন অনেক দূর থেকে বাবার ঐ আর্ত ডাকটা কানে ভেসে আসে।

সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার দিনটিতে ঘরে ফিরে আসার আগে মুম্‌বা পাখি দুটোর পায়ের বাঁধন খুলে শূন্যে উড়িয়ে দিয়েছিল।

ইজারাদার সাইলেনাসের বাড়িতে প্রথম দিনটির কথা ভুলতে পারেনি মুম্‌বা। ইজারাদারের বাগানের একপ্রান্তের একটা ঘরে মুম্‌বার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

ভোরের পাখির ডাকে দরজা খুলে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুম্‌বা চমকে উঠল। গল্পের পরীর মতো সুন্দরী একটি মেয়ে তারই দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটি এগিয়ে এলো। মিষ্টি গলায় বলল, কি নাম তোমার?

মুম্‌বা।

বাঃ, তুমি তো বেশ বুঝতে পার আমার কথা। কতদিন আমাদের দেশে এসেছ?

কালই তো ইজারাদার সাহেব আমাকে জাহাজঘাটা থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। সন্ধ্যার একটু আগেই এসেছি।

মেয়েটি বলল, ইজারাদার সাহেব আমার বাবা। কিন্তু তুমি একদিনমাত্র এসে আমাদের দেশের ভাষা শিখলে কি করে? এমনটা তো হয় না!

ইজারাদার সাহেব যখন আমার দেশে কাজে গিয়েছিলেন তখন আমি তাঁর তাঁবুতে থেকে তাঁকে সেবা করতাম। তিনি আমাকে এদেশের ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছেন।

মেয়েটি বলল, বেশ হয়েছে, আগেভাগেই ভাষাটা শিখে নিয়েছ। আরে, এতক্ষণ আমার নামটা তো তোমাকে বলা হয়নি। হেলেন। খুব মিষ্টি নাম না?

মুম্‌বা মাথা নেড়ে জানাল, নামটা বেশ ভালই।

হেলেন অমনি বলল, তোমার নামটাও খুব পছন্দসই —মুম্‌বা। আচ্ছা, তুমি আমার একটু কাজ করে দেবে?

মুম্‌বা কি কাজ না জেনেই মাথা নাড়ল। প্রায় তারই বয়সী মেয়েটির কথাবার্তায় সে খুব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

হেলেন বলল, তোমাকে বলতাম না, কিন্তু জাম্‌বো কাকা একদম বুড়ো হয়ে গেছে। গাছে চড়তে পারে না। আঁকশি দিয়ে অনেক জলপাই জড়ো করেছে, কিন্তু মগডালে এখনও বেশ কয়েকটা থেকে গেছে। আমি নুনে জারিয়ে আধপাকা জলপাই খেতে খুব ভালবাসি।

মুম্‌বা অমনি বলে উঠল, আমাকে গাছ দেখিয়ে দাও, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

হেলেন মুম্‌বাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ফলের বাগানে।

সেদিন অনেকগুলো পাকা জলপাই পেড়ে দিয়ে হেলনের বাহবা কুড়িয়েছিল মুম্‌বা।

যে কদিন ইজারাদার সাহেবের বাড়িতে রইল মুম্‌বা সে দিনগুলিতে জীবনের সেরা আনন্দ আর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছিল তার। ইজারাদার সাহেব বেরিয়ে যেতেন ভোরবেলা নাস্তা সেরে, তারপর জরুরী কাজকর্ম চুকিয়ে ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যে। তাই সারাদিনটা মুম্‌বাকে নিয়ে হুটোপুটি করে বেড়াত হেলেন।

হেলেনের মা ছিলেন ভারী দয়াবতী মহিলা। তিনি মুম্‌বাকে তার দেশের নানা কথা জিজ্ঞেস করতেন। মায়ের কথা বলতে গিয়ে মুম্‌বা যখন চোখের জল ফেলত তখন তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। বলতেন, দুঃখ চিরদিনের নয়, একদিন সব দুঃখ তোর ঘুচে যাবে বাছা।

বাগানে লুকোচুরি খেলত মুম্‌বা আর হেলেন। কত ফুল, কত প্রজাপতি, কত পাখির ডাক! ফলের বাগিচায় ঝুড়ি ভরে ফল পাড়ত দুজনে। মুম্‌বা বয়ে নিয়ে যেত। জাম্‌বো কাকা তারিফের গলায় বলত, আহা, আমার কত কষ্ট কমিয়ে দিল ছেলেটা। কোন মায়ের বুক খালি করে এলি রে বাপ।

দুপুরে খাবার পর যখন সবাই কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করত তখন মুম্‌বা বেরিয়ে পড়ত জাম্‌বো কাকার সঙ্গে আশপাশ ঘুরে দেখতে। বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে তীরবেগে চারঘোড়ার রথ ছুটে গেলে তাক লেগে যেত মুম্‌বার। রথের ওপর যারা বসে থাকত তাদের মনে হতো, সূর্য কিংবা চন্দ্রলোক থেকে নেমে আসা কোনো দেবদেবী।

দূরে পাথরে গাঁথা কারুকার্যময় প্রাসাদের দিকে হাত তুলে একদিন জাম্‌বো কাকা বলেছিল, মহামহিম সম্রাট থাকেন ওখানে। বড় বড় সবুজ গাছের বীথি চোখের দৃষ্টিকে বার বার সেদিকে টানছিল। দূর থেকে ভেসে আসছিল বাদ্যধ্বনি। কিছুক্ষণ পরেই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছিল একদল রোমান সৈন্য। দীপ্ত সূর্যের রশ্মিতে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল তাদের হাতে ধরা বর্শার ফলক। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাসাদ প্রদক্ষিণ

করে আবার ঢুকে গিয়েছিল প্রাসাদের ভেতরে। হঠাৎ প্রাসাদ থেকে একঝাঁক পায়রা শূন্যে উড়ে গিয়ে আকাশে চক্কর দিয়ে ফিরছিল মহা আনন্দে।

আর একদিন পাথর ঘেরা একখণ্ড জায়গার ভেতর তুরীভেরীর আওয়াজ শুনে মুম্‌বা তার জাম্‌বো কাকাকে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি হচ্ছে কাকা?

জানোয়ার আর মানুষ নিয়ে খেলা হচ্ছে।

কি রকম সে খেলা?

ঐ যে ঘেরা জায়গাটা দেখছ, ওর একজন মালিক আছে। সে খেলা দেখিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা রোজগার করে। এমনি বেশ কয়েকটা আখড়া আছে এই রোম নগরে। ওপরে দর্শকদের বসার আসন, নিচে চারদিক ঘেরা খেলার জায়গা।

মুম্‌বা অধীর হয়ে আবার জানতে চাইল, খেলাটা কি?

জাম্‌বো বুড়ো সেই পনের বছর বয়স থেকে রোমে এসেছে। এখন তার বয়স চারকুড়ি ছুঁই ছুঁই। অভিজ্ঞতা তার অনেক।

বুড়ো বলল, যুদ্ধে যারা বন্দী হয়ে আসে তাদের মুক্তির একটা উপায় হলো ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে লড়াই করে জেতা। যদিও জেতা প্রায় অসম্ভব তবু একখানা ছোরা হাতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। শেষে সিংহের পেটেই যেতে হয় সেই হতভাগাদের। তিন চার দিন খেতেই দেয় না সিংহটাকে। তারপর খাঁচার মুখটা খুলে দিলেই সে হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ে তার খাবারের ওপর। দু'এক মিনিট ঝটাপটি, তারপর সব শেষ।

মুম্‌বা ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে বলল, ওরে ব্বাস, এরকম ভয়ংকর দৃশ্য কেউ চোখে দেখতে পারে!

দেখতে পারে কি রে বেটা, পয়সা দিয়ে খেলা দেখতে ঢোকে। নিজেরা রান্না মাংসের হাড় চুষতে চুষতে খেলা দেখে। সিংহের থাবার ঘায়ে গর্দান মটকে গেলে লোকগুলো আনন্দ আর উত্তেজনায় চেঁচাতে থাকে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে মুম্‌বার শরীরে কাঁপুনি এসে গেল। তার মনে হলো, যে সুন্দর মানুষগুলোকে সে পথেঘাটে চলতে দেখেছে তারা আসলে এক একটা নর-রাক্ষস।

জাম্‌বো কাকা একটুখানি থেমে আবার বলল, মানুষে মানুষে লড়াই আরও জমে ওঠে!

মুম্‌বা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল জাম্‌বো কাকার মুখের দিকে।

বুড়োকে কথায় পেয়ে বসেছিল। সে বলে চলল, এই আমাদের মতো যারা ক্রীতদাস, তাগদ আছে শরীরে, তাদের ল্যানিস্টারা দাস-বাজার থেকে কিনে নেয়।

মুম্‌বা জানতে চাইল, ল্যানিস্টা কাদের বলে কাকা?

যারা লড়াই করে তাদের বলে গ্ল্যাডিয়েটার! আবার ঐ গ্ল্যাডিয়েটারদের যারা লড়তে শেখায়, বিভিন্ন আখড়ায় ওদের নিয়ে ভাড়া খাটায় তাদেরই বলে ল্যানিস্টা। আর ঐ আখড়া, যেখানে ওরা জীবনমরণ লড়াই করে তাকে বলে এরেনা।

তুমি তো অনেক কিছু জানো কাকা!

আরে আমি যে নিজের চোখে আখড়ায় ঢুকে ইজারাদার সাহেবের খিদমদগার হয়ে লড়াই দেখেছি। সেদিন দুজোড়া নেমেছিল লড়াইয়ে। প্রথম জোড়াটির একজনের হাতে ছিল জাল, অন্যজনের তলোয়ার। জাল ছুঁড়ে যদি একবার জড়িয়ে ফেলতে পারে তাহলে তলোয়ারধারী কাবু। আর যদি ছুঁড়ে দেওয়া জাল একবার ফসকে যায় তাহলে জালধারীর খেল খতম। দ্বিতীয়বার জাল গুটিয়ে ছুঁড়তে যাওয়ার আগেই তলোয়ারধারীর এক কোপে ধড় থেকে উড়ে যাবে মুণ্ডুখানা।

একটু থামল জাম্‌বো কাকা। মুম্‌বার দিকে তাকিয়ে একসময় বলল, সেদিন জিতেছিল কিন্তু জালধারী লোকটা। তলোয়ারধারী যখন পাঁয়তারা করতে করতে তলোয়ারখানা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার শত্রুর ওপর তখন ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে জাল ছুঁড়ল জালধারী। তারপর কোমরে ঝোলান ডাণ্ডশটা খুলে নিয়ে একঘায়ে ঘিলু বের করে দিলে জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়া লোকটার।

মুম্‌বা মূক হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হলো ডাণ্ডশটা তার মাথাটাকেই চৌচির করে দিলে।

কথা বলেই চলল জাম্‌বো কাকা, সেদিন লড়াই জমেছিল ছোরাওলাদের। নাস্তার একটু পরে শুরু হয়ে শেষ হলো সেই দুপুরের খাওয়ার একটু আগে। ততক্ষণে একজনের গলার নলিটি কেটে ফেলা হয়েছিল। রক্ত ফিনকি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছিল এরেনার তৈরি মাটি। সবাই চিৎকার করে বাহবা দিচ্ছিল বিজয়ীকে। তার হাতে ধরা ছিল একটা বাঁকা ছুরি। তারও সারাটা শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল। এত বাহবার ভেতরেও লোকটা কিন্তু মুখ তোলেনি। সে চোখ দুটো নিচু করে তাকিয়েছিল মরা মানুষটার মুখের দিকে।

মুম্‌বা অমনি বলল, কেন অমন করে তাকিয়েছিল কাকা?

উত্তেজনায় যে কাজ করেছে তার জন্যে অনুশোচনা। আসলে তো ওরা সকলেই বন্ধু। একই সঙ্গে জীবনের কটা দিন থাকা, খাওয়া আর শোওয়া। সবাই একই গোত্রের মানুষ, ক্রীতদাস।

মুম্‌বা বলল, যদি ওরা বন্ধু তাহলে একজন আর একজনকে মারল কেন?

এরেনার ভেতর খেলার নিয়মই এই। একজনকে মরতেই হবে। তাই নিজের প্রাণটাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্যকে ইচ্ছা না থাকলেও মারতে হয়।

অন্য একদিন জাম্‌বো কাকার সঙ্গে বেরিয়ে মুম্‌বা এক সাধুর দেখা পেয়েছিল। পথের ধারে একটা লম্বা আলখাল্লায় গা ঢেকে লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল মানুষটি। অনেক পথ-চলতি লোক জমে গিয়েছিল রাস্তায়। তারা বলাবলি করছিল, সাধু মানুষটি পুব দিকের কোন দেশ থেকে এসেছে।

সাধু কিন্তু রোমানদের ভাষাতেই কথা বলছিলেন।

জাম্‌বো কাকার সঙ্গে ভিড়ের ভেতর মুম্‌বাও দাঁড়িয়ে পড়ল। মুম্‌বা এমন শান্ত, দয়ালু আর আলোর মতো উজ্জ্বল মুখ কখনো দেখেনি।

সাধু বলছিলেন, প্রভু একজনই আছেন। আর সকলেই তাঁর দাস। যাঁদের দেবতার আসনে বসিয়েছ, যাঁদের রাজার আসনে বসিয়েছ, যাঁদের ক্রীতদাস বলে ঘৃণা করছ তাঁরা সকলেই কিন্তু ঐ একই প্রভুর দাস। তিনি সবার ওপরে কাজের ভার দিয়েছেন কিন্তু কাউকে কারোরই ওপরে প্রভুত্ব করতে দেননি। তাঁর ভালবাসা আলোর মতো সবার ওপর সমানভাবে এসে পড়ে। তাঁর ক্রোধ রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র বাছবিচার না করে

সাধু রোমানদের ভাষাতেই কথা বলছিলেন।

অন্যায়কারীকে আগুনের মতো দগ্ধ করে। প্রতিটি কাজ শুদ্ধভাবে কর। নির্ভয়ে থেকো। স্মরণ কর একমাত্র সেই প্রভুকে। তিনিই তোমাকে পথ দেখাবেন।

সাধু মানুষটি এই কটি কথা বলেই তাঁর লম্বা লাঠিখানা রাস্তায় ঠুকতে ঠুকতে সামনের দিকে চলে গেলেন। যে মানুষগুলো জটলা করে তাঁর কথা শুনছিল তারা নিজেদের ভেতর ঐ কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন একজন বলে উঠল, এসব কথা সম্রাটের লোকজন অথবা পুরোহিতদের কানে গেলে সাধুর আর রক্ষে নেই। ক্রুশে ওঠা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সম্রাটের প্রাসাদে যাবার ঠিক আগের দিন সত্যিই ঘটনাটা ঘটল। জাম্‌বো কাকা সেদিন একাই বাজারে গিয়েছিল। ফিরে এসে মুম্‌বার কানে কানে বলল, পুরোহিতরা সাধুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারার আদেশ দিয়েছিল, আজ তাঁকে ক্রুশে তোলা হয়েছে।

মুম্‌বা আর্তনাদ করে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। তার হঠাৎ মনে হলো, সাধু তারই সামনে দুটি হাত দুদিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। দুহাতের পাতায় ফুটে আছে লাল রক্ত। সাধুর মুখে নির্মল হাসিটি ছড়িয়ে পড়েছে। চোখে ঝরে পড়ছে করুণা।

মুম্‌বা একটা ঘোরের ভেতর থেকে কথা বলে যেতে লাগল। উত্তর দিতে লাগলেন সাধু। জাম্‌বো কাকা প্রশ্ন আর উত্তর দুটোই শুনতে পেল মুম্‌বার মুখ থেকে।

মুম্‌বার প্রশ্ন, তোমার দুহাতের পাতায় রক্ত কেন? কারা এমন নিষ্ঠুর কাজ করেছে?

ও রক্ত নয় বাবা রক্তরাঙা ফুল। নিষ্ঠুর কাজ তো কেউ করেনি, ওরা আমাকে আঘাত করে আমার কাজটাকেই এগিয়ে দিয়েছে। ঐ রাঙা ফুল ওদেরই দেবার জন্য হাতে ধরে আছি।

তোমাকে আমি একদিন পথের ওপর দেখেছি সাধুবাবা। তোমার কথাও শুনেছি, সব বুঝতে পারিনি, তবু বড় ভাল লেগেছিল।

পথই তো আমার আশ্রয়। পথে পথেই আমি আমার কথা বলে বেড়াই। তুমি আরও একটু বড় হও, তখন আমার সব কথার অর্থ ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে।

তুমি কেমন করে এখানে এলে? তোমাকে নাকি ওরা ক্রুশে আটকে রেখেছে?

কেউ কখনো আমাকে আটকে রাখতে পারে না। আমি নিজের ইচ্ছায় বাঁধা পড়ি। এই যেমন তুমি ভালবাস বলে ক্রুশের বাঁধন খুলে তোমার কাছে চলে এলাম। বলতে পার তোমার কাছে বাঁধা পড়ে গেলাম।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ মুম্‌বা নতজানু হয়ে বসে রইল চোখ বন্ধ করে। যখন চোখ খুলে উঠে দাঁড়াল তখন সারা মুখে খেলা করছে অপূর্ব এক আলো।

পরের দিন সম্রাটের খাজাঞ্চীর সঙ্গে মুম্‌বা গিয়ে উঠল রাজপ্রাসাদে। আসার সময় ইজারাদারের স্ত্রী তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমি তোমাকে তোমার দুঃখী মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দিতাম বাবা।

হেলেন মুম্‌বার ঘরের জানালায় ভোরবেলা এসে বলে গিয়েছিল, তুমি আমার

বন্ধু। আমি তোমাকে ভুলব না।

এই ক'টি শব্দ উচ্চারণ করেই সে চলে গিয়েছিল তার ঘরে। রাজপ্রাসাদে যাবার সময় মুম্‌বা আর তাকে দেখতে পায়নি।

প্রাসাদে গিয়ে মহারানী ক্লডিয়ার কাছে আশ্রয় মেলেনি মুম্‌বার। সম্রাটের পুত্র সিনিয়াস তখন মুম্‌বারই সমবয়সী। অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির সে। তার জন্য নির্দিষ্ট ভৃত্যেরা সব সময়েই তটস্থ হয়ে থাকত। সম্রাট হনোরিয়াস যুবরাজের প্রায় সমবয়সী একটি ভৃত্যকে পেয়ে পুত্রের কাছে নিযুক্ত করতে চাইলেন। দেখা যাক্, যুবরাজের প্রকৃতির যদি কিছু পরিবর্তন হয়।

সম্রাটের ইচ্ছাতেই মুম্‌বা থেকে গেল যুবরাজের সেবায়।

মুম্‌বা অতি বাধ্য। অসীম ধৈর্য তার। যুবরাজ সিনিয়াস এখন নতুন ভৃত্যটিকে নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়।

লক্ষ্যভেদ রপ্ত করছে সিনিয়াস। তীর ছুঁড়ছে বিভিন্ন দিকের লক্ষ্য বস্তুতে ঘন ঘন। সেই নিক্ষিপ্ত তীরগুলোকে অতি দ্রুত দৌড়ে গিয়ে সংগ্রহ করে আনতে হচ্ছে মুম্‌বাকে। এ যেন মুম্‌বাকে ক্লান্ত আর পরাস্ত করার জন্যই খেলায় মেতে উঠেছে সিনিয়াস।

রাতে যুবরাজের শয্যার পাশে পালাক্রমে জাগতে হয় চারজন ক্রীতদাসকে। যুবরাজের সামান্যতম অসুবিধার দিকে নজর রাখে তারা। সিনিয়াসের আদেশে একটানা হাওয়া করার ভার পড়ে মুম্‌বার ওপর। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মুম্‌বা ঠিকমতো তার কাজ করছে কিনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে যুবরাজ। ভোরে উঠে মুম্‌বার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সারা রাতের ক্লান্তি তার সমবয়সী ভৃত্যটির চোখে কি ছায়া ফেলেছে তাই দেখে তারিয়ে তারিয়ে।

মুম্‌বার সব কাজই নিখুঁত। তার কাজের ত্রুটি বের করা যায় না বলেই যুবরাজ মনে মনে গজরাতে থাকে।

যুবরাজ ঘোড়ায় চড়ে যখন রাজ-উদ্যানের চারদিকে দৌড়য় তখন ঘোড়ার লাগাম ধরে ছুটতে হয় মুম্‌বাকে। ঘোড়ার পেটে গুঁতো মেরে তাকে জোরসে চালাতে থাকে সিনিয়াস। মুম্‌বা সমানে কিছু সময় ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে হাঁপিয়ে ওঠে। ওর এই অবস্থা দেখে হাহা করে হাসতে থাকে যুবরাজ। যেন দৌড় প্রতিযোগিতায় নিজেই হারিয়ে দিয়েছে মুম্‌বাকে।

এই নিষ্ঠুর রাজপুত্রটি একবার এক অঘটনে পড়ে গেল। রাজ-উদ্যানের পাশেই বৃহৎ একটি জলাশয়। এ জলাশয়ের চারদিক ছিল উপলে আকীর্ণ। ঐ উপলের ওপর দিয়ে অশ্ব চালনা মানা ছিল। কিন্তু কোনো রকম বারণ মানার পাত্র ছিল না যুবরাজ। সে জোরসে চাবুক কশাতেই লাফিয়ে ছুটতে গেল ঘোড়া, অমনি মসৃণ উপলে পা হড়কে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ওপর থেকে উল্টে পড়ে গেল যুবরাজ সিনিয়াস। পড়বি তো পড় একেবারে জলাশয়ে। অতি গভীর জলাশয়। এদিকে কোনো দিনই জলে নামেনি সিনিয়াস, সাঁতার জানা তো দূরের কথা। দু'একবার হাঁকুপাঁকু করে জলের ওপর ওঠার চেষ্টা করল যুবরাজ, পরক্ষণেই তলিয়ে গেল তলায়।

প্রহরীরা বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাতে লাগল প্রাসাদ কাঁপিয়ে। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ঘণ্টা শুনে সম্রাটও সচকিত। তিনি খবর পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অকুস্থলে এসে উপস্থিত। প্রাসাদের গবাক্ষ খুলে গেছে ততক্ষণে। মহারানী বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জলাশয়ের দিকে। কোনোকিছু ভাববার অথবা কথা বলার শক্তি নেই তাঁর।

অনেকের সঙ্গেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুম্‌বা। প্রবল ঠাণ্ডায় জল থেকে উঠে পড়ল সবাই। দমও প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। কিন্তু মুম্‌বা ক্রমাগত ডুব দিয়ে হাতড়াচ্ছিল জলের তলায়। শেষে মুম্‌বার হাতে ঠেকল সিনিয়াসের চুলেভরা মাথাখানা। সে চুলের মুঠি ধরে প্রবল শক্তিতে ডাঙায় টেনে আনল যুবরাজকে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন রাজবৈদ্য। সে যাত্রায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল যুবরাজ সিনিয়াস।

সেই থেকে সম্রাট হনোরিয়াসের দৃষ্টিতে পড়ে গেল ক্রীতদাস মুম্‌বা। নিজের জীবন বিপন্ন করেও যে ছেলেটি তার কর্তব্যে অবিচল ছিল তাকে পুরস্কৃত করার জন্য হনোরিয়াস একদিন সভা ডাকলেন।

সম্রাটের আহ্বানে মুম্‌বাকে নিয়ে আসা হলো সভাকক্ষে। অতি সহজ সারল্যে ভরা মুখ। বিনয়ে মুখখানা ঈষৎ নত হয়ে আছে। কিন্তু কোথাও দাসসুলভ ভয়ের লেশমাত্র নেই। যেদিন থেকে সাধুবাবা নির্ভীক হতে বলেছেন সেদিন থেকে মুম্‌বা ভয়ের কাছে মাথা নত করেনি।

সম্রাট নিজের মুখে মুম্‌বার স্বভাবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। শেষে মুম্‌বাকে বললেন, আমি তোমার কাজে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, তুমি আমার একমাত্র সন্তান সিনিয়াসকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছ। বল, আমার কাছ থেকে তুমি কি পুরস্কার চাও?

আশ্চর্য! আজকাল মুম্‌বার মুখ দিয়ে যেন সাধুবাবাই কথা বলতে থাকেন।

মুম্‌বা বলল, আমি আপনার ক্রীতদাস হয়েও আপনার ভালবাসা পেয়েছি, এটাই আমার পুরস্কার সম্রাট।

তুমি চিরদিনই আমার ভালবাসা পাবে, তবু তোমার খুশি মতো কিছু আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও। তোমার মুক্তিও চাইতে পার।

সম্রাট, আপনার অনুগ্রহের কথা কোনোদিনও ভুলব না। তবে আজ নয়, অন্য কোনো সময় আমাকে চেয়ে নেবার সুযোগ দিন।

বেশ তাই হবে। আমি সভাসদদের কাছে সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছামতো পুরস্কার আমার কাছ থেকে যখনই চাইবে তখনই পাবে।

একটা শাস্তি অপেক্ষা করছিল মুম্‌বার জন্যে। সম্রাট স্বয়ং মুম্‌বাকে অনুগ্রহ করেছেন, এ কথা রাষ্ট্র হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা রোমনগরী চঞ্চল হয়ে উঠল। পথেঘাটে ঘরে বাইরে মুম্‌বাকে নিয়ে চলল আলোচনা। মুম্‌বা যে যুবরাজকে গভীর জলের তলা থেকে তুলে এনেছে এ কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। নিজের চোখে দেখেছে এমন একজন রাজপ্রাসাদের মালি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলল, মুম্‌বা যুবরাজকে চুলের ঝুঁটি ধরে জল থেকে ডাঙায় টেনে তুলেছিল।

মুখে মুখে কথাটা প্রচারিত হলো। যুবরাজ সিনিয়াসের বন্ধুদের কানে গেল কথাটা। তাদের মুখ থেকে শুনতে পেল সিনিয়াস। অমনি রাজরক্তে আগুন ধরে গেল। একটা ক্রীতদাস তার চুলের ঝুঁটি ধরে তুলেছে আর সে কথা ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে, এর চেয়ে অপমানের আর কি থাকতে পারে!

রাগে অন্ধ হয়ে সিনিয়াস তার বন্ধুদের সঙ্গে মিলে মুম্‌বার দুটো হাত বেঁধে ফেলল। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধল তার ঝুঁটি। ঐ দড়ি বাঁধা হলো ঘোড়ার সঙ্গে শক্ত করে। এবার ঘোড়াকে চাবুক মেরে ছোটান হলো। মুম্‌বা কিছুপথ লাফিয়ে দৌড়ে চলল, তারপর সটান শুয়ে পড়ল মাটিতে। অমনি ঘষটাতে ঘষটাতে মুম্‌বার সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। রক্তাক্ত হলো সমস্ত দেহটা।

শাস্তি যখন যথেষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো যুবরাজের তখন ঘোড়া থামিয়ে নামল সিনিয়াস। নেমেই ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারল কয়েক ঘা। তারপর খুলে দেওয়া হলো হাত আর ঝুঁটির বাঁধন। মুম্‌বা আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল পথের ওপর। সিনিয়াস তার বন্ধুদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে।

একসময় সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল মুম্‌বার। সে উঠে দাঁড়াল পথের ওপর। ধীরে ধীরে চলতে লাগল রাজপ্রাসাদে তার আস্তানার দিকে। সে ভেবেই পেল না, এত বড় কঠিন শাস্তি তাকে পেতে হলো কেন! সম্রাটের কাছে মুম্‌বার ছিল অবারিত দ্বার। কিন্তু সম্রাটের কাছে গিয়ে সে কোনো অভিযোগ জানাল না। নীরবে সে যুবরাজের কাজ করে যেতে লাগল।

যুবরাজ সিনিয়াসের জন্য সম্রাট অস্ত্র-শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। মুম্‌বাকে সারাক্ষণ যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হতো। তাই অস্ত্র-শিক্ষক চলে গেলে যুবরাজের আদেশে মুম্‌বাকেই নামতে হতো প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায়। অসম্ভব সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর ক্ষিপ্রতা ছিল ক্রীতদাস মুম্‌বার। সে বসে বসে দেখত সিনিয়াসের গুরুর অস্ত্রচালনার কৌশল। একবার কিংবা দু'বার দেখলেই সে প্যাঁচগুলো রপ্ত করে নিত। তারপর যুবরাজের সঙ্গে খেলতে গিয়ে অভ্যেস হয়ে যেত তার। এমনি করে সে শিখে নিয়েছিল রথ-চালনার কৌশলও।

সম্রাট তাঁর প্রাসাদে প্রতি বছর রথ ও অস্ত্র-প্রতিযোগিতার আসর বসাতেন।

রথের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিটি রথ টানত চারটি করে ঘোড়া। রোমের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিযোগীরা এসে ভিড় জমাতো প্রাসাদের চারদিকে। রথ-দৌড়ের পরেই শুরু হয়ে যেত অস্ত্র-পরীক্ষা। সফল প্রতিযোগীদের সম্রাট বিতরণ করতেন বহুমূল্য উপহার।

শিক্ষা শেষ হলে যুবরাজও যোগ দিল প্রতিযোগিতায়। এটাই ছিল রাজগৃহের নিয়ম। এ প্রতিযোগিতার পুরস্কার আগাম ঘোষণা করলেন সম্রাট। যে রথ চালনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে সে অলংকৃত করবে যুবরাজের সারথীর পদ, আর যে অস্ত্র-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে সে পাবে যুবরাজের দেহরক্ষীর পদ।

যদি যুবরাজ বিজয়ী হয় তাহলে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পদাধিকারীরা লাভ করবে ঐ দুটি পদের গৌরব।

এও স্থির হলো, যুবরাজ প্রথমেই কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে না। যারা প্রথম স্থান লাভ করবে তাদেরই সঙ্গে লড়বে যুবরাজ।

মুম্‌বা দুটি প্রতিযোগিতাতেই নাম দিয়েছিল। প্রাসাদ থেকে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে বেরিয়ে গিয়েছিল প্রতিযোগিতার রথগুলি। নির্দিষ্ট সীমা ছুঁয়ে যখন ফিরে আসতে লাগল তখন সূর্য মধ্যাহ্ন গগনে।

প্রাসাদের দর্শকেরা উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। তারা চীৎকার করে উৎসাহ যোগাতে লাগল প্রতিযোগীদের।

দেখা গেল তিনখানা রথ প্রবল প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে। দু'খানা একেবারে পাশাপাশি। তৃতীয়টি একটু তফাতে ওদের প্রায় ছুঁয়ে ফেলার মুখে। শেষ বাঁকটিতে এসে ঘোরার মুখেই পাশাপাশি দুটি রথ জড়িয়ে পড়ল সংঘর্ষে। মুহূর্তে রথ দুটোর চাকা ভেঙে, ঘোড়া উল্টে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। তৃতীয় রথী একটু তফাতে রথ চালাচ্ছিল বলে নিজের দ্রুতগামী রথটিকে নিয়ে বেরিয়ে এল নির্বিঘ্নে। জয়ী হলো তৃতীয় রথের আরোহী মুম্‌বা।

কিন্তু পরদিন আশ্চর্যভাবে যুবরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেল সে। হঠাৎ একদল ভেড়াওয়ালা ভেড়া নিয়ে এসে পড়ল পথের ওপর। সজোরে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল মুম্‌বা। ঘোড়াগুলো সহসা বাধা পেয়ে লাফিয়ে উঠল শূন্যে। কিন্তু মুম্‌বার দক্ষ পরিচালনায় টাল সামলে নিল চারটি ঘোড়াসহ রথখানা। আবার গতি লাভের আগেই দেখা গেল দূর দিয়ে কখন বেরিয়ে গেছে যুবরাজের রথ।

অস্ত্র-পরীক্ষার দিনেও ক্ষিপ্রতায়, কৌশলে সুদক্ষ অস্ত্রবিদদের অবলীলায় অতিক্রম করে গেল মুম্‌বা। সম্রাট স্বয়ং ঘন ঘন সাধুবাদে অভিনন্দন জানালেন এই দুর্দান্ত শক্তিমান তরুণ কিশোরটিকে।

পরদিন শুরু হবে যুবরাজের সঙ্গে শেষ লড়াই। যে কোনো একটি অস্ত্র বেছে নিতে হবে দুজনকে।

মুম্‌বা বলল, যুবরাজের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তিনি যে ধরনের অস্ত্র তুলে নেবেন আমি তাই দিয়েই লড়ব।

যুবরাজ সিনিয়াস বলল, কাল তীরের লড়াই হোক। লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় নামব আমি।

সম্রাট বললেন, বেশ, তাই হবে।

প্রধান সেনাপতিকে আদেশ করলেন, দশটি তীর আর দুটি ধনুক নিয়ে এসো।

সেনাপতি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করল। দুটি ভিন্ন রঙের গুণ পরানো ধনুক আর তীর সে নিয়ে এল।

সম্রাট এবার পাঁচটি তীরে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে বললেন, ঐ সাদা গুণ পরানো ধনুকটার সঙ্গে এই চিহ্ন দেওয়া তীরগুলো রেখে দাও। আর অন্য পাঁচটি চিহ্নহীন তীর রেখে দাও লাল গুণ পরানো ধনুকটার সঙ্গে। সাদা গুণযুক্ত ধনুটা যথাসময়ে তুলে দেবে যুবরাজের হাতে। অন্যটা দেবে যুবরাজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে। লক্ষ্যবস্তু স্থির করার ভার রইল তোমার ওপর।

সেনাপতি মাথা নত করে জানাল, সম্রাটের আদেশ অবশ্যই পালিত হবে।

রাতে যুবরাজের সঙ্গে নিভৃতে কিছু পরামর্শ হলো সেনাপতির।

পরদিন দেখা গেল প্রান্তরের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব রেখে দুটি বড় নিরেট কাঠের চক্র রাখা হয়েছে। প্রথমটি অবশ্য পুরো নিরেট নয়। মাঝখানে গোলাকার বড় একটি ছিদ্র। ঐ ছিদ্রপথে দেখা যাচ্ছিল দ্বিতীয় চক্রের সামান্য একটু অংশ। ঐ অংশে আঁকা ছিল একটি পারাবতের ছবি।

অতি ধীরে ঘোরান শুরু হলো সেই চক্র। প্রথমে তীর ছোঁড়ার জন্য তৈরি হয়েছিল

বেরিয়ে গেছে যুবরাজের রথ।

মুম্‌বা। সে প্রথম ছিদ্রপথের ভেতর দিয়ে পারাবতের চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল তার তীর। সঙ্গে সঙ্গে তীরসহ পারাবতটি সরে গেল। তার জায়গায় দেখা গেল আর একটি পারাবত এসে উদিত হয়েছে। সেটাকেও নির্দিষ্ট জায়গায় তীরবিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও সরে গেল। এমনি পাঁচটি তীরে বিদ্ধ হলো পাঁচটি পারাবত।

কথা ছিল, পারাবতের মুণ্ডেই বিদ্ধ করতে হবে তীরের ফলা।

শেষে যুবরাজ পারাবত অঙ্কিত দ্বিতীয় একটি চক্রে আগের মতো পরপর তীর নিক্ষেপ করে গেল।

প্রতিযোগিতা শেষ হলে বিচারকরা দেখলেন, মহারাজের সূক্ষ্ম চিহ্নযুক্ত পাঁচটি তীরই পারাবতের চক্ষু ভেদ করে চলে গেছে। অপর পক্ষে চিহ্নহীন তীর মাত্র দুটি ক্ষেত্রে মস্তক ভেদ করে যেতে সফল হয়েছে।

বলাবাহুল্য অস্ত্র প্রতিযোগিতায়ও জয়ী হলো যুবরাজ সিনিয়াস।

সম্রাট কিন্তু ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তবে এটিকে বাতিল করবেন, এমন কোনো যুক্তিও খুঁজে পেলেন না তিনি।

জয়জয়কার পড়ে গেল যুবরাজের। সিনিয়াসের কৃতিত্বের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা রাজ্যে। যারা গুপ্ত ব্যাপার কিছু জানল না কিংবা বুঝল না তারা ধন্য ধন্য করতে লাগল।

কেবল ঘটনা জানল দুজনে। একজন যুবরাজ, অন্যজন সেনাপতি। মেষপালকদের মেষের দল নিয়ে পথ অবরোধ করে দাঁড়ানো, কিংবা যুবরাজের জন্য চিহ্নিত তীর কৌশলে বদল করে দেওয়ার পরিকল্পনা সেনাপতির সঙ্গে যুবরাজ গোপনে বসেই স্থির করেছিল। সৎ, সরল আর সহজ বিশ্বাসপ্রবণ মুম্‌বা এসবের ভেতর কোনো ছলনার অস্তিত্ব থাকতে পারে তা ভাবতেই পারল না।

সম্রাট মুম্‌বাকে নিযুক্ত করলেন যুবরাজের ছায়াসঙ্গী। মুম্‌বা আর সিনিয়াসের ভৃত্য নয়, সারাক্ষণের দেহরক্ষী, প্রয়োজনে রথ-পরিচালক।

একদিন সম্রাট মুম্‌বাকে নিজের নিভৃত কক্ষে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুম্‌বা এসে অভিবাদন জানাল সম্রাটকে।

সম্রাট মুম্‌বাকে ক্রীতদাস বলে অবহেলা করলেন না। তিনি তাকে কোমল স্বরে আসন গ্রহণ করতে বললেন।

মুম্‌বা বসলে তিনি বললেন, আমি কিন্তু তোমাকে উপহার দেবার কথা ভুলিনি। তুমি কোনোরকম সংকোচ না করে তোমার ইচ্ছামতো কোনোকিছু প্রার্থনা করে নাও।

মুম্‌বা নতজানু হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, সম্রাট, আপনি আমার ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছেন। একজন অতি নগণ্য ক্রীতদাসকে আপনি যুবরাজের প্রধান দেহরক্ষী আর রথ-চালকের সম্মানীয় পদ দিয়েছেন। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে প্রভু?

সম্রাট বললেন, সে তো তুমি তোমার নিজের শক্তিতেই অর্জন করেছ। আমি যে পুরস্কার দিতে চাইছি তা আমার একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য।

মাথা নিচু করে সামান্য সময় বসে রইল মুম্‌বা। তার হঠাৎ মনে হলো, হারানো বাবাকে খুঁজে তার মুক্তি চেয়ে নেওয়া যায় না কি সম্রাটের কাছ থেকে? অবশ্য তার বাবা যদি এ দেশেই ক্রীতদাস রূপে বিক্রি হয়ে থাকে।

মুহূর্তকালের ভেতরেই মুম্‌বা দেখল তার সামনে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই সাধু। মুখে করুণার হাসিটি মাখানো। মুম্‌বা শুনতে পেল, সাধু বলছেন, এই সামান্য পুরস্কার নিয়েই কি তুই সন্তুষ্ট থাকবি? অনেক বড় পুরস্কার চেয়ে নেবার সময় আসবে তোর। তখন সম্রাটের কাছ থেকে চেয়ে নিস।

মুম্‌বা চোখ তুলে দেখতে পেল সম্রাট তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। চোখাচোখি হতেই সম্রাট বললেন, বুঝেছি, তুমি এখনও পুরস্কারের ব্যাপারে মনস্থির করতে পারনি। বেশ, তোমার যখন ইচ্ছে হবে তখনই চেয়ে

নিও।

রাজ্য সীমান্তের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার কলহপ্রিয় বাসিন্দারা বার বার রোমান অধিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। সম্রাট এই প্রথম যুবরাজকে পাঠালেন ঐ উপজাতির লোকদের শায়েস্তা করার জন্য। সঙ্গে চলল সসৈন্যে সেনাপতি, আর যুবরাজের যুদ্ধ-রথ পরিচালনা করে নিয়ে চলল মুম্‌বা স্বয়ং।

উপদ্রুত এলাকায় এসে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের তলায় সমতলভূমিতে সৈন্য সমাবেশ করা হলো।

কয়েকদিন কেটে গেল, শত্রুপক্ষের একটি মানুষেরও মুখ দেখা গেল না।

পুবদিক দিয়ে পাহাড়ী উপজাতির মানুষগুলোর নেমে আসার সম্ভাবনা বেশি। তাই পুবদিকের পাহাড় ঘেঁষে স্থাপন করা হয়েছে সৈন্য-শিবির। পাহাড়ের মাঝামাঝি যুবরাজের অবস্থান। তার তাঁবুর শীর্ষে উড়ছে রাজকীয় পতাকা। পশ্চিমে সেনাপতির তাঁবু। সঙ্গে দুজন বিশ্বাসী দেহরক্ষী। যুবরাজের দেহরক্ষার ভার একমাত্র মুম্‌বার ওপর।

একটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্বের ওপর চেপে সেনাপতি সৈন্য-শিবির থেকে নিজের শিবির পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে।

রাত হলেই পানভোজনে মত্ত হয়ে ওঠে সৈন্যরা। সেনাপতি আসে যুবরাজের তাঁবুতে। সেখানেই বসে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পানের আসর। সে সময় মুম্‌বার ছুটি। তারপর সেনাপতি নিজের তাঁবুতে চলে গেলে সারারাত পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে মুম্‌বা।

দশম দিনের রাত্রিতে মুম্‌বা রোজকার মতো বেরিয়ে গিয়েছিল রাতের টহলে। যুবরাজ মত্ত ছিল সেনাপতির সঙ্গে পানভোজনে।

মুম্‌বা প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে পাহাড়ের এক একটা দিকে চলে যায়। সে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে উপজাতীয় পাহাড়ীদের চলাচলের পথরেখা আবিষ্কারের চেষ্টা করে। সেদিন তার সফর ছিল পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে।

সেনাপতির তাঁবু পেরিয়ে সে চলে গিয়েছিল আরও অনেকখানি দূরে। ফেরার পথে চাঁদের অবস্থান দেখে তার মনে হলো, রাত বেশ গভীর হয়ে গেছে। সমস্ত পশ্চিম প্রান্ত ঘুরে যুবরাজের শিবিরে পৌঁছতে কাবার হয়ে যাবে রাতের বেশির ভাগ সময়। মুম্‌বা জানে, যুবরাজ এসময় অতিরিক্ত পানের প্রভাবে অচেতনে ঘুমোয়। সুতরাং মুম্‌বার এই বিলম্বের হিসেব নিতে জেগে থাকবে না কেউ। তবু মুম্‌বা নিজের ভুলের জন্য ভারী অনুতপ্ত হলো। সে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য খানিকটা পাহাড়ের ওপর উঠে কোনাকুনি পার হবার চেষ্টা করল। গায়ের রঙে, গাছের ছায়ায় সে একটা কালো জাগুয়ারের মতো এগিয়ে চলল যুবরাজের শিবির লক্ষ্য করে।

ডানদিকে কালো ছায়ার মতো জেগে আছে সেনাপতির শিবির। মুম্‌বা লক্ষ্য করল, নিয়মমতো সেনাপতির শিবিরের বাঁ দিকে তার ঘোড়াটি বাঁধা নেই। তাহলে কি সেনাপতি এত রাত অব্দি যুবরাজের শিবিরেই রয়েছে! কিন্তু এমনটা তো ঘটার কথা নয়।

আরও খানিকটা এগিয়ে প্রকাণ্ড একটা পাথরের স্তূপ দেখতে পেল মুম্‌বা। ঐ স্তূপটার আধখানা বেড় দিয়ে খানিকটা নিচে নামলেই সমতল। তারপর পথের একটা বাঁক ঘুরলেই যুবরাজের শিবির।

একটা মোটা গাছ ডালপালা মেলে পাহাড়ের নিচ থেকে উঠে এসেছে ঐ পাথরের স্তূপ অব্দি। মুম্‌বা স্থির করল, পাহাড়ের ঢাল দিয়ে না নেমে সে ঐ গাছ বেয়েই নেমে যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। একটা কাঠবেড়ালীর মতো তিরতির করে সে নামতে লাগল ডাল বেয়ে। ঘন পাতায় ভরে আছে ডালপালা। সে ঐ পাতার আড়াল থেকে দেখল, গাছের তলায় বসে কি সব আলোচনা করছে দুটো মানুষ। পাশেই দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে পা ঠুকছে দুটো ঘোড়া।

আরে, এ যে সেনাপতি আর তার প্রধান সহকারীর ঘোড়া! কি করছে এত রাতে দুজনে এখানে বসে!

ঘন পাতার আড়ালে থেকে শশকের মতো কান খাড়া করে রইল মুম্‌বা।

গভীর পরামর্শই চলছিল এবং ভয়ংকর।

সেনাপতি বলে উঠল, কেন, অসুবিধাটা কোথায়? আমরা দুজনে একসঙ্গে যখন খুশি যুবরাজের শিবিরে ঢুকতে পারি। তাছাড়া উপজাতির মানুষগুলো যেদিন হামলা করতে নিচে নামবে, সেদিন একদিকে সৈন্যরা তাদের ওপর চড়াও হবে, অন্যদিকে আমরা আসল কাজ হাসিল করব।

সেনাপতির সহকারী বলল, আমরা যুদ্ধের ডামাডোলের ভেতর যুবরাজের শিবিরে আচমকা ঢুকে পড়ব। ঐ কালো জানোয়ারটা কোনো কিছু বোঝার আগেই ওকে খতম করে দেব। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার তলোয়ার এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে যুবরাজের বুকখানা।

সেনাপতি উত্তেজিত হয়ে বলল, সব ভণ্ডুল করে দেবে দেখছি তুমি। আরে আমি চাই ঐ কালো কুকুরটাকে বাঁচিয়ে রাখতে। আধমরা করে ওকে বেঁধে ফেলতে হবে। রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে প্রচার করতে হবে, ওটা একটা শয়তান। উপজাতির মানুষগুলোর সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল যুবরাজকে হত্যার। সে তার ঐ জঘন্য কাজে সফলও হয়েছে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। পালানোর সময় ধরা পড়ে গেছে। উপজাতির লোকগুলো ওকে আশা দিয়েছিল, দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একটি জাহাজে তুলে দেশে পাঠিয়ে দেবে।

এতগুলো কথা একনাগাড়ে বলে থামল সেনাপতি।

সহকারী বলল, যুবরাজ তো খতম হলো, কিন্তু তারপর?

সেনাপতি বলে উঠল, সব পরিষ্কার। বৃদ্ধ সম্রাটকে বন্দী করা কিংবা খতম করা কোনো ব্যাপারই নয়। আজ কথা দিচ্ছি, সিংহাসন পেলে তুমিই হবে আমার প্রধান সেনাপতি।

সহকারী বলল, এখন ঐ পাহাড়ীদের নিচে নেমে আসার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে তার ঘোড়ার দিকে যেতে যেতে বলল, বাইরে থেকে খাবার সংগ্রহের পথগুলো ওদের বন্ধ করে দিয়েছি। এবার বাছাধনদের নামতেই হবে।

ঘোড়ায় চড়ে দুজন নিজেদের তাঁবুর দিকে রওনা হয়ে গেল।

যুবরাজের তাঁবুর দিকে যেতে যেতে ভাবল মুম্‌বা, পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে সজাগ থাকতে হবে। সেনাপতির বিরুদ্ধে যুবরাজকে কিছু বললে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ যুবরাজ সেনাপতির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। প্রতিদিন

পান-ভোজনের সঙ্গী। আর সে যুবরাজের চোখে একজন ক্রীতদাস ছাড়া কিছুই নয়।

তিন দিন পরে প্রতিবছরের মতো সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হলো সৈন্য-শিবিরে। পান-ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা করল যুবরাজ। অনেক রাত অব্দি নৃত্যগীত, আহার পানীয়ে মত্ত হয়ে মাঝরাতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। কেবল সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় জেগে রইল একজন, সে মুম্‌বা। তার কেমন যেন মনে হতে লাগল, এ অবস্থায় শত্রুপক্ষ নেমে এলে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

রাত থমথম। চাঁদ উঠল পাহাড়ের মাথায়। আধখানা চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠল পাহাড় ও অরণ্য।

মুম্‌বা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল যুবরাজের তাঁবু থেকে। পিঠে তীরভরা তূণীর, হাতে ধনুক। কোমরে বাঁধা থলেতে আগুন জ্বালাবার জন্য চকমকি পাথর আর একটি দড়ির ফাঁস। এ জিনিসগুলি সে প্রায়ই রেখে দেয় তার নিজের কাছে। কে জানে কখন কি প্রয়োজনে এগুলো লেগে যায়।

সারি সারি সৈন্য-শিবির নিঝুম, নিঃশব্দ। মুম্‌বা জঙ্গল চিরে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল। অসীম সাহসী আর শক্তিমান তরুণ মুম্‌বা। সে কোথাও লতা কোথাও বা গাছের ডালপালাকে আশ্রয় করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাহাড়ের ওপর ক্রমাগত উঠে চলল।

শীতের শেষে ঝরে পড়া পাতায় বনভূমি পূর্ণ হয়ে আছে। শুকনো পাতায় পা পড়ে এক ধরনের বিচিত্র শব্দের সৃষ্টি করছে।

হঠাৎ চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মুম্‌বা। কালো কালো কতকগুলো মাথা দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি। চাঁদের আলোয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তাদের ছায়া ছায়া শরীরগুলো।

একটা জটিল জটাজালে ছাওয়া পুরানো গাছের ওপর উঠে নিজেকে আড়াল করে বসল মুম্‌বা। বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসে সে পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা দেখতে পেল।

পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উপজাতির মানুষজনের ঘরবাড়ি। তাদের কিছু কিছু চাষবাসের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠছে চাঁদের আলোয়। হঠাৎ মুম্‌বা দেখল, গাছপালায় ঘেরা একটা সমতলভূমিতে বহু মানুষ জড়ো হয়েছে। তাদের সকলের হাতে নানা ধরনের অস্ত্র। তারা সকলেই তাকিয়ে আছে পাহাড়ের চূড়ার দিকে। ওদের কাছ থেকে যেন কোনো কিছু নির্দেশের অপেক্ষা করছে। মুম্‌বার মনে হলো, চূড়ার লোকগুলো তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে নিচের সারি সারি সৈন্য-শিবিরের ক্রিয়াকলাপ। তাদের নির্দেশ পেলেই অস্ত্রধারী লোকগুলো স্রোতের মতো নেমে যাবে নিচের শিবির লক্ষ্য করে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই মুম্‌বার অনুমান সত্যে পরিণত হলো। ও দেখল, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এক একটি গিরিখাদ ধরে উপজাতীয় যোদ্ধারা প্রপাতের মতো নেমে চলেছে। হাতে ওদের মশাল নেই, অস্পষ্ট চাঁদের আলোই সম্বল। মুম্‌বা বুঝল ওরা অতর্কিতে আক্রমণ করতে চায়। আলো কিংবা কোলাহলে সতর্ক হয়ে যাবে শত্রুসৈন্য, সে সুযোগ কোনোভাবেই ওরা দিতে চায় না শত্রুপক্ষকে।

কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হয়ে গাছের উঁচু ডালটি ধরে বসে রইল মুম্‌বা। এখন অপরিচিত পাহাড়ী পথে দ্রুত নেমে গিয়ে শিবিরে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দেওয়া প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। পাহাড়ীরা তাদের নিত্য পরিচিত পথে এখন শিবিরের প্রায় কাছাকাছি নেমে গিয়েছে। মুম্‌বা গাছের ওপর থেকে প্রায় সবকটি দলকেই দেখতে পাচ্ছিল।

হঠাৎ পাহাড়ের দক্ষিণ দিক থেকে দম্‌কা হাওয়া বইতে শুরু করল। আশ্চর্য! ঐ হাওয়ার ছোঁয়ায় মুহূর্তমধ্যে মুম্‌বার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তর্‌তর্‌ করে গাছ বেয়ে নেমে এল নিচে। থলে থেকে চকমকি পাথর বের করে আগুন ধরিয়ে দিল স্তূপাকারে জমে ওঠা শুকনো পাতায়। বাতাসের বেগে তখন সারা বনের শুকনো পাতা উড়তে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই সে আগুন পাখা মেলে উড়তে লাগল। উপজাতি-অধ্যুষিত বনভূমির গাছপালা জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে।

বসত এলাকায় ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা ছাড়া আর প্রায় সমর্থ পুরুষ বলতে কেউই ছিল না। পাতায় ছাওয়া ঘরগুলোতে আগুন লাগামাত্র তারা চিৎকার জুড়ে দিলে।

আর কিছুসময় বনের ভেতর থাকলেই আগুনের বেড়াজাল থেকে বেরুনোর পথ বন্ধ হয়ে যাবে, একথা ভাবামাত্র দ্রুত একটা গিরিখাদ ধরে নেমে যেতে লাগল মুম্‌বা।

একটা উদ্দেশ্য মাথায় রেখে সে বনের ভেতর আগুন লাগিয়েছিল। ঐ যোদ্ধা উপজাতীয় লোকগুলো আগুন দেখলেই ঘর সামলানোর জন্য যুদ্ধ ফেলে ছুটে আসবে। তখন অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে নেশাগ্রস্ত ঘুমন্ত রোমান সৈন্যরা।

মুম্‌বা যা ভেবেছিল তার চেয়ে কিছু বেশি ফলই পাওয়া গেল। উপজাতীয় লোকেদের ভেতর যারা পাহাড়ের চূড়ায় ছিল তারা দামামা পিটে নিচে নেমে যাওয়া মানুষগুলোকে বিপদের সংকেত দিতে লাগল।

ঐ শব্দ আর লেলিহান আগুন শিখার তাণ্ডব দেখে সমতলে পৌঁছে যাওয়া উপজাতীয় সৈন্যেরা পেছন ফিরে দ্রুত পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। এখন আর দলবদ্ধভাবে ওরা এগোচ্ছে না। যে যেমনভাবে পারছে পাহাড়ে উঠে আসার চেষ্টা করছে। শুরু হয়ে গেছে আতঙ্ক আর কোলাহল। ইতিমধ্যে সজাগ হয়ে উঠেছে রোমান সৈন্যেরা। তারা পলায়মান উপজাতীয়দের পেছনে তাড়া করে আসছে।

মুম্‌বা পাহাড়ের শেষ ধাপ থেকে লাফিয়ে পড়ল নিচে সমতলভূমিতে। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে পড়ে গেল তার যুবরাজের কথা। কি সর্বনাশ! এতক্ষণ সে উপজাতির মানুষগুলোর হাত থেকে রোমান সৈন্যদের রক্ষার চেষ্টাই করছিল কিন্তু এদিকে যুদ্ধের কোলাহলের ভেতর যুবরাজ যে সম্পূর্ণ অরক্ষিত! এই মুহূর্তে হয়তো দুই দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়েছে যুবরাজের শিবিরে।

মুম্‌বা উড়ে চলে গেল যুবরাজের শিবির লক্ষ্য করে একটা বিদ্যুৎ-গতি বাজপাখির মতো।

সেই মুহূর্তে একটা নাটক অভিনীত হচ্ছিল শিবিরটিকে কেন্দ্র করে। অনুপস্থিত মুম্‌বার জন্য বাইরে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছিল সেনাপতির সহকারীটি। ভেতরে অসতর্ক যুবরাজকে মাটিতে চেপে ধরে তীক্ষ্ণ তলোয়ার তুলে আস্ফালন করছিল সেনাপতি, সিনিয়াস, মৃত্যুর দেবতা প্লুটোকে স্মরণ কর্‌, তোর অন্তিমকাল আসন্ন। ভাবী সম্রাটের

দৃষ্টি বুকের ওপর আটকে রইল।

তরবারি তোর বুকের রক্তে অভিষিক্ত হোক।

কথাগুলো উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করছিল সেনাপতি, আর প্রতীক্ষা করছিল বাইরে থেকে মুমবার বন্দী হওয়ার খবরটি শোনার জন্য।

বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হলো না। বাইরে প্রাণফাটা একটা আর্ত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ভারী কোনো বস্তুর পতনের আওয়াজ হলো।

মুমবার নিক্ষিপ্ত তীর মুহূর্তে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে সেনাপতির হতভাগ্য সহকারীর বুক।

কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই শূন্য থেকে আঁকাবাঁকা লিকলিকে একটা সাপ লাফিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল সেনাপতির গলা। পেছন থেকে প্রবল হ্যাঁচকা টানে সেনাপতির হাতের তলোয়ার ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পরাক্রান্ত সেনাপতি পড়ে গেল মাটিতে।

প্রবল বিক্রমে মুমবা ঐ ফাঁসের দড়িতে জড়িয়ে বেঁধে ফেলল চক্রান্তকারীকে।

যুবরাজ সিনিয়াস মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণ ফিরে পেয়ে আবেগে জড়িয়ে ধরল মুমবাকে। বলে উঠল, জীবনে পশুর মতো হিংস্র আচরণ করেছি তোমার ওপর। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আজ থেকে তুমি ক্রীতদাস নও, তুমি আমার বন্ধু, প্রাণদাতা।

চক্রযুক্ত একটি খাঁচা সঙ্গে এনেছিল সেনাপতি। উদ্দেশ্য ছিল খাঁচায় বন্দী করে নিয়ে যাবে উপজাতির সর্দারটিকে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, সেই খাঁচার মধ্যে ঢুকতে হলো স্বয়ং সেনাপতিকে।

যুদ্ধে পরাজিত উপজাতির মানুষদের শাসন করে বিজয়ীর মতো রাজধানীতে ফিরে এলো সসৈন্যে যুবরাজ সিনিয়াস। খাঁচায় বন্দী সেনাপতিকে ঘোরানো হলো নগরের চতুর্দিকে। ধিক্কার ধ্বনির ভেতর দিয়ে তাকে পাঠান হলো কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। পরে সম্রাটের বিচারে সাব্যস্ত হলো সেনাপতির মৃত্যুদণ্ড।

মুমবার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সে হয়ে উঠল নগরের সর্বসাধারণের প্রিয়পাত্র। প্রতিটি গৃহে, পথে-প্রান্তরে মুমবাকে নিয়ে চলল আলোচনা। রোমবাসীরা তাকে ক্রীতদাস না ভেবে তাদেরই একজন বলে ভাবতে লাগল। সম্রাট এতে গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করলেন।

এই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সম্রাটের আদেশে রাজ্যের সর্বত্র চলল বিপুল আয়োজন। উৎসব শুরু হলো রথচালনা-প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে। সমাপ্তি পর্বের জন্য রইল দেশব্যাপী গ্ল্যাডিয়েটারদের আখড়ায় আখড়ায় মরণপণ যুদ্ধ। যে রক্তঝরা যুদ্ধ দেখে মানুষ মেতে উঠবে উত্তেজনায়।

একসময় উৎসবের শেষপর্ব শুরু হয়ে গেল গ্ল্যাডিয়েটারদের নৃশংস যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। এ নিয়ে রাজ্যব্যাপী উৎসাহের শেষ নেই। স্থির হলো, প্রতি আখড়ায় চারজোড়া করে বাছাই গ্ল্যাডিয়েটার লড়াই করবে। তাদের ভেতর বিজয়ী দুজোড়ার লড়াই হবে। শেষে অবশিষ্ট একজোড়া লড়বে পরস্পরের সঙ্গে। সাতজন নিহত হবার পর যে বীর টিঁকে থাকবে, তার সঙ্গে যুদ্ধে নামবে অনুরূপ আখড়ার আর একজন বিজয়ী। শেষ পর্যন্ত সারা রাজ্যব্যাপী এমনি যুদ্ধ করতে করতে যে দুজন বিজয়ী টিঁকে থাকবে, তারা লড়াই করবে স্বয়ং সম্রাটের সামনে। যে গ্ল্যাডিয়েটার এই শেষ যুদ্ধে বিজয়ী হবে তাকে সম্রাট দেবেন মুক্তি।

দীর্ঘ দিন যুদ্ধের পর যে দুজনমাত্র টিঁকে রইল তারা পেল কয়েকদিনের পূর্ণ বিশ্রাম। শেষ যুদ্ধে তারা নামবে শততম দিনটিতে। সেই উৎসব সমাপ্তির দিনে লড়াইয়ের উদ্বোধন করবেন সম্রাট। দর্শকের আসনে বসবেন রাজা এবং রোম নগরীর প্রায় সমস্ত

গণ্যমান্য ব্যক্তি।

সেই ভয়ঙ্কর দিনটি এসে গেল। রক্তলোভী বিশিষ্ট নরনারীরা সমবেত হলো এরেনা ঘিরে সুশোভিত উচ্চ মঞ্চে। তোরণদ্বারে সম্রাটের আগমন সূচিত হওয়ামাত্র সশব্দে বেজে উঠল দামামা, তুরী ভেরী। সম্রাটকে অভ্যর্থনা করে এনে বসান হলো দর্শকদের মাঝখানে, সুসজ্জিত এক সিংহাসনে। সম্রাটের রক্ষক হিসেবে তাঁর পশ্চাতে তীক্ষ্ণধার অসি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুম্‌বা। নিজেকে আজ বড় অসহায় মনে হচ্ছিল তার। দাসদের নিয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সে কোনোদিনই মনেপ্রাণে সমর্থন করতে পারেনি। প্রতিদিনই সে শুনতে পেত, বিজয়ী গ্ল্যাডিয়েটারদের নাম আর তাদের অসীম বীরত্বের কাহিনী। পথেঘাটে লোক আলোচনায় মত্ত হয়ে উঠত। সে কিন্তু আড়ালে অশ্রুবিসর্জন করত নীরবে। যারা যুদ্ধে নিহত হলো তাদের জন্য, আর যারা আজ বিজয়ী হয়ে আগামী দিনে মৃত্যুপুরীর আখড়ায় প্রবেশ করবে তাদের জন্য। মানুষের নিষ্ঠুর মৃত্যুতে মানুষেরই মত্ত উল্লাস, এ কেমন!

শেষ লড়াইয়ের দর্শক-মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে মুম্‌বা। তার চোখের সামনে এখুনি শুরু হবে জীবনমৃত্যুর খেলা। না, সে এ খেলা দেখবে না। মুম্‌বা এরেনার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিল তার চোখের দৃষ্টি। ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে উঠল তুরীভেরী। সম্রাট কোষ থেকে নিষ্কাশন করলেন তাঁর কারুকার্যখচিত অসি। ঊর্ধ্বে তুলে ধরা মাত্র শুরু হয়ে গেল এরেনার মধ্যে দুই যোদ্ধার মরণপণ খেলা। নীরব হয়ে গেল দামামার নিনাদ।

অসির ঝঙ্কার শোনা যাচ্ছে। শিউরে শিউরে উঠছে মুম্‌বার সারা দেহ।

কিছুক্ষণের ভেতরেই আহতের চিৎকার আর দর্শকের মত্ত উল্লাস মিশে গেল। ঘনঘন শোনা যেতে লাগল সেই নারকীয় আর্তনাদ আর উচ্ছ্বাস।

কতক্ষণ যুদ্ধ চলেছে তার হিসাব রাখেনি মুম্‌বা। হঠাৎ এরেনার ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল বিজয়ী, মহামান্য দর্শকদের আদেশ পেলে আমি এর মুণ্ডটি ধড় থেকে আলাদা করে ফেলি।

সমুদ্রগর্জনের মতো গর্জে উঠল মঞ্চে উপবিষ্ট দর্শককুল, ছিঁড়ে ফেল, টুকরো করে ফেল।

মানুষের রক্তের পিপাসা তখন হিংস্র জন্তুকেও ছাড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ সমস্ত মঞ্চকে স্তব্ধ করে দিয়ে চিৎকার করে উঠল একটি কণ্ঠ, না, আমার সঙ্গে শেষ যুদ্ধ না করে ওকে জন্তুদের মতো মেরে ফেলতে পারবে না।

তলোয়ার উঁচিয়ে তরুণ কিশোর মুম্‌বা ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রক্তাক্ত এরেনার ভেতর। মুহূর্তে তার ওপর ভর করেছে কি যেন এক মহাশক্তি।

সমস্ত মঞ্চ স্তব্ধ, সম্রাট নির্বাক। এরেনার ভেতর বিজয়ী মানুষটা তখন তার প্রতিপক্ষের বুকের ওপর একটা পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেরই দেহে কোনো আচ্ছাদন নেই, রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। পরাজিতের ভগ্ন অস্ত্রটি পড়ে আছে কিছু দূরে। বিজয়ী এরেনার নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে শেষ আঘাত হানার আগে অস্ত্র উঁচিয়ে চেয়ে নিয়েছে দর্শকদের অনুমতি।

মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল পট। বিজয়ী রক্তমাখা তলোয়ারখানা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ধাবমান তরুণের দিকে। দর্শকেরা অতিরিক্ত একটা যুদ্ধ দেখার সুযোগ পেয়ে ফেটে পড়ল উল্লাসে।

অভিজ্ঞ গ্ল্যাডিয়েটার লড়ছে একটা তরুণ কিশোরের সঙ্গে। কিন্তু মুম্‌বাকে যেন দেখা যাচ্ছে না। তরঙ্গিত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠছে তার তলোয়ার। ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রতিপক্ষের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। লড়ছে গ্ল্যাডিয়েটার। কিন্তু বিদ্যুৎচমকের মতো ক্ষিপ্র মুম্‌বার কাছাকাছি পৌঁছতে পারছে না সে।

একসময় ঘোর লড়াইয়ের ভেতর দুজনে সরে এল অনেক কাছাকাছি। দুজনের তলোয়ারই ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই একটা চিৎকার শোনা গেল। মনে হলো মুম্‌বা আর্তনাদ করে উঠল, মেরো না, মেরো না, আমি মু-ম্‌-বা। তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে গেল। তার দৃষ্টি গ্ল্যাডিয়েটারের বুকের ওপর আটকে রইল ছোরার ফলার মতো। মুম্‌বাকে দেখে মনে হলো, একটা পাথরের মূর্তিতে সে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

একটা শক্ত কালো সুতো গলায় বেড় দিয়ে এসে পড়েছে গ্ল্যাডিয়েটারের বুকের ওপর। সেই সুতোয় একটা টকটকে লাল ফলের বীজ মাদুলির আকারে গাঁথা। মুম্‌বার ঠাকুমা তার ছেলের গলায় মাদুলিটা ঝুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই মন্ত্রপড়া মাদুলি গলায় থাকলে কোনো বিপদ আর কাছে ঘেঁষবে না।

গ্ল্যাডিয়েটারও প্রতিদ্বন্দ্বীর গলায় তার নিজের ছেলের নামটা শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল। স্মৃতির ওপারে হঠাৎ আবছা অন্ধকারের ঘোর কেটে লাফিয়ে উঠল সূর্য। আলোর ছোঁয়ায় গ্ল্যাডিয়েটারের চোখের ওপর ভেসে উঠল তার হারানো সংসারের ছবি। গ্ল্যাডিয়েটার তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নিজের ছেলেকে। মুম্‌বা বাপের বুকে মুখ গুঁজে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদতে লাগল। যে ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য এতদিন ধরে মরণপণ লড়াই করে এসেছে, মুক্তির জন্য স্বপ্ন দেখেছে প্রতিরাতে, সে নিজেই এসে ধরা দিল তার বুকের মাঝখানে। হুহু করে গ্ল্যাডিয়েটারের চোখ বেয়ে নামতে লাগল জলের ধারা। সেই পবিত্র চোখের জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল বুক থেকে ঝরে পড়া রক্ত।

এরপর পিতাপুত্রে মিলে আহত তৃতীয় মানুষটিকে তুলে নিল এরেনার ধুলো থেকে। তারা তিনজনে দাঁড়িয়ে রইল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

সম্রাট যখন জানতে পারলেন রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্ল্যাডিয়েটার মুম্‌বারই পিতা তখন তিনি ঘটনার আকস্মিকতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করলেন, আজকের এরেনায় অংশগ্রহণকারী তিনজনকেই আমি মুক্তি দিলাম।

কে যেন মুম্‌বার কানে কানে বলল, তুই কি এই সামান্য মুক্তিতেই তুষ্ট হবি মুম্‌বা!

হঠাৎ একটা আলোর রশ্মি এসে পড়ল মুম্‌বার চেতনায়।

মুম্‌বা বলল, মহামান্য সম্রাট, আপনার দয়ার তুলনা নেই। এর সঙ্গে আমি আর একটি ভিক্ষা জানাব আপনার কাছে।

সম্রাট বললেন, অবশ্যই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। তাছাড়া রোম ত্যাগ করে দেশে যাবার সময় তুমি তোমার আগের প্রাপ্য

উপহারটি চেয়ে নাও। আমার দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে পারলে আমি গভীর আনন্দ লাভ করব।

মুম্‌বা বলল, আপনার কাছ থেকে কেবল সেই উপহারটুকুই আমি প্রার্থনা করে নেব সম্রাট।

সমবেত দর্শককুল নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল মুম্‌বার দিকে।

ক্ষণকাল মাথা নিচু করে পরক্ষণেই মুখ তুলে বলতে লাগল মুম্‌বা, সম্রাট, আমি অতি তুচ্ছ এক ক্রীতদাস। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু জেনেছি, তাতে বুঝেছি, রোম সাম্রাজ্যের নাম পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু মহামান্য সম্রাট আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না এমন সভ্য একটি দেশের নাগরিকরা কেন এত রক্ত চান! মানুষে মানুষে, পশুতে মানুষে মরণপণ লড়াই বাধিয়ে তাঁরা কি আনন্দ পান? অসহায় মানুষগুলোর শরীর থেকে যখন ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে তখন রোমের নারী-পুরুষেরা কেন এত উল্লাসে ফেটে পড়েন? পশুরা খাবার দরকার না পড়লে প্রাণী বধ করে না, কিন্তু মানুষ নিছক উত্তেজনার লোভে মানুষ মারার খেলায় মেতে ওঠে কেন?

উপবিষ্ট নাগরিকেরা নীরব। স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন সম্রাট। শুধু সময় চলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে।

সেই ক্রুশবিদ্ধ সাধুকে মুম্‌বা চোখের সামনে দেখতে পেল। সম্রাটের পেছনে ঠিক যেখানটিতে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন সাধু।

মুম্‌বা বলল, এখন আমি আমার প্রিয় সম্রাটের কাছে আমার সামান্য প্রার্থনাটি জানাব।

সম্রাট, আপনি আপনার একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য আমাকে যে কোনো রকমের পুরস্কার চেয়ে নিতে বলেছিলেন। আজ সেই পুরস্কারই আপনি আমাকে দিন। আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ, অল্পে সন্তুষ্ট। আমি নিজের জন্য কোনো রাজ্যও চাই না, মুক্তিও চাই না। কেবল আপনার কাছে প্রার্থনা, মানুষে মানুষে এই ভয়ংকর মৃত্যুর খেলা বন্ধ হোক। একমাত্র আপনিই পারেন সম্রাট, রোমবাসীর মন থেকে এই রক্তের লোভ দূর করতে।

সম্রাট মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালেন আপনার আসন ছেড়ে। দক্ষিণ হাতখানি ঊর্ধ্বে তুলে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে রোম সাম্রাজ্যে বন্ধ হলো গ্ল্যাডিয়েটারদের জীবনমরণ লড়াই। অতঃপর সবকটি এরেনার দ্বারও রুদ্ধ করে দিতে হবে। সমস্ত বাস্টুয়ারী (এরেনার মালিক) তাঁদের আখড়ায় নিযুক্ত গ্ল্যাডিয়েটারদের মুক্তি দেবেন বিনা শর্তে।

চারশত চার খ্রীস্টাব্দে সম্রাট হনোরিয়াস এই মহা ফরমানটি জারি করলেন।

শীতের শেষ, বসন্তের শুরু। সোনালী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে জাহাজঘাটায়। দলে দলে বন্ধনমুক্ত গ্ল্যাডিয়েটাররা সমবেত হয়েছে নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য। তাদের চোখেমুখে উপচে পড়ছে আনন্দ, উচ্ছ্বাস আর স্বপ্ন। ভোরের একঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে উড়ে গেল আকাশপথে।

রাজহাঁসের মতো সাদা পালতোলা একটা জাহাজ সাড়া জাগিয়ে এসে দাঁড়াল বন্দরে। একে একে সেই জাহাজে উঠতে লাগল গ্ল্যাডিয়েটাররা।

হঠাৎ ঘর্ঘরধ্বনি তুলে জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল একখানা রথ। সেই রথ থেকে নেমে এল এক সম্ভ্রান্ত তরুণী। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সে জাহাজের দিকে। হাতে একগুচ্ছ নীল ফুল।

মুম্‌বা, মুম্‌বা।

নিজের নাম শুনে ফিরে দাঁড়াল মুম্‌বা। দুহাতে ভিড় ঠেলে সে তরুণীটির দিকে এগিয়ে গেল।

তরুণী বলল, তুমি আমাকে চিনতে পার?

মুম্‌বা অনাবিল একমুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, তোমাকে কি করে ভুলে যাব হেলেন। আমার কিশোর বয়সের ক'টি দিন যে কিশোরীটি হাসি, গান, ফুল, পাখি দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিল, তাকে কি কোনোদিন ভোলা যায়?

জাহাজ ছাড়ার সংকেত বাজল। হেলেন মুম্‌বার হাতে ফুলের গুচ্ছটি ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমরা যতদূরেই থাকি, চিরদিন বন্ধু হয়েই রইব।

ছবিঃ বিজন কর্মকার

হাসতে ভুলে যাচ্ছ কেন?

অশোক সী

হাসতে ভুলে যাচ্ছ কেন?
দুঃখ যতই থাক না,
দুঃখটাকে করতে ঘায়েল
দাও সে হাসির টাকনা!

দুঃখ যদি হয় রে বাসী
থাকে শোকের দ্বন্দ্ব,
ছড়িয়ে দিও মুচকি হাসির
আতরটুকুর গন্ধ!

দুঃখ যদি হয় টাটকা
মুখটি হলে গোমড়া,
বিটলে হাসির মুক্তো-মণি
ছড়িয়ে দিও তোমরা!

দুঃখ যদি হয় রে তেতো—
টক-নোনতা-ঝাল কী,
দমকা হাসির মিষ্টিভরা
দোলাও সুরের পালকি!

দুঃখ যদি জব্দ করে
জোয়ান-বুড়ো-বাচ্চা,
হরেক হাসির কোরাস গেয়ে
কান মুলো তার আচ্ছা!

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

নর্দ

অগ্নিমিত্র

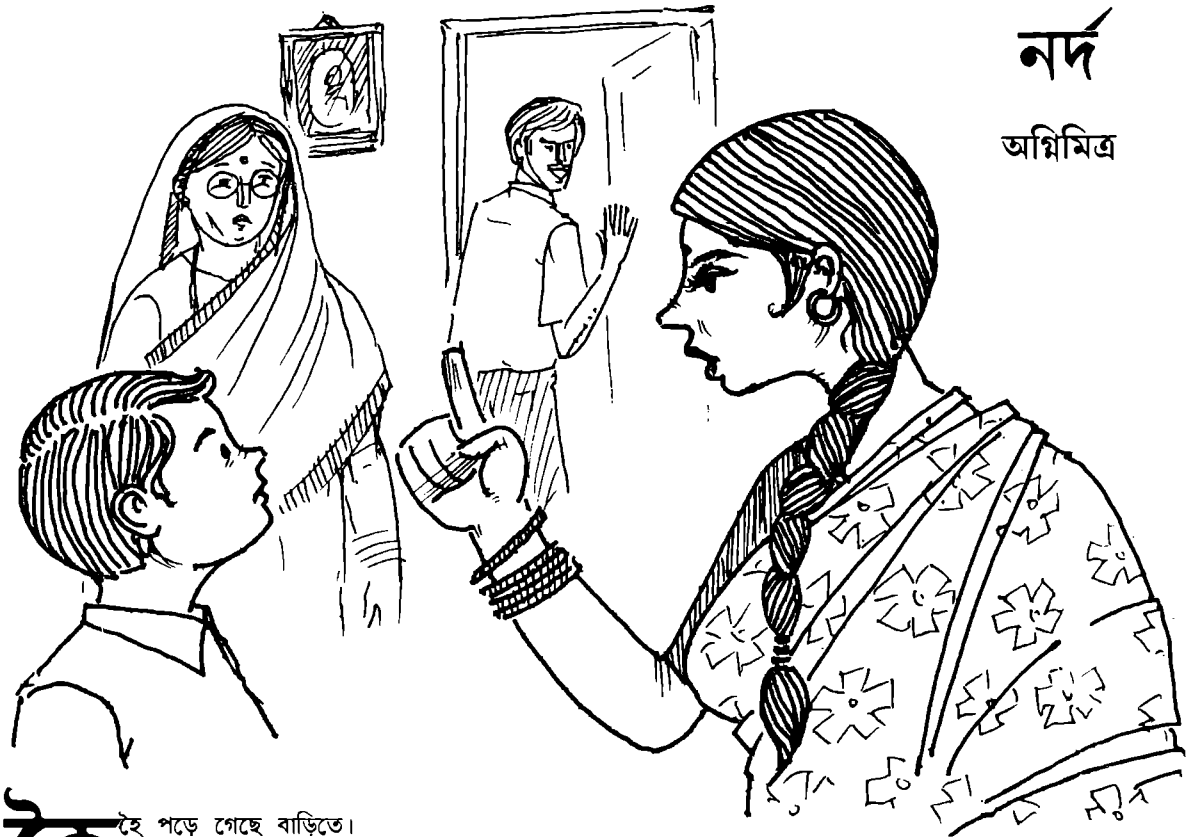

হৈ হৈ পড়ে গেছে বাড়িতে।

কিছুক্ষণ আগে পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে ফিরেছে টাবলু। ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ টু-তে ওঠার বার্ষিক পরীক্ষা। আজ দ্বিতীয় দিনে ছিল ইংরেজী। টাবলুর পিসি কণা তাকে স্কুল থেকে নিয়ে এসেছে। তখন থেকেই কণার মুখ গম্ভীর। ঘরে ঢুকে সে একেবারে ফেটে পড়ল।

উঃ, কি গাধা ছেলে রে বাবা! সব জানিস, সব পড়িয়ে দিয়েছি তবু এত সোজা একটা কথার মানে ভুল করে বসলি?

টাবলুর দাদু আর ঠাকমা দুজনেই ঘরে ছিলেন। ঠাকমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, আহা, অমন করে বকছিস কেন? যা বাপু, এখন কিছু খেয়ে নিতে দে–

কণা ঝাঁজের সঙ্গে বললে, তুমি আর আস্কারা দিও না তো মা! আমি পেস্ট্রি আর আইসক্রীম নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো খেয়েছে। ছি ছি ছি, এই রকম একটা ভুল করে এলি। মিস যে ঘচ ঘচ করে দু'টো নম্বর কেটে নেবেন তারপর আর তুই ফার্স্ট হতে পারবি?

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, কী এমন ভুল করেছে যে অমন করে বকছিস? পরীক্ষায় দু'একটা ভুল তো হতেই পারে?

কণা আরো রেগে গেল –তোমরা আদর দিয়ে দিয়েই এটাকে বাঁদর করে তুলবে বাবা! জানা না থাকলে ভুল করতে পারে, কিন্তু জানা শব্দের মানে ভুল করবে কেন? কোকোনাট মানে নারকেল, আম্ব্রেলা মানে ছাতা, র‍্যাবিট মানে খরগোশ–এগুলো তো ঠিকই লিখেছে, এমন কি ওয়াইল্ড মানে বন্য ওর পক্ষে বেশ কঠিন–সেটাও লিখেছে অথচ ড্রেন মানে নর্দমা এটা জানা থাকা সত্ত্বেও ভুল লিখে এলো?

টাবলুর ঠাকমা এগিয়ে এসে নাতিকে নিজের হাতের আড়ালে নিয়ে বললেন, এখন ছেড়ে দে মা। একটা ভুল করে ফেলেছে তা কী আর করা যাবে?

কণা রেগেমেগে সোফায় বসে পড়লো। তার নিজের কলেজের পড়াশোনার চাপ যতই থাক, সেই কে-জি ক্লাশ থেকে টাবলুকে সে পড়িয়ে আসছে। মাস পাঁচেক হলো টাবলুর একটা সুন্দর ফুটফুটে বোন হয়েছে। তারপর থেকে সে পিসির কাছেই শোয়। যখনই ফাঁক পায় ছুটে গিয়ে মাকে আদর করে আসে। বোনকে সে একটুও হিংসে করে না। বরঞ্চ পুঁচকে বোনটা নেহাৎই ছোটো বলে নিজের অধিকার অনেকটা সে বোনকেই ছেড়ে দিয়েছে। কেবল সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় আর রাতে পিসির কাছে ঘুমোতে যাওয়ার সময় মায়ের কাছে অনেকগুলো চুমু খাওয়া তার চাই।

কণার গলা শুনে টাবলুর মা নন্দিতা এঘরে এসে দাঁড়ালো। নন্দিতার স্বভাব বড়ো নরম। আজ পর্যন্ত ছেলের গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, জোরে ধমক দিয়ে একটা কথা পর্যন্ত কোনোদিন বলেনি। একটু গম্ভীর মুখে তাকালেই যথেষ্ট। মায়ের সেই চাউনি দেখলেই টাবলুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে। কখনো কখনো কান্নাও পেয়ে যায়। মনে মনে ভাবে, আর কোনোদিন সে একটুও দুষ্টুমি করবে না।

নন্দিতা বললে, কী হয়েছে কণা?

কণা সঙ্গে সঙ্গে বললে, জানো বৌদি, ড্রেন মানে লিখে এসেছে নর্দ। দু'টো নম্বর তো কাটা যাবেই! সেই কে-জি ওয়ান থেকে প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে আসছে অথচ এবার যে কী পোকা ওর মাথায় ঢুকলো, উঃ!

নন্দিতা একটু হেসে বললে, কী আর করা যাবে বলো! ভুল যখন করেই ফেলেছে তখন আর তো কোনো উপায় নেই? কাল অঙ্ক পরীক্ষায় যাতে একশো নম্বরই ঠিক করতে পারে এখন সেইটে দ্যাখো। কি টাবলু, পারবে না?

টাবলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, পারবো।

কণা আরো রেগে গিয়ে বললে, ঘোড়ার ডিম পারবি। হয়তো দু'য়ের সঙ্গে দুই যোগ করে পাঁচ লিখে বসবি। আচ্ছা, ড্রেন মানে যে নর্দমা তা তোর জানা নেই?

টাবলু মুখ গোঁজ করে বললে, বইয়ে ছাপা আছে।

কণা কী বলবে বুঝতে না পেরে মা, বাবা, বৌদি সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললে, ছেলের উত্তর শুনলে? বইয়ে ছাপা আছে! সেটা তুই পড়িসনি? আমি তোকে পড়াইনি?

টাবলু বললে, তুমি পড়িয়েছ, আমি পড়িনি।

কেন পড়িসনি?—কণা টাবলুর একখানা হাত ধরে কাছে টেনে নিল, কেন পড়িসনি বল?

এই সময় টাবলুর কাকা অলোক ঘরে ঢুকলো। সে একটা কলেজে পড়ায়। হাতে ব্যাগ নিয়ে কলেজে রওনা হচ্ছে। ভেতরের ঘর থেকে সব কথাবার্তাই সে শুনেছে। হেসে বোনকে বললে, ছেড়ে দে বাপু! ওইটুকু বাচ্চা একটা ভুল করেছে তো কী হয়েছে? ওর মতো বয়সে আমরা কত ভুল করেছি তার ঠিক আছে?

কণা আরো রেগে গিয়ে বললে, তোমরা সবাই মিলে প্রশ্রয় দিলে ওর লেখাপড়া কিছুতেই হবে না! তুমি তো আর পড়াও না? আমাকেই পড়াতে হয়। ওর মাথা যথেষ্ট ভালো। ইচ্ছে করেই এইসব দুষ্টুমি করে! কী উত্তর দিল, শুনেছ? বইয়ে ছাপা আছে!

টাবলুও পিসিকে খুবই ভালোবাসে। সে-ও জানে, পিসি যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ সব সময় তাকেই পিসির কাছে কাছে চাই। পিসির বকুনির মুখে পড়ে সে একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল। চারদিক তাকিয়ে একটু ভরসা পেয়ে বললে, আমি তো ইচ্ছে করেই নর্দ লিখেছি!

শুনলে ছোড়দা? শুনলে বৌদি?—বলেই টাবলুর হাতখানা চেপে ধরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, জেনে শুনেও কেন ইচ্ছে করে ভুল লিখলি, বল!

টাবলুও একটু গলা চড়িয়ে উত্তর দিলে, ড্রেন মানে তো নোংরা। ছাই, পচা, বিচ্ছিরি। মা কি কখনো নোংরা, পচা, বিচ্ছিরি হয়? আমি মা লিখব না—লিখব না—লিখব না! কাটুকগে নম্বর, মা আমি কিছুতেই লিখব না—

অলোক হাতের ব্যাগ রেখে একটানে টাবলুকে বুকে তুলে নিয়ে বললে, বাঃ রে বেটা, সাবাস্! ঠিক বলেছ বাপি, মা কখনো নোংরা, পচা, বিচ্ছিরি হয় না। তুমি ঠিকই লিখেছ!

সবাইয়ের চোখে জল। ভাইপোর গালে কয়েকটা চুমু দিয়ে অলোক তাকে নামিয়ে দিতেই কণা তাকে বুকে টেনে নিলে। তারও চোখে জল এসে গেছে। টাবলুকে বুকে জড়িয়ে বললে, তুমি এই জন্যে মা বাদ দিয়েছ? আগে বললেই হতো?

পিসির বুকে মুখ গুঁজে টাবলু বললে, তুমি বলতে দিলে কই?

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

এক যে ছিল

আশিস সান্যাল

এক যে ছিল শেয়াল,
তার ছিল এক মেয়ে;
সেদিন ভোরে বেজায় খুশি
উঠলো হঠাৎ গেয়ে।

আর এক ছিল ভালুক,
তার এক ছোট ছানা;
কম বা কিসে দোষে-গুণে
বাদ্যি বাজায় নানা।

সারা বনে খুশির জোয়ার
নাচ আর গানের ধুম;
শব্দে তাতে হালুম বাঘের
ভাঙলো হঠাৎ ঘুম।

দারুণ রোষে বললো হেঁকেঃ
'সাহস এমন কার?
আন তো ধরে সব কটাকে
মটকে খাবো ঘাড়।'

লেজটি নেড়ে শেয়াল বলেঃ
'আপনি হলেন রাজা—
দয়া করে একটি বার
মাপ করে দিন সাজা।'

মৃদু হেসে হালুম বাঘা
দু'চোখ মেলে কয়ঃ
'আয় না তবে আমার কাছে
করিস কেন ভয়!'

কাছে যেতেই মারলো থাবা
দু'হাত তুলে তার;
ছিটকে শেয়াল পড়লো দূরে—
মটকে গেলো ঘাড়।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

রথের দিনে

মহাশ্বেতা দেবী

এ বছর বর্ষা খুব জাঁকিয়ে নেমেছিল। রথযাত্রার দশদিন আগে কি বিষ্টি, কি বিষ্টি তা ভাবতে পারবে না। নদী-নালা ভেসে গেল। এ পুকুরের জল ও পুকুরে গিয়ে ঢুকল। বড় বড় মাছ কত এ পুকুর থেকে ও পুকুরে চালান গেল কে বলবে?

এমন বিষ্টিতে বেরোবে কে? রামমোহন একতলার জানলায় বসে বিষ্টি দেখছিল। এমন বিষ্টিতে ভাসাভাসি মাঠঘাটকেই কি সমুদ্দুর বলে?

ফুলি বারবার জিগ্যেস করছিল, অ মোহন দাদা, বল না গো, এত জল হলে কি সমুদ্দুর হয়?

আমি জানি? আমি সমুদ্দুর দেখেছি?

তা'লে ভশচাজ মশাইকে জিগ্যেস করো?

তুই জিগ্যেস কর গে যা। তোকে বলবে না অবিশ্যি। কিছুতেই বলবে না।

কেন বলবে না গো?

ভশচাজমশাই বোকা মেয়েদের দেখতে পারে না। শুধু, শুধু কেমন ছেলেদের ভালবাসে তা জানিস?

কেমন ছেলেদের?

আমার মতো দশ বছরের ছেলেদের।

ইশ! আমি ফুল তুলে দিই, নেয়। আমার বাবার সঙ্গে কত গল্প করে তা জান?

সমুদ্দুর অন্য রকম।

বল না গো, কি রকম!

মস্ত বড়। এপার ওপার নেই। সব জলে জলাক্কার। ভশচাজ-মশাই দেখেছে তো!

সে তো পুরীতে, জগন্নাথের মন্দিরে।

সেই তো! হেঁটে হেঁটে, বালির দেশ পেরিয়ে সেই কত দূরে!

আমিও যাব একদিন।

এইটুকুনি মেয়ে, সন্ধ্যে হলে বাড়ি যেতে ভয় পাস, দুগ্গাপুজোয় বলির ঢাক শুনলে ভয় পাস, গঙ্গা বুড়ি জটা দুলিয়ে ভিক্ষে করতে এলে ভয় পাস, তুই যাবি অতদূর?

ফুলি রাঙা কাপড়টি গাছকোমর করে জড়িয়ে বলল, বাবা বলেছে আসছে বছর যদি টাকা যোগাড় হয়, অনেক সেথো জুটিয়ে আমাদের সকলকে নিয়ে পুরী যাবে।

হেঁটে হেঁটে?

ফুলি হেসে কুটিপাটি। অ মোহন দাদা! সাত বছরে আমার যত বুদ্ধি আছে, দশ বছরে তোমার তা নেই। মা, পিসি, আমি, গজুদাদারা সবাই, জ্যাঠা, জ্যেঠি, সব হেঁটে যাবে? সার সার গরুর গাড়িতে যাব। অনেক, অনে-ক দিন পরে আসব। সেথা রথ দেখব যে!

আমিও যাব।

তোমার মা যেতে দিলে তো? দিত, নিশ্চয় দিত। কিন্তু তুমি দস্যিপনা করো, গাছের ডাল থেকে পুকুরে ঝাঁপ মারো, কোন ভরসায় ছাড়বে?

সমুদ্দুর দেখবই আমি একদিন। সাতটা সমুদ্দুরই দেখে আসব। বিষ্টি পড়লে সমুদ্দুর না কি ক্ষেপে ওঠে।

সে কবে দেখবে?

ঠিক দেখব। আগে বড় বড় জায়গাগুলো দেখি, হুগলী, বর্ধমান, কলকেতা, কিছু দেখিনি।

আর কলকেতা! এখন রথটা দেখতে পাও কিনা দেখ। আমি তো সমানে বলছি, নেবু পাতায় করমচা! হে বিষ্টি, ধরে যা!

অমনি করে বললে বিষ্টি ধরে?

তুমিই বলো?

বলতে পারি, যদি মায়ের ভাঁড়ার থেকে নারকোলের সন্দেশ আনতে পারিস চুরি করে।

চুরি করব কেন? আমি চাইলেই জ্যেঠিমা দেবে।

মল ঝমঝমিয়ে ছুটে গেল ফুলি, আর চারটে নারকোলের

ছাপা নিয়েও এল। বলল, বলো?

তুইও বল?

নেবু পাতায় করমচা
হে বিষ্টি ধরে যা!
উত্তরে যা দক্ষিণে যা
হেথা হতে চলে যা!

ফুলি বলল, কমবে?

কমবে না মানে? রথ টানব না আমরা?

রথের দিনে বিষ্টি নাকি হতেই হয়?

এবারে হবে না।

রামমোহনের কথা কি আকাশের দেবতা শুনেছিল, না রথের দেবতা, কে জানে! রথের দিনে সকালে দেখা গেল সাঁ সাঁ করে মেঘ ভেসে চলে যাচ্ছে। বেলা হতে ফ্যাকাশে রোদ উঠল। যে যার কাঁথা কানি কাপড় মাদুর রোদে দিচ্ছে। উঠোনের পাতা, বাগানের ভাঙা ডালপালা সরিয়ে পাঁজা করছে। এর মধ্যেই ড্যামডেমিয়ে বড় বাড়ির রথ বেরোল।

ফুলি বলল, বাপরে রথের চুড়ো!

কেমন সাজিয়েছে দেখ?

ভশচাজমশাই বললেন, এ কি পুরীর রথ? সে আকাশ পানে মাথা, একেকটা চাকা কি বড়। রথের নিচে কত্‌জনা মাথা পেতে দেয় জানিস?

কেন ভশচাজমশাই?

রথের চাকায় মরলে যে মহা পুণ্যি হয়।

ফুলি বলল, ইস! আমাদের রথের চেয়ে সে রথ ভাল?

দেখিসনি তো, দেখলে বুঝতিস।

রামমোহন বলল, সমুদ্দুরের চেয়ে রথ বড়?

সমুদ্দুর হলো জল! এই নীল জল, এই সাদা বালি, কত কড়ি ঝিনুক পড়ে থাকে! সেবার এনে দিলাম না তোকে?

ফুলি বলল, একবার আমরাও যাব, তাই না মোহন দাদা? নয় হেঁটে হেঁটে যাব, বালি দেখব, সমুদ্দুর দেখব, রথ দেখব!

হ্যাঁ রে ফুলি। আমি তো একলাই চলে যাব।

যাবে, যাবে রামমোহন অনেক দেশে যাবে। অনেক কিছু দেখবে। মায়ের শাসনে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে শুধু পড়াশুনো, সময়ে স্নান-আহ্নিক, চরণামৃত খাওয়া, কত ধান, কত চাল, কোন কাছারির কোন নায়েবকে তাড়াতে হবে, এ সব শুনতে ভাল লাগে না রামমোহনের। সন্নেসীরা হেঁটে হেঁটে হিমালয়ে যায়, সমুদ্রের পাড়ে যায়। রামমোহনও যাবে।

কি ভাবছ মোহন দাদা?

তুই কি করে যাবি ফুলি? তোর বাড়ির লোকরা না গেলে আমার সঙ্গে তোকে যেতেই দেবে না।

ফুলি বেড়াবিনুনী বাঁধা মুখটি তুলে হেসে বলল, পালিয়ে যাব? তুমি আর আমি?

তাই যাস।

ওই দেখ, আমার খেলুড়ীরা ডাকছে। আমি যাই গো মোহন দাদা।

মল ঝমর ঝমর বাজিয়ে হলুদ শাড়ি গাছকোমর বেঁধে ফুলি দৌড়চ্ছে আর হাততালি দিয়ে বলছে,

তোদের হলুদ মাখা গা
তোরা রথ দেখতে যা
আমি হলুদ কোথা পাব?
আমি উল্টোরথে যাব।

পাগলী, আস্ত পাগলী একটা ফুলি! কত কথা যে বলে, তার মানেই হয় না। সিজমনসা গাছের নিচে একটি ছোট্ট মাটির ঘট ভরে দুধ ঢেলে দেবে।

ও কি করিস ফুলি?

ও মা, তাও জান না? উনি যে মনসা গো! ওঁকে দুধ দিলে উনি তুষ্ট থাকবেন, বাড়িতে কাউকে সাপে কাটবে না।

রামমোহনের মা ফুলিকে ভালবাসেন। কাছে বসিয়ে রামায়ণের গল্প বলেন, দুর্বো বেলপাতা বাছতে শেখান। ফুলির বাবা বড্ড রাগী লোক। সব সময়ে ধমকে কথা বলেন। সে জন্যেই তো ফুলি এ বাড়িতে ছুটে ছুটে আসে। কত আবদার যে করে!

পদ্মবিল থেকে পদ্ম এনে দেবে মোহন দাদা?
সিঁদুরমণি গাছের আম পেড়ে দেবে?
কেমন করে মাছ ধরো? শিখিয়ে দেবে?

সব সময় মোহন দাদা, মোহন দাদা, মোহন দাদা! হয়তো ও রামমোহনের জ্ঞাতি বোনই হবে। এ গ্রামে বামুনপাড়াই তো মস্ত বড়। এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যে কেমন সব সম্পর্কও আছে। সে ভশচাজমশাইয়ের খাতায় সব লেখা আছে। তবে কে যে কার কেমন আত্মীয় তা রামমোহন জানে না।

তাছাড়া রামমোহনের বাবা রামকান্ত রাধানগর গ্রামে একজন বড়লোক। ওদের পাকা বাড়ি, তিন মহলা। ফুলিদের বাড়ি তো মাটির ঘর। দিব্যি উঁচু ঘর, খড়ের চাল, বড় বড় ধানের গোলা আছে, সম্পন্ন গৃহস্থ যাকে বলে। ফুলির মা বলেন, ফুলি দস্যি মেয়ে। সব সময়ে এলতলা বেলতলা ঘোরে। কবে একদিন ভূতে ওর ঘাড়টি মটকে দেবে।

ফুলি বলে, অ মোহন দাদা, এ কথা সত্যি?

কি কথা?

আমার জ্যাঠাদের বাঁশবাগানে নাকি ভূত আছে?

দূর! আমি তো দেখিনি।

কি জানি বাবা! শুনলে ভয় করে। তোমার ভয় করে না?

না। ভূত দেখলে তো ভয় পাব! দেখলামই না, ভয়টা পাব কোত্থেকে?

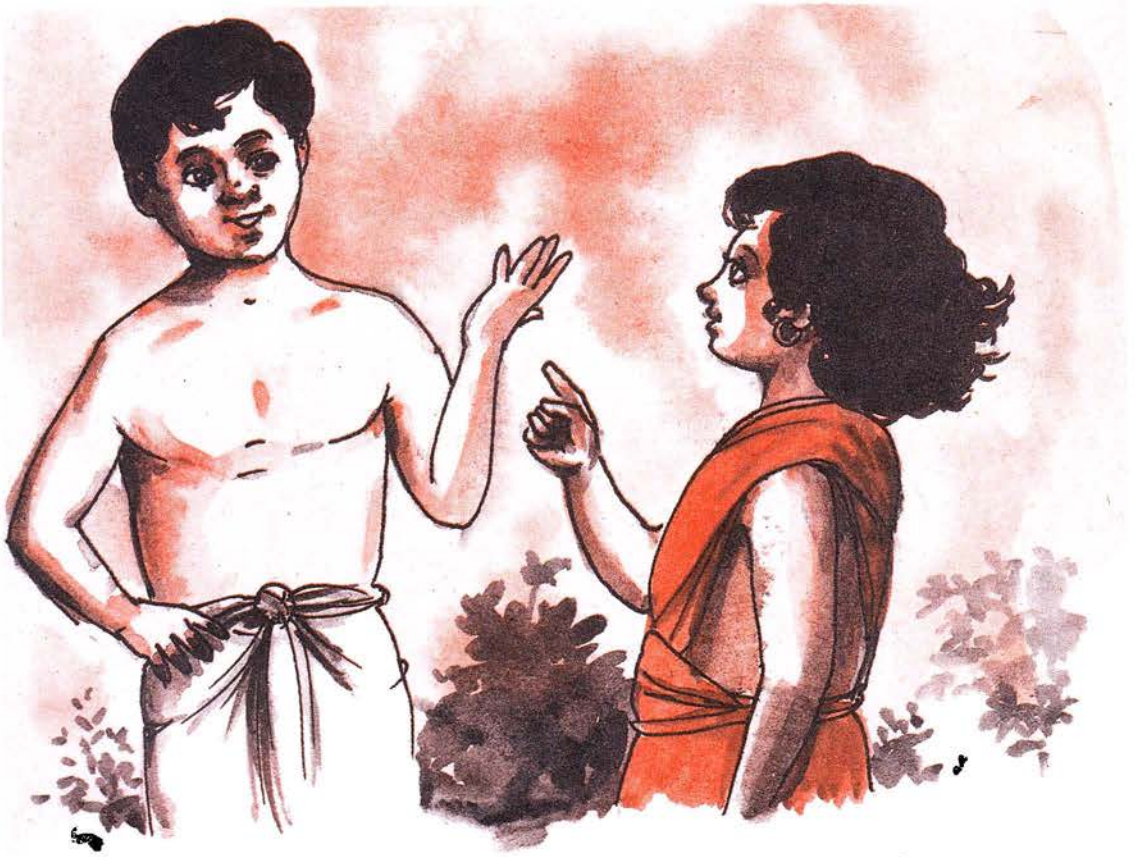

তোমার হয়ে কত ঝগড়া করি সকলের সঙ্গে।

এ সব শুনলে ফুলি ছোট্ট তর্জনীটি তুলে বলে, সেজন্যেই তো তোমাকে সবাই বলে দস্যি ছেলে।

তুই কি বলিস?

তোমার হয়ে কত ঝগড়া করি সকলের সঙ্গে। বলি তুমি ভালো, তোমার মনে দয়ামায়া আছে। তুমি মোতি বুড়ীকে একটা কাঁথা দিয়েছ মাঘ মাসে, আমার চন্না পাখির পা ভেঙে গেলে হাড়জোড়া লতা বেটে লাগিয়ে ওর পা ভাল করে দিয়েছ। আর, আরো কত কি!

এ সব কথা হয়েছিল ও বছর রথের আগে। ও বছর রথের আগে কি বিষ্টি হয়েছিল, রাধানগর কেন, মুণ্ডেশ্বরী নদীর পুবে পশ্চিমে এমন বিষ্টি অনেককাল হয়নি। মুণ্ডেশ্বরী আর কানা দামোদরের দু' পাড় ভাসাভাসি, পুকুর ভেসে মাছ ঘরের উঠোনে, আর মোতি বুড়ী রামমোহনদের বারুদালানের কোণে বসে বলছিল, পেল্লয় কাণ্ড মা, পেল্লয় কাণ্ড!

রথের দিনে আকাশ ফর্সা হয়ে গিয়েছিল।

রথের পরের দিন ও মা! রামমোহনের সেথো, পাঠশালার পোড়ো জগাই এসে বলল, কাণ্ড শুনিছিস?

কি আবার কাণ্ড? বাজে-পোড়া তালগাছটা পড়ে গেছে, এই তো?

না রে না! কাল রাত্রে ফুলির বে' হলো যে!

সে কি রে?

কি থপথপে বুড়ো রে! নাপিত সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে টাকা পয়সা নিচ্ছিল। বিষ্টিতে তো জলে জলাক্কার সব! এখানে শিবমন্দিরে উঠিছিল। ঠাকুরমশাই সব বলেছে, এ গাঁয়ে কুলীন বামুন ক'ঘর, কার কার আইবুড়ো মেয়ে আছে। শুনে টুনে বলে, এখেনে বে' হয় না? ঠাকুরমশাই ফুলির বাপকে ডেকেছে। ব্যস, হুট বলতে ছোট্ কটক! কাল রাতে ফুলির বে' হয়ে গেছে। এখন একুশ টাকা নিয়েছে, পরে এসে একশো এক টাকা পুষিয়ে নিয়ে যাবে।

কি কাণ্ড!

কুলীন বামুনদের কাণ্ড!

সেও বটে। কুলীন বামুনরা এরকমই হয়। একশো দু'শো বিয়ে করে। রাধানগর গ্রামে এমন কত মেয়ের বিয়ে হয়, কত কচি কচি মেয়ে বিধবা হয়। ফুলির পিসি নাকি সাত বছরে

বিধবা হয়, রামমোহন চিরকাল বিন্দুপিসিকে সাদা থান পরে থাকতে দেখেছে।

মাঝে মাঝে বর মরে গেলে মেয়েরা সতীও হয়। তারা নাকি হাসতে হাসতে গিয়ে চিতায় বসে আর জ্বলে যায়।

সবাই দেখতে যায়, রামমোহন কখনো যায় না।

পুজোয় পাঁঠা বলি, মোষ বলির ঢাকের শব্দ, সতীদাহের সময় ঢাকী ঢুলির ঢাকঢোলের শব্দ শুনলেই রামমোহন ছুট লাগায়। দূরে, দূরে, ধানক্ষেত পেরিয়ে অনেক দূরে।

মাঝে মাঝে জেলেপাড়া চলে যায়। রেবতী জেলেনী বলে, কি ঠাকুর! ভয় পেয়েছ?

রামমোহন কথা বলে না।

ধন্যি বাবা বামুনের ঘর! মেয়েছেলেকে বেঁধেছেঁদে চিতায় সমপ্পন? কি করে পারে?

তোমরা কখনো অমন কর না, না?

কেন করব? কিসের দুঃখে?

ফুলির তবে বিয়ে হয়ে গেল? বিয়ের পরে....

জগাই! বরটা যদি মরে যায়?

সে তো যাবেই। বুড়ো হাবড়া না?

তখন কি....ফুলিকেও....?

কে জানে!

সেদিন নয়, পরদিন সকালে ফুলি মল ঝমঝমিয়ে এসে হাজির। সিঁথেয় সিঁদুর, হাতে রাঙা কড় আর লোহাটা নতুন।

এসেই বলল, অ মোহন দাদা, আমার বে হয়েছে জানো?

কি করে জানব? তুই বলিছিলি?

ও মা! আমি জানি নাকি? সাঁঝের বাতি দিইছি, জ্যেঠি বলল, হাত পা ধুয়ে মাদুরে বোস। তোর বে! কি কাণ্ড! জলে আটকা পড়িছিল বুড়ো! বাবা এনে ঘরে তুলল। কতবার জল দিইছি, দুধবাতাসা দিইছি, কে জানে তার সঙ্গে বে' হবে?

তোর বর গেল কোথা?

আমি জানি? কতগুলো নাকি বউ আছে, খাতায় লিখে রেখেছে সব, তাদের বাড়ি যাবে। মা আর জ্যেঠি কি কম? মাকড়ি, নোলক, সব খুলে রেখেছে। কত্ করে বললাম, নতুন ডুরেটা দাও, পরি। তা মা বলল, যখন ঘর করতে যাবি, তখন সব গুছিয়ে দোব।

তা এখন কি মনে করে?

দেখ না, কি এনেছি। মা নাড়ু ভেজেছিল, আর বড় বড় কদমা এনেছিল বাবা, তোমার আর আমার জন্যে লুকিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। দাঁড়াও, তোমার মাকে পেন্নাম করে আসি।

ফুলি নাচতে নাচতে চলে গেল। রামমোহনের হাসি পাচ্ছিল। ফুলি এখনো পুতুলের বিয়ে দেয়, ওরই বিয়ে হয়ে গেল!

রামমোহনের মা বললেন, সেই তো ভালো। বামুনের মেয়ে, সাত-আট বছরেই তো বে' হয়। আমার মা'র বে' হয়েছিল ছ'বছরে, জানিস?

তোমার বাবা কত বড় তখন?

এগারো বছর।

আমি অমন বিয়ে করবই না।

ও মা, কি করবি?

বাবা বলেছেন, আমি অনেক পড়ব। ফারসি শিখব, ইংরিজি শিখব।

মা নিশ্বাস ফেললেন।

এখন তো ফারসি না শিখলে চলেই না।

ফুলি বলল, আমিও ফারসি শিখব।

রামমোহন বলল, হ্যাঁ, তুই সব শিখবি! বাংলাই জানিস না।

শিখতে দেবে নাকি বাবা? মেয়েছেলের নাকি লেখাপড়া শিখতে নেই।

খেলতে আছে তো? যা, খেলতে যা। রাতদিন খেলা, খেলা, খেলা!

খেলবই তো! বাবা বলেছে, চুঁচড়ো থেকে রথ এনে দেবে। পরের বছর আমরা সেই রথ টানব, কেমন?

রামমোহনের মা সস্নেহে বললেন, টানবি, টানবি। দেখিস, পোটো পাড়া থেকে তোকে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা এনে দেবে মোহন।

শোলার কদম?

তাও এনে দেবে।

তবে আর কি? যাই?

যেন ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে দৌড়ে চলে গেল ফুলি।

এক বছর কেটে গেল। এ বছর রথের সময় দেখ আকাশ ঝকঝকে, নির্মেঘ। জ্যৈষ্ঠ থেকেই আকাশ মুখ ফিরিয়েছে। আষাঢ়েও বিষ্টি নামে না।

সবাই বলল, এ মহা দুর্লক্ষণ! এমন হলে এ বছর আশ্বিনে ঝড় জল হবে, নয়তো বান বন্যা হবে, মাঠের ধান, গাছের ফল, সব নষ্ট হবে।

মন্দিরে মন্দিরে পুজো, শ্মশানকালীর মন্দিরে যাগযজ্ঞ চলেছে সাত দিন। এর মধ্যেই রথের দিন এসে গেল। ফুলির এতটুকুন রথ, তাতে এতটুকু জগন্নাথ, ফুলি তাতেই খুশি। রথের আগের দিন ফুলি বলে গেল, কিছু ভেব নাগো মোহন দাদা। রথের দিনে জল হতেই হবে। এ হলো রথের নিয়ম।

রথের নিয়ম?

আহা! রথযাত্রার নিয়ম। হাসছ কেন? আমি সব জানি, জান?

তারপর বলল, কাল রথ নিয়ে বেরুব খেলুড়ীদের সঙ্গে।

বাড়ি বাড়ি চিড়ে-কদমা-কলা তুলব আর আমাদের বাড়ি বসে সবই খাব।

অমনকে দিবি না?

তুমি কি খেলুড়ী? তুমি তো দাদা!

তুই আর বড় হবি না।

ইস! বোশেখে আট বছর হলো, তা জানো? এখন চাল বাছি, শাক বাছি, বড়ি দিতে পারি, পুজোর সাজ করতে পারি।

সব পারিস?

স—ব পারি। শুধু রাঁধতে পারি না। আগুন তাত সইতে পারি না গো। আগুনে বড় ভয়।

আগুনে বড় ভয় ফুলির!

কিন্তু রথের দিন সূর্য মাঝ আকাশে উড়ো উড়ো কালো মেঘে ঢাকা না পড়তে হঠাৎ যে সবাই ফুলিদের বাড়ির দিকে ছুটেছিল? ঢাকীরা ঢাক বাজাচ্ছিল, ঢুলী বাজাচ্ছিল ঢোল, ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, বুড়ী সবাই যে দৌড়চ্ছিল?

চিন্তা জেলেনী মাছচুপড়ি আছড়ে ফেলে চেঁচিয়ে বলেছিল, শুনেছো গো বড়মা? মুকুজ্জেদের ফুলিকে ওরা সতী কত্তেছে? ই কি নিয়মরীত গা?

রামমোহন চেঁচিয়ে বলেছিল, না!

"না" কি গো! এক রথযাত্তারায় ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বে! আর আরেক রথযাত্তারায় শুনি বর মরেচে পশশু দিনে। এখানে হেথা ফুলিকে তার বাপ সতী করবে।

ফুলিকে?

বাপের যে পুণ্যি হবে!

রামমোহনের বুকের মধ্যে পাথর ভাঙে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, সে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

সত্যিই তো মানুষে মানুষে রথ দোলের ভিড়। রাধানগরে যেন কেউ ঘরে নেই। যে যার কাজ ফেলে ছুটে এসেছে।

ছুটে এসে জগাই বলে, চ! গাছে উঠে দেখি।

না!

রামমোহন অনেক চেষ্টায় বলে, তুই ওঠ্। আমার, আমার পায়ে বেল কাঁটা ফুটেছে।

সর্, আমি উঠি।

জগাই আমগাছে তরতরিয়ে ওঠে।

রামমোহন বলে, জগাই.... ?

কি?

সত্যিই ফুলিকে.... ?

হ্যাঁ রে! মাকে জাপটে বসে আছে ফুলি। এক হাতে ওর রথ! ইশ্! কি সিঁদুর মাখাচ্ছে সব, কি আলতা ছোঁয়াচ্ছে পায়ে। সব খাবলে খাবলে ওর মাথার সিঁদুর নিচ্চে!

রামমোহন পাগলের মতো ছুটতে থাকে।

ক্...ক্....কেন?

ও বাবা! সতীর সিঁদুর ঘরে রাখলে কম পুণ্য? রতনের মাসি খোঁড়া নাতিটার মাথা ফুলির পায়ে ঠেকাচ্ছে।

ফুলি....কি....করছে?

ইদিক উদিক চাইছে আর মুখ লুকোচ্ছে মায়ের কোলে।

আর...ফুলির...মা?

ওকে টানতে টানতে নে যাচ্ছে ডুলির দিকে...

ঢাক হঠাৎ জোরে জোরে বাজে। আর রিনরিনে, আর্ত একটা গলা তীরের মতো উঠে যায় আকাশপানে, আগুনে দিও না মা গো! আগুনে বড় ভয় লাগে....

রামমোহন দু' কানে আঙুল দিয়ে পাগলের মতো ছুটতে থাকে। ঘর পেরিয়ে পথ, নয়ানজুলি, ধানক্ষেতের আল, ছুটতে থাকে, ছুটতে থাকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে আর ছোটে। ফুলির গলা ওর পেছনে তাড়া করে আসছে কেন? ছুটতে ছুটতে রামমোহন নদীপাড়ে উপুড় করা জেলে নৌকোগুলোর মধ্যে চলে যায়, দু'কানে আঙুল দিয়ে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ে। অজ্ঞান হয়ে যায়।

জ্ঞান যখন হয় তখন সূর্য ঢলে পড়েছে।

ঠাকুর! হুঁশ এয়েছে?

রেবতী দিদি? আমি কোথা গো?

আমার দাওয়ায়। কি সব্যনাশ হতো বল তো, সাপে কাটলে?

ভাল হতো, মরে যেতাম।

না ঠাকুর, অমন কথা বলে না!

কান পেতে থাকে রামমোহন। না, আর কোনো ঢাকঢোলের বাদ্যি নেই বাতাসে।

রেবতী সস্নেহে বলে, নাও, জল বাতাসা খাও। অজাতের ঘরে তুলেছি, মাথায় জল ঢেলেছি, দোষ যা হবার তা হয়েছে, জল খাও।

রামমোহন জল খায়।

চলো, ঘরে দিয়ে আসি।

আঁধার হোক।

রেবতী নিশ্বাস ফেলে বলে, সব হয়ে বয়ে গেছে ঠাকুর। শ্মশান থেকে ছাই নিয়ে যে-যার ঘরে চলে গেছে। আমিও ঘরে বসেছিলাম। শেষে নাইতে যেয়ে দেখি...তুমি...

রামমোহন হাঁটুতে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে।

ফুলি...আগুন তাত সইতে পারে না...

রেবতী যেন অনেক দূর থেকে বলে, বড় জাতের কড়া নিয়ম ঠাকুর! মেয়েছেলেকে....

দিদি? তোমাদের ছেলেরা তো নৌকো নিয়ে দেশে দেশে যায়?

যায় তো!

সর্বত্তর কি এমনি করে....

কি জানি ঠাকুর!

রামমোহন উঠে বসে, ঝাঁশের খুঁটিটায় হেলান দেয়। আষাঢ়ের বেলা, সূর্যাস্তের পরেও আঁধার নামে না। জোনাকি একটা দুটো ওড়ে।

রামমোহন মনে মনে বলে, নিশ্চয় তেমন দেশ আছে। সেই দেশে চলে যাবে রামমোহন, সেই দেশে, যেখানে ফুলিদের উঠোনে ঢাক বাজে না রথের দিনে। একটা কিছু করবে রামমোহন, একটা ছিষ্টিছাড়া লণ্ডভণ্ড কিছু। কি করবে তা তোর মোহন দাদা জানে না। কিন্তু তুই দেখে নিস ফুলি, আকাশ থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখে নিস!

রেবতী বলে, চলো ঠাকুর, ঘরে পৌঁছে দিই।

না, আমি একাই যেতে পারব।

আজকে রামমোহন বড় হয়ে গেছে, একা ফিরতে আর ভয় পাবে না। কোনোদিন ভয় পাবে না।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

সোনার ছেলে

সুখেন্দু মজুমদার

একটা ছেলে দুষ্টু ভীষণ, নতুন ক্লাশে ওঠে ফি-সন,
ছবি আঁকে রঙবেরঙের,
দেখে সবাই অবাক।

কোথায় আছে পাখির ছানা, সে ছেলেটার নয় অজানা,
পড়ার ফাঁকে কানে বাজে
কিচিরমিচির ডাক।

লাটাই হাতে ঘুড়ি ওড়ায়, লম্বা সুতোয় লাট্টু ঘোরায়,
সময় পেলে বইও পড়ে,
রূপকথা বা মজার।

দেয় সে সাড়া হাতছানিতে, রঙ ঢুকিয়ে পিচকারিতে,
রঙ মেখে সে ভূতও সাজে,
মুখ করে না ব্যাজার।

সেই ছেলেটা খেলার মাঠে, সবার সেরা এ তল্লাটে,
তখন তাকে সবাই বলে,
সোনার ছেলে সত্যি।

সে ছেলেটাও হারতে রাজী, ঠিক তখনই দুষ্টু পাজি,
বোনের সাথে যেই না করে
খুনসুটি একরত্তি।

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

পৈশাচিক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমার প্রিয় কুকুর জিমকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

সাদা ঝাঁকড়া লোমেঢাকা ছোট্ট এই প্রাণীটি বেজায় ভীতু। কোনও দিশী কুকুর, এমনকি বেড়াল দেখলেও ঝটপট আমার কাঁধে উঠে পড়ে।

তো মোল্লার দৌড় মসজিদের মতো আমার বিকেলে বেড়ানোর দৌড় খেলার মাঠ পেরিয়ে নদীর ধারে একটুকরো ঘাসে ঢাকা জমি। নদীটাও ছোট। তার পাড়-বরাবর ঘন জঙ্গল। ঘাসে ঢাকা জমিটায় গিয়ে জিমের সঙ্গে আমার লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে যায়। জিম এ খেলায় বড় পটু।

সেদিন জিমের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে রোদ ফুরিয়ে গেল। এবার বাড়ি ফেরার পালা। জিম একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। রোজকার মতো ডাকলাম, "জিম! আর নয়। চলে এস।"

কিন্তু অন্যদিনের মতো সে বেরিয়ে এল না। বারকতক ডাকাডাকি করে ঝোপটার কাছে গেলাম। গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

আমাকে দেখামাত্র জিম দুপায়ে ভর করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। তারপর গরগর শব্দে গর্জন করতে থাকল। মুখে হিংস্র ভাব এবং কুতকুতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

একটু অবাক হয়েছিলাম। জিম খুব নিরীহ শান্ত স্বভাবের কুকুর। তার এই চেহারা দেখব কল্পনাও করিনি। ধমক দিয়ে বললাম, "কী হচ্ছে জিম? তুমি অমন করছ কেন? চলে এস। এবার আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে না?"

জিম একই ভঙ্গিতে হিংস্র চোখে তাকিয়ে গরগর করতে থাকল।

"জিম! চাঁটি খাবে বলে দিচ্ছি।" বলে থাপ্পড় তুলে এগিয়ে যেতেই জিম গর্জন করে তেড়ে এল। মনে হলো, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলায় কামড় বসাবে।

এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার! জিম কখনও এমন করে না। তাছাড়া তার গলায় যে গরগর গর্জন শুনছি, তা যেন কোনও হিংস্র জন্তুর। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ জিম পাগল হয়ে গেল নাকি? কোনও কুকুর পাগল হয়ে গেলে তার লালায় 'রাবিজ' নামে সাংঘাতিক ভাইরাস সৃষ্টি হয় এবং কাকেও কামড়ে দিলে তার লালা থেকে মানুষের রক্তে সেই ভাইরাস সংক্রামিত হয়, যা জলাতঙ্ক রোগের কারণ।

আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পাশের নিচু গাছটা থেকে লম্বাটে একটা ডাল ভেঙে নিলাম। তারপর সেটা ছড়ির মতো বাগিয়ে জিমের গায়ে জোরে ঘা দিলাম। প্রিয় জিমকে এভাবে আঘাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তার মারমুখী ভঙ্গি দেখে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতায় এই কাজটা করতেই হলো।

অদ্ভুত ব্যাপার, জিম ডালটা কামড়ে ধরল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর সে গর্জন করে আগের মতো দুপায়ে হেঁটে আমার দিকে তেড়ে এল।

অমনি আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে দৌড়ুতে থাকলাম। খেলার মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলা শেষ করে তখন আড্ডা দিচ্ছে। আবছা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। আমাকে দৌড়ুতে দেখে তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে অতিকষ্টে বললাম, "জিম পাগল হয়ে গেছে। আমাকে তাড়া করে আসছে।"

একটি সাহসী ছেলে বলল, "আপনার জিম? মানে আপনার এইটুকু কুকুরটা? তা এতে এত ভয় পাওয়ার কী আছে? এই! তোরা আয় তো

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে দৌড়ুতে থাকলাম।

দেখি। ব্যাটের ঘায়ে পাগলামি ঘুচিয়ে দেব।"

ওরা ব্যাট তুলে হইহই করে এগিয়ে গেল। তারপর নদীর ধারে জঙ্গলের কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। একটু পরে দেখলাম, ওরা দৌড়ে পালিয়ে আসছে। আমার কাছে এলে জিজ্ঞেস করলাম, "দেখতে পেলে জিমকে?"

সেই সাহসী ছেলেটি বলল, "জিম-টিম নয়। ইয়া বড় একটা ভালুক!"

একজন বলল, "ভালুক নয়! কালো রঙের বাঘ! ওরে বাবা! ওই দ্যাখ্ তেড়ে আসছে!"

ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল। আবছা আঁধারে যেন সত্যিই একটা প্রকাণ্ড কালো রঙের জন্তুকে আসতে দেখলাম। তখন আমিও প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দিলাম।

খেলার মাঠের অন্যপ্রান্তে চারদিকে পাঁচিলঘেরা আমাদের একতলা বাড়ি। ফুলবাগান আর কিছু ফলের গাছ আছে। তখন শরৎকাল। বাড়ির সবাই আমাকে আর কাজের লোক কানুকে পাহারায় রেখে পুজোর ছুটি কাটাতে হিমালয় ভ্রমণে গেছে।

আমার ডাকাডাকিতে কানু গেট খুলে দিল। তারপর আমাকে দেখে একটু ভড়কে গিয়ে বলল, "কী হয়েছে ছোটবাবু? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?"

"এক গ্লাস জল।" বলে আমি সটান ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে ধপাস করে বিছানায় বসে পড়লাম। কানু শশব্যস্তে জল এনে দিল। জলটা প্রায় শুষে নিয়ে বললাম, "গেটটা ভাল করে বন্ধ করেছ তো?"

"করেছি। কিন্তু কী হয়েছে বলবেন তো?"

"তুমি আলো জ্বেলে দাও। বলছি।"

কানু সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিল। তারপর আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর আগাগোড়া ওকে ঘটনাটা শোনালাম।

শোনার পর কানুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। সে বলল, "বুঝতে পেরেছি। এতকাল ধরে শুনে আসছি নদীর ধারে শ্মশানে একটা পিচাশ থাকে। সেই পিচাশটা আপনার কুকুরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।"

"তুমি কি পিশাচের কথা বলছ?"

"আজ্ঞে, একই কথা ছোটবাবু!" কানু চাপা গলায় বলল। "আপনাকে অনেকদিন ঠারেঠোরে কথাটা বলেছি। আপনি গেরাজ্যি করেননি।"

"কী বলেছ তুমি?"

"বলিনি নদীর ধারে সন্ধ্যেবেলা অমন করে একা-দোকা বসে থাকবেন না? সূর্য ডোবার আগেই চলে আসবেন!"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "পিশাচ-টিশাচ নয় কানু! আমার ধারণা, জিম হঠাৎ পাগলা কুকুর হয়ে গেছে। আগে প্রতি সপ্তাহে ওকে ভেটার্নারি ডাক্তারের কাছে দেখাতে নিয়ে যেতাম। গত দু সপ্তাহ যাইনি। যাই হোক, তুমি শীগগির এক পেয়ালা কড়া কফি করে আনো। কফি খেয়ে আমি ওই ডাক্তারের বাড়ি যাব।"

কানু গুম হয়ে চলে গেল।...

ভেটার্নারি ডাক্তার অর্থাৎ পশুচিকিৎসক অতুল নন্দী বলেছিলেন, "আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তা হলে বলব এটা একটা অদ্ভুত কেস। আপনার জিম যে জাতের কুকুর, তাতে ওর পক্ষে গাছের ডাল কামড়ে টুকরো টুকরো করা অসম্ভব। বরং এক কাজ করুন। দিনেরবেলা মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে সব বলুন। ওদের কুকুর ধরার ব্যবস্থা আছে। জিমকে খুঁজে বের করে তারা ধরে আনুক। তারপর আমি পরীক্ষা করে দেখব জিমের কী হয়েছে।"

সে-রাতে আমার ঘুম আসছিল না। জিম আমার পাশেই শুয়ে থাকে। সে নেই। বিস্ময়, আতঙ্ক আর দুঃখে আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

জিমের কথা ভাবতে ভাবতে কখন একটু তন্দ্রার ঘোর এসেছে, হঠাৎ তা ছিড়ে গেল। বিছানার পাশেই জানালা। সামান্য দূরে রাস্তার ধারের ল্যাম্পপোস্ট থেকে ফিকে আলো এসে জানালার ধারে পড়েছে। তাকিয়ে দেখি, কী একটা প্রাণী জানালার রড আঁকড়ে ধরে ঘরের ভেতর উঁকি দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো ফেললাম। অবাক হয়ে দেখলাম, প্রাণীটা আমার জিম। চেঁচিয়ে উঠলাম, "জিম! জিম! তুমি ফিরে এসেছো?"

তারপর টর্চ নিভিয়ে যেই জানালার কাছে গেছি, জিম তখনকার মতো হিংস্র গর্জন করে উঠল। জানালার রডের ফাঁকে তার মুখটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো তেমনি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছিল। তক্ষুণি পিছিয়ে এসে ডাকলাম, "কানু! কানু!"

পাশের ঘরে কানুর সাড়া পাওয়া গেল, "ছোটবাবু! কী হয়েছে?"

"জিম! জিম এসেছে!"

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল কানু। দরজা খুলে দিতেই সে থমকে দাঁড়াল। তারপর সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিল।

সেই আলোয় যা দেখলাম, তাতে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। জিম জানালার একটা রড কামড়ে বেঁকিয়ে দিয়েছে। এবার পাশের রডটা বাঁকানোর চেষ্টা করছে। নিমেষে বুঝলাম, ওই রডটা বাঁকাতে পারলেই জিম ঘরে ঢুকতে পারবে। তারপর আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্ঘাৎ গলায় কামড় বসাবে।

ব্যাপারটা কানুও টের পেয়েছিল। সে বোবাধরা গলায় বলে উঠল, "পিচাশ! পিচাশ! ছোটবাবু! গুলি করুন! এক্ষুণি গুলি করে মারুন!"

আলমারির মাথায় দোনলা বন্দুকটা রাখা ছিল। কাঁপা-কাঁপা হাতে বন্দুকটা নিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো কার্তুজ বের করলাম। কার্তুজ পুরে জিমের মুখের ভেতর বন্দুকের নল ঢুকিয়ে পর পর দুবার ট্রিগারে চাপ দিলাম। জিম ছিটকে পড়ল। বারুদের কটু গন্ধে ঘর ভরে গেল।

কানু এবার সাহস করে আমার টর্চ নিয়ে জানালার ধারে গেল। বাইরে আলো ফেলে সে খুশিতে হেসে উঠল। "পিচাশ ব্যাটাচ্ছেলে একেবারে অক্কা! ওই দেখুন ছোটবাবু, দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে।"

উঁকি মেরে দেখার পর হঠাৎ বন্দুকের নলের দিকে চোখ পড়ল। আশ্চর্য, দুটো নলের ডগা প্রায় এক ইঞ্চি কেটে বেঁকে গেছে। জিমের মরণকামড় বলা চলে।

তা হোক। প্রাণে তো বেঁচেছি। বললাম, "চলো কানু! জিমের মড়া একটা বস্তায় ভরে রাখা যাক। সকালে অতুল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। জিমের সত্যিই কী হয়েছিল আমার জানা দরকার।"

কানু বলল, "অত হ্যাঙ্গামার দরকার কী ছোটবাবু? তাছাড়া পিচাশ বলে কথা! চলুন, বস্তায় ভরে দুজনে ব্যাটাচ্ছেলেকে নদীর ধারে কোথাও পুঁতে রেখে আসি। বুঝলেন না? নদীর ধারে পুঁতলে পিচাশব্যাটা খুশি হবে। নিজের ডেরায় বরাবরকার মতো বাস করবে। কাছেই শ্মশান। শ্মশানে আস্ত মড়া না পাক, মড়াপোড়া ছাই খেয়ে ঢেকুর তুলবে।"

বললাম, "না কানু! জিমের কী হয়েছিল, পরীক্ষা করে দেখা উচিত।"

কানু গোমড়ামুখে বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না ছোটবাবু! অতুল ডাক্তার কুকুরটা খামোকা কাটাছেঁড়া করবে। তাতে পিচাশ আরও রেগে যাবে।"

একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। পিশাচের রাগের জন্য নয়, আমার প্রিয় জিমকে নিশ্চয় অতুল ডাক্তার কাটাছেঁড়া করবেন। অর্থাৎ পোস্টমর্টেম না করে ছাড়বেন না।

কানু একটা বস্তা খুঁজতে গেল। তারপর ডাকল, "চলে আসুন ছোটবাবু! আমি যা বলছি, ভালর জন্যই বলছি।"

অগত্যা তার কথায় রাজী হলাম। ছোট্ট কুকুরের মড়াটা বস্তায় পুরে কানু কাঁধে চাপাল। আমি একটা শাবল আর টর্চ নিলাম। খেলার মাঠ পেরিয়ে নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতর গেলাম। তখন কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। আমার গা ছমছম করছিল অজানা ত্রাসে। বন্দুকটার নল একটু বেঁকে এবং ফেটে গেলেও সঙ্গে আনা উচিত ছিল।

তবে কানু সাহসী লোক। পিশাচ সম্পর্কে সে যা-ই বলুক, দেখলাম পিশাচের ভয় এ মুহূর্তে তার নেই। নরম মাটি খুঁড়ে জিমের মড়া বস্তাসুদ্ধু শীগগির সে পুঁতে ফেলল। তারপর নদীর জলে হাত এবং শাবল রগড়ে ধুয়ে এল। বলল, "আপদ গেল। চলুন, ফেরা যাক্!"...

জিম ছিল আমার ছায়াসঙ্গী। তার এই পৈশাচিক মৃত্যুর পর আমি একলা হয়ে পড়েছিলাম। সবচেয়ে দুঃখ, আমার হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। মনে মনে বলতাম, ক্ষমা করো জিম! আমি তোমাকে মারতে চাইনি। ওটা নেহাৎ একটা দুর্ঘটনা। তোমার কাণ্ড দেখে বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

প্রতিদিন বিকেলে নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতর তার কবরের কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। মধ্যে কয়েক পশলা বৃষ্টির পর কবরে ঘন ঘাস গজিয়েছিল। সেই ঘাসে হাত বুলিয়ে মনে হতো জিমের সেই নরম লোমের স্বাদ পাচ্ছি।

একদিন কানু বলল, "ছোটবাবু, আপনি ওভাবে একা নদীর ধারে যাবেন না। জিমের জন্য আপনার দুঃখুটা বুঝতে পারছি। তাই বলে অমন করে পিচাশের এলাকায় যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? তার চেয়ে বরং বড়বাবুকে লিখে পাঠান, ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফেরার সময় একটা ভাল জাতের কুকুর যেন কিনে আনেন।"

কানু আমার দাদাকে বড়বাবু বলে। দাদা সপরিবারে এখন হিমালয়ের কোন মুল্লুকে আছেন জানি না। নৈনিতাল থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম সপ্তাহ দুয়েক আগে। সেখান থেকে ওঁর মুসৌরি যাওয়ার কথা। তারপর আরও কত জায়গায় যাবেন এবং বাড়ি ফিরবেন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরে।

কাজেই দাদার নাগাল পাওয়া কঠিন। কানুর কথা শোনার পর ঠিক করলাম, অবিকল জিমের মতো একটা কুকুর নিজেই যোগাড় করে ফেলব। জিমকে অবশ্য কিনেছিলাম ইরানি যাযাবরদের কাছে। ওরা এই মফস্বল শহরে প্রায় প্রতি বছর শীতের সময় আসে। কিন্তু শীত আসতে এখনও অনেক দেরি। তাই বরং কলকাতা গিয়ে একটা কুকুর কেনা উচিত। গঙ্গার ধারে ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে কারা বিলিতি কুকুর বিক্রি করে দেখেছি।

পরদিনই কলকাতা গিয়ে অবিকল জিমের মতো দেখতে একটা কুকুর কিনে আনলাম। কুকুরওয়ালা আমার গরজ দেখে দাম হেঁকেছিল এক হাজার টাকা। আটশো টাকায় রফা হয়েছিল।

এই কুকুরটার বয়স জিমের চেয়ে কম। বেশ মিষ্টি চেহারা। তুলতুলে নরম শরীর। হাবভাবে বড্ড বেশি লাজুক। তবে ওটা ওর ভদ্রতা। বেড়াল কিংবা দিশী কুকুর দেখলে ধমক দিতে ছাড়ে না। জিমের মতো অত ভীতুও নয়। জিমের স্মৃতি রাখতে ওর নামও দিলাম জিম।

কয়েকদিনের তালিমে নতুন জিম পুরনো জিমই হয়ে উঠল। কানুর নিষেধ সত্ত্বেও ওকে নিয়ে একদিন নদীর ধারে গেলাম। সত্যি বলতে কী, আমি পিশাচ-টিশাচে বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার ধারণা, জিম কোনও অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মানুষের যেমন হিস্টিরিয়া হলে দেহের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়, হয় তো কুকুরেরও তেমনি হিস্টিরিয়া হয়।

বিকেলে নদীর ধারে ঘাসের জমিতে নতুন জিমকে লুকোচুরি খেলা শেখাচ্ছিলাম। আমার ইশারায় সে একটা ঝোপের আড়ালে লুকোতে গেল।

এবার তাকে আমার খুঁজে বের করার পালা। ঝোপটার পেছনে গিয়ে তাকে খুঁজে পেলাম না। বললাম, "বাহ্ জিম! তুমি এরই মধ্যে পাকা খেলোয়াড় হয়ে গেছ দেখছি। ঠিক আছে। আমার এক পয়েন্ট হার হলো। এবার বেরিয়ে এস।"

কোনও সাড়া পেলাম না। শিস দিলাম। নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু কোথায় সে?

খুঁজতে খুঁজতে কিছুটা এগিয়ে যা দেখলাম, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। সারা শরীরে ঠাণ্ডা হিম একটা স্রোত বয়ে গেল। নতুন জিম

মরে পড়ে আছে। রক্তে কুকুরটার সাদা শরীর লাল হয়ে গেছে। কোনও হিংস্র জন্তু যেন ওর মাথাটা সদ্য কামড়ে খেয়েছে। তখনও গলার কাছ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

তারপর আবিষ্কার করলাম কুকুরটা রক্তাক্ত অবস্থায় যেখানে নিথর হয়ে পড়ে আছে, সেখানেই পুরনো জিমের কবর। কবরের সবুজ ঘাসগুলোও রক্তে লাল হয়ে আছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ খেলার মাঠের দিক থেকে কানুর চিৎকার কানে এল। "ছোটবাবু! ছোটবাবু! ছোটবাবু!"

সম্বিৎ ফিরলে তক্ষুণি সেখান থেকে দৌড়ে চললাম খেলার মাঠের দিকে। তারপর দেখি কানু ছুটে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল। একমুখ হেসে বলল, "শীগগির বাড়ি আসুন! আপনার জিম ফিরে এসেছে!"

চেঁচিয়ে উঠলাম, "কানু! কী বলছ তুমি? জিমের কবরের ওপর—"

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কানু বলল, "আপনার জিম এখন দুধ বিস্কুট খাচ্ছে। বেচারার বরাতে কতদিন খাওয়া জোটেনি কে জানে! শীগগির দেখবেন আসুন!"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বাড়ি ফিরলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। এই তো সেই জিম! আমাকে দেখামাত্র এঁটোমুখে একলাফে কাঁধে উঠে বসল। আদরে গালও চেটে দিল।

কানু হাসতে হাসতে বলল, "রান্নাঘরে খুট্‌খুট্ শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখি, জিম ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। ভয় পেয়েছিলাম প্রথমে। কিন্তু আমাকে দেখেই কুঁই কুঁই করে পা চাটতে এল। অনেক পরীক্ষে করে তখন নিশ্চিন্ত হলাম এই সেই জিম। আপনাকে বলেছিলাম না, নদীর ধারে জঙ্গলে এক মহা ধড়িবাজ পিচাশ আছে? পিচাশব্যাটা জিমকে কোথাও লুকিয়ে রেখে নিজে জিমের রূপ ধরেছিল। বুঝলেন তো?"

আমি জিমকে কোলে নিয়ে তার চোখের দিকে তাকালাম। সেই নম্র শান্ত সুন্দর চোখ। চোখ নয়, যেন দু টুকরো হাসি।

কানু বলল, "তা ছোটবাবু, নতুন জিমকে কোথায় রেখে এলেন?"

আস্তে বললাম; "কবরে।"

কানু চমকে উঠে বলল, "তার মানে? ও ছোটবাবু! খুলে বলুন না!"

"কানু! নতুন জিমকে হয়তো তোমার সেই পিশাচটা মেরে ফেলেছে। সাহস থাকে তো দেখে এসো গে!"

কানু চোখ কপালে তুলে বলল, "পাগল, না মাথাখারাপ? এই সন্ধ্যেবেলা পিচাশের এলাকায় গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াব নাকি? সকালে গিয়ে দেখব ব্যাপারটা কী।"...

পরদিন সকালে কানুকে সঙ্গে নিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা তাকে রাত্রেই বলেছিলাম। কানু একটা শাবল নিয়ে গিয়েছিল। নতুন জিমকে কবর দেবে বলেই।

জিমকে এই অভিযানে সঙ্গে নিইনি। তাকে চেনে আটকে রেখে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, নতুন জিমের লাশটার কোনও পাত্তা নেই। তবে ঘাসে প্রচুর রক্ত জমাট বেঁধে আছে। হঠাৎ বললাম, "আচ্ছা কানু! কবরটা খোঁড়ো তো! ওটার মধ্যে নিশ্চয় জিমের ছদ্মবেশী কোনও হিংস্র পাগলা কুকুরের হাড়গোড় আছে।"

কানু উৎসাহে কবরটা খুঁড়ে ফেলল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, মাটির ভেতর একটুকরো হাড়ও নেই। কানু ভয়ার্ত মুখে বলল, "দেখলেন তো? চলুন! এখান থেকে কেটে পড়া যাক। আর ভুলেও যেন এই জঙ্গলে পা দেবেন না ছোটবাবু।"

সত্যি বলতে কী, আজও এই অত্যদ্ভুত ঘটনার কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, জিমের ছদ্মবেশী হিংস্র প্রাণীটি দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ওই ভঙ্গিতেই সে আমার দিকে তেড়ে এসেছিল।...

ছবি: ধ্রুব রায়

বুলুমাসির কুলুমানালি ভ্রমণ

সরল দে

বুলুমাসি বলে, যেতে হবে কুলুমালানি
রেঁধে-বেড়ে খাবো, সাথে নিতে হবে জ্বালানি।
মামা বলে, ভুল উচ্চারণে কী বানালি?
মানালিটা মানিয়ে দে, বল্ কুলুমানালি।
এক সই ছিল কাছে, নাম তার রুবি দে,
বললে সে, ওটা বাপু বলবার সুবিধে।
হৈ-রৈ করে এলো আর-সই পামেলা,
বলে, গ্যাস ট্রেনে যাবে? হতে পারে ঝামেলা।
কেরোসিন? তা-ও নয়, হায় কি অবস্থা!
ঘুঁটে চাই শ'খানেক, কয়লা ক'বস্তা।
হাঁড়ি-কুড়ি কড়া-বেড়ি চাই ঠিক-ঠিক তো;
চাই সব চাই, কিছু নয় অতিরিক্ত।
ফ্যাসাদে কি পড়বো রে গিয়ে কুলুমালানি?
রান্নার জল চাই—তা-ও একজালা নি।
ট্রেন যেই ছাড়ো-ছাড়ো মাসি দুদ্দাড়িয়ে
লাফ দিয়ে নামে, বলে, রুখে দাও গাড়ি এ!
হা, উনুন আনিনি তো, বাদ গেছে তালিকায়!
ছুটে ফের যেতে হবে বাড়ি—সেই সালিখায়!!

ছবি: সুদীপ

তিন কন্যা

নলিনী দাশ

আদর্শ বালিকা শিক্ষামন্দিরের হীরক জয়ন্তী। শহরের সব গুণীজ্ঞানী গণ্যমান্য ব্যক্তি স্কুলের সুসজ্জিত নতুন হলে সমবেত হয়েছেন। কলকাতা থেকে এসেছেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপিকা ডক্টর মন্দাকিনী মুখার্জি আর বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা অলকানন্দা বসু। এঁরা দুজনেই এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী। আরো অনেক প্রাক্তন ছাত্রী আজকের উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে প্রজ্ঞাপারমিতা দাশের একটি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র স্কুলকে উপহার দিয়েছেন। নতুন সভাগৃহের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রজ্ঞাপারমিতা ভবন'। কলকাতা থেকে দূরে এই ক্ষুদ্র শহরে যখন মেয়েদের শিক্ষা বলতে গেলে শুরুই হয়নি, তখন কয়েকজন আদর্শবাদী সমাজসেবীর সাহায্যে তিনটি মাত্র শিশুকন্যাকে নিয়ে এই শিক্ষামন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এক অসামান্য কর্মী প্রজ্ঞাপারমিতা দাশ। তারপরে একটানা দীর্ঘ চল্লিশ বছর, নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তিনি এমন একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষালয় গড়ে তুলেছিলেন, যার সমতুল্য প্রতিষ্ঠান কেবল এই জেলায় কেন, সমগ্র রাজ্যের মধ্যে বিরল। এখন তিনি ইহজগতে নেই কিন্তু এই শিক্ষামন্দিরের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। প্রধানা শিক্ষিকা মধুছন্দা সেন অভ্যাগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সংক্ষেপে স্কুলের ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন। সেই বিখ্যাত 'বড়দি' প্রজ্ঞাপারমিতা দাশ চাইতেন যে তাঁর ছাত্রীরা পড়ায়, খেলায়, গানে ও কাজে সব বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাক। সেই প্রথম যুগেই পরপর দু-বছর দুটি বোন আরতি আর ভারতী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এখনও এই শিক্ষামন্দিরের ছাত্রীরা সেদিনকার ঐতিহ্য বহন করছে। লেখাপড়ায়, খেলায়, নাচ-গান-অভিনয়ে আর সমস্ত কাজে তারা সবার সেরা।

সভার শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তারপর নৈশভোজনের পরে অভ্যাগতরা বিদায় নিলেন। কলকাতা থেকে আসা দুই বিশিষ্ট মহিলা কিন্তু হেডমিসট্রেসের অতিথি হয়ে তাঁর কোয়ার্টার্সে থেকে গেলেন। ছাত্রজীবনে তাঁরা মধুছন্দার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন। অতিথিরা চলে গেলে তাঁরা তিনজনে ঘরোয়া পরিবেশে দোতলার বারান্দায় আরামকেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে বসলেন। সমস্ত দিন প্রচণ্ড ধকল গেছে, তবু গভীর রাতেও তাঁদের চোখে ঘুম নেই। চল্লিশ বছর আগে তাঁরা এই শিক্ষামন্দিরে পড়াশুনা করেছেন, এই হোস্টেলে বাস করেছেন। সেদিনের কত কথা আজ মনে ভিড় করে আসছে। পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে তাঁরা সব শ্রান্তিক্লান্তি ভুলে গেছেন।

অলকানন্দা বললেন, 'হালফিলের সব খবর বল'—মধুছন্দার কাছে প্রশ্ন, 'শুনলাম এখনকার মেয়েরা সমস্ত ঐতিহ্য বজায় রেখেছে, আগেকার মান রক্ষা করেছে, কিন্তু—'

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মধুছন্দা বললেন, 'কিন্তু দুষ্টুমির প্রতিযোগিতায় তারা আগেকার মেয়েদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কি? সত্যি করে বল দেখি'—হেসে ফেললেন মধুছন্দা, 'কি দুষ্টুই ছিল আমাদের সময়কার মেয়েরা! বাস রে বাস!'

'মনে পড়ে সেই এক নম্বরের কথা?' প্রশ্ন করলেন মন্দাকিনী, 'মিস চট্টরাজ যার নাম দিয়েছিলেন পহেলা নম্বরের শয়তান?' তিনি আরশোলাকে বাঘের মতন ভয় করতেন, তাই তাঁরই ক্লাসে একদিন আট-দশটা জ্যান্ত আরশোলা ছেড়ে দিয়েছিল দুষ্টু মেয়েটা! তারপর সে যা কাণ্ড!'

চল্লিশ বছর আগেকার সেই দৃশ্যটা মনে করে তিনটি পঞ্চাশোত্তীর্ণা মহিলা পঞ্চদশী তরুণীর মতন খিলখিল করে হেসে উঠলেন!

'দুই নম্বরই বা কম কিসে?' বললেন অলকানন্দা। 'মাধুরীদিকে মেয়েরা যমের মতন ভয় করত। তাঁরই অঙ্কের ক্লাসে, দুষ্টু মেয়েটা ব্ল্যাকবোর্ডে উঠে অঙ্ক করার সময়, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে মুখভঙ্গি করে অন্য মেয়েদের হাসিয়ে দিয়েছিল। কেমন সন্দেহ হওয়াতে মাধুরীদি যেই পিছনে ঘুরে তাকিয়েছেন, এক মুহূর্তের মধ্যে ভালমানুষ সেজে দিদিকেই প্রশ্ন করে বসল। দিদি তো ভারি খুশি। ভাবলেন তার পড়ায় ভারি মন—'

মধুছন্দার মতে তিন নম্বরটিই ছিল দলের পাণ্ডা, একেবারে শয়তানের শিরোমণি।

কিন্তু মন্দাকিনীর ধারণা যে তিনটিই সমান ওস্তাদ—'সেই ভূমিকম্পের কথা মনে নেই?' আবার সবাই সেদিনের কথা মনে করে হেসে উঠলেন।

আগের রাত্রে সত্যিই ভূমিকম্প হয়েছিল। বড়দি মেয়েদের লাইন করে খেলার মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভূমিকম্প হলে কেন বাড়ির বাইরে বেরোতে হয় সেটা বুঝিয়ে বলেছিলেন। পরের রাতে ভূমিকম্প হয়নি, কিন্তু একটি ছোট মেয়ে, বোধহয় স্বপ্ন দেখে 'ভূমিকম্প' বলে চিৎকার করেছিল। আচমকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে অনেক মেয়ে ভয় পেয়ে 'ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!' বলে চেঁচিয়েছিল, ভয়ে ছুটে বাইরের দরজার কাছে চলে গিয়েছিল। ঐ তিনটি মেয়েকে দেখা গেল যে যার বিছানায় শুয়ে শুয়েই 'ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!' বলে চেঁচাচ্ছে আর গড়িয়ে গড়িয়ে হাসছে!

'সাধে কি মিসেস তলাপাত্র বলেছিলেন, তিনটি যা মাইয়া আছে না, আমাগো হাড়মাস সব কালি কইরা ছাড়ছে!'

'কেবল মিসেস তলাপাত্র কেন? সব টিচাররাই ওদের ওপর খাপ্পা ছিলেন! মাধুরীদি তো ওদের নাম উচ্চারণ করতেন না—বলতেন ঐ ইন্দি-বিন্দি-সিন্দি!'

ওদের কথা বলতে কোনো টিচারই নাম করতেন না। সেই তিনটি মেয়ে বললেই সবাই বুঝে যেতেন কাদের কথা বলা হচ্ছে!

একদিন তো তাঁরা সবাই দলবেঁধে বড়দির কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে ঐ তিনটি মেয়েকে নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে না দিলে তাঁরা কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন না। বড়দি কিন্তু তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হননি।

চল্লিশ বছর পরে সেদিনের কথা মনে করে মধুছন্দা বললেন, 'আমি আজো ভেবে পাই না, বড়দি অমন দুষ্টু ডানপিটে মেয়েদের ঐরকম ধৈর্যের সঙ্গে সামলাতেন কি করে? কোনোদিনও তাঁকে রাগারাগি বা বকাবকি করতে দেখিনি!'

'বড়দি যে সমস্ত ছাত্রীকে নিজের মেয়ের মতন ভালবাসতেন,' বললেন মন্দাকিনী, 'তাদের কথা বলতে গেলে আমার কন্যারা বলে উল্লেখ করতেন।'

সত্যিই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আদর্শ বালিকা শিক্ষামন্দিরের হেডমিসট্রেস, বড়দি প্রজ্ঞাপারমিতা দাশের। যত দুষ্টু হোক না কেন, সব ছাত্রীই ছিল তাঁর কন্যা-সম স্নেহের পাত্রী। সব টিচার দলবেঁধে তাঁর কাছে এসে যখন কয়েকটি বিশেষ দুষ্টু মেয়েকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বড়দি বলেছিলেন,'তাহলে তো পরাজয় স্বীকার করা হবে, তার মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? দুষ্টু মেয়েকে ক্রমে সুপথে আনতে পারলে তবেই না শিক্ষকের কাজের সার্থকতা। তাদের তাড়িয়ে দিলে তো সমস্যার সমাধান হবে না।'

বড়দির ধারণা ছিল যে সেই ভীষণ ডানপিটে মেয়েগুলি প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত চঞ্চল, স্কুলের সাধারণ কাজকর্মের মধ্যে তাদের বাড়তি প্রাণশক্তি খাটাবার সুযোগ না পেয়ে তারা কুকর্ম করে চলেছে। তাদের আরো কাজ দিতে হবে, নানারকম দায়িত্বভার চাপিয়ে দিতে হবে।

'বলেন কি বড়দি?' টিচারেরা প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন, 'যারা সবথেকে আগে শৃঙ্খলা ভাঙে, তাদের ওপরেই শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব দেবেন?'

'একবার দায়িত্ব দিয়েই দেখুন না কি ফল হয়।'

বড়দির কথা মেনে নিতে না পারলেও, টিচারেরা তাঁর একান্ত অনুরোধে, তাঁর খাতিরে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন।

রোজ সকালে প্রার্থনা সভায় যাবার পথে সেই ইন্দি-বিন্দি-সিন্দি নানা অজুহাতে প্রায়ই গোলযোগের সৃষ্টি করছিল, তাই তাদের ওপর দেওয়া হলো প্রার্থনাসভায় শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব। দেখা গেল যে সত্যিই এর ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটল।

দিনকয়েক সমস্ত কাজকর্ম বেশ শান্তভাবে চলল। তারপরেই একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার ফলে বড়দি তাঁর আজন্মলালিত বিশ্বাস প্রায় বিসর্জন দিতে বসেছিলেন!

একটা বাইরের কাজে আটকে পড়ার ফলে সেদিন তাঁর স্কুলে আসতে কিছুক্ষণ দেরি হয়েছিল। স্কুলে পৌঁছবার আগেই তিনি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে মেয়েরা সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কি ব্যাপার? দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে বড়দি জানতে পারলেন যে হঠাৎ স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ভারি অবাক হয়ে গেলেন তিনি। কই? তিনি তো কোনো ছুটি দেননি! একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল কেন?' মেয়েটি বলল, 'আপনি জানেন না? মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েরা খুব ভাল ফল করেছে বলে ছুটি দেওয়া হয়েছে।'

আরোই অবাক হয়ে বড়দি কিছুই বুঝতে পারলেন না। মেয়েরা তাঁর কাছে এসে ছুটি চেয়েছিল সেকথা সত্যি। কিন্তু তিনি তো রাজী হননি। কোনো নোটিসও সই করেননি! তাহলে?

কোনোমতে উত্তেজনা চেপে বড়দি নিজের ঘরে গিয়ে ছুটির নোটিসটা চেয়ে পাঠালেন। নোটিস-বুকটা হাতে পেয়ে তিনি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। সত্যিই তো, নোটিস বেরিয়েছে যে আজ সকালে প্রার্থনার পরেই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, কারণ এই স্কুলের মেয়েরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেছে। তলায় হুবহু তাঁর সই-এর মতন সই।

ভাল করে চোখ মুছে বড়দি আবার দেখলেন। নাঃ, তাঁর চোখের ভুল নয়। অথচ তাঁর খুব ভাল করে মনে আছে যে

আজ তো পয়লা এপ্রিল তাই....

তিনি কোনো ছুটির নোটিস সই করেননি। তাহলে তাঁর সই হয়ে নোটিস বেরোল কি করে? কে টাইপ করল সেই নোটিস? স্কুলের কাগজ পেল কোথায়? নোটিস-বুক? সইটাই বা করল কে?

ছাত্রীরা ছুটির নোটিস পেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। অধিকাংশ টিচারও। সবাই ভাবল তিনি নিজেই মত বদল করে পরে ছুটির নোটিস দিয়েছেন।

অফিসের সব কর্মীকে নিজের ঘরে ডেকে গোপনে জেরা করলেন বড়দি। কিন্তু কোনো সদুত্তর পেলেন না। এটুকু বোঝা গেল যে সাবধানতার অভাব ঘটেছিল। অতি চতুর কোনো ব্যক্তির পক্ষে স্কুলের কাগজ চুরি করে নোটিস টাইপ করা অসম্ভব ছিল না, তারপর তাঁর সই জাল করে সেটা নোটিস-বুকে লটকে দিলে সকালে জারি হয়ে যাবেই রুটিনমাফিক। কিন্তু এমন কাজ কে করতে পারে? অফিসের কারো সাহস হবে না।

তবে কি? তবে কি তারাই? যে কথাটা বড়দি নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাইছেন না, সেটাই কি তবে সত্যি! বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু...কিন্তু তা না হয়ে থাকলে আর কি হতে পারে?

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বড়দি।

ছুটি হয়ে যেতে মেয়েরা, টিচাররা সব যে যার বাড়ি চলে গেছিলো, ক্রমে অফিসও বন্ধ হয়ে গেল। দু-একটি বেয়ারা ও দারোয়ান ছাড়া সমস্ত স্কুলবাড়ি ফাঁকা, নির্জন।

নিজের চেয়ারে ঠায় বসে রইলেন বড়দি। সারাদিন আর একটা কথাও বললেন না। এক পেয়ালা চা বা এক গ্লাস জলও খেলেন না,—খেতে পারলেন না। তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় হতে লাগল। এত বড় একটা ঘটনা যদি তাঁর অজানতে ঘটে যেতে পারে, তাহলে এই চেয়ারে বসে থাকবার কোনো অধিকার আছে কি তাঁর?

অন্ধকার হয়ে যেতে বেয়ারা একটা বাতি জ্বেলে রেখে গেল। অনেকক্ষণ পরে বড়দি কাঁপা হাতে কলম তুলে নিলেন। প্রায় অন্ধ চোখে অন্ধকারে বসে নিজের পদত্যাগপত্র লিখলেন, তারপর তার তলায় নাম সই করলেন।

'বড়দি!'

একটা মৃদু, কাতর ডাক শুনে চোখ তুলে তাকালেন বড়দি।

'বড়দি —ভিতরে আসতে পারি?'

'কে? কে ওখানে? ভিতরে এসো।'

বড়দির গলার স্বরে, তাঁর সমস্ত চেহারার মধ্যে হয়তো আজ অন্যরকম কিছু ছিল। তিনটি মেয়ে চুপিচুপি তাঁর ঘরে ঢুকল, তারপরে চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বড়দিও চুপ। পলকহীন চোখে সোজা তাকিয়ে রইলেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি নিরুত্তাপ শুকনো গলায় বললেন, 'এটা তাহলে তোদেরই কাজ?'

মেয়েরা নিরুত্তর।

'স্কুলের কাগজ চুরি করলি? চাবি চুরি করে অফিসঘরে ঢুকে টাইপ করলি? আমার সই জাল করলি? এ সমস্তই যে মস্তবড় অপরাধ সেটা তোরা জানিস না? তোরা তো শিশু নস!'

তবু মেয়েরা চুপ।

তেমনি মৃদু, কঠিন স্বরে বড়দি বলে চললেন, 'আরতি আর ভারতী আমার ছাত্রী ছিল, তাদের কথা মনে করলে গর্ববোধ করি, কিন্তু তোরা আমার ছাত্রী একথা চিন্তা করেও যে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে! সমস্ত জীবন ধরে এত পরিশ্রম করে কি তবে কতগুলি চোর আর জালিয়াৎ তৈরি করছি? ছি! ছি! ছি! এখনই আমার এই চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছা করছে!' আর কিছু না বলে বড়দি তাঁর পদত্যাগপত্রটা মেয়েগুলির দিকে এগিয়ে দিলেন। একবার চিঠিটা দেখেই তারা শিউরে উঠলো! আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটি মেয়ে ভাঙা গলায় মৃদুস্বরে বলল, 'বড়দি...আজ...আজ তো পয়লা এপ্রিল...তাই...'

এতক্ষণে বড়দি সব বুঝতে পারলেন। একটা মস্তবড় বোঝা নেমে গিয়ে তাঁর মন হালকা হয়ে গেল। ঠিক কথাই তো, আজ পয়লা এপ্রিল, সবাইকে বোকা বানাবার দিন। এপ্রিল ফুল করা একটা তামাশা। সবসময় নানারকম রগড় করতে ভালবাসে এই মেয়েগুলি, আজ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। তাই বলে তারা চোর বা জালিয়াৎ নয়, কোনো বড় অপরাধ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

বড়দির মনের ভাবের পরিবর্তন তাঁর মুখেও ছাপ ফেলেছিল। মেয়ে তিনটি একটু সহজ হয়ে দাঁড়াল, তারপর এক এক করে কাতরভাবে বলল, 'আমরা ভেবে দেখিনি বড়দি, তাই অত কথা বুঝিনি।'

'এখন বুঝেছি যে কাজটা মস্ত অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আর কোনোদিন আমরা এমন দুষ্টুমি করব না, বড়দি। এবার সত্যি ভাল হয়ে যাব।'

'ঐ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিন, দোহাই আপনার।'

'তাহলে কথা দে যে এবার থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া করবি, সব কাজ করবি। প্রতিজ্ঞা কর যে সব বিষয়ে ভাল হবার চেষ্টা করবি?'

'আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি বড়দি, আমরাও আপনার গর্বের কারণ হতে চেষ্টা করব। কথা দিচ্ছি যে একদিন আরতিদি আর ভারতীদির সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে আমাদেরও নাম করতে পারবেন।'

প্রশান্ত স্মিত হাসি ফুটে উঠল বড়দির মুখে। নিজের অন্তরের গভীর স্নেহের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই তিনটি দুষ্টু মেয়ে—তাঁর এই তিনটি কন্যা— মন্দা, নন্দা আর ছন্দা, আজ যতই দস্যি, ডানপিটে হোক না কেন, এদের মধ্যে যথার্থ বড় হবার সম্ভাবনা আছে। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে এরা সত্যিই একদিন তাঁর নাম রাখতে পারবে।

চল্লিশ বছর পরে আজ পুনর্মিলিত হয়েছেন সেই তিনটি কন্যা —মন্দা, নন্দা ও ছন্দা। চল্লিশ বছর আগেকার সেই ডাকসাইটে দুষ্টু মেয়ে তিনটি আজ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডক্টর মন্দাকিনী মুখার্জি বিখ্যাত লেখিকা অলকানন্দা বসু আর নামকরা হেডমিসট্রেস মধুছন্দা সেন, যিনি সেই বড়দি প্রজ্ঞাপারমিতা দাশের হাত থেকে এই আদর্শ বালিকা শিক্ষামন্দিরের পরিচালনভার নিয়ে, পূর্ব ঐতিহ্য রক্ষা করে একে আরো এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

চল্লিশ বছর আগেকার সেই দিনটি স্মরণ করে তিনটি খ্যাতনামা মহিলা বলে উঠলেন, 'আমাদের প্রতিজ্ঞা রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি বড়দি, বলুন আমরা আপনার নাম রাখতে পেরেছি কিনা!'

ছবি : ধ্রুব রায়

কুমড়োডিহির তিনটি বুড়ো

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কুমড়োডিহি গাঁয়ে থাকত থুত্থুরে খুব তিনটে বুড়ো,
হামাগুড়ি দিয়ে তারা উঠল গিয়ে পাহাড়চুড়ো।

ব্যাপার দেখে গাঁয়ের যত জোয়ান এবং বীর পালোয়ান
বলল, এ কী, আমরা থাকতে উঠল ওরা, কী অপমান!

অপমানে জ্বলতে জ্বলতে সব পালোয়ান বলল রেগে,
চুড়োয় ওঠার সাধ্যিটি নেই, তবুও কেউ যাইনি ভেগে।

ওপর থেকে তিনটে বুড়ো নিচের দিকে একটু নুয়ে
বলল, তোরা রাগ করিস না, আকাশটাকে আসছি ছুঁয়ে।

ছবি : সৃফি

এক টিপ নস্যি

মনোরঞ্জন ঘোষ

সেদিন সকালে সমর সবেমাত্র বসেছে এক গোয়েন্দা গল্পের কাহিনীকে সাদা কাগজের কারাগারে অক্ষরের শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখার জন্য, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। সে বিরক্তির সঙ্গে রিসিভার তুলে নিয়ে বলল, হ্যালো?

অন্য দিক থেকে তার বন্ধু ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার ভুজঙ্গ ধরের কণ্ঠস্বর কানে এল, সমর? বাড়ি আছ তাহলে?

না, আমি বাড়ি নেই।

তার মানে?

সাহেবদের 'নট অ্যাট হোমে'র মতন। লোকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা না থাকলে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ও-কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। আমার বাচ্চা চাকর হারানকে শিখিয়ে রেখেছি, কেউ দেখা করতে এলে সোজা বলে দেবে আমি বাড়ি নেই। টেলিফোন তাকে ধরতে না দিয়ে দেখছি ভুল করেছি।

আমাকে এড়ানো অত সহজ নয়। লোককে ধরাই তো আমার কাজ।

লোককে, না বদলোককে?

একই কথা। ধরার আগে পর্যন্ত সবাই ভাল লোক, ধরে তারপর প্রমাণ করি তারা বদলোক।

তা বেশ! কিন্তু আপাতত আমাকে ধরার উদ্দেশ্য কী? এক নিরীহ গল্পলেখককে—

বাজে কথা অনেক হয়েছে। শোনো! আমার হাতে মোটেই সময় নেই। এখুনি তোমার বাড়ি যাচ্ছি। গিয়েই তোমাকে গ্রেপ্তার করে আমার গাড়িতে তুলে নেবো। প্রস্তুত থাকবে।

দোহাই! এক সপ্তাহ আমার বাড়ির চৌকাঠ মাড়িও না। আমার হাতে মোটেই সময় নেই। পুজো সংখ্যার একটা লেখা শেষ—

সমরকে শেষ করতে না দিয়েই ভুজঙ্গ ধর লাইন কেটে দিল। সমর হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মানুষের বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ মানেই খানিকটা সময় ব্যয়, যদি সে পুলিসের লোক হয় তাহলে সেই সঙ্গে কিছু বিপদও যোগ হয়।

গোয়েন্দা-গল্প লেখায় সমর চৌধুরীর পাঠকমহলে বেশ সুনাম আছে। নিছক কল্পনাবিলাসী লেখক সে নয়। বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা অনেক তদন্ত-রহস্যের কাহিনী তাকে জনপ্রিয় করেছে। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিশ্লেষণ শক্তি, অণুমাত্র ক্ষমতা তাকে যেমন রহস্য-গল্প রচনায় খ্যাতি এনে দিয়েছে, তেমনি মর্যাদাও দিয়েছে পুলিস মহলে। তার কলেজ-জীবনের সহপাঠী ভুজঙ্গ ধর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পাওয়ার পর পুলিসে চাকরি নিয়েছিল। তারপর অনেক জটিল কেস সতীর্থ সমরের সাহায্যে সমাধান করার ফলে বর্তমানে সে প্রমোশন পেয়ে ডি. সি. (ডি. ডি.) হয়েছে। তার পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে শখের গোয়েন্দাগিরি সমরকে করতে হয়।

পূজা সংখ্যায় কয়েক জায়গায় সমরের গল্প দেবার কথা আছে। ঘুম থেকে উঠেই সে মনস্থ করেছিল আজ যে করেই হোক একটি গল্প শেষ করবে।

কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভুজঙ্গ এসে তাকে ঘর থেকে টেনে বের করল। কোনো ওজর-আপত্তিতে কান না দিয়ে সমরের হাত ধরে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে তুলল।

সমর বলে, ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা বলে একটা কথা শুনেছিলাম। এ যুগে অশ্বারোহণ অচল হয়ে এলেও অনেকের সেই আচরণটা বদলায়নি দেখছি।

ভুজঙ্গ সিগারেট-কেসটা সমরের দিকে ধরে বলল, ঘোড়ার জিন তবু আরোহীর ইচ্ছেমতো খুলে ফেলে যাত্রা স্থগিত রাখা চলত। কিন্তু চার্টার্ড প্লেনের যাত্রা তো তোমার আমার ইচ্ছেমতো স্থগিত রাখা যায় না। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই দমদম এরোড্রোম থেকে একটি প্লেন সিঙ্গাপুর রওনা হবে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সমর বলল, তাতে তোমার আমার কি? আদার ব্যাপারীরা জাহাজের খোঁজ রাখে না। তুমি দেখছি উড়োজাহাজের খোঁজ রাখছ কলকাতার পাহারাওয়ালা হয়ে।

পাহারাওয়ালাই বটে! প্লেনের পাইলটকে ভদ্রভাবে পাহারা দিচ্ছি আমরা সবাই, কাস্টমসের প্রিভেন্টিভ অফিসার, সেন্ট্রাল এক্সাইজের অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টার, সিকিউরিটি কন্ট্রোলার, ডি. সি. ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের আমি। এক আমেরিকান পাইলট আমাদের কলা দেখিয়ে বোম্বের এক বিখ্যাত জুয়েলার্সকে পথে বসিয়ে হাওয়াই জাহাজে হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টায় আছেন।

হুঁ! তোমার কথার মধ্যে রহস্যের গন্ধ রয়েছে। পাঠকদের কৌতূহল সৃষ্টির জন্য এভাবে কথা বলা লেখকদের একচেটিয়া ব্যাপার। তুমি পুলিসের লোক, সহজ সরল ভাষায় ব্যাপারটা সোজা বলে ফেল!

ভি আই পি রোড ধরে দমদম এয়ারপোর্টের উদ্দেশে যেতে যেতে ভুজঙ্গ ধর বলল, খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছ যে আজকাল আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীর দল এই দেশের ওপর একটু নেকনজর দিয়েছে। ওয়ালকটের ব্যাপারটা মনে আছে? নিজস্ব প্লেনে বেআইনী সোনা পাচারের সময় দিল্লীতে ধরা পড়েছিল? তারপর জামিনে খালাস থাকার সময় একদিন পালাম এরোড্রোমে তার আটক করা প্লেনের তদারক করতে আসে। এক ফাঁকে পড়ে থাকা প্লেনে চেপেই পালিয়ে যায়। দিল্লির পুলিস, এরোড্রোমের অফিসাররা, কাস্টমসের কর্মচারী বোকা বনল। কাগজে হৈচৈ, পার্লামেন্টে চেঁচামেচি—

হ্যাঁ, এসব আমি জানি। আরও জানি যে সেদিন তোমরা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বুক ফুলিয়ে বলেছিলে, দিল্লির ছাতুখেকো পুলিস বলেই ওয়ালকট বোকা বানাতে পারল। আমরা বাঘা ভাতখেকো বুদ্ধিমান বাঙালী, বহু ঘুঘু স্মাগলারকে ঘায়েল করেছি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়।

সমর আরও বলে, তা এখন যেমন হন্তদন্ত হয়ে এরোড্রোমে ছুটেছ, তাতে বুঝেছি তোমাদের কোনো কৃতী শ্বশুর-পুত্রের পদার্পণ হয়েছে।

পদার্পণ নয়, এখন পলায়ন-পর্বের প্রস্তুতি চলছে। ব্যাটা আমাদের নাকের ডগা দিয়ে বুক ফুলিয়ে উড়ে পালাতে চায়। সব জানা সত্ত্বেও হাতে-নাতে ধরতে না পারায় আইনের সাহায্যে তাকে আমরা আটকাতে পারছি না। ওয়ালকটকে নায়ক করে তুমি এক গল্প লিখবে বলেছিলে। এখন দেখছি এই ববি গিলকি হচ্ছে ওয়ালকটের বাবার কোনোটাই তার পছন্দ হলো না।

বাবা। ইনি শুধু স্মাগলার নন, পি সি সরকারের স্বগোত্রীয়।

তার মানে? ম্যাজিশিয়ান নাকি?

রীতিমতো। জিনিস অদৃশ্য করায় সিদ্ধহস্ত। পি সি সরকার লোকের চোখের সামনে মোটর গাড়ি অদৃশ্য করতেন, আর ইনি মোটরের চেয়ে দামী মটরের মতো হীরে সকলের সতর্ক নজর সত্ত্বেও অদৃশ্য করতে পারেন। আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম তোমার কাছে আসার বদলে ঐ ভোজবাজি রহস্য সমাধানের জন্য জুনিয়র পি সি সরকারের সাহায্য নেব। নেহাৎ তিনি এখন বিদেশে শো করতে গেছেন—

হুঁ! আমায় উত্তেজিত করার জন্য আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে কথা বলছ তা বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ কেসটা জটিল, তোমরা হালে পানি পাচ্ছ না, তাই আমায় তাতিয়ে কাজ উদ্ধারের তালে আছ।

ভুজঙ্গ হেসে ফেলে বলল, সরকারের ম্যাজিক আর সমরের লজিক দুয়েরই আমি ভক্ত, দুটোই আমার কাছে সমান বিস্ময়কর।

প্রশংসা শুনে প্রসন্ন হলাম। দেবতারাও স্তবে তুষ্ট হয়, আমি তো কোন ছার। এবার কেসটা বিশদভাবে বলো!

কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলে একটা প্লেন রাতের অন্ধকারে ভুবনেশ্বরে নেমেছিল। পাইলট বলেছিল পথ ভুল করায় তার তেল ফুরিয়ে গেছে বলে সেখানে নামতে বাধ্য হয়েছে। তেল নিয়ে সে আবার উড়ে যায়। কে জানে কোন এরোড্রোমে! পরে সন্দেহ করা হয়েছিল সেটা আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদের প্লেন। আমাদের গোপন খবর আছে, ওইরকম আর একটা প্লেন কলকাতায় এসেছে।

তার মানে কোনো ট্রাভেল কোম্পানীর প্লেন নয়, প্রাইভেট প্লেন?

হ্যাঁ। প্লেনটা এখানে এসেছে আর তার সঙ্গে আরও অনেক খবর এসেছে। সেগুলো খবর-কাগজের রিপোর্টারের খবর নয়, গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্ট। বোম্বে থেকে ওয়ারলেসে আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সে এসেছে। ববি গিলকি এখানে আসার আগে তিন দিন বোম্বেতে কাটিয়েছে। সেখানে তাজমহল হোটেলে উঠেছিল। বোম্বে পৌঁছাবার পরদিন সে সেখানকার বিখ্যাত জুয়েলার মেসার্স লীলারাম অ্যান্ড কোম্পানীর শো-রুমে গিয়েছিল। একটা খুব কম দামের হীরে সে কেনে সাড়ে পাঁচশো টাকা দিয়ে। নগদ দাম সে পকেট থেকে নোট বের করে তখুনি দিয়ে দিল। আমরা এখন বুঝছি নগদ নোট দেখিয়ে হীরেটা কেনা তার এক চালাকি, তার চিটিং-বিজনেসের এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট। এইভাবে সে লীলারামের বিশ্বাস অর্জন করল। কথায় কথায় শুনিয়ে দিল সে তাজমহল হোটেলে উঠেছে, তার নিজস্ব প্লেন সান্তাক্রুজ এরোড্রোমে রয়েছে, সে আমেরিকার এক ফিল্ম প্রোডিউসার, পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে, বিভিন্ন দেশে ছবি বেচাকেনা তার ব্যবসা। লীলারাম ভাবল যে মাইক টডের মতোই এ লোকটা মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন ডলারের মালিক, একটি শাঁসাল মক্কেল। গিলকি তারপর লীলারামকে জানায় যে মনের মতো হীরে পেলে যত টাকাই দাম হোক না কেন সে কিনতে প্রস্তুত। লীলারাম তখন তার আয়রন সেফ থেকে দামী-দামী সব হীরে সাহেবকে দেখান শুরু করল। সাহেবও সেগুলি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটা একটা করে লীলারামের সামনের টেবিলে রাখতে শুরু করে। নানা ধরনের নানা জাতের সব হীরে—স্বচ্ছ হীরে, কমল হীরে, নীলাভ হীরে, পলকী হীরে, ব্রাহ্মণ হীরে, ক্ষত্রিয় হীরে, বৈশ্য হীরে...

দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাধা দিয়ে সমর বলল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এসব বর্ণ-বিভাগ তো মানুষের মধ্যেই আছে জানি, তাও শুধু ভারতের মানুষের মধ্যে। হীরেদের মধ্যেও আবার জাতিভেদ আছে?

বাঃ। সব হীরেই কি এক জাতের নাকি? বর্ণ অনুসারেই তাদের বর্ণ-বিভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ হীরে হচ্ছে শ্বেতবর্ণের, ক্ষত্রিয় হীরে রক্তবর্ণ, বৈশ্য হীরে পিঙ্গল, শূদ্র হীরে কৃষ্ণবর্ণ। যাক, লীলারাম গিলকিকে বিদেশী খনিরও অনেক হীরে দেখায়—দক্ষিণ আফ্রিকার জেগার্স ফন্টিনের নীল হীরে, কিম্বারলির হলদে হীরে, ওয়েসেলটনের শ্বেত হীরে, ডি বিয়ার্সের মেটে হীরে, ব্রিলিয়ান্ট কাট হীরে, টেবল-কাট হীরে, রোজ-কাট হীরে...

সমর আবার বাধা দিয়ে বলে, বাহান্ন গোষ্ঠী হীরের বংশ পরিচয়ে আমার কাজ নেই। তুমি কি জুয়েলার্সদের কাছে খুব যাতায়াত করছ? এত নাম জানলে কি করে?

আরে ভাই, গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এসব জানতে হয়। ভারতের মধ্যে যে সব দামী হীরে জহরত আছে, দেশের সেই সম্পদ যাতে বাইরে চালান না যায়, সেদিকে নজর রাখতে হয়। তোমরা তো শুধু কোহিনূরের কথা জান। সেটা ছাড়াও পৃথিবীর নামকরা প্রথম দশটা হীরের মধ্যে তিনটে এককালে ভারতবর্ষে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান যার, সেই অর্লফ হীরে মহীশূরের এক দেবমন্দির থেকে এক ফরাসী নাবিক চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। সেই চুরির ব্যাপার তোমার ডিটেকটিভ গল্পের প্লট হতে পারে। নাবিকটি মন্দিরের দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের সিদ্ধির শরবতের নেশায় কাৎ করেছিল। তারপর গভীর রাতে মন্দিরে ঢুকে দেবতার তৃতীয় নয়নস্বরূপ সেই হীরেটা খুলে নিয়ে সেখানে অবিকল ওই আকারের এক কাচের চোখ বসিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও ধরা পড়ার ভয়ে সে নিজের জানুতে গভীর গর্ত করে হীরেটা লুকিয়ে রাখে। যে জাহাজে করে সে এ দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ওই হীরে বেচে দেয়। ক্যাপ্টেন আমস্টারডামের কাউন্ট অর্লফকে বেচে দেয়। অর্লফ নিজের নামেই হীরেটার নামকরণ করে রাশিয়ার রাণী ক্যাথারিনের কাছে বেচে। হীরেটা এখন রুশ সরকারের সম্পত্তি। ওটার দাম প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছাতে আর একটু সময় লাগবে বুঝে ভুজঙ্গ তার বন্ধুকে ভারতের বিখ্যাত হীরেগুলির ইতিহাস শোনায়। সে বলে, পৃথিবীর সপ্তম হীরে 'পিট-ডায়মণ্ড'-এর আবিষ্কর্তা শ্রমিকটিকে হত্যা করে এক দস্যু সেটি হস্তগত করে। নানা হাত-ঘোরা হীরেটার সংবাদ পেয়ে মাদ্রাজের তখনকার গভর্নর উইলিয়াম পিট মাত্র বিশ হাজার পাউন্ডে সেটা কিনে নিয়ে ফ্রান্সের রিজেন্ট ফিলিপসকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। হীরেটা পঞ্চদশ লুইয়ের রাজমুকুটে স্থান পায়। তারপর নেপোলিয়ান ক্ষমতা দখল করার পর হীরেটা তাঁর তলোয়ারের বাঁটে বসান। বর্তমানে প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে সেটা আছে।

পৃথিবীর অষ্টম স্থানাধিকারী ভারতীয় হীরেটা কোনো ব্যবসায়ীর মারফৎ ইউরোপে বিক্রির জন্য চালান হয়েছিল। সেখানে বিখ্যাত বীর চার্লস দি বারগান্ডি সেটা কেনেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে ফেলেন। এক ফরাসী নাবিক সেটা পেয়ে মাত্র কয়েক ফ্রাঙ্কে বিক্রি করে দেয় ডিউক অব টাস্কানিকে। তাঁর নামানুসারে হীরের নাম হয় গ্রান্ড ডিউক। সেটা পরে অস্ট্রিয়ার রাজার সম্পত্তি হয়েছিল।

সমর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, প্রাচীন ভারতে ভুজঙ্গ ধরের মতো কোনো ডিটেকটিভ না থাকায় ভারতের সম্পদ বিদেশের রাজভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। এখন আর সে ভয় নেই।

ঠাট্টা নয়। তোমাকে হীরে সম্বন্ধে এত কথা বললাম এইজন্য যে

সোফায় আরাম করে বসে ববি

যাতে তুমি কেসটার গুরুত্ব বোঝ। স্মাগলার বব গিলকি আর একটি ওইরকম দামী হীরে নিয়ে আর আধঘণ্টার মধ্যে ভারত থেকে পালাবে।

হীরের কথা ছেড়ে গিলকির কথা বলো! লীলারামের দোকানে সে কী করেছিল?

লীলারামের দেখানো দামী হীরেগুলোর মধ্যে কোনোটাই তার পছন্দ হলো না। সবগুলি ভাল করে দেখার পর সে জানাল কোনোটাই কিনতে ইচ্ছুক নয়। লীলারামের কর্মচারীরা সাহেবের সামনে থেকে হীরেগুলো উঠিয়ে আয়রন সেফে পুরে রাখতে গিয়ে দেখল একটি হীরে উধাও। ঐতিহাসিক ভার্গাস হীরকের ষোল খণ্ডের একটি সেট, সাইজ চিনে বাদামের মতন, কিন্তু খুব দামী। দোকানে হৈচৈ পড়ে যায়। সাহেব স্বেচ্ছায় দুহাত মাথার উপরে তুলে নিজেকে সার্চ করতে দেয়। সাহেবের কোট-প্যান্টের পকেট হাতড়ে কিছু পাওয়া যায় না। সাহেব বলে যে ওই বিশেষ হীরেটা তাকে দেখান হয়নি, জহুরী ভুল করছে। জহুরী লীলারাম বলে যে তার সংসারের ছেলেমেয়ের নাম ও সংখ্যা তার ভুল হতে পারে, কিন্তু তার দোকানের হীরের সংখ্যা ও দাম কখনো ভুল হবে না। তখনি পুলিস ডাকা হয়। তারা এসে আবার রীতিমতো সার্চ করে, কিন্তু হীরেটা পায় না। প্রমাণাভাবে শুধু সন্দেহের বশে সাহেবকে আটকান যায় না। পুলিস সাহেবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা তার ওপর কড়া নজর রাখে। গোপনে হোটেলের মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এক গোয়েন্দা হোটেলের বয় সেজে দিনরাত্তির সাহেবের উপর নজর রাখে। সাহেব হোটেলের বাইরে কোথাও যায় না, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতেও আসে না। তার মানে দোকান থেকে হীরেটা হাতসাফাই করে সরিয়ে থাকলেও সেটা সে বোম্বেতে কারুকে বিক্রি করেনি। বোধহয় ভারতের বাইরে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল দামে বেচার ইচ্ছে তার আছে। বোম্বের পুলিসের ধারণা যে ম্যাজিশিয়ানরা যাকে পাসিং বলে সেই হাতের কৌশলের সাহায্যে সে হীরেটা হস্তগত করেছে, কিন্তু কোথায় সেটা লুকিয়েছে তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

সমর প্রশ্ন করে, তারপর?

গিলকি বোম্বে থেকে কলকাতায় কাল এসেছে। আজ সকালে সিঙ্গাপুর যাওয়া তার প্ল্যান। এখানেও কারুকে সে হীরে বেচার চেষ্টা করেনি। এরোপ্লেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার ওপর নজর রেখেছি। কাল রাত্তিরে সে গ্র্যান্ড হোটেলে ছিল। সেখানেও এক গোয়েন্দা হোটেল-বয় সেজে নজর রাখে। তার কাছে কেউ আসেনি। এখন সে এরোড্রোমে গেছে, একটু বাদেই তার ফ্লাই করার কথা। আমি টেলিফোনে সেখানকার অফিসারদের বলেছি তোমাকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যে করেই হোক তার ফ্লাইট দেরি করিয়ে দিতে। এরোড্রোম অফিসার রাজী হয়েছে তুমি না পৌঁছান পর্যন্ত তার প্লেনে তেল ভরা বা অন্য প্লেন এখনি ল্যান্ড করবে এই অজুহাতে গিলকির টেক-অফ দেরি করিয়ে দিতে।

ভুজঙ্গ গাড়ির বাইরে দৃষ্টিপাত করে বলল, আমরা এরোড্রোমে এসে পড়েছি। আইনত সাহেবকে আটকাবার ক্ষমতা আমাদের নেই, অথচ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস তার কাছে হীরেটা আছেই আছে। মাত্র পনেরো মিনিট সময় তুমি পাবে। দেখ তার মধ্যে যদি হীরেটা উদ্ধার করতে পার। আমরা হার মেনেছি। বাট উইশ ইউ সাকসেস!

সমরদের গাড়ি এসে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর কাছে থামল। তারা দুজনে নেমে পড়ল। ভেতরে ঢুকে দেখাল লাউঞ্জের এক সোফায় আরাম করে বসে ববি গিলকি সিগারেট টানছে। মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। মনে মনে হয়তো বুঝেছে কলকাতার পুলিস ও কাস্টমস তার কাছে হার মেনেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই সে নিরাপদে ভারত ত্যাগ করতে পারবে।

ডি. সি. ভুজঙ্গ ধরকে দেখে অন্যান্য অফিসাররা তার কাছে এল। তাদের কথাবার্তা সমরের কানে আসে ঃ

আবার আমরা ওর সমস্ত মালপত্তর তন্নতন্ন করে সার্চ করেছি।

জামাকাপড় খুলিয়ে বডি সার্চ করেছি। পায়ের জুতো মোজাও পরীক্ষা করা হয়েছে।

কোটের লাইনিং, স্যুটকেসের সিক্রেট পকেট ইত্যাদি স্মাগলারদের যত রকম লুকোবার জায়গা থাকতে পারে সবেরই সন্ধান করেছি।

আমার মনে হয় হীরেটা ও গিলে ফেলেছে। একমাত্র ওর পেটের মধ্যেই থাকা সম্ভব। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স-রে করে কিংবা জোলাপ খাইয়ে দেখতে হবে।

কিন্তু তাতেও না পাওয়া গেলে তখন?

এমনিতেই ও বলা শুরু করেছে তোমরা আমায় অনর্থক হয়রান করছ। তোমাদের জন্যে ঠিক সময়ে সিঙ্গাপুরে না পৌঁছাই যদি তাহলে আমার বিজনেসের ভীষণ ক্ষতি হবে। তখন তোমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমি আমেরিকার কনসালকে জানাব। তিনি দিল্লীর হোম-ডিপার্টমেন্টকে বলবেন এক নিরীহ বিদেশীকে তোমরা অনর্থক জ্বালাতন করেছ।

হুঁ। শেষে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে চোরটা বুক ফুলিয়ে

বেরিয়ে যাবে? লজ্জার কথা! কাগজে টি-টি পড়বে।

সমর ওদের আলোচনা শুনতে শুনতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ববি গিলকিকে লক্ষ্য করছিল। সাহেব এক নাক দিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের মতোই ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

সিগারেট শেষ হয়ে আসতে সেটা থেকে আর একটা ধরিয়ে সে অফিসারদের উদ্দেশে বলল, ফাইভ মিনিটস মোর! আই হোপ এভরিথিং ইজ অলরাইট। আই ক্যান টেক-অফ অ্যাট দি সিডিউলড টাইম।

ভুজঙ্গ সমরকে বলল, ভারতের রত্ন ভারতে রাখার জন্য আমি একটা লাস্ট চান্স নেব। তাতে আমার চাকরি যায় যাক!

সমর হেসে বলল, সেকি! আমি যে তোমায় প্রমোশন পেয়ে পুলিস কমিশনাররূপে ভবিষ্যতে দেখতে চাই। শীগগির এক টিপ নস্যি যোগাড় করো দেখি!

কিছু বুঝতে না পেরে ভুজঙ্গ প্রশ্ন করে, নস্যি? তুমি নস্যি চাইছ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এরোড্রোমের কর্মচারী বা প্যাসেঞ্জার কারও কাছে আছে কিনা তাড়াতাড়ি খোঁজ করো। নিশ্চয় কারও না কারও নস্যি নেওয়া অভ্যাস আছে। নস্যির উপর তোমার চাকরির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শীগগির—

সমরের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও তার ওপর আস্থা থাকায় ভুজঙ্গ ছুটে চলে যায় নস্যিখোর খুঁজে বের করতে।

সমর এগিয়ে গিয়ে গিলকির সঙ্গে আলাপ শুরু করল ইংরাজিতে। গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং! আপনি আবার কে? পুলিস না কাস্টমসের লোক?

ওদের কেউ নয়। একজন লেখক।

লেখক! সাংবাদিক! দেখুন তো, মিছিমিছি সন্দেহ করে আমায় এরা কি রকম জ্বালাতন করছে! এ নিয়ে আপনি কাগজে খুব লিখুন। এরকম বিরক্ত করলে আর কোনো আত্মসম্মানী বিদেশী এদেশে বেড়াতে আসবে? আপনারা ফরেন এক্সচেঞ্জ সহজে পাবেন?

সত্যি কথা! নিশ্চয়ই লিখব। তা আপনি তো এখুনি রওনা হচ্ছেন?

হ্যাঁ। ওরা আমায় অনেকবার সার্চ করেছে। গিলকি অফিসারদের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে না হয় আর একবার সার্চ করুক। তাতেও সন্তুষ্ট না হলে বলুক, আমি না হয় উলঙ্গ হয়েই প্লেনে উঠব।

সমর বলল, তার দরকার হবে না। ওরা আর সার্চ করবে না। যাবার আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার মতামত একটু শুনি।

ও, জার্নালিজমের জন্য? আপনাদের দেশটা বড় গরম লাগে আমাদের কাছে। সাহেব সমরকে একটা সিগারেট অফার করে বলল।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তো! অনেকেরই গরমে ঘাম বসে সর্দি হয়। আপনার সর্দি হয়নি তো?

না। অবশ্য আমি গরমের মধ্যে খুব ঘোরাঘুরি করিনি।

ইতিমধ্যে ভুজঙ্গ ধর এক নস্যির ডিবে এনে সমরের হাতে দিল। কৌতূহলী সাহেব সমরকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি?

নস্যি।

ন্যাস্টি থিং। আপনি নেন নাকি?

হ্যাঁ। আপনি সিগারেট টানেন মুখ দিয়ে, এটা টানতে হয় নাক দিয়ে। মুখের এক ইঞ্চি উপরে নাক। তাই আপনার চেয়ে আমি এক ইঞ্চি সুপিরিয়র। আসুন, দুজনে সমান হই। আপনি সিগারেট অফার করলেন, তার বদলে আমি দেব এক টিপ নস্যি...

ও, নো নো! সাহেব সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, আই মাস্ট টেক-অফ নাউ।

সমরও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভুজঙ্গ। সাহেবকে ধরে জোর করে নাকে নস্যি দিয়ে দাও। নাকের গর্তে সাহেব হীরেটা পুরে রেখেছে।

অফিসাররা সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে ঘিরে ধরে। ধস্তাধস্তি করে সাহেবের নাকে নস্যি দেওয়া হয়। তার হাঁচির সঙ্গে হীরেটা বেরিয়ে আসে। হাঁচতে হাঁচতে সাহেবের নাকানির একশেষ হয়। নাকের জলে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তাকে প্লেনের বদলে পুলিসের গাড়িতে চাপতে হয়।

ভুজঙ্গ সমরকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি করে টের পেলে যে ওর নাকের মধ্যে হীরেটা লুকানো আছে?

সমর জবাব দিল, যখন শুনলাম সাহেবের মালপত্তর জামা-কাপড়ের মধ্যে হীরেটা নেই, তখনই বুঝলাম সেটা তার দেহেই আছে। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম সাহেব যখন মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, তখন ধোঁয়া একদিকের নাকের গর্ত দিয়েই শুধু বের হচ্ছে। জেনে নিলাম সাহেবের সর্দি হয়নি। অতএব নাকের একদিক বোজার একটি মাত্র কারণই থাকতে পারে। হীরেটা নাকে পুরে তোমাদের নাকাল করছে।

ছবি: সুফি

চন্দ্র সরোবর প্রজেক্ট

শিশিরকুমার মজুমদার

চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার

এন. আর. কুরুভেল্লুর কথা

ভীষণ বিপদে পড়েছি! এ এমন বিপদ যা নিয়ে আমি কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছি না! কি যে করব তা-ও ভেবে পাচ্ছি না।

কিছুক্ষণ আগে কিরণ সিং এসে বলে গেল, 'আজও ব্লাস্টিং-এর কাজ চালু রাখা যাবে না সাব।' কারণ ওই এক, বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ তেওয়ারী ব্লাস্টিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে ব্লাস্টিংয়ে বাধা দিচ্ছে। বার কতক ওখান থেকে ওকে কথায় ভুলিয়ে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিরণ সিং। কিন্তু তেওয়ারীজী জায়গা থেকে নড়েনি। তার মুখে ওই এক কথা, ব্লাস্টিং চললে আমাদের দেশ এক পরম সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে।

কিরণ সিং ব্লাস্টিং ইউনিটের হেড সর্দার। লেখাপড়া তেমন জানে না। কিন্তু ব্লাস্টিংয়ের কাজে গোটা দুনিয়ায় অমন এক্সপার্ট আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। প্রায় তিরিশ বছর ধরে ও এই ব্লাস্টিংয়ের কাজ করছে।

আমরা উত্তর ভারতের এক গোপন অঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশের শিবালিক পর্বতশ্রেণীর মাঝে নতুন একটা হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাচ্ছি। নদীতে বাঁধের কাজে তাই নদীর দুদিকের পাথর কাটিং হচ্ছে। অঞ্চলটা এত বেশি সীমান্ত অঞ্চলে যে সরকার বাধ্য হয়েই এই প্রজেক্টের কথা গোপন রেখেছে। আমি এই প্রজেক্টের প্রধান। আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

কাজ বেশ চমৎকার গতিতে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু গত ক'দিন থেকে ব্লাস্টিংয়ের চার্জে যে ইঞ্জিনিয়ার আছে, মানে তেওয়ারীর অদ্ভুত কতগুলো ব্যাপারে কাজ একদম বন্ধ হয়ে গেছে!

গত তিন তারিখে ভোরবেলা সবে ঘুম থেকে উঠেছি, তখনি ফোনটা বেজে উঠল। কিরণ সিং সোজা আমাকে বলল, 'স্যার, রাতের শিফ্‌টে রজব আলি ছিল। তাকে ব্লাস্টিং চালিয়ে যাবার হুকুম দেননি তেওয়ারী সাহাব! সকালে

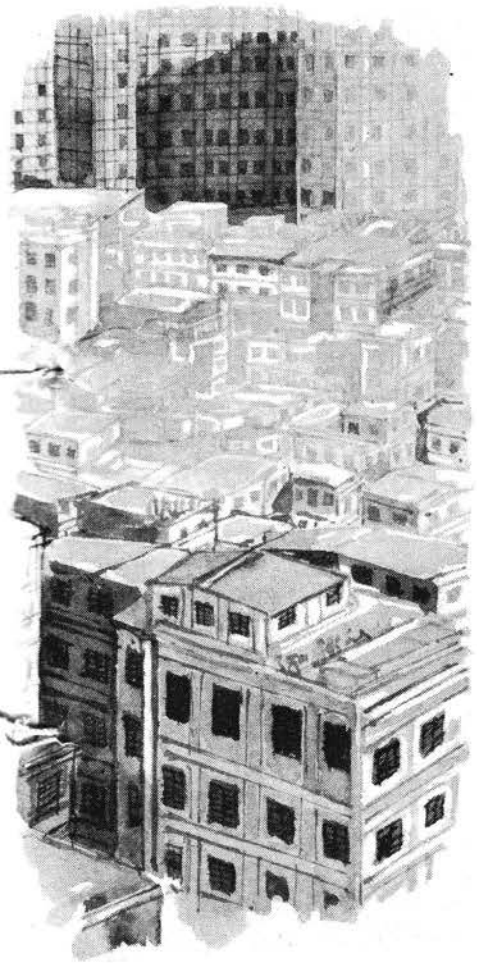

এসেও আমাকে বললেন, ব্লাস্টিং বন্ধ, যতক্ষণ না তিনি আবার হুকুম দিচ্ছেন!'

অবাক আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কোথাও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি?'

'না, সাব।'

'তাহলে নিশ্চয়ই পাথরের গায়ে কোথাও ফাটল বার হয়ে পড়েছে?'

'না, সাব।'

'তাহলে কি ধস নেমেছে কোথাও?'

ব্যস্ত হয়ে কিরণ সিং বলল, 'সাব, কোথাও কিছুই হয়নি। কাজ এভাবে বন্ধ করে দেবার যে কি কারণ তাই বুঝতে না পেরেই আপনাকে এত সকালে বিরক্ত করছি।'

উত্তরে আমি কিছু বলার আগেই বাইরে দরজার বেল বাজল। আর্দালি দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকল তেওয়ারী। উস্কোখুস্কো চুল, ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। দরজার কাছ থেকেই জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি স্যার?'

আমি সম্মতি জানাতে ও ক্লান্ত পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। আমি ফোনে কিরণ সিংকে বললাম, 'তেওয়ারীজী আমার কাছে এক্ষুণি এসেছেন। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা কি বুঝি আগে।'

ওদিক থেকে ও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্লাস্টিং কি শুরু করে দেব সাব?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'না। ব্লাস্টিং আপাতত বন্ধই থাকবে। স্টাফরা যে যার পোস্টে ডিউটি দেবে। আমি আলোচনা করে যা নির্দেশ দেবার দেব।'

কিরণ সিং ফোন ছেড়ে দিল। আমি আর্দালিকে ডেকে কফি দিতে বলে তেওয়ারীর সামনের চেয়ারে বসলাম।

তেওয়ারী যেন কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল। সে মাত্র দশ-বার সেকেন্ডের জন্য। তারপর বেশ অস্বস্তিতে বলল, 'স্যার, আমার কোনো অসুখ হয়নি। বিশ্বাস করুন, আমি ড্রাগ খাই না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, সবল আছি। প্রয়োজন হলে আপনি কোম্পানীর ডাক্তারদের দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। আমি যা বলব, আপনি মন দিয়ে শুনবেন আগে। তারপর নয় কৈফিয়ত চাইবেন কেন কাজ বন্ধ করেছি তার জন্য।'

আমি হেসে বললাম, 'এত কথার কি আছে? আমি আমার স্টাফদের ব্যক্তিগতভাবে চিনি। কিন্তু কি কারণে ব্লাস্টিং বন্ধ করলে?'

ও বেশ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, 'স্যার, আপনি কি ঋগবেদ পড়েছেন? মানে ও-সম্বন্ধে আপনার কি ভাল জানা আছে?'

অবাক আমি বললাম, 'এ প্রশ্ন কেন? আমি হিন্দু। সাধারণ হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান থাকা উচিত তা আমার আছে। তবে আমি ও-বিষয়ে পণ্ডিত নই। ঋগবেদ আমার পড়া নেই। ওর নাম শোনা আছে।'

'বালখিল্য ঋষিদের নাম শুনেছেন?' ও জিজ্ঞাসা করল।

'সর্বনাশ! তাঁরা এসে চড়াও হয়েছেন নাকি? কেন এই অঞ্চলটা কি এক দেবস্থান নাকি? নাকি আমরা তাঁদের একান্তে সাধন-ভজন করায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি? কতজন এসেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে? ধর্ম বলে কথা! এ দেশে তো ধর্মের নামে সবকিছুই করা সম্ভব। ভাল করেছ আপাতত ব্লাস্টিং বন্ধ করে। তা ওই ঋষিদের প্রধানদের আমার সঙ্গে আলোচনায় বসতে অনুরোধ করেছ তো? আমাকেও তো কাজ বন্ধ রাখার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওপরওয়ালার কাছে।'

মাথা নিচু করে কতক্ষণ বসে রইল তেওয়ারী। তারপর মুখ তুলে বলল, 'স্যার, ওঁরা আসবেন না। মানে, তাঁরা আসতে পারবেন না। নানান কারণ আছে তার। আমাকেই তাঁরা বলতে বলেছেন, এই যে ব্লাস্টিং চলেছে, তার ফলে ছিটকানো পাথরের টুকরোর ঘায়ে প্রতিদিন তাঁদের দেড়শ থেকে দু'শ জন করে মারা পড়ছেন। তাঁদের চারদিক ঘিরে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চলেছে। তাঁরা তাই এটা বন্ধ করতে অনুরোধ করেছেন। তাই আমি....।'

আমি ওর মুখে একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রথমেই মনে হলো, এই নির্জন নির্বান্ধব পরিবেশে থেকে ওর বোধহয় মাথা গরম হয়েছে। এখুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনা উচিত। সরকার এখানে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার পাকা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আশপাশের পাহাড় জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে জমি জরিপ করে তবে কাজ শুরু করার অনুমতি দিয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী এই অঞ্চলের দু'শ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে কোথাও কোনো জনবসতি নেই। তাহলে ব্লাস্টিংয়ের ফলে ছিটকে-ওঠা পাথর পড়ে দেড়শ থেকে দু'শ জন করে মানুষ প্রতিদিন ঘায়েল হয় কি করে!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের ভাব বুঝতে পারল তেওয়ারী। ও কেশে গলা সাফ করে বলল, 'স্যার, আমার মনে হয় আপনি বালখিল্যদের বিষয়ে বোধহয় তেমন কিছুই জানেন না। ঋগবেদে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কথা লেখা আছে। তার মধ্যে তাঁদের আকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে একটা ঘটনার উল্লেখ আছে: 'এক মহামুনির যজ্ঞে সবাই যখন বিরাট বিরাট কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে আসছিলেন, তখন সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত বালখিল্যরা সবাই মিলে ধরাধরি করে বহু কষ্টে গাছের একটা বিরাট পাতা আনছিলেন। তাঁদের আসার পথের মাঝে গরুর খুরের চাপে তৈরি একটা গর্তে কিছু জল জমে ছিল, তাতেই পড়েন তাঁরা।'

আমি আর পারলাম না। প্রায় ধমকেই বললাম, 'এসব কি তুমি বলছ তেওয়ারী! পরশু রাতে তোমাদের পার্টি ছিল শুনেছি। সেখান থেকে তুমি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলে তাও জানি। কি খেয়েছিলে, কোথায় ছিলে বাকি সময় শুনি?'

তেওয়ারী করুণভাবে বলল, 'না স্যার, না, আমি নেশা করি না। এ কথা সত্যি পরশু রাতে পার্টি ছিল। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাগানে ঘুরব বলেই বার হয়েছিলাম। তখন তো বুঝিনি আমাকে কোথায় যেতে হবে। গতকাল রাতে ফিরেছি আমি। ফিরেই ব্লাস্টিং বন্ধ করে

দিয়েছি। আজ সকালেও তা বন্ধ রেখেছি। আমি যা বলছি, তা সত্যি। বালখিল্যদের সর্বনাশ করছি আমরা। পরশু রাতে বাগানে বার হতেই বালখিল্যদের তিন প্রতিনিধির সঙ্গে আমার আচমকা দেখা হয়। আমিও প্রথমে আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের একান্ত অনুরোধে আমি তাঁদের সঙ্গে যাই তাঁদের দেশে। সেখানে গিয়ে আমি যা দেখে এসেছি তা সত্যিই মর্মান্তিক। তাঁদের শত শত বাড়িঘর, দালান-কোঠা, হাসপাতাল কারখানা শূন্য থেকে পাথর পড়ে ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। সত্যিই শয়ে শয়ে লোক মারা পড়েছেন প্রতিদিন। ওঁদের জীবনযাত্রা স্তব্ধ হতে বসেছে। ভেবে দেখুন স্যার, হিরোসিমা নাগাসাকিতে এটম বোমা ফেলে যে জঘন্য অমানবিক পাপ আমেরিকা করেছে মানবজাতির প্রতি আমরাও কি ঠিক তেমনি জঘন্য অমানবিক পাপ করব না, যদি ব্লাস্টিং চালিয়ে যাই? আরও সাত দিন ব্লাস্টিংয়ের প্রোগ্রাম আছে আমাদের। তা চালিয়ে গেলে, পৃথিবীর বুক থেকে বালখিল্য সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে নাকি?' কাতরভাবে কথাগুলো বলে তেওয়ারী থামল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। বহুক্ষণ মাথায় কোনো বুদ্ধি এল না। তেওয়ারী যা বলছে তার মানে হলো ব্লাস্টিংয়ের ফলে ছিটকে- ওঠা পাথর পড়ে অজানা এক মানবসভ্যতা ধ্বংস হতে চলেছে! ছিটকে-ওঠা পাথরগুলো তো তেমন কিছু বড় সাইজের নয়। হ্যাঁ, সোজাসুজি মাথায় পড়লে মানুষ মরতে পারে। কিন্তু একটা-দুটো পাথর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো সবাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে। নইলে অন্য কোথাও আশ্রয় নেবে। তা হলে মৃত্যু-সংখ্যা অত হবে কেন? সভ্যতা ধ্বংসই বা হবে কেন ওই পাথর পড়াতে! তেওয়ারীর কি হুঁশ নেই নাকি! কি যে বলছে ও তা নিজেই জানে না!

তেওয়ারী কিন্তু আমার এই চুপ করে থাকাটাকে আমার মনের পরিবর্তন বলে ভাবল। তাই একটু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'স্যার, ঋগবেদেই লেখা আছে, সে সময় এঁদের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এঁদের এক একজনের উচ্চতা ছিল বুড়ো আঙুলের মতো। এঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। একবার দেবরাজ ইন্দ্র এঁদের উপেক্ষা করলে, এঁরা অন্য একজন মানুষকে শিখিয়ে পড়িয়ে দ্বিতীয় ইন্দ্র করে তোলার কাজ শুরু করবেন ভেবেছিলেন। এমনই ছিল এঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে দখল। ইন্দ্র তো ভয় পেয়ে কাশ্যপ মুনিকে ধরলেন। কাশ্যপ মুনি কোনোমতে এঁদের ঠেকান। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে থাকলে প্রতিপদে তাঁদের অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তাঁরা সবাই স্বেচ্ছায় হিমালয়ের দিকে সরে এসে নিজেদের গোপন রাজ্য স্থাপন করেন। যা কিনা গত কয়েক দিনের ব্লাস্টিংয়ে আমরা ধ্বংস করেছি। যা কিছু বাকি আছে, তাও ধ্বংস হয়ে যাবে যদি আমরা ব্লাস্টিং চালিয়ে যাই।'

কিছু বলতে হবে তাই বললাম, 'তুমি তো জান, গত রাত থেকে যেখানে ব্লাস্টিং চালু করার কথা, সে জায়গাটা আগের জায়গা থেকে দূরে। তার ফলে এখন আর আগের জায়গায় পাথর ছিটকে পড়বে না। হয়তো তাহলে তোমার ওই বুড়ো-আঙুলে সভ্যতা বেঁচে বেতে পারে। সুতরাং...'

কথা আমাকে শেষ করতে দিল না তেওয়ারী, বাধা দিয়ে বলল, 'স্যার, পাথর পড়েই যে শুধু ওঁদের ক্ষতি হচ্ছে তা তো নয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে যে ভূমিকম্প হচ্ছে, তাতে তাঁদের স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো হুড়মুড় করে ধসে পড়ছে। বহু বাড়িতে ফাটল ধরেছে। এমন কি শহরের আন্ডারগ্রাউন্ড সিউয়ারেজগুলোতে ফাটল ধরে ময়লা জলনিকাশে বাধা পড়ছে। জায়গায় জায়গায় পাহাড়ে ধস নামছে। জমি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজের চোখে এসবই দেখে এসেছি স্যার, নিজের চোখে। একটা কথা বলি স্যার, সবকিছু দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছে, ওঁদের সভ্যতা আমাদের সভ্যতা থেকে নানান কারণে অনেক উন্নত। আমরা এখনও আমাদের শক্তির উৎস হিসাবে পৃথিবীর সম্পদ পুড়িয়ে পৃথিবীর আবহাওয়াকেই বিষাক্ত করে তুলছি। ওঁরা ওঁদের সব শক্তির উৎস সূর্যরশ্মিকেই করেছেন। আমি মিনতি করছি স্যার, ওঁদের ধ্বংস করবেন না। ওঁদের কথা আপনি এখুনি প্রচারের ব্যবস্থা করুন। পৃথিবীর মঙ্গলই হবে তাতে। গোটা পৃথিবী থেকে লোক ছুটে আসবে এখানে বালখিল্যদের সঙ্গে আলাপ করতে। এই অঞ্চলে বিরাট শহর গড়ে উঠবে। বিরাট গবেষণাকেন্দ্রও খোলা হবে। পৃথিবীর অনেক অতীত ইতিহাসও জানা যাবে।'

আমি আর থাকতে পারলাম না। বেশ রূঢ়-ভাবেই বললাম, 'বিন্ধ্যেশ্বরী, একটা কথা তোমাকে আমি শোনাতে চাই। এই হাইডল প্রজেক্ট আগামী বছর চালু করা একান্তই দরকার। আমাদের ডিফেন্স সংক্রান্ত দুটো অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি তাদের উৎপাদন শুরু করবে আগামী বছর। আমরা যদি আমাদের কাজ শেষ করতে না পারি, তাহলে তাদের কাজও বন্ধ হবে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই আমরা আমাদের কাজ বন্ধ করতে পারব না।'

বাধা দিয়ে তেওয়ারী বলল, 'কিন্তু স্যার...'

আমি আরও রূঢ়ভাবে বললাম, 'গরুর পায়ের চাপে মাটিতে যে গর্ত হয়, তাতে জমা জলে পড়ে যারা দিশাহারা হয়, তাদের দেখতে কত বড় শুনি?'

তেওয়ারী তাড়াতাড়ি বলল, 'স্যার, ঋগবেদে তো তাই লেখা আছে। আর আমিও তো নিজের চোখেই তাঁদের দেখে এলাম। বলেছি তো তাঁরা বুড়ো আঙুলের মাপের মতো লম্বা হবে। কথাটা আপনি বোধহয় খেয়াল করেননি আগে। ওঁরা সত্যি আছেন স্যার। ওঁদের সভ্যতা ওই সামনের পাহাড়ের ওদিকেই কোথাও ভীষণভাবে বিকাশলাভ করেছে, বিস্তারলাভও করেছে যে তাতেও সন্দেহ নেই। কারণ ওঁদের প্রধান আমাকে বলেছেন, ওঁদের রাজ্যের দৈর্ঘ্য আমাদের অতীত হিসাবমতে এক যোজন। এক যোজন স্যার চার ক্রোশ। মানে, আট মাইল। প্রস্থ আধ যোজন অর্থাৎ দুই ক্রোশ বা চার মাইল। তাহলে মোট হিসাব দাঁড়াবে বত্রিশ বর্গমাইল। ওদেশে এগারোটা মহানগর আছে। দুশো সাতান্নটা নগর। আর উপনগরের সংখ্যাটা এখন ঠিক মনে করতে পারছি না স্যার। ওঁদের সভ্যতা এত উন্নত যে ওদেশে গ্রাম বলে কিছু নেই। নেই নিরক্ষরতা। নেই বেকারসমস্যা। দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যু না হলে মানুষ আমাদের হিসাবে প্রায় একশ বছর বাঁচেন। শুধু কি তাই স্যার, ওঁদের রাস্তাঘাট, যাতায়াত- ব্যবস্থা আমাদের থেকে সহস্রগুণ ভাল। প্রতিটি উপনগরের সঙ্গে নগরের পাকা রাস্তার যোগাযোগ আছে, নগরের সঙ্গে মহানগরের। দশটা উপনগর নিয়ে ওখানে একটা উপজেলা। দশটা উপজেলা নিয়ে একটা জেলা। প্রতিটি জেলায় একটা করে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার অধীনে এ হেন বিষয় নেই যা পড়ানো না হয়। সব জেলার বাসিন্দারা তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন। আবার সব নেতারা মিলে একজনকে দেশের প্রধান নির্বাচন করেন। স্যার, ওদেশে সবাই সমান। ওদেশে তথাকথিত ধর্মের কোনো স্থান নেই। তাই কোনো ধর্মগুরুও নেই। রাজনীতির স্থান নেই, তাই বাকসর্বস্ব নেতাও নেই। আর এতদিন ওদেশে আবহাওয়া দূষণ বলে কোনো সমস্যাই ছিল না। আমরা বাঁধ তৈরি করে আজকাল ওদের মধ্যে সেই সমস্যার সৃষ্টি করেছি। ওদেশে ঘরে বাইরে সবার সব কাজ চলে সৌরশক্তিতে পাওয়া বিজলিতে। এত কথা এত বিস্তৃত করে বললাম, ওঁদের অবস্থার কথা আপনাকে সঠিকভাবে বোঝাব

বলে। আপনি ওঁদের রক্ষা করুন স্যার। ওঁদের ধ্বংস করবেন না।'

এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে আমার মতো একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে এইরকম এক রূপকথাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। তেওয়ারীকে বাধা না দিলে ও হয়তো আরও কত কথাই বলবে, যা আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে যাবে। তাই প্রচণ্ড ধমকে তাকে থামিয়ে দিলাম। বললাম, 'তোমাকে কুড়ি দিনের ছুটি দিচ্ছি। তুমি এখনি প্রজেক্টের গাড়ি নিয়ে শহরে চলে যাও। সেখান থেকে বাড়ি। তোমার জায়গায় আমি সুকান্ত পালকে পাঠাচ্ছি এখুনি। ব্লাস্টিং সম্বন্ধে যা করার সে-ই করবে এখন। তুমি বিশ্রাম নিয়ে ফিরে এসে আবার তোমার চার্জ বুঝে নেবে।'

তেওয়ারীর মুখের ভাব বদলে গেল। ও যেন কেমন অসহায়ের মতো হয়ে গেল। আমার দিকে স্পষ্টভাবে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনি তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করলেন না!'

ধমকে আমি বললাম, 'না, না, তোমার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করিনি। বুড়ো আঙুল মাপের মানুষ! তোমার মধ্যে এখন একটা ভিন্ন শক্তি কাজ করছে। সেই শক্তিই তোমার মনের মধ্যে এইসব চিন্তা যুগিয়েছে। তুমি বাড়ি পৌঁছালেই আমাদের সরকারি ডাক্তার তোমার ভার নেবেন। একটু সুস্থ হলেই বুঝতে পারবে, কি সব অবিশ্বাস্য কথা তুমি শোনাচ্ছিলে আমাকে! তোমার এই অবস্থায় আমি আর তোমাকে কাজে রাখতে পারি না। এই আমার শেষ কথা।'

কথার শেষে ফোন তুলে আমি সিকিউরিটি অফিসারকে ডাকলাম। বললাম, 'ইঞ্জিনিয়ার বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ তেওয়ারী আমার ঘরেই আছেন। আমি চাই আমার ঘর থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে যেন অ্যারেস্ট করা হয়। অ্যারেস্ট করেই তাঁকে প্রজেক্টের বাইরে নিয়ে গিয়ে দায়িত্বসম্পন্ন লোক সঙ্গে দিয়ে কলকাতায় আমাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। আমার লেখা চিঠি থাকবে সঙ্গে। সেই চিঠি তেওয়ারীর সম্বন্ধেই লেখা। ডাক্তাররা তাঁর দায়িত্ব বুঝে নিলে তবে সিকিউরিটির কাজ শেষ।'

সিকিউরিটি অফিসার যজুর্বেন্দ্র সিংজী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনো বে-আইনী কিছু ঘটেছে নাকি স্যার?' তাঁর গলায় বেশ উদ্বেগ!

তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'না, না, তেমন কিছু নয়। খানিকটা শারীরিক ব্যাপার বলতে পারেন। ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে বলেই এতটা কঠিন হচ্ছি আমি। আপনি নিজেও আসুন না এখানে। জরুরী কথা আছে।'

উনি 'আসছি স্যার' বলে ফোন ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখলাম সামনের চেয়ারে তেওয়ারী ঠিক তেমনিভাবেই বসে আছে। ওর মুখেও সেই করুণ ভাব। ও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমাকে এভাবে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার তো একটাই মানে! আপনি ভাবছেন, আমার মাথার গোলমাল হয়েছে! আমার বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেবার আগে আপনি নয় আপনার ক'জন বিশ্বস্ত অফিসারকে আমার সঙ্গে দিন, আমি যদি তাঁদের ওই বালখিল্যদের রাজধানী 'অমরাপুরীতে' না নিয়ে যেতে পারি, তখন তো আমার বিরুদ্ধে সব ব্যবস্থাই আপনি নিতে পারবেন। আর যদি প্রমাণ হয় আমি সত্যি, তাহলে...'

আমি ওর কথায় বাধা দিয়ে ফোন তুলে সুশান্ত পালকে ডাকলাম। তাকেও তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসতে বললাম।

তেওয়ারী তখনও যেন শেষ চেষ্টা হিসাবেই বলে চলেছে, 'স্যার, বালখিল্যরা অত্যন্ত মেধাবী। অতীতে বহুযুগ আগে তাঁরা তাঁদের ক্ষমতায় দ্বিতীয় ইন্দ্রকে গড়তে গেছিলেন। এর মানে স্যার, ইন্দ্র যেমন দেবতাদের প্রধান হিসাবে ত্রিভুবন শাসন করতেন, ওঁরাও তেমনি যান্ত্রিক কিছু তৈরি করতে যাচ্ছিলেন, যার ক্ষমতায় তাঁরাও ত্রিভুবনে তাঁদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পারতেন। তাঁদের তা করতে দেওয়া হয়নি। বদলে এই হিমালয় অঞ্চলেই তাঁদের রাজ্য স্থাপন করতে দেওয়া হয়েছিল। স্যার, সে সুযোগ তাঁরা নষ্ট করেননি। আজ তাই তাঁরা সব বিষয়েই আমাদের থেকে সহস্রগুণে এগিয়ে আছেন। চলুন, আপনিই না হয় তাঁদের দেখতে চলুন। না যান তো অন্তত তাদের ধ্বংসের কারণ হবেন না।'

আমি ওকে উপেক্ষা করলাম। ওকে বকে যেতে দিলাম। আমি জানি, এসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা বা সায় দেওয়া দুটোই খারাপ। আপনমনে বকে ও থামল। তবে সে মাত্র অল্পক্ষণের জন্য। ফের বলতে লাগল, 'ওঁরা কিন্তু আশা করেছেন, আমাকে ওঁদের সমস্যা যে কি তা দেখানোর পর আমরা ব্লাস্টিং বন্ধ করব। ওঁদের প্রধান আমাকে বলেছেন, ওঁরা বিশ্বাস করেন, আমরা ওঁদের উপস্থিতির কথা জানি না বলেই এই সর্বনাশ করে চলেছি। এখন যখন আমরা ওঁদের সমস্যার কথা জানতে পারলাম, তখন ওঁরাও নিশ্চিন্ত যে আর ওঁদের সর্বনাশ আমরা করব না। ব্লাস্টিং ফের চালু করলে, গোটা পৃথিবীর মানুষদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা কিন্তু বদলে যাবে স্যার। তখন হয়তো ওঁরাও পাল্টা কোনো ব্যবস্থা নেবেন। ওঁরা বিজ্ঞানে আমাদের থেকে বহু এগিয়ে আছেন। ওঁদের বদলা নেওয়া হয়তো আমরা সহ্যই করতে পারব না। এ কথাটাও মনে রাখবেন স্যার।'

আমি ওর এ কথা শুনে অবাক হলাম। এতক্ষণ তেওয়ারী অনুনয়-বিনয় করে আমাকে ওর মনের কথাগুলো বোঝাতে চেষ্টা করছিল। তাতে কাজ না হওয়াতে ও এখন আমাকে প্রচ্ছন্নভাবে ভয় দেখাচ্ছে। সর্বনাশ! ওকে আর একমুহূর্তও প্রজেক্টের ভিতরে ছেড়ে রাখা চলবে না। শেষে কি থেকে কি করে বসবে কে জানে!

মনে খুবই দুঃখ হলো আমার। তেওয়ারী আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকারী ছিল। আজ তার এ কি অবস্থা!

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন যজুর্বেন্দ্র সিং। দরজা নক করে ভিতরে আসার অনুমতি পর্যন্ত নিলেন না। তার মানে তিনি আমার ফোন পেয়ে বেশ চিন্তা নিয়েই এসেছেন। তাঁর হাতে ধরা রিভলবার। সামনে তেওয়ারীকে দেখেই তিনি ধমকে উঠলেন, 'খবরদার চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করবেন না। আপনি এখন আমাদের বন্দী।'

ওঁর পেছন পেছন বেশ ক'জন সিকিউরিটি গার্ড ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তাদেরও হাতে অস্ত্র। তারা নিমেষে তেওয়ারীকে ঘিরে ফেলল। যজুর্বেন্দ্র সিং আমার ফোন পেয়েই কি করতে হবে, সে বিষয়ে সিকিউরিটি গার্ডদের ভালভাবে বুঝিয়েই আমার এখানে এসেছেন। তাই গার্ডরাও নিমেষে কাজ করেছে।

আতঙ্কে ভয়ে আধমরা তেওয়ারী কাঁপতে কাঁপতে উঠেই দাঁড়াল। ও যে এখন কি করবে তা-ই ও ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। ওকে ওভাবে খালি হাতে দাঁড়াতে দেখে যজুর্বেন্দ্র সিংও দারুণ অবাক হয়েছিলেন। তিনি আর কিছু বলার আগেই আমি বললাম, 'ভয় পেও না তেওয়ারী, সিংজী আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি, তাই এমন হলো। না, না, তোমাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি। তবে আজই তোমাকে কলকাতার ট্রেন ধরতে হবে। সেখানেই এখন কিছুদিন তোমাকে গিয়ে থাকতে হবে।' কথার শেষে যজুর্বেন্দ্র সিংকে আর্মগার্ড সরিয়ে নিতে বললাম।

গার্ডরা গোড়ালি ঠুকে সেলাম বাজিয়ে বার হয়ে গেল। আমি যজুর্বেন্দ্র সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তেওয়ারীর সঙ্গে যাবার লোক ঠিক

করেছেন?'

সিংজী মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে আগেই স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি টিকিট কাটতে।' বলে তেওয়ারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসুন তেওয়ারীজী, বাইরেই গাড়ি অপেক্ষা করছে।'

কাঁপতে কাঁপতেই তেওয়ারী ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে। ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'কাজটা কিন্তু ভুল করলেন স্যার। ভবিষ্যতে দুনিয়ার কাছে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

আমি ওর এসব কথার কোনো উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ উত্তরের আশায় থেকে তেওয়ারী একজন গার্ডের সঙ্গে ঘরের বাইরে চলে গেল।

যজুর্বেন্দ্র সিংকে বসতে বলে তেওয়ারীর সব কথাই ওঁকে বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম তেওয়ারী সম্বন্ধে ওঁর কি মত।

একটু ভাবলেন যজুর্বেন্দ্র সিং। বললেন, 'তাহলে তো আপনার অনুমানই সঠিক। নির্জনে জনমানবহীন জঙ্গলের মধ্যে সারাদিন শুধু কাজ নিয়ে থাকতে থাকতেই ওর এই অসম্ভব চিন্তাটা মাথায় এসেছে। এখন তো এ নিয়ে কাউকে কিছু বলা যাবে না। আর যা কিছুই করা হোক না কেন, ওর ভবিষ্যৎ জীবনের ওপরে যেন তার ছাপ না পড়ে। এত ভাল ছেলে, কি চমৎকার হাতের কাজ! সৎ, পরিশ্রমী এমন ছেলে খুব কমই আছে আমাদের এই ইউনিটে।'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিংজী ফের বললেন, 'আপনি স্যার ঠিক ডিসিসনই নিয়েছেন।'

যজুর্বেন্দ্র সিং চলে যাবার পর আমি আবার ফোন করলাম সুশান্ত পালকে। শুনলাম, সে তার কোয়ার্টার ছেড়ে রওনা হয়েছে। কিছু পরে সামনে এসে দাঁড়াল সুশান্ত পাল। সে ডিউটি দেবার জন্যেই মাথায় হেলমেট চড়িয়ে হাজির হয়েছে। আমাকে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমি তৈরি হয়েই এসেছি স্যার।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি কি করে জানলে আমি কোথায় তোমাকে ডিউটিতে পাঠাব? বসো, কথা আছে।'

সুশান্ত বসে বলল, 'কাল রাত থেকে ব্লাস্টিংয়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না, তেওয়ারী নিরুদ্দেশ। তাই বুঝলাম কোথায় আমার ডিউটি। তা ছাড়া, আপনি তো রাতে কার কোথায় ডিউটি আছে সেই নামের তালিকা রোজ তৈরি করেন। আপনি তাহলে জানেন, গতরাতেও আমার ডিউটি ছিল। তা সত্ত্বেও যখন ডেকেছেন, তখন মনে হয় কাজটা খুবই জরুরী। আমি সেইমতো কাজ করব।'

আমি বললাম, 'তেওয়ারী জঙ্গলে পথ হারিয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছি চিকিৎসার জন্য। তার জায়গায় আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিলাম। এখুনি কাজ ফের চালু কর।'

সুশান্ত বলল, 'ঠিক আছে, স্যার। আমি জল যাবার টানেলের কাজের সঙ্গে এই দায়িত্বও নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের কাজ চালু হবে।'

খুশি হয়ে বললাম, 'আমি জানি, তুমি এ কথাই বলবে। আমি সদরে লোক চেয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। নতুন লোক এলে, তুমি তোমার ডিউটিতে ফের ফিরে যাবে।'

সুশান্ত বলল, 'ঠিক আছে, স্যার। কিন্তু আমার দোস্ত তেওয়ারীর কি হয়েছে স্যার? গতকাল সে কোথায় গেছিল? জঙ্গলে তো তার যাবার কথা নয়। তার কি হয়েছে স্যার, তা কি আমি জানতে পারি?'

এ কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'আজই কিছুক্ষণের মধ্যেই যদি ব্লাস্টিং করা ফের চালু করতে পার পাল, তাহলে খুবই খুশি হব আমি।'

আমার উত্তর শুনে পালও কিছুক্ষণ চুপ করে

ওঠার চেষ্টা করবেন না।

থেকে বলল, 'আমি এখুনি যাচ্ছি স্যার কাজ চালু করতে।' কথার শেষে সে আর দাঁড়াল না। সোজা ঘরের বাইরে চলে গেল।

আমি জানি, মনে সে নানান চিন্তা নিয়েই গেল। তেওয়ারী ওর সত্যিই দোস্ত। তার যে হঠাৎ কি হলো, সে চিন্তা তো ওর হবেই। কিন্তু আমিও নিরুপায়। তেওয়ারীর অসুখের কথা এক্ষুণি আর কাউকে জানানো যাবে না।

সুশান্ত পালের কথা

বেশ চিন্তা নিয়েই বসের বাংলো থেকে বার হয়েছিলাম আমি। আমার প্রাণের বন্ধু তেওয়ারীর হঠাৎ এমন কি রোগ হলো যে তাকে সাইট থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো! তাকে যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে তো সন্দেহ নেই, কারণ সকালে তাকে আমি দেখেছি। অবশ্য দেখে মনে হয়েছিল, ওর কিছু হয়েছে। কেমন যেন উস্কোখুস্কো চেহারা। তবে তখন ও আর আমি দুজনেই ডিউটিতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম বলেই কোনো কথা বলতে পারিনি। তারপর থেকে আর ওকে প্রজেক্ট সাইটের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সিকিউরিটি অফিসারকে ওর কথা জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, সে ভাল আছে। আপাতত তার কথা আলোচনা না করাই ভাল। ওকে নিয়ে কেন এত গোপনতা! ও দেশদ্রোহীর কাজ করতে পারে না। ওদের বংশে একজন শহীদ জন্মেছিলেন। দেশের জন্য তিনি হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছিলেন। তেওয়ারীও দেশকে ভালবাসে বলেই কত ভাল ভাল অফার ছেড়ে দিয়ে এই জঙ্গলে এসেছে দেশের ভবিষ্যৎ গড়বে বলে। তাহলে ওর কি এমন রোগ হলো যে ওকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো!

ব্লাস্টিং স্পটে গিয়ে তেওয়ারীর কাগজপত্র দেখে বুঝলাম, নতুন করে যে কাজ শুরু হয়েছে তা যদি নদীর দু পারেই একসঙ্গে চালু রাখা যায় তো মাত্র আট দিনেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। আট দিন পরেই বাঁধ আবার তার মাথা তুলতে শুরু করবে। পাওয়ার হাউসে জল নিয়ে যাবার সুড়ঙ্গের কাজ আমি শেষ করেই এসেছি। এখন সে কাজ শুধু চেক করা হচ্ছে। হিসাবমতো বাঁধের আউটলেটগুলো বন্ধ করা হবে আরও দশ দিন পরে। তারপর বাঁধের গায়ে জমতে শুরু করবে জল। সেই জলকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করে বিজলি উৎপাদন করা হবে। সেচের কাজে লাগান হবে। যে হ্রদ সৃষ্টি হবে তার ধারে সরকার এক প্রমোদকানন আর বিলাসবহুল হোটেল তৈরি করবেন।

লুনা নদীর বুকে এই বাঁধ মাথা তুলছে।

এই তো আমি

আটকে দেওয়া নদীর জল যে বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করবে, সেই হ্রদের নাম রাখা হবে 'চন্দ্র সরোবর'। বাঁধের নাম 'চন্দ্র সরোবর বাঁধ'। আমাদের এই প্রজেক্টকে তাই সরকারিভাবে বলা হয় 'চন্দ্র সরোবর প্রজেক্ট'।

আমার কেমন যেন মাঝে মাঝে মনে হয়, যাঁরা এই চন্দ্র সরোবর প্রজেক্টের পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা সুস্থ তো! তা না হলে লুনা নদীতে বাঁধ দেবার কথা কেউ চিন্তা করে! বলা হয়েছে, দুটো অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই হবে এই বাঁধের প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ বর্ডার এখান থেকে মাত্র আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে।

সে কথা যাক, ভূ-বিজ্ঞানী, পরিবেশ-বিজ্ঞানীরাও এখানে বাঁধ তুলতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই অঞ্চল মূলত মাটি পাথরের পাহাড়ে গড়া। লুনা নদীর জলে তাই প্রচুর পলি। বাঁধে বাধা পেয়ে সে পলি জমে একশ বছরের মধ্যেই এই বাঁধ সর্বনাশ ডেকে আনবে। দ্বিতীয়ত বাঁধ সম্পূর্ণ হলে আশপাশের ঘন বনজঙ্গলের চূড়ান্ত ক্ষতি হবে। ফলে গোটা অঞ্চলের আবহাওয়া একদম বদলে যাবে। জলের অভাব ঘটবে বিশাল এলাকায়। বন-জঙ্গল জলের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তৃণভোজী প্রাণীদের খাবারের অভাব হবে। বহু প্রজাতির ক্ষুদ্র প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটবে।

কিন্তু সে সব কথা আমাদের মনে চিন্তা জাগাতে পারে, সামান্য ক'জন ইঞ্জিনিয়ারের চিন্তায় কি আসে যায়! উপরওয়ালাদের কথাই এদেশে শেষ কথা।

কিরণ সিং ডাকল, 'স্যার চার্জ রেডি।'

চমকে উঠে আমি বললাম, 'কাজ শুরু করে দাও।'

ওয়ার্নিং ঘণ্টা বেজে উঠল, মাইকে কিরণ সিং হুঁশিয়ারি দিল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে একসঙ্গে বারুদ ফাটল, বুম বুম বুম। প্রচণ্ড শব্দে ফের ব্লাস্টিং শুরু হয়ে গেল।

মিনিটখানেক পরে কিন্তু টেলিফোন বেজে উঠল। কানে দিতেই ওদিক থেকে বস বললেন, 'ক্যারি অন মাই বয়, আমি খুশি।'

ব্লাস্টিং সমানে চলতে লাগল। তেওয়ারীর কথা আমরা সবাই ভুলে গেলাম।

নির্দিষ্ট দিনে ব্লাস্টিং শেষ হলো। বাঁধও মাথা তুলতে শুরু করল। একদিন সে কাজও শেষ হলো। শেষ পর্যন্ত সেই দিনও এসে গেল, বাঁধের সব আউটলেটগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। লুনা নদীর ধারাস্রোত আচমকা বাঁধে বাধা পেয়ে থমকে থেমে বাঁধের গায়ে জমে উঠতে লাগল। লুনা নদীতে জলের ঢল খুব বেশি। হিসাবমতোই চন্দ্র সরোবর তার রূপ নিতে শুরু করল। নির্দিষ্ট সীমানায় জলের উচ্চতা এলেই প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে বোতাম টিপে তিনটে জেনারেটার চালু করে বাঁধের উদ্বোধন করবেন। তার দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল। এখন সামনের ক'দিন লুনা নদীর ধারা-স্রোতকে বাঁধের গায়ে মাথা কুটতে হবে।

জলের গভীরতা পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত হবে তখন চন্দ্র সরোবর ছশো বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে তার বিশাল রূপ নেবে।

আপাতত আমাদের তেমন কোনো কাজ নেই। আমরা সবাই মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করছি, এবারে কোথায় বদলি হব তাই নিয়ে। সামান্য কিছু লোক বাঁধের দেখভালের জন্য এখানে থাকবে। বাকিদের নতুন কোনো জায়গাতে যেতেই হবে। আমি মনে মনে তৈরি।

বস দিন ঠিক করলেন, সময়মতো সব কাজ শেষ হবার জন্য তিনি ঘরোয়া পার্টি দেবেন। পার্টির শেষেই তিনি সবাইকে বদলির খবর জানিয়ে দেবেন। আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব। একখানা চিঠি লিখতে বসলাম বাড়িতে। সেই চিঠি লেখা শেষ করতে বেশ রাত হলো। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমও আসতে দেরি হলো না। কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে হলো আমার কানের পাশে কি যেন নড়ছে! একটা দারুণ অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল। হাত আপনা থেকেই কানের কাছে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হলো, কি যেন কানের কাছ থেকে সরে গেল!

কোনো পোকামাকড় নয় তো! ভয়ে হাত সরিয়ে নিলাম। তবে পোকামাকড় হলে তা বেশ বড়! যদি কামড়ে দেয়! ভয়ে উঠে বসতে যাব, কে যেন ফিসফিস করে কানের কাছে কি বলল! স্পষ্ট মানুষের গলা তবে তা যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হলো। পরক্ষণেই মনে হলো, না, দূরে তো নয়, কানের কাছেই কে যেন কি বলল, কিন্তু খুব আস্তে! সে বলেই চলল, 'দো-হাই, আচ-অমকা নআ-ড়া চ-অড়া করবে-ন্ না। আম-আর ক-অ-থা শুন-উন।'

বেশ ঘাবড়ে গেলাম আমি। স্বপ্ন দেখছি না তো? না, না, জেগেই আছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঘরের কোথাও কোনো শরীরী অশরীরী কেউ নেই! তাহলে অমন টেনে টেনে কথা বলছে কে!

সে-ই আবার বলল, 'ভ-অয় পাআ-বেন-নাআ। আ-আমি কোন-ও-ও ক্ষ-ওতি কর-বোও নাআ। সে এ-ক্ষম-তাআ আম-আর নেএ-ই। আম-ই এস-এছি আপ-না-আকে সং-গেএ নিই-য়ে যে-তেএ। আম-আদের ও-খান-এ। যাও-আ খুব-ই দরকা-আর। উঠ-উন আল্-ও জাল-উন।' লোকটা থামল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। আলোটা জ্বাললাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কেউ নেই! ঘরের মধ্যে আমি শুধু একাই দাঁড়িয়ে আছি! টেবিলের ওপরের ঘড়িতে বেজেছে বারোটা কুড়ি। বাইরে নতুন বাঁধের ধারে ধারে আলো জ্বলছে। সেখানে এখনও শেষ সময়ের কাজ চালু আছে। আমার কোয়ার্টারের চারপাশে আবছা অন্ধকার। রাস্তার আলোগুলোও দূরে দূরে টিমটিম করে জ্বলছে। চারদিক নিস্তব্ধ জনমানবশূন্য। শুধু আমার ঘরে যে কেউ উপস্থিত আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি যে তার কথা স্পষ্ট শুনেছি জাগা অবস্থায়!

'আমি এখানে।' ঠিক তেমনি টেনে টেনে কে যেন ফের বলল। আমার মনে হলো, ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়া ট্রানজিস্টার রেডিওর ভিতর থেকেই যেন কথাগুলো বার হয়ে আসছে!

সে আবার বলল, 'এই তো আমি এখানে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না কেন?' সেই টেনে টেনে ভুল উচ্চারণে বলা কথা! তবে বুঝতে আমার তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু যে বলছে, সে যে কোথায় তা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। অবাক আমাকে এদিক ওদিক এপাশ ওপাশ তাকাতে দেখে ও ফের বলল, 'এই তো আমি তোমার মাথার বালিশের পাশে দাঁড়িয়ে আছি।'

এবারে আমার নজর গেল সেদিকে। জীবনে যা কখনও দেখব বলে ভাবিনি, যা কখনও কল্পনাও করিনি, সেই চরম অবিশ্বাস্য ব্যাপারই আমার দুই চোখের সামনে সত্যি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমার মাথার বালিশের পাশে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে আমার বুড়ো আঙুলের চাইতে বেশি লম্বা বলে মনে হলো না!

বেশ কিছুক্ষণ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হলো, গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আমি এসব স্বপ্নে দেখছি। এখুনি ঘুম ভেঙে যাবে। এমন কত আজগুবি স্বপ্নই না আমি দেখি। কিন্তু ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সব মিথ্যা হয়ে যায়। এও হয়তো তেমনি কিছু!

ও বলল, 'না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। তুমি জেগেই আছ। গত নয় দিন ধরে আমি তোমাদের এখানে প্রতি রাতে আসছি। তোমাদের কাউকে আমাদের এখুনি খুব দরকার। অথচ যেখানে ঢুকেছি, দেখেছি তোমরা ঘরের মধ্যে ঘর বানিয়ে ঘুমিয়ে আছ। তোমাদের দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কাছে যেতে পারিনি। আজই দেখলাম তুমি ঘরের মধ্যে ঘর বানিয়ে শোওনি, তাই তোমার ঘুম ভাঙিয়েছি। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এখুনি। আমাদের বড় বিপদ।'

অবাক আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এখানে এলে কি করে? আর তুমিই বা কে?'

সে বলল, 'আমি এসেছি আমাদের দেশ অমরাবতী থেকে। আমাদের রাজধানীর নাম অমরাপুরী। সেখানেই তোমাকে আমি নিয়ে যেতে চাই। আজ তুমি ঘরের মধ্যে ঘর বানিয়ে শোওনি। তাছাড়া তোমার গায়ের চাদর আজ মাটি পর্যন্ত লুটিয়েছিল। বহুকষ্টে সেটা বেয়েই উঠেছি ওপরে। তোমাকে ডেকে তুলব বলে।'

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম এসবই সত্যি। এসব স্বপ্ন নয়! আমার সামনে আমারই বিছানার ওপরে জুতো মোজা-পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে। হোক না সে ছোট্ট দেখতে, তবুও একেবারে মানুষ। করুণভাবেই যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বারকতক চোখ কচলালাম। ও তবুও সেখানেই দাঁড়িয়ে, এ তো আমি ঠিকই দেখছি!

ও ফের বলল, 'নাও, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। সঙ্গে তোমার হাত-আলোটা নিতে ভুলো না। পথে অন্ধকার পাবে। তোমরা যে শক্তিতে হাঁট, হিসাব কষে দেখেছি, তেমনভাবে হাঁটলে তুমি আড়াই ঘণ্টায় আমাদের দেশে পৌঁছতে পারবে।'

আমি একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'প্রথমে বল, তুমি কে?'

'আমি বালখিল্যদের দেশ অমরাবতীর রাজধানী অমরাপুরী থেকেই আসছি। আমাদের প্রধান আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাউকে এখুনি আমাদের দেশে নিয়ে যেতে। আমার নাম জ্যামঘ। তুমি সহজ করে আমাকে জ্যাম বলে ডাকতে পার।'

'জ্যাম, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমাদের হিসাবে মাত্র চার-পাঁচ সেন্টিমিটার লম্বা। বালখিল্যরা কি সবাই তোমারই মতো?'

'হ্যাঁ, বন্ধু।' জ্যাম বলল, 'অতীতে আমরা বিশালাকার ছিলাম। সেই যুগের কথা কি তোমরা জান? সেই যুগে এই মেদিনীর বুকে বিশালাকারদের স্থানই ছিল শুধু। পর্বতপ্রমাণ প্রাণী, আকাশছোঁওয়া বৃক্ষ আর বিশালাকার মানুষ। কিন্তু যুগযুগান্তরের বিবর্তনের ফলে সত্য যুগের আগেই আমরা ক্ষুদ্রাকার হয়ে এই বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হই।'

'এ কি তুমি অদ্ভুত কথা শোনালে জ্যাম?' আমি থাকতে না পেরে বললাম।

ও বাধা দিয়ে বলল, 'তোমাদের কাছে কি ক্ষুদ্রকে বিশাল করে দেখার কাচ নেই? আমাদের অতি ক্ষমতাশালী তেমন কাচ আছে। তোমাদের থাকলে, তা দিয়ে তোমাদের

আশপাশের কীটপতঙ্গদের দেখ, তাহলেই দেখবে তাদের অনেকেরই আকৃতি সেই আদিম যুগের অতিকায়দের মতো! বেশিদূর যেতে হবে না। তোমরা যাতে লেখ, তা যেখানে জমা করে রাখ, কিছুদিন পরে দেখবে সেখানে জন্মেছে আকাশী বর্ণের অতি কোমলত্বক এক ধরনের কীট। সেই কীট, যাতে লেখা হয় সেই জিনিসই শুধু নষ্ট করে। শক্তিশালী কাচের মাধ্যমে দেখলেই বুঝবে সেগুলির চেহারার সঙ্গে অতীতের এক বিশালাকার প্রাণীর কী অদ্ভুত সাদৃশ্য! বিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীর আবহাওয়া বদলেছে। ফলে উদ্ভিদ- জগৎ, প্রাণীজগতেও তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের কথা তোমরা জান। এই চারটে যুগ নিয়েই এক একটা কল্প। এমন বহু কল্প ধরেই চলেছে বিবর্তনের ধারা মেদিনী জুড়ে। আমরা বালখিল্যরা বোধহয় এই কল্পের আগের কল্পের প্রাণী। তখন ছিলাম অতিকায়। এই কল্পের শেষে এসে এখন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বলে ও হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বলল, 'নাও, নাও, আর কথা নয়। তুমি চল আমার সঙ্গে আমাদের দেশে। এখন আমাদের সমূহ বিপদ, আর সেই বিপদ তোমাদের জন্যে। তোমরাই এখন পারবে সে কারণটা দূর করতে।'

'আমাদের জন্যে তোমাদের সমূহ বিপদ, এ তুমি কি বলছ জ্যাম!'

'ঠিকই বলছি।' বলল জ্যাম, 'তোমাদের আগের প্রতিনিধিকে কাজের লোক বলেই আমরা ভেবেছিলাম। সে ফিরে আসার পর আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম তোমরা তোমাদের প্রকৃতিকে ধ্বংস করার খেলা বন্ধ করেছ। তোমাদের ওই বীভৎস খেলা বন্ধ হলে আমরাও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাব। কিন্তু আমাদের সব ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করে তোমরা মেদিনীর বুক ফাটিয়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি করা শুরু করেছিলে। আবার আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আর এখন তোমরা যা করছ তাতে তো আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার ইচ্ছাটাই তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে আমরা মনে করছি। এ কখনও আমরা হতে দেব না। তবু আমরা চরম আঘাত হানার আগে তোমাদের আর একবার সুযোগ দিতে চাই। চল দেখবে তোমরা কি করেছ। এখনও সময় আছে তোমাদের ভুল সংশোধনের। তাই আমরা মনে করি।' কথা শেষ করে জ্যাম আমার দিকে তাকাল। কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর ফের বলল, 'তোমাদের সেই প্রতিনিধির নাম ছিল বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ তেওয়ারী। সে তো নিজের চোখেই সবকিছু দেখে এসেছিল। সে কি তোমাদের আমাদের কথা বলেনি? তোমরা কি কেউই আমাদের কথা জান না?'

আমি বললাম, 'বিন্ধ্যেশ্বরীর শরীর হঠাৎ খারাপ হওয়াতে সে দেশে ফিরে গেছে। মনে হয় সে তোমাদের কথা কাউকেই বলেনি। তাই আমিই এখন আমাদের মধ্যে প্রথম তোমাদের কথা এভাবে শুনলাম বলতে পার। তোমরা তাই চরম আঘাত হানার আগে আর একবার তোমাদের সমস্যার কথা আমাকে বোঝাও। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।'

জ্যাম আবার কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'কয় কল্প পরে আমরা যখন এই আকার প্রাপ্ত হয়েছি, তখনও কিন্তু আমরাই মেদিনীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। মানুষ ততদিনে সোজা হয়ে হাঁটতে শিখেছে। তারাও চিন্তাক্ষমতা পেয়েছে। মেদিনীর যে যে জায়গার আবহাওয়া ভাল সেই সেই জায়গায় আমরা বালখিল্যরা ওইসব মানুষদেরই পাশাপাশি বাস করতাম। মানুষদের চিন্তাশক্তি আছে দেখেই আমাদের জ্ঞানী-গুণীরা তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করে। তোমাদের সভ্যতার বিকাশ ঘটে সে কারণেই। বহুদিন আমরা কিন্তু সুখে-স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বাস করেছিলাম। তবে এক বিষয়ে মানুষ বালখিল্যদের থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিল। তা হলো দৈহিক শক্তিতে। আর সে কারণেই মানুষদের প্রধান ইন্দ্র নেহাতই তুচ্ছ কারণে একবার বালখিল্যদের প্রধানকে অপমান করে। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে চরম ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়। বালখিল্যদের প্রধান তখন এক যন্ত্রদানব তৈরি করতে থাকে, যে হবে ইন্দ্রের থেকেও সহস্রগুণ শক্তিশালী, এমন কি বুদ্ধিসম্পন্নও। এই কথা প্রচার হতেই ইন্দ্র ভীষণ ভয় পায়। সে মহামুনি কাশ্যপকে অনুরোধ করে তাকে রক্ষা করার জন্য। মানুষদের মধ্যে মহামুনি কাশ্যপ ছিল বালখিল্যদের পরম বন্ধু। তার একান্ত অনুরোধেই আমরা মানুষদের সংসর্গ ছেড়ে এই হিমালয় পর্বতের সানুতে আমাদের নতুন রাজত্ব স্থাপন করি। সেও বহুযুগ আগের কথা, তখন সবে সত্যযুগের শেষ। লুনা নদীর তীরস্থ আমাদের রাজ্যে এত দিন মানুষের কোনো উৎপাত ছিল না। এতদিন আমরা বংশপরম্পরায় সুখে-স্বচ্ছন্দেই বাস করছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে তোমরা এসে আমাদের সেই সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন ঘটাচ্ছ। এখন তো তোমরা আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার চেষ্টাই চালাচ্ছ! তাই তোমাকে ডাকতে আসা।'

আমি বললাম, 'বেশ, চল, কোথায় যেতে হবে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমার চলার সঙ্গে তাল রাখবে কি করে? তা ছাড়া বাইরের ঘন বন আর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমি তো প্রতি মুহূর্ত তোমাকে হারাব। তোমাকে দেখে আমি তাহলে চলব কি করে?'

জ্যাম বলল, 'আমি এসেছি আমাদের এক-খানা পুষ্পকরথ চালিয়ে শূন্যপথে। সেই পুষ্পক আমি তোমার ঘরের সামনে লুকিয়ে রেখে এসেছি। তোমাদের যেমন উল্কাপিণ্ডের মতো প্রচণ্ড শব্দ-উৎপাদক আবহাওয়া দূষণকারী আকাশযান আছে, আমাদের পুষ্পকও তেমনি আকাশযান। ব্যতিক্রম, তা শব্দ দূষণ বা আবহাওয়া দূষণ করে না। তার শক্তির উৎস মার্তণ্ডদেব। সে কথা যাক, বন্ধু, তুমি আমাকে তোমার কাঁধে তুলে নাও। তাহলেই তো সমস্যার সমাধান হবে।'

আমি হেসে বললাম, 'কথাটা মন্দ বলনি। এসো তাহলে আমার কাঁধেই চড়।' বলে আমার ডান হাতটা পেতে দিলাম বিছানার বালিশের পাশে। জ্যাম আমার হাতের ধার দুহাতে ধরে ওর সমস্ত শরীরে ঝাঁকানি দিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল হাতের চেটোতে। মাঝ বরাবর এসে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, 'সাবধানে তোলো আমাকে বন্ধু। আচমকা ঝাঁকানি দিও না। পড়ে যাব তাহলে।'

আমি অতি সাবধানে হাত বাঁ কাঁধের কাছে এনে ধরলাম। জ্যাম আমার জামার খাঁজ ধরে বহুকষ্টে উঠে পড়ল কাঁধে। জামার কলার ধরে কোনোমতে কাঁধের দুপাশে পা দিয়ে বসল। বলল, 'চল বন্ধু এবার বাইরে। আর আমার পড়ে যাবার ভয় নেই। চল।'

আমি কোমরে রিভলবার বেঁধে, টেবিলের ওপর থেকে টর্চ নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। ঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে তাতে তালা দিলাম। চাবি পকেটে রেখে বললাম, 'কোন দিকে যাব? ডাইনে না বাঁয়ে?'

জ্যাম আমার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওভাবে ঘরের দরজা বন্ধ করলে কেন, কেউই তো তাহলে আর ভিতরে ঢুকতে পারবে না!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'যাতে অন্য কেউ ঢুকতে না পারে তার জন্যই তো তালা দিলাম। খোলা থাকলে তো চোর এসে ঢুকে আমার সব কিছু নিয়ে যাবে। জান না, এখানে অনেক কাজের লোকই অসৎ।'

'চোর? অসৎ?' জ্যাম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের ভাষাও আমাদের পূর্ব-

পুরুষরাই শিখিয়েছিল। তা ওই দুটো শব্দ তো আমাদের ভাষায় নেই। মানে কি কথা দুটোর? কই অন্যের জিনিস নিয়ে যায় এমন জন্তুও এ জঙ্গলে আছে বলে তো শুনিনি!'

ভীষণ লজ্জা পেয়ে আমি বললাম, 'চোর অসৎ কোনো জন্তু নয়। ওদের পরিচয় তোমাকে পরে দেব। এখন তাড়াতাড়ি চল, দেরি হচ্ছে না?'

ও বলল, 'হ্যাঁ। ডান দিকে চল।'

ওর কথামতো আমি প্রজেক্টের ডান দিকের পথটা ধরে হাঁটা শুরু করলাম। রাত একটা দশ, হাতঘড়িতে দেখলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত, আকাশে চাঁদ নেই। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার চারদিকে। তার মাঝে টর্চের আলোয় পথ চলেছি। লুনা নদী এদিকের বহু অঞ্চলই ভাসিয়ে দিয়ে চন্দ্র সরোবরের রূপ নেবে। তারও আর বেশিদিন দেরি নেই। জল কতদূর পর্যন্ত ভাসাবে, পাহাড়-জঙ্গলের মাঝে কিছু দূর দূর তার চিহ্ন গেঁথে তোলা হয়েছে। জ্যাম দেখলাম সেই চিহ্ন দেখেই যেন এগিয়ে চলেছে। চন্দ্র সরোবরের গভীরতম অংশের গভীরতা হবে পঁয়তাল্লিশ মিটারের মতো। মূল সরোবরের অগভীর অঞ্চলের গভীরতাও হবে বাইশ মিটারের মতো। তা ভিন্ন পাশের এক বিশাল নিচু অঞ্চল যা চন্দ্র সরোবরের জল বাড়ার জন্য ডুবে যাবে, তার আয়তনও হবে তিরিশ বর্গকিলোমিটারের মতো। সেখান থেকেই সেচের খালগুলো নানান দিকে ছড়িয়ে যাবে।

জ্যামের কথামতো সড়ক ছেড়ে বহুক্ষণই জংলা পথে চলেছি। এবারে মনে হলো আমাকে যেন ও লুনা নদীর আরও কাছে নিয়ে গেল। কিছু দূর দূর আমাকে থামিয়ে জ্যাম তার পথ ঠিক করে নিচ্ছিল।

প্রথম প্রথম ওর পথের নিশানা আমি আমার মনের মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এত বেশিবার ও এদিক ওদিক এপাশ ওপাশ করাল আমাকে যে সবকিছুই আমার গোলমাল হয়ে গেল। তাছাড়া এই গভীর বনে পথ বলে তো কিছুই নেই। নেই এমন কিছু বিশেষ নিদর্শন যা লক্ষ্য রেখে পথের নিশানা ঠিক রাখা যায়। বিশাল বিশাল গাছগুলো সবই প্রায় একই রকম। দুধারের ঘন গভীর ঝোপ-জঙ্গলের চেহারাও একই ধরনের। হাতেও আমার কুড়ুল নেই যে গাছের গায়ে কোপ বসিয়ে পথের নিশানা রাখব। সুতরাং জ্যামের হাতেই নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলাম। ওর মুখেও কিন্তু একই কথা, 'বন্ধু, এবার ডাইনে। ব্যস ব্যস, এবার বাঁয়ে চল। বাঃ, বেশ এসেছ বন্ধু। এবারে ওই ওদিকের পাথরের ঢিবিটার দিকে চল। এবারে আরও বাঁয়ে। বাঃ, বেশ এসেছ বন্ধু! এবারে ওই ওদিকের পাথরের চাঁইটার দিকে। সামনে, ওই যে দূরে আকাশের গায়ে মাথা তুলে একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে, ওটার আমরা নাম দিয়েছি অলঙ্ঘ্য পর্বত। আমাদের এক বীর ক্রীড়াবিদ্ একটানা একুশ দিনের চেষ্টায় ওর চূড়ায় উঠতে পেরেছিল। তার নাম অশ্মক। সে-ই এখন আমাদের দেশের সব থেকে প্রিয় ক্রীড়াবিদ্।'

ক্লান্ত আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর কত দূরে তোমাদের দেশ শুনি?'

ও বলল, 'না, না, আর বেশিদূরে নয়। অলঙ্ঘ্যের পাশ দিয়ে এগোলেই আমাদের দেশে পৌঁছাবে। ততক্ষণে আকাশে মার্তণ্ডদেবের আবির্ভাবও হবে। মার্তণ্ডই বালখিল্যদের কাছে প্রাণের উৎস। আমরা মার্তণ্ডদেবকেই পুজো করি।'

কথা বলতে বলতে আমরা আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলাম। এদিকে পথ ক্রমশ চড়াই। আমি ঠিক করলাম চড়াই ভেঙে সাবধানে টিলার ওপরে উঠব। তাহলে হয়তো বুঝতে পারব, জঙ্গলের ঠিক কোন জায়গায় আমরা আছি।

এই চিন্তামতো আমি ঢালের একটা দিক ভাল করে দেখে সেদিকেই পা বাড়ালাম। আমাকে ওভাবে টিলার দিকে যেতে দেখে জ্যাম প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না, ও পথে নয়। আমাদের যেতে হবে অলঙ্ঘ্যকে ডাইনে রেখে বেড় দিয়ে পিছনে। সেই দিকেই আমাদের দেশ অমরাপুরী। ও পথে যেতে সময় লাগবে।'

আমি টিলার চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বললাম, 'তুমি শক্ত করে জামার কলারটা ধরে থাক। পড়ে যেও না যেন। আমি এই টিলাটার মাথায় উঠে দেখতে চাই, আমরা কোথায় এসেছি। তারপর আবার তোমার দেখান পথে এগোব।'

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ, তাই চল। এ পথেও চড়াই ভেঙে উঠে ওপাশের ঢাল দিয়ে নামলে, অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা অমরাপুরী পৌঁছে যাব। সে ভালই হবে।'

ঢালের গা বেয়ে বেশ কিছুটা উঠে আমি বেদম হয়ে পড়লাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলাম। উঁচু জায়গা থেকে গোটা অঞ্চলের সবকিছু দেখব বলেই আমার এ পথে আসা। দেখলে হয়তো বুঝতে পারব, বাঁধের ঠিক কোন দিকে আমরা আছি।

হঠাৎ সামনে উঁচুর দিকে আমার নজর গেল। চূড়ার পিছন দিয়ে যেন কেমন একটা ক্ষীণ আলোর সাড়া জেগেছে। সামনের আকাশ জুড়ে গোটা আকাশে সেই আলোর রেশ! এ আলো বিদ্যুতের আলো বলেই মনে হলো। টিলার ওদিকেই কোথাও অনেকটা জায়গা জুড়ে নিশ্চয়ই সারি সারি আলো জ্বলছে। সে আলো তীব্র নয়, তেমন উজ্জ্বলও নয়। তবুও তা যেন অনেকটা জায়গা জুড়েই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে! কিসের আলো ওটা!

জ্যাম বলল, 'আমরা অমরাপুরীর কাছে পৌঁছে গেছি। রাতে আমাদের নগরের পথঘাট, বাগান আর আশপাশের সমস্ত সাধারণের জায়গায় আলো জ্বালানো থাকে। প্রয়োজনে কোনো নাগরিক যদি রাতে বাইরে বার হয় তো তার পথ চলতে অসুবিধা হয় না। দূরে যে আলোর রেশ দেখতে পাচ্ছ, তা আমাদের রাজধানীর পথঘাটের আলো। অলঙ্ঘ্যের চূড়ায় চড়লেই তুমি নিচে নগর দেখতে পাবে।'

আমি উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জ্যাম, এই অলঙ্ঘ্যের ওদিকে নিচে নামার কোনো পথ আছে কি? বলতে পার সে কথা?'

জ্যাম বলল, 'আমাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, কারণ আমি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পুষ্পক রথচালক। তোমাদের ঘরের মধ্যে পুষ্পক রথ নিয়ে ঢোকার সাহস আমার আছে বলেই আমাকে পাঠানো হয়েছিল। তোমাদের ওখানে যেতে হলে সোজা পথে আমাদের এই অলঙ্ঘ্য পার হতে হয়। তাই ওদিক সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে। এদিকে উঠতে যত কষ্ট, ওদিকে নামতে আশা করি তত কষ্ট হবে না। অশ্মক যে পথে চূড়ায় উঠেছিল, সে পথেই আমি তোমাকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

আর কথা না বাড়িয়ে শেষ দমে আমি অলঙ্ঘ্যের চূড়ার কাছ বরাবর উঠে পড়লাম। হাঁপাতে হাঁপাতে নিচের দিকে তাকাতেই এত অবাক হয়ে গেলাম যে বলে বোঝানো যাবে না। একি দেখছি আমি! আমার চোখের সামনে নিচে বিশাল এক সমতলের বুকে সারি সারি হাজার হাজার আলো জ্বলছে। ছোট্ট ছোট্ট ক্ষুদে আলোর সারি। যেন সমতলের বুকে ওখানে কেউ একটা আলোর নকশা এঁকেছে! অতি ছোট মৃদু আলো, কিন্তু কয়েক হাজার একসঙ্গে জ্বলে আকাশের বুকে দৃষ্টিনন্দন মৃদু আলোর ছটা ছড়িয়েছে।

জ্যাম বলল, 'ডান দিকে যে চৌকো আলোয় ঘেরা জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, ওটাই আমাদের খেলার মাঠ। তারই একটু পশ্চিমে গেলে আলোর বৃত্তটার মাঝখানে আছে আমাদের মহাকবির সমাধি। তার থেকে আরও পশ্চিমে যে লম্বাটে চৌকোণা দেখা যাচ্ছে, ওটাই আমাদের প্রধানের কার্যালয়। ওখান থেকেই

অমরাপুরীর দৃশ্য অপূর্ব দেখাচ্ছিল

প্রধান রাজ্য চালান।'

স্তম্ভিত আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'জনসংখ্যা কত শহরের?'

জ্যাম বলল, 'দিনে প্রায় ষাট লক্ষ, রাতে তা কমে দাঁড়ায় চল্লিশে। কমে, কারণ অনেকেই বাইরে থেকে আসে কাজে। সন্ধ্যে হলেই সবার বাড়ি ফেরার তাগাদা থাকে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের প্রধানের নাম কি?'

'তাঁর নাম শাশ্বত শাস্ত্রজ্ঞ মহাবলি পঞ্চদশ সহস্র নমুচি। তোমাকে তো বলেছি আমরা ইন্দ্রকে সহ্য করতে পারতাম না। অতীতে এই নমুচি নামের এক দৈত্য ইন্দ্রকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। অনেক অনুনয়-বিনয় করে ইন্দ্র এর কাছ থেকে মুক্তি পায়। আর মুক্তি পেয়েই অন্যায়ভাবে নমুচিকে হত্যা করে। আমরা নমুচির বীরত্ব আর বিজ্ঞতার কথা স্মরণে রেখেই আমাদের প্রধানের নামকরণ করেছি নমুচি। ইনি সেই পর্যায়ের পঞ্চদশ সহস্রতম নমুচি। তুমি তাঁকে মাননীয় নমুচি বলেই ডাকবে।'

'প্রধান মন্ত্রীর নাম কি?'

'তার নাম মঙ্গলকামী সহস্রলোচন। সে তার মঙ্গলময় দৃষ্টিতেই সবদিক দেখে। সকলের মঙ্গলসাধন করে।'

'আর সেনাপতি? তার নাম?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সেনাপতি? সে আবার কে?' অবাক জ্যাম জিজ্ঞাসা করল।

'ওই যে, সৈন্যদলের প্রধান! অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে শত্রুদের দমন করে। রাজ্য রক্ষা করে, তার কথা বলছি।'

'সৈন্যদল? শত্রু?' অবাক জ্যাম বলল, 'কথাগুলোর মানেই বুঝলাম না তো? আমাদের এক বিশাল বাহিনী আছে। তুমি কি তার কথা বলছ? তার নাম সেবাবাহিনী। কোথাও কোনোভাবে বিপদ-আপদ ঘটলে, কারও ক্লেশ হলে, বা প্রকৃতি বিরূপ হলে, আমাদের এই সেবাবাহিনী দ্রুত কাজ করে। সকলকে রক্ষা করাই তো তাদের কাজ। এই বাহিনীর প্রধানা এক মহিলা, দেশের সবাই তাঁকে তো মা বলে ডাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি যেন একটা উপাধি আছে তাঁর। কিন্তু সে আর কে মনে রেখেছে! সবারই তো তিনি মায়েরই মতো। তোমাদের সর্বনাশা খেলায় আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা তো আমাদের এই মা-ই তাঁর বাহিনী নিয়ে সব দিক রক্ষা করেছেন! এখনও তাঁর সেবাকাজ শেষ হয়নি। চল, দেখবে চল, কি ভয়ঙ্কর ক্ষতিই না তোমরা করেছ আমাদের!'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'পাহাড় চড়াইয়ের ক্লান্তি গেছে আমার। এবারে পথ দেখাও। নিচে নামি। রাত ভোর হয়ে এল প্রায়। কোন দিকে পথ?'

জ্যাম বলল, 'ওই যে ডান দিকে বিশাল গাছটা দেখছ, ওটাই এই পাহাড়ের সব থেকে পুরনো গাছ। আড়াই হাজার বছর ধরে ও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওটাকে বাঁয়ে রেখে নামতে শুরু কর। সামনেই নিচে নামার পথ পাবে। নিচেই সোজা রাজধানীর প্রধান পথও পাওয়া যাবে।'

তারপর যা হলো তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। নামলাম তো অলঙ্ঘ্যের এক ফাটল বেয়ে নিচে। ভোরের আভাস। তখন আকাশে অল্পদূরে বালখিল্যদের রাজধানীর আলো দেখা যাচ্ছিল। পথ সোজা সেদিকেই চলে গেছে, সেই হাজার হাজার আলোয় সাজা শহরের দিকে। এই পথটা পাকা পথ। কিন্তু এ পথ আমাদের প্রজেক্টের করা নয়। চওড়ায় হবে প্রায় চার মিটারের মতো। পাহাড়ি ঢালের শেষে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পথ। একটু এগোতেই দুপাশে পাহাড় দেখা গেল। একটা পাহাড়ি ফাটলের মাঝ দিয়েই এগিয়েছে পথ। এখানে পথটা অনেক কম চওড়া। দুদিকে হাত বাড়ালে অনায়াসেই আমি পাহাড়ের পাশ ধরতে পারতাম। জায়গায় জায়গায় দুদিকের পাহাড়ি ঢালের গাছপালা গায়ে এসে ঠেকছিল। কাঁধের উপর থেকে জ্যাম মাঝে মাঝে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল, তা না হলে হয়তো অনেক জায়গাতেই নিচে ঝুঁকে-পড়া গাছের ডালে আমার মাথা ঠুকে যেত। পাহাড়ি ফাটল পার হয়ে আমরা অন্য দিকে পৌঁছালাম। অমরাপুরীর দৃশ্য এখান থেকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবারে আমি কোনদিকে যাব?'

'সোজা সামনে।' বলল জ্যাম, 'পথে আর কোনো বিপদের ভয় নেই তোমার। তাকিয়ে দেখ, আমাদের দেশ কত সুরক্ষিত জঙ্গলের হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ থেকে।'

তাকিয়ে দেখলাম, আমরা এমন একটা উপত্যকায় পৌঁছেছি, যার চারদিকেই ওই

অলঙ্ঘ্যের মতো টিলায় ঘেরা। বুঝলাম, ওই পাহাড়ি ফাটল ছাড়া এই ঘেরার মধ্যে ঢোকার আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

জ্যাম বলল, 'ওই ফাটল পথ সমস্ত সময় রক্ষা করা হয়। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা ওখানে স্বয়ংক্রিয় এমন সব যন্ত্র বসিয়েছেন, যে কোনো হিংস্র প্রাণীর প্রবেশ ঘটলেই সেই যন্ত্র থেকে অস্ত্র ছুটে গিয়ে তাকে আঘাত করবে। অস্ত্রের মুখে এমন ওষধি লাগান থাকে যে হিংস্র প্রাণী অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন তাকে বিশাল এক স্যন্দনে তুলে বাইরের অরণ্যে রেখে আসা হয়। এই কাজের জন্যেও আমাদের এক বিশাল বাহিনী আছে। তাদের কাছে এমন বিশাল স্যন্দন আর ভার-উত্তোলক যন্ত্র আছে, যা প্রায় অবিশ্বাস্য ক্ষমতাসম্পন্ন। হিংস্র প্রাণীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের এই বাহিনীর একান্তই প্রয়োজন আছে।'

অবাক আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যন্দন, সে আবার কি?'

হেসে জ্যাম বলল, 'স্যন্দন কি তা তুমি জান না। অবাক করলে, যা চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত যাওয়া যায়, তাকেই তো বলে স্যন্দন। চাকাযুক্ত যান বলতে পার। তবে ক্ষমতা আসে মার্তণ্ডের শক্তি থেকে।'

আমি আর কিছুটা এগোতেই সামনে একটা পাথরের নিচু পাঁচিলের মতো দেখতে পেলাম। পথ তার মাঝ দিয়েই এগিয়ে গেছে। সেই অবধি পৌঁছাতেই জ্যাম চেঁচিয়ে উঠল, 'থাম বন্ধু, থাম, অল্প কিছুক্ষণের জন্য।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি থেমে পড়েছিলাম। বেশ চিন্তাই হয়েছিল, অমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল কেন জ্যাম! তাহলে কি এই প্রায় অন্ধকারে আমি আমার অজান্তে কোনো বালখিল্যকে মাড়িয়ে দিয়েছি! সর্বনাশ! থমকে থেমে মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকালাম। না, পায়ের কাছে কিছু নেই।

তখনি দেখতে পেলাম বিরাট বিরাট গুবরে পোকার মতো কি সব যেন আমার চারপাশে শূন্যে ঘুরতে শুরু করেছে। এক একটা হাতের মুঠোর থেকে কিছু বড় আকার। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। ওগুলো যদি একসঙ্গে আমাকে কামড়ায়! তাহলে আর দেখতে হবে না!

চারটে পোকা মোট। তারা অদ্ভুত বৃত্ত রচনা করে ঘুরছিল। হঠাৎ তার একটা থেকে এক ঝলক আলোর তীর যেন সোজা এসে আমার মুখে পড়ল। ভয়েই আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম। তারপর চারটে থেকেই ঘন ঘন সেই আলোর তীর ছোঁড়া হতে লাগল। এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি, ওগুলো পোকা নয়, বালখিল্যদের শোনা সেই পুষ্পক রথ। ওরা জানত আমি আসব। কি জানি আমার আইডেন্টিটি ঠিক রাখার জন্যই বোধহয় সব দিক থেকে ছবি তুলে রাখল। যেমন হঠাৎ ওরা উড়ে এসেছিল, তেমনি হঠাৎই ওরা প্রচণ্ড গতিতে উড়ে চলে গেল রাজধানীর দিকে। আমার কানে ভেসে এল একটা ডাক, 'সুস্বাগতম!' বালখিল্যরা আমাকে তাদের রাজ্যে সাদরে আহ্বান জানাচ্ছে!

জ্যাম বলল, 'তোমাকে তো আমি পুষ্পকের কথা বলেছি, এই হলো সেই পুষ্পক। তোমার আকৃতি ছবি হিসাবে তুলে নিল। ব্যাপারটা যে কি হলো, তা কি বুঝলে? আমাদের কাছে এমন যন্ত্র আছে যার সাহায্যে আমরা প্রতিটি জিনিসের ছবি ধরে রাখতে পারি। এমন যন্ত্র মনে হয় তোমাদের নেই।'

মনে মনে আমি হাসলাম। মুখে কিছু বললাম না। জ্যাম ভাবল, আমি বোধহয় ছবি তোলার ব্যাপারটা বুঝতেই পারিনি। তাই বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, 'এ অতি সহজ ব্যাপার। প্রয়োজন বোধ করলে এ বিষয়ে তুমি আমাদের কারিগরদের কাছে সাহায্য নিতে পার। আমি ব্যবস্থা করে দেব। ফিরে গিয়ে তুমিও এমন যন্ত্র বানিয়ে ব্যবহার করতে পার। চল, এখন এগোও ওই সামনের বিশাল পাথরের খণ্ডটার দিকে। ওর ভিতরটা আমরা যন্ত্রের সাহায্যে ফাঁকা করে ফেলেছি। ওই হলো আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগৃহ। ওখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানেই রাজ্যের প্রধানরা তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন।'

আমি পাথরের চাঁইটার দিকে এগোলাম। পাকা পথ, দুপাশে ঘাসজমি। তার মধ্যে নানান ফুলের বাগান। অবশ্যই সে সব অতি ক্ষুদ্র রংবেরং-এর ঘাস ফুল। কিন্তু অপূর্ব সুন্দর কায়দায় তা সাজান হয়েছে। সেই বাগানের মাঝে মাঝে অপূর্ব কারুকাজ করা কিছু মূর্তিও বসান। কোথাও কোথাও এমন সব গঠনের জিনিস রয়েছে, সেগুলো যে ফোয়ারা তাতে সন্দেহ নেই। বালখিল্যরা তাহলে সৌন্দর্যেরও পূজারী! রাস্তাটা সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে পাথরের চাঁই-এর সামনে। জ্যাম বলল, 'সামনেই ভেতরে ঢোকার পথ। চল এগোও।'

সামনেই মনে হলো যেন একটা গুহামুখ। তারও চারপাশের পাথর খোদাই করে অপূর্ব নকশা করা। সেইসব নকশার কোথাও কিন্তু আমি কোনো অস্ত্রধারী মূর্তি দেখতে পেলাম না। তাহলে সৈন্য যে কি, শত্রু কাকে বলে, এসব তাহলে সত্যিই বালখিল্যরা জানে না। অবাক কাণ্ড! এই পৃথিবীর বুকে তাহলে এমন সভ্যতা আজও টিকে আছে! যারা অপরকে হিংসা করতে জানে না!

আলো জ্বলছে গুহামুখে। মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে একটু দাঁড়ালাম আমি। বাইরের শেষ হয়ে আসা অন্ধকার থেকে ভেতরের আলো অনেক বেশি বলেই বোধহয় দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেছিল। ভিতরের পথটা একটু বাঁকা। চোখে আলো সইয়ে বাঁকের মুখে পৌঁছাতেই আচমকা আমার কানে ভেসে এল বিচিত্র সব শব্দের ঝড়। তাছাড়া আমাকে চমকে দিয়ে আমার দুপাশ দিয়ে ভীষণ ভয়ে একের পরে এক বালখিল্যরা গুহার মধ্যে ঢুকতে লাগল। বাইরে তখন ভোরের আলোর আভাস জেগেছে। এত ভোরে ওরা সবাই যে কোথা থেকে এমনভাবে আসছে তা বুঝতে পারলাম না। জ্যাম কানে কানে বলল, 'সাবধান বন্ধু, সাবধানে দেখে পা ফেল।'

সেইভাবেই আমি এগোতে লাগলাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, ওই বিচিত্র শব্দ, আর্তনাদ আর অবাক হবার আওয়াজে মেশান শব্দ। আমি একটা ঘরের মতো জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। খুবই ছোট্ট ঘর। তার তিন দিকের দেওয়াল মাত্র ক'হাত দূরে। আর প্রত্যেক দেওয়ালের গায়ে থাককাটা সিঁড়ির মতো বসার জায়গা। সেই জায়গায় দলে দলে বালখিল্যরা বসে আছে। আতঙ্কে, ভয়ে আর অবাক হয়ে তারাই চেঁচাচ্ছে।

জ্যাম বলল, 'বন্ধু, তুমি পিছনের মঞ্চে বস পা ঝুলিয়ে। এই হলো আমাদের ব্যবস্থাপক সভাগৃহ। এখানেই দেশের প্রতিটি প্রান্তরের প্রতিনিধিরা প্রধানের সঙ্গে বসে দেশ পরিচালনা করে। অতীতে যে সব মানুষ পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছিল, এখানেই প্রধান তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল। তোমাদের প্রথম প্রতিনিধিকেও এখানেই আনা হয়েছিল।'

অবাক আমি চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। রোমের এম্ফি থিয়েটারের মতো জায়গা এটা। তবে ঘরের মতো জায়গার মধ্যে, এই যা তফাৎ। তা ছাড়া এখানে তিন দিক ঘিরে বসার জায়গার সামনে স্টেজের মতো একটা জায়গা আছে। মনে হয় ওটার ওপর বসেই দেশের পরিচালকরা সব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে দেশের কাজ করে।

জ্যাম ফের বলল, 'বন্ধু, তুমি বস। না হলে সভা শান্ত হবে না। সভার কাজ আরম্ভ করা যাবে না।'

জ্যামের কথামতো আমি সেই স্টেজের ওপর পা ঝুলিয়ে বসলাম। আমার তিন দিকের

থাককাটা সিঁড়িতে কম করে হাজার প্রতিনিধি বসে আছে। তারা যেন চমৎকার একটা নাটক দেখবে বলে এসেছে। সে নাটকের নায়ক আমি!

আমাকে দেখে সভাগৃহের মধ্যে যে চিৎকার আর্তনাদ উঠেছিল, আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে তা থামল।

জ্যাম বলল, 'বন্ধু, দেশের অধিকাংশ বালখিল্যই মানুষ সম্বন্ধে কিতাবে কিছু পড়ে থাকলেও বাস্তবে তোমার আকৃতি দেখে ভয় পেয়েছে! ওরা ভাবেনি কল্পনার সঙ্গে বাস্তব এমনভাবে মিলে যেতে পারে। দেখলে তো ভয় পেয়ে কিছু বালখিল্য পালিয়েও গেল।'

অবাক আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? আমার আগেও তো একজন মানুষ এখানে এসেছিল বললে।'

'একবার এক সাদা চামড়ার মানুষ পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছিল। তখন সে ভীষণ অসুস্থ। অনাহারে মরার মতো অবস্থা তার। রাজকবিরাজ তাকে সুস্থ করে। কিন্তু সে তো একযুগ আগের কথা। কে আর তার কথা মনে রেখেছে বল? সেই মানুষ কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে! উপকারীর উপকারের প্রতিদানে সেই সাদা চামড়ার মানুষ এখান থেকে কাউকে না জানিয়ে পালায়। যাবার সময় একটা স্বচ্ছ বড় পাত্রের মধ্যে দুজন বালখিল্যকে তুলে নিয়ে যায় জোর করে। হয়তো ভেবেছিল নিজের দেশে গিয়ে সবাইকে ওই বালখিল্যদের দেখাবে! কিন্তু তা হয়নি। গভীর জঙ্গলের মধ্যেই সে পথ হারিয়ে মরেছিল। আমাদের এক পুষ্পক-চালক যখন তাকে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পায় তখন সে তো মরেইছে, স্বচ্ছ পাত্রের মধ্যে বন্দী থেকে দুজন বালখিল্যও অনাহারে তৃষ্ণায় মরেছে!'

আমি বললাম, 'তারপরই কি আমার বন্ধু তেওয়ারী এসেছিল এখানে?'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় মানুষ সে-ই। তাকেও তোমার মতো এখানে আনা হয়েছিল আমাদের বিপদের কথা শোনাবার জন্য।' বলল জ্যাম, 'তুমিই তৃতীয় মানুষ, যে এখানে এলে।'

আমি হেসে বললাম, 'আচ্ছা, আমিও যদি তোমাদের ক'জনকে বন্দী করে নিয়ে পালাই এখান থেকে, তাহলে কি হবে?'

'না না, বন্ধু, ও চিন্তা তুমি মন থেকে তাড়াও। ভীষণ ভয় পেয়ে বলল জ্যাম, 'এখন আর আমরা অত পিছিয়ে নেই। যে মুহূর্তে তুমি ওই ফাটল পার হয়ে আমাদের দেশে ঢুকেছ, সেই মুহূর্ত থেকেই তোমার প্রতিটি চালচলন আমাদের ছায়াধরা যন্ত্রে ধরা পড়ছে। ক'জন বিশেষজ্ঞ সারাক্ষণ তোমার ওপরে নজর রাখছে। তুমি যদি অন্যায় কিছু করে পালাতে চেষ্টা কর, তা হলে পথের ধারে গোপন স্থানে লুকনো একাধিক ঘুমপাড়ানি যন্ত্র ছুটে গিয়ে তোমার গায়ে বিঁধবে। পালাতে পারবে না তুমি। আমার কথা কি বিশ্বাস হলো না? তাকিয়ে দেখ সবে ভোর হতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে সভাগৃহ প্রতিনিধিতে ভরে গেছে। তারা কি করে জানল তুমি আসছ? তুমি ফাটল পথ পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়াধরা যন্ত্রে তোমার কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। হাঁটা-পথে তুমি এখানে আসার আগেই তাই প্রতিনিধিরা তাদের স্যন্দন চড়ে চলে এসেছে এখানে। সাদা চামড়ার অকৃতজ্ঞ মানুষটার অমন ব্যবহারের পর আমরা দারুণ সজাগ।'

ওর কথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম আমি। এ কি সব কথা শোনাচ্ছে জ্যাম! তাহলে তো বালখিল্যরা বিজ্ঞান বিষয়ে দারুণ উন্নত! এদের এখানে আমাকে তো সমঝে বুঝে চলতে হবে!

জ্যাম বলল, 'সামনের ওই বসার জায়গাতেই প্রধান আর তার সহকারীরা বসে আছেন। এখুনি তাঁরা তোমার সঙ্গে আমাদের দেশের আসন্ন বিপদ বিষয়ে আলোচনা করবেন। তুমি আমাকে তোমার ডানপাশে নামিয়ে দাও সাবধানে।'

আমি তাই করলাম। দেখলাম পাশেই একটা সমতলে সরু কাঠির মতো কতগুলো কি যেন পরপর দাঁড় করানো আছে। জ্যাম আস্তে সেগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা তেমন কাঠি ডান হাতে ধরে চাপা কেশে গলা সাফ করল। সঙ্গে সঙ্গে সারা গুহাঘর কাশির শব্দে কেঁপে উঠল। ও তাহলে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এখন কিছু বলবে!

আবারও গলা সাফ করে জ্যাম বলল, 'মহাবলি নমুচি, উপস্থিত নগর, উপনগর প্রধানরা, আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা আমি যথাযথভাবে পালন করেছি। এখন আপনাদের জানাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত এই মানুষটি আমাদের বন্ধু। সুতরাং সবাই নিশ্চিন্ত মনে এর সঙ্গে খোলাখুলি সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।'

জ্যাম থামতেই সারা ঘরে কথার ঝড় উঠল, 'সাধু, সাধু, সাধু।'

ওদিক থেকে একজন বলল, 'তাহলে মহাবলি নমুচিই আমাদের হয়ে সব প্রশ্নগুলো করুন। প্রয়োজনে আমরা তাঁকে সাহায্য করব।'

অবাক হয়ে দেখলাম বক্তার হাতে একটা যন্ত্রমতো কি ধরা। সেই যন্ত্রে কথা বলছে বলেই সারা ঘর ওর কথায় গমগম করে উঠল! জ্যাম থামতেই আমি স্পষ্টভাবেই সবার উদ্দেশে বললাম, 'বন্ধু বালখিল্যের মুখে শুনলাম আমাদের কাজের ফলে তোমাদের জীবনে নাকি নানান সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি এ কথা বলতে পারি, আমরা তোমাদের সম্বন্ধে কোনো খবর জানতাম না। জানতাম না বলেই আমাদের কাজে তোমাদের যে জীবন-মরণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাও বুঝতে পারিনি। এখন যদি আমি তোমাদের সমস্যার কথাগুলো জানতে পারি তাহলে ফিরে গিয়ে আমাদের প্রধানকে বলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে পারি। আমি সমস্ত মানুষদের পক্ষ থেকে তোমাদের এ কথা জানাতে পারি, মানুষ কখনও এমন কিছু করবে না, যাতে বালখিল্যদের সামান্যতম ক্ষতি হয়।'

আমার কথার শেষে আবার সভাগৃহে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। স্পষ্ট দেখলাম, একদল বালখিল্য তাদের সামনের টেবিল চাপড়ে আমার কথায় সন্তোষ প্রকাশ করল। অন্য একদল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের হাতের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম মাইকে জোর প্রতিবাদ তুলতে থাকল। তা দেখে আমি বেশ অস্বস্তিতেই পড়লাম। কারণ সভাগৃহে তাদের সংখ্যা তো কম নয়। জানি না আমাদের কাজের ফলে এদেশে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হয়তো তা এতই ভয়ঙ্করভাবে ঘটেছে যে আমার কথা আর এরা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না।

হঠাৎ সভাগৃহের সামনে মাঝখানে একটা লাল বাতি জ্বলে উঠল। অমনি সবাই শান্তভাবে তাদের আসনে বসে পড়ল। নিস্তব্ধ হলো সভা-গৃহ। ওদিকে একজন বালখিল্য উঠে দাঁড়াল। তার হাতের যন্ত্রে সে বলল, 'অতিথি মানুষের কথা আমরা শুনলাম। বর্তমান পরিচালক পরিষদ সে কথায় সন্তুষ্ট। বিরোধীদের যদি সে বিষয়ে কিছু বলার থাকে তো তাদের প্রধান তা বলতে পারে।'

কথার শেষে অন্য দিক থেকে একজন বালখিল্য উঠে দাঁড়াল। দেখেই বুঝলাম উপস্থিত সভাসদদের মধ্যে সে বয়সে অনেক ছোট। বেশ ধীরস্থিরভাবেই সে তার হাতের যন্ত্রে বলতে শুরু করল, 'মানুষদের বিশ্বাস করার আর কোনো কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। প্রথম যে সাদা চামড়ার মানুষ অসহায়ভাবে এখানে এসে পড়েছিল, আমাদের সৎ ব্যবহারের প্রতিদানে সে আমাদের দুই হতভাগ্য সঙ্গীকে বন্দী করে নিয়ে পালিয়েছিল। কিছুদিন আগে এরাই বিনা কারণে প্রকৃতির বুকে বীভৎস সব কাণ্ড ঘটিয়ে লুনা নদীর জলধারাকে বন্ধ করার

চক্রান্ত শুরু করেছে! তখনই আমরা তাদের এই কাজের বদলা নিতে বলেছিলাম। খেয়াল করুন, আমি 'বদলা' শব্দটা যখন ব্যবহার করছি, তখন অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছিল, ওই শব্দটার

বসার সঙ্গে সঙ্গে তা থামল

মানে কি। ওই শব্দটা অর্বাচীন শব্দ। ওর ব্যবহার মানুষরাই করে থাকে, আমাদের সভ্যতায় ওর চল নেই। ওই শব্দটা আমাদের মহাজ্ঞানী যুগন্ধর তাঁর পুস্তকে লিখে রেখে গেছেন। যুগন্ধরই তো আমাদের দেশের একমাত্র পুরুষ যিনি অল্পবয়সে গোপনে মানুষদের মাঝে বহুদিন বাস করে ওদের বিচিত্র সব অসভ্য নিয়মকানুনের কথা তাঁর পুস্তকে লিখে রেখে গেছেন। তাঁর পুস্তকের শেষ কথাই হলো, সাবধান, মানুষকে ভীষণভাবে দেখেশুনে তবে বিশ্বাস করবে। বদলা মানে অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় দিয়েই করবে। এখন যদি কেউ বলে 'অন্যায়' শব্দটার কি মানে তো আমি নাচার!

'দ্বিতীয় যে মানুষকে আমরা এখানে এনেছিলাম ডেকে সে আসাতে আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি ক'দিন বন্ধ হয়েছিল। তখন সবাই বলেছিল আমার কথাই ভুল, মানুষকে বিশ্বাস করা চলে। কিন্তু ক'দিন পরেই সেই মানুষরা তাদের কৌশল বদল করেছিল। তারা পাথর বৃষ্টি বন্ধ করে কৃত্রিম ভূমিকম্প শুরু করেছিল। তাহলে আর কেন আমরা মানুষদের বিশ্বাস করব? এই মানুষও এখানে অনেক ভাল ভাল কথা বলে যাবে। ফিরে গিয়ে সে যে আমাদের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটাবে না, সে বিশ্বাস আমরা করি কি করে? সর্বনাশ আমাদের গ্রাস করতে চলেছে। এখন আর বিশ্বাসের সময় নেই। এখন আমাদের উচিত, যে সব ক্ষেপণযন্ত্র আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা তৈরি করেছে, তার সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক যুক্ত করে এখুনি নিক্ষেপ করে লুনা নদীর জলস্রোতকে মুক্ত করে দেওয়া। আমরা তো আমাদের এই ক্ষেপণযন্ত্রে বিস্ফোরক যুক্ত করে অতীতে আমাদের আশপাশের পর্বত ফাটিয়ে আমাদের প্রয়োজনে অনেক কাজ করেছি। এই ক্ষেপণযন্ত্র তার নিখুঁত লক্ষ্যে যে পৌঁছাবে তা তো আমরা জানি। তাহলে, আমাদের আর মিছিমিছি সময় নষ্ট করার কি কারণ থাকতে পারে?' বক্তৃতা শেষ করে বিরোধীপক্ষের নেতা বসল।

সভাগৃহের সবাই নিশ্চুপ। আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুধু তাকিয়েই রইলাম। কি সর্বনাশা কথা এরা বলছে। কে জানে এদের বৈজ্ঞানিকেরা কত শক্তিশালী ক্ষেপণআস্ত্র তৈরি করেছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী যে কোনো অস্ত্রেই তো বাঁধটাকে ধ্বংস করে ফেলা যাবে। আবার তাই আমি বলতে শুরু করলাম। বললাম, 'মাননীয় বালখিল্য মহোদয় যা বললেন, তারই উত্তরে আমি বলতে চাই, মানুষরা স্বেচ্ছায় কোনো অভিসন্ধি নিয়ে কিছু করেনি। বালখিল্যদের যা কিছু ক্ষতি হয়েছে, তা হয়েছে মানুষদের অজান্তেই। মানুষ কখনও কিছু ধ্বংস করতে চায় না। করবেও না। সুতরাং তাদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আমি দেখে যেতে চাই কি ক্ষতি মানুষ করেছে। আমাদের ওখানে ফিরে গিয়ে আমি তার প্রতিকার করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। মানুষদের আর একবার সুযোগ দিয়ে বিশ্বাস করে দেখ।'

আমার বক্তৃতার শেষে আবার টেবিল চাপড়ে একদল সন্তোষ প্রকাশ করল। অন্য দল চুপ করেই বসে রইল।

একজন গণ্যমান্য বালখিল্য তার জায়গা ছেড়ে এগিয়ে গেল বক্তৃতা মঞ্চের দিকে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিরোধী নেতা যা বলল, তা যদি মানতে হয় তো আমাদের পঞ্চদশ সহস্রতম নমুচিকে এখুনি পদত্যাগ করতে হয়। আমি বলি, তার প্রয়োজন নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীপক্ষের একজন উঠে বলল, 'আপনার কথা মানতে পারলাম না, বালখিল্যরা আজ চাইছে পরবর্তী নমুচিকে। কারণ বর্তমান নমুচি মানুষকে বিশ্বাস করে। অথচ মানুষ যে বিশ্বাসের যোগ্য নয়, তার প্রমাণ

তো আমরা বহুবারই পেয়েছি, সেই অতীত ইন্দ্রের কাল থেকে আজ পর্যন্ত।'

আমি বাধ্য হয়েই ওদের কথার মাঝে বললাম, 'মাননীয় বালখিল্য, তুমি নেহাতই ভুল করছ, এই পৃথিবীতে একমাত্র মানুষকেই বিশ্বাস করা চলে। মানুষ কখনও কারও ক্ষতি করতে চায় না। আমরা....'

আমার কথার মাঝে বাধা পড়ল। অন্যদিক থেকে একজন বলে উঠল, 'সভাপ্রধান, সভার শালীনতা নষ্ট হয়েছে! মানুষটা মিথ্যা কথা বলেছে। তা তো আমরা হতে দিতে পারি না।'

দেখলাম বক্তা একপাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল। তার মানে সভার প্রতিটি সদস্যের সামনেই মাইকের ব্যবস্থা আছে। যাতে তারা তাদের মতামত সবাইকে শুনিয়ে দিতে পারে।

সভাপ্রধান এক বৃদ্ধ। হাত তুলে সবাইকে শান্ত করে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজই তুমি প্রথম আমাদের এই ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিয়েছ। তাই তুমি হয়তো সভার নিয়ম কি তা জান না। শুনে রাখ মানুষ, আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় মিথ্যা কথা বলার অধিকার নেই। এখানে আসি আমরা রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। বাজে মিথ্যা বলে প্রয়োজনীয় সময় নষ্ট করতে নয়। তেমন গর্হিত কাজ যে করে তাকে আমরা শাস্তি দিই। তুমি নতুন, তাই তোমাকে আর বিরক্ত করলাম না। এখন তুমি আবার তোমার বক্তব্য কি তা বল। তবে ওইসব মিথ্যা কথাগুলো বাদ দিয়ে।'

অবাক আমি বললাম, 'আমি তো মিথ্যা কিছুই বলিনি। এখনও আমি তো আমার কথা বুঝিয়ে বলার সুযোগই পাইনি, কি মিথ্যা বললাম আমি?'

'ওই যে বললে, মেদিনীতে মানুষদেরই মাত্র বিশ্বাস করা যায়!'

'যায়ই তো! মানুষই তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী।'

'থাম, থাম! আবার অবান্তর কথা বলছ তুমি।' বেশ রাগ করেই সভাপ্রধান বলল, 'যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে, এনে সুখ পায়, তাদের বিশ্বাস করার মতো নির্বোধ এদেশে পাবে না। আর তারা শ্রেষ্ঠ কিসে?'

একটু থেমে থেকে আমি বললাম, 'এ খুবই অপমানকর কথা। আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি, আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। কেন আমাকে ডাকা হয়েছে তা-ই বল। দেখাও আমাকে কি সর্বনাশ তোমাদের হয়েছে। আমি সবকিছু দেখে যেতে চাই। তারপর ফিরে গিয়ে আমি যথাযথ বন্দোবস্ত করব। যতদিন না আমি কিছু করতে পারি অন্তত ততদিন তোমরা এমন কিছু করবে না, যাতে মানুষদের ক্ষতি হয়। মানুষদের ভালোমন্দ নিয়ে তোমাদের এই সভায় এত বিশদ আলোচনা করাও সময়ের অপচয়। তা এখুনি বন্ধ কর।'

সভায় আবার তুমুল হট্টগোল শুরু হলো। সেই দুই পক্ষের কথার লড়াই। তা কিছুক্ষণ চলার পর সভাপ্রধান আবার হাত তুলল। লাল আলোটা জ্বলল। অমনি সবাই চুপ করে গেল। সভাপ্রধান বলল, 'শোন মানুষ, আমাদের প্রধান মহাবলি নমুচি,' আমাদের সর্বনাশের কথা তোমাকে শোনাবে। সব শুনে তুমিই আমাদের জানিয়ে যাও এখন আমাদের কি করা উচিত। ইচ্ছা করলে লুনা নদীর ধারাস্রোতকে আবার আমরা যে কোনো মুহূর্তে মুক্ত করে দিতে পারি। না, তা যে হঠাৎ করব না, সে কথা আমিই দেশবাসীর পক্ষ থেকে তোমাকে দিচ্ছি। আশা করি তুমি তোমার পূর্ব প্রতিনিধির মতো মিথ্যাচার করবে না।' বলে সামনে বসে থাকা দেশের প্রধান নমুচিকে বক্তৃতা মঞ্চে আসতে বলল।

নমুচি আস্তে আস্তে উঠল বক্তৃতা মঞ্চে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'মানুষ, তোমাদের দেওয়া পাথর-বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। এই পাথর-বৃষ্টিতে মোট সাত হাজার নয় শত তিরানব্বই জন বালখিল্য মারা গেছে। অল্প-বয়স্ক শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউই বাদ নেই। আহতের সংখ্যা সাতাশ হাজার। তার মধ্যে একুশ হাজার এগারো জন চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেছে। এই বিবরণ থেকেই বুঝতে পারছ কি ভীষণ গর্হিত কাজ মানুষ করেছে। পাথর-বৃষ্টি বন্ধ করার পরও তোমরা কৃত্রিম ভূকম্পন সৃষ্টি করেছিলে। তার ফলে আমাদের অনেক আবাসস্থল, অনেক ঐতিহাসিক সৌধ ধূলিসাৎ হয়েছে। আমাদের অর্থবিভাগ মোট ক্ষতির পরিমাণ ধরেছে দশ হাজার তিন শত সাঁইত্রিশ কোটি দ্রামুর বা স্বর্ণ-মুদ্রা। এও কি প্রমাণ করে না তোমাদের ভয়ঙ্কর রূপের কথা? বিরোধী পক্ষের নেতারও তাই যথেষ্ট কারণ আছে মানুষকে অবিশ্বাস করার। কিন্তু আমরা যারা এখন বালখিল্যদের অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করি, আমরা মনে করি অবস্থা এখনও চরমে পৌঁছায়নি। এ কথা আমরা বিশ্বাস করি, মানুষরা আমাদের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে বলেই আজ এই বিভ্রান্তি ঘটেছে। তারা জানে না আমাদের বর্তমান অবস্থানের কথা, তাই তাদের কৃতকর্মের ফল এভাবে আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। আমরা যদি তাদের আমাদের অবস্থার কথা অবগত করাতে পারি, তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি।'

থামল প্রধান। সঙ্গে সঙ্গে আবার টেবিল চাপড়ে তার কথার সমর্থন জানান হলো।

আমি বললাম, 'তোমাদের এই কথাই ঠিক। আমরা জানতাম না তোমাদের অস্তিত্বের কথা। তাই এই লুনা নদীতে বাঁধ দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছি। এই স্থান নির্বাচনের সময় যদি তোমাদের অস্তিত্বের কথা জানা যেত, তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও স্থান নির্বাচন করা হতো। কিছুদিন আগে যাকে তোমরা এখানে এনেছিলে, সে অসুস্থ হয়ে স্থান-ত্যাগ করেছে। সে কাউকেই তোমাদের কথা বোধহয় বলতে পারেনি। পাথর-বৃষ্টি সে বন্ধ করেনি। বন্ধ হয়েছিল ব্লাস্টিংয়ের স্থান পরিবর্তন করার জন্য। সে কথা যাক, মানুষের মনে কোনো হিংসা লুকিয়ে নেই। মানুষ জেনে বুঝে তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। এই কথাটা তোমরা বিশ্বাস করতে পার।'

ওদিক থেকে একজন প্রধান উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা এই মানুষের কথা মেনেই নিই। কারণ, একথা তো ঠিক আমরা বহু যুগযুগান্তর ধরে আমাদের অস্তিত্বের কথা গোপন রেখেছি। সেই গোপনতার ফলে আমাদের অস্তিত্বের কথা আজকের মানুষের মনে না থাকাই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে যারা স্থান নির্ণয় করতে এসেছিল তারা কখনও আমাদের কথা চিন্তা করেনি।'

আমি বললাম, 'ঠিক তাই হয়েছে মন্ত্রীমশাই। এখন আমি বলি কি, কে দোষী, কিভাবে দোষী, এসব বিচার না করে আমাকে সবকিছু দেখাও এবং বোঝাও বর্তমানে তোমাদের সব থেকে বেশি চিন্তার কারণটা কি। আমি তাহলে আমাদের প্রজেক্ট সাইটে ফিরে গিয়ে আমাদের প্রধানকে বলে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারব। এমনকি তাঁকে বলে, সরকারপক্ষ থেকে তোমাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থাও করতে পারব।'

সভাগৃহ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মানে আমার কথা সভার দুই পক্ষকেই ভাবিয়ে তুলেছে। মনে মনে একটু স্বস্তি পেলাম আমি। গোপন স্থানে এদের বসানো ক্ষেপণ অস্ত্রগুলোর মুখ তো আমাদের বাঁধের দিকেই করা আছে। এরা সভ্যতার যে স্তরে পৌঁছেছে, সামান্য একটা বাঁধ ওই ক্ষেপণঅস্ত্র চালিয়ে ধ্বংস করা হয়তো এদের কাছে তেমন কোনো সমস্যাই নয়। সেই সর্বনাশা চিন্তা আমি বোধহয় এদের মন থেকে দূর করতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি বললাম, 'মহতীসভাকে আমি জানাচ্ছি, আমি

ক্ষতিস্থানগুলি দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত, আমাকে তোমরা এখনই সেখানে নিয়ে যেতে পার।'

মহাবলি নমুচি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'এতেই সব সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। আমি তাই এই সভার পক্ষ থেকে এই মানুষদের প্রতিনিধিকে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঘুরিয়ে দেখাবার অনুমতি দিচ্ছি। তাকে আমাদের যে আসন্ন সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, তাও দেখানো হবে। জ্যামঘ, তুমি তোমার বন্ধুর ভার নাও। বায়ুবাহিনীর প্রধান, এখনি দুজন উপযুক্ত চালককে তাদের পুষ্পক রথ নিয়ে উপস্থিত হতে বল। তারাই মানুষকে পথ দেখিয়ে জায়গা থেকে জায়গায় নিয়ে যাবে। স্যন্দন বাহিনীর প্রধান, তুমিও এখনি কয়জন স্যন্দন-চালককে ডেকে পাঠাও, তারাও পথ দেখিয়ে দেবে। আমি মনে করি এই সভার সদস্যরা এই ব্যবস্থা অনুমোদন করল।'

সঙ্গে সঙ্গে সভার সবাই টেবিল চাপড়াতে লাগল।

জ্যাম তখন আমার একপাশে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে। তা দেখে আমি আমার বাঁ হাতটা ওর সামনে পেতে দিলাম। ও সেই আগের মতোই দুহাতে পাশ ধরে লাফিয়ে চেটোর ওপরে উঠে পড়ল। তেমনি ভয়কাঁপা গলায় বলল, 'সাবধান, ফেলে দিও না যেন।'

আমি হাতটা ডান কাঁধের কাছে ধরতেই ও ঠিক আগের মতোই কাঁধে চড়ে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'উঠব?'

ও বলল, 'তোমরা কি তোমাদের প্রধানদের সঙ্গে এভাবেই কথা শেষ কর?'

ভীষণ লজ্জা পেলাম আমি ওর কথায়। শত হোক আমি এখন এদের কাছে মানুষের প্রতিনিধি। আমার সামান্য অভব্যতা মানুষদেরই দুর্নামের কারণ হবে। আমি তাই বললাম, 'উপস্থিত নগর উপনগর প্রধানরা, উপস্থিত মন্ত্রীমশাই ও সর্বপ্রধান, আপনারা আমাকে আজ এই যে সুযোগ দিলেন, আমি তা গ্রহণ করলাম। কথা দিচ্ছি, ফিরে গিয়ে আমি আপনাদের বিষয়ে আমাদের প্রধানকে সব সমস্যার কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।' কথার শেষে আমি উঠে দাঁড়ালাম। চারদিকে সেই আগের মতো টেবিল চাপড়ানো শুরু হলো।

সবাইকে পেছনে রেখে মাথা নিচু করে গুহা ঘর থেকে বাইরে আসতেই ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে কেঁপে উঠলাম। রাত শেষ হয়ে গেছে। চারদিকের গাছপালায় বাতাসের গান শুরু হয়েছে। অথচ কোথাও কোনো পাখির ডাক শুনতে পেলাম না। সামনে শহরের সব আলোই নিভে গেছে। আমি জ্যামকে পাখির কথা বলতেই ও বলল, 'কি সর্বনাশ, তুমি কোন পাখির কথা বলছ? আকাশের ওই সব উড়ন্ত প্রাণীদের আমরা ভীষণ ভয় করি। হ্যাঁ, স্বীকার করি, তাদের মধ্যে কিছু নিরীহ, তারা অপূর্ব সুরে গান গায়। কিন্তু অধিকাংশই মাংসাশী। সুযোগ পেলেই তারা তাদের নখে আমাদের তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। সে বড়ই বীভৎস মৃত্যু। আমাদের বায়ুবিভাগের এত পুষ্পক তো সেকারণেই অহরহ আকাশ পাহারা দিচ্ছে। তাদের আসার খবর পেলেই পুষ্পকগুলো উড়ে গিয়ে তাদের আক্রমণ করে। তাদের প্রাণে মারে না, রাজ্য সীমা পার করে দিয়ে আসে। আজকাল ওরাও জানে, এ রাজ্যে ঢুকলে তাদের প্রাণ যাবার ভয় আছে, তাই তারা এদিকে বড় একটা আসে না।'

আমি বললাম, 'কিভাবে আমি তোমাদের নগরে ঢুকব? আমার তো ভয় হচ্ছে, আমার ধাক্কাতেই না আরও কিছু বাড়ির ক্ষতি হয়।'

জ্যাম বলল, 'আগেই আমাদের সভায় ঠিক হয়েছিল, যাকে এখানে আনা যাবে, তাকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখানো হবে। নগরের প্রধান প্রধান পথগুলো দিয়ে ঘুরলে কোনো বিপদ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। প্রধান প্রধান পথ দিয়ে ঘুরলেই তুমি বুঝতে পারবে আমাদের সত্যিই কি সমস্যা! তারপর তোমাকে লুনা নদীর ধার দিয়ে নিয়ে যাব সেই গভীর খাদের কাছে, যেখান দিয়েই আমাদের আসন্ন সর্বনাশ এগিয়ে আসবে তা দেখাতে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রধান প্রধান পথের দুপাশের বাড়িতে আমি ধাক্কা খাব না তো?'

'যাতে তা না হয়, সে কারণে তোমার আগে আগে দুদিকে দুই পুষ্পক উড়বে। তারা তোমাকে পথ দেখাবে। তোমার পায়ের সামনেও থাকবে দুটো স্যন্দন। তাদের কাজ হবে তুমি কোথায় কোথায় তোমার পা ফেলবে তা আগেই দেখিয়ে দেওয়া। আমার তো মনে হয় এ ব্যবস্থায় আর কোনো বিপদ হবে না।'

আমি বললাম, 'তুমি গাড়ির কথা বলছ? তা এখন কোথায় গাড়ি। দেরি করলে ওদিকেও দেরি হয়ে যাবে।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই কানে এল অতি ক্ষীণ একটানা শব্দ, চমকে এদিক ওদিক তাকাতেই জ্যাম বলল, 'না, না বন্ধু, এদিক ওদিক নয়। বালখিল্যদের পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য সংকেতধ্বনি তুলে স্যন্দনগুলো এসে গেছে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

নিচের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হলাম, সেই হাতের মুঠোর মতো দেখতে চার চাকা-ওয়ালা দুটো স্যন্দন সাইরেন বাজাতে বাজাতে সোজা আমার পায়ের কাছে এসে থামল। একটার দরজা খুলে অতি পুঁচকে একজন ড্রাইভার বার হয়ে এল। তার সারা শরীরে এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরা। ঘাড় তুলে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল। তা শুনতে পেলাম না আমি। না পেলেও ড্রাইভার তার দুহাত সামনের রাস্তার দিকে দেখিয়ে আমাকে এগোতে ইঙ্গিত করল। তারপর ফের স্যন্দনে উঠে পড়ে স্যন্দন চালু করল।

জ্যাম বলল, 'এবারে বন্ধু তুমি ওই দুই স্যন্দন দেখেই এগোও। ওরাই তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে।'

মনে মনে আমি ভগবানকে স্মরণ করে আস্তে আস্তে ওই দুই গাড়ির পেছন পেছন এগোলাম। গুহাঘরের আশপাশ প্রায় ফাঁকা বিশাল বিশাল সবুজ মাঠ। চারপাশে তার বাগান। মাঝে মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট ছবির মতো বাড়ি। দূর থেকেই দেখছিলাম সেগুলোর দরজা খোলা। বাড়ির বালখিল্যরা দারুণ কৌতূহল নিয়ে বারান্দায় উঁকিঝুঁকি মারছে। আর আমাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে! একটু এগোতেই শহর আমার চোখের সামনে পড়ল। আমাদের হিসাবে তিন-চার মিটার থেকে দশ মিটারের মতো উঁচু সব বাড়ি। তিন-চার মিটার উঁচু বাড়িগুলোই সাধারণ বাড়ি। বাকিগুলো বোধহয় ওদের স্কাইস্ক্র্যাপার। সব থেকে চওড়া রাস্তাটা তিন মিটারের মতো হবে। বাকিগুলো দেড় থেকে দু মিটার। সেখান দিয়েই আমাকে যেতে হবে। আমি আস্তে আস্তে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমার আসার জন্য রাস্তায় বালখিল্যরা কেউ নেই। নেই ওদের কোনো গাড়ি। সাবধানে এগোতে আমার তেমন অসুবিধা হচ্ছিল না।

খোলা ময়দান পার হতেই কোথা থেকে দুটো পুষ্পক উড়ে এল। এখন থেকে ও দুটোও আমার সামনে উড়বে। কোথাও কোনো বাড়িতে আমি আটকে যাব কিনা তা ওরা নজর রাখবে। কারণ রাস্তা জায়গায় জায়গায় বেশ সরু। কোথাও বাড়িগুলো বেশ ঘিঞ্জি। সেখানে রাস্তা এক, এমনকি আধ মিটারের মতো চওড়া। সেই সব জায়গায় আমাকে অতি সাবধানে দুপাশের বাড়িগুলোকে বাঁচিয়ে এগোতে হচ্ছিল। কিছুটা এগোতে জ্যাম বলল, 'এবার তুমি এপাশ ওপাশ দুদিকে তাকিয়ে দেখ।'

তাকিয়ে দেখলাম, দুপাশের বাড়িগুলোর বেশিরভাগই আর আস্ত নেই। চারদিকে ভাঙা

পাথর ছড়ানো। কোনো সন্দেহ নেই, ব্রাস্টিংয়ের ফলে ছিটকে-ওঠা পাথরগুলোই এখানে বোমার মতো পড়ে সবকিছুকে এভাবে ভেঙেছে। এমন ভয়ঙ্কর ধ্বংসের ফলে যে কত প্রাণহানি ঘটেছে তা সহজেই বোঝা যায়! আমি বেশ লজ্জায় পড়লাম।

জ্যাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,'ক্ষয়ক্ষতি এই অঞ্চলেই সব থেকে বেশি হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যাও যে অনেক তা তো শুনেইছ।'

আমি দেখলাম, আমার সামনে উড়ে-চলা একটা পুষ্পক হঠাৎ তার গতি বদল করে ধ্বংসস্তূপের মাঝামাঝি চলে গেল। তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে কিছুটা নেমে পড়ে চারদিকে কি যেন সব ছড়িয়ে দিল!

জ্যাম বলল, 'মৃত আত্মাদের সম্মান জানানো হলো বন্ধু। সেই সঙ্গে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে সব দেহ এখনও আটকা পড়ে আছে, যা আর কোনো অবস্থাতেই উদ্ধার করা যাবে না, তাদের থেকে যাতে কোনো মহামারী না ছড়ায় তাই ওষুধও ছড়ানো হলো। এটা আমাদের এখানের নিয়মিত কাজ।' পুষ্পকটা আবার ফিরে এসে আমাকে সামনের পথ দেখাতে লাগল।

নিচের স্যন্দন দুটো এরপর আমাকে এমন একটা পথে ঢোকাল, যেখানে পরপর দুপাশে আমার কোমর-সমান উঁচু বাড়ি। আর পথটাও তেমন চওড়া নয়। আমি খুব সাবধানে দুদিক বাঁচিয়ে এগোতে লাগলাম। দু-একটা বাড়ির ভিতর থেকে আতঙ্কের চিৎকার শোনা গেল। আবার অনেকগুলো বাড়ির ছাদে অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দেখা আমি পেলাম। তারা ভয় তো পাচ্ছিলই না, বরং হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। আরও কিছুটা এগোতেই জ্যাম বলল, 'বন্ধু, সামনের ওই যে লাল রঙের বাড়িটা দেখছ, ওটাই আমার বাড়ি। ওর ছাদে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে আর তাদের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা দাঁড়িয়ে আছে। তুমি যদি একবার তাদের সঙ্গে আলাপ কর তো ভাল হয়। বালখিল্যদের মাঝে আমার একটু নাম- ডাক হয় তাহলে।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই বন্ধু। আমি থামছি ওখানে। তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি। তুমি ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও।'

আমি হাসিমুখে সেই বাড়িটার সামনে দাঁড়ালাম। মাথা নিচু করে বললাম, 'নমস্কার, এসেছি আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করতে। জ্যামঘ আমার বন্ধু বিশেষ।'

আমার কথা শুনে জ্যামের ছেলে আর মেয়ে তো আনন্দে লাফাতে লাগল। আশপাশের বাড়ির ছাদে ভিড় জমে গেল। আমি জ্যামকে বললাম, 'তুমি ওদের বুঝিয়ে বল, আমি পরিচিত হয়ে দারুণ খুশি হয়েছি। যদি তোমার ছেলে আর মেয়ে আমার কাঁধে চড়তে চায় তো আমি ওদের চড়াব।' বলে কাঁধের কাছে হাত পাততেই জ্যাম তাতে উঠে বসল। আমি আস্তে আস্তে ওকে ওদের বাড়ির ছাদের একপাশে নামিয়ে দিলাম। ও ওর পরিবারের লোকজনদের কাছে গেল। নিশ্চয়ই সে আমার কথা ওঁদের বলল। কারণ, আমি দেখলাম, ওর ছেলে আর মেয়েই শুধু নয়, ওর স্ত্রী, বৃদ্ধা বাবা, বৃদ্ধা মা পর্যন্ত বহুকষ্ট করে আমার হাতের চেটোর উপরে উঠে পড়লো। অতি সাবধানে আমি ওঁদের সবাইকে কিছুক্ষণ এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ফের সবাইকে নামিয়ে দিলাম ছাদে।

তারপর যা কাণ্ড হলো না! এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদের ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে হল্লা জুড়ে দিল। বাধ্য হয়েই আমি অচেনা, অজানা বেশ কয়েক বাড়ির ছেলেমেয়েদেরও হাতে তুলে ঘোরালাম। আরও অনেকেই ভাবছিল এবারে তাদের পালা আসবে। কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ক্ষমা চেয়ে আমরা এগোলাম।

এতক্ষণ শহরের উপকণ্ঠ দিয়েই বোধহয় আমি আসছিলাম। এরপর সামনে পুরো শহরের ছবিটা ফুটে উঠল। দারুণ হিসাব কষে তৈরি করা শহর। কিন্তু শহরটা যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বোমাখাওয়া কোনো জার্মান শহরের মতো হয়ে আছে। যে বাড়িটা ভাঙেনি, তারও গায়ে ফাটল ধরেছে। এদিকে ওদিকে পাথরের চাঙ পড়ে। বহু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ওদের সব স্কাইস্ক্র্যাপারের জানলায় কাচ নেই। সবকিছু হাট করে খোলা! সেইসব জানলার ধারেই সবার আনাগোনা চলছে। তারাও ব্যস্ত আমাকে দেখার জন্য। একটু এগোতেই সামনে একটা বিরাট গর্ত দেখলাম। তাতে জল জমে জমে একটা ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। সেই ডোবাটা আমি লাফিয়ে পার হলাম। বালখিল্যরা তো আর তা পারবে না। ওদের পক্ষে ওটা বিরাট একটা দীঘি।

জ্যাম বলল, 'জান বন্ধু, ওই ভয়ঙ্কর জলায় পড়ে ডুবে মরেছে কতজন? এখন তো প্রধান ঘোষণা করেছে, ভাঙা পাথরগুলো সরিয়ে এনে ওটাকে ভর্তি করা হবে। মোটামুটি হিসাব কষে দেখা গেছে, গোটা শহরের চার ভাগের তিন ভাগ পাথর ওভাবেই সাফ করা যাবে।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাড়ের কাছে কি যেন এসে বিঁধল। বেশ যন্ত্রণা বোধ হলো। কিছু ভেবে ওঠার আগেই কানের পাশে, নাকের ডগায়, ঘাড়ে পরপর আরও কটা কি যেন এসে বিঁধল। হাতটা ঘাড়ের কাছে পৌঁছাবার আগেই সামনের পুষ্পক দুটো হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে আমার পিছন দিকে চলে গেল। যন্ত্রণা যেন সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল। আমি প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠলাম, 'জ্যাম, জ্যাম, আমাকে কেউ আঘাত করছে। কেউ কিছু ছুঁড়ে মারছে! এ কি হলো আমার জ্যাম, কে এমন করল?'

জ্যাম বলল, 'নড় না বন্ধু, নড় না। আমি ফলাগুলো বার করে দিচ্ছি। পুষ্পক দুটোই ওদের দিকে তেড়ে গেছে। আর কোনো ভয় নেই।'

যন্ত্রণায় আমি বললাম, 'ফলা মানে, আমাকে কি সত্যিই কেউ আঘাত করেছে? কি হবে আমার?'

'বিরুদ্ধ পক্ষের কিছু ছেলে, সর্বনাশের দলে নাম লিখিয়েছে। এ তাদেরই কাজ। ওদিকের বাড়ি থেকেই তাক করে বিষাক্ত ফলা ছোঁড়ার যন্ত্রটা ব্যবহার করেছে। তুমি ভয় পেও না। এই বিষফলা ছুঁড়েই আমরা হিংস্র জন্তুদের কাবু করি। এ বিষ তোমাকে ক'দিন শুধু ঘুম পাড়িয়ে রেখে দেবে। তার বেশি কিছু নয়।'

জ্যাম আমার হাতের চেটোয় উঠে একটা একটা করে সব বিষাক্ত ফলাগুলো টেনে তুলল। ব্যথা পেলাম, তবে তেমন অসহ্য নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রাণের ভয় আছে নাকি?'

হেসে জ্যাম বলল, 'না, না, মিছে ভয় পেও না তো। মাত্র ক'দিন শুধু ঘুমোবে। তার বেশি কিছু নয়। জোরে পা চালাও উল্টো দিকে। এখুনি তোমাকে ফিরতে হবে গুহাঘরে। নইলে কোথায় ঘুমোবে তুমি?'

তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এলাম গুহাঘরের দিকে। সত্যি তো ওষুধের ঘুম তো যেখানে সেখানে দেওয়া যাবে না।

মনে মনে শিউরে উঠলাম, একটা ফলা যদি চোখে এসে লাগত! নেহাতই ভাগ্যবলে তা হয়নি। ঘুমে চোখ জুড়ে আসতে লাগল আমার। ভীষণ তেজী ওষুধ তো! বড় বড় পা ফেলে আমি এগোলাম গুহাঘরের দিকে।

শঙ্কর দেবের কথা

সুশান্ত পালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গত পরশু সকালবেলা তার ঘর তালাবন্ধ দেখা গেছে। তারপর থেকে আর তার কোনো খবর নেই। ট্রাঙ্ক টেলিফোনে বড় সাহেব গোপনে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সেখান থেকে জানানো হয়েছে, সে বাড়ি ফেরেনি।

তাহলে সে গেল কোথায়?

আজকাল তার তেমন জরুরী কোনো ডিউটি ছিল না। বাঁধের কাজ শেষ। জেনারেটার চালু হবার জন্য রেডি। ঠিক দিনে জলের উচ্চতা একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী সুইচ টিপে জেনারেটার চালু করে দেবেন। তার ক'দিন এখনও দেরি আছে। সেদিন বাঁধের কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে যাদের প্রশংসাপত্র দেবেন তার মধ্যে সুশান্তও একজন। সে আমার পাশের ঘরেই থাকত। দারুণ ভাব তার সঙ্গে আমার। তাই আমাদের প্রধান কুরুভেল্লু সাহেব গোপনে আমাকে বললেন ওর খোঁজে বার হয়ে পড়তে, আমি রাজী হয়ে গেলাম। মাঝে মধ্যে হাতে কোনো কাজ না থাকলে সুশান্ত একাই এদিক ওদিক একটু ঘুরে বেড়াত। তখন ও সঙ্গে নিত অস্ত্র আর কম্পাস। এই জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী তেমন নেই। যাও বা ছিল, ঘনঘন ব্লাস্টিং-এর ফলে তারা এ জঙ্গল ছেড়ে চলে গেছে। তবে এখনও মাঝে মধ্যে আশপাশের জঙ্গল থেকে এক একটা ভাল্লুক এদিকে চলে আসে। সেগুলো ভীষণ হিংস্র, মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে।

ওর ঘর খুলে ভিতরে গিয়ে দেখেছি, ও রিভলবার আর ওর কম্পাস, হাতঘড়ি সঙ্গে নিয়ে গেছে। বড় টর্চটাও নেই। তার মানে ও স্বেচ্ছায়ই ওর ঘর থেকে বার হয়ে কোথাও গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ও গেছে কোথায়?

প্রথমেই আমি ওর ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। রাতে ও মেসে খেতে এসেছিল। তখন ওর সঙ্গে কথা বলে ওর চলে যাবার বিষয়ে কিছুই শুনিনি। ভোরে উঠেই দেখেছি ঘরে তালা ঝুলছে। আমি ভোরে যখন উঠি, তখনও বাইরে অন্ধকার থাকে। ও অত ভোরে কোথায় গেল! মাঝরাতে আমার একবার ঘুম ভেঙেছিল, মনে পড়ল, তখন যেন ওর ঘরে ওকে কারও সঙ্গে কথা বলতে শুনেছিলাম। তখন ঘুমের ঘোরে ছিলাম বলে, ব্যাপারটাকে মনের ভুল বলে ভেবে ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, ওর এই এভাবে চলে যাওয়ার সঙ্গে রাতের সেই কথা বলার যোগ আছে। তার মানে ও একা কোথাও যায়নি। কারও সঙ্গে কোথাও গেছে। সে কথাই বসকে বললাম। আমার কথা শুনে উনিও যেন কেমন চিন্তায় পড়লেন। আমাকে বললেন, 'শঙ্কর, তোমাকে যেখানে সেখানে খুঁজতে হবে না। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় খোঁজে যেতে হবে। সন্ধ্যেবেলা ঘরে থেকো, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে গোপন কথা।'

সন্ধ্যা থেকেই আমি বাড়িতে বসেছিলাম বসের জন্য। উনি এলেন সন্ধ্যে পার করে। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'দেরি হলো, কারণ বিকাল থেকে আকাশের যা অবস্থা! বৃষ্টি নামল বলে। ভেবেছিলাম বৃষ্টি মাথায় করে আসব না। কিন্তু মনে একটা চিন্তা এল। এদিকে অসময়ে পাহাড়ী বৃষ্টি যে কি ভয়ঙ্কর হয় তা তো তুমি জান। থমথমে আকাশ যেন তেমন বৃষ্টিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তেমন বৃষ্টি হলে আমাদের যত না ক্ষতি হবে, তার থেকেও শতগুণ বেশি ক্ষতি তো অন্যদেরও হতে পারে। সে কথা ভেবেই আমি চলে এসেছি তোমার কাছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'স্যার, এই গহন জঙ্গলে আমরা ছাড়া আর কারা আছে যে বৃষ্টিতে ক্ষতি হবে? আমাদের বাঁধের সবকিছুই তো যথাযথ কাজ করছে, তেমন বৃষ্টি হলে লুনা নদীতে বান ডাকবে, তা ডাকুক। আমাদের স্লুইস গেটগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আমরা তো অনায়াসেই সেই জলের বেগকে সামলাতে পারব। তবে?'

'সেই তবে নিয়েই আমি তোমার সঙ্গে আজ আলোচনা করতে এসেছি। আগেই বলি, সুশান্তর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ারও আমার মনের সন্দেহের সঙ্গে যোগ আছে। আমার সন্দেহ ঠিক কিনা জানি না। সেটা জানাও তোমার একটা কাজ হবে।'

বসের কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালীভরা। এসব আজ উনি কি বলছেন! কাদের যেন ক্ষতি হবে। তার সঙ্গে সুশান্তের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ারও সম্বন্ধ আছে! কি যে বলব আমি ভেবে পেলাম না।

উনি বললেন, 'শঙ্কর, তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই, কথা দাও সে সব কথা তুমি আপাতত গোপন রাখবে?'

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, ও কি বিদেশী কোনো সংস্থার হয়ে কাজ করছে?'

'না, না, ওকথা নয়।' বললেন বস, 'তোমাকে বোধহয় আশপাশেই কোথাও ওর খোঁজ নিতে হবে। আর তা নিতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মুষলধারে বৃষ্টি নামলে যে শেষ পর্যন্ত কি হবে, তাই তো আমি বুঝতে পারছি না। যাক সে কথা, তুমি কি বালখিল্যদের নাম শুনেছ?'

অবাক আমি বললাম, 'কী বললেন, স্যার? বালখিল্য? মানে কি ওর?'

উনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে এনে আমাকে একে একে তেওয়ারীর সব কথা খুলে বললেন। জীবনে এত অবাক আমি কখনও হইনি। তবুও বললাম, 'স্যার, ওসব তো আপনার অনুমান। এমনও তো হতে পারে তেওয়ারী সত্যিই মনের ভারসাম্য হারিয়েছিল। বুড়ো আঙুলের মাপের মানুষ! এ কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন? পাকা প্রমাণ ছাড়া কারও কাছে বলতেও পারব না!'

উনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'প্রমাণ আমার কাছে আছে। আর তা আছে বলেই এখন আমার মনে হচ্ছে, অতীত না জেনে অনেক ক্ষতিই আমরা ওদের করেছি। হয়তো বাঁধ দিয়ে চন্দ্র সরোবর তৈরি করে এখন আমরা ওদের ডুবিয়ে মারার ব্যবস্থাও পাকা করে বসেছি। সেটাই এখন আমার চিন্তার বিষয়। ওরা তাই হয়তো সুশান্তকে ধরে নিয়ে গেছে, ওদের বিপদের কথাই জানাতে।'

এবারে আমারও মনে হলো, স্যারের কিছু হয়নি তো! সর্বনাশ! আজ বাদে কাল প্রধানমন্ত্রী আসছেন বাঁধের উদ্বোধন করতে, আর এদিকে আমরা...

স্যার বললেন, 'তুমি তোমার চেয়ারটাও টেবিলের কাছে টেনে আন। বাড়তি বাতিটাও জ্বালিয়ে দাও।' কথার শেষে ওঁর কোটের পকেট থেকে কিছু একটা বার করে এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। মনে হলো কোনো হাল্কা ধাতুর তৈরি জিনিস ওটা। দেখতে হাতের মুঠোর মতো। তবে আকারে কিছুটা বড়। বাইরেটা দারুণ পালিশ করা। আমি ঝুঁকে পড়ে জিনিসটা দেখলাম।

স্যার তাঁর অন্য পকেট থেকে বার করলেন একটা বড় আতশ কাচ। সেটা এগিয়ে ধরে বললেন, 'জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে দেখ শঙ্কর। এটা কি বলে তোমার মনে হয়?'

আমি আতশ কাচ দিয়ে জিনিসটা ভাল করে দেখলাম। মনে হলো অতি আধুনিক যে সব ক্ষেপণ অস্ত্রের ছবি কাগজে বার হয়, এটাও সেইরকম দেখতে। তার মানে, আজকাল কতই তো খেলনা বার হয়েছে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের নকল করে, এটাও তেমনি একটা খেলনা ক্ষেপণ অস্ত্র গোছেরই কিছু হবে। তাই বললাম স্যারকে।

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে উনি আমার হাত থেকে কাচটা নিলেন। উঠে নিজের হাতে ঘরের দরজা-জানালাগুলো ভেজালেন। তারপর জিনিসটা টেবিলের একধারে রেখে তার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বাঁ হাতে ওঁর আতশ কাচ। অন্য হাতে তিনি আমায় ড্রইং ইনস্ট্রুমেন্টের বাক্সটা থেকে একটা কম্পাস বার করে ধরলেন। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, 'শঙ্কর, বালখিল্যরা যে মিথ্যা কল্পনা

নয় তার প্রমাণ বোধহয় এখনি পাব আমরা। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে আমরা এমন একটা আশ্চর্য কিছু আবিষ্কার করব যার কথা মানুষ বহু বহু যুগ আগেই ভুলে বসেছিল। যার আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীতে হৈচৈ পড়ে যাবে। তুমি সাবধানে বস। জানি না এখন কি হতে চলেছে। সাবধান।'

ঝুঁকে পড়ে আতশ কাচের মধ্যে দিয়ে দেখে উনি সেই জিনিসটার কোনো একটা জায়গায় সাবধানে খোঁচা মারলেন। অবাক কাণ্ড, আমার চোখের সামনে জিনিসটা সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রাণ পেল! চাপা একটা স্-স্-স্ আওয়াজ তুলে টেবিলের ওপর দিয়ে সামান্য কিছুটা ছুটে গিয়ে হঠাৎ ওটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে উড়তে শুরু করল! চালক ছাড়া কোনো কিছুকে আমি কখনও উড়তে দেখিনি। মনে হলো, ওটা একটা তেমনি চালকছাড়া উড়োজাহাজ—না, না, বোধহয় স্পেসশিপ, নয়তো অত্যন্ত উন্নতমানের কোনো জেটযান। পাগলের মতো ওটা ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। স্যার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় বলতে থাকলেন, 'শঙ্কর, ধর ধর, ওটাকে ধর। কোথাও গুঁতো লাগলে ওটা ধ্বংস হয়ে যাবে। দোহাই তোমার।' বলে নিজেই ওটার পিছনে পিছনে লাফাতে লাগলেন। ওটা ততক্ষণে যে গতি পেয়েছে, সেই গতি খালি হাতে থামান সম্ভব নয়। সে কথা বোধহয় স্যারও বুঝলেন। তবুও কেন যেন ওটার পেছনেই লাফাতে লাগলেন! ওঁর শরীরের ধাক্কায় ভেজান দরজাটা খুলে গেল। একটা পাক খেয়েই সেই আকাশযানটা বাইরে বার হয়ে গেল। শেষ চেষ্টা হিসাবে মরিয়া হয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা ধরতে গেছিলাম। ভাগ্যিস ওটাতে আমার হাত পৌঁছায়নি, পৌঁছালে যে কি হতো তার প্রমাণ পেলাম মুহূর্তেই, ওটা সোজা গিয়ে ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল গাছটার গুঁড়িতে আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-ঝিলিকের সঙ্গে চারদিক কাঁপান শব্দে ওটা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল!

আমাদের হুঁশ ফিরে আসতেই শুনলাম, দূরে অন্য কোয়ার্টারের লোকজনেরা সবাই ছুটে আসছে আমার কোয়ার্টারের দিকে।

স্যার গভীর নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমারই ভুল, যখন বুঝতেই পেরেছিলাম ওটা একটা আকাশযান, তখন ওটা চালু করার আগে আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। আমার ভুলের জন্য এত বড় একটা প্রমাণ নষ্ট হলো।'

আমি বললাম, 'তা নয় হলো, এখন যাঁরা ছুটে আসছেন, তাঁদের কি বলবেন, কি বোঝাবেন?'

উনি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বললেন, 'আমি কিছুই আর ভাবতে পারছি না শঙ্কর। ওদের সামলাও। মনে রাখবে সবকিছু ভীষণ গোপনীয়। যা হোক করে ওদের বোঝাও, কিছুই হয়নি।'

আমি কিছু ভেবে ওঠার আগেই ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের রডরিগস হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল। স্যারকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'আপনার কোনো ক্ষতি হয়নি তো স্যার। আকাশ ছেয়ে গেছে ঘন মেঘে। ভীষণ বৃষ্টি আসছে। এইমাত্র আপনাদের সামনের গাছে বাজ পড়ল। আকাশের যা অবস্থা, আরও বাজ পড়তে পারে।'

ওর কথা শুনে স্বস্তিতে আমি বললাম, 'আকাশের অবস্থা দেখেই স্যার আমার ঘরে ঢুকেছিলেন। তারপরেই তো বাজটা পড়ল। না না, আমাদের কারও কোনো ক্ষতি হয়নি। ধন্যবাদ খবর নিতে আসার জন্য।'

'রাস্তার কিছু আলো নিভে গেছে।' বলল রডরিগস, 'ফেরার সময় সাবধানে ফিরবেন স্যার। টর্চ এনেছেন তো? বেশি দেরি করবেন না, বৃষ্টি নামলে ফেরা অসুবিধা হবে।'

ওরা সবাই চলে গেল। স্যার চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'সবই তো বুঝলে শঙ্কর, এবার তুমি সুশান্তকে খুঁজে বার কর। আকাশের যা অবস্থা, বৃষ্টি নামলে জলাধারে জলের উচ্চতা বাড়লে চারপাশের অনেক জায়গা ডুবে যাবে। সেই জমির ফাটল দিয়ে জল ঢুকে দ্বিতীয় সরোবর, সূর্য সরোবর তার রূপ নেবে। কে বলতে পারে তাতেই ওই বালখিল্য সভ্যতাও জলের তলায় চলে যাবে কিনা! আমার কি মনে হয় জান? যে আকাশযানটা এখুনি আমাদের ভুলে ধ্বংস হলো সেটা চড়েই বালখিল্যদের কেউ এসেছিল সুশান্তকে ডেকে নিয়ে যেতে। ওদিকে ওদের সমস্যা হয়তো এতই গভীর যা ওরা জানাতে চায় আমাদের। তাই এভাবে সুশান্তকে নিয়ে গেছে।'

'আপনি আকাশযানটা পেলেন কোথায়?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সকালবেলা আসছিলাম সুশান্তর খোঁজ নিতে, হঠাৎ ঝোপের মধ্যে ভোরের রোদ পড়ে কি যেন চকচক করে উঠল। তুলে দেখি ওটাকে। তখন থেকেই আমার মনের সন্দেহ গেল। এই যানটাই প্রমাণ যে বালখিল্যরা আছে। আর তারা দারুণ সভ্য, বিজ্ঞানে উন্নত, অতি আধুনিক সব প্রযুক্তিবিদ্যাও তারা জানে। আমাদের কর্তব্য এখন তাদের রক্ষা করা। তোমাকে তাই সুশান্তর খোঁজে এখুনি বার হয়ে পড়তে বলছি। তোমার কাছে পাকা খবর পেয়েই আমি ওপরওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে ওদের রক্ষার ব্যবস্থা করব। শঙ্কর, তোমার ওপরেই বালখিল্যদের ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে। কথাটা মনে রেখ।'

ভোরবেলা হ্যাভারস্যাকে ক'দিনের মতো রসদ নিয়ে আমি রওনা হলাম। প্রজেক্ট সাইটের আশপাশেই গভীর জঙ্গল। হাতের ধারাল অস্ত্রটা দিয়ে ঝোপজঙ্গল কেটে এগিয়ে চললাম। সঙ্গে আমার অস্ত্র আছে। তবে এই জঙ্গলে আজকাল আর হিংস্র প্রাণী নেই। বাঁধের গোলমালে তারা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে।

আকাশের অবস্থা আজ আরও ভয়ঙ্কর। এখন যদিও বর্ষাকাল নয়, তবুও সূর্যের দেখা নেই। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। অসময়ে এসব অঞ্চলে বৃষ্টি নামলে তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। প্রজেক্ট অফিসে কাজ করার সময় তেমন অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে অতীতে। আকাশের অবস্থা দেখে আমি ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বালখিল্যদের ভবিষ্যৎ ভেবেই রওনা হয়েছি। সত্যিই তো, এমন একটা সভ্যতার সর্বনাশ হোক, তা এই পৃথিবীর কেউই চাইবে না। প্রয়োজন হলে চন্দ্র সরোবর প্রজেক্ট পরিত্যাগ করে লুনা নদীর জলধারা মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। তবে এসব চিন্তা আমি করছি, করছেন আমাদের বসও, কিন্তু আমাদের ওপরওয়ালারা? বালখিল্যদের সমস্যা কি ওইসব ওপরওয়ালারা বুঝবেন? তবুও চেষ্টা চালাতেই হবে। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অন্তত আমরা কৈফিয়ত দিতে পারি।

বালখিল্যদের ক্ষতি হচ্ছে বাঁধের জন্য। তাহলে তাদের আস্তানা থাকা উচিত বাঁধের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যেই। যে সব অঞ্চল ভবিষ্যতে জলে ডুবে যাবে না, তেমন কোনো অঞ্চলেই তাদের থাকা উচিত। তাই আমি নদীর উৎসমুখের দিকেই হাঁটা দিলাম। চললাম একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে যতটা যাওয়া যায় তেমনি পথে। অবশ্য কোথাও পথ বলতে কিছু নেই। জল বাড়তে বাড়তে এমন সব জায়গায় পৌঁছেছে যেখান দিয়ে হাঁটাচলা করা খুবই কষ্টের। নদীর জলের ধারা তো আটকে দেওয়া হয়েছে, এখন প্রতিদিনই চন্দ্র সরোবরের জল বাড়ছে। নদীর আশপাশই জলের তলায় চলে গিয়ে সরোবরের বিস্তৃতি বাড়াচ্ছে। এই বিস্তৃতি বেড়ে হবে দুশো বর্গকিলোমিটারের মতো। এত বিরাট এলাকার কোথায় যে বালখিল্যদের আস্তানা, তা খুঁজে বার করা সহজ নয়।

স্যার অবশ্য রওনা হবার আগে জানিয়েছেন,

কলকাতায় খবর পাঠিয়ে তেওয়ারীকে তাড়াতাড়ি এখানে ফেরত আনছেন। সে তো ওখানে গেছে। সে এলে কাজ সহজ হবে। তবে তার এসে পৌঁছাতে আরও ক'দিন লাগবে। তার আগে আমাকে ওই বালখিল্যদের আস্তানা খুঁজে বার করতে হবেই।

মনে মনে অনেক ভেবেছি, পৃথিবীর সব জায়গার সব কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে যখন খবরটা ছাপা হবে, তার সঙ্গে আমার নামটাও থাকবে। এ কি কম সম্মানের কথা!

নদীর অববাহিকা ধরে আমি এগোচ্ছি। আকাশ তেমনি অন্ধকার। আমাকে তাড়াতাড়ি পথ চলতে হচ্ছে। কারণ মুষলধারে বৃষ্টি নামলে আমার খোঁজা একদম বন্ধ হয়ে যাবে।

এদিক ওদিক নজর রেখে আমি নদীর উৎস-মুখের দিকেই এগিয়ে চললাম। ব্লাস্টিংয়ের পাথর ছিটকে পড়েও বালখিল্যদের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে। তাহলে তো তাদের আস্তানা আমাদের সাইট থেকে বেশিদূরে হতে পারে না। জায়গাটা এক-দেড় কিলোমিটারের মধ্যেই হওয়া উচিত! সেই জায়গার খোঁজে নদীর তীর ধরে আমি প্রায় তিন কিলোমিটারের মতো পথ এগোলাম। সেখানে সামনেই জমির বুকে সেই বিরাট ফাটলটা। চন্দ্র সরোবরের সংলগ্ন যে দ্বিতীয় জলাধারটা হবে, যার থেকে সেচের খালগুলো কাটা হয়েছে সেই দ্বিতীয় জলাধারে এই ফাটলপথেই বাঁধের জল ঢুকবে। চারদিকে পাহাড়ঘেরা দ্বিতীয় জলাধারটা আমাদের কাজ নয়। প্রকৃতির বুকে পাহাড়ঘেরা ওই নিচু জমিটার সঙ্গে এই যে জমির ফাটলের যোগ, এটা বহুযুগ ধরেই আছে। আমরা শুধু বাঁধে জল আটকে সেই জল ওই ফাটলের মধ্যে দিয়ে নিচু জমিতে ঢুকিয়ে দেব। তাতেই আমাদের কাজ হবে। চন্দ্র সরোবরে জলের উচ্চতা যতটা ধরা হয়েছে সামনের ওই ফাটলের গভীরতা তার থেকেও অন্তত পাঁচ মিটার বেশি। পাহাড়ঘেরা এই নাবাল জমির বাড়তি সুযোগ নেবে বলেই বাঁধটা হিসাব কষে ঠিক জায়গায় তোলা হয়েছে। জমির ফাটলে জল ঢুকতে শুরু করেছে। তবে তা নিচু কিছু জায়গাকেই ভাসিয়েছে। জমির ফাটলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলাম, জলের বুকে এখানে ওখানে বিশাল সব গাছ অসহায়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো জল বাড়লে জলের তলায়ই চলে যাবে।

কিন্তু কোথাও আমি বালখিল্যদের দেখা পেলাম না। বেলা পড়ে এসেছে। আকাশের অবস্থা ভয়াবহ। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে। কি করব ভাবছি, হঠাৎ মনে পড়ল, বহুদিন আগে সুশান্ত বলেছিল, এই জমির ফাটলের এক কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট গুহার মতো আছে, যার মধ্যে বসে নিরাপদে রাত কাটান যায়। আন্দাজে দিক ঠিক করে আমি সেই দিকেই জোর কদমে এগোলাম। সুশান্ত আগে এদিকে এসেছিল। আমাদের সার্ভে দল যখন দ্বিতীয় জলাধারের জায়গা জরিপ করছিল, সেই দলের সঙ্গে সুশান্ত ক'দিন এখানে ঘুরে গেছে। পাহাড়ি গুহায়ও রাত কাটিয়ে গেছে। আমি কিন্তু কখনও এদিকে আসিনি। তাই মনে যথেষ্ট সন্দেহ গুহাটা খুঁজে পাব কিনা। ক্রমে অন্ধকার ঘনাতে থাকল। বেলা বেশি না হলেও থমথমে আকাশই যেন চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে দিল। আর সেই অন্ধকারে আমি তখনও ঘুরে মরছি। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা বড় পাথরের আড়ালে হ্যাভারস্যাক নামিয়ে রাতের থাকার আয়োজন শুরু করলাম। নদীর তীর ছেড়ে বেশি ভিতরে আসতে পারিনি। বেশি ভিতরে গেলে পথ হারিয়ে মরব। আর প্রজেক্ট সাইটে ফিরে যেতে পারব না।

সামান্য কিছু খেয়ে তাঁবুর মধ্যে গ্রাউন্ড সিট বিছিয়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে পড়লাম। মাথার কাছের ফ্ল্যাপ ডোরটার জিপ টেনে বন্ধ করতে গিয়ে নজরে পড়ল সামনে দূরে দেওয়ালের মতো লম্বা টিলাটার মাথার ওপর দিয়ে যেন আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে। খুব মৃদু আলো। ঘোর অন্ধকারের মাঝে মনে হলো, দেওয়ালের টিলাটার ওদিকে কোথাও কারা যেন কম পাওয়ারের অনেকগুলো বিজলি বাতি জ্বেলেছে। আলো মানেই প্রাণের সাড়া। এখানে আর অন্য কোন প্রাণী আলো জ্বালাবে! তাহলে কি আমি বালখিল্যদের আস্তানার হদিস পেলাম!

হ্যাভারস্যাক গুটিয়ে তুলে নিলাম পিঠে। হাঁটা দিলাম ওই আলোর দিকে। কি জানি কি দেখব ওই টিলাটার ওপরে উঠে!

হাঁপাতে হাঁপাতে টিলার মাথার দিকে উঠতে লাগলাম। কতগুলো ছড়ানো পাথরের মাঝ দিয়ে শেষ কয়েক মিটার উঠে সামনের দিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত হলাম। এ আমি কি দেখছি! সামনের টিলার ঢালের নিচেই চারদিকে পাহাড়ঘেরা এক অধিত্যকায় কারা যেন সারে সারে হাজার খুদে বিজলির বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে!

এ যেন হাজার বিজলি বাতির নকশা। এই সারি সারি জ্বালা আলোই কি তাহলে বালখিল্যদের সেই অজানা শহর! আরও কিছুটা নেমে থমকে দাঁড়ালাম, না কোনো সন্দেহ নেই এই সেই আস্তানা। ওই তো সরু সরু পথের দু পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নানান আকারের বাড়ি। এ তো বিশাল এক খেলনা শহর! দূরের দিকে তাকালেই বোঝা যায় অধিত্যকার অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে শহরটা। কে বলতে পারে এই শহর ছাড়া অন্য কোথাও এদের আরও শহর আছে কিনা!

আরও কিছুটা নামতেই বুঝলাম, আকাশ থেকে বোমা ফেললে যেভাবে শহর নগর ধ্বংস হয়, এই শহরের অবস্থাও অনেকটা তাই। আমাদের তেওয়ারী এখান থেকে ফিরে গিয়ে সঠিক বর্ণনাই দিয়েছিল। আমাদের বস তা বিশ্বাস করেননি। মনে মনে হিসাব কষে দেখলাম, আমাদের বাঁধের থেকে এই শহরের দূরত্ব ওড়া-পথে এমন কিছুদূরে হবে না। প্রতিটি ব্লাস্টিংয়ের পাথর ছিটকে এসে পড়েছে এই শহরের ওপরে। তাতেই এমন বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটেছে।

এখন আমার কাজ হবে বালখিল্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। তারপর খোঁজ নেওয়া সুশান্তর। সেও কি এসেছে এখানে!

নিচে নেমে শহরের ধারে এসে দাঁড়ালাম আমি। কি করব তা ভেবে না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'সুশান্ত, সুশান্ত, তুমি কি এখানে কোথাও আছ? সাড়া দাও!'

আমার চিৎকার বোধহয় আশপাশের বালখিল্যদের ভয়ের কারণ হলো। হঠাৎ দেখলাম আলো জ্বালা পথের ওপর দলে দলে ছেলেমেয়ে বাচ্চা-বুড়ো জোয়ান বালখিল্যরা এসে ভিড় করল। তাদের কারও কারও গলায় আতঙ্কের চিৎকার। ওদের চিৎকার থামার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মাঝ দিয়ে কতগুলো কি যেন ছুটে এল বাঁধানো পথ দিয়ে। ওগুলো যে চাকাওয়ালা গাড়ি, তাতে সন্দেহ নেই। চারদিক থেকে ছুটে আসা গাড়িগুলো আমাকে ঘিরে ধরল। আমি কিছু ভেবে ওঠার আগেই দেখলাম, আমার চিবুক-সমান উঁচু দিয়ে সেই স্যারের আনা অনেকগুলো আকাশযান আমাকে ঘিরে চক্কর দিতে লাগল!

বেশ ভয়ই পেলাম আমি। নিচের গাড়িগুলোর আক্রমণ সামলাতে গেলে আকাশযানগুলো আমার ওপরে আছড়ে পড়বে। পড়ার ফলে যে কি হবে তা তো আমার দেখা আছে। আমি ভয়ে আত্মসমর্পণ করার জন্য দুহাত মাথার ওপরে তুলে ধরলাম। চাপা গলায় বললাম, 'আমি তোমাদের বন্ধু। এসেছি আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর খোঁজে। তার খবর কি তোমাদের জানা আছে?'

নিচের গাড়ি থেকে একজন পথে নামল। হঠাৎ কানে ভেসে এল, সে বলছে, 'তু-উমি যো-অদি বন্-ধুউ হ-অও তা-হঅলে, বাঁ-আ দিই-কের পাথ-থরের ঘঅ-রে এ-র দি-ইকে চ-অলও।'

বেশ বুঝতে পারলাম ওর হাতে যা রয়েছে তেমন কিছু নিয়েই তো আজকাল আমাদের দেশের নেতারাও পথেঘাটে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।

বাঁ দিকে তাকিয়ে একটা বিশাল পাথরের চাঁই দেখতে পেলাম। সেদিকে একটু এগোতেই নিচের গাড়িগুলো আর শূন্যে চক্কর- খাওয়া আকাশযানগুলো সবই অদৃশ্য হয়ে গেল। পাথরের চাঁইয়ের দিকে কিছুটা এগিয়েছি, হঠাৎ দেখি আড়াল থেকে টলতে টলতে বার হয়ে এল সুশান্ত!

সুশান্ত আমাকে দেখেই খুশি হয়ে বলল, 'তুমি এসেছ, ভাল করেছ। এখুনি তোমাকে ফিরে যেতে হবে আমাদের ক্যাম্পে।'

ওর কথা জড়ানো। তার মানে ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই ফিরে যেতে পারেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ফিরে না হয় আমি যাব, কিন্তু তোমার ব্যাপার কি? এমন উস্কোখুস্কো চুল, কথা জড়ানো, কি হয়েছিল তোমার?'

ও যেন হাসার চেষ্টা করল, বলল, 'আমার ঘোর এখনও কাটেনি। কাটতে হয়তো আরও ক'দিন সময় লাগবে। ও-কথা থাক। সকালে হেঁটে গিয়ে দেখে এসেছি এদের কি সমস্যা। কেন এরা এত চিন্তায় পড়েছে। শঙ্কর, তুমি জান না, এরা ইচ্ছা করলেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্ষেপণ অস্ত্র ছুড়ে আমাদের বাঁধ উড়িয়ে দিতে পারে। তা কিন্তু এরা করতে চায় না। আমাদের বারবার সুযোগ দিচ্ছে, এদের সঙ্গে সমঝে বুঝে চলার। তুমি তো আমাদের বাঁধের দ্বিতীয় ক্যাচমেন্ট এরিয়ার কথা শুনেছ। সরকার যার নাম দিতে চান সূর্য সরোবর। বালখিল্যদের রাজত্ব এই সরোবরের নিচু জমির মধ্যেই পড়ে। তুমি তো জান চারদিকে পাহাড়ঘেরা একটা নিচু অধিত্যকাকেই সূর্য সরোবরের স্থান করা হয়েছে। যাতে জল ঢুকবে আপনা থেকেই জমির গায়ের একটা বিশাল ফাটল দিয়ে। বাঁধে জল বাড়লেই আপনা থেকে এই অধিত্যকা জলে ডুবে যাবে। ডুবে যাবে পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতা, যা কয় কল্প আগেই এই পৃথিবীতে তাদের রাজ্যবিস্তার করেছিল। আমি কাল শরীরের এই অবস্থা সত্ত্বেও জমির ফাটলের ধার পর্যন্ত গেছিলাম। দেখে এসেছি খাদ দিয়ে হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করেছে। এখনি যদি কিছু না করা হয় তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'আমিও তো আজই কিছুক্ষণ আগে জমির সেই ফাটলের ধার পর্যন্ত গেছিলাম। তুমি যা বললে, তা সত্যি, জল ঢুকছে ফাটলে। এক্ষুণি কিছু করা দরকার।'

সুশান্ত বলল, 'তাহলে এস আমার সঙ্গে এদের সভাগৃহে, সেখানেই আমি আছি। সেখানেই তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যাও।'

'তোমার অসুখটা কি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ও হাসল। বলল, 'সে কথা পরে শুনবে। এখন একটু বিশ্রাম কর। বালখিল্যরা আমার খাবার যোগান দেবার জন্য বিশাল একটা বালখিল্য লাইন চালু করে দিয়েছে। ওরা সারাক্ষণ, সারাদিন সারারাত ধরে আমার জন্য খাবার এনে এক জায়গায় জড়ো করছে। ওই দেখ সেই লাইন।' বলে ও পাথরের চাঁই-এর একপাশটা দেখাল।

অবাক আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম। যত দূর দেখা যায় বালখিল্যদের একটা লাইন সামনের রাস্তা ধরে চলে গেছে শহরের দিকে। সেই লাইনে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাত হয়ে খুদে খুদে খাবারের টুকরোগুলো এসে ঢুকছে একটা যেন গুহার মধ্যে।

সুশান্ত বলল, 'এটা একটা পাথুরে গহ্বর। এরা কেটে খোদাই করে ভিতরটা রিশাল ঘরের মতো করেছে। এখানে দুজনেই আরামে বসতে পারব।'

ওর পেছন পেছন লাইনের বালখিল্যদের বাঁচিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। হ্যাভারস্যাকটা একপাশে নামিয়ে রেখে পা ছড়িয়ে বসলাম।

সুশান্ত বলল, 'নাও, তোমার বাঁ দিকে যে খাবার আছে তা খাও। ও বোধহয় আটা জাতীয় কিছুর তৈরি। দারুণ খেতে।'

আমি বললাম, 'রাতের খাওয়া আমি খেয়ে নিয়েছি। আমি তোমার জন্য টিন ফুড এনেছি। পোশাক এনেছি। ওষুধও আছে কিছু। সে সব তুমি আপাতত তোমার জন্য রাখ। এখন বল, ফিরে গিয়ে স্যারকে আমি কি বলব?'

আমার কথা শুনে একটু ভাবল সুশান্ত, তারপর বলল, 'জানি না বালখিল্যদের মনে কি আছে। আমি এদের যতদূর বুঝেছি, এরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না। এরা প্রকৃতির ভারসাম্যও নষ্ট করার কথা চিন্তা করে না। এদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির তুলনা হয় না। প্রযুক্তিবিদ্যায় এরা মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে। শঙ্কর, তুমি জান না এরা লুনা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে প্রতিদিন বাঁধের গায়ে যে জল জমছে তার সঠিক হিসাব রাখছে। এরা জানে ওই জমির ফাটলটার কথা। জানে ওখান দিয়ে জল ঢুকলে ওদের সমূহ ক্ষতি, কারণ ওদের গোটা রাজত্বটাই তো সূর্য সরোবরের নিচু জমির বুকে। এরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের বহুবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তেওয়ারীকে নিয়ে এসেছিল এখানে। তার ফলে ওদের শহরের বুকে পাথর পড়া বন্ধ হয়েছিল। ওরা ভেবেছিল মানুষ নিশ্চয়ই ওদের অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছে। সুতরাং যোগ্য ব্যবস্থাই নেওয়া হবে, যাতে ওদের কোনো বিপদ না হয়। কিন্তু তেওয়ারীর কথা আমাদের বস বোধহয় বিশ্বাস করেননি। না করার মতো কথাই বটে। তুমি জান, ব্লাস্টিংয়ের দিক বদল হওয়াতেই এদের এখানে পাথর পড়া বন্ধ হয়েছিল। তেওয়ারীর বলার জন্য নয়। সে কথাও এরা ক'দিন পরেই বুঝতে পেরেছিল, বাঁধের গায়ে জল বাড়ার ব্যাপারটা দেখে। তাই অনেক চেষ্টা করে আমাকে এখানে ধরে এনেছিল ওরা। কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে পড়াতে আর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনি। এরাও তাই আর মানুষের কাজের উপর ভরসা রাখতে পারেনি। নিজেরাই এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যা শেষ পর্যন্ত আমাদের সর্বনাশ ঘটাবে।'

অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা কি করতে চায় তা কি তুমি জান?'

'হ্যাঁ, এরা আমাকে গতকালই ওদের শেষ কথা জানিয়েছে। বলেছি তো, এদের প্রযুক্তি-বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান। আমাকে এরা এখান থেকে কিছুদূরে এক জায়গায় নিয়ে গেছিল। সেখানে ওরা কিছু যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। সেগুলো আর কিছুই না, প্রচণ্ড শক্তিশালী ক্ষেপণ অস্ত্র। প্রতিটি অস্ত্রের মাথায় এরা তেমনি শক্তিশালী বিস্ফোরক লাগিয়েছে। এই অস্ত্র, ওরা অবশ্য অস্ত্র কথাটার মানেই জানে না কারণ এদেশে যুদ্ধ বা হিংসা করার মতো কোনো কিছু নেই, এ দিয়ে শুধু ওরা আশপাশের পাহাড় ফাটায়। তাও ওরা করে যখন কোথাও ধস নামার উপক্রম হয়, তখন। ওদের প্রধান আমাকে বলেছে, আর মাত্র কটা দিন ওরা দেখবে। বাঁধের জলের উচ্চতা যদি বেড়েই চলে তবে ওই ক্ষেপণ অস্ত্র চালিয়েই ওরা আমাদের বাঁধ উড়িয়ে দেবে। এদের যা ক্ষমতা, তাতে যে একাজ ওরা সহজেই করতে পারবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমাকে এখুনি ফিরে গিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে এমন ব্যবস্থা যাতে বাঁধের জলের উচ্চতা একটা

নির্দিষ্ট সীমার ওপরে না ওঠে।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো আমাকে এখনি ফিরতে হয়। তুমি বল, আমি ফিরে গিয়ে বসকে কি বলব?'

'প্রথমেই বলবে, স্লুইস গেট খুলে বাঁধের জলের উচ্চতা অন্তত দশ মিটার কমিয়ে দেন যেন। জলের উচ্চতা আপাতত আর বাড়তে দেন না যেন। তারপর লোকজন পাঠিয়ে এদিকের জমির ফাটলের মুখে পাকা একটা বাঁধ তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। সেচের খালের জল সেই বাঁধ থেকেই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছাড়ার ব্যবস্থা থাকবে। সরকারকে সূর্য সরোবরের চিন্তা ছাড়তে হবে। কারণ তাতেই কেবল বালখিল্য সভ্যতা রক্ষা পাবে।' কথাগুলো বলে সুশান্ত আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, 'এ আর এমন কি শক্ত কাজ? বালখিল্যদের সভ্যতার কথা চিন্তা করে এ কাজ সবাই করবে। তা হলে আমি আর এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করব না। আমি চলি। ওদিকে আকাশের অবস্থাও ভয়ঙ্কর। যে কোনো মুহূর্তে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।'

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন দুজন বালখিল্য। তাদের মাঝে ক'জনের চেহারা দেখলেই মনে হয় তারা উঁচু স্তরের বালখিল্য। হয়তো এরাই শহরের প্রধান।

সুশান্তও বলল, 'সামনের জন হলো অমরাপুরীর প্রধান পুরুষ নমুচি আর সঙ্গে রয়েছে মন্ত্রী সহস্রলোচন। দুজনে এসেছে বোধহয় তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।'

ওরা সকলেই আমাদের পাশের ছোট্ট সমতল জায়গাটায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লেন। প্রধান পুরুষ নমুচিই এগিয়ে গিয়ে সরু একটা কাঠির মতো জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমাকে আমরা আমাদের মাঝে স্বাগত জানাচ্ছি। তুমি আমাদের জন্য কি সংবাদ এনেছ, তা কি জানতে পারি?'

উনি মাইকের সামনেই কথাগুলো বললেন। সারা ঘর গমগম করে উঠল।

আমি বললাম, 'আমাদের প্রধান আপনাদের সমস্যা যে কি তা জানতেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সমস্যা যে কি তা আমি বুঝেছি। আমি তাই এখুনি ফিরে যাচ্ছি। গেলেই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রধান পুরুষ দারুণ ক্ষোভে বললেন, 'আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাকে নিয়ে মানুষদের তিনজন প্রতিনিধি এখানে এসেছে। দেখেছে সবই, তাও এখনও কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হলো না!'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'তেওয়ারী এসেছিল, তার কথা ঠিক বোঝা যায়নি বলেই কোনো ব্যবস্থা এতদিন নেওয়া হয়নি। তবে নিশ্চিন্ত হন। এবারে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান পুরুষ বললেন, 'তার আর প্রয়োজন হবে না। আমাদের আবহাওয়া যন্ত্র জানিয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড়জল ঝাঁপিয়ে পড়বে শহরের বুকে। আবহাওয়া যন্ত্র কিন্তু আরও একটা ভয়ঙ্কর সংকেত দিয়েছে, লুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের আশেপাশে বা সেখানেই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে! জল বাড়ার ব্যাপারটা তুমি বোঝ তো?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'কাল ফাটলের মুখটা আমি দেখে এসেছি। জল ঢুকতে শুরু করেছে দেখেছি।'

'তা যদি দেখেই এসে থাক, তাহলে তো বুঝবে এখুনি আমাদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে আকাশছোঁয়া জলের ঢেউ এসে আমাদের সব শেষ করে দেবে। তা তো আমরা হতে দিতে পারি না।'

'কি ব্যবস্থা আপনারা নিতে চান?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'তোমাদের দেওয়া লুনা নদীর বুকের বাঁধটা উড়িয়ে দিতে চাই। লুনা নদীর জলের স্রোত আপন পথেই ফের যাতে বয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে চাই। তাতেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

'আপনারা বাঁধটা উড়িয়ে দিতে চান?'

'হ্যাঁ। তার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করা হয়েছে।' বললেন প্রধান পুরুষ।

সুশান্ত বলল, 'আমাদের আর একটা সুযোগ যদি দাও তো মনে হয়, বাঁধ ধ্বংস করতে হবে না।' কথাগুলো ও যেন মিনতি করেই বলল।

'কি সুযোগ চাও তোমরা?' মন্ত্রী সহস্রলোচন জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার বন্ধু শঙ্কর এখুনি ফিরে যাবে আমাদের ক্যাম্পে। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমার আর এক বন্ধু জ্যামঘ। তাহলেই সে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে ক্যাম্পে। সেখানে পৌঁছেই সে লুনা নদীর জলের উচ্চতা কমিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেবে। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার বেশি জলাধারে জল রাখা হবে না। তাতেই তোমাদের আর কোনো ভয় থাকবে না। পরে ফাটলের মুখটা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দিলেই তো সব সমস্যার সমাধান হবে।'

মন্ত্রী সহস্রলোচন কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'আমরা মানুষের কথায় আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। তারা কোনো ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে মিছিমিছি দেরি করে। তবে তুমি যখন বলছ, আমরা শেষ সুযোগ দিতে পারি।'

সুশান্ত বলল, 'তাহলে বন্ধু জ্যামঘকে এখানে ডাকা হোক।'

একজন যুবক বালখিল্য এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলেন, বললেন, 'আমার মনে হয় আমরা সবাই এখন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত ধ্বংসযন্ত্রাগারে যাই। সেই পথেই তো মানুষটিকে ফিরতে হবে। সে দেখে যাক আমরা কি করতে পারি। প্রয়োজনে কি করব?'

একটু ভেবে প্রধান পুরুষ বললেন, 'তাই চল। আমরা প্রস্তুত থাকব। মানুষের কাছ থেকে সময়মতো সংবাদ না পেলেই আমাদের কাজ আমরা করব।'

আমরা সবাই বাইরে বার হয়ে এলাম। সেই যুবক বললেন, 'আমরা আমাদের স্যন্দনে যাত্রা করছি। পুষ্পক রথ আসছে, তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।'

বাইরের আকাশের অবস্থা দেখে আমি ভয় পেলাম। ঝড়বৃষ্টি এলো বলে। আমি কি সময় পাব তার মধ্যে ফিরে গিয়ে খবর দিতে? মনের ভয়ের কথাটা সুশান্তকে বললাম। ততক্ষণে বালখিল্যদের প্রধানরা সবাই চলে গেছেন। সুশান্ত বলল, 'চিন্তা করার কারণ নেই। এরা প্রযুক্তিবিদ্যায় এতই এগিয়েছে যে জ্যাম সঙ্গে করে ওয়াকি টকি গোছের কিছু নিয়ে যাবে। স্যার স্লুইস গেট খুলে দিলেই সে ওখান থেকেই তা এদের জানিয়ে দেবে। তা ছাড়া ক'জন পুষ্পক চালককেও নয় তোমাদের সঙ্গে পাঠাতে বলব। তারাও খবর নিয়ে আসতে পারবে।'

মনে মনে খুশি হলাম আমি। যাক তাহলে দুপক্ষের মাঝে একটা সমঝোতা যে হবে তাতে আর আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

পুষ্পকের দেখানো পথে আমরা হাজির হলাম সেই ভয়ঙ্কর স্থানে। এই জায়গাটা একটা বিশাল মাঠের মাঝে। গোটা চার-পাঁচ বিরাট গম্বুজওয়ালা বাড়ি। উঁচু আমাদের প্রায় কোমর-সমান। আমরা পৌঁছাতেই প্রধান পুরুষের নির্দেশে কারা যেন কোথায় কি করল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে সব কটা গম্বুজের মাথার ওপরের গোল ঢাকনাটা দুদিকে সরে গেল। আমরা দুজনে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, তার প্রত্যেকটার মধ্যেই রয়েছে সারি দিয়ে সাজানো ক্ষেপণ অস্ত্র। অস্ত্রগুলো প্রত্যেকটাই ক্ষেপণ মঞ্চে চাপান। পাশেই দেওয়ালের গায়ের তাকে পরপর থাক দিয়ে রাখা ক্ষেপণ অস্ত্রের সার।

কোথায় আবার কে যেন কি নির্দেশ দিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপণ মঞ্চ তার দিক পরিবর্তন

করতে শুরু করল। তার মানে এখান থেকেই এরা এই ক্ষেপণ অস্ত্র যেদিকে খুশি পাঠাতে পারে। সুশান্ত আগেই বলেছে, এই অস্ত্রে ওরা পাহাড়ের গায়ের আলগা পাথর খসিয়ে ফেলে যাতে আচমকা ধস নেমে কোথাও কোনো ক্ষতি না করতে পারে। যে অস্ত্রে ওরা পাহাড় ভাঙতে পারে তার কয়েকটা যে অনায়াসেই আমাদের বাঁধটা উড়িয়ে দিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই!

আবার কোনো গোপন নির্দেশে ক্ষেপণ মঞ্চের মুখ ঘুরে আগের অবস্থায় এল। মাইকে কে যেন বলল, 'আমাদের যন্ত্রের মুখ এখন মানুষের গড়া লুনা নদীর প্রাচীরের দিকে করা আছে। আমরা নির্দেশ পেলেই নদীর প্রাচীর ধ্বংস করতে পারব।'

প্রধান পুরুষ তাঁর দলবল নিয়ে আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ধ্বংসযন্ত্র-ঘরের ছাদগুলো আবার আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেল। আমি ওদের সামনে গিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'প্রধান পুরুষ, আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর বুকের জলের উচ্চতা নামিয়ে দেওয়া হবে। বৃষ্টি হলেও যাতে আচমকা জলের উচ্চতা না বাড়ে তার ব্যবস্থাও করা হবে। আপনাদের ক্ষেপণ অস্ত্রগুলোর ব্যবহার বন্ধ রাখুন। তার আর প্রয়োজন হবে না।'

প্রধান পুরুষ বললেন, 'সাধু তোমার প্রস্তাব। এই তো হওয়া উচিত সভ্য মানুষ ও বালখিল্যদের উদ্দেশ্য। বাঁচব, বাঁচতে দেব, এই তো নীতি। আমরা তাতেই বিশ্বাস করি। তাহলে তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। মানুষের বন্ধু আমাদের জ্যামঘই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সে তোমারও বন্ধু হবে।'

সুশান্তর বন্ধু জ্যামের সঙ্গে আলাপ হলো। আমিও তাকে আমার কাঁধে তুলে রওনা হলাম। পিঠের বোঝা ছেড়ে এসেছি। এখন জোর কদমে চলতে হবে। যাতে ঝড়বৃষ্টির আগে প্রজেক্ট সাইটে পৌঁছাতে পারি। জ্যাম সঙ্গে ওদের কথা বলার যন্ত্র নিয়েছে।

চলতি পথে জ্যাম বলল, 'মানুষদের আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তারা এক একজন এক একরকম। এই যে তোমরা এত ভাল, অথচ তোমাদের প্রধান, তারা কি কিছুই জানে না? প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করলে যে ভবিষ্যতে মানুষেরই কি ভীষণ ক্ষতি হবে তা তো তাদের বোঝা উচিত। আমাদের ছোট ছোট শিশুরাও তো এই সহজ কথাটা জানে। যাদের শিশুদের মতো জ্ঞানবিদ্যা নেই তারা কি করে তোমাদের প্রধান হয় বুঝি না। তোমাদের ভবিষ্যৎ তাহলে কি?'

বন্ধুকে খুঁজতে চেষ্টা করলাম

লজ্জায় আমি ওর কথার কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। বললাম, 'ডান দিকে যাব, না বাঁ দিকে?'

'তুমি মোটেও জোরে হাঁটতে পার না।' বলল জ্যাম। 'এভাবে হাঁটলে ঝড়ের আগে আমরা অর্ধেক পথও শেষ করতে পারব না। তুমি কি দৌড়াতে পার না?'

'দৌড়!' অবাক হয়ে আমি বললাম, 'আমার তো অত দম নেই। তেমনভাবে চললে আমি বেদম হয়ে পড়ব। এই তো বেশ জোরে চলছি। এতেই হবে।'

কথার শেষে আমি আমার সাধ্যমতো হাঁটার বেগ বাড়ালাম। জ্যাম আর কোনো কথা বলল না। তবে বুঝতে পারলাম, আমার কাঁধের ওপর ও ছটফট করছে। হঠাৎ চারপাশের গাছের পাতায় আচমকা সরসর শব্দ উঠল। বাতাসেই পাতাগুলো অমন আওয়াজ তুলল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের ওপর জ্যাম আর্তনাদ করে উঠল, 'বন্ধু, বন্ধু, ঝড় এসে গেল। নামাও, আমাকে নামাও তাড়াতাড়ি।' ওর কথাগুলো বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে ডুবে গেল। উঁচু গাছের ডালপালাগুলোও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণভাবে দুলে উঠল। ঝরঝর শব্দ তুলে নিচের ঝরা পাতাগুলো উড়তে শুরু করল। জ্যামের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝোপজঙ্গল গাছপালা তোলপাড় করে প্রচণ্ড বেগে বাতাস ধেয়ে এল। আমি আমার হাত কাঁধের কাছে নিয়ে যাবার আগেই বন্ধু জ্যাম হাওয়ার তোড়ে উড়ে গেল। ওর ক্ষীণ আর্তনাদ যেন কানে এসেছিল আমার। ঝড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'বন্ধু, বন্ধু, তুমি কোথায়?'

প্রচণ্ড ঝড়ের গর্জনের মাঝে অন্য আর কোনো সাড়া জাগেনি। আমি পাগলের মতো নিচু হয়ে ওই ঝড়ের মাঝেই বন্ধুকে খুঁজতে চেষ্টা করলাম। অসম্ভব, তাকে আর পাওয়া যাবে না। একটা অপরাধবোধ আমাকে পেয়ে বসল।

কিন্তু আমাকে আর বেশিক্ষণ চিন্তা করতে হলো না, মুষলধারে বৃষ্টি নামল। প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসা বাতাসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে আকাশভাঙা বৃষ্টি চারদিক অন্ধকার করে দিল। ভিজে আমি কাঁপতে লাগলাম। কোনদিকে যে যাচ্ছি সে বোধ আর আমার ছিল না। বাতাসের টানই যেন আমাকে পথ দেখাচ্ছে। বনের গাছপালার ডাল এদিকে ওদিকে ভেঙে পড়তে লাগল। যে কোনো মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। পায়ের নিচেও জলের স্রোত বয়ে চলেছে। ডাঙা জমিতেই যখন এত জলের স্রোত, তখন লুনা নদীর বুক বেয়ে তো বন্যার স্রোত ধেয়ে আসবে! বালখিল্যরা তাদের ক্ষেপণ অস্ত্র ছুঁড়ুক, ধ্বংস করুক লুনা নদীর বাঁধ। তা ভিন্ন তাদের আর বাঁচার পথ নেই। মানুষের হাতে গড়া বাঁধই আজ মানুষের আদিম সভ্যতাকে ধ্বংস করতে বসেছে। হায় রে!

হঠাৎ যেন মনে হলো আমার সামনে একটা পাহাড়ি দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে তো আমি আগেও একবার এসেছি। তবে তো আমি আমাদের ক্যাম্প সাইটের দিকে না গিয়ে আবার ফিরে চলেছি বালখিল্যদের রাজত্বের দিকে! তাহলে আমি নিজে গিয়েই ওই ক্ষেপণ অস্ত্র চালিয়ে দিয়ে মানুষকে বাঁচাব এক ভীষণ কলঙ্কের হাত থেকে।

প্রাণপণ শক্তিতে আমি ওই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলাম। আমাকে এখুনি পৌঁছাতে হবে সেই ধ্বংসযন্ত্র ঘরের সামনে। বোঝাতে হবে ওখানকার যান্ত্রিকদের আমি কিছুই করতে পারিনি। এখনই ওদের ক্ষেপণ অস্ত্র চালাবার সময় এসেছে। লুনা নদীর এই বাঁধ ভাঙলে যে ক্ষতি হবে এই পৃথিবীর তার থেকেও কোটিগুণ বেশি ক্ষতি হবে বালখিল্য সভ্যতা ধ্বংস হলে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঝড়জলের মধ্যেই আমি টিলাটার চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। সামনে সবকিছু অন্ধকার, প্রচণ্ড জলের স্রোত নেমে চলেছে টিলাটার গা বেয়ে। নিচের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টির ধারায় সবকিছু ঝাপসা। তা হোক, বালখিল্যরা এখনও ওদের ক্ষেপণ অস্ত্রগুলো কাজে লাগাচ্ছে না কেন? ওরা কি জ্যামের কাছ থেকে আশার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে! না, না, জ্যাম নেই, সে আর কোনো খবর শোনাবে না। আমি ওই প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝেই প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম, 'দেরি কর না আর, আর দেরি কর না।' আমার কথাগুলো ঝড়ের শব্দে হারিয়ে গেল। পড়তে পড়তে আমিও জলের স্রোতের সঙ্গে নিচের দিকে নেমে চললাম। এতক্ষণে চোখে পড়ল আবছা আলোর সারি। ওই তো শহরের আলো। তাহলে এখনও আশা আছে সবকিছু রক্ষা করার। হুড়মুড় করে পা পিছলে আমি অনেকটা নিচে পড়ে গেলাম। ভীষণ ব্যথা পেয়েছি। কিছুক্ষণ আমি তাই নড়তে পারলাম না। কিন্তু ওরা ক্ষেপণ অস্ত্র ছুঁড়ছে না কেন? ওরা কি এখনও মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখেছে! এ ভুল ওরা করছে কি করে!

হঠাৎ সামনের দিকে নজর গেল। ওটা কি! ঘোর অন্ধকারের মাঝে আরও জমাটবাধা একটা বিশাল অন্ধকার যেন সবকিছুকে চাপা দিতে দিতে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। ওর সামনে পড়ে আলোগুলো অদ্ভুত আওয়াজ তুলে সার বেঁধে নিভে যাচ্ছে। কি ওটা ওভাবে সবকিছুকে গ্রাস করতে করতে এগিয়ে আসছে, কি ওটা! আতঙ্কে আমার শরীর কেঁপে উঠল। জলস্তম্ভ! দিকজোড়া এক জলস্তম্ভ ছুটে আসছে সবকিছু গ্রাস করতে! কিছু ভাবার আগেই অদ্ভুত একটা আওয়াজ উঠে নিচের অনেকটা জায়গা জুড়ে বিদ্যুতের পরপর কটা ঝিলিক উঠল। তারপর সমস্ত ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল। শহরের সমস্ত আলো নিভিয়ে জলস্তম্ভ স-স-স আওয়াজ তুলে ছুটে এসে আছড়ে পড়ল টিলার গায়ে। এত দূর জল ছিটকে উঠল যে বৃষ্টির ধারাকে ছাপিয়ে নতুন জলের ধারা ঝরে পড়ল আকাশ থেকে। কোনো কিছু ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই নিচের অধিত্যকা জুড়ে সূর্য সরোবর তার সম্পূর্ণ রূপ নিল মানুষের কষা হিসাবমতোই। আমি শুধু স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বালখিল্যদের সভাগৃহ, সেই পাথরটাও আর দেখা গেল না। তার মানে, সূর্য সরোবরের জলের গভীরতা এখন অন্তত কুড়ি মিটারের মতো। সেই গভীর জলের তলায় বালখিল্যদের এই শহর শুধুই নয়, অধিত্যকা জুড়ে ওদের যে সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল, তার সবটাই এখন জলের তলে। আমরা মানুষরাই আমাদের সামান্য লাভের কথা ভেবে একটা সভ্যতার অস্তিত্ব চিরতরে মুছে ফেললাম। সবকিছু শেষ হয়ে গেল।

তখনি মনে পড়ল সুশান্তর কথা। সর্বনাশ, ও – ও কি তাহলে জলের তলায় ডুবে গেছে! প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে নজর পড়ছিল না। এদিক ওদিক কোথাও কারও সাড়া ছিল না। আমি শুধু অসহ্য যন্ত্রণায় সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সব দোষ আমার! সব দোষই আমার! কেন আমি দৌড়ে গেলাম না! কেন আমি বালখিল্যদের বাধ্য করলাম না তাদের ক্ষেপণ অস্ত্র চালাতে! কি ক্ষতি হতো চন্দ্র সরোবরের বাঁধ ভেঙে গেলে! কেন আমি কিছুই করলাম না!

তখনি নিচের দিকে কেমন যেন আওয়াজ উঠল। অন্ধকারের মাঝে কি যেন ভীষণভাবে নড়াচড়া করতে লাগল। আমি ঝুঁকে পড়ে প্রাণপণে চেঁচালাম, 'কে, কে, সুশান্ত!'

টলতে টলতে সুশান্ত উঠে এল পাশে। ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে বলল, 'আচমকা বিশাল উঁচু জলস্রোত ধেয়ে এসে সবকিছু ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিল শঙ্কর। বালখিল্য সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। আগামী দিনে তোমার আর আমার, কারও কথা দুনিয়ার কেউই বিশ্বাস করবে না। শুধু মানুষের ভুলে, মানুষের দূরদৃষ্টির অভাবে এত বড় সর্বনাশ ঘটতে পারল! শেষ হয়ে গেল পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতা! কে দায়ী এর জন্য বলতে পার শঙ্কর?'

আমি বললাম, 'শান্ত হও সুশান্ত, শান্ত হও।'

এ ছাড়া অন্য আর কি বলার আছে আমার! আমরাই তো অবিবেচক! আমরাই তো শুধু বর্তমানের কথা ভাবি। আমাদের কাছে অতীত নেই, নেই ভবিষ্যৎ। আর আমাদের এই বর্তমান ভাবনার মাঝেও রয়েছে চূড়ান্ত অসঙ্গতি। আমরা তাই তো প্রকৃতিকে নষ্ট করছি!

বৃষ্টি থেমে গেল। ঝড়ও থামল। আকাশ বোধহয় পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা দুজনে সেই উঁচু জায়গাটাতে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। সামনে দিগন্তজোড়া চন্দ্র সরোবর প্রজেক্টের দ্বিতীয় সরোবর—সূর্য সরোবর। ভবিষ্যতে আমাদের সরকার এখানে একটা ট্যুরিস্ট সেন্টার করবে। ইয়েটিং ক্লাব, সুইমিং ক্লাব থাকবে। স্পিড বোটে চড়ে চারপাশ ঘোরা যাবে। ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট নাকি জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করা আরম্ভ করে দিয়েছে। সে পথ দিয়েই সরকারি গাড়ি রকেটের গতিতে ছুটে আসবে ট্যুরিস্টদের নিয়ে। কেউই তাদের তখন জানতে পারবে না সূর্য সরোবরের নিচে কি আছে।

মন্ত্রী এসে এবারে বোতাম টিপে জেনারেটার চালু করে দেবেন। চারদিকে হাততালি পড়বে। কেউই কিন্তু তখন এই ভয়ঙ্কর দুঃখের কথা জানবে না।

'চল ফেরা যাক, সুশান্ত।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, চল।' উত্তরে বলল সুশান্ত। ও যেন কেমন উদাস হয়ে গেছে।

পিছনে শুধু জল আর জল। যেন বিশাল এক সাগর আমাদের ঘিরে। আমরা সেই সাগর পিছনে রেখে ফেরার পথ ধরলাম। আমাদের কাজ শেষ।

ছবিঃ বিজন কর্মকার

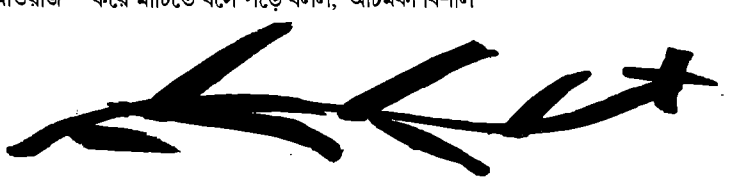

উপরে উঠছে বেগিন আর লাফায়েল

নরক থেকে ফিরে

রাহুল মজুমদার

না, অন্নপূর্ণা এবার আমাদের ফিরিয়েই দিলো, বেগিনের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো হতাশা, বুঝলে জাঁ, ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই।

৮০০০ মিটার উঁচু অন্নপূর্ণা শিখর আর মাত্র ৪০০ মিটার দূরে। কিন্তু এই ৪০০ মিটার যে পেরোনো যাবে না এটা বুঝতে জাঁ ক্রিস্টোফার লাফায়েলের অসুবিধে হয়নি। এর আগে অনেক পাহাড়ে চড়েছে রাফায়েল একা, আলপাইন স্টাইলে, অর্থাৎ কারো সাহায্য না নিয়ে। কিন্তু এবারের মতো কঠিন সংগ্রাম কোনোবার করতে হয়নি। পিয়ের বেগিনের মতো কিংবদন্তি পর্বতারোহী সাথী না থাকলে ও কবেই ফিরে যেত! এই পথে এতদূর উঠে আসার দুঃসাহস ওর হতো না। একা বোধহয় এপথে ওঠা সম্ভবও নয়। প্রায় পুরোটা পথ রোপ ফিক্স করে উঠতে হয়েছে। বেগিনের দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা, দুর্জয় সাহস লাফায়েলকেও সাহস যুগিয়েছে।

কয়েক মাস আগে যখন বেগিন ওকে অন্নপূর্ণার সাউথ ফেসে নতুন পথ বেয়ে ওঠার প্রস্তাবটা দেয় তখন লাফায়েল এককথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলো। একে তো বেগিনের মতো স্বনামধন্য পর্বতারোহীর একমাত্র সঙ্গী হবার গৌরবের সুযোগ, তার ওপর দুর্গমের প্রতি নিজের আকর্ষণ।

৪১ বছর বয়সী বেগিন আর ২৭ বছর বয়সী লাফায়েল বেস ক্যাম্পে এসে পৌঁছয় ৬ অক্টোবর ১৯৯২। বেস ক্যাম্প থেকেই বেগিন দেখিয়েছিলো ওদের ক্লাইম্বিং রুটটা। এক নজরেই বোঝা যাচ্ছিলো, অত্যন্ত দুরারোহ। একেবারে খাড়া—বেশ বিপজ্জনক। এই দুর্গমকে জয় করবে বলেই তো এসেছে ওরা। আবহাওয়া খুব একটা ভালো নয়। দু-চার দিনের মধ্যে আবহাওয়া ভালো না হলে ওপরে যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

পরদিন এই অবস্থাতেই উঠতে শুরু করলো ওরা। ৫৩০০ মিটারে অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প করলো প্রায় অনায়াসেই। পরদিনও অন্নপূর্ণার আবহাওয়া ওদের খুব বেগ দিলো না ৬৫০০ মিটার পর্যন্ত। কিন্তু এরপরই মেজাজ বিগড়োলো অন্নপূর্ণার। ফুঁসে উঠলো। থামতে বাধ্য হলো ওরা। কোনোমতে বিভক টেন্টটা লাগিয়ে ঢুকে পড়লো। মুহুর্মুহু আক্রোশ জানিয়ে যাচ্ছে তুষারঝড়; কেঁপে কেঁপে উঠছে তাঁবু। মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে আছড়ে ফেলবে অতলে। রাতটা প্রায় জেগেই কাটলো। ভোরের দিকে আবহাওয়া একটু শান্ত হতে বেরিয়ে পড়লো ওরা। পাঁচ হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। তার

পিয়ের বেগিন

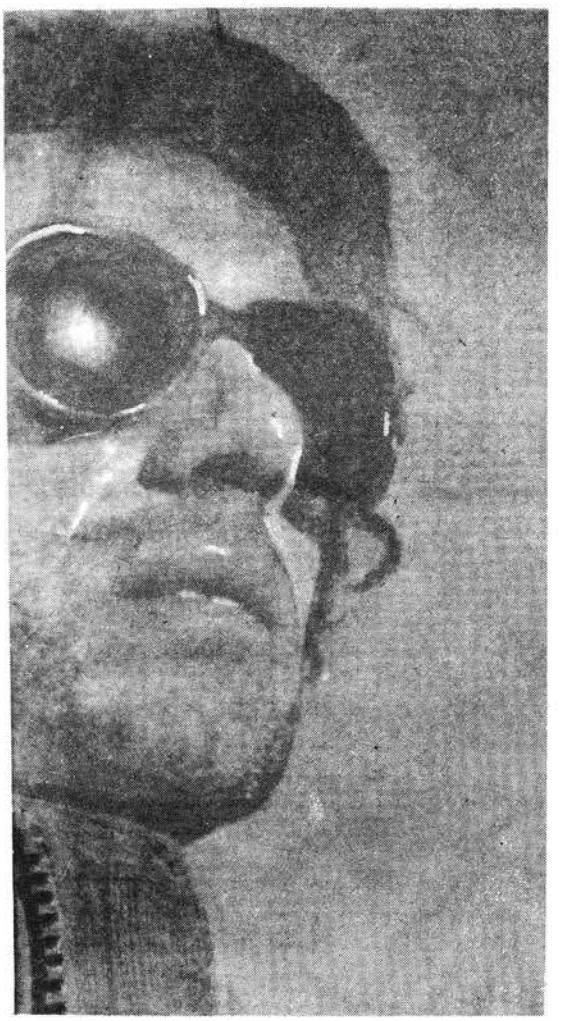

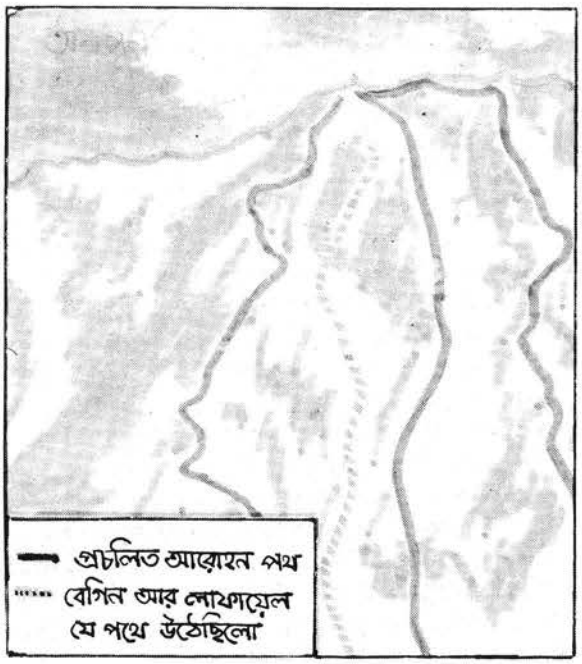

অন্নপূর্ণার সাউথ ফেস

ওপর প্রায় সত্তর-আশি ডিগ্রি খাড়া পথের ওপর সারারাত আলগা তুষার জমেছে। তবু হার না মেনে ওরা চড়তে থাকলো মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে। ওদের এই দুঃসাহস দেখে ক্ষেপে উঠলো অন্নপূর্ণা। বীভৎস তুষারঝড় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মাত্র ৫০০ মিটার উঠেই ক্ষান্ত দিতে হলো। বিভক টেন্টটা লাগাতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হলো ওদের। তাঁবুর মধ্যে প্রায় বসেই সময় কাটতে লাগলো। মূর্তিমান শয়তানের মতো তুষারঝড় উপড়ে ফেলতে চাইছে ওদের। থরথর করে

জাঁ লাফায়েল

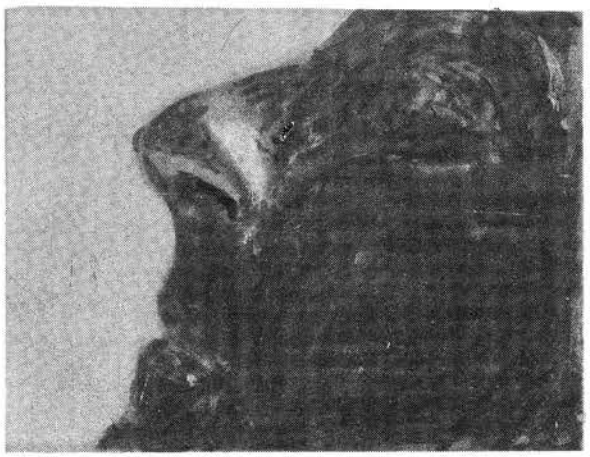

কাঁপছে তাঁবু, প্রতিটা মুহূর্ত কাটছে দুশ্চিন্তায়। এমনকি বেগিনের মতো দুঁদে পর্বতারোহীর মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। এরকম আবহাওয়া থাকলে শৃঙ্গে ওঠা তো দূরের কথা, প্রাণে বেঁচে ফেরাটাই হবে আশ্চর্যের।

সারাদিন সারারাত চললো তুষারঝড়ের হুমকি। কিন্তু, ভোরবেলা হঠাৎই থেমে গেলো সব। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, ঝকঝক করছে। দ্রুতহাতে সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। অত্যন্ত কষ্টকর চড়াই। প্রতিটি পদক্ষেপে হয় ধাপ কাটতে হচ্ছে তুষার-গাঁইতি দিয়ে, না হয় মারতে হচ্ছে পিটন। ওদের বড়ো ভরসা এই পিটনগুলো। গাঁথা হলেই মুখটা খুলে চওড়া হয়ে যায়, ফলে, বেরিয়ে আসার ভয় থাকে না। তাই তো এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'বন্ধু'—'ফ্রেন্ড'। শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে অন্নপূর্ণার খাড়া শরীর বেয়ে উঠছে দুজনে। তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নিচে, তার ওপর আবার মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে। আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো ওদের। আবার যদি ঝড় ওঠে! এখানে তো তাঁবু খাটাবার জায়গাও নেই।

ওদের আশঙ্কাকে সত্যি করে পৈশাচিক উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তুষারঝড়। সবেমাত্র ৩০০ মিটার উঠতে পেরেছে ওরা এতক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টায়। ঝড় ওদের উড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে। তাড়াতাড়ি বরফে দুটো গর্ত খুঁড়ে দুজনে মাথা গুঁজে বসে পড়লো তার ভিতর। প্রাণটা বাঁচলো। মাথার উপর দিয়ে ভীমগর্জনে ছুটে চলেছে তুষারঝড়। মাঝে মধ্যে তুষারের ছোটোখাটো চাঙড় খসে পড়ছে গায়ে মাথায়। কোনোমতে পিটনের গায়ে হারনেস (দড়ির ঝোলা আসনের মতো) আটকে তাতে বসে প্রহর গোনা। কথা বলার উপায় নেই। তুষারঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে আওয়াজ পাশের গর্তে পৌঁছনো অসম্ভব।

দিনভর সারারাত চললো ১৬০ কিমি বেগের তুষারঝড়। বিনিদ্র রাত কাটিয়ে ভোরের দিকে ওরা টের পেলো ঝড়ের বেগ কমেছে। ঠাণ্ডায় বসে বসে জমে যাওয়ার থেকে ওঠার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলো ওরা। আর তো মাত্র ৫০০ মিটার। কপাল ভালো থাকলে আজ সামিট হয়েও যেতে পারে। কালো মেঘ, শূন্যের অনেক নিচে তাপাঙ্ক, তুষারঝড় (যদিও তার বেগ এখন একটু কম) তুচ্ছ করে খাড়া দেওয়াল বেয়ে বেগিন আর লাফায়েল তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলো। প্রতি মুহূর্তেই থামতে হচ্ছে, দম নিতে, ধাপ কাটতে বা পিটন লাগাতে। এক হাত ওপর বা নিচের জিনিস দেখা যাচ্ছে না, এত ঘন মেঘ। তুষার উড়ছে, আছড়ে পড়ছে, হাওয়ার বেগে ভারসাম্য রাখাই দায় হয়ে পড়ছে। কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতেও। লাফায়েলের মনে হচ্ছে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। বেগিনও বুঝতে পেরেছে, আর এগোনো অসম্ভব। এতক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টায় মাত্র ১০০ মিটার উঠতে পেরেছে ওরা। বাধ্য হয়েই বেগিনকে বলতে হলো, নাঃ, অন্নপূর্ণা এবার আমাদের ফিরিয়েই দিলো।

হতাশা ঝেড়ে ফেলতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো। তারপর শুরু করলো নামতে। এই আবহাওয়ায় ওঠার থেকে নামাটা বেশি কঠিন। অথচ উপায় নেই। নেমে যেতে হবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে, সম্ভব হলে বেস ক্যাম্পে। অত্যন্ত সাবধানে আস্তে আস্তে ওরা নেমে এলো সবথেকে বিপজ্জনক অংশটায়। ৮০ মিটার পথ একেবারে ৯০ ডিগ্রি খাড়া নেমে গেছে। বরফের মাঝে মাঝে বেরিয়ে রয়েছে পাথর। দড়ি ছাড়া উপায় নেই। পিটন মারলো বেগিন। রোপটা পিটনে আটকে নেমে গেলো দু ধাপ। দ্বিতীয় পিটনটা মেরে ও নামবে আরেকটু, আর লাফায়েল তার ক্যারাবিনারে (আংটা) রোপ আটকে নামবে প্রথমটুকু। বেগিনের সম্পূর্ণ ভার এখন দড়ির ওপর। পা দুটো কোনোমতে ছুঁয়ে

রয়েছে পাহাড়ের গা। দ্বিতীয় পিটনটা বার করছে বেগিন। রুদ্ধশ্বাসে সেটাই দেখছিলো লাফায়েল। হঠাৎ কড়াৎ করে একটা শব্দে চমকে ডানদিকে তাকালো। আতঙ্কিত হয়ে দেখলো বরফ উপড়ে বেরিয়ে এসেছে উপরের পিটনটা। লাফায়েলের বিস্ফারিত চোখের সামনেই এক ঝলক রুপোলি বিদ্যুতের মতো নেমে গেলো সেই পিটন 'বন্ধু', সোজা গেঁথে গেলো বেগিনের বুকে। এক মুহূর্ত থমকে রইলো বেগিনের দেহটা। হাত দুটো কী যেন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলো শূন্যে। তারপর অসহায় লাফায়েলের চোখের সামনে, অসংখ্য শিখরজয়ী, অসীমসাহসী পিয়ের বেগিন হারিয়ে যেতে থাকলো অতল গহ্বরে।

এক অদ্ভুত আতঙ্ক, অসহায়তা ঘিরে ধরলো লাফায়েলকে। এক মুহূর্ত আগেও যেখানে দাঁড়িয়েছিলো ওর অগ্রজপ্রতিম কিংবদন্তি পর্বতারোহী বন্ধু, সেখানটা এখন শূন্য। রাক্ষসী অন্নপূর্ণা এইমাত্র গিলে খেয়েছে বেগিনকে। বেগিন হারিয়ে গেছে অতলে, সঙ্গে নিয়ে গেছে পর্বতারোহণের সমস্ত সরঞ্জাম। লাফায়েল এখন একান্ত অসহায়। মৃত্যু ছাড়া ওর অন্য কোনো পরিণতি নেই। কোনো সরঞ্জাম ছাড়া এই পথে, এই আবহাওয়ায়, এই তাপাঙ্কে নামা মৃত্যুরই নামান্তর।

মরতে যখন হবেই, তখন দিই ঝাঁপ—দুই বন্ধু একই সঙ্গে চলে যাবো মৃত্যুর ওপারে। প্রথমে এই ভাবনাই এলো লাফায়েলের মনে। তারপর, হঠাৎই ওর মনে হলো, যদি বেগিন কোথাও আটকে গিয়ে থাকে! যদি এখনো বেঁচে থাকে! তাহলে তো ওকে বাঁচাতেই হবে। আর ওকে বাঁচাতে গেলে নিচে নেমে সাহায্য আনা ছাড়া উপায় নেই। এক অতিমানবিক শক্তি যেন ভর করলো লাফায়েলের উপর। প্রায় অসম্ভব পথে সাজসরঞ্জামহীন অবস্থায় নামতে শুরু করলো ও। ঘন মেঘের জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড বেগে ঝড় এসে ধাক্কা মারছে। সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রম আর বেগিনের আকস্মিক দুর্ঘটনার ধাক্কায় শরীর ক্লান্ত-অবসন্ন, তবু অন্ধের মতো নামতে থাকলো লাফায়েল। মনে তার একটাই চিন্তা—সাহায্য চাই বেগিনকে বাঁচাতে। এমন একটা মানুষ, এতো সহজে মরে যেতে পারে, এ কথা ওর বিশ্বাস হয় না। বেগিন নির্ঘাৎ বেঁচে আছে।

কী করে এবং কখন যে লাফায়েল ওদের বিভক টেন্টে পৌঁছলো, জানে না। একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের ভরসা পাওয়া মাত্র শরীরের সমস্ত বোধ চলে গেলো। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো ও।

বিশ্রামের ফলে শরীরে একটু বল ফিরে পেতেই তেরো তারিখ ভোরবেলা আলো ফোটার আগেই আবার পথে নামলো ও। সঙ্গে টেন্টে পাওয়া ছোট এক টুকরো রোপ। ঘন মেঘের মাঝ দিয়ে সাবধানে নেমে চলেছে। হঠাৎ একঝলকের জন্য মেঘ সরে গেলো। লাফায়েল দেখতে পেলো অনেক দূরে দুটো চলমান বিন্দু। প্রচলিত পথে কারা যেন উঠছে ওপরপানে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে চীৎকার করলো, হে-এ-ল্ল। সঙ্গে প্রবলভাবে দুহাত নাড়তে লাগলো। বিন্দু দুটো থমকালো। কিন্তু হায়, আবার মেঘ এসে ঢেকে দিলো সব। দ্রুত সাহায্যের শেষ আশাটুকু মুছে গেল মুহূর্তে। চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো লাফায়েলের হতাশায়। কিন্তু কান্নার সময় এখন নয়। নামতে হবে, আনতে হবে সাহায্য।

শরীর আর চলতে চাইছে না। বাধ্য হয়ে সঙ্গের শেষ মিষ্টিটুকু খেয়ে নিলো ও। কিন্তু বিপদ কখনো একা আসে না। হঠাৎ ওর বাঁ পায়ের ক্র্যাম্পন খুলে গেলো। এই তুষাররাজ্যে ক্র্যাম্পন প্রায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই জরুরি। একে খাড়া পথ, তায় পিছলে যাচ্ছে বাঁ পা কঠিন বরফে। তুষার গাঁইতি আর রোপটুকু সম্বল করে নামতে নামতে হঠাৎই এক টুকরো আশার আলো। ঐ তো ক্র্যাম্পনটা পড়ে আছে। যাক, অন্নপূর্ণার বুঝি একটু দয়া হয়েছে।

চারটে বাজে। আরে ঐ তো! ৬৫০০ মিটারে লাগানো ওদের টেন্টটা। আর কতদূর হবে? ফুট তিরিশেক। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো লাফায়েল। এর পরেরটুকু নামতে ততো অসুবিধা হবে না। আর ৫৩০০ মিটারের অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে পৌঁছতে পারলে খাবার, জল—আহ্।

কড়-কড়-কড়-কড়াৎ—গুম-গুমগুম্। বিকট শব্দে চকিতে মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকালো লাফায়েল। বড় একটা পাথরের টুকরো নেমে আসছে ভীমবেগে। সরবার সময় নেই। মাথা বাঁচাতে হাত দিয়ে আড়াল করলো মাথা। সশব্দে এসে পাথরটা আছড়ে পড়লো ওর হাতে। গুঁড়িয়ে গেলো হাতের হাড়। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে মহা আতঙ্কে লাফায়েল দেখলো ফুলে যাচ্ছে হাতটা। ভিতরে রক্তস্রাব হয়ে ফ্রস্ট বাইট হবার ভয়ে দ্রুত হাতে ছুরি বার করে হাতটা চিরে দিলো ও। তারপর, কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে টেন্টে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে গেলো।

পরের দিনটা কাটল ওর ঘোরের মধ্যে। বিকেলের দিকে জ্ঞান ফিরতে প্রথমেই ওর মনে হলো একটা হাত অকেজো, খাবার নেই, জল নেই। এভাবে এখানে পড়ে থাকলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালো ও। পড়ে রইলো সমস্ত সরঞ্জাম। টলতে টলতে আচ্ছন্নের মতো নামতে শুরু করলো। রাত হলো। চাঁদ উঠলো। নামছে... নামছে...চাঁদের জায়গা নিলো সূর্য, তবু ওর চলা থামলো না। উঠতে, পড়তে, হোঁচট খেতে খেতে দুপুরবেলা পৌঁছে গেলো অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে। কিন্তু, হায়! পুরো তাঁবুটাই চাপা পড়ে গেছে তুষারে। এই শরীরে যতোটা সম্ভব চেষ্টা করলো ও। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, একটা হাত নাড়াতে পর্যন্ত পারছে না। এক টুকরো খাবার পেলে...নাঃ, কিছু উদ্ধার করা গেলো না। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু সে শক্তিটুকুও বুঝি অবশিষ্ট নেই শরীরে। মরিয়া হয়ে নামতে শুরু করলো লাফায়েল।

ধীরে ধীরে সূর্য নামছে পাটে, নামছে আঁধার। আর পারছে না লাফায়েল। আহ্, একটু শুয়ে পড়লে কেমন হয়! ভাবনাটা মনে উঁকি দিতেই নিজের মনকে ধমক দিলো ও। তাঁবু, স্লীপিং ব্যাগ ছাড়া এই তুষারক্ষেত্রে রাত কাটালে, সেটাই হবে জীবনের শেষ রাত।

আরে, ওগুলো কী? তাঁবু না? তবে কি বেস ক্যাম্প এসে গেলো! নেমে আসতে পারলো ও নরক থেকে! নাকি সবই মনের ভুল?

স্লোভানিয়ান বেস ক্যাম্পের লোকেরা যখন লাফায়েলের প্রায় অচৈতন্য দেহটা বয়ে নিয়ে এলো তাঁবুর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে, তখন ওর মুখে হাসি, চোখে জল। চোখে জল প্রিয় বন্ধু বেগিনের জন্য, যে চিরতরে রয়ে গেলো তার স্বপ্নভূমি হিমালয়ের বুকে। আর হাসি নরক থেকে বেঁচে ফিরে আসার আনন্দে।

ছবি ঃ লেখক

বড়বাবু তখন কলম বাগিয়ে রিপোর্ট লিখছিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা সদর অফিসে পাঠানো দরকার। মাঝপথে কালী সর্দার এসে হাজির হলো। হরসিং সম্বন্ধে একরাশ কথা বলে গেল গড়গড় করে। বড়বাবু ব্যস্ত মানুষ। সে সব কথার কিছুটা শুনলেন, কিছুটা শুনলেন না।

কালী সর্দার যা বলল তা হলো, 'হরসিং মানুষ ভাল। রীতিমত কাজের। আচার-ব্যবহার যেমন সুন্দর তেমনি সৎ। হলে হবে কি, মানুষটা যেন কেমন কেমন। একটুতেই ঘাবড়ে যায়। এক কথায় যাকে বলে ভীতু। আমার মনে হয়, ও লোককে জঙ্গলে পাঠানো ঠিক হবে না। বিশেষ রাস্তা তৈরির কাজে।'

এক ভীতু মানুষের গল্প

সুকুমার ভট্টাচার্য

বড়বাবু তাঁর রিপোর্টে লিখলেন,-'হরসিং খুব কাজের লোক। তবে কিনা একটু ভীতু গোছের মানুষ। একটুতেই ঘাবড়ে যায়।'

এবার হরসিং মানুষটা কেমন, বলা যাক। ভীষণ গরিব সে। ছেলেমেয়ে আর বউ নিয়ে সংসারে তার অনেকগুলি পোষ্য। ভালভাবে সকলকে ভরণপোষণ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। কিন্তু তার বড় ইচ্ছে, সংসারের সকলে ভাল থাক, ভাল পরুক। ছেলেরা ভাল জামাকাপড় পরবে, মেয়ে আর বউ গলায় হার, হাতে বালা পরে ঝলমলিয়ে ঘুরে বেড়াবে এটাই তার সব সময়কার কামনা।

হলে হবে কি, ওই কামনাটুকুই সার। ওসব ইচ্ছের সমস্তটাই তার ক্ষমতার বাইরে। নিজের ব্যাপারেও তার একটা বাসনা ছিল। সেটা হলো একটা সাইকেল। নিজস্ব অমন একটা জিনিস থাকার কত সুবিধে। কিন্তু ওই —কোনো কিছুই তার আয়ত্তের মধ্যে নয়।

শহরের বাইরে একটা চালাঘরের মধ্যে তার বাস। তা-ও সে চালা তেমন জুতসই নয়। নিজহাতে যেমন পেরেছে তেমন তৈরি করেছে। কলাপাতা আর পিচবোর্ড দিয়ে করেছে তার দেয়াল। পুরনো মরচে-পড়া ক্যানেস্তারা টিন এনে, পিটিয়ে সমান করে মাথায় ছাউনি দিয়েছে। তা সে চালাঘর এমনি নড়বড়ে যে, প্রতি বর্ষাতেই সে পিচবোর্ডের দেয়াল ভিজে নষ্ট হয়ে যায়।

তবু ওটাই তার আশ্রয়। মাটিলেপা মেঝে, তা সে যেমন মসৃণ তেমনি কোমল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও তেমন বলার মতো নয়। পাতলা জলের মতো মুসুর ডাল আর চাপাটি। তবু ছেলেমেয়ে বউ কারো মনে কোনো ক্ষোভ নেই। ঘরের মেঝেয় গোল হয়ে বসে সোনামুখ করে তাই-ই খায়।

ভিণ্ডওয়ারার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি হবে। তার জন্যে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন। কনট্রাকটর মানুষটিও কিছু কম বিচক্ষণ নন। বড়বাবুর পাঠানো রিপোর্টটার ওপর চো বুলোতে বুলোতে ভদ্রলোক থামলেন। নজর আটকে গেল হরসিং নামটার ওপর। দেখলেন, 'মানুষ ভাল। কাজের লোক। তবে কিনা ভীতু গোছের মানুষ।'

সঙ্গে সঙ্গে হরসিং-এর নামের পাশে টিক দিয়ে দিলেন তিনি। আরে, জঙ্গলে এমন লোকেরই তো দরকার। যার কাছে পাইথন আর ডোরাকাটায় কোনো তফাত থাকে না। দুশো শ্রমিকের তালিকার মধ্যে হরসিং অক্লেশে ঢুকে পড়ল। আর এই ফেরে পড়েই একদিন সকলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল হরসিং। গিয়ে পৌঁছল ভিণ্ডওয়ারার গভীর জঙ্গলে। একেবারে খোদ হিমালয়ের হিংস্র কালো ভাল্লুকদের আস্তানায়। আর কে না জানে যে, পৃথিবীতে ওদের মতো মারাত্মক জানোয়ার আর নেই।

হরসিং নামটা অমন হলে হবে কি, আসলে ও কিন্তু বাঙালি।

আর বাঙালি মাত্রই যেমন হয়, ও-ও তেমনি। সর্বদাই হৈ চৈ আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জমিয়ে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু পেটের দায়ে ঠাঁইনাড়া হতে হলো। তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেচারিকে ভিগুওয়ারায় যেতে হলো। সঙ্গীসাথী যা জুটল, সে আর কহতব্য নয়। সকলেই যেন কেমন কেমন। জঙ্গলটা কেমন, বা সেখানে কি ধরনের জানোয়ার, তা নিয়ে কেউ কোনো কথাই বলল না। আর হরসিংও যে পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে, বা সাবধান হবে, সে ধরনের মানুষই নয় সে। ফলে—

কি থাক, ওর অবস্থাটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক।

বাবু নতুন জায়গায় গিয়ে, কুঁড়ে বানিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। সব শ্রমিকরা যেভাবে থাকে, ঠিক সেইভাবেই। অর্থাৎ এক কুঁড়ের মধ্যে ছেলে মেয়ে-বউ আর একরাশ মুরগী ছাগল। লক্ষ্য করে দেখা গেল, প্রতিদিনই দু-চারটে করে মুরগীর বাচ্চা উধাও হতে শুরু করেছে। কি ব্যাপার, কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। একে তাকে কথাটা বলতে তারা বলল, এ আর কারো কাজ নয়। গোখরো। নিশ্চয় গোখরো সাপ আছে তোমার ঘরের মাচায়। বলো কি? চোখ কপালে উঠল হরসিং-এর। পাঁই পাঁই ছুটল সে। দুদ্দাড়িয়ে মাচার পাতা সরাতেই দেখল, একজোড়া গোখরো সাপ! একটা তো তখনি হরসিং-এর ডাণ্ডার ঘায়ে ঠাণ্ডা হলো। আর একটা দৌড় দিল বনে। সঙ্গীসাথীরা মার মার করে পিছু নিল। শেষ পর্যন্ত পঞ্চত্ব ঘটল সেটারও।

এই হলো আমাদের হরসিং।

দিন যায়। দ্রুত এগিয়ে চলে রাস্তার কাজ। সামনে এগোতে এগোতে আর সব শ্রমিকদের সঙ্গে জঙ্গলের আরো গভীরে গিয়ে পড়ল হরসিং। সেখানে চারদিকে নানা জাতের জানোয়ারের পদচিহ্ন। ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে বাঘের পায়ের ছাপও দেখতে পেল কয়েকটা। রোদে পুড়ে শক্ত ইঁট হয়ে আছে। বাবু আবার এমনি, সেটাকে সাবধানে ছুরি দিয়ে কেটে, গোটা ছাপটাই তুলে নিয়ে এল কুঁড়েতে। কেন? না, বাড়ির সকলকে দেখাবে। তারপর সকলকে দেখাবার পর, সেই ভারি বাঘের পায়ের ছাপটা চাপিয়ে দিল কুঁড়েঘরের চালে। কারণ কি? না, যত ঝড়ই উঠুক, মাচার পাতা আর উড়বে না। ঠিক ঠিক জায়গামতো থাকবে।

রাস্তা তৈরি করতে করতে শ্রমিকদল আরো এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এতদূর যে, কুঁড়ে থেকে আর নিয়মিত খেতে আসা যায় না। অতএব এখানকার লোকের যা দস্তুর, তাই করো। অর্থাৎ ডেরা ওঠাও। সংসারের সবকিছু বয়ে নিয়ে আরো এগিয়ে চল। যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখানে নতুন করে জায়গা পছন্দ করো। জঙ্গল থেকে ঘাস-পাতা-বাঁশ কেটে এনে আবার চালা বাঁধো। এই হলো জীবন।

আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা একেবারে আদিম যুগের মতো। সব সময় নির্ভর করতে হয় বনের হরিণ আর নদীর মাছের ওপর। শুকনো কাঠের গনগনে আগুনে ঝলসাও আর খাও। একেবারে গরম গরম। এমনি গরম যে, পোড়া মাংস থেকে আগুনের ফুলকি ঝরে পড়ে।

কাজ করতে করতে হাতের একটা আঙুল কেটে গেছিল। আঙুলটা মুখের ভেতর নিয়ে চুষতে শুরু করল হরসিং। ভাবে, জঙ্গলে জংলী হয়ে থাকাটা খুব সহজ। এ যা জায়গা, এখানে কুঁড়ে বাঁধা কোনো ব্যাপারই না। প্রাণধারণের জন্যে আর যা দরকার, সেটা হলো কিছুটা জোয়ার আর আখের গুড়। চাল আর সরষে থাকলে তো ভালই হয়। আর দরকার কুঁড়ের মাচার ওপর একটা ডাগর-ডোগর লাউগাছ। ব্যস! একটা সংসারের বেঁচে থাকার পক্ষে এগুলোই যথেষ্ট নয় কি?

কিন্তু তার এইসব ভাবনাচিন্তার কথা যাকেই বলে, সে-ই মুখ টিপে হাসে। বনরক্ষক আর রেঞ্জার সাহেবের কথা মনে করিয়ে দেয়। বলে, ইচ্ছে করলেই জঙ্গলে কেউ শিকার করতে পারে না। পারে না ইচ্ছেমতো ঘাস কাটতে। ওসব কাজের জন্যে আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। যদি না করো, ধরা পড়লেই জরিমানা। নয়তো জেল হাজত!

শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে নানা গল্পগুজব করে। বিড়ি টানে। তা বলে কাজ কিন্তু পড়ে থাকে না। হাত ঠিকই চলে। কোদাল গাঁইতির ওঠা-নামায় রাস্তা এগিয়ে চলে। কাটা পড়ে রাশি রাশি গাছপালা। কাটা পড়ে ঘেসো মাঠ। মাঝে মাঝে সামনে পড়ে ফাঁকা ময়দান। সেটা আর কিছু নয়, জন্তু-জানোয়ারদের বিচরণভূমি। দেখা যায় হরিণ আর নীলগাইদের। পেটের দায়ে সেখানে উদয় হয় বন্য চিতা আর বাঘ। তবে দিনের বেলা তাদের টিকি দেখা যায় না। আবার কখনো বা সামনে নদী পড়ে। সেখানে কুমীররা মড়ার মতো পড়ে পড়ে রোদ পোয়ায় আর ঘুমোয়। শ্রমিকদের হৈচৈ আর কুড়ুল-কোদালের আওয়াজে বাবুদের ঘুম ছুটে যায়। ধড়মড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। ঝুপঝাপ আওয়াজ হয়। রাস্তা কিন্তু এগিয়ে চলে। লম্বা হতে হতে একেবারে গিয়ে পৌঁছয় হিমালয়ের পাদমূলে। সেখানে বাঁশ আর শালবনের পরিবর্তে দেখা যায় শুধু ওক গাছের ঘন সমারোহ।

অনেক জানোয়ারের পায়ের ছাপই হরসিং-এর চোখে পড়েছে। কিন্তু আসলে সেগুলো যে কি, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই তার। জানোয়ারদের অনেক ডাকই তার কানে গেছে। কিন্তু কোন ডাকটা যে কার, সেটা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। ময়ূর, প্যাঁচা বা টিয়াপাখি হঠাৎ যদি ডেকে ওঠে, তাহলে হরসিং-এর পিলে চমকে যায়। শিয়াল যদি হঠাৎ হাঁকাড়ি দেয়, তো ভয়ে বাবুর মুখ আমসি। তারপর যখন বোঝে, ওসব ডাকাডাকি কিংবা হাঁকাড়ি তাকে উদ্দেশ করে নয়, তখন বাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। তা সে এমনি উদাসীন যে, সামনে বাঘ এসে পড়লে তাকে আমল দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

বলতে গেলে পাখি আর বাঁদর ছাড়া হরসিং কোনো হিংস্র প্রাণীই চোখে দেখেনি। কি করে দেখবে? সব সময়ই তো দলের মাঝে থেকে হৈ চৈ করে কাজ করে। সুতরাং যাদের সে চোখেই দেখেনি, তাদের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবনারও কোনো কারণ

নেই।

একদিন সঙ্গীদের কাছে শুনল, কাছেই একটা ঝর্ণা আছে। বাবুর ইচ্ছে হলো দেখবার। গেল সময় করে। বেশ সুন্দর জায়গা। চারদিক ঘিরে ফার্নের জঙ্গল। এককেবারে নীরব নিঝঝুম। কেউ কোথথাও নেই। হঠাৎ দেখল, একটা খুব দামি জিনিস পড়ে আছে। সেটা আর কিছুই নয়, একটা খালি কেরোসিন তেলের টিন। একেবারে নতুন, চকচকে নিটোল। সূর্যের আলোয় রুপোর মতো চকচক করছে। সন্তর্পণে তাকাল চারদিকে। কেউ আছে কিনা! কেউ দেখছে কিনা তাকে! যখন বুঝল কেউ দেখছে না, তখনি সেটা তুলে নিয়ে একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখল। ইচ্ছে, সন্ধ্যের পর অন্ধকার হলে চুপি চুপি এসে নিয়ে যাবে।

আসলে ওটা হলো সার্ভেয়ার দলের। সার্ভেয়ারদের একটা দল জমি মাপতে মাপতে আগে আগে গেছে। ছাউনি তুলে অন্যজায়গায় যাবার সময় হয়তো নিয়ে যেতে ভুলে গেছে জিনিসটা। অথচ অমন একটা নতুন টিন, কিছু ফ্যালনা নয়। সকলের কাছেই দরকারি।

ভেবে দেখ, ওটা দিয়ে কি না করা যায়? জল তো আনা যায়ই, ইচ্ছে করলে তেল-গম-মকাই সবই রাখা যায়। আবার ওটাকে কেটে পিটিয়ে সমান করে নিলে, কেমন সুন্দর চারচৌকো একটা টিন পাওয়া যায়। দরকার পড়লে চালাঘরের মাচায় ওটাকে চাপিয়ে দাও, ব্যস! জল পড়ার হাত থেকে নিশ্চিন্দি! ওটা পেলে, গিন্নি যে আনন্দে আটখানা হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সে মহিলাও বড় যে সে মানুষ নয়। রীতিমতো বিচক্ষণ! জিনিসটা যে ঠিক কোন কাজের উপযুক্ত, তা সে মহিলা ঠিক বুঝে নেবে। অতএব টিনটা হরসিং-এর চাই-ই।

টিনটা ঝোপের আড়ালে রেখে আবার চারদিকে তাকাল সে। কেউ দেখে ফেলেনি তো! তারপরই নিশ্চিন্ত হলো সে। না, কেউই দেখেনি। সকলেই রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু যেখানে সে টিনটা লুকোল, সে জায়গাটা ভীষণ মারাত্মক। খুব ঘন কাঁটাগাছের ঝোপ, তার মাঝের কিছুটা অংশের ডালপালা ভাঙা। যে কোনো চালাক-চতুর লোক জায়গাটা দেখেই বুঝতে পারত, ওখান দিয়ে কোনো বড়সড় জানোয়ার নিয়মিত যাতায়াত করে। কালো কালো বেশ কিছু লোমও লেগে আছে কাঁটাঝোপের ডালপালায়। ওটার পেছনেই আছে একটা অন্ধকার পাথুরে গুহা। আর অমন জায়গাতেই সাধারণতঃ ভাল্লুকরা থাকে। হিমালয়ের সেই ভীষণকায় হিংস্র প্রাণী।

বিকালে কাজের ছুটি হলো। আর সকলের সঙ্গে হরসিংও ফিরে এল নিজের ছাউনিতে। বউ তার সত্যিকারের কাজের মানুষ। প্রচুর চাপাটি আর ভাজাভুজি রেঁধে রেখেছিল। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খেতে বসে গেল। শরীরে শক্তি পেল, মনটাও বেশ চাঙা হয়ে গেল। টিনটার কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়ে গেছিল গিন্নিকে। খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'চলি। টিনটা এখুনিই নিয়ে আসা দরকার। আর একবার এনে ফেলতে পারলে, কেউ আর বলবে না, ওটা আমাদের নয়।'

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকার। গিন্নি বলল, 'তা ঠিক। তবে তুমি একটু দাঁড়াও। আমি চট করে তোমার ছোরাটাতে একটু ধার দিয়ে দিই।'

কথাটা শুনেই ঘাবড়ে যায় হরসিং! বলে, 'আবার ছোরাছুরি কেন? এমনিই তো যাওয়া ভাল। বেশ ঝাড়া হাত-পা।'

'হাজার হলেও জঙ্গল বলা যায়, অন্ধকারে যদি কোনো বাঘ-ভাল্লুকের সামনে পড়ে যাও?'

'বাঘ! ব-বলো কি?'

'তা যদি না-ও হয়, কোনো চিতা বাঘও তো হতে পারে!'

'বি-বিচিত্র কিছু নয়!' মাথা নাড়ল হরসিং, 'তাহলে থাক। আমি বরং কাল সকালে এনে দেব।'

'কিন্তু এরি মধ্যে কেউ যদি নিয়ে পালায়?'

বলে কুঁড়ের মধ্যে চলে গেল গৃহিণী। লুকনো জায়গা থেকে একটা দুদিক ধারালো ছোরা বার করে আনল। কয়েক বছর আগে অনেক দরদস্তুর করে গিন্নি সেটা কিনেছিল, এক ব্যাপারীর কাছ থেকে। দেবার সময় সে মানুষ বলেছিল, 'তুমি তো বাপু জিনিসটা খুব সস্তায় পেয়ে যাচ্ছ। তুমি তো জান না, জিনিসটা কত কাজের! আমি জানি, দার্জিলিং-এ ওটা দিয়ে একটা মানুষ খুন হয়েছিল।'

হরসিং আর কি করে! ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। পাশ থেকে একটা নুড়ি কুড়িয়ে গিন্নি ঘষতে লাগল ছোরাটার ওপর। কিছু পরে দু ফোঁটা তেল দিয়ে চকচকে করে তুলল সেটাকে। বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে দেখতে লাগল ধারের বহর।

আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখল হরসিং।

তার মানে, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। অথচ কিছুতেই মন চাইছে না যেতে।

আবার হঠাৎ মনে হলো, কেনই বা বেরবে না। গত বছরে ছেলেটার খুব জ্বর হয়েছিল। বর্ষাকাল। খাটিয়ার ওপর কম্বল চাপা দিয়ে ছেলেটা কোঁকাচ্ছিল। ওদিকে চালার মাচা ফুটো থাকায়, বৃষ্টির জল ঝরঝর করে ঝরছিল কম্বলটার ওপর। ঘরে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে সেই জল আটকাবে। কিন্তু সে সময় এমন একটা টিন থাকলে, আর অমন আতান্তর হতো না। অতএব টিনটা নিয়ে আসাই ভাল। অন্ধকার রাত্তির তো কি হয়েছে? গিন্নির হাত থেকে ছোরাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হরসিং।

ততক্ষণে চাঁদ উঠেছে। স্বচ্ছ তরল আলোয় মোটামুটি নজর চলে। দেখা যায় সবকিছুই। জঙ্গলের মধ্যে বীরবিক্রমে এগিয়ে চলল হরসিং।

কেউ কোথাও নেই। মৃদুমন্দ বাতাস। শনশন আওয়াজ তুলছিল গাছগাছালির পাতায়। ঝোপঝাড়ে জোনাকিদের একটানা ওড়াউড়ি! এক্ষুণি যদি একটা বাঘ সামনে এসে দাঁড়ায়? যদি হাঁক ছাড়ে, হালুম! তাহলে সে কি করবে? ভাবে হরসিং। কিন্তু হাঁটতে থাকে। থেমে দাঁড়ায় না।

হঠাৎ একটা কর্কশ ডাক কানে আসতেই, তড়াক করে লাফিয়ে

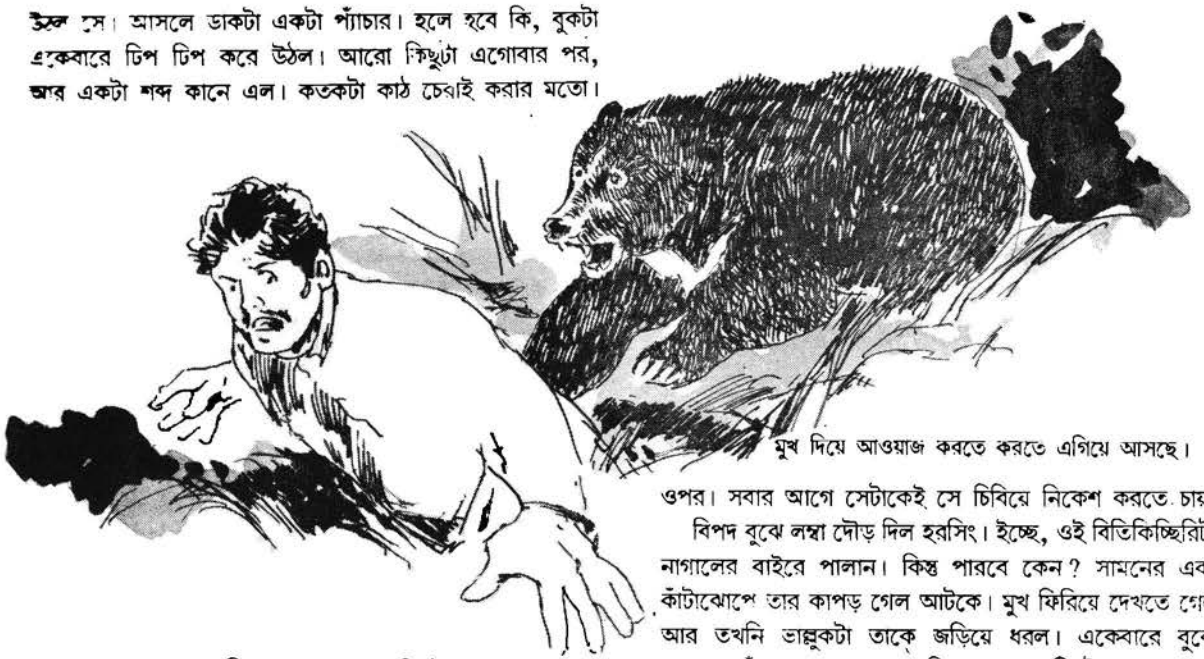

মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

ইল সে। আসলে ডাকটা একটা প্যাঁচার। হলে হবে কি, বুকটা একেবারে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। আরো কিছুটা এগোবার পর, আর একটা শব্দ কানে এল। কতকটা কাঠ চেরাই করার মতো। মনে ভরসা পেল হরসিং। তাহলে কাছেপিঠে মানুষ আছে! তা সে চোর-ডাকাত বা জঙ্গলের চোরাকাঠপাচারকারীই হোক!

দ্রুত এগিয়ে চলল হরসিং। কি একটা জানোয়ার রাস্তার ধারের ঝোপের মধ্যে থেকে ডাকছিল। ওকে দেখে এক লাফে উধাও। যেহেতু বাঘের ভাবনাটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল, তাই ভয়ে তার ডিরমি খাবার দাখিল। অনেক পরে যখন দেখল, সে ঠিকই আছে, তখন আবার সাহস এল। হোঁচট খেতে খেতে আবার এগোতে লাগল। গিয়ে পৌঁছল সেই ঝোপটার কাছে। ডান হাতে ছোরাটা নিয়ে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল ঝোপটার দিকে। তারপরই বাঁ হাত বাড়িয়ে ঝট্ করে টিনটা টেনে নিয়েই সে পিছু ফিরল তখনি।

ঠিক সেই সময় পেছনের গাছটা ভীষণভাবে নড়ে উঠল। ডালপালা ভাঙার আওয়াজ উঠল মড়-মড় মড়-মড় করে। ঝোপের অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে এল এক দশাসই জানোয়ার। সেটা যে ঠিক কি, বুঝতে পারল না হরসিং। শুধু দেখল, আরো ঘন অন্ধকারের একটা স্তূপ। বুকের অনেকখানি অংশ তার সাদা ধবধবে। মস্ত লম্বা ছুঁচলো নাক। তার দুপাশে দুটো কুতকুতে চোখ।

ভাল্লুক! মুখ দিয়ে অ-র্-র্-র্ আওয়াজ করতে করতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মানুষ দেখে প্রথম চোটে ভয় পায় না, এমন জানোয়ার খুব কমই আছে। লুকিয়ে পড়তে চায় আড়ালে। কিন্তু ভাল্লুকদের ব্যাপার-স্যাপার একেবারে আলাদা। মানুষকে পরোয়া করা তো দূরের কথা, উল্টে বুক বাজিয়ে থপথপ করে এগিয়ে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সবিক্রমে। তার আসল লক্ষ্য থাকে মানুষের মাথাটার ওপর। সবার আগে সেটাকেই সে চিবিয়ে নিকেশ করতে চায়।

বিপদ বুঝে লম্বা দৌড় দিল হরসিং। ইচ্ছে, ওই বিতিকিচ্ছিরিটার নাগালের বাইরে পালান। কিন্তু পারবে কেন? সামনের একটা কাঁটাঝোপে তার কাপড় গেল আটকে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে গেল, আর তখনি ভাল্লুকটা তাকে জড়িয়ে ধরল। একেবারে বুকের ভেতর। বাঁ হাতে ধরা কেরোসিন তেলের টিনটা ঢালের মতো সজোরে বাড়িয়ে দিল ভাল্লুকটার মুখের ওপর। বাঁচাতে চাইল নিজেকে।

এর পরের অবস্থা আর বলার মতো নয়। একটা বিশ্রী বোঁটকা গন্ধ, আর বড় বড় কালো লোমের চাপে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার অবস্থা। অন্ধকারের ভেতর জানোয়ারটার মুলোর মতো দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। এগিয়ে এল তার মাথাটায় কামড় দিতে। অতবড় একটা জানোয়ারের ওজন বড় কম নয়। সহ্য করতে পারল না হরসিং। পা পা করে পিছু হঠতে লাগল সে। আর তখনি তার মাথায় কামড় দিতে গেল ভাল্লুকটা। কিন্তু পারল না। হরসিং মাথাটা সরিয়ে নিতে গিয়ে টাল সামলাতে পারল না। ধপ করে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ারটাও। গর্জন এবার আরো প্রবল হলো পশুটার।

যেহেতু টিনটা ঢালের মতো সামনে ধরা ছিল, তাই হাজার চেষ্টা করেও হরসিং-এর মাথাটাতে কামড় দিতে পারল না ভাল্লুকটা। মাথা আর মুখের মধ্যে অনেকটাই ফারাক রয়ে গেল। ফলে সুযোগ পেয়ে গেল হরসিং। ডান হাতের ছোরাটা সজোরে পাগলের মতো চালাতে লাগল ভাল্লুকটার পেটের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তাজা গরম রক্তের ঢল নামল তিরতিরিয়ে। ভিজে সপসপে হয়ে উঠল হরসিং-এর শরীর।

একসময় ভাল্লুকটার বিক্রম অনেকখানি কমে গেল। হাতের বাঁধনটা আলগা হতে শুরু করল একটু একটু করে। দেহের ভারটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একেবারে পেড়ে ফেলবার দাখিল করল তাকে। বেচারি হরসিং আর কি করে! ভার সইতে না পেরে চিৎপটাং হয়ে পড়ল কাঁটাঝোপের ওপর। ভাল্লুকটার ঘন

পুরু লোমে ঢাকা পড়ে গেল তার নাক-চোখ-মুখ। একটু বাতাসের জন্যে ছটফট করতে লাগল সে।

কি ভাগ্যিস, সে অবস্থা বেশিক্ষণ রইল না। একটু পরেই একপাশে হেলে পড়ল শয়তানটা। দু পাক গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেল দেহটা।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল হরসিং। তারপরই চোখ পড়ল নিজের ওপর। দেখল, সারা শরীর রক্তে মাখামাখি। আর অত রক্ত যে তারই, এটা ভেবে রীতিমতো মুষড়ে পড়ল সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অনড় হয়ে পড়ে রইল মাটিতে। মৃত্যুর অপেক্ষায়।

সময় গড়িয়ে চলল। রাত পেরিয়ে ভোর হবার সময় হলো। শিশির পড়ে শরীর একেবারে ঠাণ্ডা। থরথর করে কাঁপছে। এমন সময় মনে হলো, বউ যেন ডাকছে। কান পাতল হরসিং। তারপর স্পষ্ট কানে এল বউয়ের গলা, 'কই, কোথায় গেলে? শুনছ?'

মাটিতে চিৎপাত অবস্থায় থেকেই অতিকষ্টে মুখ ফেরাল। ফিস ফিস করে বলল 'এই যে, আমি এখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল বউ। ঝুঁকে পড়ল হরসিং-এর ওপর। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার?'

বলেই দেখতে পেয়ে গেল ভাল্লুকটাকে। আঁতকে উঠল বউ। জিজ্ঞেস করল, 'উরি ব্বাস! কত বড় ভাল্লুক! কে মারল ওটাকে? তুমি!'

কাঁদ কাঁদ গলায় হরসিং বলল, 'কে জানে, কে মেরেছে? তবে আমি আর নেই। আমি মারা গেছি জানবে।'

'সে কী!'

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল বউয়ের। কেরোসিন তেলের টিনটা পাশেই পড়েছিল। কুড়িয়ে নিয়ে ছুটল নদীর দিকে। পুরো এক-টিন জল এনে, শুরু করল সাফসুতোর পর্ব। খুব ভয়ে ভয়ে গায়ের লেগে থাকা রক্ত মুছিয়ে দিল। রাশি রাশি পিঁপড়ে ইতিমধ্যেই এসে ঝেঁকে ধরেছিল হরসিংকে। নিপুণ হাতে আপদগুলোকে তাড়াল বউ। কিন্তু কোথায় কি? কোনো আঘাতই চোখে পড়ল না বউয়ের। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল হরসিংকে, 'তোমার কোথায় লেগেছে? কই কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'কি যে বলো! দেখছ না, কত রক্ত পড়েছে!'

'তা দেখেছি। কিন্তু এ রক্ত কার? তোমার না ওই মরা ভাল্লুকটার?'

'তোমার কি মনে হচ্ছে? কার?'

'মনে হচ্ছে ভাল্লুকটার। তোমার নয়।'

'তাই!'

কিছুটা বল পেল যেন শরীরে। দুই কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল হরসিং। চোখ বুজে অনুভব করার চেষ্টা করল। শরীরের কোথাও কটকট, ঝনঝন করছে কিনা!

একেবারে কিছু হয়নি, এমন নয়। ভাল্লুকটার নখের আঁচড়ে দেহের নানা জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে। এই মাত্র। হাতে টিনটা ছিল বলে মাথাটা বেঁচে গেছে। বলতে গেলে, অমন একটা ঘটনার ফলে হরসিং-এর যে দশা হওয়ার কথা, তার কিছুই হয়নি।

সাহস করে উঠে দাঁড়াল হরসিং। একেবারে বিধ্বস্ত। কোনো বল নেই শরীরে। টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়াল ভাল্লুকটার সামনে। ছোরাটা তখনো সেই জানোয়ারটার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে। এবার সজোরে সেটাকে টেনে বার করল হরসিং। ঘন ঘাসের ওপর রগড়ে সেটাকে মুছে নিল ভাল করে। তারপর বউকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার এই মড়াটাকে নিয়ে কি করব?'

'কিচ্ছু করবে না। যেমন পড়ে আছে তেমনি থাক। শেয়ালে শকুনে শেষ কাজটা করে দেবে।'

'তা একরকম ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু আমার গায়ে এই যে এত কাটাছেঁড়া, তার কি হবে? কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কি বলব?'

'ওঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।' বলে কৈফিয়ত খাড়া করে দিল বউ, 'বলবে, গাছ থেকে পড়ে গেছ।'

'সেই ভাল।' মনে মনে খুশি হলো হরসিং! টিনটা হাতে ঝুলিয়ে কর্তা-গিন্নি বাড়ির পথ ধরল। যেতে যেতে বউকে জিজ্ঞেস করল 'এবার বল, টিনটা দিয়ে কি করবে? নিশ্চয় চালের মাচার ফুটো বন্ধ করবে?'

'মাথথা খারাপ! এত ভাল টিন, ওভাবে নষ্ট করব?'

'তাহলে?'

'ভেবে দেখি, কি করতে পারি!'

তা হরসিং-এর বউ খুবই বিচক্ষণ। পরদিন সকালে হরসিং কাজে বেরিয়ে যাবার পর, সে টিনটাকে আড়াআড়ি কেটে ফেলল। সারা দুপুর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সে মহিলা দু-দুটো চারচৌকো ঝোলার মতো তৈরি করল। বিকালে কর্তা যখন ফিরল, সে-দুটো দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ, কেমন জিনিস তৈরি করেছি! ভাল হয়নি?'

মাথা নেড়ে তারিফ করল হরসিং। বলল, 'হ্যাঁ, জিনিসের মতো জিনিস বটে!'

'যদিও জানি, তোমার শখ একটা সাইকেলের। তা কি করব বল, আমাদের যা অবস্থা, সে তো আর হবার নয়। তাই দুটো ঝোলা ব্যাগের মতো করে দিলাম। সর্বদাই তো যাযাবরদের মতো এক ঠাঁই থেকে আর এক ঠাঁই যাতায়াত করতে হয়। তোমার নিজের যা কিছু জিনিসপত্তর, এতে করে নিয়ে গেলে বেশ হবে। লোকে দেখে বলবে যে হ্যাঁ, একটা লোকের মতো লোক যাচ্ছে বটে!'

মনে মনে খুশি হলেও, কোনো মন্তব্য করল না হরসিং।

কারণ তার মনে শান্তি নেই। সবকিছু ভালভাবে চুকেবুকে গেলেও, আর একটা নতুন ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। সে বেশ ভালই জানে, সে কি করেছে। একটা জলজ্যান্ত ভাল্লুককে সে খতম করেছে। কথাটা যদি কোনোরকমে ফাঁস হয়ে রেঞ্জার সাহেবের কানে ওঠে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। জরিমানা অনিবার্য! হয়তো বা জেলহাজত!

('নোরা বার্ক' অবলম্বনে।)

ছবিঃ ধ্রুব রায়

ভৈরব

মানবেন্দ্র পাল

ছোটনাগপুরের পাহাড়-ঘেরা এই ছোট্ট জায়গাটায় সেদিন যেন ধূসর সন্ধ্যা কেমন একরকম গা-ছমছম-করা রহস্যময় রোমাঞ্চ নিয়ে নেমে এসেছিল।

এমনটা অন্যদিন হয় না। অন্যদিনও এই সময় ধূর্জটিবাবু সর্বাঙ্গে গরম চাদর জড়িয়ে, হাতে দস্তানা পরে টাক মাথার উপর মাংকি-ক্যাপ চাপিয়ে লাঠি ঠুকঠুক করে এসে বসেন। এখন সবে অক্টোবরের মাঝামাঝি। শীত পড়েনি, পড়ব পড়ব করছে। এখনই ঐ কচি শীতের বিরুদ্ধেই ধূর্জটিবাবুর এই রণসাজ। তাঁর এই শীতবস্ত্রের বর্ম দেখে মহীতোষ মজুমদারের স্ত্রী হাসেন। কিন্তু যাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা তিনি নির্বিকার। তাঁর কোনো লজ্জা-সংকোচ নেই। মহীতোষবাবু এক সময়ে পুলিশ অফিসার ছিলেন। অসময়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। তাঁর পুলিশি জীবনের নানা ঘটনা শুনতে ধূর্জটিবাবু ভালোবাসেন। সেই লোভে এই ক'দিন ধরে রোজ সন্ধ্যাবেলা উনি এখানে আসেন।

কেন যে মহীতোষবাবু পুলিশের চাকরির মতো লোভনীয় কাজ রিটায়ার করার আগেই ছেড়ে দিয়েছিলেন সে কথা একমাত্র বাড়ির লোক ছাড়া আর কাউকে বলেননি। কেননা বললেও তা কেউ বিশ্বাস করবে না। শুধু চাকরি ছাড়াই নয়—একেবারে দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল।

এখানে উনি এসেছেন মাস ছয় হলো। শান্ত, নিরিবিলি জায়গা। ভদ্রলোকের বাস তেমন নেই। কেননা শহর বলতে যা বোঝায় তা এখান থেকে ক্রোশখানেক দূরে। মহীতোষবাবুর বাংলোর অল্প দূরে একটা পুরনো দোতলা বাড়ি। ঐ একটিই দোতলা বাড়ি। ওপরের জানালাগুলো সব সময়েই বন্ধ। একতলায় লোক থাকে। তারা বাঙালী নয়, মিশুকেও নয়। তবে কয়েক দিন হলো ধূর্জটিবাবু নামে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ঐ বাড়িতে এসেছেন। তিনি নিজেই এসে মহীতোষবাবুর সঙ্গে আলাপ করেছেন।

উনি অবশ্য সকালের দিকে আসেন না। বিকেলেও শীতের ভয়ে বড়ো একটা দূরে কোথাও যান না। ঠাণ্ডার ধাত। একটুতেই নাকি বুকে কফ জমে, গলা বসে যায়। তিনি অল্প কথা বলেন, তবু বিদেশে এই বাঙালী অতিথিকে পেয়ে মহীতোষবাবু ও তাঁর স্ত্রী খুব খুশী।

স্বামী স্ত্রী ছাড়া এ বাড়িতে আর এক জন আছে। তার নাম লক্ষ্মণ। লম্বা চওড়া, যাকে বলে দশাসই চেহারা—তাই। কুচকুচে কালো রঙ। আর পাথরের মতো বোবা। কাজ করে অসুরের মতো। ভোরবেলা আসে। কাজ করে রাতের খাবার নিয়ে চলে যায় নদীর ওপারে। ধূর্জটিবাবু ওকে প্রথম দেখেই আঁৎকে উঠেছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, ঐ লোকটার কাছ থেকে

সাবধান থাকবেন মশাই। আমি বলছি, ও মানুষ খুন করতে পারে।

এ কথা শুনে মহীতোষবাবুর স্ত্রী শিউরে উঠেছিলেন, কিন্তু এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহীতোষবাবু ভয় পাননি। ভয় পেয়েই বা কি করবেন। সন্দেহ করে না হয় ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর লোক পাবেন কোথায়?

রোজ সন্ধ্যেবেলা ধূর্জটিবাবু এসে মহীতোষবাবুর কাছে তাঁর পুলিশি জীবনের যত খুন-খারাপির গল্প ছেলেমানুষের মতো শোনেন। লণ্ঠনের আলো থেকে চোখ আড়াল করার জন্যে উনি একটা কিছু বই কিংবা কাগজ চিমনির গায়ে ঠেকিয়ে রাখেন। একটা ঘটনা বলা শেষ হয়ে গেলে উনি নাকে কেমন একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করেন। অর্থাৎ ঘটনাটা তাঁর পছন্দ হলো না। অন্য ঘটনা শুনতে চান। যেন তিনি কোনো বিশেষ ঘটনা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সময়ে সময়ে মহীতোষবাবুর মনে হতো ধূর্জটিবাবু হয়তো বা কোনো ছদ্মবেশী লেখক—প্লট খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

শেষে আজ মহীতোষবাবু তাঁর জীবনের সেই একান্ত গোপনীয় রোমাঞ্চকর কাহিনীটা বলতে শুরু করলেন, যে কাহিনীর নায়ক দুটি স্কুলের ছাত্র—মহীতোষ আর ভৈরব।

কাহিনী শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন কতকগুলো অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল সেটা হঠাৎ ঝনঝন করে পড়ে ভেঙে গেল। এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির ছাদে কি একটা পাখি বিশ্রী শব্দে ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে মহীতোষবাবুর মতো লোকও চমকে উঠলেন। তার পরই মনে হলো যেন প্রচণ্ড ঝড় উঠছে। তিনি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু কালিঢালা অন্ধকার আকাশ ছাড়া ঝড়ের কোনো লক্ষণই দেখতে পেলেন না।

এসব কি হচ্ছে? মনে মনে মহীতোষবাবু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন।

ভৈরব ছিল তাঁর ইস্কুলের বন্ধু। একই সঙ্গে পড়তেন তাঁরা। কতই বা বয়েস হবে তখন, তেরো-চোদ্দ? ভৈরব ছিল একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। তার স্বভাবের সঙ্গে মহীতোষের স্বভাবের কোনো মিল ছিল না। তবু ভৈরব কেন যে মহীতোষকে খুব ভালোবাসত তার কারণ অজানা।

পড়াশোনায় ভৈরবের মন ছিল না। ঐ বয়েসেই সে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক শেখার জন্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরত। ওঝাদের বাড়ি গিয়ে বসে থাকত। সে ওঝারা সাপের ওঝা নয়, ভূত ছাড়াবার ওঝা।

ওর চেহারাটাও ছিল তেমনি। কালো ষণ্ডাগণ্ডা। ছোট করে কাটা চুল। সে চুলে কখনও তেল পড়ত না। আর চোখ দুটো ছিল পাথরের চোখের মতো নিষ্প্রাণ। ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত ওর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না।

এমন ছেলেকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। মহীতোষও পারতেন না। কিন্তু ছুটির পর ভৈরব একরকম জোর করে মহীতোষকে টেনে নিয়ে যেত নির্জন জায়গায়, বিশেষ করে শ্মশান কিংবা কবরখানায়। সেখানে বসে ও যে সব কথা মহীতোষকে শোনাতো তাতে বেচারি মহীতোষের রক্ত জল হয়ে যেত। যেমন ও বলত ও নাকি ভূত নামানো প্রায় শিখে ফেলেছে। অমুক গ্রামের অমুক ওঝা ওর গুরু।

একদিন বলল, খুব ইচ্ছে করে তিব্বত যেতে। ওখানকার লামারা নাকি প্রেতসিদ্ধ। মহী ভাই, চ'না, তোতে আমাতে একবার তিব্বত ঘুরে আসি।

শোনো কথা! তিব্বত যেন এপাড়া ওপাড়া! শুধু গিয়েই, কদিন থেকে ফিরে আসা।

চল না মহী! লেখাপড়া শিখে ভালো ছেলে হয়ে বাড়ি বসে থেকে কি হবে। তার চেয়ে যদি প্রেতসিদ্ধ হতে পারিস তাহলে দুনিয়ার সবকিছু চলে আসবে এই হাতের মুঠোয়।

এসব কথায় মহীতোষ সাড়া দিতে পারতেন না। ভৈরবের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে লাগলেন। ছুটি হতে না হতেই তিনি ছুটে বাড়ি পালাতেন।

একদিন ভৈরব মহীতোষকে একা পেয়ে ওঁর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল। ওর ডান হাতে একটা বাড়তি ছোট আঙুল ছিল। সেটা আবার ছুরির ফলার মতো বাঁকা। দেখলে গা শিউরে উঠত। সেই বেঁটে আঙুলটার তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে মহীতোষের হাতে দাগ কেটে দিয়ে বলল, কিরে! আমায় এড়িয়ে যাচ্ছিস? কিন্তু মনে রাখিস, আমায় দূরে ঠেলে দিলেও আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবি না। আমি তোকে কাছে টানবই।

ছেড়ে দে ভাই, আমায় ছেড়ে দে। বলে কোনোরকমে সেদিন মহীতোষ ওর হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছিলেন।

আবার একদিন পাকড়াও করেছিল ভৈরব। বলেছিল, তুই না যাস আমি একাই তিব্বত যাব। সেখানে যদি মরেও যাই তবু তোকে দেখা দেবই। আমার গুরু বলেন প্রেত-আত্মা খুব ইচ্ছে করলে দেহ ধারণ করে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা দিতে পারে। তবে তার জন্যে আত্মাকে প্রচণ্ড কষ্ট পেতে হয়। মুক্তিও আটকে যায়। তা যায় যাক, তবু তোর সঙ্গে দেখা করতে আসব।

এই পর্যন্ত বলে ভৈরব একটু থেমেছিল। তারপর বলেছিল, তবে একটা কথা, দেখা করতে এলে তুই যদি আমায় অপমান করিস, আমায় তাড়িয়ে দিস তাহলে বন্ধু বলেও খাতির করব না। তোকে মেরে আমার সঙ্গী করে নেব।

মহীতোষ তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন।

বল, কথা দে, দেখা দিলে কাছে ডাকবি?

নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মহীতোষ তাড়াতাড়ি বলেছিলেন, এখুনি মরা-টরার কথা কেন ভাই? এখনও ঢের সময় আছে।

ভৈরব দাঁতের ফাঁকে হেসে বলেছিল, তা আছে। কিন্তু ঐ আর কি 'যদি'-র কথা বললাম। বল, দেখা করতে এলে ফিরিয়ে দিবি না।

না।

প্রতিজ্ঞা?

হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা।

আমায় তখন দেখলে চিনতে পারবি তো? ডান হাতে এই আঙুল—বলে ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে ধরেছিল। অমনি ওর ঐ ক্ষুদে আঙুলটা তিরতির করে কাঁপতে লেগেছিল। আর কপালের বাঁ দিকে এই কাটা দাগ। মনে থাকবে তো?

হ্যাঁ ভাই, থাকবে। খুব থাকবে। বলে কোনোরকমে পালিয়ে এসেছিলেন।

এরপর হঠাৎই একদিন ভৈরব বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একরকম ছুটেই ঢুকলেন মহীতোষবাবুর স্ত্রী। তাঁর মুখে চোখে ভয়ের ছাপ, ছাদে কিসের শব্দ হচ্ছে!

মহীতোষবাবুও চমকে উঠলেন।

ছাদে শব্দ?

হ্যাঁ, শোনো।

মহীতোষবাবু কান পাতলেন। খুব মৃদু একটা শব্দ। কে যেন ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মহীতোষবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে ছাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ছাদে কে?

উত্তর পেলেন না। শব্দটা থেমে গেল। একটু পরে লক্ষ্মণ এসে দাঁড়ালো। সে জানাল, ছাদে একটা খারাপ ধরনের পাখি বসেছিল। সেটাকে ও তাড়াতে গিয়েছিল।

তবু ভালো।

পরক্ষণেই মহীতোষবাবু ভাবেন, তাই বা কেন? এত দিন পর হঠাৎ খারাপ পাখি কোথা থেকে এল?

এত যে কাণ্ড হচ্ছে পরম ধৈর্যবান শ্রোতাটির মধ্যে কিন্তু কোনো চাঞ্চল্য নেই। সেই যে অন্ধকারে মুখ আড়াল করে গল্প শুনে যাচ্ছিলেন, টুঁ শব্দটি নেই। বোধ হয় ঘটনাটা তাঁর ভালোই লাগছে।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে—মহীতোষবাবু আবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। ভৈরবের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তখন তিনি কলকাতার কাছাকাছি এক জায়গার থানার ও সি। একদিন একটা মার্ডার কেস এল। মহীতোষবাবু লাশ দেখলেন। প্রবল আক্রোশে কেউ লোকটাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। এমন তো কত লাশই দেখেছেন তিনি। কিন্তু কেন যে এই মৃতদেহটা দেখে থমকে গিয়েছিলেন তা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল।

মৃতের বয়েস বছর বাহান্ন-তিপ্পান্ন, কালো কুচকুচে রঙ। এই বয়েসেও পেশল চেহারা। নাক থ্যাবড়া। মুখটা যেন চেনা চেনা লাগল। তারপর ডান হাতে ছটা আঙুল দেখেই মহীতোষবাবু চমকে উঠেছিলেন। আঙুলটা আবার ছুরির ফলার মতো বাঁকা।

কপালের রক্তটা মোছো তো। হুকুম দিয়েছিলেন একজন কনস্টেবলকে। রক্তের ছোপ মুছে ফেলতেই দেখা গেল কাটা দাগ। বুঝতে বাকি রইল না এ তাঁর সেই ছোটবেলাকার ক্লাস

আপনি কি হারাচ্ছেন
জানেন কি?

গ্রাহকদের জন্যে
বিশেষ সুযোগ

এক বছরের
পুজো সংখ্যা সহ ১২টি সংখ্যা হাতে নিলে ১২২ টাকার বদলে মাত্র ৯০ টাকা। বুক পোস্টে ১১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ১৭০ টাকা।

দু বছরের
দুটি পুজো সংখ্যা সহ ২৪টি সংখ্যা হাতে নিলে ২৪৪ টাকার বদলে মাত্র ১৭০ টাকা। বুক পোস্টে ২১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৩৩০ টাকা।

তিন বছরের
তিনটি পুজো সংখ্যা সহ ৩৬টি সংখ্যা হাতে নিলে ৩৬৬ টাকার বদলে মাত্র ২৫০ টাকা। বুক পোস্টে ৩১০ টাকা। রেজিঃ পোস্টে ৪৯০ টাকা।

গ্রাহকদের জন্যে এই বিশেষ সুযোগ নিতে হলে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে নিচের ঠিকানায় এম· ও· করুন। চেক ও ড্রাফটেও টাকা পাঠাতে পারেন। বাংলার বাইরের ব্যাঙ্কের চেক হলে ২০ টাকা বেশি লাগবে। 'শুকতারার জন্য' কথাটি পরিষ্কার করে লিখে দেবেন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ফ্রেন্ড ভৈরব। জানা গেল ও নাকি এ অঞ্চলের এক কুখ্যাত সমাজবিরোধী। নিজেদের মধ্যে রেষারেষির জন্যেই প্রাণ হারিয়েছে।

ভৈরব যে তাঁর চেনা মহীতোষবাবু তা প্রকাশ করলেন না। লাশ পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠিয়ে বাসায় ফিরে এলেন। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, একদিন যে প্রেতসিদ্ধ হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল শেষ পর্যন্ত সে হয়ে গেল কিনা একটা ডাকসাইটে সমাজবিরোধী।

যাই হোক এই খুনের তদন্তের ভার পড়েছিল মহীতোষবাবুর ওপরেই। কোথায় কোথায় ভৈরব থাকত, তার দলে আর কে কে আছে, কেই বা ওকে খুন করল এইসব তদন্ত শুরু করতে হলো। কিন্তু বিশেষ কোনো ক্লু পাওয়া গেল না। তা ছাড়া এইসব সমাজবিরোধীদের খুনের কেস নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছেও তাঁর বিশেষ ছিল না। কেসটা ক্রমে ধামা চাপা পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে তাঁর জীবনে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

একদিন।

রাত বেশ গভীর। নিস্তব্ধ অঞ্চলটা। মনে হলো কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে ঠুক ঠুক ঠুক।

ঘুম ভেঙে গেল মহীতোষবাবুর। কিন্তু কিছু আর শোনা গেল না। ভাবলেন, বোধ হয় স্বপ্ন দেখছেন। পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। একটু পরেই আবার সেই শব্দ। এবার বিছানায় উঠে বসেই হাঁকলেন, কে?

উত্তর নেই।

পাঁচ মিনিট পরে আবার সেই শব্দ। এবার জোরে।

মহীতোষবাবু উঠতে যাচ্ছিলেন, ওঁর স্ত্রী বাধা দিলেন, যেও না।

মহীতোষবাবু হচ্ছেন পুলিশ অফিসার। এত অল্পে ভয় পেলে কি তাঁর চলে।

দাঁড়াও দেখি। বলে উঠে আলমারি খুলে রিভলবারটা নিয়ে দরজা খুলতে গেলেন, আর ঠিক তখনই দরজার বাইরে থেকে একটা অল্পবয়সী ছেলের গলা শোনা গেল, মহী, আমি এসেছি, খুব দরকার।

গলার স্বর শুনে মহীতোষবাবু অবাক! যেন অনেক দিন আগের খুব চেনা গলার স্বরটা। তাড়াতাড়ি দরজা খুললেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সামনে সরু এক ফালি প্যাসেজ আছে। প্যাসেজটা গিয়ে পড়েছে বড়ো রাস্তায়। এই প্যাসেজ দিয়েই যাওয়া-আসা করতে হয়। দরজার সামনে কেউ নেই দেখে মহীতোষবাবু প্যাসেজের উপর টর্চ ফেললেন। দেখলেন সেখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে। খালি-গা, পরনে একটা লুঙ্গি। মাথায় ফেট্টি বাঁধা। মুখটা রক্তে জবজবে।

এ আবার কে? এত রাত্তিরে এখানে কেন? পুলিশের লোক বলে লোকটা কি নালিশ জানাতে এসেছে?

তাকে কিছু বলতে যাবেন, স্পষ্ট দেখলেন লোকটা হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকছে।

মহীতোষবাবু রিভলবারটা শক্ত করে ধরে এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে গেলেন একেবারে ওর তিন ফুটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে এক চাঙড় বরফ যেন তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে নেমে গেল। হাত পা অসাড় হয়ে এল।

কে এ? এ তো ভৈরব। সেই যে খুন হয়েছিল। যার খুনের কিনারা এখনো হয়নি। আশ্চর্য! সে কি করে—

পরক্ষণেই দেখলেন ও এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। হাতের ইশারায় কেবলই ডাকছে, এসো—আমার সঙ্গে এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি ওর পিছনে পিছনে চললেন। ও গলি থেকে পথে নামল। রাস্তা নির্জন—অন্ধকার। আগে আগে চলেছে ভৈরবের ছায়ামূর্তি। পিছনে মহীতোষবাবু। মাঝেমাঝেই সে পিছন ফিরে দাঁড়াচ্ছে আর ইশারায় ডাকছে।

ও কোথায় কী উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! মহীতোষবাবু চলেছেন তো চলেছেনই। একটা কথাই শুধু ওঁর মনে পড়ছে, দরজা ঠেলবার সময়ে ছোটো ছেলের গলায় ভৈরব বলেছিল, খুব দরকার।

কিসের দরকার? তবে কি ও ওর খুনীর কাছে নিয়ে যেতে চায়?

এ কথা মনে হতেই মহীতোষবাবু খুব ভয় পেলেন। এভাবে একা যাওয়া তাঁর উচিত নয়। তখনই তিনি ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ঠিক কোথায় এসে পড়েছেন বুঝতে পারলেন না। তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। পা দুটো যেন অসাড় হয়ে এল। তিনি আর হাঁটতে পারলেন না। ফুটপাথের ওপরেই বসে পড়লেন।

জ্ঞান ফিরে এল ভোরবেলায়। তখন একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

এই পর্যন্ত বলে মহীতোষবাবু থামলেন। ধূর্জটিবাবু সেই যে শীতের ভয়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে গুটিসুটি আধ-শোওয়া হয়ে ছিলেন, তেমনিই রয়েছেন। সাড়াশব্দ নেই। ঘরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর হাওয়া থমথম করছে। বাইরে কতকগুলো কুকুর কেন যে এই বাড়িটা লক্ষ্য করেই ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করতে লাগল কে জানে!

ঘরে এই মুহূর্তে মহীতোষবাবু আর ধূর্জটিবাবু ছাড়া অন্য কেউ নেই। তবে কেন কুকুরগুলো—

না, ঘরে আরো একজন কখন নিঃশব্দে এসে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মহীতোষবাবুর কথা শুনছে কেউ তা খেয়াল করেনি।

কে? ও লক্ষ্মণ। মহীতোষবাবু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। দে তো বাবা, জানলাগুলো বন্ধ করে। বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।

লক্ষ্মণ কোনো উত্তর দিল না। দৈত্যের মতো বিরাট চেহারা নিয়ে ধুপ ধুপ করে পায়ের শব্দ তুলে জানলাগুলো বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

তারপর—

কি মশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

বলে যান। মুখ না তুলেই কফ-জড়ানো স্বরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ধূর্জটিবাবু।

তারপর থেকে প্রায়ই রাত দুপুরে দরজার শব্দ। মহীতোষবাবুকে উঠতে হতো। দেখতেন দরজার বাইরে ভৈরব দাঁড়িয়ে।

একদিন বিরক্ত হয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়েছিলেন। উঃ ভৈরবের সে কী রাগ! কী দৃষ্টি! চোখ দুটো যেন হলদে বোতামের মতো অভিব্যক্তিশূন্য অথচ ভয়ঙ্কর। মনে হচ্ছিল তক্ষুণি বুঝি মহীতোষবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ছটা আঙুল দিয়ে টুঁটি চেপে ধরবে।

বাধ্য হয়ে মহীতোষবাবুকে বাড়ি বদলাতে হলো। কিন্তু সেখানেও ভৈরব হাজির। এমনি করে যেখানেই যান ভৈরবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না। একদিন তো সবে সন্ধ্যেবেলা—লোডশেডিং। বাড়ি ফিরছিলেন মহীতোষবাবু। দেখলেন গলির মুখে ভৈরব কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন আর নাম ধরে ডাকে না। শুধু ওর সেই ভয়ঙ্কর হলুদ বোতামের মতো চোখ দিয়ে যেন গিলতে আসে।

তাই, শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন একেবারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। কী বলব মশাই, ভৈরবের ভয়ে রাতে ঘুমুতে পারতাম না। এখানে এসে মনে হচ্ছে নিস্তার পেয়েছি।

গল্প আমার এখানেই শেষ। বলে মহীতোষবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। আরামে একটা সুখটান দিয়ে বললেন, এসব কথা কাউকে বলিনি—বলতে চাই না। বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। নেহাৎ আপনি—

কথা শেষ হলো না মহীতোষবাবুর। তাঁর মনে হলো ঘরটা যেন হঠাৎ কুয়াশায় ভরে উঠছে।

এ কী! এত কুয়াশা কোথা থেকে এল? জানলাগুলো তো সব বন্ধ।

এমনি সময় সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে ধূর্জটিবাবু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলেন। হলদে বোতামের মতো দুটো চোখ কুয়াশার ভেতরেই ধিকি ধিকি জ্বলছে। একটানে খুলে ফেললেন হাতের দস্তানাটা। লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় দেখা গেল শীর্ণ একটা হাত ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সেই হাতে ছটা আঙুল। ছুরির ফলার মতো অতিরিক্ত সেই আঙুলটা কাঁপছে তিরতির করে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গেলেন মহীতোষবাবু কিন্তু কুয়াশায় দম বন্ধ হয়ে গেল।

দুদিন পর সুস্থ হয়ে উঠলেন মহীতোষবাবু। কি যে ঘটেছিল কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। জানলেন সেই রাত্রে লক্ষ্মণই ডাক্তার ডেকে এনে তাঁকে বাঁচায়। কিন্তু ধূর্জটিবাবুর পাত্তা আর পাওয়া যায়নি।

সেদিন বিকেলে সেই দোতলা বাড়িতে ধূর্জটিবাবুর খোঁজ নিতে গেলেন মহীতোষবাবু। অবাঙালী বৃদ্ধ একজন বললেন, দুদিন আগে হঠাৎ ভোরবেলায় সেই বাঙালীবাবু চলে গেছেন। তিনি এঁদের কেউ নন। চিনতেনও না। কলকাতা থেকে নাকি এসেছিলেন কয়েক দিনের জন্য। কোথাও থাকার জায়গা পাচ্ছিলেন না বলে বাইরের ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলেন।

মহীতোষবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

দশমীর সন্ধ্যে

অপূর্ব দত্ত

ডানদিকে ঢালু পথ চলে গেছে, কিছু এগোলেই মাঠ,
কেউ বলে নাকি অনেক আগেতে ওখানে বসত হাট।
কেউ বলে ওটা চৌধুরীদের সাবেকি বসতভিটে
মাঝরাত্তিরে একা হেঁটে গেলে হাওয়া খেলে যেত পিঠে।

সেই মাঠ আজ তিন পুরুষের বারোয়ারি পুজোতলা
ছোটতে সেখানে গেছি একা, কত খেয়েছি যে কানমলা।
মহালয়া থেকে পুজো শুরু হতো, লক্ষ্মীপুজোয় শেষ,
তারপরে আরও কুড়িদিন ধরে চলত যে তার রেশ।
ছুটির অংক, ড্রয়িংয়ের খাতা থাকত শিকেয় তোলা
ছোটকা বলত–"তুই দেখি বেশ হয়েছিস ব্যোমভোলা।"
নবমীর দিন মজা হতো ভারী, রামদীন সর্দার,
ইয়া বড় গোঁফ, গলায় রুপোর তাবিজ ঝোলানো তার–
ঠাকুরদালানে হাড়িকাঠ ছিল, পুঁচকে একটা পাঁঠা
এক কোপে ধড়মুণ্ডু আলাদা, কাঁপত বুকের পাটা।
দশমীর সেই সন্ধ্যেটা আজও বারবার মনে ভাসে
এক নিমেষেই মৃত্যু ঘটত সব হাসি উল্লাসের।
এই বয়েসেও এখনো দশমী তেমনই বিষাদময়
ছেলেবেলাটাই ঘুরে ফিরে আসে, তাছাড়া কিছুই নয়।

ছবিঃ সুফি

পাহারাদার

নটরাজন

এমন জানলে এখানে কিছুতেই বাড়ি করতেন না বিপ্রদাস। ভেবেছিলেন, জায়গাটা যখন কেনা পড়ে আছে, আর তাঁর নিজের রিটায়ার করতেও যখন আর বেশি দেরি নেই, তখন কোনোরকমে একখানা ছোটখাটো বাড়ি তৈরি করে নিজের বাড়িতে উঠে আসবেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে পরের বাড়িতে কতকাল আর ভাড়া থাকবেন? সেই ইচ্ছাতেই বাড়ি তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হায় ভগবান, এ কোন জায়গায় বাড়ি করছেন তিনি? চোর–চোর, চারিদিকেই যেন চোর কিলবিল করছে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু চুরি হয়ে যাচ্ছে। ইঁটের থাক থেকে আজ যদি চুরি যায় বিশ-পঁচিশ খানা ইঁট, তো কাল চুরি যাচ্ছে দু'চার ঝুড়ি বালি কিংবা পাথরকুচি। একদিন তো দু'বস্তা সিমেন্টই চুরি হয়ে গেল। প্রতিবেশীদের কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা এমন ভাব দেখাবে যেন বাড়ি তৈরি করতে হলে এ জাতীয় চুরি অবশ্যই হবে। এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই।

মাথা না ঘামিয়ে পারেন না বিপ্রদাস। ধার-দেনা করে কষ্টের পয়সায় বাড়ি তৈরি করছেন। আগুনের মতো দাম জিনিসপত্রের। তাতে যদি প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু চুরি হতে থাকে তাহলে কতদিন তা সহ্য করা চলে? এ নিয়ে বাড়িতেও বিপ্রদাসের অশান্তি। স্ত্রী কনকপ্রভা মুখ ঝামটা দিয়ে বিপ্রদাসকে বলেন, এভাবে আর কতদিন চোরের পেটে পয়সা ঢালবে? তার চাইতে কাজ বন্ধ করে দাও। এমন চোরের জায়গায় বাস না করাই ভালো।

কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে মনে করেছ? বলতে থাকেন বিপ্রদাস, হাতের কাছে চুরির জিনিস না পেলে শেষে একটি একটি করে বাড়ির ইঁটই খুলে নিয়ে যাবে। আমি তো আর অফিস-কাছারি বন্ধ করে রাত দিন বাড়ি পাহারা দিতে পারবো না?

তাহলে কি এমনি ক্ষতি সহ্য করে যেতে হবে? কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলতে থাকেন কনকপ্রভা, এর কি কোনো প্রতিকার হবে না? আসলে পাশের ঐ বস্তির লোকেরাই এই চুরি করে। থানায় গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে নালিশ করো। ব্যাটাদের ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ একটু আধটু ঠেঙালেই চুরি বন্ধ হবে।

জবাব দেন বিপ্রদাস, ঐ এলাকায় ঐ বস্তির লোকেরাই তো সংখ্যায় বেশি। বাড়ি তৈরির আগেই যদি ওদের শত্রু করে তুলি তাহলে কি আর ওখানে শান্তিতে বাস করতে পারবো?

একটু চিন্তা করে কনকপ্রভা আবার বললেন, তাহলে একজন দারোয়ান গোছের লোকের ব্যবস্থা করো যে নাকি রাতে বাড়িতে থেকে জিনিসপত্র পাহারা দেবে। দিনের বেলায় তো মিস্ত্রিরা কাজ করে। চুরি তো হয় রাতে।

স্ত্রীর কথায় একটু ম্লান হেসে বিপ্রদাস বললেন, তুমি কি

ভেবেছ সেই চেষ্টা আমি করিনি? মাসে একশো টাকা মাইনে দিয়ে বাইরের একটা লোককে প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিলাম। বাংলাদেশের লোক। রিকশা চালায়। থাকার জায়গা নেই। রাতে রাস্তার ধারে ঘুমোয়। থাকার জায়গা ও সেই সঙ্গে মাইনে দেব শুনে সে এককথায় রাজী হয়ে গেল। একদিন এসে রইলোও বাড়িতে। তালা চাবি লাগিয়ে রিকশাটাকে বাইরে রেখে দিলে। পরের দিন সকালে উঠে দেখে যে তালা ভেঙে তার রিকশাটাই হাওয়া। আমি যেতেই হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে লাগলো। শেষে লোকটার পকেটে কিছু পয়সা আক্কেলসেলামি হিসেবে গুঁজে দিয়ে তাকে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পাঠিয়ে তবে রেহাই পাই।

তাই নাকি? কৈ, এ কথা তো তুমি এতদিন আমাকে বলোনি? কনকপ্রভার কণ্ঠে অনুযোগ।

জবাব দেন বিপ্রদাস, বলে কিছু লাভ হতো না বলেই বলিনি। এখন ভাবছি ঐ দারোয়ান-টারোয়ানে কিছু কাজ হবে না। ঐ দারোয়ান নিজেই যে জিনিসপত্র চুরি করবে না কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে চুরি করাবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? তাই ভাবছি, ঐ মিস্ত্রিদের মধ্যেই যদি কাউকে বলে কয়ে রাতে ওখানে থাকতে রাজী করাতে পারি তাহলেই ভালো হয়। সারাদিন কাজ করবে। রাতে ওখানেই রান্না করবে, খাবে, শোবে। ঘরগুলোর কাজ শেষ হতে তো অনেক দেরি। বাড়ি তৈরির মাল-মশলা না হয় বাইরে না রেখে ঘরেই তুলে রাখার ব্যবস্থা করবো।

স্বামীর কথাটা ঠিক মনঃপূত হয় না কনকপ্রভার। বললেন, সে কি গো, নতুন বাড়িতে রান্না করতে গিয়ে চারিদিকে কালিঝুলি ফেলবে। ঘরদোর নোংরার একশেষ করে ছাড়বে। না বাপু, আমার ঐ নতুন বাড়িটা এভাবে নষ্ট হতে দেব না।

না—না, বললেন বিপ্রদাস, নষ্ট হবে কেন? এখনও তো দেয়ালে পলেস্তারা লাগেনি। কালিঝুলি পড়লেও কোনো ক্ষতি হবে না এখন।

নিজের এই পরিকল্পনার কথা স্ত্রী কনকপ্রভাকে বললেও সময় ও সুযোগের অভাবে কোনো ব্যবস্থাই তখনও করে উঠতে পারেননি বিপ্রদাস। আর তারই মধ্যে একদিন বাড়িতে একটা বড় ধরনের চুরি হয়ে গেল। একে চুরি না বলে বোধহয় ডাকাতি বললেই ঠিক হবে।

কাঠের দরজা-জানালার কাজ হচ্ছিল বাড়িতে। ছুতোর মিস্ত্রি কয়েকটা দরজা-জানালার কাঠের ফ্রেম তৈরি করে লোহার আংটা দিয়ে দেয়ালে লাগিয়েছিল। একদিন সকালে দেখা গেল কে বা কারা যেন জানালা গলে ভেতরে ঢুকে লোহার আংটা ভেঙে দরজার দু'খানা কাঠের ফ্রেম চুরি করে নিয়ে গেছে।

খবর পেয়েই অফিস কামাই করে বিপ্রদাস ছুটলেন থানায়। মনে মনে বললেন, নাঃ, আর কোনো চক্ষুলজ্জা নয়। এবার পুলিশ দিয়ে ঐ ব্যাটাদের শায়েস্তা করাতেই হবে, বড় বাড় বেড়েছে ওরা।

থানা অফিসার কিন্তু বিপ্রদাসের অভিযোগ প্রায় গ্রাহ্যই করলেন না। বললেন, খালি বাড়ি থাকলে চোর তো চুরি করবেই। তা, ঐ বস্তির লোকেরাই যে চুরি করেছে তার কোনো প্রমাণ আছে?

আজ্ঞে না, আমতা আমতা করে জবাব দেন বিপ্রদাস, তবে আমার সন্দেহ—

কথাটা শেষ করতে পারেন না বিপ্রদাস। তার আগেই সেই অফিসার আবার বলে ওঠেন, সন্দেহ আর প্রমাণের মধ্যে রাম ও রামছাগলের তফাৎ। প্রমাণ যখন নেই তখন থানায় দৌড়দৌড়ি করে অযথা সময় নষ্ট না করে বাড়ি গিয়ে নিজের জিনিস নিজে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন।

হতাশ বিপ্রদাস বাড়ি ফিরে এসে মনে মনে সঙ্কল্প করেন, যে করেই হোক বাড়ি পাহারার জন্যে একটা লোকের বন্দোবস্ত করতেই হবে।

সেদিন মিস্ত্রিদের টাকাপয়সা দিতে গিয়ে তাদের কাছে কথাটা পাড়লেন বিপ্রদাস। বললেন, আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ তো থাকো বারাসাত, কেউ বা মছলন্দপুর কিংবা গোবরডাঙা। এতদূর থেকে যাতায়াত করতেই তো তোমাদের অনেক সময় চলে যায়। তার চাইতে তোমরা যদি এখানেই থাকতে পারো তাতে তো তোমাদেরই সুবিধা, কি বলো?

বিপ্রদাসের কথার কোনো জবাব না দিয়ে মিস্ত্রিরা চুপ করে থাকে। বিপ্রদাস আবার বললেন, বাড়ির কাজ শেষ হতে তো অনেক দেরি। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে তোমরা এখানেই থাকতে পারো। এখানেই রান্নাবান্না করে খাবে, এখানেই থাকবে। এতে তোমাদেরও যেমনি সুবিধে তেমনি বাড়ির মালপত্র চুরি যাবার ভয়ও আর থাকবে না।

এতক্ষণে মিস্ত্রিদের মধ্যে একজন জবাব দেয়, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন কত্তা। কিন্তু বাড়িতে আমাদের বৌ, ছেলে-মেয়েরা রয়েছে। আমরা এখানে থাকলে সেখানে তাদের দেখবে কে?

তা অবশ্যি ঠিক। মিস্ত্রিদের কথায় সায় দেন বিপ্রদাস, পরিবার-পরিজন ছেড়ে তোমরা এখানে এসে থাকবেই বা কেমন করে? কিন্তু কি করা যায় বল তো? চুরি বন্ধ না হলে তো ভারি মুশকিল।

এই সময় একজন মিস্ত্রি বলে ওঠে, এখানে থাকার কথা যদি বলেন তো কত্তা, একমাত্র বলরাম ইচ্ছে করলে থাকতে পারে। ওর বৌ গত বছর মারা গেছে। সেই থেকে বেচারি একা।

মিস্ত্রি নয়, যোগাড়ের কাজ করে বলরাম। বছর পঁয়ত্রিশের মতো বয়স। কালো ছিপছিপে চেহারা। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বলরামকে ডেকে বিপ্রদাস তার কাছে কথাটা পাড়তেই কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে বলরাম।

জিজ্ঞেস করেন বিপ্রদাস, কিহে বলরাম, সংসারে তোমার যখন কেউ নেই তখন তোমার এখানে থাকতে অসুবিধে কোথায়? থাকা, খাওয়া, কাজকর্ম—সবই এখানেই করবে।

মুখ তুলে মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় বলরাম, না কত্তা, বৌ না থাকলেও একটা ছেলে আছে আমার। তাকে ফেলে আমি একা এখানে এসে থাকি কেমন করে?

তাই নাকি? তা তোমার ছেলের বয়স কতো? বাড়িতে থাকে কার কাছে?

কার কাছে আর থাকবে কত্তা? একাই থাকে। গাঁয়ের মানুষ আমরা। সাত আট বছরের ছেলেটার দিকে আশেপাশের লোকেরাই একটু আধটু নজর রাখে। গতরে খেটে যখন পেটের ভাত যোগাড় করতে হবে তখন তো আর ছেলেকে পাহারা দিতে বাড়িতে বসে থাকতে পারি না?

কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিপ্রদাসের কথাই চিন্তা করছিল বলরাম। গত বছরের ঝড়ে তার ঘরের চাল সেই যে উড়ে গেছে, পয়সার অভাবে এতদিন তা আর মেরামত করতে পারেনি। শীত-গ্রীষ্ম ঐ ভাঙা ঘরেই তাদের বাপ ব্যাটার কেটেছে। সামনে বর্ষাকাল। বর্ষায় তো আর ঐ ভাঙা ঘরে থাকা যাবে না। কাজেই সামনের বর্ষাটা যদি বাপ ব্যাটায় কত্তার ঐ বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারে তাহলে মন্দ কি?

রাজী হয়ে গেল বলরাম। আর হাতে যেন স্বর্গ পেলেন বিপ্রদাস। এতদিনে বাড়ি পাহারার একটা লোক পাওয়া গেল। এবার হয়তো চুরি বন্ধ হবে।

হলোও ঠিক তাই। সন্ধ্যের পরে যে বাড়িটা অন্ধকারে এতদিন ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো, সেখানে কেরোসিন লম্ফর আলো জ্বলে উঠতেই সাবধান হলো চোরেরা। সন্ধ্যার অন্ধকারে মালপত্র হাতিয়ে নেবার সুযোগ আর রইলো না। আর এর আসল কৃতিত্ব কিন্তু বলরামের চাইতে তার আট বছরের ছেলে গদাইয়েরই বেশি। সারাদিন খাটাখাটনির পরে বলরাম মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঐটুকু ছেলে গদাইয়ের ঘুম কিন্তু খুবই পাতলা। কোথাও খুট করে একটু শব্দ হলেই তার ঘুম ভেঙে যায়। ছেঁড়া মাদুরের ওপর উঠে বসে সে ঠেলে তোলে বলরামকে। গদাইয়ের এই সতর্কতায় একদিন এক ছিঁচকে চোর বলরামের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল। খবরটা বিপ্রদাসের কানে যেতেই তিনি খুশি হয়ে একটা নতুন জামা কিনে দিয়েছিলেন গদাইকে।

সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্নাবান্না সেরে নেয় বলরাম। তারপর ছেলেকে খাইয়ে ও নিজে খেয়ে কাজে লেগে পড়ে। গদাই সারাটা দিন আপন মনে ঘুরে বেড়ায় বাড়ির মধ্যে। কখনও মিস্ত্রিদের পিছে পিছে ঘুরে তাদের ফাইফরমাস খাটে। কখনও বা একা একাই নিজের মনে খেলা করে। গদাইয়ের দাপটে বাড়ির ত্রিসীমানায় কাক-পক্ষীটি পর্যন্ত আসার সুযোগ পায় না। এমনকি গদাইয়ের ঢিলের ভয়ে রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরগুলো পর্যন্ত আর ঘেঁষে না এদিকে। সময় সময় গদাই তন্ময় হয়ে মিস্ত্রিদের কাজ দেখে আর মনে মনে তাদের তারিফ করে। তাদের হাতের ছোঁয়ায় চৌকো ইঁটগুলো কেমন সুন্দর দেয়ালের রূপ ধরে। মনে মনে সে ঠিক করে বড় হয়ে সে ওদের মতোই মিস্ত্রি হবে। তার বাবার মতো যোগাড়ের কাজ করবে না।

মাসের পর মাস কাটে। একটু একটু করে খুলতে থাকে বাড়ির রূপ। আর এই রূপ যতই বাড়তে থাকে ততই আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে গদাই। তার ভাব-ভঙ্গিতে মনে হয় সে নিজেই যেন এই বাড়িটির মালিক। কিন্তু সে যে মালিক নয় সেই বোধ তার আছে। সে জানে, এই বাড়িতে সে ও তার বাবা পাহারাদার মাত্র। বাড়ির কাজ যেদিন শেষ হবে সেদিন তাদের চলে যেতে হবে নিজেদের গাঁয়ের সেই ভাঙা বাড়িতে। ছোট ছেলে গদাইয়ের এই ভাবভঙ্গিতে মজা পায় মিস্ত্রিরা। এ নিয়ে মাঝে মধ্যে তারা ঠাট্টাও করে গদাইকে। কিন্তু গদাই এসব একেবারেই গায়ে মাখে না। যদিও সত্যি নয়, তবুও এই বাড়িখানাকে নিজের বলে ভাবতে ভালই লাগে তার।

রাত দিন বাড়ির মধ্যে একা ঘুরে ঘুরে এর প্রতিটি ইঁটের সঙ্গেই পরিচিত হয়ে উঠলো গদাই। এখন তাকে চোখ বেঁধে দিলেও যেন সে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে অনায়াসে। একতলা হলেও মস্ত বড় বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। পর পর দু'খানা ঘর পার হয়ে পেছনদিকে টানা বারান্দা। এই বারান্দাখানাই সবচাইতে প্রিয় গদাইয়ের। বারান্দার বক্স জানালার উঁচু বেদীটার ওপর বসলে দূরের রেললাইন স্পষ্ট দেখা যায়। ইদানীং দিনের বেলায় তো বটেই, এমনকি রাতেও সে এখানে বসে ইলেকট্রিক রেলগাড়ির যাতায়াত দেখে আর কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে দূর দূরান্তরে পাড়ি দেয়।

অবশেষে একদিন শেষ হলো বাড়ির কাজ। সেই সঙ্গে শেষ হলো বলরাম ও গদাইয়ের এই বাড়িতে থাকার মেয়াদ।

গৃহপ্রবেশের দিন অতিথি-অভ্যাগতের ভিড়ে গমগম করছে বাড়ি। নিমন্ত্রিতের তালিকায় মিস্ত্রিরাও আছে। বিপ্রদাস সেদিন একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বকশিস দিয়েছিলেন গদাইকে। ছেঁড়া ময়লা জামার বুকপকেটে সেই নোটখানা সন্তর্পণে ভাঁজ করে রেখে বেশ গর্বভরেই চলাফেরা করছিল গদাই।

বাড়ির গৃহিণী কনকপ্রভার ইচ্ছায় বাইরে ম্যারাপ খাটিয়ে অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে ঘরদোর ময়লা না হয়। বাপ বলরামের পাশে খেতে বসে গদাই ফিসফিস করে বলরামকে জিজ্ঞেস করে, খেয়ে উঠে একবার বাড়ির মধ্যে যাবো বাবা?

কেন? খেতে খেতে ছেলের দিকে তাকায় বলরাম।

না, এমনি। জবাব দেয় গদাই।

কেন, এমনি কেন?

চাটনির হাত চাটতে চাটতে তেমনি নিচু কণ্ঠেই জবাব দেয় গদাই, পেছনের সেই বারান্দাটা সাজিয়ে গুছিয়ে এখন কেমন দেখতে হয়েছে তাই একবার দেখে আসবো।

একটু চিন্তা করে বলরাম বললে, না-না, দরকার নেই। বাড়ি-ভর্তি লোক। কে আবার কী বলবে!

কেন, বলবে কেন? বলে ওঠে গদাই, এতদিন এই বাড়িতে তো আমরাই থেকেছি।

তখন বাড়ির দেখাশোনার ভার ছিল আমাদের ওপর। এখন তো আর তা নয়।

গদাই আর কিছু না বলে তখনকার মতো খাওয়ার দিকে মন দিলেও বাড়ির সেই সাজানো-গোছানো পেছনের বারান্দায়

যাবার কথাটা কিন্তু ভুলে যায়নি। তাই খাওয়া-দাওয়ার পরে মিস্ত্রিরা যখন এক জায়গায় জড়ো হয়ে গল্প করছে তখন এক ফাঁকে বাপ বলরামের কাছ থেকে সরে গেল গদাই।

একে ভালো-মন্দ খাওয়া তার ওপর পকেটে একখানা কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকার নোট। মনে মনে খুবই খুশি গদাই। পায়ে পায়ে সে এসে দাঁড়ায় নতুন বাড়ির দরজার সামনে। ভারি সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে বাড়িখানা। লোকজন যাচ্ছে আসছে। এই বাড়ির সবকিছু তার মুখস্থ। একটু সময় ইতস্তত করে গদাই। তারপর সোজা ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে।

ঘরভর্তি লোক। গদাইয়ের বয়সী ছেলে-মেয়েরা ভালো জামাকাপড় পরে হুটোপুটি করছে। গল্প-গুজব করছে বড়রা। গদাইয়ের দিকে নজর পড়ে না কারুর, কিংবা হয়তো পড়লেও ছোকরা চাকর-বাকর বলে মনে করেছিল।

প্রথম ঘরটা পার হয়ে দ্বিতীয় ঘর। এর পরেই গদাইয়ের সেই প্রিয় বারান্দা যেখানে বসে সে দূরের রেলগাড়ি যাতায়াত দেখতো দিনের পর দিন। এই দ্বিতীয় ঘরে মেয়েদের ভিড়।

পায়ে পায়ে গদাই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই একজন মাঝবয়সী মোটা মহিলা খপ করে গদাইয়ের একটা হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, এই,এই তুই কে? কেন এসেছিস এখানে?

গদাই কিছু বলার আগেই আর একজন মহিলা বলে ওঠে, চোর-ছ্যাঁচোড় নাকি? কাজের বাড়ির ভিড়ে কিছু হাতাবার মতলবে ঢুকে পড়েছে?

ওমা, তাই নাকি? সমস্বরে বলে ওঠে অনেকে, কি দিনকাল পড়েছে রে বাপু! দিন-দুপুরে ঘরের মধ্যে চোর!

চোর—চোর! শোরগোল ওঠে মেয়েদের মধ্যে। পাশের ঘর থেকে একজন যণ্ডা গোছের যুবক ছুটে এসে ঠাস করে গদাইয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, কিরে, কী চুরি করতে এখানে ঢুকে পড়েছিস?

চড় খেয়ে চোখ ফেটে জল এলেও নিজেকে সামলে নেয় গদাই। ততক্ষণে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে সেখানে। ঘাবড়ে গিয়ে গদাই কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কেবল উচ্চারণ করে, ওপাশের বারান্দায়।.

কী—ওপাশের বারান্দায় কী? আর একজন গদাইয়ের মাথার চুল মুঠোয় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে থাকে, ওপাশে যে একটা বারান্দা আছে তাও তো দেখছি জানে। বেশ ভালো মতো তৈরি হয়েই এসেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির গৃহিণী কনকপ্রভা শোরগোল শুনে সেখানে না এলে গদাইকে হয়তো আরও বেশি লাঞ্ছিত হতে হতো। কনকপ্রভা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে গদাইকে চিনতে পেরে বলে ওঠেন, আরে গদাই যে। তা বাপু, তুই একপা ধুলো নিয়ে বাড়ির মধ্যে কেন? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো বাইরে গিয়ে বোস।

একটা কথাও না বলে মাথা নিচু করে গদাই বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে। পেছনের বারান্দাটা আর দেখা হলো না তার।

বাপ বলরামের সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে সারাটা পথ গদাই একেবারে বোবা হয়ে রইলো। একটা কথাও বলেনি। একটা প্রশ্নও করেনি। রেলগাড়ির কামরায় বাপের পাশে কেবল বসে রইলো স্থির হয়ে।

একসময় বলরাম হঠাৎ বলে ওঠে, পঞ্চাশ টাকার নোটটা কোথায় রেখেছিস? ওটা আমার কাছে দে। নইলে হারিয়ে ফেলবি।

ডাগর চোখ দু'টি মেলে কয়েক মুহূর্ত বাপের দিকে তাকিয়ে থাকে গদাই। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে, যাদের টাকা তাদেরই বাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছি বাবা।

কথাটা বলেই বাপের কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে সেই আট বছরের ছেলেটা।

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

সত্যি-মিথ্যে

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

একজোড়া প্যাঁচাপেঁচি
দিনরাত চ্যাঁচামেচি—করতো বাড়ির অলিন্দে
ওদের ওই দুষ্টুমি
সইতো না ঝুমঝুমি—করতো কেবলি সে-নিন্দে।

ঠাম্মা আর মা তার
বলেছেন বারবার—পৃথিবীতে যত আছে পক্ষী
শালিক-ময়না-টিয়া
বুলবুলি-কাকাতুয়া—সব থেকে প্যাঁচাপেঁচি লক্ষ্মী।

ওদের তাড়াতে নেই,
প্যাঁচাপেঁচি যেখানেই—লক্ষ্মীর বসবাস সেখানেই
ঝুমঝুমি হেসে বলে
সেই যুগ গেছে চলে—সেকেলে কথার নেই দাম নেই।

দুম-দাম ঢিল ছুঁড়ে
প্যাঁচাপেঁচি গেল উড়ে—এক মাস পরে বাবা বললেন,
চাকরিটা গেছে তাঁর
ঠাম্মার মুখভার—কে জানে এখন কী করবেন?

বুঝলো না ঝুমঝুমি
সত্যি মিথ্যে কী—কে জানে কখন কীসে কী যে হয়!
পুরানো বলেই তা
কোনো কিছু মানব না—এমন কথাও নয় ভাল নয়।

ছবি: সুফি

একটি শিশুর জন্য

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয়নি!

সে যুদ্ধ নিবারণ করেছিল একটি শিশু! কতই বা বয়স হবে তার–তিন কিংবা চার। মুখে ভাল করে কথা পর্যন্ত ফোটেনি। কচি মুখে একগাল হাসি নিয়ে সবেমাত্র দুরন্তপনা করে বেড়াতে শিখেছে। তবু এই শিশুই বাঁচিয়েছিল হিন্দুস্থানের অসংখ্য মানুষকে–রক্তক্ষয় আর প্রাণহানির কবল থেকে। সে না থাকলে সত্যিই রক্তে লাল হয়ে যেত সরযূ নদীর জল। হাহাকার আর কান্নায় ভারী হয়ে উঠতো আকাশ আর প্রকৃতি।

শুধু কি তাই–যুযুধান দুপক্ষের মধ্যে একপক্ষের নায়ক কলঙ্কিত হতো পিতৃঘাতক বলে কিংবা অন্যপক্ষ পুত্রের হত্যাকারী হিসেবে।

এ কাহিনী আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগেকার।

গৌড়ের শাসনকর্তা বোঘরা খাঁ তাঁর রাজধানী লখনৌতির খাস দরবার থেকে যাকে বলে রাগে গরগর করতে করতে গিয়ে ঢুকলেন বেগম মহলে।

বেগম তখন তাঁর কক্ষে দিব্যি আয়াসে পান চিবুতে চিবুতে প্রিয় বাঁদীর সংগে খোশগল্প করছিলেন।

নবাবকে দেখে বাঁদী তসলিম জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সেইটুকুর যা অপেক্ষা। তারপরই বোঘরা খাঁ রাগে যেন ফেটে পড়লেন, তোমার আদরেই ছেলেটা এমন উদ্ধত, অপদার্থ হয়েছে বেগম। তার এত বড় সাহস, সে কিনা আমাকেই অপমান করে চিঠি পাঠায়!

বেগম তাঁর পালঙ্কে শুয়েছিলেন, এবার উঠে বসলেন। স্বামীর রাগে তাঁর বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে মনে হলো না, বরং পুত্র পত্র পাঠিয়েছে শুনে বেগমের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, বেটা আমার চিঠি দিয়েছে। কেমন আছে বেটা কাইকোবাদ ? বহু,পোতা কাইমুর সব ভাল আছে তো ?

–থাম। বেগমের কথা শেষ হবার আগেই ধমকে ওঠেন বোঘরা খাঁ, ও ছেলে বংশের কুলাঙ্গার। আর কিছুদিনের মধ্যেই ওর হাত থেকে মসনদ কেড়ে নেবে ওরই উজির নাজিমুদ্দীন। দিল্লীর মসনদ চলে যাবে বলবন বংশের হাত থেকে। সে ব্যাপারে হুঁশ আছে তোমার বেটা কাইকোবাদের ?

–হায় আল্লা। শুনতে শুনতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বেগম সাহেবা। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আমার বেটা ছেলেমানুষ। তার পেছনে লেগেছে শয়তান উজির আর নিমকহারাম ওমরাহের দল....

–চুপ কর। আবার ধমকে উঠলেন বোঘরা খাঁ, তোমার পুত্র নিজেই এখন এক আস্ত শয়তান, না হলে আমার চিঠির উত্তরে সে কিনা লেখার সাহস পায় যে, তাকে উপদেশ না পাঠিয়ে আমি যেন সুলতান হিসাবে উপঢৌকনসহ তসলিম পাঠাই!

বলতে বলতে ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন বোঘরা খাঁ, খুব শীঘ্রই সেই বেত্তেমিজের উপঢৌকন পাবার সাধ আমি মিটিয়ে দেব। আকিল খাঁকে আমি হুকুম করেছি ফৌজ তৈরি করতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিল্লী অভিযানে বেরুবো আমি।

উপঢৌকন পাবার সাধ আমি মিটিয়ে দেব।

ঘটনার পটভূমিটা এবার একটু বলে নেওয়া দরকার।

কেউ ভাবতে পারে পুত্র যেখানে স্বয়ং দিল্লীর সুলতান, সেখানে তার পিতা কি করে সামান্য এক অংগরাজ্যের শাসনকর্তা বা নবাব হয়ে আছেন !

ব্যাপারটা ঘটিয়েছিলেন বোঘরা খাঁ নিজেই।

তিনি ছিলেন তৎকালীন দিল্লীর এক জবরদস্ত সুলতান বলবনের পুত্র।

বলবন যখন দিল্লীর বুকে বসে রাজত্ব চালাচ্ছেন, সে সময়ে গৌড়ের শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তখন গৌড়ের রাজধানী লখনৌতি ছিল বাংলার মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলের রাজধানী। স্থানটির প্রকৃত নাম লক্ষ্মণাবতী।

সে যাই হোক, সেবার বলবন নিজে এসে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন করে নিজের ছেলে নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

বোঘরা খাঁ দিল্লী থেকে এলেন গৌড় রাজধানী লখনৌতিতে এবং এসেই ভালবেসে ফেললেন এই রাজ্যের মাটিকে।

সত্যিই এ এক সোনার দেশ। এখানকার উর্বর জমিতে সোনার ফসল, গাছে গাছে কত রঙবেরঙের ফুল, সুস্বাদু ফল। এখানে কতই না ঋতুবৈচিত্র্য ! এখানকার বাতাস স্নিগ্ধ। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আর মানুষগুলির অন্তর অনুভূতিপ্রবণ। এরা হাসতে জানে, ভালবাসতে জানে। রুক্ষ উষর দেশের মানুষ বোঘরা খাঁ এ দেশকে আপন করে নিলেন।

আর সেই জন্যেই তো পিতার অসুস্থতার সংবাদ শুনে দিল্লী যাত্রা করেও মনটা ফেলে গেলেন গৌড়েরই মাটিতে।

দিল্লী এসে দেখলেন পিতা বলবনের দিন ফুরিয়ে এসেছে। পুত্র বোঘরা খাঁকে কাছে পেয়ে খুবই খুশি হলেন সুলতান। পুত্রকে মসনদের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে চাইলেন। কিন্তু রাজী হলেন না বোঘরা খাঁ। বললেন, বাবা, লখনৌতিতেই বেশ আছি আমি। মসনদ আপনি অন্য কাউকে দিন। আমাকে আপনি লখনৌতিতে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।

পিতার প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আবার গৌড়ে ফিরে এলেন বোঘরা খাঁ। রাজধানী দিল্লীতে রেখে এলেন কিশোর পুত্র কাইকোবাদকে।

সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত উজীর নাজিমুদ্দীনের সাহায্যে ওমরাহরা কাইকোবাদকেই দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিল।

ব্যাপারটা যে ভাল হয়নি, তা বোঝা যাচ্ছে এইবার।

কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসাবার সুবাদে উজীর নাজিমুদ্দীন এত প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে যে সুলতানের সব ক্ষমতাই সে আত্মসাৎ করে সুলতানের নামে প্রকৃতপক্ষে সেই সাম্রাজ্যটা চালাতে শুরু করেছে।

শুধু কি তাই, নতুন সুলতান রাজধানীতে থাকলে পাছে দরবারের অন্য আমীর ওমরাহরা তাকে ঘিরে দল পাকায়, সেই ভয়ে সে নতুন সুলতানকে দিল্লী থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে

রেখেছে দিল্লীর কাছাকাছি কিলুখাড়ি নামে এক জায়গায়, একটা নতুন প্রাসাদ বানিয়ে। সেখানে সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে আমোদ-প্রমোদে ভুলিয়ে রেখেছে তরুণ সুলতানকে।

এদিকে লখনৌতিতে বসেও সব খবরই রাখছিলেন বোঘরা খাঁ। আর সে কারণেই কিছুদিন আগে হরকরা মারফৎ তিনি পুত্র কাইকোবাদকে উজীর সম্পর্কে সাবধান করে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন।

সে চিঠির উত্তর এল কিনা এমন অভব্য ভাষায়! কাইকোবাদ পিতাকে যা লিখেছে তার অর্থ দাঁড়ায়–উপদেশ না পাঠিয়ে বোঘরা খাঁ যেন সুলতানকে আনুগত্য জানিয়ে উপঢৌকন পাঠান।

বোঘরা খাঁর অবশ্য মনে হয়েছে, যে গোপন পত্রটি তিনি পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন তা উজীরের হস্তগত হয়েছে এবং পুত্র কাইকোবাদের নামে পাঠানো হলেও উত্তর প্রকৃতপক্ষে উজীর নাজিমুদ্দীনেরই মুসাবিদা করা। তবু এক্ষেত্রে ওই অপদার্থ পুত্র এবং উদ্ধত উজীরের বিরুদ্ধে বড় রকমের আক্রমণ চালানো ছাড়া উপায় নেই।

আর সে কারণেই সেনাধ্যক্ষ আকিল খাঁকে জরুরী তলব দিয়ে হুকুম করলেন বোঘরা খাঁ যত শীঘ্র সম্ভব অভিযানের ব্যবস্থা করতে। সে অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন বোঘরা খাঁ নিজেই।

এ খবর যথাসময়ে দিল্লীতে পৌঁছে গেল।

পিতা বোঘরা খাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাকেই আক্রমণ করতে আসছেন শুনে কাইকোবাদ প্রথমটা বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই তার কেটেছে দাদুর আদর আর আমোদ-আহ্লাদে। যুদ্ধবিগ্রহের নাম শুনলেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করে। আর সেই জন্যেই তো উজীর নাজিমুদ্দীনের হাতে সাম্রাজ্যের ভার ছেড়ে দিয়ে দিব্যি আনন্দ-ফুর্তিতে মশগুল হয়ে রয়েছে। উজীরই তার নাম করে যেমন খুশি রাজ্য চালায়।

এবারও তাকে চাঙা করে তুললো নাজিমুদ্দীন।

কাইকোবাদের সামনে দাঁড়িয়ে পুরোচনার ভঙ্গিতে বললো, ইনসাল্লা। মসনদের কাছে বাপ ভাই দোস্ত বলে কেউ নেই সুলতান। হুকুমত বজায় রাখতে কারুর চোখ রাঙানোকেই আপনি পরোয়া করবেন না। আমি আজই আপনার নামে সিপাহশালারকে হুকুম জারি করছি ফৌজ সাজিয়ে ফেলতে। এ ফৌজের নেতৃত্ব দেবেন সুলতান আপনি নিজে।

–আমি! এবার আমতা আমতা করে কাইকোবাদ, ও কাজটাও আপনি করলে ভাল হয় উজীর।

–না সুল্লতান। উজীর নাজিমুদ্দীন এবার সুলতানের আরও কাছাকাছি সরে এসে ফিসফিস করে বলে, সেটা ভাল দেখাবে না। দুশমনরা জোর পেয়ে যাবে। আমি থাকবো আপনার পেছনে।

যুদ্ধের নামে কাইকোবাদের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করলেও উজীর নাজিমুদ্দীনের অবাধ্য হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

যথাসময়ে বিশাল সেনাবাহিনী যাত্রা করলো রাজধানী দিল্লী থেকে। নেতৃত্বে স্বয়ং সুলতান কাইকোবাদ।

অযোধ্যার কাছাকাছি সরযূ নদীর দুই তীরে দু পক্ষের ফৌজ শিবির ফেললো।

একদিকে দিল্লীর তরুণ সুলতান কাইকোবাদের সেনাদল। অন্য তীরে তার পিতা গৌড়ের শাসনকর্তা বোঘরা খাঁর নেতৃত্বে বিপুল সৈন্যবাহিনী।

এবার কে জেতে, কে হারে সেটাই দেখার।

চল্লিশ দিন দুপক্ষ সরযূ নদীর তীরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বোধকরি দুপক্ষই চেয়েছিল আক্রমণটা শুরু হোক অন্য পক্ষ থেকে। পিতা কিংবা পুত্র কেউই একান্ত স্বজনহত্যার দায় নিজে তুলে নিতে চান না।

ইতিমধ্যে দুই পক্ষের দুই অধিনায়কের শিবিরে তখন শুরু হয়েছে বিচিত্র নাটক।

পুত্র কাইকোবাদের অবস্থা যাকে বলে রীতিমত শোচনীয়।

উজীর নাজিমুদ্দীনের কথার ওপর ভরসা করেই না তরুণ সুলতান কাইকোবাদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পিতার বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে। কিন্তু সরযূ নদীর তীরে এসে যখন অপর পারে পিতা বোঘরা খাঁর সৈন্যসজ্জা দেখলো, তারপর থেকেই তার বুকের মধ্যেটা কেমন যেন করতে শুরু করেছে।

এ শুধু তার ভীতি নয়। কাইকোবাদ বোঘরা খাঁর একমাত্র পুত্র। শিশুকাল থেকে পিতা-মাতার বড় আদরে সে বড় হয়েছে। দাদু নির্দেশ জারি না করলে এখনও সে পিতার কাছেই থাকতো পিতার অনুগত শাহজাদা রূপেই। তার পরিবর্তে তার পিতা তাকে স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছেন দিল্লীর মসনদ। এই তো কিছুদিন আগেও মা তাকে চিঠি লিখে তার শারীরিক কুশল জানতে চেয়েছেন। কাইকোবাদের ছেলে অর্থাৎ তাঁদের নাতির জন্যে উপহার পাঠিয়েছেন বাংলার বিখ্যাত মসলিনের পোশাক।

এই পিতার বিরুদ্ধেই সে কিনা....

সন্ধ্যা নেমে আসছে। সরযূর জলে অন্ধকারের ছায়া। কাইকোবাদ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠলো। আপন মনেই বিড়বিড় করলো, না উজীর নাজিমুদ্দীন, আর আমি গ্রাহ্য করবো না তোমায়।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল তরুণ সুলতান। ওমরাহ হুসেন আলি এককালে তার পিতার প্রিয়পাত্র ছিল। উজীর নাজিমুদ্দীন তাকে মোটেই পছন্দ করে না। তবু তাকে সঙ্গে এনেছে কাইকোবাদ। এই মুহূর্তে তার পরামর্শই সবচেয়ে আগে দরকার।

ওদিকে আর একজনও বিমর্ষ চিত্তে গালে হাত দিয়ে শিবিরের সামনে বসেছিলেন। উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ দূর আকাশে–যেখানে এক ঝাঁক পাখি দিনশেষে উড়ে যাচ্ছে আপন নীড়ে। সেখানে আছে তাদের শিশু। সেই সন্তানদের টানেই পক্ষ বিস্তার করে দূর-দূরান্ত থেকে পাখিরা উড়ে চলেছে নিজেদের আস্তানায়।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপন মনেই একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন বোঘরা খাঁ। মনে পড়ে গেল যুদ্ধযাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে বেগমের সেই অশ্রুভরা কণ্ঠস্বর, তুমি কি পিতা না পাষাণ? একমাত্র পুত্রকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছ তুমি!

বোঘরা খাঁ জবাব দিয়েছেন, তুমি ভুল করছ বেগম। আমার একমাত্র পুত্রকে বাঁচাবার জন্যেই এখন ওর বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধযাত্রা করা প্রয়োজন। কাইকোবাদ এখন ওর উজীরের হাতের পুতুল। এইভাবে খুব বেশিদিন ও মসনদে থাকতে পারবে না। বলবন বংশের নাম লুপ্ত হয়ে যাবে।

সেদিনের সেই মোক্ষম যুক্তিগুলো আজ যেন বড় অসার মনে হচ্ছে বোঘরা খাঁর নিজের কাছেই। বারবার মনে পড়ছে পুত্রের নবীন মুখখানি। হায়! কি করে ওর শরীরে অস্ত্রাঘাত করবেন বোঘরা খাঁ? আজ চল্লিশ দিন যাবৎ দুপক্ষ যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি অপেক্ষা করে রয়েছে–একবার যদি যুদ্ধের ভেরী বাজে তবে সে অন্ধকার নেমে আসবে তাঁর জীবনে।

ভাবতে ভাবতে অনমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন বোঘরা খাঁ। হঠাৎ যেন স্বপ্নের মধ্যেই একটা কণ্ঠস্বর শুনলেন– দাদাজী...দাদাজী...

কে! কে ডাকলো? ওই শিশুকণ্ঠের ডাক যেন বড় পরিচিত বোঘরা খাঁর। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব! তবে কি এই রণক্ষেত্রে সন্ধ্যাকালে জাগ্রত অবস্থাতেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন!

–দাদা! দাদাজী!

ডাকটা এবার স্পষ্ট শুনলেন বোঘরা খাঁ।

–দাদাজী, তুমি কোথায়?

না, এ স্বপ্ন নয়। কে যেন ছুটে আসছে শিবিরের বাইরে। বোঘরা খাঁও ছুটে বেরিয়ে এলেন শিবির থেকে।

সামনে যাকে দেখলেন তাকে এখানে এ সময়ে দেখবেন ভাবতে পারেননি। ঠিক তেমনি দুষ্টুমিভরা মুখ, একমাথা কালো চুল। ছুটে আসছে দুহাত বাড়িয়ে।

–বেটা, মেরে লাল, তুই এসেছিস! দৌড়ে গিয়ে শিশুকে বুকে তুলে নিলেন বোঘরা খাঁ। তাঁর একমাত্র নাতি কাইমুর– কাইকোবাদের শিশুপুত্র।

কাইমুরের পেছনে দাঁড়িয়ে তখন মিটমিট করে হাসছে হুসেন আলি। তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে আদর করার পর বোঘরা খাঁর নজর পড়লো পুরনো দোস্ত ওমরাহ হুসেন আলির দিকে। হেসে বললেন, মতলবটা বোধকরি তোমার। তুমিই নিয়ে এসেছ আমার নাতিকে। আঃ, কত দিন বাদে দেখলাম কাইমুরকে। এস, শিবিরের ভেতরে এস হুসেন আলি।

দুজনে শিবিরে প্রবেশ করলো। বোঘরা খাঁ শিবিররক্ষীদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা এখন বাইরে যাও। বহুদিন বাদে আমার নাতি আর পুরনো দোস্তের সংগে দেখা হয়েছে। এ সময়ে এখানে তোমাদের প্রয়োজন নেই।

এর পরের দৃশ্য সরযূর অপর পারে। সময়– পরদিন সন্ধ্যা।

কাইকোবাদ জনাকয়েক পার্শ্বচর নিয়ে শিবিরের সামনে বসেছিল। দৃষ্টি নদীর বুকে নিবদ্ধ। অস্তাচলগামী সূর্যের রাঙা

দেব সাহিত্য কুটীরের
পূজাবার্ষিকী
ছোটদের
গল্পসঞ্চয়ন

ষাট বছর
পর আবার
বই মেলায় বেরিয়েছে।

লেখক তালিকায় আছেনঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, জলধর সেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমাংকুর আতর্থী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গংগোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুখলতা রাও, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবিনয় রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাধারাণী দেবী, সুনির্মল বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহনলাল গংগোপাধ্যায়, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, হেমেন্দ্রলাল রায় এবং আরো অনেকে।

ছবি এঁকেছেনঃ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইবন্ধু রায় ও ফণিভূষণ গুপ্ত।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ,
২১,ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৯

চেঁচিয়ে উঠলো কাইকোবাদ, ওকে আসতে দাও।

আলো ছড়িয়ে পড়েছে নদীর জলে, দুই তীরের সারি সারি সৈন্যশিবিরগুলির উপর। সেদিকেই তাকিয়ে বসে আছে কাইকোবাদ। কি এক প্রত্যাশা গুঞ্জরিত হচ্ছে তার মনে। তা পার্শ্বচরদের মধ্যে কেউই টের পাচ্ছে না। তাই তারা যখন তরুণ সুলতানের মন ভোলাবার জন্য মিঠে মিঠে কথা বলছিল, কাইকোবাদ সে সব কথা শুনে না শুনে অন্যমনস্কভাবে শুধু হুঁ-হাঁ করছিল।

অন্যমনস্কতা ভাঙলো দাঁড়ের ছপছপ শব্দে।

একটা ছোট সুদৃশ্য নৌকো ভেসে আসছে নদীর ওপার থেকে।

–হুজুর। নৌকোটা আসছে ওপারের দুশমন শিবির থেকে। দেবো ওটাকে ডুবিয়ে?

একজন সৈনিক হাতের বর্শাটা তুলে সুলতানের নির্দেশ চাইলো।

–না। চেঁচিয়ে উঠলো কাইকোবাদ, ওকে আসতে দাও।

নৌকোটা ততক্ষণে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। সুন্দর নক্সাকাটা ঝালর দেওয়া ছই-এর মধ্যে কে আছে এখনও দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে চারজন মাঝি একতালে যন্ত্রের মতো নৌকোটা চালিয়ে আনছে।

–হেই, কে আসছে নৌকোয়? একজন অতি উৎসাহী সৈনিক হেঁকে উঠলো সুলতানের পাশ থেকে।

–আঃ, ওকে আসতে দাও। বিরক্ত কণ্ঠে সুলতান তার সংগীদের নিবৃত্ত করলো।

আর কেউ কোনো কথা বললো না। সুলতানের মর্জি কেউ বুঝতে পারছে না ওরা।

নৌকো এসে ভিড়লো সুলতানের সামনেই নদীতীরে।

মাঝি নৌকো থেকে পাটাতন নামিয়ে দিল ডাঙায়।

এরপর নৌকোর ছই-এর মধ্যে থেকে যে মানুষটা ধীর মন্থর পদে এসে তরুণ সুলতানের কাছে দাঁড়ালেন, তাঁকে চিনতে কারুর ভুল হলো না। তিনি বোঘরা খাঁ স্বয়ং। তাঁর বুকে জড়িয়ে রয়েছে কাইমুর–সুলতান কাইকোবাদের শিশুপুত্র।

কাইমুরই প্রথম নীরবতা ভেঙে চেঁচিয়ে উঠলো, আব্বা, আব্বা, এই দেখ দাদাজীকে নিয়ে এসেছি, দাদাজী তোমায় আর বকবে না বলেছে।

পিতা এবং পুত্র দুজনের চোখেই তখন অশ্রুধারা।

কয়েক মুহূর্ত দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর কাইমুর হাঁটুমুড়ে বসে নিজের মাথার তাজ খুলে রাখার উপক্রম করলো পিতার পায়ের কাছে–

কিন্তু তার আগেই বোঘরা খাঁ কাইকোবাদকে এক হাতে জড়িয়ে টেনে নিলেন নিজের বুকে। এখন তাঁর বুকের একদিকে নাতি, অন্যদিকে পুত্র।

পিতাপুত্রের মিলনের এ এক অপূর্ব দৃশ্য। উপস্থিত সৈনিকেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগলো। তারপর সর্বপ্রথম জয়ধ্বনি করে উঠলো হুসেন আলি। সংগে সংগে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুললো অন্য সবাই।

সরযূর জলে বেলাশেষের রঙ ততক্ষণে মুছে গেছে। আকাশে উঠেছে পূর্ণ চন্দ্র। তার স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত দুই শিবির আর সরযূর স্রোতধারা।

ইতিহাস বলে, এর পর পুত্র কাইকোবাদ পিতা বোঘরা খাঁকে মিনতি করে বলেছিল, দিল্লীর মসনদ অপেক্ষা পিতার স্নেহই তার অধিক কাম্য। মসনদের গুরুদায়িত্ব এখন থেকে পিতাই গ্রহণ করে বলবন সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষা করুন। কিন্তু বোঘরা খাঁ রাজী হননি। বলেছিলেন, যে মসনদ তিনি একবার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন তা গ্রহণ করার ইচ্ছা তাঁর আর নেই। গৌড়ের শাসনকর্তা হিসাবে থাকতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট। তবে পুত্র কাইকোবাদ যদি যথার্থ সুলতানের মতো দিল্লীতে বসে প্রজার হিতসাধনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে তবেই তিনি পিতা হিসাবে সবচেয়ে খুশি হবেন। এ ব্যাপারে করণীয় কিছু উপদেশও তিনি দিলেন।

এর পর পুত্রকে মসনদে বসিয়ে নিজের হাতে বোঘরা খাঁ পুত্রের মাথায় সুলতানী 'তাজ' পরিয়ে দিলেন। নাতি কাইমুরকে বসিয়ে দিলেন পুত্রের কোলে।

শিবিরের বাইরে তখন দুপক্ষের সৈন্যরা উৎসবে মেতেছে। বাজছে ঢাক, শিংগা, তুরী, ভেরী। ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠছে পিতা-পুত্রের নামে।

আর এই মহামিলনের মূল কৃতিত্ব যে ছোট্ট শিশুটির, সেই কাইমুর তখন পিতার কোলে বসে আনন্দে হাততালি দিয়ে বারবার শুধু বলছে, কি মজা, কি মজা! দাদাজী তুমি খুব ভাল! আব্বা, তুমিও ভাল! তোমরা সবাই ভাল!

ছবি: প্রদীপ রায়

বাংলা সালের জন্মকথা

প্রসিত রায়চৌধুরী

বাংলা সালের উদ্ভব ব্যাপারে নানা ঐতিহাসিক বিতর্ক আছে। বাজার-চলতি রটনা হলো, বাদশা আকবর হিজরী সাল থেকে দশ বছর কম করে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। মুসলমান ধর্মগুরু মহম্মদ ৬২২ খ্রীস্টাব্দে (৫৪৪ শক) মক্কা থেকে মদিনা পলায়ন করেন। সেই বছর থেকে হিজরী সাল গণনা করা হয়। এই হিজরী সাল চান্দ্রবর্ষ অনুসারে, সৌরবর্ষ অপেক্ষা যা দশ এগারো দিন কম হিসেবে গণনা করা হয়। অথচ বাংলা সাল, সৌরবর্ষ অনুযায়ী গণনা করা হয়ে থাকে। সৌরবর্ষ হিসেবে সাল গণনা বিজ্ঞানসম্মত। এখন দেখা যাক আকবরের বাংলা সাল প্রবর্তনের দাবি কতটা যুক্তিসঙ্গত।

আকবর মসনদে বসেন ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে। বাংলা বঙ্গাব্দের সঙ্গে ইংরাজী খ্রীস্টাব্দের পার্থক্য (বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত) ৫৯৩ বছর। কাজেই ১৫৫৬ - ৫৯৩ বাংলা ৯৬৩ বঙ্গাব্দে আকবর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এমন একটি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গেছে, যাতে ৯৪৫ বঙ্গাব্দের তারিখ দেওয়া আছে। তাহলে আকবর হিজরী সাল থেকে দশ বছর কমিয়ে পাঠান শের শাহের আমল (১৫৪০-১৫৪৬) থেকে বাংলা সালের সূত্রপাত করবেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, পাঠানরা মোগলদের চিরশত্রু। আর কোরান-স্বীকৃত চান্দ্রবর্ষকে বিজ্ঞানসম্মত সৌরবর্ষতে রূপান্তর কোনো মুসলমান বাদশার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ ৯০৩ হিজরী থেকে অর্থাৎ ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলা সালের প্রবর্তন করেছেন বলে জনরব। কেউ কেউ বলেন রাজা সালবাহন (সালীবাহন) বাংলা সালের প্রবর্তক। কিন্তু রাজা সালীবাহন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে।

কর্ণসুবর্ণের পরাক্রান্ত রাজা শশাঙ্ক (যিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন) তাঁরই আমল থেকে বাঙলা সালের উদ্ভব বলেই মনে হয়। আনুমানিক ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে (৫১৫ শক) রাজা শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের (গৌড়ের) সিংহাসনে বসেন। রাজত্ব করেন ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ মতান্তরে ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এখন চলছে ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দ। তার থেকে ৫৯৩ বছর বাদ দিলে পাওয়া যায় ১৪০০ সাল। সাল শব্দটি ফারসী আর সন শব্দটি আরবী। কাজেই ১৪০০ সালটি ১৪০০ বঙ্গাব্দ হবে। রবীন্দ্রনাথ ১৩০২ সালে '১৪০০ সাল' কবিতাটি রচনা করেন। আজও বাঙালী পাঠক সানন্দে কবিতাটি পাঠ করছে।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

নাচনি

মুস্তাফা নাশাদ

গান ধরেছে দোয়েল-কোয়েল
ময়না বাজায় শিঙে।
তা-থৈ তা-থৈ লেজ দুলিয়ে
নাচ্ছে একাই ফিঙে!

টরে টক্‌কা—টরে টরে
দেশ বিদেশের ঘরে ঘরে,
নৃত্য সমাচার—
ফিঙে নাচনির পৌঁছে দিল;
রেডিও, টি-ভি, তার!

ছবি: রাহুল মজুমদার

কাউন্ট রজারের গুপ্তধন

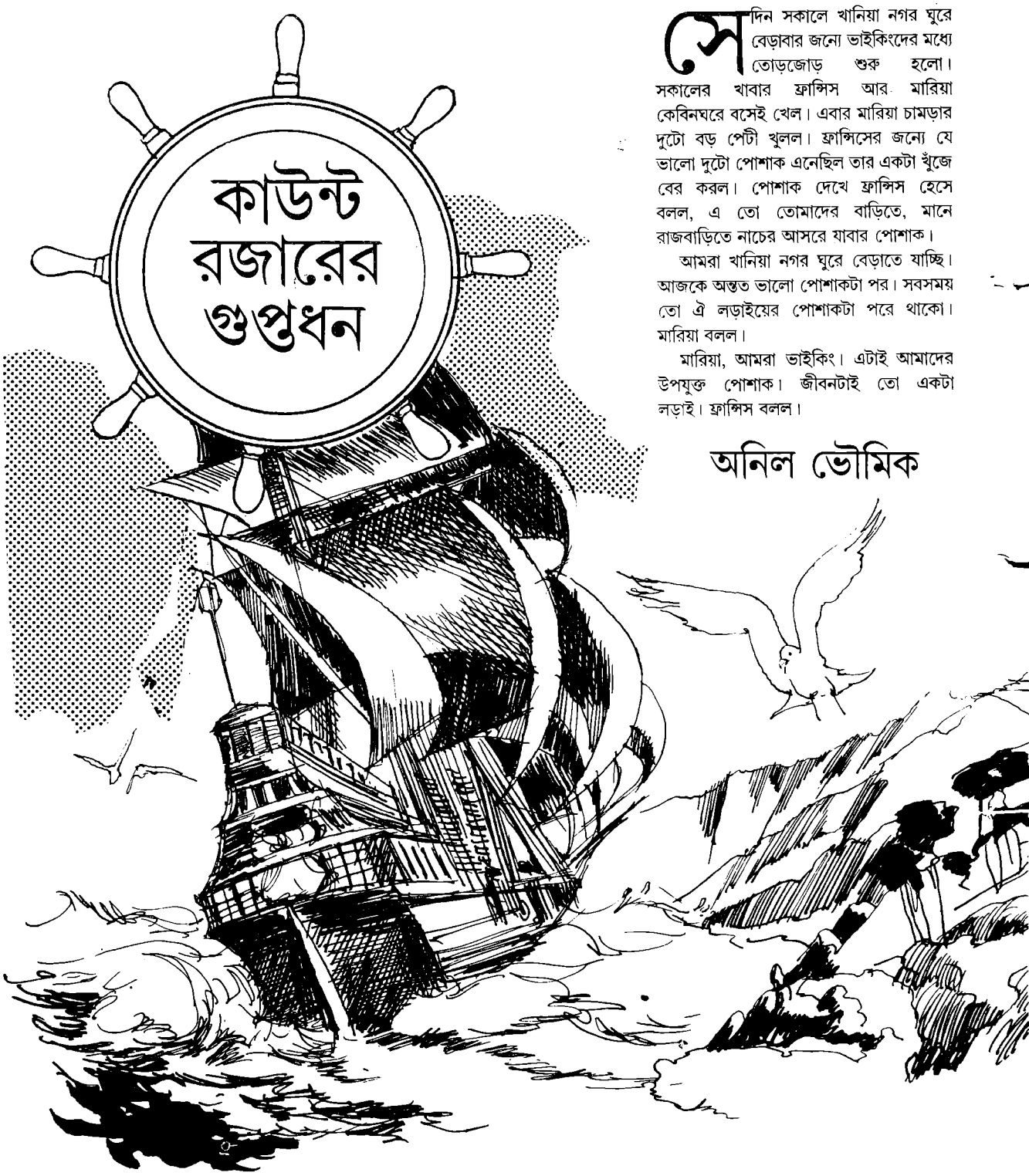

সেদিন সকালে খানিয়া নগর ঘুরে বেড়াবার জন্যে ভাইকিংদের মধ্যে তোড়জোড় শুরু হলো। সকালের খাবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া কেবিনঘরে বসেই খেল। এবার মারিয়া চামড়ার দুটো বড় পেটী খুলল। ফ্রান্সিসের জন্যে যে ভালো দুটো পোশাক এনেছিল তার একটা খুঁজে বের করল। পোশাক দেখে ফ্রান্সিস হেসে বলল, এ তো তোমাদের বাড়িতে, মানে রাজবাড়িতে নাচের আসরে যাবার পোশাক।

আমরা খানিয়া নগর ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি। আজকে অন্তত ভালো পোশাকটা পর। সবসময় তো ঐ লড়াইয়ের পোশাকটা পরে থাকো। মারিয়া বলল।

মারিয়া, আমরা ভাইকিং। এটাই আমাদের উপযুক্ত পোশাক। জীবনটাই তো একটা লড়াই। ফ্রান্সিস বলল।

অনিল ভৌমিক

খুব হয়েছে। নাও পর এটা। মারিয়া হেসে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে হ্যারি, বিস্কো, শাঙ্কো আর অন্য সব ভাইকিংরা যে যার ভালো পোশাক পরে তৈরি হয়ে জাহাজের ডেকে এসে জড়ো হলো। জাহাজের জীবন বড়ো একঘেয়ে। দিনরাত চারদিকে সীমাহীন সমুদ্র। মাটির দেখা পাওয়ার জন্যে, মাটিতে নামার জন্যে ওরা আকুল হয়ে থাকে। আজকে শুধু মাটিতে নামা নয়, মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ানো। যুদ্ধ নয়, শান্তির দিন আজ। ওরা সাগ্রহে ফ্রান্সিস ও মারিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরেই সুন্দর পোশাক পরে ফ্রান্সিস ও মারিয়া ডেকে উঠে এল। মারিয়া পরেছে হালকা গোলাপি রঙের পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা গাউন। মারিয়াকে আজকে দেখতে রাজকুমারীর মতোই লাগছে। অবশ্য দীর্ঘদিন সমুদ্রে জাহাজে থাকার জন্যে মারিয়ার গায়ের রঙ আগের মতো গোলাপি-ফর্সা নেই। একটু যেন তামাটে হয়ে গেছে। ওরা দুজনে আসতেই ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল, ও হো-হো। এটা ওদের আনন্দের ধ্বনি, প্রতিজ্ঞার ধ্বনি, আবার প্রতিবাদেরও ধ্বনি।

এমন সময় দেখা গেল কাভাল্লি জাহাজের পাটাতন দিয়ে উঠে আসছে। ওকে দেখে ফ্রান্সিসরা সকলেই খুশি হলো। কাভাল্লি ফ্রান্সিসের কাছে এল। হেসে বলল, কালকেই শুনেছি আপনারা আজ খানিয়া নগরে ঘুরে বেড়াবেন। আপনারা তো চেনেন না, তাই আমি এলাম। সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো আপনাদের।

এ তো ভালোই হলো। ফ্রান্সিস হেসে বলল।

সবার আগে জাহাজের ফেলা পাটাতন দিয়ে কাভাল্লি, ফ্রান্সিস ও মারিয়া জাহাজঘাটায় নামল। পেছনে একে একে আর সব বন্ধুরা নামল। কাভাল্লি সবাইকে নিয়ে নগরের রাস্তা দিয়ে চলল। পথের লোকজন দোকানদারেরা অনেকেই ফ্রান্সিসদের এই দলকে দেখল। তারা ভেবে পেল না এরকম পোশাকপরা লোকগুলো কোন দেশের! বিশেষ করে মহিলারা মারিয়াকে বারবার দেখতে লাগল। এরকম মেয়েদের পোশাক ওরা কখনও দেখেনি। দল বেঁধে হৈহৈ করে চলল ওরা।

প্রথমে কাভাল্লি ওদের নিয়ে গেল বিরাট দুর্গটায়। রাজা বোনিফেস-এর বাসস্থান আর সভাগৃহ এখানে। কাভাল্লি সবাইকে নিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারি দুর্গটা আগেই ভালো করে দেখেছে। ওরা দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বারে বন্ধুদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

দুর্গ দেখা হলে কাভাল্লি ওদের নিয়ে চলল একটা ছোট অ্যাম্ফিথিয়েটার দেখাতে। খুব বেশি বড় নয় সেটা। চারদিকে পাথরের দেয়াল। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। দেখল চারিদিকে গোল করে পাথরের বসার জায়গা। মাঝখানে গোল জায়গা। কাভাল্লি ঐ জায়গাটা দেখিয়ে বলল, এটাকে বলে এরেনা। এখানে তরোয়ালের লড়াইয়ের প্রতিযোগিতা হয়। রাতে মশালের আলোয় নাটকও অভিনীত হয়। তারপরে চলল সবাই উত্তর দিকে। দেখল ছবির মতো সুন্দর একটা হ্রদ। তারপরেই ঘাসে-ঢাকা ছোট পাহাড়। পাথর-ছড়ানো ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা।

খানিয়া নগর খুব একটা বড়ো নয়। দুপুরের মধ্যেই প্রায় সব দেখা হয়ে গেল। ঘোরাঘুরির জন্যে বেশ খিদেও পেয়েছে সকলের। মারিয়াই প্রস্তাব দিল, এখন জাহাজে ফিরে গিয়ে রান্নাবান্নার দরকার নেই। এখানেই কোনো সরাইখানায় খেয়ে নেওয়া যাক। সব ভাইকিংরা হৈহৈ করে এই প্রস্তাবে রাজী হলো।

কাভাল্লি দুর্গের কাছে এক বড় সরাইখানায় ওদের নিয়ে গেল। এত খদ্দের পেয়ে সরাইখানার মালিক খুশিতে আটখানা। সবাই টানা কাঠের বেঞ্চিতে বসল। সামনে কাঠের টানা টেবিলমতো। খেতে দেওয়া হলো বড় বড় গোল রুটি, তরকারি আর গরম গরম ভেড়ার মাংস। সবাই ক্ষুধার্ত। হাপুস-হুপুস করে খেতে লাগল।

বিকেল নাগাদ ভাইকিংরা হৈহৈ করতে করতে জাহাজে ফিরে এল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার সময় ভাইকিংরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এবার আর কোথাও নয়। সোজা দেশে ফিরবো। দু'একজন বলল, দেখ ফ্রান্সিস কী বলে।

রাত হলো। ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে আছে। ও ভেবে পাচ্ছে না এবার কী করবে? মারিয়া জিজ্ঞেস করল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে? ফ্রান্সিস হেসে বলল, আমিও ঠিক এই কথাটাই

ভাবছি। তুমি, আমার বন্ধুরা সবাই তো দেশে ফেরার জন্যে আকুল। আমার কিন্তু দেশে ফিরে অলস সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে করছে না।

এখন তো কোথাও যাবার নেই। তবে দেশে ফিরতে চাইছো না কেন? মারিয়া বলল।

কে বলতে পারে হয়তো ফেরার পথেই কোনো রহস্যের, কোনো গুপ্তধনের সংবাদ পেয়ে গেলাম। তখন? ফ্রান্সিস বলল।

সে তখন ভাবা যাবে। এখন দেশের দিকে জাহাজ চালাতে বলো। মারিয়া বলল।

বেশ, তোমরা যেমন চাও। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালের খাবার খাওয়া হলো। জাহাজচালক আর নজরদার পেড্রোকে নিয়ে হ্যারি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

তাই তো ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

আমরা অনেকদিন দেশ ছেড়ে এসেছি। সবাই দেশে ফিরতে চাইছে। পেড্রো বলল।

ঠিক আছে। ফ্রান্সিস জাহাজচালকের দিকে তাকিয়ে বলল, জাহাজ ছাড়ো দেশের দিকে। জাহাজচালক হেসে খুশিতে লাফিয়ে উঠল। পেড্রো দুহাত তুলে হো-হো ধ্বনি তুলল। দুজনেই ছুটল নিজেদের কাজের জায়গায়। দেশে ফেরার খবর ভাইকিংদের মধ্যে রটে গেল। সবাই হৈহৈ করে উঠল।

পেড্রো দড়ি বেয়ে মাস্তুলের মাথায় ওর বসার জায়গায় গিয়ে বসল। ঘরঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। কয়েকজন উঠে গেল পালের মাথায়। দড়িদড়া খুলে পালগুলো তুলে দিল। কিন্তু হাওয়ার তেমন জোর নেই। পালগুলো খুব ফুলে উঠলো না। তাই দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে নেমে গেল।

খানিয়ার জাহাজঘাটা থেকে ভাইকিংদের জাহাজ সরে এল অনেকটা। সমুদ্রের জলে অনেকগুলো দাঁড় পড়ার শব্দ উঠল, ছপ্—ছপ্—

ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে খানিয়া বন্দর দূরে মিলিয়ে গেল। চারদিকে শুধু জল। জাহাজ তখন মাঝসমুদ্রে চলে এসেছে। সমুদ্রের জলে রোদ পড়েছে। ঝলসে উঠছে শান্ত ঢেউ। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ বেগে ভেসে চলেছে ভাইকিংদের দেশের উদ্দেশে।

তিন-চার দিন কাটল। ঝড়বৃষ্টি নেই। ভূমধ্যসাগরের শান্ত সমুদ্র। সমুদ্রের জল গভীর নীল। ক'দিনই হাওয়া বেগে বইছে। পালগুলো ফুলে উঠেছে। জাহাজ চলেছে। ভাইকিংরা খুশি। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না। ডেকে বসে শুয়ে ওরা বিশ্রাম করে। দল বেঁধে কয়েকজন ছক্কাপাঞ্জা খেলে। রাত হলে দেশের গল্প করে। কতদিন পরে দেশে ফিরছে ওরা। কেউ কেউ হেঁড়ে গলায় গানও ধরে।

সেদিন সন্ধ্যে হয় হয়। পশ্চিম আকাশে তখন সবে সূর্য ডুবেছে। একটা গভীর কমলা রঙের আভা সারা পশ্চিম আকাশে ছড়িয়ে আছে।

হঠাৎ নজরদার পেড্রো চিৎকার করে বলে উঠল, ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। কথাটা ডেকে শুয়ে বসে থাকা ভাইকিংদের কানে গেল। ওরা ছুটে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশের কমলা রঙের আলোয় ওরা দেখল পশ্চিম দিকে কিছু দূরে ডাঙা। তবে সমতল নয়। ছোট ছোট উঁচু-নিচু টিলার সারি। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ, বুঝে উঠতে পারল না ওরা। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে খবর পাঠানো হলো।

একটু পরে দুজনে এল। সঙ্গে মারিয়া। সেই টিলার সারির রঙ কেমন বোঝা যাচ্ছে না। সন্ধ্যের নিস্তেজ আলোয় কালো কালো দেখাচ্ছে। ফ্রান্সিস ডাকল, হ্যারি।

বলো। হ্যারি বলল।

এটা কোনো দ্বীপ না দেশ বুঝতে পারছি না। কী করবে এখন?

দ্যাখো ফ্রান্সিস, আমরা এখন দেশে ফিরছি। এটা কোনো দ্বীপ না দেশ সেটা এখন জানার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। তবে একটা সমস্যা হচ্ছে এই, ডাঙার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হবে। কাজেই ডাঙায় কারা থাকে, তারা আমাদের কোনো বিপদে ফেলে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। হ্যারি বলল।

তা ঠিক। ফ্রান্সিস বলল, তবে আমরা কোথায় এলাম এটাও তো জানা দরকার।

তাহলে এক কাজ কর, হ্যারি বলল, সন্ধ্যের একটু পরে আমরা কেউ নৌকোয় চড়ে ওখানে যাবো। যদি দেখি লোকজন আছে, কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবে তাদের কাছে জেনে নেব এই জায়গাটা কী? দ্বীপ না কোনো দেশ? সেটা জানতে পারলে বুঝতে পারবো আমরা কোথায় এলাম, আমাদের দেশ কতদূর।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে একটু ভাবল। তারপর মাথা তুলে বলল, বেশ, আমিই যাবো।

আমিও যাবো, মারিয়া বলে উঠল। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, অচেনা অজানা জায়গা। দুজনে বিপদে পড়লে তখন আমাদের উদ্ধার করতে গিয়ে আমার বন্ধুদের হয়তো লড়াইয়ে নামতে হবে। মিছিমিছি বোকার মতো রক্তক্ষয়, মৃত্যু আমি চাই না। আমি একাই যাবো।

সন্ধ্যের পরে পরেই ফ্রান্সিস দ্রুত রাতের খাবার খেয়ে নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। মারিয়া একটু ভীত স্বরে বলল, তুমি একা একা যাবে! যদি কোনো বিপদে পড়ো!

ফ্রান্সিস হেসে বলল, অত ভয় পেলে তো বাড়ি থেকেই বেরুনো যায় না। অথচ কোথায় কোন অচেনা সমুদ্রে, অজানা দেশে এসেছি আমরা। তাহলে এলাম কেন?

মারিয়া আমতা আমতা করে বলল, না, বলছিলাম—সাবধানে—

কিচ্ছু ভেবো না। মনে সাহস আনো। ফ্রান্সিস বলল।

ডেকে উঠে ফ্রান্সিস রেলিঙের ধারে এল। ঝুঁকে দেখল একটা নৌকো নামানো হয়েছে। ঢেউয়ে দুলছে নৌকোটা। হ্যারি শাঙ্কো—ওরা কয়েকজন ওর কাছে এল। হ্যারির গায়ে একটা চাদরের মতো কাপড় জড়ানো। ফ্রান্সিস সেটা দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। ওরা ফ্রান্সিসের সঙ্গী হতে চাইছিল। ফ্রান্সিস নৌকোয় নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন হ্যারি এগিয়ে এল। বলল, ফ্রান্সিস, তুমি কি একাই যাবে?

হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল।

একটা কথা ভেবেছো? হ্যারি বলল।

কী? ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

যদি ওখানে গিয়ে কোনো লোকের সঙ্গে বা লোকেদের সঙ্গে দেখা হয় তখন কী বলবে?

বাঃ। জানতে চাইবো যে এটা কোন দ্বীপ বা কোন দেশ। ফ্রান্সিস বলল।

তোমার কথা ওরা বুঝবে? হ্যারি হেসে বলল।

আরে! ফ্রান্সিস প্রায় লাফিয়ে উঠল, সত্যিই তো—এটা তো ভেবে দেখিনি। ওদের ভাষা তো আমিও বুঝবো না।

সুতরাং—হ্যারি হেসে বলল, আমি কিন্তু গ্রীকভাষাটা অল্পস্বল্প বুঝি।

হ্যারি, যাও শীগগির তৈরি হয়ে এসো। তুমি না থাকলে তো—

হ্যারি গায়ের কাপড়টা খুলে বিস্কোর হাতে দিল। দেখা গেল হ্যারির কোমরে তরোয়াল গোঁজা। পোশাকটাও নতুন। বলল, চলো আমি তৈরি হয়েই এসেছি।

দুজনে দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে পরপর নৌকোটার ওপর নামল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। হ্যারি শরীরের দিক থেকে খুব সবল না। বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ফ্রান্সিস নৌকো চালালো ঐ

টিলাগুলো লক্ষ্য করে।

বাঁকা চাঁদ রয়েছে আকাশে। কিন্তু চাঁদের আলো নিস্তেজ। অস্পষ্ট সমুদ্রের জল, টিলাগুলো দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। এই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে সমুদ্রতীরে লোকজনের অলক্ষ্যে পৌঁছুনো যাবে। সবকিছু স্বাভাবিক দেখলে তবেই লোকজনের সামনে যাওয়া যাবে। অবশ্য যদি ওখানে মানুষজন থাকে।

তীরের কাছে নৌকোটা বেয়ে নিয়ে এল ফ্রান্সিস। দেখল এখানে সমুদ্রের জল থেকে টিলা উঠে গেছে। এখানে নামার অসুবিধে। তবু এখানেই নামতে হবে। তারপর টিলাটার মাথায় ওঠা যায় কিনা দেখতে হবে। উঠতে পারলে ওপর থেকে সহজেই চারদিক দেখা যাবে।

নৌকোটা টিলার গায়ের কাছে নিয়ে এল ফ্রান্সিস। অন্ধকারে দুচোখ কুঁচকে দেখতে লাগল নৌকো কোথাও ভেড়ানো যায় কিনা। পেল একটা জায়গা। গুহার মতো লম্বাটে ফাঁক একটা। ফ্রান্সিস ফাঁকের মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে দিল। আটকে গেল নৌকোটা।

এবার ফ্রান্সিস টিলার পাথুরে গা-টা দেখতে লাগল। দেখল—কিছু পাথরের চাঁই উঁচিয়ে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল, ওগুলো ধরে ধরে ওপরে ওঠা যাবে। ফ্রান্সিস প্রথমে পাথরের একটা ওঁচানো চাঁই ধরল। তারপর পাথরের খাঁজে পা রেখে রেখে উঠতে শুরু করল। মুখ নিচু করে বলল, হ্যারি, আমি যেভাবে উঠছি, দেখে দেখে তুমিও উঠে এসো।

পারবো? হ্যারি একটু চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল।

কেন পারবে না! উঠতে শুরু কর। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সাবধানে উঠতে লাগল। একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। খুব অস্পষ্ট চাঁদের আলো রয়েছে। পেছনে হ্যারিও উঠতে লাগল।

বেশি উঁচু না। একসময় শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্রান্সিস টিলার ওপরে উঠে এল। প্রথমেই দাঁড়িয়ে পড়ল না। একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে সামনের দিকে তাকাল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল সামনে একটা ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। তারপরে গাছপালা। কিছু কাঠপাথরের ঘরবাড়ি। ওসব ছাড়িয়ে দূরে ধুধু দেখা যাচ্ছে জলের আভাস। ফ্রান্সিস ভাবল তাহলে এটা একটা ছোট দ্বীপ। যতদূর চোখ যায়, জনমানবের দেখা নেই। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো। উঠে দাঁড়াল। তখনই হ্যারির হাঁপানো

আমি একাই যাবো।

গলা শুনল, ফ্রান্সিস, হাতটা ধরো। ঘুরে দেখল হ্যারি হাত বাড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে হ্যারির হাত ধরল। তারপর হ্যারিকে টেনে তুলে নিল। হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ দেখল ঐ গাছগাছালি ঘরবাড়ির দিক থেকে অনেক লোক আসছে প্রান্তরের দিকে। অনেকের হাতে জ্বলন্ত মশাল, খোলা তরোয়াল, বর্শা।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে হ্যারির ডান হাত ধরে টান দিয়েই পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। হ্যারিও সঙ্গে সঙ্গে ওর পাশে বসে পড়ল।

ওরা পাথরের আড়াল থেকে দেখল সেই দল বেঁধে আসা লোকগুলোর সামনে একজন লোকও আসছে। বেশ দৃপ্তভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে আসছে লোকটা। বোঝা গেল ঐ লোকটাই ওদের নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই ওদের নেতা-টেতা হবে।

ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে লোকগুলো দলে দলে এসে দাঁড়াল। এ প্রান্তরে পড়ে-থাকা একটা বড় পাথরখণ্ডে সেই নেতা উঠে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকদের কথাবার্তা থেমে গেল। একজন লোক নেতার পাশে একটা জ্বলন্ত মশাল তুলে ধরে রইল। এবার সেই নেতাকে ফ্রান্সিস একটু ভালোভাবে দেখল। নেতাটি যুবক। বুকে লোহার বর্ম। কিন্তু মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। মাথার লম্বা লম্বা চুল ঘাড়ের পেছনে ঝুলে পড়েছে। সমুদ্রের জোর হাওয়ায় তার মাথার চুল উড়ছে।

এবার নেতা যুবকটি গলা চড়িয়ে বলল, আমার বিদ্রোহী বন্ধুরা—

সমুদ্রের জোর হাওয়া ফ্রান্সিসদের দিকে বইছে। যুবকটির কথা কাজেই ওরা একটু অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেল। যুবকটির কথা ফ্রান্সিস বুঝল না। হ্যারি বুঝল। আস্তে বলল, ফ্রান্সিস, যুবকটি লো ল্যাতিন ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছে। এই লো ল্যাতিন ভাষাটা বেশ সহজ। আমি ভালো বুঝি, বলতেও পারি। তবে অক্ষর চিনি না।

এবার যুবকটি যা বলতে লাগল হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে তা বুঝিয়ে দিতে লাগল। যুবকটি বলছে, আমরা সারাসেনরা সিসিলি দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসী। অথচ রাজা ফ্রেডারিক আমাদের সব অধিকার জমি অর্থ কেড়ে নিচ্ছে। অত্যাচারও চালাচ্ছে। রাজা ফ্রেডারিক বিদেশী নর্মানদের বংশধর। আমরা তার অধীনতা স্বীকার করবো কেন? সিসিলি আমাদের মাতৃভূমি। আমরা সিসিলি থেকে ঐ নর্মান বিদেশীকে তাড়াবো। রাজা ফ্রেডারিকের বশংবদ ভূস্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে

দক্ষিণ সিসিলি থেকে পালিয়ে আমরা এই লিপারি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছি। যুবকটি থামল। তারপর আবার বলতে লাগল, আমরা আজ রাতেই অন্ধকারের মধ্যে সিরাকস বন্দরে নামবো। আক্রমণ করবো ম্যামিয়েস দুর্গ। সমবেত বিদ্রোহীরা হৈহৈ করে চিৎকার করে উঠল। যুবকটি আবার বলতে লাগল, আমরা সংবাদ পেয়েছি রাজা ফ্রেডারিকের একদল সৈন্য রাজধানী পোলার্মো থেকে জাহাজে চড়ে এই সিরাকস বন্দরে আসছে। উদ্দেশ্য, ম্যামিয়েস দুর্গ রক্ষা। আমরা নতুন সৈন্যদল পৌঁছবার আগেই দুর্গ দখল করবো। যুবকটি থামল। আবার চিৎকার হৈ-হল্লা খোলা তরোয়াল ঘোরানো, বর্শা উঁচিয়ে ধরা, মশাল নাচানো শুরু হলো। যুবকটি আবার বলতে লাগল, সমুদ্রতীরে আমাদের যত নৌকো আছে সব জড়ো করা হয়েছে। নৌকোয় চড়ে আমরা সিরাকস বন্দরে নামবো। তারপর দুর্গ দখলের লড়াই। লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। বক্তৃতা শেষ করে যুবকটি পাথর থেকে নেমে দাঁড়াল।

এরপর যুবকটি হেঁটে চলল সেই গাছগাছালি ঘেরা বাড়িগুলোর দিকে। বিদ্রোহীরাও হৈহৈ করতে করতে পেছনে পেছনে চলল।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, কী বুঝলে?

বুঝলাম এটা একটা ছোট্ট দ্বীপ, লিপারি। কাছেই সিসিলি দ্বীপ। ঐ দ্বীপের রাজা এখন ফ্রেডারিক। এই দ্বীপে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা সারাসেন। সিসিলির আদি অধিবাসী। রাজা ফ্রেডারিকের অনুগত কিছু ভূস্বামী এদের দ্বীপছাড়া করেছে। তদুপরি রাজা ফ্রেডারিক বিদেশী নর্মানদের বংশধর। কাজেই এই সারাসেনরা একটি যুবকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করেছে। আজ রাতে ওরা এই দ্বীপ থেকে নৌকোয় চড়ে গিয়ে মূল দ্বীপ সিসিলির সিরাকস বন্দরে নামবে। তারপর ম্যামিয়েস দুর্গ আক্রমণ করবে। হ্যারি বলল।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ফ্রান্সিস বলল, আমরা সিসিলি দ্বীপের কাছে এসেছি। এখানে এখন যুদ্ধ চলবে। কাজেই আমরা এখানে নামবো না। বাঁ দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবো।

তাই ভালো। হ্যারি বলল, এসবের সঙ্গে আমরা জড়াবো না।

এবার ফ্রান্সিস বলল, চলো জাহাজে ফিরবো। দুজনে আগের মতোই ওঁচানো পাথর ধরে ধরে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে নিচে নেমে এল। দেখল নৌকোটা ঠিকই আছে। ওরা আস্তে আস্তে নৌকোয় নেমে বসল। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল জাহাজের দিকে।

দুজনে জাহাজে উঠল। ভাইকিং বন্ধুরা ওদের ঘিরে ধরল। মারিয়াও এসে একপাশে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সব কথা বলল। তারপর বলল, আমরা সিসিলির বিদ্রোহ, যুদ্ধ—এসবের সঙ্গে জড়াবো না। রাত একটু বেশি হলে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সিসিলির দক্ষিণ দিক দিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো। কথাটা শুনে ভাইকিং বন্ধুরা খুশিই হলো। সিসিলিতে নামা হবে না। সোজা দেশের দিকে যাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস কেবিনের দিকে চলল। সঙ্গে মারিয়া আসতে আসতে বলল, জানো, সিসিলি ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ। সিসিলিকে বলা হয় ভূমধ্যসাগরের উদ্যান।

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, মারিয়া—তুমি কত পড়াশুনো করেছো? আমি কিন্তু গোমুখ্খু গোঁয়ার।

মারিয়া বেশ দৃঢ়স্বরে বলল, না। তুমি আমাদের দেশের গর্ব, ভাইকিং জাতির গর্ব।

ফ্রান্সিস হেসে মাথা ঝাঁকাল। কিছু বলল না।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ডেকে উঠে এল। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, পাল খাটাও। এখুনি জাহাজ ছাড়বো। বন্ধুরা পালের কাঠে উঠে গেল। দড়িদড়া ঠিক করে পাল খুলে দিল। জাহাজচালক হুইলের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিস তাকে বলল, দিক ঠিক রেখে দেশের দিকে জাহাজ চালাও। জাহাজচালক হুইল ঘোরাল। জাহাজ ঘুরে পশ্চিমমুখো হলো। ওদিকে পালেও হাওয়া লেগেছে। জাহাজ চলল। বাতাসের তেমন জোর নেই। জাহাজ আস্তে আস্তে চলল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস—হাওয়া পড়ে গেছে। দাঁড় বাইলে ভালো হতো।

কী দরকার রাত জেগে দাঁড় বাইবার। সকাল পর্যন্ত দেখি। হাওয়ার জোর না বাড়লে তখন দেখা যাবে। এখন সবাই বিশ্রাম করুক। ঘুমিয়ে নিক। ফ্রান্সিস বলল।

জাহাজের গতি মন্থর। লিপারি দ্বীপের দক্ষিণে জাহাজ এল। তখনই দ্বীপটায় অনেক লোকের চিৎকার হৈ-হল্লা শোনা গেল। একটু পরেই দেখা গেল দ্বীপের বাড়িঘরে আগুন লেগেছে। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশে কালো ধোঁয়া উঠছে। এবার তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ, লোকজনের চিৎকার, কাতর আর্তনাদ, আহতের গোঙানি শোনা গেল। দ্বীপের আগুনের আভায় দ্বীপের পশ্চিমদিকে দুটো জাহাজের মাস্তুল দেখা গেল। পালগুলো গোটানো। ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, বলো তো কী ব্যাপার?

গোলমাল, আহতদের আর্তনাদ শুনে মনে হচ্ছে রাজা ফ্রেডারিকের নতুন সৈন্যরা লিপারি দ্বীপ আক্রমণ করেছে। বিদ্রোহী যুবকটি বলেছিল রাজা ফ্রেডারিকের নতুন সৈন্যদল আসছে। তারাই জাহাজে চড়ে এসেছে। বিদ্রোহীদের ঘাঁটি এই দ্বীপটির বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে। রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা সুশিক্ষিত সৈনিক সন্দেহ নেই। বিদ্রোহীদের তো দেখেছি। তেমন অস্ত্রশস্ত্র বা শিক্ষা নেই। ওদের লড়তে হবে মনের জোরে।

যা বুঝছি বিদ্রোহীরা হেরে গেছে। ফ্রান্সিস বলল।

তারই সম্ভাবনা বেশি। হ্যারি বলল।

জাহাজ চলেছে। লিপারি দ্বীপের চিৎকার হৈ-হল্লা শুনে বিস্কো, শাঙ্কো আর কয়েকজন ভাইকিংও ডেকে উঠে এসেছে ততক্ষণে। সবাই রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইল।

দ্বীপটায় এ সময় হঠাৎ দু-একটা জ্বলন্ত ঘর বোধহয় ধসে পড়ল। দাউ দাউ করে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল। ফুলকি উড়ল বেশ উঁচু পর্যন্ত। দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিসদের জাহাজ পর্যন্ত আগুনের উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে পড়ল। সমুদ্রের জলেও সেই আভা ছড়াল। তখনই বিস্কো চেঁচিয়ে উঠল, ফ্রান্সিস, একটা নৌকো জলে ভাসছে। ততক্ষণে সবাই সেই নৌকোটা দেখেছে। নৌকোটায় কোনো আরোহী নেই। আস্তে আস্তে ওটা ভেসে চলেছে। বিস্কো বলল, খালি নৌকো—কোনো মানুষ নেই নৌকোটায়।

আবার দ্বীপটায় জ্বলন্ত বাড়িঘর কিছু ধসে পড়ল। আগুনের ফুলকি উড়ল। আবার আগুনের আভা ছড়াল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল—নৌকোটার মধ্যে একটা হাত উঠেই নেমে গেল। এটা হ্যারির চোখেও পড়ল। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পেড্রো—পেড্রো কোথায়? পেড্রো একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল, পেড্রো, মাস্তুলের মাথায় ওঠো। ভালো করে দেখো তো নৌকোটায় কোনো মানুষ আছে কিনা। পেড্রো ছুটল মাস্তুলের দিকে। ও তো নজরদার। তরতর করে মাস্তুলের মাথায় উঠে গেল। একটু পরে অমনি দ্রুত নেমে এল। বেশ হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল,

নৌকোটায় দুজন লোক। গলুইয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। তাই আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে মরে গেছে না বেঁচে আছে বুঝলাম না।

বেঁচে আছে। আমি হাত তুলতে দেখেছি। ফ্রান্সিস বলল।

কী করবে এখন? হ্যারি বলল।

যে দেশেরই হোক, মানুষ তো। ফ্রান্সিস বলল, ওদের বাঁচাতে হবে। বিস্কো, এক্ষুণি যাও। নৌকোটা টেনে নিয়ে এসো। কিন্তু আমাদের নৌকোয় চড়ে যেও না। বলা যায় না হয়তো রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা এদিকে নজর রাখছে। সাঁতরে যাও।

বিস্কো জাহাজের হালের দিকে চলে গেল। ঝোলানো দড়িদড়া ধরে ধরে আস্তে সমুদ্রের জলে নামল। জলে বেশি শব্দ না করে সাঁতরে চলল নৌকোটার দিকে।

নৌকোর কাছাকাছি পৌঁছে বিস্কো ঠিক করল আগেই নৌকোর মধ্যে উঁকি দেবে না। বলা যায় না ভেতরে যে দুজন লোক আত্মগোপন করে আছে তারা হয়তো সশস্ত্র। চমকে উঠে হয়তো ওকে আক্রমণও করতে পারে। বিস্কো তো তরোয়ালই আনেনি।

বিস্কো নৌকোটার পেছন দিকে গেল। নৌকোর গায়ে হাত রেখে একটু বিশ্রাম করল। নৌকোর পেছন দিকটা লম্বাটে নয়,চ্যাপ্টামতো। ওখান থেকে একটা দড়ি ঝুলছিল। বিস্কো দড়িটা নিয়ে দাঁতে চেপে ধরল। তারপর সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে। নৌকোটাও ভেসে চলল সঙ্গে সঙ্গে।

নৌকোটা জাহাজের গায়ে এসে লাগল। এবার দেখা গেল দুজন লোক নৌকোটার গলুইয়ে শুয়ে আছে। মড়ার মতো। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে লো ল্যাতিন ভাষায় বলল, তোমাদের কোনো ভয় নেই। দড়ি ফেলা হচ্ছে, দড়ি ধরে ধরে উঠে এসো। লোক দুজনের মধ্যে একজন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। অল্প আলোয় দেখা গেল লোকটি বয়স্ক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ। লোকটি নৌকো থেকে মুখ তুলে বলল, আমি মোটামুটি সুস্থ। কিন্তু সঙ্গের যুবকটি বেশ আহত। ও দড়ি ধরে উঠতে পারবে না। এবার বিস্কো নিশ্চিন্ত হলো—লোক দুটো সশস্ত্র নয়। বিস্কো নৌকোটায় উঠল। ওদিকে শাঙ্কোরা কয়েকজন মিলে জালের মতো বাঁধা দড়ি জাহাজ থেকে নামিয়ে দিল। বিস্কো আহত যুবকটিকে ধরে তুলে বসিয়ে দিল। আহত যুবকটি ককিয়ে উঠল। ততক্ষণে দড়ির জাল নামানো হয়েছে। বিস্কো আস্তে আস্তে যুবকটিকে ধরে দাঁড় করাল। তারপর দড়ির জালে বসিয়ে দিল। আহত যুবকটি গোঙাতে শুরু করল। ওপর থেকে শাঙ্কোরা দড়ির জালে বসে-থাকা যুবকটিকে আস্তে আস্তে জাহাজের রেলিঙের ওপর দিয়ে তুলে এনে ডেকে নামাল। আহত যুবকটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ডেকেই শুয়ে পড়ল। এবার জাহাজের কাচঢাকা চৌকোনো লণ্ঠনের আলোয় ফ্রান্সিস হ্যারি যুবকটিকে দেখেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। যুবক সেই বিদ্রোহী নেতা। ঘাড়ের ওপর ঝুলে-পড়া মাথার চুল। এখন বুকে বর্ম পরা নেই। খালি গা। হাত-কাঁধ-মুখ-কপাল ক্ষতবিক্ষত। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, শীগগির বৈদ্যকে ডেকে আনো। ওদিকে বিস্কো আর বয়স্ক লোকটি দড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এসেছে। বিস্কো তাড়াহুড়োতে একটা মারাত্মক ভুল করল। যুবক আর লোকটি যে নৌকোয় ভাসছিল সেই নৌকোটা বিস্কো দড়ি দিয়ে ওদের জাহাজের গায়ে বেঁধে রেখে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারিরা আহত যুবকটিকে নিয়ে ব্যস্ত। ওরা এটা লক্ষ্য করল না।

জাহাজের বৈদ্য ওষুধের ঝোলা নিয়ে এল। আহত যুবকটির ক্ষতগুলো পরীক্ষা করল। বৈদ্যকে ফ্রান্সিস বলল, কেমন দেখলে?

তরোয়াল-বর্শার ঘায়ে কেটে গেছে। বেশি রক্ত পড়েছে তাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভয়ের কিছু নেই। বৈদ্য ঝোলা খুলল। চিনেমাটির বোয়াম বের করল। চটচটে আঠার মতো হলুদ-রঙা ওষুধ ক্ষতস্থানে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিল। যুবকটি ককিয়ে উঠেই শান্ত হলো। ওর মৃদু গোঙানি বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল, একে তোমরা সাবধানে নিয়ে যাও। কোনো কেবিনে রাখো। মারিয়াকে বলো ও যেন যুবকটির দেখাশুনো করে।

শাঙ্কোরা কয়েকজন মিলে যুবকটিকে কাঁধে করে নিয়ে গেল।

বয়স্ক লোকটিও তখন ডেকে বসে পড়েছে। বোঝা গেল ভীষণ ক্লান্ত লোকটি। ফ্রান্সিস একবার দেখল লোকটিকে। লোকটির পরনে সাধারণ চাষীর পোশাক। ফ্রান্সিস এবার হ্যারিকে মৃদুস্বরে বলল, হ্যারি, চিনতে পেরেছো যুবকটিকে?

হ্যাঁ। সেই যে বক্তৃতা দিচ্ছিল, বিদ্রোহী নেতা।

কী করবে এখন? ফ্রান্সিস বলল।

ও ভীষণ আহত। বিপন্নও। ওকে তো আশ্রয় দিতেই হবে। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তো ওকে রাখতেই হবে। হ্যারি বলল।

বুঝলাম এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। কিন্তু পরাজিত আহত এই বিদ্রোহী নেতাকে ফ্রেডারিকের সৈন্যরা নিশ্চয়ই খুঁজে বেড়াবে। যদি আমাদের জাহাজ খানাতল্লাশী করতে আসে? ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু ওরা কী করে বুঝবে যে যুবকটি আমাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে? হ্যারি বলল।

তা ঠিক। যাক গে, কালকের দিনটা দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

এ সময় মারিয়া ডেকে উঠে এল। ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল, আহত যুবকটি এখন একটু ভালো আছে। ওর সঙ্গের লোকটি কোথায়?

ফ্রান্সিস ডেকে বসা লোকটিকে দেখাল। মারিয়া লোকটির কাছে গেল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন? লোকটি মাথা নেড়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল, আমি আসলে স্পেনীয়। অনেকদিন আগে জাহাজডুবি হয়ে এই সিসিলিতে এসেছিলাম। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো। লোকটির সঙ্গে কথা বলে সব জানা যাবে।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি লোকটির কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল, আপনার নাম কী?

সাভোনা। লোকটি আস্তে বলল।

ঐ যুবকটি তো বিদ্রোহী নেতা?

সাভোনা একটু আশ্চর্য হলো। বলল, আপনারা জানলেন কী করে?

যে ভাবেই হোক জানতে পেরেছি। যুবকটির নাম কী?

মোরাবিত। ও আমার সন্তানের মতো। সাভোনা বলল।

হুঁ। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল, কী হয়েছিল অল্প কথায় বলুন তো।

লোকটি বলতে লাগল, আমরা লিপারি দ্বীপ থেকে সিসিলি আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। তার আগেই রাজা ফ্রেডারিকের সৈন্যরা দুটো জাহাজে চড়ে এল। লিপারি দ্বীপে আমাদের আক্রমণ করল। আমরা হেরে গেলাম। সৈন্যরা আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল। ভীষণ আহত মোরাবিতকে কাঁধে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে সমুদ্রতীরে এলাম। পেয়ে গেলাম আমাদের একটা নৌকো। মোরাবিতকে নৌকোয় শুইয়ে দিয়ে আমিও পাশে শুয়ে পড়লাম যাতে রাজার সৈন্যরা আমাদের দেখতে না পায়। নৌকো সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে চলল। তারপর—লোকটি থামল।

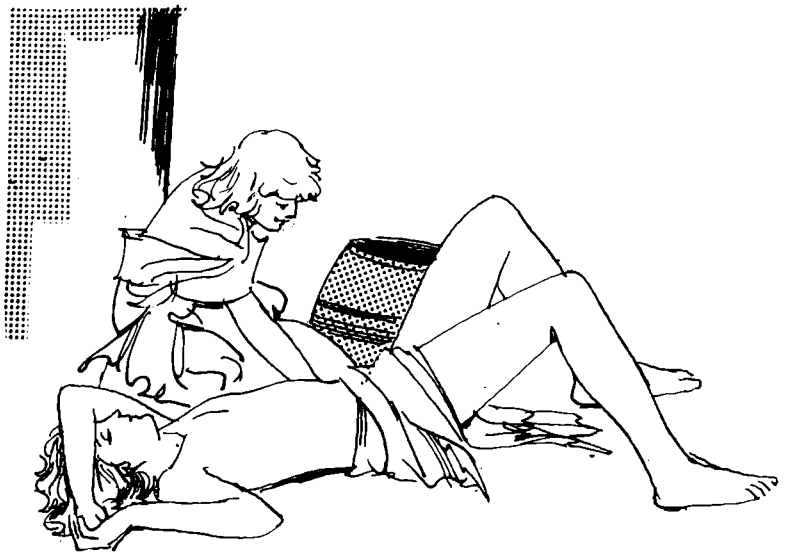

যুবকটি ডেকেই শুয়ে পড়ল।

হুঁ। ফ্রান্সিস একটু ভেবে নিয়ে বলল, দেখুন, আমরা ভাইকিং—বিদেশী। মোরাবিত আর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি আপনারা অসুস্থ ও বিপন্ন বলে। কিন্তু আপনাদের দেশের কোনো ব্যাপারের সঙ্গে আমরা নিজেদের জড়াতে চাই না। তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অঞ্চল থেকে চলে যেতে চাইছি। কিন্তু আপনারা জাহাজে থাকলে তো আমাদেরও জাহাজ থামিয়ে অপেক্ষা করতে হয়।

সাভোনা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে। মোরাবিত কাল নাগাদ একটু সুস্থ হলে আমরা আপনাদের জাহাজ থেকে নেমে যাবো।

ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। শুধু শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল, জাহাজের পাল নামিয়ে নোঙর ফেলতে বলো। জাহাজ এখানেই থামিয়ে রাখতে হবে। অন্তত কাল অবধি।

মারিয়া সাভোনাকে বলল, আসুন, আপনাদের দুজনকেই খেতে দেব। সাভোনা আস্তে আস্তে উঠল। মারিয়ার সঙ্গে চলে গেল খাবার ঘরের দিকে।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস হ্যারি শুতে চলে গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম আসতে একটু দেরি হলো। ওর মাথায় নানা চিন্তা।

ভোর হলো। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেমেই আছে। হ্যারি বরাবরই খুব ভোরে ওঠে। হ্যারি জাহাজের ডেকে উঠে এল। অনেক ভাইকিং বন্ধু ডেকের এখানে ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে।

সবে সূর্য উঠেছে। সমুদ্রে আকাশে হালকা নরম রোদ ছড়ানো। হ্যারি লিপারি দ্বীপের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। দেখল দুটো যুদ্ধ-জাহাজ ওদের জাহাজের দিকে আসছে। বেশ দ্রুতই আসছে।

হ্যারি চিৎকার করে বলল, এই সবাই উঠে পড়ো। তারপরই ছুটল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। ফ্রান্সিসের কেবিনঘরের দরজায় ঘা দিয়ে ডাকল, ফ্রান্সিস! ফ্রান্সিস!

মারিয়া জেগেই ছিল। ও ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। ফ্রান্সিসও ততক্ষণে উঠে পড়েছে। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, ডেকে এসো। দুটো যুদ্ধজাহাজ আমাদের জাহাজের দিকে আসছে।

বলো কি? ফ্রান্সিস বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। ছুটল ডেকের সিঁড়ির দিকে।

ডেকে তখন ভাইকিং বন্ধুরা জড়ো হয়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখে বিস্কো বলল, ফ্রান্সিস, এখন কী করবে?

দাঁড়াও, দেখি। ফ্রান্সিস তাকাল জাহাজ দুটোর দিকে। জাহাজ দুটো তখন অনেক কাছে চলে এসেছে। সৈন্যরা জাহাজের রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রীক সৈন্যদের মতো মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে লোহার বর্ম। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো যে জলদস্যুর দল নয়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা হলো এরা কারা? ওদের জাহাজের দিকে আসছে কেন?

ফ্রান্সিস, আমরা আগেই লড়াইয়ে নামবো না—দেখি এদের উদ্দেশ্য কী? হ্যারি বলল।

আমিও তাই ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর ডেকে জড়ো হওয়া বন্ধুদের উদ্দেশে বলল, ভাইসব, আমরা আগেই লড়াইয়ে জড়াবো না। এরা কারা, কী চায় আগে শুনি সব।

বন্ধুরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছিল মনে মনে। ফ্রান্সিসের কথা শুনে ওরা একটু হতাশ হলো। হতাশা চাপা থাকলো না বিস্কোর কথায়। বিস্কো বলল, যদি এই সৈন্যরা নিরস্ত্র আমাদের হত্যা করে?

ফ্রান্সিস বলল, আমার এখনও তা মনে হচ্ছে না। তবু সবাই অস্ত্র আনো। অস্ত্র নিয়ে ডেকের একপাশে দাঁড়াও। আমার আর হ্যারির তরোয়াল দুটোও এনো।

সবাই ছুটল অস্ত্রঘরের দিকে। ভাইকিংদের ছুটোছুটিতে কথাবার্তায় মারিয়া বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ও দ্রুতপায়ে ডেকে উঠে এল। ওদিকে মোরাবিতের পাশে সাভোনা ঘুমিয়েছিল। ভাইকিংদের ডাকাডাকি ছুটোছুটির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠল। দেখল মোরাবিত তখনও ঘুমিয়ে আছে। ও মোরাবিতকে আর ডাকল না। কেবিনঘরের বাইরে এল। সিঁড়ি বেয়ে ডেকে পা রেখেই ও চমকে উঠল। রাজা ফ্রেডারিকের জাহাজ। সামনের জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে রাজা ফ্রেডারিকের প্রধান সেনাপতি এলাইমো। সাভোনা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করল। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। ছুটল নিজেদের কেবিনের দিকে।

ওদিকে সেনাপতি এলাইমো যে জাহাজে ছিল সেই জাহাজটা ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজটা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল। এলাইমো এক লাফে ফ্রান্সিসদের জাহাজের রেলিং ধরে ডেকে উঠে এল। পেছনে পেছনে আরো কয়েকজন সৈন্য।

এলাইমো এগিয়ে এল ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মারিয়ার দিকে। এলাইমো দীর্ঘদেহী। বলিষ্ঠ। মুখে দাড়িগোঁফ। বেশ সযত্নে ছাঁটা। বলল, আপনারা কারা? কোত্থেকে আসছেন? লো ল্যাতিন ভাষা। হ্যারি এক পা এগিয়ে এসে বলল, আমরা ভাইকিং। ক্রীট দ্বীপ থেকে ফিরছি।

সশস্ত্র ভাইকিংদের দেখে এলাইমো মৃদু হাসল। বলল, শুনেছি আপনারা বীরের জাতি। আমাদের সঙ্গে লড়াই চান?

না। তবে আমাদের জীবন বিপন্ন হলে লড়াইতে তো নামতেই হবে। হ্যারি বেশ দৃঢ়স্বরে বলল।

যাকগে, এলাইমো সহজভঙ্গিতে বলল, আমি এলাইমো, রাজা ফ্রেডারিকের প্রধান সেনাপতি। এক বিদ্রোহী নেতা আর তার পরামর্শদাতার খোঁজে এসেছি।

আমরা এখানকার কাউকেই চিনি না। হ্যারি বলল।

কিন্তু তাদের আপনারা দেখেছেন। এলাইমো বলল।

না, দেখিনি। হ্যারি বলল।

ঠিক আছে, রেলিঙে ঝুঁকে দেখুন তো আপনাদের জাহাজের সঙ্গে একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে কিনা।

হ্যারি রেলিঙের কাছে গিয়ে ঝুঁকল। সর্বনাশ! বিস্কো কী সাংঘাতিক ভুল করেছে! মোরাবিতদের নৌকোটা বেঁধে রেখেছে। হ্যারি একবার বিস্কোর দিকে তাকাল। তারপর ফ্রান্সিসের কাছে এল। নিচুস্বরে সব কথা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, দ্যাখো মিথ্যে বলে কাজ হয় কিনা।

হ্যারি এলাইমোর দিকে তাকাল। বলল, ওটা আমাদেরই নৌকো।

অসম্ভব। ঐরকম গণ্ডোলার মতো দেখতে নৌকো একমাত্র এই অঞ্চলের লোকেরাই ব্যবহার করে। এলাইমো বলল।

খালি নৌকোটা ভাসছিল, আমরা জাহাজে বেঁধে নিয়েছি। হ্যারি বলল।

এলাইমো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, গতরাতে অন্ধকারের মধ্যে ওরা ঐ নৌকোটায় লুকিয়ে পালিয়েছিল। কাজেই—একটু থেমে বলল, ওরা দুজন আপনাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে।

এবার হ্যারি ফ্রান্সিসকে নিম্নস্বরে সব বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এখন সব স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। ফ্রান্সিস দ্রুত হ্যারিকে বলে গেল কী বলতে হবে। হ্যারি বলল, আমরা সত্যি কথাই বলছি। কাল রাতে নৌকোয় আত্মগোপন করে যে দুজন এসেছিল তারা কারা আমরা জানি না। দুজন বিপদগ্রস্ত মানুষ। তার মধ্যে একজন আবার গুরুতর আহত, তাই আমরা মানবিক কারণেই তাদের আশ্রয় দিয়েছি, আহতকে চিকিৎসা করিয়েছি।

কোথায় ওরা? এলাইমো বলল।

একটা কেবিনে। হ্যারি বলল।

আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন। এলাইমো বলল।

নিয়ে যাবো একটি শর্তে। আপনি ওদের হত্যা করতে পারবেন না। হ্যারি বলল।

যদি করি। এলাইমো বলল।

তাহলে আমরা লড়াইয়ে নামবো। হ্যারি কথাটা বলে ফ্রান্সিসকেও বলল। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করল।

এলাইমো একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে। ওদের জীবিত ধরাই রাজা ফ্রেডারিকের ইচ্ছে। ওদের রাজার কাছে নিয়ে যাবো।

আমরাও ওদের সঙ্গে যাবো। হ্যারি বলল।

আপনারা যাবেন কেন? এলাইমো একটু আশ্চর্য হয়ে বলল।

যদি যাওয়ার পথে আপনারা ওদের মেরে ফেলেন। হ্যারি বলল।

এলাইমো বুঝল এরা সহজে মোরাবিত আর সাভোনাকে ছাড়বে না। ও বলল, ঠিক আছে, আপনারা ক'জন যাবেন চলুন।

আমরা সবাই যাবো। হ্যারি বলল।

তার মানে? এলাইমো বলল।

মোরাবিত আর সাভোনা আমাদের জাহাজে যে কেবিনঘরে আছে সেখানেই থাকবে। আমরা মোরাবিতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করবো। আপনাদের জাহাজের সঙ্গেই আমাদেরও জাহাজ যাবে।

এবার এলাইমো বলল, রাজা ফ্রেডারিক সিরাকস বন্দরের ম্যামিয়েস দুর্গে আছেন। সিরাকস বন্দর কাছেই। একটু থেমে বলল, কিন্তু—আপনাদের বিশ্বাস কি! আমাদের দুটো জাহাজ আপনাদের জাহাজের দুপাশে থাকবে। এভাবেই আমাদের নজরদারির মধ্যে দিয়ে আপনাদের সিরাকস বন্দরে যেতে হবে।

হ্যারি নিম্নস্বরে ফ্রান্সিসকে সব বলল। ফ্রান্সিস বলল, বলো আমরা এই প্রস্তাবে রাজী। হ্যারি সে কথাই বলল।

এলাইমো সঙ্গের জনা দশেক সৈন্যকে ফ্রান্সিসদের জাহাজে পাহারায় থাকতে হুকুম দিল। দুজন সৈন্যকে দেখিয়ে বলল, এরা মোরাবিত আর সাভোনা যে কেবিনঘরে আছে সে ঘরের সামনে পাহারা দেবে।

হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, বেশ। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল সে কথা। মারিয়া বলল, আমি এই সৈন্য দুজনকে নিয়ে যাচ্ছি। মারিয়া হাত নেড়ে সৈন্য দুজনকে আসতে বলে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলল। পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্য দুজনও চলল। এলাইমো নিজের জাহাজে ফিরে গেল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশে জাহাজের গুটোনো পাল তুলে দেওয়া হলো। জাহাজ চলল। দুধারে এলাইমোর দুটো যুদ্ধজাহাজও সঙ্গে সঙ্গে চলল।

ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে মোরাবিতদের কেবিনঘরের সামনে এল। দেখল, খোলা তরোয়াল হাতে দুজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। ও কেবিনঘরে ঢুকল। মারিয়া তখন মোরাবিতের শরীরের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগাচ্ছে। সাভোনা চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিস সাভোনার সাহায্যে মোরাবিতের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ফ্রান্সিস বলল, এখন কেমন আছো?

মোরাবিত হেসে বলল, এখন অনেকটা ভালো আছি। কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না।

কেন? ফ্রান্সিস বলল।

আপনাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কিন্তু সেই আপনারা আমাদের জন্যে কী বিপদে পড়লেন! এর চেয়ে আমরা ধরা দিলে ভালো হতো। মোরাবিত বলল।

তুমি এই নিয়ে ভেবো না। ফ্রান্সিস বলল।

সাভোনা বলল, আমরা বিদ্রোহী—প্রাণপণে লড়াই করেছি কিন্তু আমরা অস্ত্রে বা যুদ্ধবিদ্যায় রাজার সৈন্যদের সমকক্ষ নই। যদি কিছু অর্থ যোগাড় করতে পারতাম—

ওর সঙ্গে মোরাবিতও কী বলে উঠল। সাভোনা হেসে উঠল।

মারিয়া বলল, হাসছেন যে?

মোরাবিত বলছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন ও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। সাভোনা হেসে বলল।

এবার ফ্রান্সিস চমকে ওদের দিকে তাকাল। বলল, কাউন্ট রজার কে? তার গুপ্তধন—মানে ব্যাপারটা কী বলুন তো?

সাভোনা বলল, সেসব শুনে আপনাদের কী হবে?

মারিয়া বলল, ওর নাম ফ্রান্সিস। অনেক গুপ্তধনের রহস্য ও ভেদ করেছে। ওকে বলেই দেখুন না।

সাভোনা, বলুন তো কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের ব্যাপারটা। ফ্রান্সিস বলল। তখনি হ্যারি ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলে উঠল, হ্যারি, ভালো সময়েই এসেছো। শোনো সাভোনা এক গুপ্তধনের কাহিনী বলছে।

সাভোনা আস্তে আস্তে বলতে লাগল:

প্রায় একশো বছর আগের কথা। দুই নর্মান ভাই রজার ও রবার্ট সমুদ্রপথে সিসিলি এসেছিল। দু ভাই-ই ছিল দুঃসাহসী আর অত্যন্ত বলশালী। দুজনেই ছিল দস্যু। দস্যুবৃত্তি করে জমানো প্রচুর ধনসম্পদ ছিল ওদের। ক্রমে সিসিলি জয় করে রবার্ট উত্তরের আর রজার দক্ষিণের রাজা হয়ে বসল। রজার উপাধি নিল

কাউন্ট। রাজা হিসেবে কাউন্ট রজার কিন্তু যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। যা হোক, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কাউন্ট রজারের ধর্মে মতি হলো। খ্রীস্টধর্মগুরু পোপের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলল। পুরোনো জীর্ণ গ্রীক মঠগুলো সংস্কার করল। সিরাকস আর কাতানিয়ায় দুটো গীর্জা তৈরি করল। তারপর কাউন্ট রজার মারা গেল। উত্তরের পোলার্মো থেকে ভাই রবার্ট ছুটে এল। উদ্দেশ্য কাউন্ট রজারের ধনসম্পত্তি অধিকার করা। দুজনেই তো অতীতে দস্যু ছিল। রবার্ট সিরাকসের রাজবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কাউন্ট রজারের ধনসম্পত্তির কোনো হদিসই পেল না। রাজকোষের কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে রবার্ট ফিরে গেল। তারপর একশ বছর ধরে কাউন্ট রজারের বংশধররা, ধনী ভূস্বামীরা অনেকেই খুঁজছে। কিন্তু কেউ কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের হদিস করতে পারেনি। সাভোনা থামল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ সব মন দিয়ে শুনছিল। এবার বলল, আচ্ছা, কাউন্ট রজার কি তার গুপ্তধন কোথায় রাখা হয়েছে সেসব ব্যাপারে কোনো সূত্র রেখে যায়নি?

কিছুছু না। সাভোনা বলল।

কাউন্ট রজারের মৃত্যু হয়েছিল কোথায়? ফ্রান্সিস বলল।

এই সিরাকসের রাজবাড়িতে। সাভোনা বলল।

সেই রাজবাড়ি কি সিরাকসে এখনও আছে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

না। বেশ কয়েক বছর আগে এখনকার রাজা ফ্রেডারিক সেসব ভেঙে ফেলেছিল। প্রচার করেছিল যে বেশ ভালো একটা দুর্গ তৈরি করবে। তৈরি করেছেও একটা দুর্গ, ম্যামিয়েস দুর্গ। কিন্তু আসল কারণ ছিল কাউন্ট রজারের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান করা। কিন্তু রাজবাড়ি ভেঙে ফেলেও ফ্রেডারিক কিছুই পায়নি। সাভোনা বলল।

তাহলে কাউন্ট রজারের তৈরি কোনো কিছুই সিরাকসে নেই? ফ্রান্সিস বলল।

আছে। তার তৈরি গীর্জাটা। ওটা ম্যামিয়েস দুর্গের উত্তর কোনায় আছে। রাজা ফ্রেডারিক ওটার কিছু সংস্কার করেছিল। ভাঙেনি। তবে এখন ঐ গীর্জায় শুধু রাজপরিবারের মানুষদেরই প্রবেশাধিকার আছে, অন্য কারো নয়।

তাহলে ঐ গীর্জাটা আপনি দেখেননি? ফ্রান্সিস বলল।

একটু চুপ করে থেকে সাভোনা বলল, দেখুন, আমি একসময় রাজা ফ্রেডারিকের একজন অমাত্য ছিলাম। রাজা আমার কাছ থেকে স্পেনীয়, পর্তুগীজ ভাষা শিখেছিল। কয়েকটা ভাষা জানতাম বলে রাজসভায় যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তবে সারাসেনদের ওপর অবিচার হচ্ছিল দেখে আমি সেই পদ ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের দলে চলে এসেছিলাম। ঐ গীর্জায় আমি রবিবারের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অনেকবার গেছি।

গীর্জাটার কিরকম সংস্কার রাজা ফ্রেডারিক করেছেন? ফ্রান্সিস বলল।

যা কিছু সংস্কার ওপরেই হয়েছে। ভিত্তিটা সেই কাউন্ট রজার যেমন করিয়েছিলেন তেমনি আছে। বোধহয় ভিতটায় সুন্দর মোজেকের কাজ ছিল বলেই রাজা ফ্রেডারিক ভেঙে ফেলেনি। সাভোনা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন সম্পর্কে একেবারে নীরব থাকার কারণ কী তাই ভাবতে লাগল।

হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস, কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের অনুসন্ধান করবে নাকি?

অবশ্যই। ফ্রান্সিস বেশ জোর দিয়ে বলল।

মারিয়া বলল, রাজবিদ্রোহীদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি, এজন্যে রাজা ফ্রেডারিক নিশ্চয়ই চটে যাবে। আমাদের না কয়েদঘরে বন্দী করে রাখে!

দেখা যাক। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল।

সেনাপতি এলাইমোর নির্দেশমতো ফ্রান্সিসদের জাহাজ পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল তাদের দুটো জাহাজ দুপাশ থেকে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দূরে সিরাকস বন্দর দেখা গেল। আস্তে আস্তে তিনটি জাহাজই ভিড়ল সিরাকস বন্দরের জাহাজঘাটায়।

এলাইমো ফ্রান্সিসদের জাহাজে এল। তখন ফ্রান্সিস হ্যারি ডেকে দাঁড়িয়েছিল। এলাইমো হ্যারিকে বলল, মোরাবিত আর সাভোনাকে নিয়ে আসুন। ওদের বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আমরা কী করবো? হ্যারি বলল।

রাজার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের এই জাহাজে এখানেই থাকতে হবে। এলাইমো বলল। হ্যারি কথাটা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল, বলো যে বন্দীদের সঙ্গে আমরা তিনজনও রাজার কাছে যাবো। হ্যারি বলল সে কথা।

আপনারা যাবেন কেন? এলাইমো একটু আশ্চর্য হয়েই বলল।

রাজা ফ্রেডারিকের সঙ্গে আমাদের কথা আছে। ফ্রান্সিসের শেখানো মতো হ্যারি বলল। এলাইমো একটু ভাবল। বলল, বেশ। বিদ্রোহীদের আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন। কাজেই রাজা আজ হোক কাল হোক আপনাদের শাস্তি দেবেনই।

এলাইমোর আটজন সৈন্য যে কেবিন-ঘরে মোরাবিত আর সাভোনা ছিল সেই ঘরে গেল। ওদের দুহাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল।

জাহাজঘাটায় দাঁড় করানো ছিল একটা সুসজ্জিত সাদা ঘোড়া। এলাইমো সেই ঘোড়ায় উঠে বসল। ঘোড়া আস্তে আস্তে চলল।

বন্দী দুজনকে মাঝখানে রেখে দুপাশে দাঁড়াল খোলা তরোয়াল হাতে আটজন সৈন্য। পেছনে ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি। মোরাবিত তখনও সুস্থ হয়নি। হাঁটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

নগরে ঢুকল সবাই। সিরাকস মোটামুটি বড় একটা বন্দর-শহর। রাস্তায় লোকজনের বেশ ভিড়। সারি সারি খোলা দোকানপাট। এর মধ্যেই রটে গেছে মোরাবিত আর সাভোনাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হচ্ছে। লোকজন যে যার কাজ ফেলে মোরাবিতকে দেখতে ছুটে এল। সাভোনা রাজ-অমাত্য ছিল। তাকে অনেকেই দেখেছে। চেনেও। কিন্তু বিদ্রোহী যুবক মোরাবিতের নামই সবাই শুনেছে। চোখে কখনও দেখেনি। তাই সকলে সাগ্রহে মোরাবিতকে দেখতে রাস্তায় ভিড় করল। ফ্রান্সিস, মারিয়া, হ্যারিকে দেখেও ওরা একটু আশ্চর্যই হলো। এই ভিনদেশী লোকগুলোকে তো বন্দী করা হয়নি। তাহলে এদের দুর্গে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন?

ম্যামিয়েস দুর্গ অনেকটা জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে। উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রধান দরজার কাছে এলাইমো ঘোড়া থেকে নামল। প্রধান ফটকটি মজবুত কাঠের। দ্বাররক্ষীরা এলাইমোকে দেখে মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। একটু শব্দ তুলে দরজা খুলে দিল ওরা।

সবাই দুর্গের ভেতরে ঢুকল। একটা পাথরের তৈরি চত্বরের পর দুর্গের পাথরে তৈরি বাড়িঘর। চত্বর পেরিয়ে একটা বড় দরজার সামনে সবাই এল। দুজন দ্বাররক্ষী এলাইমোকে সম্মান জানাল। এলাইমো একজন দ্বাররক্ষীকে কী বলল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। একটু পরে বেরিয়ে এলাইমোকে কী বলল। এলাইমো পেছন ফিরে হাতের ইঙ্গিতে সবাইকে ঘরে ঢুকতে বলল।

সৈন্যরা বাদে ঘরে ঢুকল সবাই। ঘরটা বেশ

বড়। একটু অন্ধকার মতো। পাথরের দেয়ালের পাথর কুঁদে ফুল-লতাপাতার কাজ করা। সামনেই একটা পাথরের রঙিন কাপড়-ঢাকা আসনে রাজা ফ্রেডারিক বসে আছেন। দুপাশে লম্বাটে পাথরের কাপড়-ঢাকা আসনে কয়েকজন বসে আছেন। নিশ্চয়ই মন্ত্রী-অমাত্যরা। রাজা ফ্রেডারিকের মাথায় দামী পাথর বসানো সবুজ মীনে-করা মুকুট। রাজা মধ্যবয়স্ক। পরনে রেশমী কাপড়ের ঢিলে পোশাক। অমাত্যদের গায়েও একই রকম পোশাক।

এলাইমো মাথা নিচু করে রাজাকে সম্মান জানাল। মোরাবিত সাভোনা মাথা নোয়ালো না। ফ্রান্সিস এটা দেখে মনে মনে ওদের প্রশংসা করল। এলাইমো একনাগাড়ে কী বলে যেতে লাগল। হ্যারি মৃদুস্বরে সেসব ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে দিল। এলাইমোর কথা শেষ হলে রাজা ফ্রেডারিক মোরাবিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, সারাসেনদের ক্ষেপিয়ে তুমি রাজবিদ্রোহী হয়েছো। তোমার ফাঁসি হবেই। এবার সাভোনার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন, সাভোনা, বেশ তো আমার রাজসভায় সুখে ছিলে। সে সুখ তোমার সহ্য হলো না। সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলে। বিদ্রোহীদের পরামর্শদাতা হলে। এবার বাকি জীবন কয়েদঘরে কাটাতে হবে যে। মোরাবিত সাভোনা কোনো কথা বলল না।

এবার রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, শুনলাম আপনারা ভাইকিং। মোরাবিত আর সাভোনাকে আশ্রয় দিয়েছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছেন। কিন্তু আপনারা কি জানতেন না এরা রাজদ্রোহী?

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে সত্যি কথাই বলল, হ্যাঁ, মোরাবিত বিদ্রোহী আমরা ঘটনাক্রমে সেটা জানতাম। কিন্তু সাভোনার পরিচয় জানতাম না।

ফ্রান্সিসের কথা শুনে হ্যারি মৃদুস্বরে বলল, এটা স্বীকার করলে কেন? এতে তো আমাদের বিপদ বাড়বে।

দেখা যাক। ফ্রান্সিসও মৃদুস্বরে বলল।

রাজা ফ্রেডারিক বললেন, আপনারা বিদেশী। তবু জেনেশুনে যখন ওদের আশ্রয় দিয়েছেন তখন আপনাদেরও বিচার হবে কয়েকদিনের মধ্যেই।

ফ্রান্সিস বলল, বেশ। তবে আপনাকে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে।

বলুন।

সাভোনা এদেশের অতীত ইতিহাস ভালোই জানেন। ওঁর কাছে শুনেছি প্রায় একশো বছর আগের রাজা কাউন্ট রজার এখানে তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ কোথাও গোপনে রেখেছিলেন। আমরা স্থির করেছি সেই গুপ্তধন অনুসন্ধান করে উদ্ধার করবো। ফ্রান্সিস বলল।

কথাটা শুনে রাজা ফ্রেডারিক বেশ আশ্চর্য হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, প্রায় একশো বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষরা ঐ গুপ্তধন উদ্ধারের কত চেষ্টা করেছেন। কেউ পারেননি। আপনি বলছেন পারবেন!

পারবোই একথা বলার সময় এখনো আসেনি। সব দেখেশুনে চিন্তাভাবনা করে তবেই পারবো কিনা সেটা বলা যাবে। তবে আমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রাখি। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফ্রেডারিক অবাক চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফ্রান্সিস বলল, আপনার কাছে আমি কয়েকটা কথা জানতে চাই।

বলুন।

কাউন্ট রজার তাঁর রাজত্বকালে কী কী তৈরি করিয়েছিলেন?

এখানে আর কাতানিয়ায় দুটো গীর্জা আর যে বিরাট বাড়িটা কাতানিয়ায় তৈরি করাবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেই বাড়িটা। তারপরই উনি মারা যান। রাজা বললেন।

অসুস্থতার সময় কোথায় ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

কাতানিয়ার ঐ বাড়িটায়। অবশ্য দুদিন পরেই তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়। এখানকার রাজবাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফ্রান্সিস চুপ করে শুনল। তারপর বলল, আজকে আমরা জাহাজে ফিরে যাবো। এই দুর্গে আমাদের একটা থাকবার জন্যে ঘর দেবেন। কাল থেকে আমরা তিনজন এখানেই থাকবো। আর একটা কথা, সাভোনা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ওঁর সাহায্য আমাদের খুবই প্রয়োজন।

যদি সাভোনা পালিয়ে যায়? রাজা বললেন।

আমি তার জন্যে দায়ী থাকবো। ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। রাজা মুখে শব্দ করলেন।

আর আমরা যেন সর্বত্র অবাধে যেতে পারি, খোঁজখবর করতে পারি, কেউ যেন আমাদের বাধা না দেয়—এই আদেশ আপনি দেবেন। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ। রাজা মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন।

এবার ফ্রান্সিস বলল, যদি গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমাদের তো বটেই, মোরাবিত আর সাভোনাকেও মুক্তি দিতে হবে।

রাজা ফ্রেডারিক একটু ভাবলেন। তারপর দুজন অমাত্যকে ইঙ্গিতে ডাকলেন। দুজন রাজার সামনে গেলেন। তিনজনের মধ্যে কী কথাবার্তা হলো। অমাত্যরা ফিরে গিয়ে নিজেদের জায়গায় বসলেন। রাজা বললেন, দেখুন, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আপনারা উদ্ধার করতে পারবেন না। তবু আপনার শর্তে আমি রাজী হলাম। কিন্তু যদি গুপ্তধন উদ্ধার করতে না পারেন? রাজা বললেন।

তাহলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের জাহাজ চালিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে দেবেন। মোরাবিত ও সাভোনার সঙ্গে আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিসের এই শর্ত শুনে হ্যারি ভীষণভাবে চমকে উঠল। বলল, কী বলছো ফ্রান্সিস? মারিয়াও বিস্ময়ে বলে উঠল, কী সাংঘাতিক! ফ্রান্সিস গভীরস্বরে বলল, অনেক ভেবেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা বাধা দিও না। রাজা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ফ্রান্সিসের দিকে। মোরাবিত সাভোনা ওর আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, নিজের দেশবাসীও নয়। অথচ ওদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না এই বিদেশী। রাজা দুজন অমাত্যকে ডাকলেন। তাঁদের বললেন সব। এবার সবাই ফ্রান্সিসের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। সবাই নীরব। হঠাৎ সাভোনা ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, ফ্রান্সিস, এ তুমি কী বললে! কী সাংঘাতিক শর্ত! উফ্। সাভোনা মোরাবিতকে ফ্রান্সিসের শর্তের কথা বুঝিয়ে বলল। মোরাবিত চিৎকার করে কী বলে উঠল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস মোরাবিতও বলছে তুমি এরকম শর্ত দিও না। ফ্রান্সিস হাসল। বলল, এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

রাজা ফ্রেডারিক বললেন, ঠিক আছে। আমরা পরস্পরের শর্ত মেনে চলবো। আপনারা জাহাজে ফিরে যেতে পারেন। তবে সৈন্যদের কড়া পাহারার মধ্যে আপনাদের থাকতে হবে।

বেশ। ফ্রান্সিস মাথা একটু ঝাঁকিয়ে বলল।

একদল সৈন্যের পাহারায় জাহাজে ফিরে এল ফ্রান্সিসরা। আসার পথে হ্যারি মারিয়া একটি কথাও বলতে পারল না। ফ্রান্সিসের শর্তের কথা ভেবে ওরা দুজনই বিমর্ষ।

জাহাজে উঠতেই সব বন্ধুরা ছুটে এসে ওদের ঘিরে ধরল। হ্যারি বলল, ভাইসব, ফ্রান্সিসকে বিশ্রাম করতে যেতে দাও। রাজকুমারীও ফ্রান্সিসের সঙ্গে যান। যা বলার আমি বলছি। ফ্রান্সিস আর মারিয়া নিজেদের ঘরে চলে গেল। হ্যারি বন্ধুদের সব বলল। ফ্রান্সিসের শর্তের কথা শুনে বন্ধুরা ভীষণ

উত্তেজিত হলো। কেউ কেউ অভিমানের সুরে বলল, ফ্রান্সিস আমাদের কিছু না জানিয়ে এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিল! কয়েকজন উত্তেজিত স্বরে বলল, ফ্রান্সিসকে আমরা জাহাজ ছেড়ে যেতে দেব না। আজ রাতেই পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করে জাহাজ নিয়ে পালাবো। পাহারাদাররা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা ভাইকিংদের কথা কিছুই বুঝল না।

হ্যারি বিপদ আঁচ করল। বন্ধুরা যদি সত্যিই উত্তেজিত হয়ে লড়াইয়ে নামে তাহলে মৃত্যু রক্তক্ষয় অনিবার্য। ও গলা চড়িয়ে বলল, ওসব ভাবনা ছাড়ো। ফ্রান্সিসকে বলছি, ও তোমাদের সব বুঝিয়ে বলবে। হ্যারি চলে গেল। ফ্রান্সিস তখন নিজের কেবিনে চুপ করে শুয়ে চিন্তা করছে। অনেক চিন্তা মাথায়। হ্যারি এল। দেখল মারিয়া মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে। হ্যারি বন্ধুদের মনোভাবের কথা বলল। ফ্রান্সিস চুপ করে শুনল। তারপর বলল, রাতে খাওয়াদাওয়ার পর সবাইকে ডেকে জড়ো হতে বলো। আমি যা বলার বলবো।

রাতে জাহাজের ডেকে জড়ো হলো সবাই। ফ্রান্সিস এল। সঙ্গে মারিয়া। সকলের কথাবার্তা থেমে গেল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, ভাইসব, ধর্ম-ভাষা-মাটির ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা এই পৃথিবীর অধিবাসী। আমাদের একটাই পরিচয় আমরা মানুষ। তাই মোরাবিত আমার ভাই। সাভোনা আমার পিতৃতুল্য। একটু থেমে বলল, ওদের লড়াই অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে, ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। সেটা ওদের দেশের ব্যাপার। কিন্তু মোরাবিতের কথাই ভেবে দেখো। কী সুন্দর সুগঠিত শরীর! কত অল্প বয়েস! ওর দিকে যতবার আমি তাকিয়েছি এক অদ্ভুত স্নেহের টান বারবার অনুভব করেছি। সাভোনার কথা ভাবো। রাজার প্রিয় অমাত্য ছিলেন। যথেষ্ট বুদ্ধিমান। চিন্তাশীল। সারাজীবন তিনি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে তিনি মেনে নিয়েছেন বিদ্রোহীর কষ্টকর দুঃখময় জীবন। এমন দুটি মানুষের মৃত্যু হবে এ আমি মেনে নিতে পারিনি। কাজেই আমি আমার জীবনকে বাজি ধরেছি। আর একটু গলা চড়িয়ে ফ্রান্সিস বলল, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আমি উদ্ধার করবোই। মোরাবিত আর সাভোনাকে আমি বাঁচাবোই। তার জন্যে যদি আমাকে বাকি সারাজীবন এই সিসিলিতে থাকতে হয় আমি থাকবো। ততদিন তো ভাই মোরাবিত, পিতৃতুল্য সাভোনা দুজনেই বেঁচে থাকবে। থামল ফ্রান্সিস। তারপর বলল, ভাইসব, আমার শর্তের সঙ্গে আমি কিন্তু তোমাদের জড়াইনি। তোমরা ইচ্ছে করলে জাহাজ নিয়ে স্বদেশে চলে যেতে পারো। এবারে বুদ্ধির লড়াই আমার একার লড়াই।

ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোনো কথা বলল না। মাথার ওপরে ঝকঝকে তারাভরা আকাশ। শন্‌শন্ সমুদ্রের হাওয়ার শব্দ। জাহাজের গায়ে ঢেউ ভেঙে পড়ছে—ছলাৎ—ছলাৎ।

হঠাৎ বিস্কোর গলা শোনা গেল। ফ্রান্সিস, তোমাকে ছেড়ে আমরা কেউ এখান থেকে এক পাও নড়বো না। শেষ পর্যন্ত তোমাকে যদি রাজা ফ্রেডারিক ফাঁসি দেন আমরা প্রত্যেকে তখন একই-সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবো। সব ভাইকিং উত্তেজিত ভঙ্গিতে দুহাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, ও হো হো।

ফ্রান্সিসের দু চোখ ভিজে উঠল। চোখ মুছে ও ভাঙা গলায় বলল, ভাইসব, আমার বুদ্ধি চিন্তাশক্তির গভীরতার ওপর বিশ্বাস রাখো। জীবনের বাজি আমাকে লড়তে দাও। আমি কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধার করবোই।

সবাই আবার চিৎকার করে ধ্বনি তুলল, ও হো হো। সভা ভেঙে গেল। সবাই পরস্পর কথা বলতে বলতে চলে গেল।

পরদিন সকালেই ফ্রান্সিস মারিয়া আর হ্যারিকে নিয়ে ম্যামিয়েস দুর্গে এল। দুজন সৈন্য ওদের দুর্গের একটা বড় ঘরে নিয়ে এল। ওরা দেখল, ঘরটায় শুকনো ঘাসের ওপর কাপড় ঢাকা সুন্দর বিছানা পাতা। বালিশও রয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। বিছানায় সাভোনা আধশোয়া হয়ে কিছু ভাবছিল। ফ্রান্সিসদের দেখে উঠে বসল। বলল, ফ্রান্সিস, তোমাকে যতটুকু দেখেছি তাই থেকে একটা কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি তুমি জীবনে কিছু আদর্শকে বিশ্বাস করো এবং সেই আদর্শকে রক্ষা করতে তুমি সিদ্ধান্ত নাও। তাই আমি তোমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না। একটু থেমে বলল, বলো এবার তুমি কী করতে চাও?

প্রথমেই কাউন্ট রজারের আমলের যে রাজবাড়ির অংশটা ভাঙা হয়নি সেটা দেখতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ চলো। সাভোনা বলল।

সাভোনার দুর্গ-এলাকা ভালো করেই চেনা। ও ওদের দুর্গের উত্তর কোনায় নিয়ে এল। দেখা গেল একটা ছোট গীর্জা। সাভোনা গীর্জাটা দেখিয়ে বলল, এটাই কাউন্ট রজারের তৈরি গীর্জা। এটার কথা তোমাদের বলেছি। ওরা গীর্জাটার সামনে এল। গীর্জার চারদিকে সুন্দর বাগান। অনেক ফুলগাছ। গোলাপ টিউলিপ ডালিয়া আরো নাম-না-জানা ফুল ফুটে আছে। কাঠের দরজা খুলে ওরা গীর্জাটার দরজার সামনে এল। দেখল প্রবেশপথের মেঝেয় নানারঙের সুন্দর মোজেকের কাজ করা। সাভোনা বলল, এই মেঝে কিন্তু কাউন্ট রজারই তৈরি করিয়েছিল। রাজা ফ্রেডারিক এই মেঝেটা ভাঙেনি।

ওরা গীর্জার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ছোট গীর্জা। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। দেয়ালে মাতা মেরীর ছবি। বেশ ভাবগম্ভীর শান্ত পরিবেশ। দেখা গেল মেঝেতেও মোজেকের কারুকাজ। ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখল। গীর্জা যেমন হয় তেমনি সব। জানলায় রঙিন কাচ। সকালের রোদ কাচের রঙ মেখে মেঝেয় পড়েছে। ফ্রান্সিস বেশ ভালো করেই দেখল সব।

সবাই বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস সাভোনাকে বলল, সাভোনা, কাল আমরা কাতানিয়া যাবো। আপনি ব্যবস্থা করতে পারবেন?

সাভোনা হেসে বলল, রাজা ফ্রেডারিক দুজন সৈন্যকে রেখেছে, দেখেছো তো? পাহারাদারির জন্যে ওদের কিন্তু রাখা হয়নি। আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য ওদের নিযুক্ত করেছে রাজা। গুপ্তধন বলে কথা! রাজা ফ্রেডারিক এখন রাজধানীতে ফিরে যাবে না। গুপ্তধন খুঁজছো তুমি। খুব উৎসাহ রাজা ফ্রেডারিকের। রাজা এখন এখানেই থাকবে।

পরদিন দুপুরেই ফ্রান্সিসদের জন্যে রাজবাড়ির একটা চার ঘোড়ার গাড়ি আনা হলো। গাড়িটা পুরোনা হলেও দেখতে সুন্দর। ফ্রান্সিসরা উঠল গাড়িটায়। গাড়ি দুর্গ থেকে বেরিয়ে ছুটল কাতানিয়ার দিকে। বিকেলের মধ্যেই ওরা কাতানিয়া পৌঁছল। এটাও একটা বন্দর-শহর। তবে সিরাকসের মতো অত জমজমাট নয়। সাভোনার নির্দেশে গাড়ি একটা বিরাট গীর্জার সামনে এসে থামল। গীর্জার মাথায় নানা কারুকাজ করা।

গীর্জার বড় দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে সাভোনা বলল, এই গীর্জাটাও কাউন্ট রজার তৈরি করেছিলেন। তবে এটা সর্বসাধারণের জন্যে। ভেতরে সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীস্টের বড় মূর্তি। দেয়ালে যীশুর জীবনবিষয়ক নানান ছবি। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল এই গীর্জার মেঝেতেও মোজেকের নানা রঙদার কাজ। এসব দেখতে দেখতে একটা কথা হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে পড়ল, দুটো গীর্জাই কাউন্ট রজার তৈরি করিয়েছিলেন। ওপরের

কাঠামো জীর্ণ হয়েছিল বলে রাজা ফ্রেডারিক ওপরের কাঠামো সংস্কার করিয়েছিলেন। কিন্তু মেঝে ভাঙা হয়নি। সংস্কারও করা হয়নি। কাজেই অক্ষত মেঝেটাই কাউন্ট রজারের নির্দেশে তৈরি। কাজেই মেঝেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার ফ্রান্সিস খুব খুঁটিয়ে মেঝের রঙিন মোজেকের নকশাগুলো দেখতে লাগল। তবে ওর তো ছবি-আঁকিয়ের চোখ নয়। নকশাগুলোর ফুল-পাতা গুলিয়ে যাচ্ছে। ও মারিয়াকে বলল, মারিয়া, তুমি তো সেলাই করো, ছবি, নকশা বোঝ— এই মেঝের নকশাটা লক্ষ্য করো তো। ম্যামিয়েস দুর্গের গীর্জার মেঝেতেও নকশা দেখেছিলাম। দুটো নকশাই কি একরকম? মারিয়া কিছুক্ষণ মেঝের নকশার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মনে হচ্ছে একই রকম নয়, তবে ম্যামিয়েসের গীর্জাটা ছোট। নকশাগুলোও ছোট। এটা বড়, কারণ মেঝেটাও বড়।

হুঁ। তুমি ভালো করে নকশাগুলো দেখ। পরে ম্যামিয়েসের গীর্জার মেঝের সঙ্গে মেলাবো। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে। মারিয়া বলল। তারপর মেঝেটায় ঘুরে ঘুরে সব নকশা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

গীর্জার শান্ত পরিবেশ থেকে সবাই বেরিয়ে এল। সাভোনা বলল, এরকম অনেক গীর্জা বাড়িঘরে বিচিত্র স্থাপত্যরীতি দেখা যায়। রোমীয় বাইজেন্টাইন আরবীয় আবার সিসিলির নিজস্ব রীতি সব মিলেমিশে একাকার। হ্যারি বলল, এই অঞ্চলে মিশ্রণটা বেশি হয়েছে। ফ্রান্সিস খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিল না। ও ডুবেছিল নিজের চিন্তায়।

মারিয়া বলে উঠল, সিসিলি এলাম অথচ এটনা আগ্নেয়গিরি দেখবো না?

সাভোনা হেসে বলল, উত্তরে তাওরমিয়ার দিকে কিছুটা গেলেই এটনা আগ্নেয়গিরি ভালোভাবে দেখা যাবে।

তাই চলুন। মারিয়া খুশিতে লাফিয়ে উঠল।

হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। দেখল, ফ্রান্সিস নিজের চিন্তায় মগ্ন। হ্যারি বলল, কী ফ্রান্সিস, এটনা দেখতে যাবে? ফ্রান্সিস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাসল। বলল, চলো মারিয়া যখন দেখতে চাইছে।

গাড়ি চলল উত্তরে তাওরমিয়ার দিকে। পথে দেখা গেল সেই একই দৃশ্য। গাধা খচ্চরের পিঠে গমের বস্তা চাপিয়ে চাষীরা চলেছে। গাধা খচ্চরের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দে চারিদিক ভরে উঠেছে। পথের দুপাশে সিট্রাস গাছ। গমের ক্ষেত, নানা শাকসবজির চাষের জমি। কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে সাভোনা বলে উঠল, ঐ যে এটনা আগ্নেয়গিরি। গাড়ি থামল। সবাই নেমে একটা ছোট্ট টিলায় উঠল। দেখা গেল এটনা আগ্নেয়গিরি বিকেলের আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টা ছাই রঙের। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকের শান্ত পরিবেশের মধ্যে এটনার ভাবগম্ভীর রূপ দেখে ফ্রান্সিসরা অভিভূত হলো। এখন শান্ত এটনা। অতীতে কতবার আগুন ছাই লাভা ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করেছে! ভূমিকম্প ঘটিয়েছে!

এবার ফেরার পালা। কাতানিয়া নগরে ওরা সন্ধ্যের আগেই ফিরে এল। সাভোনা বলল, ফ্রান্সিস, এখন কোথায় যাবে?

যে বাড়িতে কাউন্ট রজার মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

সাভোনার নির্দেশমতো গাড়ি চলল। নগরে মানুষজনের ব্যস্ততা। অনেকেই ফ্রান্সিসদের বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে দেখল। ভিনদেশিগুলো রাজবাড়ির গাড়িতে যাচ্ছে। কারা এরা?

বিরাট একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল। সবাই গাড়ি থেকে নামল। বাড়িটার সদর দরজা হাট করে খোলা। ঢুকল সবাই। বড় চত্বরটায় অশ্বশালা। অনেক ঘোড়া বাঁধা। কিছু লোক ঘোড়াগুলোর তদারকিতে ব্যস্ত। অন্যপাশে অনেক মাছধরা জাল শুকোচ্ছে। কয়েকজন বসে জাল বুনছে। ওদিকের ঘরগুলোতে অনেক পরিবারের বাস। সাভোনা বলল, এখানে সৈন্যদের অশ্বশালা হয়েছে। ওদিকে জেলেদের বসতি। কাউন্ট রজারই নাকি ওদের এখানে বাস করার অধিকার দিয়েছিলেন। এরা পুরুষানুক্রমে সমুদ্রে মাছ ধরে।

দক্ষিণ কোনার দিকে সাভোনা চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। কোনায় পাথর দিয়ে তৈরি বেশ বড় একটা ঘর। ঘরটার সামনে জেলেদের পোশাক-পরা একটি লোক বসে আছে। সাভোনা লোকটার সঙ্গে কথা বলল। লোকটি উঠে গিয়ে ঘরটার তালা খুলতে লাগল। সাভোনা বলল, কাউন্ট রজারের স্মৃতিবিজড়িত এই ঘরটা এখানকার জেলেরাই দেখাশুনো করে।

তালা খোলা হলো। ঘরটায় ঢুকল সবাই। একটু অন্ধকারমতো ঘরটা। তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনো আসবাবপত্র নেই। শুধু কোনায় রাখা রয়েছে একটা খাপে ঢাকা তরোয়াল, লোহার বর্ম আর শিরস্ত্রাণ। সাভোনা বলল, এই সবই নাকি কাউন্ট রজারের। ঘরটার মেঝেয় সুন্দর মোজেকের কাজ করা। ফ্রান্সিস মেঝের মোজেকের কাজ দেখতে দেখতে বলল, মারিয়া, আগের গীর্জা দুটোয় যে নকশা দেখেছিলে এগুলোও কি তেমনি, মানে একই নকশা? মারিয়া দেখতে দেখতে বলল, না। আগের দুটোয় লতাপাতা বেশি ছিল। এটায় ফুলের সংখ্যা বেশি।

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সাভোনা হেসে উঠে বলল, এখানেও গান? ফ্রান্সিস বলে উঠল, কী ব্যাপার সাভোনা? সাভোনা বলল, তোমাদের বলেছিলাম না কাউন্ট রজার শেষ বয়েসে খুব খ্রীস্টভক্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি কিছু ভক্তিগীতি লিখেছিলেন। সেই ভক্তিগীতিরই একটা এখানে ফুল লতাপাতা দিয়ে মোজেকের কাজের মধ্যে দিয়ে লিখিয়েছেন। অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলাম। তখন লক্ষ্য করিনি। আজকে দেখছি একটা গান লেখা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুজনেই চমকে উঠল। ফ্রান্সিস বলল, পড়ে বলুন তো গানটা কী?

সাভোনা মেঝের দিকে তাকিয়ে পড়ে পড়ে বলে গেল—

কোথাও নাই শান্তি
যীশুর চরণে ক্ষান্তি
সব দুঃখ সব ভ্রান্তি।
হৃদয়ে রাখো ভক্তি।

ফ্রান্সিস মন দিয়ে শুনল সবটা। হ্যারি বলল, আমি লো ল্যাতিন ভাষা শুনলে বুঝি বলতেও পারি। কিন্তু অক্ষর খুব ভালো চিনি না। ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, আপনি এই গান লেখা দেখে হাসলেন কেন?

আরে, এইরকম মেঝের মোজেকের কাজের মধ্যে কাউন্ট রজার গান লিখিয়েছেন আগের দুটো গীর্জার মেঝেতেও। আমি জানতাম গীর্জার মেঝেতেই লিখিয়েছেন। এখন দেখছি এখানেও লিখিয়েছেন। ফ্রান্সিস বলে উঠল, ঐ গান দুটো আপনার মনে আছে?

কেন নয়? বহুদিন ধরে বড়দিন বা গুডফ্রাইডের উৎসবের দিনে ঐ গান দুটো গাওয়া হয় এই দক্ষিণ সিসিলিতে। শুনুন গান দুটো। বলে সাভোনা চোখ বুঁজে আস্তে আস্তে গাইতে লাগল—

লোভ হিংসায় কাতর
হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর
হৃদয় শ্বেতপাথর
যেমন যীশুর ঘর।

গান থামিয়ে সাভোনা বলল, এই গানটা

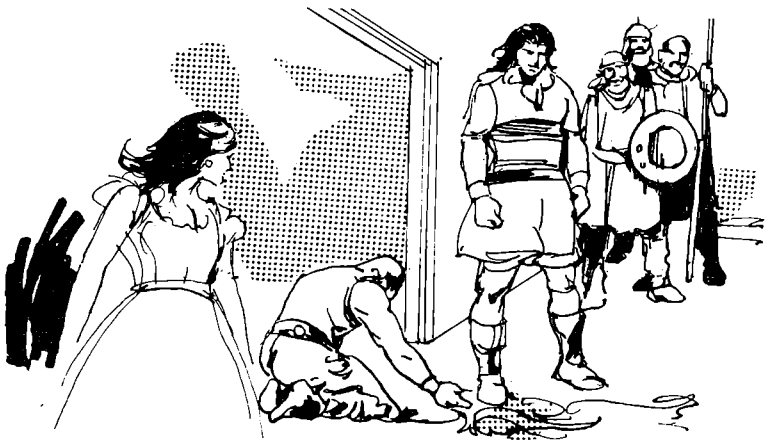

পাথর আলগা করে ফেলল।

লেখা আছে ম্যামিয়েস দুর্গের সেই ছোট গীর্জাটায়। ফ্রেডারিক ঐ জায়গায় দুর্গ নির্মাণের আগে ঐ গীর্জাটায় কিন্তু সব মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল। সাভোনার গানের সুর বড় সুন্দর লাগল ফ্রান্সিসদের। মারিয়া বলল, আর একটা গান করুন না। সাভোনা হেসে বলল, এই গানটা লেখা আছে এই কাতানিয়ায় যে বিরাট গীর্জা দেখে এলাম তার মেঝেতে। বলে সাভোনা চোখ বুঁজে আস্তে আস্তে গাইল—

নীরবে সহ যন্ত্রণা
কর যীশুর বন্দনা
ভুলে যাও সব মন্ত্রণা
হৃদয়ে পাবে সান্ত্বনা।

গানের কথা এবং সুর ঘরটায় একটা সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করল। ফ্রান্সিস হ্যারি মারিয়া তন্ময় হয়ে গেল। হঠাৎ ফ্রান্সিসের মাথায় একটা চিন্তা বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল—এই গানগুলোর মধ্যেই আছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধনের চাবিকাঠি। থাকতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনো সূত্র নেই।

ফ্রান্সিস খুব মনোযোগের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের মেঝের মোজেকের কাজগুলো দেখল। এখানেই লেখা আছে গানটা। কিন্তু গুপ্তধনের সঙ্গে এই গানের কী সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারল না। হতাশায় মাথা নেড়ে বলল, চলুন বড় গীর্জাটায় যাবো।

গাড়ি চলল। আবার বড় গীর্জাটায় ঢুকল সবাই। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দুজন ধর্মযাজক মোমবাতি জ্বেলে দিচ্ছেন। গীর্জাঘর মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোয় ভরে উঠল। সেই আলোয় মেঝের মোজেকের কারুকাজ বুঝতে অসুবিধা হলো না। ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, এখানকার গানটি মুখে বলুন। সাভোনা আস্তে আস্তে বলল, নীরবে সহ যন্ত্রণা—

ফ্রান্সিস গানটা কয়েকবার মুখে মুখে আওড়াল। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। এ তো ভক্তিগীতিই। এছাড়া কিছু নয়। তবে গানগুলির গুরুত্ব আছে এইজন্যে যে এগুলি কাউন্ট রজারের রচনা।

ম্যামিয়েস দুর্গে ফিরে আসতে একটু রাতই হলো। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সবাই শুয়ে পড়ল। হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস, কিছু হদিস করতে পারলে?

না। তবে এখানকার গীর্জাটা কালকে ভালো করে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলল, আমার মনে হয় গানগুলোর মধ্যেই কোনো সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। হ্যারি বলল, আচ্ছা সাভোনা, কাউন্ট রজারের এরকম আরো গান আছে?

হ্যাঁ, আছে, তবে সেসবের এখন খুব বেশি চল নেই। গীর্জার মেঝেয় লেখা গানগুলোরই চল বেশি। প্রায় একশো বছর ধরে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়।

ফ্রান্সিস বলল, এই দুটো গানই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই গান দুটোই সকলে জানে। গীর্জার মেঝেতেও লেখা রয়েছে। ম্যামিয়েস দুর্গের গীর্জায় তো আগে সকলেই যেতে পারতো।

আর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস তখনও জেগে। নানা চিন্তা মাথায়। তার ওপর কাউন্ট রজারের গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য ও জীবনটাই বাজি ধরেছে। ভাবতে ভাবতেই একসময় ওর দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

গভীর রাতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফ্রান্সিস উঠে বসল। ঘরে মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখল হ্যারি শুয়ে চোখে দু হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছে। ফ্রান্সিস হ্যারির গায়ে হাত রাখল। আস্তে ডাকল, হ্যারি। হ্যারির ফোঁপানি বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস বলল, কী হয়েছে? হ্যারি কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি এভাবে নিজের জীবনটাকে বাজি ধরলে? একবার কারো কথা ভাবলে না? তোমার বাবা, মারিয়া, আমরা—কারো কথা না?

ওদের কথাবার্তায় মারিয়ারও ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়া বলে উঠল, হ্যারি, কেঁদো না। তোমাকে কাঁদতে দেখলে ফ্রান্সিসের মন দুর্বল হয়ে পড়বে। দেখ আমি তো কাঁদছি না।

সাভোনারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওদের কথাবার্তা শুনে সাভোনা আস্তে আস্তে বলল, সত্যি তোমাদের মধ্যে এমন ভালোবাসা কমই দেখা যায়। একটু থেমে বলল, মানুষকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, সাভোনা, কাউন্ট রজারের গানটা শোনান না!

এত রাতে গান? সাভোনা হেসে বলল।

করুন না। হ্যারি বলল। সাভোনা শুয়ে শুয়েই আস্তে আস্তে গাইতে লাগল—লোভ হিংসায় কাতর—

গান শেষ হলো। হঠাৎ ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা সাভোনা, লক্ষ্য করেছেন আর দুটো গানের পঙক্তি চারটে। শুধু এই গানটা, মানে যেটা এখানকার গীর্জার মেঝেতে লেখা সেই গানটার কিন্তু পঙক্তি পাঁচটা।

সাভোনা একটু হিসেব করল। হেসে বলল, ঠিক বলেছো, আমি তো কোনোদিন খেয়াল করিনি।

ওদের মধ্যে আর কথাবার্তা হলো না। ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, চলুন গীর্জাটা দেখতে যাবো।

সবাই গীর্জার সামনে এল। গীর্জার সিঁড়ি দিয়ে উঠল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ফ্রান্সিস বলল, গানটা কোথায় লেখা আছে? সাভোনা আঙুল দিয়ে মেঝেটা দেখিয়ে বলল, ফুল লতা-পাতা নকশা দিয়ে এখানেই জড়িয়ে জড়িয়ে লেখা, লোভ হিংসায় কাতর—

পড়ুন তো। ফ্রান্সিস বলল। সাভোনা পড়তে লাগল। চার পঙক্তি পড়ে বলল,আরে পাঁচের পঙক্তিটা তো এখানে লেখা নেই!

ফ্রান্সিস চমকে উঠল। বলল, ভালো করে দেখুন মেঝের কোথাও লেখা আছে কিনা।

সাভোনা মেঝের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল। বলল, উঁহু, এখানে তো লেখা নেই।

নিশ্চয়ই কোথাও লেখা আছে। বাইরের ছোট বারান্দায়ও তো মোজেকের কাজ আছে। চলুন তো। ফ্রান্সিস বলল।

গীর্জাঘরের দরজার বাইরে ছোট একটু বারান্দা। মেঝেয় মোজেকের কাজ। তবে খুব বেশি লতাপাতা ফুল জড়ানো নয়। এখানে দাঁড়িয়েই সাভোনা হাসল, এই এখানে লেখা—যেমন যীশুর ঘর—শেষ পঙক্তিটা।

ফ্রান্সিস ভাবল, যীশুর ঘর—তার মানে গীর্জা।

ফ্রান্সিস মেঝের উপর উবু হয়ে বসল। ফুল-লতাপাতায় লেখাগুলো দেখতে লাগল। ও গভীরভাবে ভাবতে লাগল, বেশি পঙক্তিটা আলাদাভাবে এখানে লেখা কেন? ভাবতে ভাবতে যখন মেঝের এদিক ওদিক দেখছে তখনই হঠাৎ দেখল লেখাটার ঠিক ওপরেই দুটো লম্বাটে পাথর বসানো, আর ঐ দুটো পাথরকে কেন্দ্র করেই ফুল-লতাপাতার নকশা আঁকা হয়েছে। পাথর দুটো রঙিন। রঙ কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। ভালো করে দেখতেই দেখল, একটা পাথরের রঙ হলুদ, অন্যটার লাল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসের গানের দুটো পংক্তি মনে পড়ল—

হলুদ লাল পাথর
দূর কর এই দোসর

ফ্রান্সিস দ্রুত চিন্তা করতে লাগল—এই গানটার পঙক্তি পাঁচ এবং শেষেরটা আলাদা লেখা। অন্য কোনো গানে পাথরের কথা নেই। তবে এই পাথর দুটো তো হলুদ আর লাল রঙের। ফ্রান্সিস আনন্দে চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু নিজেকে সংযত করল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হলুদ লাল পাথর দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যারি, কাউন্ট রজারের গুপ্তধন পোঁতা আছে এই হলুদ লাল পাথর দুটোর নিচে।

বলো কি! হ্যারি পাথর দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। মারিয়া আর সাভোনা দুজনেই পাথর দুটোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

ফ্রান্সিস বলল, সাভোনা, রাজা ফ্রেডারিককে খবর দিন। এই পাথর দুটো তুলে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

কী করে বুঝলে যে—সাভোনা বলতে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল, ভুলে যাবেন না এই গীর্জার ওপরটাই রাজা ফ্রেডারিক পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন। মেঝেটা তৈরি করিয়েছিলেন কাউন্ট রজার। এটা কিন্তু আজও অক্ষত আছে।

সাভোনা আর কোনো কথা না বলে ছুটল দুর্গের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে রাজা ফ্রেডারিক এলেন। ফ্রান্সিসকে বললেন, আপনি কি নিশ্চিত এই লাল হলুদ পাথরের নিচেই আছে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন?

হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল, আর শুধু একটা কথার ধাঁধা। এই দুটো পাথর খুলে তুললে যদি একটা শ্বেতপাথর পাওয়া যায় তাহলে সব ধাঁধার সমাধান হয়ে যাবে। গানে আছে, দূর কর এই দোসর হৃদয় শ্বেতপাথর।

রাজা ফ্রেডারিকের নির্দেশে মোজেকের কয়েকজন কারিগরকে নিয়ে আসা হলো। ওরা বাঁকানো লোহার দু-তিনরকম যন্ত্র বের করে পাথর দুটো অল্পক্ষণের মধ্যেই আলগা করে ফেলল। যখন সবাই মিলে টেনে পাথর দুটো তুলে ফেলল, দেখা গেল একটা লম্বা শ্বেতপাথর বসানো। মারিয়া খুশিতে হাততালি দিয়ে ফেলল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হ্যারি, সাফল্য।

এবার শ্বেতপাথরটা কারিগর কয়েকজন মিলে বেশ কসরৎ করে তুলে ফেলল। দেখা গেল একটা লম্বাটে ওক কাঠের বাক্স। তাতে সোনারুপোর লতাপাতার কাজ। এবার বাক্সটা তোলা হলো। ভারি বাক্সটা রাখা হলো মেঝেয়। রাজা ফ্রেডারিক এগিয়ে এলেন। ওপরের কাঠের ঢাকনাটা আস্তে আস্তে তুললেন। দেখা গেল অনেক সোনার ছোট ছোট চাকতি সারা বাক্সটায় ছড়ানো। সেগুলো রাজা ফ্রেডারিক কিছুটা সরাতেই দেখা গেল কতরকম দামী পাথর বসানো মিনেকরা অলঙ্কার। সোনা দিয়ে বাঁধানো আয়না। সোনার চিরুনি। সকালের রোদ পড়েছে ঐ সোনার চাকতি অলঙ্কারগুলোর ওপর। ঝিকিয়ে উঠছে সব। আয়না চিরুনি। রাজা অমাত্যরা কারিগররা সাাভোনা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ঐ মহামূল্যবান গুপ্তসম্পদের দিকে। শুধু হ্যারি ফ্রান্সিস মারিয়া খুব একটা অবাক হলো না। ফ্রান্সিসের উদ্ধার করা গুপ্তধন ওরা তো আগেও দেখেছে। তবে মারিয়া তো মেয়ে। অলঙ্কারগুলো দেখতে লাগল। কী সুন্দর গড়ন অলঙ্কারগুলোর! হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। উদ্গত কান্নায় ওর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস হেসে বলল, হ্যারি, এখনও কিন্তু আমাদের কিছু কাজ বাকি।

হ্যারির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফ্রান্সিস রাজা ফ্রেডারিকের সামনে এল। বলল, মহামান্য রাজা, আমি আমার কর্তব্য করেছি; এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখুন।

রাজা ফ্রেডারিক সে কথার জবাব দিলেন না। আশ্চর্য হয়ে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার এত আত্মবিশ্বাস!

ফ্রান্সিস হাসল। তারপর বলল, এবার তাহলে মোরাবিত আর সাভোনাকে মুক্তি দিন। রাজা আস্তে আস্তে বললেন, নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমরা এই গুপ্তধন উদ্ধার করেছো, তোমাদেরও তো কিছু প্রাপ্য আছে। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে হাসল। বলল, এই গুপ্তধন আপনাদের দেশের, আপনাদের। আমরা কিছু নেব না। এখানকার আদিম বাসিন্দা সারাসেন জাতি, মানে মোরাবিতরা, তাদের কল্যাণের জন্যে আমাদের যা প্রাপ্য সব দিলাম। আমার অনুরোধ, আপনি ওদের ওপর সদয় হোন। ওদের ভালোবাসুন। ওদের কল্যাণে আমাদের প্রাপ্য অংশ ব্যয় করুন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, এবার আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস মারিয়া ও হ্যারির দিকে তাকাল।

তিনজনে চলল দুর্গের দিকে। পেছন ফিরে ফ্রান্সিস দেখল সাভোনা ছুটতে ছুটতে আসছে। ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। সাভোনা ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দু হাত জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল। সাভোনা কান্নাভেজা গলায় বলল, তুমি আমার সন্তানতুল্য। সেই তোমাকে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তোমার মতো মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, অনেক আছে সাভোনা। আমরা জানি না তাই। আচ্ছা চলি—মোরাবিতের সঙ্গে দেখা হলো না। ওকে আমার অন্তরের স্নেহ জানাবেন।

ওদিকে সমস্ত নগরে কাউন্ট রজারের গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা ততক্ষণে রটে গেছে। যে কারিগররা পাথর তুলেছিল, তারাই বাইরে এসে বলেছে।

তিনজন দুর্গের বাইরে আসতেই দেখে হাজার হাজার নগরবাসী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরাও খবর শুনে ছুটে এসেছে। ফ্রান্সিসরা দুর্গ থেকে বেরোতেই বন্ধুরা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। আনন্দে ধ্বনি দিল—ও হো হো!

উপস্থিত নগরবাসীরা ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা বুঝতে পারল না একজনকে নিয়ে এত লোক মাতামাতি করছে কেন?

ছবি : ধ্রুব রায়

জাগলিং-এর আসরে

অভয় মিত্র

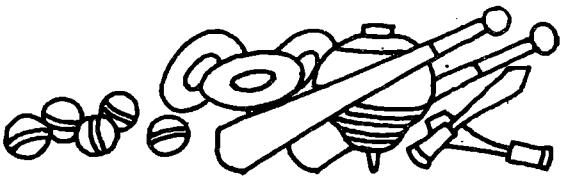

ছোট্ট সোনা ভাইবোনেরা, তোমাদের একটা মজার কথা বলি। সেদিন কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে জাগলিং-এর আসর বসিয়েছিলাম ময়দানে। মজার মজার জাগলিং দেখিয়ে জমিয়ে দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে কয়েকজন শিশুও এসে বলগুলো লুফতে শুরু করছিল। হঠাৎ এক বিদেশী সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হলেন আসরে। কিছুক্ষণ ধরে বলের খেলা, ডিশের খেলা, মুগুরের খেলা দেখার পর হঠাৎ বিদেশী ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, 'ক্যান আই ট্রাই টু?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'ও ইয়েস।'

ভদ্রলোক ডান হাতে একটা বল লুফতে শুরু করলেন। এক...এক...এক...তারপর বাঁ হাতে ঐ বলটা লুফতে শুরু করলেন। এক...এক...এক। বল লোফার পর তুলে নিলেন একটা মুগুর। কিন্তু এক পাক ঘুরিয়ে যেই মুগুরটা লুফতে চেষ্টা করলেন, অমনি সেটা গিয়ে সজোরে পড়ল ভদ্রলোকের নাকের ওপরে। একটা কিম্ভূত আওয়াজ করে ন্যাক চেপে বসে পড়লেন তিনি। আমি ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। কেরামতি দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোকের বেসামাল অবস্থা দেখে পাশ থেকে বিদেশিনী হো হো করে হেসে উঠলেন। সেকি হাসি রে বাবা! একজন ব্যথায় কাতর আর অন্যজন অট্টহাসি হাসছেন। তাড়াতাড়ি জল এনে ভদ্রলোকের নাকে দিলাম। এদিকে বিদেশিনীর হাসি দেখে সাহেব তো একেবারে চটে লাল। সকলের সামনে এভাবে যে অপদস্থ হবেন তা স্বপ্নেও ভাবেননি।

আসলে কি জানো, জাগলিং একটা সাধনার ব্যাপার। মনঃসংযোগ আর ব্যালেন্সকে একই সেতুতে বাঁধতে হয়। তার ওপর আছে শারীরিক পটুতা।

জাগলিং খুব মজার খেলা সন্দেহ নেই। কিন্তু শিখতে হলে গোড়া থেকে শিখতে হয়।

একটা মুগুরের গোড়ার দিকটা ডান হাতে ধরে এমনভাবে ছুঁড়তে হবে যাতে মুগুরটা এক পাক ঘুরে এসে ডান হাতেই পড়ে। ছোঁড়ার ওপর লোফা নির্ভর করে। তারপর একইভাবে করতে হবে বাঁ হাতে। কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যাস হয়ে গেলে তিনটে মুগুর একসঙ্গে দু হাতে লুফতে হবে। তবে জেনে রাখো সব সময়েই একটা মুগুর শূন্যে থাকবে।

মুগুরটা যেন হালকা কাঠের হয়। গোড়ার দিকটা সরু, মাথার দিকটা একটু মোটা। গোড়ার দিকটা ততটাই সরু করবে যাতে হাতের তালু দিয়ে ধরা যায়। প্রথম প্রথম খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অনুশীলন করবে, যাতে হাল্কা কাঠের মুগুরটা হাত থেকে পড়ে গেলেও বিছানাতে পড়ে। ঘরের মেঝেতে বা বাড়ির ছাদে অনুশীলন করতে গিয়ে পড়ে গেলে মুগুরটা ভেঙে যেতে পারে। এমনভাবে মুগুরটা ছুঁড়বে যাতে ফুট দুয়েক উঁচুতেই এক পাক ঘুরে যায়। খেয়াল রেখো মুগুরটা এক ফুট লম্বা হবে।

একবার অভ্যাস করে দেখই না, কি মজাটা হবে তোমাদের।

জাগলিং শুধু নিছক আনন্দের খেলা নয়। শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য জাগলিং খেলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাল্যকাল থেকে জাগলিং খেলা নিয়মিত অভ্যাস করলে পরিণত বয়সে অনায়াসে হাত-পা নাড়ান-ঘোরান সম্ভবপর হয়। মনের একাগ্রতা বাড়ে ও দৈহিক জড়তা দূর হয়।

ছবি ঃ শিবশংকর ভট্টাচার্য

পাগলা পেঁচোর ভাই

নারায়ণ সাহা

জলার ধারে হাত বাড়িয়ে, পা ছড়িয়ে ও কে?
দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, ধরবে নাকি তোকে?
চোখ দুটোতে ঝরছে আগুন যেন অগ্নিগোলা।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? এখান থেকে পালা।
আসশ্যাওড়ার গভীর বনে, যেথায় অন্ধকার,
অমাবস্যার নিশুত রাতে হয় সে একা বার।
জলার ধারে ঘাপটি মেরে ফাঁদ পেতে যে থাকে
বাগে যাকেই পাবে, ঘাড় মটকে খাবে তাকে।

সব যে জানিস তবে এমন বাড় কেন রে তোর?
শখ হয়েছে মরতে বুঝি? মর, তাহলে মর।
ও মা! ও কী! কী করছিস? দাঁড়া দাঁড়া বাপ,
বাগে পেলে ছাড়বে না যে, করবে নাকো মাফ।
তবু দেখি বড্ড সাহস! এগিয়ে চলিস সেই?
হাসিস কেন পাগলপারা? নাচিস ধেই ধেই?
কী বললি? ভূত নয় ও? নয়কো দত্যি দানা?
পাগলা পেঁচোর ভাই হয় ও, ভালোই আছে জানা!

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

অমৃতা ভট্টাচার্য, বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী, মডেল কিন্ডারগার্টেন স্কুল, বালী, হাওড়া

সমীরকুমার চক্রবর্তী, গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয়, বর্ধমান

নীলিমা বসাক, বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী, ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন, নদীয়া

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

দ্যাখো কেমন দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেলো। আবার পুজো এসে গেলো। এই সময়টা এতো ভালো লাগে না— কী যে বলি। যেদিন প্রথম নীল আকাশের বুকে হাঁসের মতো ডানা মেলে সাদাটে মেঘগুলোকে উড়তে দেখি, যেদিন প্রথম শিউলি ফুলের গন্ধ পাই, যেদিন প্রথম দুর্গা ঠাকুরের মূর্তিতে মাটি লেপা হচ্ছে দেখি, সেদিন মনটা আনন্দে পাখির মতো নেচে ওঠে। পুজো মানেই মজা, আনন্দ, হাসি, গান আর... আরটাই তো আসল—পুজো সংখ্যা পড়া। কতো গল্প, কতো উপন্যাস, কতো মজার মজার লেখা—পড়তে পড়তে কোথায় যে হারিয়ে যাই। তা তোমাদের দাদুমণি আর কি করবে বলো—তোমাদের মতো যে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখবে সে উপায় তো আর নেই। তাই বাড়ি বসে বসে শুধু পড়া আর পড়া। সেই সঙ্গে সব সময় তোমাদের কথা ভাবা। ভাবি আমার ছোট্ট বন্ধুরা এখন কি করছে। হয়তো তোমরা কেউ তখন নতুন জামা-কাপড় পরে পুজো মণ্ডপে গিয়ে ঠাকুর দেখছো, কেউ হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছো, আবার কেউ হয়তো দাদুমণির মতো পুজো সংখ্যা পড়ছো।

তা শুকতারার এবারের পুজো সংখ্যা তোমাদের কেমন লাগলো বলো। আমরা তো আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তোমাদের মনের মতো করে তোলার। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ, ট্রেকিং, অ্যাডভেঞ্চার, ফিচার আর মজার মজার লেখার পসরা সাজিয়ে তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি। গত বছর পুজোর পরই এবারের শারদীয়া সংখ্যার কাজ শুরু হয়েছিলো। এখন বিচারক তোমরাই। তোমরাই বলো কেমন হয়েছে শুকতারার শারদীয়া সংখ্যা। কার লেখা কেমন লাগলো জানাতে ভুলো না কিন্তু।

তোমাদের অনেকেই চিঠি দিয়ে মা দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের বাহনের কথা জানতে চেয়েছিলে। তাই এবার একটা আলাদা লেখা তোমরা পেলে। লেখাটা পড়লেই জানতে পারবে সিংহ কেন মা দুর্গার বাহন, পেঁচা কেন লক্ষ্মীর বাহন, ইঁদুর আর ময়ূর কেন গণেশ আর কার্ত্তিকের বাহন। আর সরস্বতীই বা কেন হাঁসের পিঠে চড়েন।

মা দুর্গার উপাখ্যানই তো শ্রীশ্রীচণ্ডী। এখন বলো দেখি এই শ্রীশ্রীচণ্ডী এলো কোথা থেকে? সব বইয়েরই তো একজন লেখক থাকেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর তাহলে কে? এবার সেই গল্পটাই বলি। ব্যাসদেবের শিষ্য জৈমিনি মহাভারত পড়ার পর কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারেননি। ওদিকে জৈমিনিকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবার মতো সময় তখন ব্যাসদেবের নেই। তাই তিনি জৈমিনিকে বিন্ধ্যপর্বতে পক্ষীরূপধারী চারজন মুনিপুত্রের কাছে পাঠালেন। বাবার অভিশাপে ওঁরা চার জন পিঙ্গাখ্য, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ নামে চারটি পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে বিন্ধ্যপর্বতে সাধনা করছিলেন। তপস্যার প্রভাবে তাঁদের সব কিছুই মনে ছিলো। মানুষের মতো কথাও বলতে পারতেন তাঁরা। তাঁরা জৈমিনির কাছে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বলার পর 'দেবীমাহাত্ম্য' কীর্তন করেন। সর্বপ্রথম এই দেবীমাহাত্ম্য মেধাঃ নামে মুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির কাছে বর্ণনা করেন। সেই কাহিনী পরে মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁর শিষ্য ভাগুরিকে বলেন। ভাগুরি কথিত সেই বিবরণ দ্রোণমুনির পক্ষীরূপী চারপুত্র জৈমিনিকে বলেন। এইভাবেই দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রবর্তন হয়। ছ জনের মুখ থেকে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছিলো বলে একে ষট্-সংবাদ-কথাও বলা হয়। কিছু বুঝলে? এইটুকু শুধু জেনে রাখো। দেবীমাহাত্ম্যই মা দুর্গার কাহিনী। মহালয়ার দিন রেডিও, টিভিতে এই মাহাত্ম্যের কথাই আমরা শুনি, দেখি।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। পুজোর সময় সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, মনের আনন্দে ঠাকুর দেখে বেড়িও। তারপরই কিন্তু চিঠি দিয়ে জানাতে হবে পুজোর শুকতারা কেমন লেগেছে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

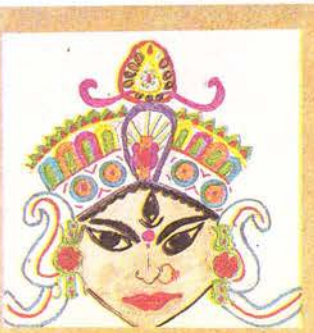

স্বাতী মাইতি, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, কালিকাখালি বালিকা বিদ্যালয়, মঠ চণ্ডীপুর, মেদিনীপুর

মৌসুমী চক্রবর্তী, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী, গুড়াপ শীতলকুমারী বালিকা বিদ্যালয়, হুগলী

তোমাদের পাতা

সৈকত সিংহ, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

দুর্গাপূজার আনন্দ

এসেছে আজ দুর্গাপূজা
তাই তো খুশির জোয়ার,
হাসছে সবাই, নাচছে সবাই,
নাই কারো মুখ ভার।

টেপ-রেকর্ডার লাউড-স্পীকার
বাজছে নানান সুরে,
সবাই দেখছে দুর্গামাকে
নানা প্যান্ডেল ঘুরে।

পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে পূজা
চাঁদার নানান বহর।
তাতেও খুশি বঙ্গবাসী
খুশি বাঙলার শহর।

সকলের আজ মুখে মুখে
দুর্গামাতার নাম,
সবার শেষে দুর্গামাকে
জানাই প্রণাম॥

সর্বাশিস বিশ্বাস, বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া

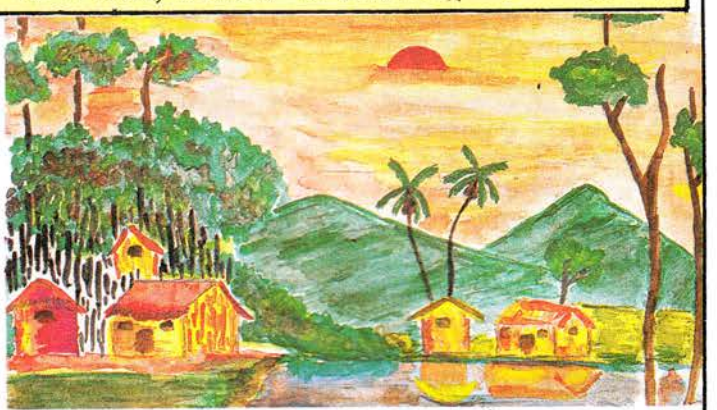

অরুণাংশু ভট্টাচার্য, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী,
ডন বস্কো স্কুল, কলকাতা

গণেশমামার বিপদ

গত দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন দুপুরবেলায় যখন আমাদের মা-মাসি-পিসিরা মা দুর্গাকে বরণ করছিলেন তখন গণেশমামা সকল দেবদেবীর বাহনদের নিয়ে এক মারোয়াড়ীর চাল, ডাল প্রভৃতি গুদামে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ গণেশমামার খেয়াল হলো এতক্ষণে হয়তো মায়ের বিসর্জন হয়ে গেছে। সবাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফিরে এসে দেখেন যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই, মা অন্যদের নিয়ে ফিরে গেছেন দেবলোকে। গণেশমামা তো খুব বিপদে পড়ে গেলেন বাহনদের নিয়ে। কি আর করবেন, আমাকে এসে বললেন, তাঁদের দেবলোকে পাঠিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। আমি কি আর করি? আমার একটা খেলনা গাড়ি ছিল তাতে করে কিভাবে তাঁদের পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম তা এই ছবিতে এঁকে পাঠালাম। গণেশমামা অবশ্য বলে গেছেন পরের বছর পূজার সময় এসে আমার খেলনা গাড়ি ফেরৎ দিয়ে দেবেন।

পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী, কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী উচ্চতর বিদ্যালয় কালনা, বর্ধমান

মোল্লা নাসিরুদ্দীন

ছবি ও কাহিনী বিন্যাস :
রতন মুখোপাধ্যায়

নাসিরুদ্দীনের প্রতিবেশী ছিল এক লোভী ব্যবসায়ী। সে নাসিরকে খুব হিংসা করতো। একদিন সে নাসিরকে জব্দ করার জন্য ফন্দি এঁটে—

ওঃ!একবার কাজ শেষ করতে পারলে নগদ ইনাম!
নাসির কাছে আসতেই গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়লো—
?
উফ!
চুপ একবারে—
ভাল চাও তো শোন—
এটার মধ্যে ঢোক!
চট্‌পট্‌, তা না হলে—
!!!
নাসির সবই বুঝলো ঐ লোভী হিংসুটে ব্যবসায়ীর ফন্দি.....
গুণ্ডারা তাকে বস্তার মধ্যে সবে ভরেছে .....
এমন সময় রাস্তায় কার পায়ের শব্দ—
?
!!

পালা! কে যেন আসছে-
কোথাও লুকালে হতো—
হ্যাঁ,সেই ভাল·····
আপনি বাঁচলে বাপের নাম!
কিন্তু গুণ্ডারা ভুল করলো। আসলে সেই ব্যবসায়ীই ঐ রাস্তা ধরে আসছিল। রাস্তার ধারে বস্তাটা পড়ে থাকতে দেখে সে....
আরে ওটা কি? আবার নড়ছে মনে হচ্ছে
মনে হচ্ছে ভেতরে কেউ আছে!
এ্যাই! ভেতরে কে?
বস্তার ভেতর থেকে নাসির ব্যবসায়ীর গলা পেল
আরে ব্যবসায়ী না কি?
কে?
আরে আমি নাসির....
ব্যবসায়ীর চোখ ছানাবড়া.....
তা তুমি বস্তার ভেতরে কেন?

নাসির এবার উল্টো ফন্দি করে—
আর বোল না ভাই! সে এক মজার কাণ্ড!!
মানে কি? কি কাণ্ড?
সেই কথাই তো বলছি— কাজীর হুকুম হয়েছে ভোরবেলায় প্রথম যাকে দেখা যাবে—
নাসির 'গল্প' শুরু করেছে.....
তাকেই গাঁয়ের মোড়ল করবে। তা আমি ভোরবেলায় যেই বেরিয়েছি অমনি কাজীর লোক এসে ধরলো—
আমাকে বললো- কাজীর কাছে যেতে, আমি রাজী হইনি তাই আমাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কাজীর কাছে।...তুমি বল ভাই আমার মতো গরীবের কি.
তা.....কাজীর লোক কোথায়?
কাছে-পিঠে কোথাও নাস্তা করতে গেছে বোধ হয়!
ব্যবসায়ীর হিংসুটে মন ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো...
তা তারা আর লোক পেল না! আমি হচ্ছি গে ব্যবসায়ী—

নাসির মনে মনে খুশি হয়....
ঠিকই তো, গরীবের কি ঘোড়া রোগ সাজে ?
সেই তো !
ধূর্ত ব্যবসায়ী মনে মনে ফন্দি করে...
তোমাকে আমি বস্তার ভেতর—
থেকে মুক্ত করতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত —তুমি আমাকে বস্তার ভেতরে
ভরে বেঁধে দেবে। তুমি যদি না চাও, তো আমি মোড়ল হতে চাই
কিন্তু আমার কি হবে ?
তোমার ভয় নেই তোমায় তো কাজীর লোক চেনে না—
তা ঠিক ! তোমার মতো লোকেরই মোড়ল হওয়া উচিত। বেশ তাড়াতাড়ি করো।
ব্যবসায়ী নাসিরকে বস্তার ভেতর থেকে মুক্ত করে। তার-পর নিজে সেই বস্তার মধ্যে ঢোকে
একটু জল্‌দি করো ভাই- কাজীর লোক এলো বলে।
মুক্ত নাসির ব্যবসায়ীকে বস্তাবন্দী করে—
সালাম ভাই ! আসি, তুমি মোড়ল হলে আমার মতো গরীব-কে একটু দেখো—
আগে মোড়ল হই তারপর তোমাকে ....
ব্যবসায়ী চিন্তা করে—নাসির তার পায়ে ধরে মিনতি করছে !!

এদিকে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর.....
চল! এতক্ষণে চলে গেছে—
হুঁ,কাজ সারলেই নগদ ইনাম!
গুণ্ডারা ওদের বস্তার কাছে এসে নিশ্চিত হলো-
সব ঠিকই আছে!
বস্তাটা তাহলে নিয়ে যাওয়া যাক!
ওরা তিনজন বস্তাটা নিয়ে এক নদীর ধারে এল। তারা বস্তার ওপর লাথি ঘুঁষি মারতে লাগলো—
উফ!!
এইবার ব্যাটার দফা রফা!
দাঁড়াও দাঁড়াও,তোমরা আমাকে মেরো না! আমি নাসির নই— আমি—আমি...
হিংসুটে ব্যবসায়ী ততক্ষণে নাসিরের চালাকি বুঝেছে..
*?!!
দাঁড়া,গলাটা চেনা চেনা ঠেকছে... খোল বস্তাটা!
তখন তারা বস্তা খুলে নাসিরের বদলে ব্যবসায়ী-কে দেখে'থ' ধূর্ত হিংসুক ব্যবসায়ীর ততক্ষণে কাহিল অবস্থা...
শেষ

মনের গহনে

ডাঃ অরুণকুমার দত্ত

টাঙ্গা চালাতে চালাতে এনায়েৎ খান সপাং করে চাবুক কশাল ঘোড়াটার পিঠে। চমকে উঠলেন টাঙ্গার একমাত্র যাত্রী মেহবুব খান। এনায়েতের টাঙ্গায় সওয়ার হয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ শহর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। টাঙ্গাটা ছোট ইমামবাড়া হয়ে বড় ইমামবাড়া পরিক্রমণ শেষ করেছে। বিশেষ কোনো তাড়া তো নেই তাঁর। বেচারা জানোয়ারটা শুধু শুধুই মার খাচ্ছে।

মেহবুব খান ঘোড়াটার দিকে একবার তাকালেন। ওর হাড় জিরজিরে চেহারাটার ওপর আগেই নজর পড়েছিল, এখন ভালোভাবে লক্ষ্য করতে দেখতে পেলেন ঘোড়াটার পিঠে লাল দগদগে একটা বিরাট ক্ষত। ক্ষতটা পুরনো হলেও সদ্য চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত। গায়ের খয়েরি রঙের সঙ্গে রক্তের রঙ যেন মিলে গেছে।

টাঙ্গাওয়ালজী ... ঘোড়াটাকে আর মারবেন না। আল্লার দোহাই, ওই তো হাড় জিরজিরে শরীর। এইটুকু পরিশ্রমেই ধুঁকছে। তার ওপর আপনি যদি এভাবে চাবুক মারেন, তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে আপনারই। ঘোড়াটাকে কদিন জিরেন দিয়ে একটু ভাল করে দানাপানি খাওয়াবেন। সেজন্য আমি আপনাকে কিছু উপরি বখশিস দিয়ে যাব।

এনায়েৎ খান ক্লিষ্ট হেসে বলল, সরকার, আপনাকে দেখে কোনো রইস আদমি মনে হচ্ছে।

মেহবুব খান নিজের পরনের পোশাকের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। চোস্ত, পাঞ্জাবি, তার ওপর একটা জহর কোট চড়ানো, মাথায় কাশ্মিরী ফেজ টুপি, গালে মেহদি করা চাপ দাড়ি। ঈষৎ তামাটে হয়ে আসা লম্বা চওড়া শরীরের সঙ্গে পোশাকটা জবরদস্ত মানিয়েছে।

টাঙ্গাটা তখন হজরতগঞ্জের দিকে বাঁক নিয়েছে। এনায়েৎ খান অভ্যেস মতো ঘোড়াটার পিঠে আবার চাবুক মারতে গিয়ে থেমে গেল। এনায়েতের পরনে একটা পুরনো ফাটাফুটো কামিজ ও পাজামা, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফের জটলা। শীর্ণ চেহারার এনায়েতের বয়স পঞ্চাশ না পেরোলেও, চেহারাটা বেশ বুড়িয়ে গেছে। এনায়েৎকে নীরব দেখে মেহবুব আবার প্রশ্ন ছোঁড়েন, টাঙ্গাওয়ালজী, আমাকে দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে?

হুজুর, আপনি বোধহয় পাঞ্জাব কি কাশ্মীরের রহনেওয়ালা।

এনায়েতের কথা শুনে গোঁফ দাড়ির ভেতর থেকে মেহবুবের সাদা দাঁতের সারি রোদের আলোয় চকচক করে উঠল। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন টাঙ্গাওয়ালজী। একগাল হেসে মেহবুব বলতে থাকেন, আমি কাশ্মীরের অধিবাসী। শ্রীনগরে আমার কার্পেটের ব্যবসা আছে। লক্ষ্ণৌ শহরে পুরনো নবাবী-কীর্তি দেখতে এসেছিলাম। শহরটা ভালই লেগেছে। তবে আমার বিশেষ করে আপনার ঘোড়াটার এই হাল দেখে, মনে সত্যিই বড় কষ্ট হচ্ছে। এই ঘোড়ার জন্য আমি আপনাকে মোটা বখশিস দিয়ে যাব। আপনি দয়া করে ঘোড়াটার একটু যত্ন নেবেন, ভাল করে খাওয়াবেন, ওর পিঠের ঘায়ের জন্য ভাল করে চিকিৎসা করাবেন, ওভাবে আর চাবুক মারবেন না ওকে।

এনায়েৎ খান তখন টাঙ্গাটাকে ঢিমেতালে চালাচ্ছে। মেহবুবের কথা শুনে এনায়েৎ বলল, আমীর সাব, আমি প্রথম থেকে অনুমান করেছিলাম, আপনি কোনো খানদানি আমীর কি ওয়াজির হবেন। তবে আপনার পকেটের চেয়ে আপনার মনটা কিন্তু আরও বড়। প্রতিদিন আমি কত সওয়ারী নিয়ে ঘুরি। তারা সারা শহর দেখে। কেউ কিন্তু আমার বা আমার ঘোড়াটার দিকে কখনও চেয়েও দেখে না।

টাঙ্গাটা তখন একটা বটগাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। গাছটার তলায় বেশ কিছু লোকের জটলা। দোকানিরা পশরা সাজিয়ে বসেছে। এনায়েৎ খান টাঙ্গাটাকে থামিয়ে বলে, এখানে একটা বিখ্যাত মাজার আছে। দেখে আসুন সরকার।

এনায়েৎ খানের টাঙ্গা চালাতে কষ্ট হচ্ছে, ও একটু জিরোতে চাইছে মেহবুব তা বুঝতে পেরে বললেন, টাঙ্গাওয়ালজী, আপনি, এখান থেকে কিছু নাস্তাপানি করে নিন। ঘোড়াটাকেও একটু খাইয়ে নিন, বলে একটা দশ টাকার নোট তিনি বাড়িয়ে ধরলেন।

এনায়েৎ হাত গুটিয়ে বলল, সরকার, আপনার দয়ার শেষ নেই। আপনার বোধহয় স্মরণ নেই, এখন রোজা চলছে। সূর্যাস্ত না হলে কিছু খেতে পারব না। তবে ঘোড়াটাকে এখন দানাপানি খাওয়াব।

একটু অপ্রস্তুত হলেন মেহবুব খান। রোজার কথা ভুলে যাওয়া তাঁর উচিত হয়নি।

ঘোড়াটাকে খাওয়ানোর পরে টাঙ্গাটা আবার চলতে শুরু করে। এনায়েৎ খান ধীর কণ্ঠে বলে চলে, সরকার, এই ঘোড়াই আমার প্রাণ। ওকে না খাইয়ে আমি কখনও খাই না। ঘোড়াটার পিঠে যেমন ঘা হয়েছে, আমার শরীরেও সেরকম একটা পুরনো ঘা রয়ে গেছে। তফাৎ শুধু ঘোড়াটার ঘা শরীরের বাইরে, আর আমার শরীরের ভেতরে।

সেকি আপনার কোথায় কি হয়েছে? মেহবুবের গলায় বিস্ময়।

চাবুক তুলেও এনায়েৎ সামলে নেয়। মৃদু হেসে বলে, আমার অনেক দিনের পুরনো গ্যাস্ট্রিক আলসার রয়েছে। ইলাজ করিয়ে লাভ কি? কোনোদিন খেতে পাই, আবার কোনোদিন পাই না। অবেলায় খাই। এভাবে কি আলসার সারে? শরীরের জন্যে সবদিন কাজে বেরোতে পারি না। তাই যেদিন চালাই সেদিন যতটা পারি বেশি কামাতে চেষ্টা করি। কিন্তু ঘোড়া যদি না ছোটে তাহলে বেশি খরিদ্দারই বা কি করে পাই আর রোজগারই বা কি করে বাড়াই। সবাই তো আপনার মতো দরাজ দিলের মানুষ নয় সরকার।

এনায়েতের কথা শুনতে শুনতে লক্ষ্ণৌ শহর পরিক্রমা করছিলেন মেহবুব খান। এই বদ-কিসমৎ টাঙ্গাওয়ালা আর ওর বদ-সুরৎ ঘোড়াটাকে দেখে অনেকদিন আগের একটা ছবি ভেসে উঠছে তাঁর চোখের সামনেঃ খরায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছিল গোটা মুলুক। কোথাও একটা দানা নেই, একছিটে পানি নেই। জান বাঁচাতে একে একে গাঁয়ের সকলেই শহরের রাস্তা ধরেছিল। ভাঙা কুঁড়েয় পড়েছিল শুধু রোগে ভোগা একটা বুড়ো আর তার একটা উপোসী খচ্চর। কেউ একবার ভাবেওনি তাদের কথা। বুড়োর সাত বছরের নাতিটাই শুধু কেঁদে ভাসিয়েছিল দাদাজীকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে।

অন্যমনস্ক মেহবুব খানের দৃষ্টি হঠাৎ আটকে গেল একটা ইমারতের গায়ে লাগানো মস্ত পোস্টারে। এনায়েতের দিকে ঘুরে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অতবড় পোস্টারে কি লেখা আছে এনায়েৎ।

এনায়েৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ঐ পোস্টার তো তামাম লক্ষ্ণৌ শহরের দেওয়াল ল্যাম্পপোস্টের গায়ে লেগে গেছে। এতক্ষণ নজর করেননি? কিছুদিন আগে এখানে একটা বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে গেছে। চম্বলের ডাকু দীপ সিং রাঠোর ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, যে চম্বলের ঐ ডাকুর সন্ধান দিতে পারবে, তাকে এক লাখ টাকার ইনাম দেওয়া হবে।

কি নাম বললেন? মেহবুব যেন গর্জে উঠলেন।

অনুচ্চস্বরে এনায়েৎ বলে, চম্বলের নামজাদা ডাকু দীপ সিং রাঠোর। পুলিশের বিশ্বাস দীপ সিং এখনও লক্ষ্ণৌ শহরেই রয়েছে।

হো হো করে মেহবুব হেসে ওঠেন। তারপর আর একটা পোস্টার নজর করে টাঙ্গা থামাতে বলেন।

পোস্টারটার নিচে বেশ কিছু লোকের ভিড়। তারা সন্ত্রস্ত গলায় দীপ সিংয়ের ডাকাতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে, এই দীপ সিং তিনবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের কবল থেকে পালিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও দীপ সিংকে পুলিশ আজও ধরতে পারেনি। পোস্টারটা মেহবুব খান ভালভাবে পড়লেন। ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দীতে লেখা। গম্ভীর মুখে মেহবুব আবার টাঙ্গায় এসে উঠে বসলেন।

আপনার কত টাকার পুঁজি আছে টাঙ্গাওয়ালজী? টাঙ্গা চলতে শুরু করতেই আচমকা বলে উঠলেন মেহবুব খান।

হঠাৎ এমন একটা বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে এনায়েৎ হকচকিয়ে গেল। একটু থেমে কাঁচু-মাচু-গলায় বলল, আমি দিন আনি দিন খাই। সংসারে আমার একটা মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। পয়সার অভাবে মেয়েটার সাদি দিতে পারছি না।

গম্ভীর গলায় মেহবুব বলে ওঠেন, যদি আপনি এক লাখ টাকা পেয়ে যান, তাহলে তো আপনার এই দুঃখ আর অভাব থাকবে না।

ক্লিষ্ট হেসে এনায়েৎ উত্তর দেয়, কিন্তু গরীবের সংসারে এক লাখ টাকা আসবে কোত্থেকে? কেনই বা আসবে?

ধরুন যদি ওই ডাকু দীপ সিংকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতে পারেন? মেহবুবের গলা খুব ধীর শান্ত।

সরকার, ওই ভয়ঙ্কর ডাকাতকে আমি ধরবই বা কি করে আর সন্ধানই পাই বা কিভাবে?

এনায়েতের কথা শেষ হবার আগেই মেহবুব ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে বলেন, যদি আমি ডাকাতকে ধরিয়ে দিয়ে টাকাটা আপনাকে পাইয়ে দিই? টাঙ্গাটাকে বাঁদিকের বাড়িটার গেটের ভেতর ঢোকান। মেহবুবের কণ্ঠে আদেশের সুর।

সরকার, ওটা কোনো নবাবী হাভেলী নয়,ওটা লক্ষ্ণৌয়ের বড় থানা, ভয়ার্ত কণ্ঠে এনায়েৎ বলে।

আমি জানি ওটা থানা। টাঙ্গা ঢোকান ভেতরে। মেহবুবের গলা আরও কঠিন!

বাধ্য হয়ে এনায়েৎ টাঙ্গাটাকে থানার চত্বরে ঢুকিয়ে দেয়। ভয়ে তার হাত-পা কাঁপছে। নিজের দুঃখের কিস্‌সা শোনানো ছাড়া আর কোনো কসুর তো সে করেনি। তবে কেন মেহবুব সাহাব তাকে থানায় আনলেন?

এই টাঙ্গাওয়ালা! থানার ভেতর টাঙ্গাটা কেন ঢুকিয়েছিস? থানার ভেতর টাঙ্গা ঢোকানো বেআইনি জানিস না?

প্রশ্নকর্তাকে লক্ষ্য করে মেহবুব বলেন, ইন্সপেক্টর সাব, আমার হুকুমেই টাঙ্গাটা থানায় ঢোকানো হয়েছে।

আপনি কে? পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রশ্ন ছোঁড়েন।

আমায় চিনতে পারলেন না ইন্সপেক্টর সাব? আমি দীপ সিং রাঠোর। আপনাদের ওই ঘোষণার এক লাখ টাকা দয়া করে এই টাঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে দেবেন।

মাথার টুপি, মুখের দাড়ি-গোঁফ খুলে মেহবুব খান বলেন, আমাকে এবার অ্যারেস্ট করুন।

পুলিশ গ্রেপ্তার করার পূর্বমুহূর্তে ভয়ার্ত এনায়েৎ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, আপনি এভাবে ধরা দিলেন কেন?

অনুচ্চস্বরে মেহবুব উত্তর দিয়েছিলেন, জীবনে অনেক পাপ কাজ করেছি। এখন আপনাকে ও ঘোড়াটাকে যদি বাকী জীবন পেট ভরে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যদি আপনার দুঃখী মেয়েটার বিয়ে হয় তাহলে একটু তো অন্তত পুণ্য করে যেতে পারব। আমি নিজে থেকে ধরা না দিলে, পুলিশের সাধ্য কি আমাকে ধরে।

ছবি: রাহুল মজুমদার

মাসি-পিসির ছড়া

রমেন দাস

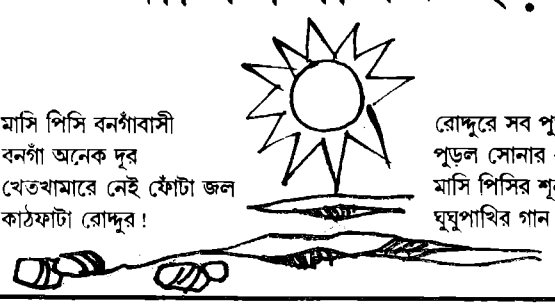

মাসি পিসি বনগাঁবাসী
বনগাঁ অনেক দূর
খেতখামারে নেই ফোঁটা জল
কাঠফাটা রোদ্দুর!

রোদ্দুরে সব পুড়ল ফসল,
পুড়ল সোনার ধান,
মাসি পিসির শূন্য গোলায়
ঘুঘুপাখির গান!

মাসির হাতে মুড়ো ঝাঁটা,
পিসির হাতে গুলি—
সেই ভয়ে সব ঘুঘু উধাও,
হাসল যে বুলবুলি।

ছবি: সুফি

বেশিদিন আগেকার কথা নয়।
১৯৮০ সালের ৪ জানুয়ারি।
সারা পৃথিবীর লোক চমকে উঠল। শিহরিত হলো।

আফ্রিকায় কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি। তার কিছু উত্তরে একটা জাতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত জঙ্গল। নাম সাবা। সিংহদের আবাস। সেই জঙ্গলে পাওয়া গেল জয় অ্যাডামসনের মৃতদেহ। ক্ষতবিক্ষত। বিকৃত। জয় অ্যাডামসনকে খুন করেছে সিংহ।

জয় অ্যাডামসনের নাম কে না জানে! মহিলা হলেও অসীম ছিল তাঁর সাহস। আর ছিল ভালবাসা-ভরা হৃদয়। পশুপাখিদের জন্য অফুরান দরদ। তাঁর প্রাণের টান ছিল আফ্রিকার সিংহ, চিতা ও লেপার্ডদের ওপর। তিনি চাইতেন, এরা যেন বেঁচে থাকে প্রকৃতিতে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নিয়ে। নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে এদের প্রাণ যেন অকালে ঝরে না যায়। যেন নির্বংশ হয়ে না যায়।

সিংহদের ও অন্য জন্তুদের নিয়ে লেখা তাঁর বই অনেক। যেমন বর্ন ফ্রি, লিভিং ফ্রি, ফর এভার ফ্রি, কুইন অব সাবা প্রভৃতি। ওঁর পালিতা সিংহ ছিল এলসা, তার ছেলেমেয়ে জেসপা, গোপা ও ছোট এলসা। এলসা তো কতদিন জয় অ্যাডামসনের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছে। কত আদর করত এলসা ও তার ছেলেমেয়েরা জয় অ্যাডামসনকে।

তাছাড়া সিংহদের আচার-আচরণ ব্যবহার-বৈচিত্র্য সব নিখুঁতভাবে জানা ছিল জয় অ্যাডামসনের।

সিংহরা কি অতটা নিষ্ঠুর হবে? হিংস্র হবে? বনের সিংহই যদি মারে, খেয়ে ফেলবে না দেহটা? এবং কেনই বা শুধু শুধু মারতে যাবে জয় অ্যাডামসনকে—এক নিরীহ মহিলাকে? যিনি তাদের শুধু ভালবাসাই দিয়েছেন।

জয় অ্যাডামসনের কোলে এলসা ও তার বোনেরা।

হিংসুক কারা? বনের প্রাণী না আমরা?

অমিয়কুমার হাটি

সন্দেহ দানা বাঁধলো তাই। কেউ কেউ শুরু করলেন খোঁজ নিতে। সাক্ষ্য প্রমাণ যে সব মিলল—খুব সাংঘাতিক। না—না, সিংহরা তাঁকে খুন করেনি। তিনি খুন হয়েছেন মানুষের হাতে। একটি অসহায় মহিলাকে হত্যা করতে হাত কাঁপেনি হত্যাকারীর। শুধু তাই নয়, তাঁর শরীরটাকে বিশ্রীভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়, যাতে সাজানো যায় এইভাবে যে সিংহই তাঁকে খুন করেছে। পরে জানা যায়, তাঁকে হত্যা করেছিল আফ্রিকার টুরকানা উপজাতির একটা ভাড়াটে খুনি। কিন্তু এটাই বহুল প্রচারিত যে জয় অ্যাডামসনকে সিংহ মেরেছে। সিংহরা অত হৃদয়হীন নয়। মানুষের হিংস্রতার কাছে ওরা তুচ্ছ, নগণ্য। কিন্তু কেন খুন করা হলো এইভাবে এক মেমসাহেবকে?

ঐ অগাধ ভালবাসাটাই হলো তাঁর কাল। গোপন ঘাতক প্রায়ই সিংহ বা চিতা শিকার করত বনে লুকিয়ে-চুরিয়ে। এতে তাঁর ক্রোধের সীমা পরিসীমা থাকত না। তাঁর জীবনের শেষ দিকে এই অসহায় জীবদের বাঁচাতে তিনি প্রায় বিদ্রোহিনী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে চেয়েছিলেন জনচেতনা জাগাতে। জঙ্গলের এই গোপন হত্যা নিয়ে বেআইনী কারবার চলছে। দুর্নীতি রয়েছে সরকারী মহলেও। বারবার সে সব বলতেন, বক্তৃতায়, মিটিং-এ। লিখতেন সে সব তাঁর লেখায়।

কী হারে চলত চিতা মারার ধুম! একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। আইন অনুযায়ী আফ্রিকায় বছরে ৫০০ চিতা মারার পারমিট মিলত। কিন্তু বেআইনীভাবে বছরে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে চালান যেত ৫০ হাজার হতভাগ্য চিতার চামড়া।

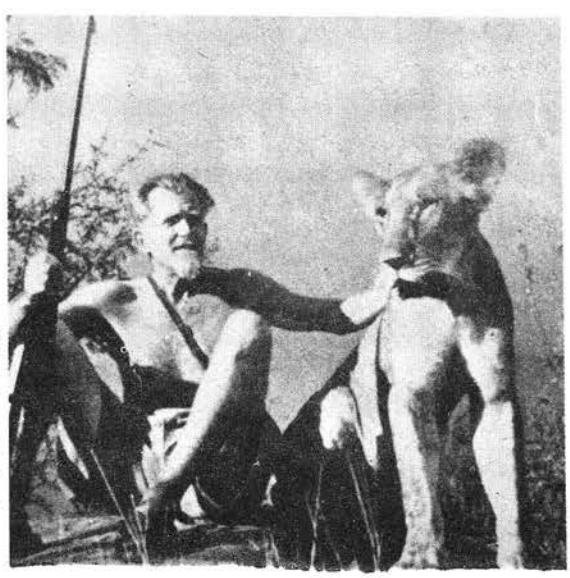

জর্জ অ্যাডামসন ও এলসা

শুধু তাই নয়। এদের মারা হতো ভয়ানক নিষ্ঠুরভাবে। চাই নিখুঁত চামড়া। গুলি করলে তো একটা ফুটোর দাগ থাকবে। তাতে দাম কম পাওয়া যাবে। যাতে কোনো দাগ না পড়ে তাই বন্দী করা হতো অসহায় চিতাকে। তারপর মারা হতো নৃশংসভাবে। সেই বেদনাদায়ক হত্যার কথা ভাবাও যায় না।

এসব অনাচার দূর করবার জন্যে চেষ্টা করতেন জয় অ্যাডামসন। ধরতে গেলে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা বিপজ্জনক মনে করল তাঁর শত্রুরা। তাই তাঁকে খুন হতে হলো ওদের হাতে।

মানুষ, পশুপাখি, বনজঙ্গল সব নিয়ে আমাদের পরিবেশ। মানুষের দাপটে সেই পরিবেশ ভীষণভাবে বদলে যাচ্ছে। পশুপাখিদের উপর নেমে এসেছে একটা বড় আঘাত।

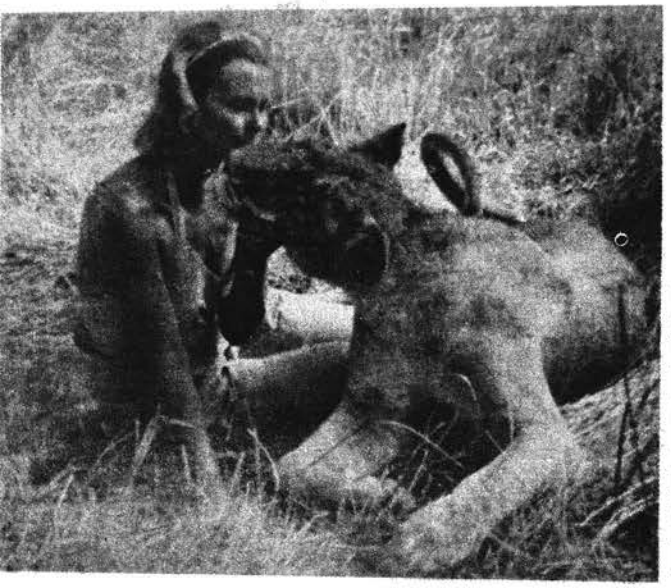

এলসাকে আদর করছেন জয় অ্যাডামসন

শুধু যে বন কেটে বসত গড়ে উঠছে, তাই নয়। আছে লাভ ও লোভের কারবারীরা। চোরাগোপ্তা পশুহত্যায় এদের জুড়ি মেলা ভার। হাতি, চিতা, সিংহ, বকপাখি, গোরিলা, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জি, বাঘ, গণ্ডার কাদের উপর না এদের লোভ নেই? শ্যেনদৃষ্টি নেই? এরা হলো গোপন ঘাতকের দল। পশুপাখিদের নেই বর্শা-বন্দুক-মেশিনগান। ওরা জানে না মিছিল করতে, দরবার করতে, সঙ্ঘবদ্ধ হতে। মানুষের লোভের কাছে ওদের জীবনের দাম আর কতটুকু? অনেক সময় এ সব চোরাকারবারীরা সঙ্ঘবদ্ধ। ওদের ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে থাকে বহুদূর অবধি। দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে।

জলদাপাড়ার জঙ্গলে গিয়েছিলাম একবার। গণ্ডার দেখেছিলাম। দুটো গণ্ডার 'রণং দেহি' বলে একটা ডোবার কাদাজল মেখে যুদ্ধ করছিল। কী সুন্দর! ওদের ছেড়ে হাতির পিঠে চড়ে ক্রমশ গভীর বনে ঢুকলাম। সে বনে সূর্যেরও আলো এসে পড়ে না। গা ছমছম! যদি পাই বাঘের দেখা! কি হবে তাহলে?

ও কি ও? স্বপ্ন দেখছি না সত্যি? ভয়ে আঁতকে উঠি। ওই তো বাঘ। ঘাপটি মেরে রয়েছে তার গোপন ডেরায়, জঙ্গলের ভিতর। হাতির উপর আমরা তটস্থ! রক্ত হিম! মাহুতও ভাবতে পারেনি, সাতসকালে এমনটা হবে। বাঘ দেখবে।

আমরা স্থির হয়ে বসে হাতির পিঠে। হাতিও নট নড়নচড়ন। কিন্তু কি হলো? ও বাঘও যে নড়ে না চড়ে না! তবে কি এইভাবে চুপ করে বসে লাফিয়ে পড়ার তাল খুঁজছে? কিন্তু ও বাঘের জ্বলজ্বলে চোখ কোথায়? ও তো কেমন নেতিয়ে পড়ে আছে!

মাহুত দেখল ভাল করে। হাতির উপর থেকে। তারপর ঘোষণা করল ও তো মৃত বাঘ! তখন আমরা নামলাম হাতির পিঠ থেকে সেই আলো-না-ঢোকা জঙ্গলে। শুধু বাঘের কঙ্কালটা আর ক্ষতবিক্ষত চামড়াটা রয়েছে। কোনো গোপন শিকারী বাঘটা মেরেছে। তার শ্বাদন্ত দুটো কেটে নিয়ে গেছে। আমাদের মনে হলো, ঐ বাঘ দেখার চেয়ে না দেখতে পাওয়া বরং ভাল ছিল!

এইভাবে জলদাপাড়ার জঙ্গলেও খুন হয় গণ্ডার, বুনোমোষ, বাঘ। এ কাহিনী সব জায়গায়। পৃথিবীর তাবৎ বন্যপ্রাণীর জীবনে আজ এক চরম সঙ্কট। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। পশুপাখিদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড।

ডায়ান ফসি—একজন আমেরিকান মহিলা। এসেছেন আফ্রিকার রোয়ান্ডা অঞ্চলে। আছেন জঙ্গলের ভিতর একটা ক্যাম্পে। গবেষণা করেন গোরিলাদের নিয়ে। সবে বড়দিন পেরিয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৫। রাতের বেলা। ডায়ান ফসির শিবিরে চুপিসাড়ে ঢুকল কে একজন। কে? কে? একে তো দেখেননি ফসি কোনোদিন। ওর হাতে কি ওটা? আঘাত হানবার চেষ্টা করছে ডায়ান ফসির মাথায়। অকুতোভয় মহিলা ডায়ান ফসি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর রিভলভারে গুলি ভরতে। সে সময়টুকু তিনি পাননি। খুনি সাংঘাতিকভাবে থেঁতলে দিল তাঁর মাথা। ডায়ান ফসি মারা গেলেন।

হইচই পড়ে গেল। ডায়ান ফসি তখন সংবাদের শিরোনামে। গোরিলাদের নৃশংসভাবে খুন করে গুপ্তঘাতকরা। তাদের বাঁচাতে, তারা যাতে লোপ না পেয়ে যায় তার জন্য ডায়ান ফসি ছিলেন সদা তৎপর। জয় অ্যাডামসনের মতো। তাই তাঁকেও সরে যেতে হলো পৃথিবী থেকে।

এখানে গোরিলারা তাঁকে হত্যা করেছে, এমন সাজানো গেল না। তাহলেও অনেক টালবাহানা কিন্তু করা হলো। বলা হলো তাঁর এক আমেরিকান রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ানে ম্যাকগিরি তাঁকে হত্যা করেছে টাকাপয়সার লোভে। কিন্তু আলমারিতে কয়েক হাজার ডলারে হাত দেয়নি কেউ। এটা সাজানো ব্যাপার। খুনি ধরা পড়ল না।

ডায়ান ফসি এসেছিলেন গোরিলাদের নিয়ে গবেষণা করতে আফ্রিকার রোয়ান্ডা অঞ্চলে। তিনি ভালবেসে ফেললেন গোরিলাদের। গোরিলারা দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল। দায়ী ছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের একটা কর্মকাণ্ড। ১৯৬০ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক রোয়ান্ডা জুড়ে চাষ করেছিল ক্রিসানথেমাম বা চন্দ্রমল্লিকা ফুল। এর থেকে পাওয়া যায় পাইরেথ্রাম নামে রাসায়নিক—পোকামাকড় মারতে কাজে লাগে। এই করতে গিয়ে ৪০% জঙ্গল নষ্ট করেছিল। ঐ জঙ্গলের অধিবাসী গোরিলাদের হয়েছিল বিপদ। পাঁচশো গোরিলা কমতে কমতে এসে ঠেকেছিল তিনশোতে।

ডায়ান ফসি বাঁচাতে চেয়েছিলেন গোরিলাদের। তিনি ওদের নাম ধরে চিনতেন। একটি পুরুষ গোরিলার নাম দিয়েছিলেন 'ডিজিট'। ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সব জায়গায়। বহুবার টেলিভিসনে

দেখা গেছিল ডিজিটকে। দেশবিদেশের ভ্রমণার্থীরা তাকে দেখতে আসত।

১৯৭৮-এর এক সকালে দেখা গেল, সেই ডিজিটকে কারা বর্শার আঘাতে খুন করেছে। কেটে নিয়েছে তার মুণ্ডু আর দুটো হাত। ফসির সে কি কান্না! সন্তানহারা জননী যেন! কাঁদতে কাঁদতে তিনি জানালেন, মাত্র ৫০০ টাকার লোভে স্থানীয় হত্যাকারী কাজটা করেছে বিদেশীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে। ডিজিটের মাথার খুলি টাঙানো থাকবে মোমেন্টো হিসাবে এক ভ্রমণার্থীর বাড়িতে। হাতের হাড় দিয়ে গড়া হবে ছাইদানি! তখনো পর্যন্ত ২৫০টি জীবিত গোরিলার মধ্যে আর একটার জীবন গেল।

কী করুণ অথচ গৌরবময় ডিজিটের মৃত্যুকাহিনী। শিকারীরা আসলে তাড়া করেছিল একটা গোরিলা পরিবারকে। ওদের লোভ—সবাইকে মেরে ফেলা। ওদের সঙ্গে ছিল শিকারী কুকুর। দুদিন ধরে তাড়া খায় গোরিলারা। শেষে দম ফুরিয়ে যায় তাদের। ডিজিট তখন বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসে, অন্য গোরিলাদের পালাতে সাহায্য করে। বীরের মতো বুক পেতে নেয় বর্শার আঘাত—তার জাতভাইদের বাঁচাতে। পাঁচবার বর্শার ফলা ঢুকেছিল তার শরীরে। মরবার আগে এই তরুণ গোরিলাটি একটি শিকারী কুকুরকে মেরে ফেলেছিল।

গোরিলাদের নিয়েও অশুভ চক্র ও আঁতাত আছে। শিশু গোরিলাদের চালান দেওয়া হয় বিভিন্ন পশুশালায়। কিন্তু একটা শিশু গোরিলাকে ধরতে গেলে তার মাকে মারতে হবে। তবে তার কোল থেকে ছিনিয়ে আনতে পারা যাবে শিশু গোরিলাকে এবং মা ও শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দেবে অন্ততঃ আরও একটি পুরুষ গোরিলা। এতই তারা ভালবাসে সন্তানদের! মানুষের থেকেও এ ভালবাসা বেশি বৈকি?

ফসির হিসাব অনুযায়ী বছরে ২০টি গোরিলার প্রাণ যায় গুপ্ত-ঘাতকের হাতে। তাহলে গোরিলারা লোপ পেতে বেশিদিন আর লাগবে না।

ডায়ান ফসি গোরিলাদের বাঁচাতে টাকা-পয়সাও যোগাড় করেছিলেন। নিজে রক্ষীও নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু একা আর কতটুকু পারবেন? বিরোধ বাধল স্বার্থান্বেষীদের সঙ্গে, এমনকি স্থানীয় সরকারের আমলাদের সঙ্গেও।

ফসি তাঁর জীবনের শেষ দিকে বুঝতে পেরেছিলেন, একটা বিরাট চক্র কাজ করছে গোরিলাদের ফাঁদ পেতে মারতে। এতে আছে ৬০ জন গুপ্তঘাতক, কয়েকজন কালো ও সাদা চামড়ার ব্যবসায়ী। আর এই কুচক্রীরা সহ্য করতে পারছিল না ডায়ান ফসিকে, যিনি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন গোরিলাদের। তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হলো পৃথিবী থেকে।

ফসিকে সমাধিস্থ করা হলো তাঁর পুত্রতুল্য গোরিলা ডিজিটের পাশে। ডিজিটের মতো আরও দুটো গোরিলাকে গুপ্তঘাতকরা হত্যা করেছিল। ওদের নাম ছিল মাকো ও চাচা বার্ট। তাদেরও মৃতদেহ শায়িত ছিল সেই জায়গাটাতে।

পিছিয়ে যাওয়া যাক আরো আগে। এই বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে। জায়গাটা হচ্ছে আমেরিকার ফ্লোরিডা। ১৯০৫ সাল। শ্বেতশুভ্র বকপাখিদের জীবন তখন বিপন্ন। সাহেব-শিকারীরা এন্তার বকপাখি শিকার করে। ওদের জীবনের আর দাম কি! বকপাখি না মারলে পালক পাবে কোথায়? বকপাখির পালক তাহলে শোভা পাবে কি করে মেমসাহেবদের টুপিতে? তাঁদের আভিজাত্যের শখ মেটাতে লক্ষ লক্ষ বক ও সারস মারা পড়ে।

এ রকম আর একটা পাখির স্থানীয় নাম হুইয়া—নিউজিল্যান্ডের পাখি। ১৯ ইঞ্চি লম্বা। এদের মেরে ফেলা হতো। কারণ কিছু বড়-লোক পছন্দ করত এদের লম্বা বড় লেজের পালক, যার ডগাটা সাদা। শোভা পেত সে পালক তাদের মাথার টুপিতে।

এর ফলে হুইয়া এবং বক সারসদের জীবন হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। প্রতি বছর ফ্লোরিডাতেই প্রায় দেড় লক্ষ বড় সারস ধরা হতো ফাঁদ পেতে। তাদের মেরে যোগাড় করা হতো তাদের পালক। এক আউন্স পালকের দাম ছিল তখন দু হাজার টাকা।

একটা সমিতি গড়া হলো। যাতে পাখি আর না মারা হয়। এই সমিতির রক্ষীবাহিনীর একজন ছিলেন গান্ট ব্রাডলে।

এলসার যখন খেলা করতে ইচ্ছা হতো।

ব্রাডলে একদিন ধাওয়া করলেন এক জলজাহাজকে। দেখলেন দুজন শিকারী মৃত বকগুলো তুলছে সেই জাহাজে, পাড়ি দেবে অন্যত্র। নিয়ম অনুযায়ী তিনি চেষ্টা করলেন শিকারীদের আটকাতে।

কিন্তু তার আগেই ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন বের করল তার বন্দুক। তাক করলো ব্রাডলের দিকে। কিছু বুঝবার আগেই বন্দুক থেকে ছুটে এল গুলি। জাহাজে ওঠা আর হলো না। লুটিয়ে পড়লেন তীরেই।

জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে গেল। দিনটা ছিল ৮ জুলাই, ১৯০৫। পরের দিন দুটি বালক দেখতে পেল ব্রাডলের মৃতদেহ।

শোরগোল হলো খুব ঘটনাটা নিয়ে। কিন্তু খুনির প্রভুদের জাল বিছানো ছিল বহুদূর অবধি। খুনিকে ধরা হলেও সে অদৃশ্য কারুর অবিশ্বাস্য তৎপরতায় জামিন পেয়ে গেল। তারপর একদিন কাঠগড়া থেকে বিচারের প্রহসন শেষে বেরিয়েও এল। কিছুই হলো না হত্যাকারীর।

বুনো পশুপাখিদের রক্ষায় ব্রাডলেই বোধহয় প্রথম শহীদ।

খুনি পার পেলেও মৃত ব্রাডলের ছায়া দীর্ঘতর হতে থাকল। নিউইয়র্কের মহিলাদের টুপির ব্যবসায়ের দিকে পড়ল সবার ঘৃণ্য দৃষ্টি। ঐ ব্যবসার জন্য বছরে হত্যা করা হতো ৫০ লক্ষ পাখি। আইন

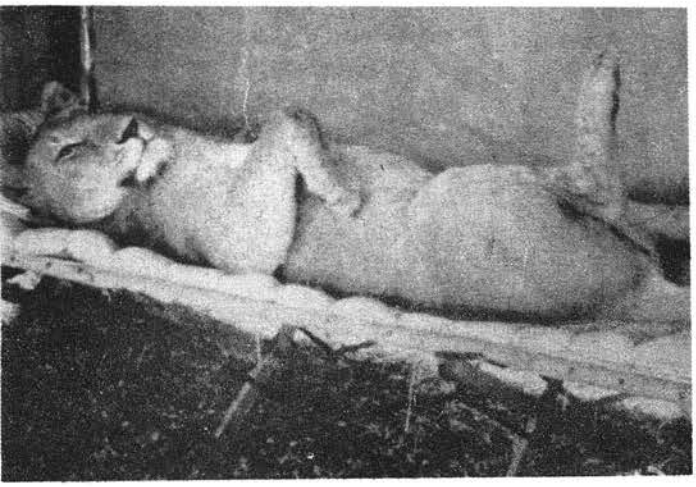

বিদায়ের মুহূর্তে জলসা

জোরদার করা হলো। গড়ে উঠল জনমত। বক সারসদের দল কিছুটা স্বস্তি পেল ব্রাডলে শহীদ হলেন বলেই।

তবু বিখ্যাত ঐ হুইয়া পাখি লোপ পেয়ে গেল একেবারে পৃথিবী থেকে। ১৯০৭ সালে শেষ হুইয়াকে হত্যা করল এক শিকারী তার ডগাসাদা কালো পালকগুলোর লোভে।

দুই মহিলা—একজন বৃটিশ, নাম জেন গুডব্যাল। অন্যজন কানাডার, নাম তার বিরুট গ্যালডিকাস। বৃটিশ মহিলা গবেষণা করছিলেন শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে। গ্যালডিকাসের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ওরাংওটাং। এও আফ্রিকার জঙ্গলের কথা। ওঁরাও বুঝেছিলেন কী সাংঘাতিক চক্র রয়েছে, যারা বন্যপ্রাণী হত্যা ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

ওই দুজন মহিলা প্রাণে বেঁচে গেছিলেন। কিন্তু সহ্য করতে হয়েছিল হুমকি। যাতে তাঁরা গবেষণা ছেড়ে দেন। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যান। ভয় দেখানো হয়েছিল প্রাণনাশের।

তবু ওঁদের সাহসে ঘাটতি পড়েনি।

কুচক্রীরা অন্য পথ ধরল। ১৯৭৫ সালে গুডব্যালের চারজন ছাত্রকে চুরি করা হলো। ওদের নিয়ে যাওয়া হলো আফ্রিকার ঐ সংরক্ষিত বন থেকে টাঙ্গানাইকা হ্রদ পেরিয়ে আরো দূরে, জায়রিতে। ৫ মাস পরে অনেক টাকাপয়সা দিয়ে ওদের মুক্ত করে আনা হয়।

এরপর আর কি সাহস থাকে দুজন মহিলার?

এইভাবে আফ্রিকার জিম্বাবোয়েতে চিফ গেম ওয়ার্ডেনকে এ কে ৪৭ অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে হত্যা করা হলো। নাম তাঁর রজার এডওয়ার্ড। কী তাঁর অপরাধ? তিনি একদল দস্যুকে তাড়া করেছিলেন, যারা চেয়েছিল হাতির জন্য সংরক্ষিত ঐ বনের হাতিদের হত্যা করতে। এর মাত্র এক বছর আগে তানজানিয়ার এক সংরক্ষিত বনে সেখানকার চিফ ওয়ার্ডেনকে মারা হলো মেশিনগানের গুলিতে। তিনিও গেছিলেন হাতিদের রক্ষা করতে। ১৯৭৫—১৯৮৫ সালে জায়রিতে এইভাবে হত্যা করা হয়েছে কম করে ২৩ জন বনরক্ষীকে। এই কাণ্ড চলছে কেনিয়াতেও, আফ্রিকার সংরক্ষিত অন্যান্য বনেও। ১৯৬০ সালে বনরক্ষী তৈরি করা হলো কেনিয়াতে। এক বছরের মধ্যে তাদের দুজন প্রাণ হারালো। আছে ভয়ভীতি। আছে ঘুষের লোভ। অল্প তাদের মাইনে। তবু সাধারণ রক্ষীবাহিনীর মধ্যেও মেলে লড়াকু মনোভাব। তারা ভালবাসে বন্য প্রাণীদের। তাদের জন্যে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

এই রকম কত শহীদ আছেন। জানা অজানা। এঁরা আশাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বন্যপ্রাণী রক্ষায় এঁদের সংগ্রাম তাই ভুলবার নয়। ভুলবার নয় জীবজন্তুর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসা। এই ভালবাসা প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য, পরিবেশের সম্পদ রক্ষার জন্য। তাই জানা অজানা এইসব শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই। তাঁরা অমর হোন। তাঁদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। অবোধ ওই সব পশুদের প্রাণরক্ষার শপথ যেন নিই সবাই।

যদিও এ শপথ শক্ত শপথ।

তবু যেন বুঝতে পারি, হিংসুটে কারা। হিংস্র নয় বনের প্রাণী। তারা মানুষের ক্ষতি করে না। অথচ মানুষ তাদের কী ক্ষতিই না করছে। আর কত ক্ষতি করবে? কত কাল? সবাই মিলে তাদের জীবনকে জীবন বলে ভাবতে শিখব কবে? তার চেয়েও বড় কথা আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটার ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যাপারে ওদের ভূমিকাও বিরাট। ওদের শেষ করে আমরা কিন্তু আমাদের ধ্বংসের দিনই ত্বরান্বিত করছি।

প্রাপ্তিযোগ

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

কুষ্ঠি খুলে বিষ্টুবাবু দেখেন লেখা 'প্রাপ্তিযোগ',
বাতের ব্যথায় বিষম কাবু, চেপেই আছে নানান রোগ।
জলের মতো ফেলেন টাকা, লটারীটাও মিথ্যে নয়
প্রাপ্তিযোগের কেমন বরাত, পরখ করে দেখতে হয়।
পদোন্নতি ঘটতে পারে, নেমন্তন্ন? কম কি তা,
মাথায় ছোঁয়ান চক্ষু বুজে প্রাচীন চরকসংহিতা।

গুপ্তধনও মিলতে পারে, বসতবাটি মান্ধাতার,
জমির দরও চড়তে পারে, মাথায় ঘোরে ধান্দা তাঁর।
পড়শী বটুক হপ্তা আগে ধার নিয়েছে হাজার তিন
সুদসমেতে ফিরিয়ে দিলে সেটাই হবে ঠিক সুদিন।
কুষ্ঠি যখন স্পষ্ট লেখে, প্রাপ্তি তবে মিথ্যে নয়
এখন শুধুই সময় গোনা, ধৈর্য ছাড়া হয় কি জয়?
সমস্ত দিন এইভাবে যায়, প্রাপ্তিযোগের নেই আভাস
বিষ্টু ভাবেন কুষ্ঠিটাতে ধরলো এবার অবিশ্বাস।
মেজাজ খারাপ করেন কি আর কলতলাতে যান সটান
পেছল চাতাল হড়কে চরণ, হলেন তিনি চিৎপটাং।
কোমরটাতে জোর লেগেছে, বিষ্টু ভাবেন মিথ্যে নয়
প্রাপ্তিযোগের বরাতখানা আছাড় খেয়েই সাঙ্গ হয়।

ছবি : সুফি

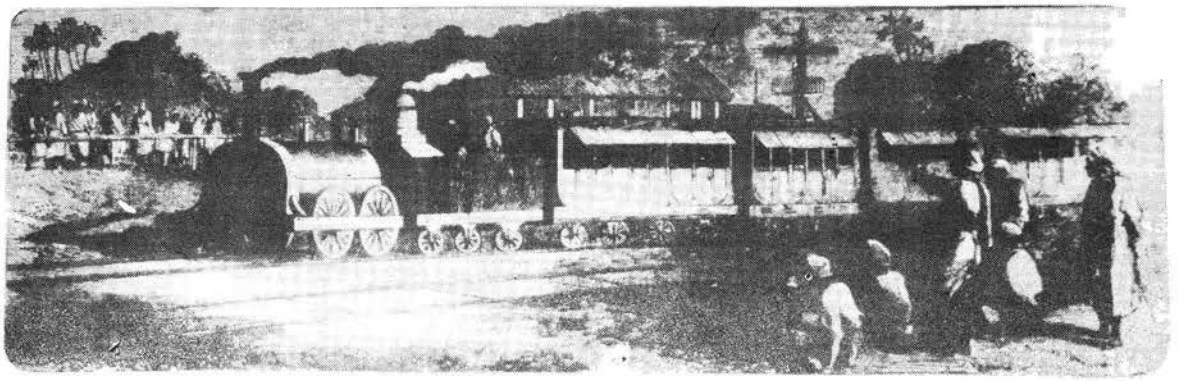

ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের প্রথম যে ট্রেনটি হাওড়া থেকে হুগলী গিয়েছিল।

কু ঝিক ঝিক

সমীর গোস্বামী

মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আগুন ও চাকার আবিষ্কার। আর সেই সভ্যতা বহুগুণ গতি পেয়েছিল যেদিন মানুষ আগুন ও চাকাকে একত্রে ব্যবহার করতে শিখেছিল অর্থাৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল স্টিম ইঞ্জিন।

এই স্টিম ইঞ্জিন কিন্তু হঠাৎ একদিনে আবিষ্কৃত হয়নি। স্টিম ইঞ্জিনের জনক জর্জ স্টিফেনসনের পুত্র রবার্ট স্টিফেনসন বলেছিলেন, 'ইঞ্জিন একজনের তৈরি নয়, একদল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফল।'

তবে রেল ইতিহাসের আলোচনায় প্রথমেই বলতে হয় রেল লাইনের কথা। রেল ইঞ্জিন আবিষ্কারের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রেল লাইনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সেকালেই মানুষ আবিষ্কার করেছিল মসৃণ পাথর বা কাঠের সমান্তরাল দুটি দণ্ডের উপর দিয়ে স্লেজ জাতীয় বা হাতে-ঠেলা গাড়িতে করে ভারি মাল অনেক সহজে নিয়ে যাওয়া যায়। গ্রীসে লাইন পাতার পরিবর্তে শক্ত রাস্তায় ৫/৬ ইঞ্চি গভীর, ২/৩ ইঞ্চি চওড়া এবং ৩ থেকে ৫ ফুট দূরত্বে সমান্তরাল দুটি টানা লম্বা গর্ত খোঁড়া হতো, যার মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো সুসজ্জিত রথ। রোমেও সৈন্যদের মালপত্র নিয়ে যাওয়ার হাতে-ঠেলা গাড়ি চালানোর জন্য গ্রীসের মতো গর্ত খোঁড়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু অন্যান্য বহু আবিষ্কারের মতো লাইনের উপর দিয়ে গাড়ি চালাবার কায়দাটাও মধ্যযুগে হারিয়ে গিয়েছিল। পরে পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতকের কোন এক সময়ে লাইনের ব্যবহার আবার জার্মানিতে শুরু হয়।

জার্মানির কয়লাখনিগুলিতে তখন লাইন পাতা হয়েছিল খনির মুখ থেকে কয়লা তুলে নিয়ে আসার ছোট গাড়িগুলি খনি-শ্রমিকদের দ্বারা অথবা ঘোড়ার সাহায্যে টেনে নিয়ে আসার সুবিধার জন্য। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে কয়েকজন জার্মান খনিবিশেষজ্ঞকে ইংলন্ডে আনা হয় সেখানে খনি থেকে কয়লা-উত্তোলন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য। জার্মান খনিবিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে খনি-মুখে লাইন পাতার ব্যবস্থাও করেন। কালক্রমে এই লাইন পাতার ব্যবস্থাই আরো উন্নত হয়ে রেল লাইনে পরিণত হয়।

আবার ইঞ্জিনের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৭৬৩ সালে নিকোলাস জোসেফ কগনট নামে এক ফরাসী গোলন্দাজ অফিসার স্টিম ইঞ্জিন চালিত একটি কামান তৈরি করেন। সেটিই ছিল প্রথম স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার। কিন্তু এই স্টিম ইঞ্জিন চালিত কামানটি পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর সময় উল্টে যায়। ফলে আর চালানো হয়নি।

এর পরে ১৭৭০ সালে অলিভার ইভান্স নামে এক আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার একটি স্টিম ইঞ্জিন তৈরি করেন। কিন্তু অমসৃণ রাস্তায় সেটি চলতে ব্যর্থ হয়। ১৭৮৬ সালে এডিনবার্গে উইলিয়াম সাইমিংটনের তৈরি ইঞ্জিনটিও রাস্তায় চলতে অক্ষম হয়। এর পরে গ্যাসলাইটের

জর্জ স্টিফেনসন।

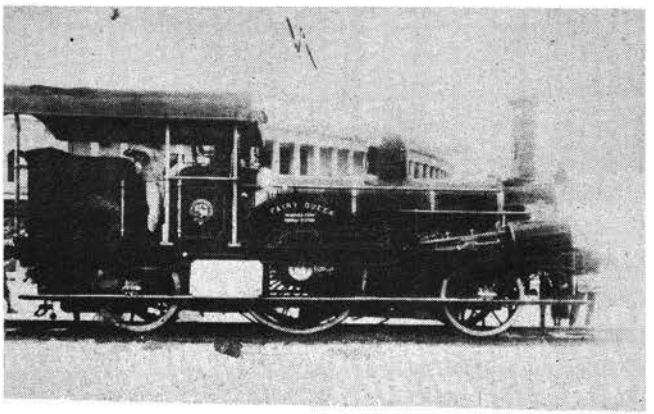

১৮৫৫-য় তৈরি পৃথিবীর সবথেকে পুরনো স্টিম ইঞ্জিন 'ফেয়ারি কুইন'। এটি রাখা আছে নিউ দিল্লীর রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়ামে।

প্রবর্তক উইলিয়াম মারডক ইঞ্জিন তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কোম্পানী 'বোল্টন অ্যান্ড ওয়াট'-এর অনুৎসাহের দরুন তিনি আর বেশি দূর এগোতে পারেননি।

রিচার্ড ট্রেভিথিক নামে এক অল্পবয়সী কর্নওয়ালবাসী ইঞ্জিনীয়ার ১৭৯০ সালে কয়েকটি মডেল ইঞ্জিন তৈরি করেন। এর পর তিনি উৎসাহী হয়ে ১৮০১ সালে একটি বড় আকারের ইঞ্জিন তৈরি করেন। ইঞ্জিনটির মাঝখানে ছিল একটি চিমনি। আর তার চারধারে ছিল যাত্রীদের জন্য বসার সীট। ট্রেভিথিক ইঞ্জিনটির নাম দিয়েছিলেন 'পাফিং ডেভিল'। এর পর 'বক্সিং ডে'-তে (খ্রীস্টমাসের পরের দিন) তিনি তাঁর কয়েকজন আমন্ত্রিত বন্ধুসহ ইঞ্জিনটি প্রথম চালনা করেন। কিন্তু কয়েক শ' গজ যাওয়ার পরেই ইঞ্জিনটি ভেঙে যায়। ভাঙা ইঞ্জিনটিকে একটি সরাইখানার ঘোড়ার গাড়ি রাখার জায়গায় ঠেলে নিয়ে গিয়ে, সকলে মিলে খেতে বসেন। হঠাৎ পোড়া গন্ধ বেরোতে তাঁদের খেয়াল হয় ইঞ্জিনের বয়লারের আগুন তো নেভানো হয়নি। ছুটে গিয়ে তাঁরা দেখেন, ততক্ষণে গাড়ি রাখার জায়গাটা জ্বলছে। এইভাবেই ট্রেভিথিকের পাফিং ডেভিল পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন (স্টিম)।

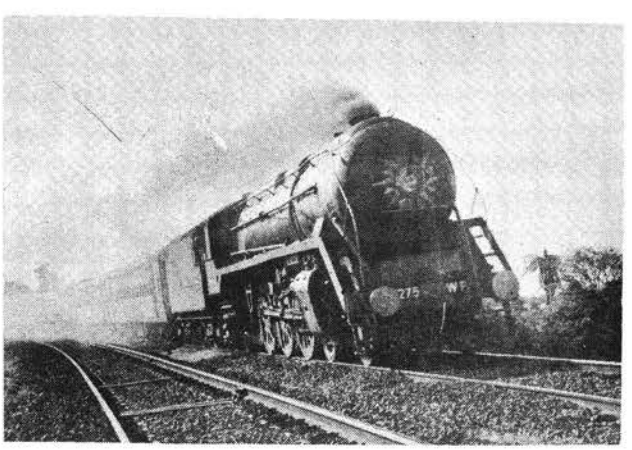

দমে না গিয়ে ট্রেভিথিক ১৮০৩ সালে আরেকটি ইঞ্জিন তৈরি করেন এবং নিজেই কর্নওয়াল থেকে লন্ডন পর্যন্ত সেটিকে চালান। কিন্তু ইঞ্জিনটি যাত্রার ধকল সইতে না পেরে ভেঙে-চুরে যায়। ট্রেভিথিক তখন বুঝতে পারেন ইঞ্জিন রাস্তায় চলবে না। তিনিই প্রথম ইঞ্জিনকে লাইনের বা রেল-এর উপর চালাবার সিদ্ধান্ত নেন। অনুসন্ধানের পর তিনি জানতে পারেন পেন-ই-ডারান নামে সাউথ ওয়েলসের এক লোহার কারখানার কারডিফ পর্যন্ত লাইন পাতা আছে। তিনি আবার একটি ইঞ্জিন তৈরি করেন। এই ইঞ্জিনটির সঙ্গে বর্তমানের স্টিম ইঞ্জিনের যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ইঞ্জিনটিতে সামনে-পেছনে চাকা লাগান হয়, যেগুলি আবার একটি লোহার দণ্ড দ্বারা যুক্ত ছিল। ইঞ্জিনটি ৫টি ওয়াগনে ১০ টন লোহা এবং ৭০ জন যাত্রী নিয়ে ঘণ্টায় ৫ মাইল গতিতে দশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে।

ট্রেভিথিক স্বভাবতই আরো উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তিনি লন্ডনবাসীকে এই অসাধারণ সাফল্য দেখাতে চাইলেন। লন্ডনের ইউস্টেন স্কোয়ারে চক্রাকারে একটা ছোট লাইন পাতা ছিল। তিনি 'স্টিম সার্কাস' নামে একটি ইঞ্জিন তৈরি করেন এবং ১ শিলিং-এর বিনিময়ে যাত্রীদের চক্ররেলে ঘুরে আসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর বরাত নিতান্তই খারাপ ছিল। যাত্রার শুরুতেই একটি চাকা ভেঙে গিয়ে ইঞ্জিনটি উল্টে যায়। ফলে গোটা পরিকল্পনাটাই গেল ভেস্তে।

ট্রেভিথিক এর পর প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এখানেই শেষ নয়। তিনি দেউলিয়া হয়ে যান। লজ্জায়, হতাশায় পেরু-তে তিনি পালিয়ে বাঁচেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ মিটে গেলে প্রথমে চিলি ও পরে কলম্বিয়া হয়ে ট্রেভিথিক আবার ইউরোপে ফিরে এসেছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় ৬২ বছর বয়সে, ১৮৩৩ সালে যখন তিনি মারা গেলেন তখন জর্জ স্টিফেনসনের আবিষ্কৃত স্টিম ইঞ্জিন চলছে পুরোদমে।

এর পর শুরু হলো সাফল্যের কাহিনী। গড়ে উঠল গোটা দুনিয়ার রেল-ব্যবস্থার বনিয়াদ। আর, যিনি এঁর স্রষ্টা, তাঁর নাম জর্জ স্টিফেনসন। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এই বিশাল কর্মকাণ্ডের যিনি জনক তিনি ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন নিরক্ষর। কারণ অত্যন্ত গরীব ঘরে জন্মগ্রহণ করায় ৮ বছর বয়সেই অর্থোপার্জনের কাজে লাগতে হয়। সেই সময় তিনি কয়লাখনির ঘোড়ায় টানা রেল লাইনের উপর থেকে গরু-ছাগল তাড়ানোর কাজ করতেন। পরের বছর থেকে তিনি খনির কয়লা বাছার কাজ পান। ক্রমে তিনি ওই খনিতে কাজে উন্নতি করেন ও ১৮ বছর বয়সে নৈশ স্কুলে ভর্তি হন।

কয়লাখনিতে কয়লা উত্তোলনের কাজে ইঞ্জিন ব্যবহার দেখে, স্টিফেনসন গাড়ি টানার কাজেও ইঞ্জিন ব্যবহারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। দু'বছরের একটানা চেষ্টার পর তিনি ১৮১৪ সালে একটি ইঞ্জিন তৈরি করেন। এই ইঞ্জিনটি ৩০ টন কয়লা বোঝাই ৮টি ট্রাক ঘণ্টায় ৪ মাইল গতিতে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইঞ্জিনটি তেমন উন্নত মানের না হওয়ায় ও ঘোড়ার চেয়ে ইঞ্জিনটি দিয়ে গাড়ি টানা ব্যয়বহুল হওয়ায় সেটি ব্যবহৃত হয়নি।

পরের বছর তিনি আগের ইঞ্জিনের দোষ-ত্রুটি শুধরে আরেকটি ইঞ্জিন তৈরি করলেন। সেটি ব্যবহার সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় অন্যান্য কয়লাখনির মালিকরাও তাঁকে ইঞ্জিন তৈরি করার অর্ডার দিলেন। জর্জ স্টিফেনসনও তাঁর ১৭ বছরের ছেলে রবার্টকে সঙ্গী করে ইঞ্জিন সরবরাহ করতে লাগলেন।

তখনও পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য কোনো রেল-ব্যবস্থা চালু হয়নি।

অবশেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত রেল-ব্যবস্থা চালু করার আইন পাশ হলো। সঙ্গে সঙ্গে লাইন নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল। ১৮২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর স্টকটন থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত ১০ মাইল দীর্ঘ পথে পৃথিবীতে প্রথম ট্রেন চলল। সেদিনের ইঞ্জিনটিও তৈরি করেছিলেন জর্জ স্টিফেনসন। নাম দেওয়া হয়েছিল 'লোকোমোশন নম্বর ওয়ান'। সেদিনের ট্রেনটিতে মোট ৩৩টি ওয়াগন ও ১টি যাত্রীদের জন্য কামরা ছিল। যাত্রীদের কামরাটিতে ছিলেন সপরিবারে কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ। ১২টি ওয়াগনে বোঝাই ছিল কয়লা ও ময়দা। বাকি ২১টিতে অন্যান্য যাত্রীদের সাময়িক বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্টকটন থেকে ডার্লিংটন রেলপথ মূলতঃ কয়লা ও অন্যান্য পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হতো।

যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল আরো পরে। যাত্রীবাহী ট্রেন কোন স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে টানা যাবে তা পরীক্ষার জন্য ইংল্যান্ডের লিভারপুলের কাছে রেনহিল নামক স্থানে আয়োজিত হয়েছিল স্টিম ইঞ্জিনদের এক দৌড় প্রতিযোগিতা। তারিখটা ছিল ৬ অক্টোবর, ১৮২৯ সাল। অংশগ্রহণ করেছিল 'নভেলটি', 'পারসিভিয়ারান্স', 'স্যান্সপেরিল' আর জর্জ ও রবার্ট স্টিফেনসনের তৈরি 'রকেট'। পৌনে দু মাইলের সেই দৌড় প্রতিযোগিতায় সমস্ত শর্তাদি পূরণ করে জয়ী হয়েছিল রকেট। শুরু হলো যাত্রীবাহী ট্রেন চলা। সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চলেছিল ১৮৩০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, ম্যানচেস্টার থেকে লিভারপুর পর্যন্ত।

যাত্রীবাহী ট্রেন চলা শুরুর আগে কিছু লোক বাধা দানের চেষ্টাও করেছিলেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল, আগুনে ইঞ্জিনের তীব্র গতিতে চলা দেখলে এমন প্রতিক্রিয়া হবে যে, গরু দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেবে। মুরগি আর ডিম দেবে না। ইঞ্জিনের ধোঁয়া বাতাসকে এমন বিষাক্ত করবে যে, পশুপাখি মারা যাবে। লাইনের দু'ধারের বাড়ি-ঘরে ইঞ্জিন থেকে ছিটকে আসা আগুনের ফুলকিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটবে। তাছাড়া ঘোড়াদের কাজ কমে গেলে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তারা মারা যাবে। সহিসরা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে বাধ্য হবে। এমন কি ইঞ্জিনের বয়লার যে কোনো মুহূর্তে ফাটতে পারে, যার ফলে মানুষ মারা যেতে পারে। অনবরত তীব্র গতিতে ছুটে চলা ট্রেন দেখতে দেখতে মানুষও পাগল হয়ে যেতে পারে। কারণ কোনো মানুষ ১০ মাইলের বেশি গতি সহ্য করতে পারে না। সুখের কথা তাঁদের বক্তব্য ধোপে টেঁকেনি।

এবার আসি আমাদের দেশে রেল চলা প্রসঙ্গে।

ভারতে প্রথম ট্রেন চলেছিল ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল বম্বে থেকে থানে পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার পথে। বিকেল ৩-৩০-এ প্রায় ৪০০ অতিথি-যাত্রী নিয়ে বম্বে থেকে প্রথম ট্রেন ছেড়েছিল। ট্রেন ছাড়ার আগে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়েছিল। সেদিনটা সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল।

বম্বের আগে হাওড়া থেকেই ট্রেন চলার কথা ছিল। কিন্তু দুটি বিপত্তির দরুন হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়া পিছিয়ে যায়। প্রথমতঃ এইচ. এম. এস. গুডউইন নামে যে জাহাজটি ইংল্যান্ড থেকে ট্রেনের কামরা নিয়ে আসছিল, সেটি বালির চড়ায় আটকে যায়। আর যে জাহাজটি ইঞ্জিন নিয়ে আসছিল, সেটি পথ ভুল করে ভারতে আসার পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়া চলে যায়।

তাছাড়া রাজনৈতিক সমস্যাও দেখা দিয়েছিল। চন্দননগরে তখন ছিল ফরাসি রাজত্ব। তারা দাবি করল ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী

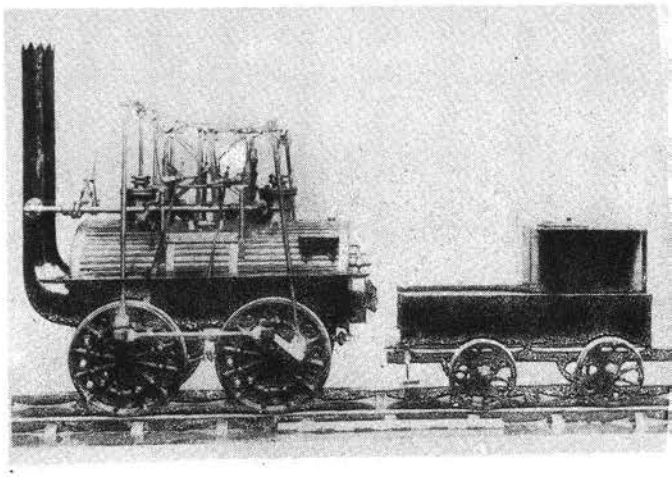

পৃথিবীর প্রথম ট্রেনের ইঞ্জিন জর্জ স্টিফেনসনের তৈরি লোকোমোশন নম্বর ওয়ান।

লাইন পাতার সময় তাদের এলাকা দখল করেছে। পরে অনেক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সে সমস্যার সমাধান হয়। আবার আশার আলো দেখা দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর চিফ ইঞ্জিনীয়ার জন হজসন স্থানীয় স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোম্পানীকে রেলের কামরা তৈরির অর্ডার দিলেন। তারা হাওড়া স্টেশনেই কামরা তৈরির কাজ শুরু করে দেন। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইঞ্জিনটি ফেরত আনারও ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৪ সালের প্রথম দিকে এইচ. এম. এস. ডেকাগ্রি নামে একটি জাহাজ ইঞ্জিনটিকে কলকাতায় নিয়ে আসে। ১৮৫৪ সালের ২৮ জুন পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়। এরপর সেই বছরেরই ১৫ আগস্ট সকাল ৮-৩০ মিনিটে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ট্রেন চলা শুরু হয়। ট্রেনটি সেদিন ২৪ মাইল পাড়ি দিয়ে হুগলি পৌঁছেছিল ৯১ মিনিটে। ট্রেনটিতে তিনটি প্রথম শ্রেণী, দু'টি দ্বিতীয় শ্রেণী, তিনটি ছাদবিহীন তৃতীয় শ্রেণীর কামরা ও একটি গার্ডের ব্রেক ভ্যান ছিল।

প্রথম ট্রেনের যাঁরা যাত্রী ছিলেন, তাঁদের যাত্রার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ থেকে

ইলেকট্রিক ইঞ্জিন।

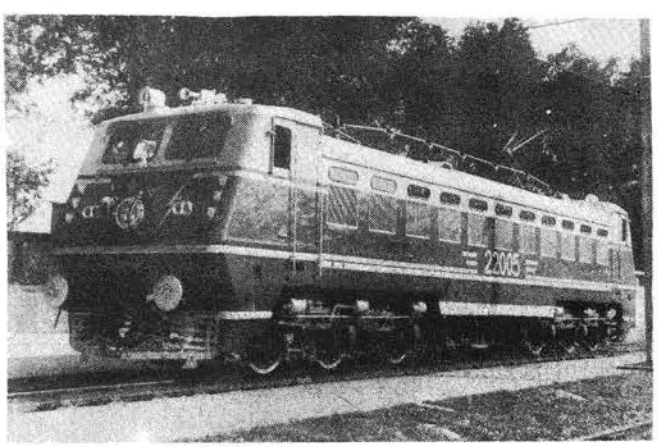

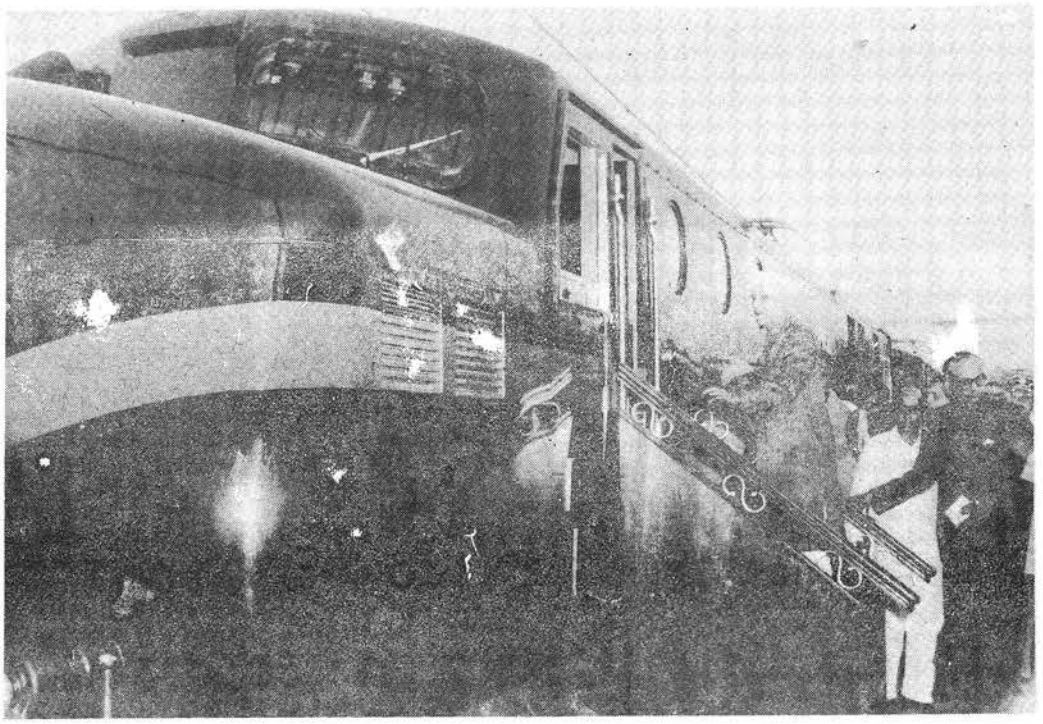

১৯৫৭ সালে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি যাত্রার উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু।

জানা যায়, রূপচাঁদ ঘোষ নামে চীনাবাজারের এক প্রতিষ্ঠিত সুগন্ধ ব্যবসায়ী হুগলীতে নেমেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, এত সত্বর পৌঁছে গেছেন। তিনি হুগলি স্টেশনে নেমে সকলকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন সত্যিই সেই এলাকাটি হুগলি কিনা। পণ্ডিত রাধাশঙ্কর ব্যানার্জি নামে এক জ্যোতির্বিদ বহু গণনার পরে যদিও প্রথম ট্রেনের যাত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু ফেরার পথে তিনি আর ওই 'আগুনে যান'-এ উঠতে চাননি। কারণ তাঁর ধারণা, অত্যধিক গতির ফলে তিনি অকালেই মারা যাবেন। সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটেছিল মিস্টার জোনস নামে এক ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে। ট্রেনে চড়ার পর থেকে তিনি এমন গতি-পাগল হয়ে গিয়েছিলেন যে, পরে একদিন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটবার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘোড়াটাকে ক্রমাগত চাবুক মারতে মারতে মেরেই ফেললেন।

পুরানো শিয়ালদা স্টেশন

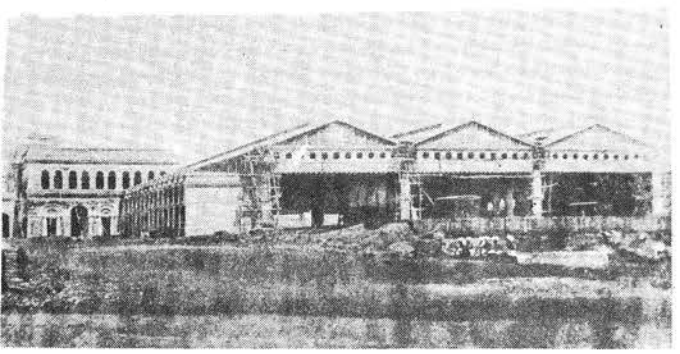

এরপরে ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও ক্রমে রেলওয়ের প্রবর্তন হলো। মাদ্রাজ থেকে ওয়ালাজা রোড (পরবর্তীকালে নাম হয় আরকট) পর্যন্ত ট্রেন চলা শুরু হয় ১৮৫৬ সালের ১ জুলাই। উত্তর ভারতে এলাহাবাদ থেকে কানপুর পর্যন্ত ১১৯ মাইল দীর্ঘ রেলপথের সূচনা হয় ১৮৫৯ সালের ৩ মার্চ। এর তিন বছর বাদেই অমৃতসর-আতারি শাখায় ট্রেন চলা শুরু হয়। ক্রমে রেল লাইন প্রসারিত হয়ে বর্তমানে বিস্তৃত হয়েছে আসমুদ্রহিমাচল।

ভারতে ট্রেন চলার আগে অন্যান্য দেশে ট্রেন চলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সে প্রথম ট্রেন চলে ১৮২৯ সালে, জার্মানিতে ১৮৩৫ সালে, হল্যান্ড ও ইটালিতে ১৮৩৯ সালে, স্পেনে ১৮৪৮ সালে। রাশিয়াতে ট্রেন চলা শুরু হয় ১৮৩৭ সালে। আমেরিকাতে বাল্টিমোর থেকে ওহিও পর্যন্ত ১৫ মাইল দীর্ঘ লাইনে ঘোড়ায় টানা ট্রেন চলত। ১৮৩০ সালের মে মাসে ওই লাইনে স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহার শুরু হয়।

শুধু নতুন রেল লাইনের পত্তনই নয়, প্রচলিত রেল ব্যবস্থাকে উন্নত করার কাজও সমান তালে গোড়া থেকেই চলে আসছে। কী করে রেলব্যবস্থা আরো আধুনিক করা যায়, অর্থাৎ আরো গতিবহুল ও যাত্রা স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়, তার প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত।

প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলা শুরু হয় ১৮৮৩ সালের ৩ আগস্ট দক্ষিণ ইংলন্ডের ব্রিটন-এ, সমুদ্রতীর বরাবর স্বল্প দূরত্বে ন্যারো গেজ ট্রেন চলা দিয়ে। অবশ্য তার আগে ১৮৭৯ সালে বার্লিনের ট্রেড এক্জিবিশনে আর্নস্ট ভন সাইমেন বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানো প্রদর্শন করেছিলেন।

এরপরে পৃথিবীর প্রথম বৈদ্যুতিক টিউব রেল চালু হয় ১৮৯০ সালে লন্ডন সিটি আর সাউথ লন্ডনের মধ্যে। ১৮৯৩ সালে

'লিভারপুর ওভারহেড রেলওয়ে' নামে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে চালু হয়।

ভারতে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে ১৯২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বোম্বে ভি টি থেকে কুরলার মধ্যে। মাদ্রাজে চলে ১৯৩১ সালে। হাওড়া থেকে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে ১৯৫৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর হাওড়া থেকে শেওড়াফুলি পর্যন্ত। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেই শুভযাত্রার উদ্বোধন করেছিলেন।

স্টিম ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ছাড়া আর যে ধরনের ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তা হলো ডিজেল। উল্লেখ্য, স্টিম ইঞ্জিনের স্বর্ণযুগেই ডিজেল ইঞ্জিন নির্মিত হয়েছিল। ১৯১২ সালে নর্থ ব্রিটিশ লোকোমোটিভ কোম্পানী ১০০০ হর্স পাওয়ারযুক্ত প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি করে। পরের বছর মেলেরস্টা সোডেরম্যানল্যান্ডস শাখায় এ্যাটলাস ডিজেল ইলেক্ট্রিক রেল কার চালু হয়। ১৯২৪ সালে জার্মানিতেও ডিজেল ইঞ্জিন শান্টিং-এর কাজে ব্যবহার শুরু হয়। ক্রমে অন্যান্য দেশেও ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ ও ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে ভারতে প্রথম ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা থেকে আনা ডিজেল ইঞ্জিনগুলি তখন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুরে ব্যবহৃত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে মেট্রো রেলের কথা না বললে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে ভবানীপুরের মধ্যে মেট্রো রেল চলাচল শুরু হয়। পরে ওই বছরেই ১২ নভেম্বর দমদম ও বেলগাছিয়ার মধ্যে এবং ভবানীপুর থেকে সম্প্রসারিত হয়ে ১৯৮৬ সালের ২৮ এপ্রিল এসপ্ল্যানেড থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো চলছে। উল্লেখ্য, ভারতের মধ্যে একমাত্র কলকাতা শহরেই মেট্রো বা পাতাল রেল চলছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে জোরে ট্রেন চলে কোথায়? তার উত্তরে জানাই, গতির দিক থেকে বর্তমানে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ফ্রান্স। সেখানে বর্তমানে ঘণ্টায় ৫০১ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চলার ব্যবস্থা আছে। তারপরেই হচ্ছে জাপান ও জার্মানি।

ছবি : লেখক

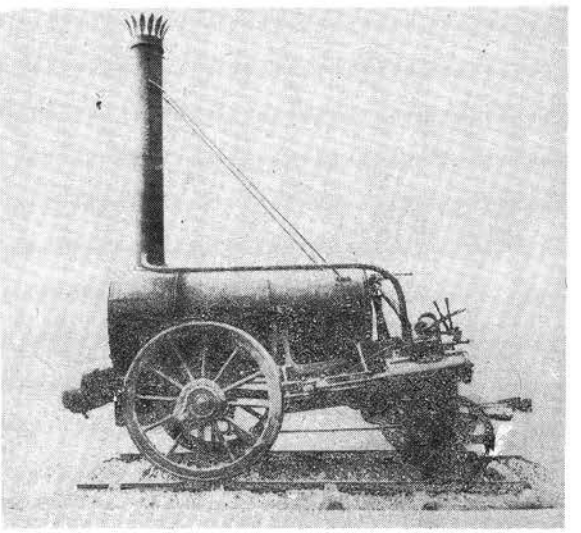

প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন রকেট। এটিও তৈরি করেন জর্জ স্টিফেনসন।

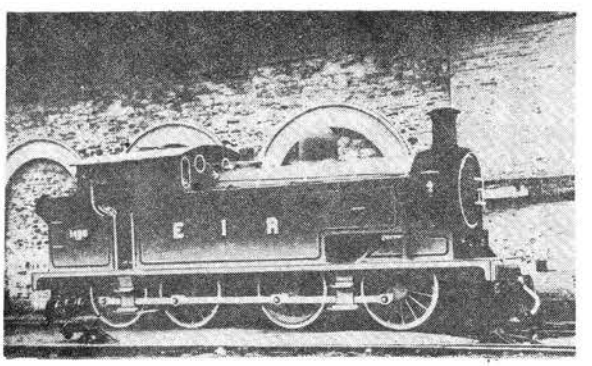

বহু পুরানো ইঞ্জিন। এর স্থান এখন যাদুঘরে।

ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের প্রথম যাত্রা হাওড়া থেকে হুগলী।

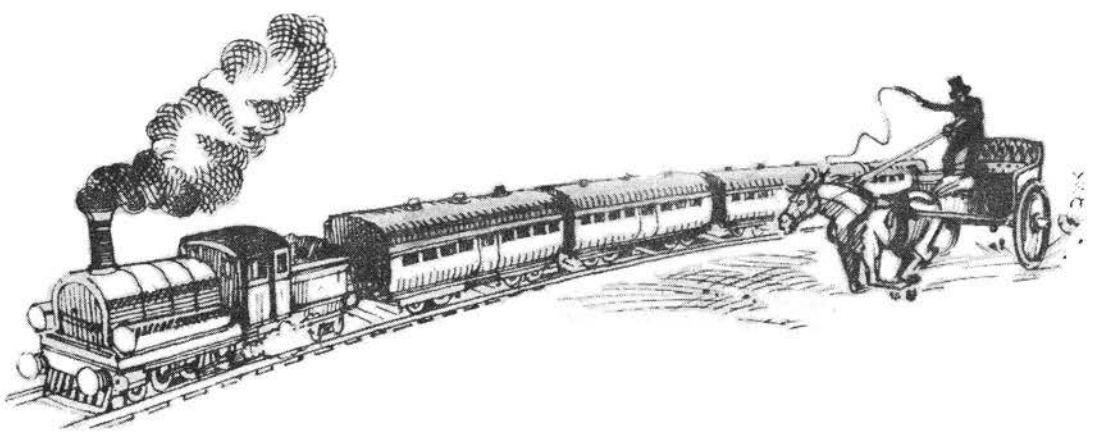

হত্যা থেকে রহস্য

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

স্যায়েমিজ ক্যাট, শ্যামদেশীয় বিড়াল? ইয়েস, মিঃ সাক্সেনা, আমার কাছে পাবেন। এ ধরনের বিড়াল এখন পৃথিবী থেকে বিলুপ্তির পথে। রেয়ার ভেরাইটি—বলতে বলতে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন হরিবাবু। কলকাতার হ্যারি এন্ড কোম্পানির মালিক হরিশঙ্কর সাহা, নামকরা অ্যানিমেল সাপ্লায়ার।

তিনি বলে চলেন, মিঃ সাক্সেনা, শুধু বিড়াল কেন, যে কোনো ধরনের জীবজন্তু সাপ্লাই করা আমার বিজনেস। গবেষণার কাজে লাগে। বাঘের বাচ্চা, সিংহের ছানা, ময়াল সাপ, ভালুক, পায়রা, খরগোশ সবই পাবেন। আমার লাইসেন্স আছে।

নিজের অফিস ঘরে বসে বলতে বলতে থামেন হরিবাবু। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মিঃ সাক্সেনার দিকে। লছমনপ্রসাদ সাক্সেনা এন আর আই, নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান। থাকেন বিদেশে। কিন্তু কি করে জানলেন এই স্যায়েমিজ বিড়ালের কথা? এ বিড়াল অনেক কষ্টে যোগাড় করেছেন হরিবাবু সেই থাইল্যান্ড এমবাসী থেকে। ছোট্ট এইটুকুন দেখতে। লোমে ঢাকা নরম তুলতুলে শরীর। সহজেই পোষ মানে। একটু আদর করলেই কোলে, বুকে,পিঠে উঠে বসে। নামতে চায় না। বিড়ালটার প্রতি মায়ায় জড়িয়ে গেছেন। আদর করে ডাকেন শ্যামা। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, এই বেড়ালটার জন্যে ছুটে এসেছেন সেই হংকং থেকে? কিন্তু কেন?

বাংলা ১২৬৫ সালে (১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ) সম্পাদিত এক দলিলে হাতের ছাপ— তখনও সঠিক ব্যাখ্যা মেলেনি।

ইয়েস মিঃ সাহা, লছমনপ্রসাদের মুখে রহস্যের হাসি। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার মশাই, শখ। কুয়েতের রাজার অর্ডার স্যায়েমিজ ক্যাট চাই। আমি কিন্তু আপনার মতোই অ্যানিমেল সাপ্লায়ার, বিদেশে ব্যবসা। লন্ডন বেস্ড কোম্পানি। কুয়েতের রাজা আমার পার্সোনাল ফ্রেন্ড। ইয়ার বিফোর লাস্ট সিংহের বাচ্চা সাপ্লাই করেছিলাম। দু'দু খানা। এখন সেগুলো পোষমানা বিড়ালের মতো রাজবাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

বলতে বলতে চোখ দুটো বন্ধ করলেন সাক্সেনা। রিভলভিং চেয়ারে দোল খান, মৃদু মৃদু হাসেন। ধোপদুরস্ত পোশাক। কাঁচাপাকা চুল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। টকটকে ফর্সা চেহারা। পেটানো স্বাস্থ্য। মুখের রেখায় বয়সের আঁকিবুকি। হাতের আঙুলে হীরের আংটি। সোনার কেস খুলে সিগ্রেট বার করে ধরালেন। রিমলেশ দামী চশমা খুলে টেবিলে রাখেন। অ্যাসট্রে এগিয়ে দেন হরিবাবু। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

অবাক হবার কথাই বটে। দোকান খুলতে না খুলতেই এসে হাজির মিঃ লছমনপ্রসাদ সাক্সেনা। হ্যারি এন্ড কোম্পানির মস্ত বড় কারবার। কলকাতার এই প্রান্তে বিরাট বাড়ি। একতলায় অফিস ঘর, দোতলা তিনতলায় অ্যানিমেল হাউস। বলতে গেলে চিড়িয়াখানা। জীবজন্তুতে ঠাসা। চারতলায় থাকেন মালিক হরিশঙ্কর সাহা। অনেক দিনের ব্যবসা।

মিঃ সাক্সেনা বলে চলেন, ইন্ডিয়ায় বছরে দুবার আসি। বেনারসে মা থাকেন, দেখা করতে আসতে হয়। এখানে আসার মুখেই রাজার চিঠিটা হাতে এলো। তখনই মনে পড়ল আপনার কথা। বিদেশেই জেনেছিলাম স্যায়েমিজ ক্যাট আপনার কাছে আছে।

হরিবাবু অবাক, কী করে জানলেন? কার কাছে শুনলেন?

সে অন্য এক কাহিনী। দুবাইতে ব্যবসার খাতিরে গেছি ,ওরাং ওটাং সাপ্লাই-এর অর্ডার ছিল। গুপ্তা সাহেবের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। একই হোটেলে ছিলাম আমরা। পাশাপাশি ঘর। গুপ্তা সাহেবকে নিশ্চয়ই চেনেন। সেই শিউনন্দন গুপ্তা, ডায়মন্ড মার্চেন্ট, ধানবাদের লোক। হীরে জহরতের কারবার। উনিই বলেছেন।

মিঃ গুপ্তার কথা শুনে আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলেন হরিবাবু। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে পড়ল সারা চোখেমুখে।

লছমনপ্রসাদ তা যেন ধরতে পারেন, দুঃখ পাবার কিছু নেই হরিবাবু। আই অ্যাম সরি। জানি মিঃ গুপ্তা আপনার বিজনেস পার্টনার,

শব-ব্যবচ্ছেদ (পোস্টমর্টেম) রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ বোঝা যায়।

ক্লোজ ফ্রেন্ড। কিন্তু কি করবেন বলুন? অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট।

হ্যাঁ, দুর্ঘটনা। ভাবলে শিউরে ওঠেন এখনও হরিবাবু। গুপ্তা সাহেবের ব্যবসা সারা দেশ জুড়ে। মাঝে মাঝে ব্যবসার খাতিরে কলকাতায় আসতেন। এখানে ফ্ল্যাট আছে, গাড়ি আছে। আর যা রাস্তাঘাট! কতদিন গাড়ি চালাতে বারণ করেছেন হরিবাবু। শিউনন্দন শোনেননি। মাস ছয়েক আগে বারাসাতের কাছে বৃষ্টিভেজা রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট। ব্রেক ফেল করে গাছে ধাক্কা, ব্যস। তোবড়ান গাড়ি উল্টে গিয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। ঝলসানো মৃতদেহটা অনেক কষ্টে সনাক্ত করেছিলেন হরিবাবু। অত গভীর রাতে বারাসাতের দিকে কেন গেছলেন গুপ্তা সাহেব এখনও ভেবে পান না হরিবাবু। সব কেমন যেন রহস্যময়।

সে সব কথা ভেবে চোখে জল আসে হরিবাবুর। খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল গুপ্তা। এত বড় বিজনেস আমার, কত হেল্প করত। এখন নিজেকে মনে হয় নিঃসঙ্গ। বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

মিঃ সাক্সেনা ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখেন, মাই গুডনেস, ইট ইজ অলরেডি ইলেভেন। এখুনি আমাকে এয়ার লাইন্স অফিসে ছুটতে হবে হরিসাহেব। দিল্লীর ফ্লাইট ভোরবেলায়। প্লীজ, বেড়ালটা দেখি।

হরিবাবু বলেন, ভেরি সরি ভাইসাব। স্যায়েমিজ ক্যাটটা আমার খুব প্রিয়, আদর করে ডাকি শ্যামা। এ বিড়াল বিক্রির জন্য নয়।

প্লীজ, প্লীজ হরিবাবু, মিনতি ঝরে পড়ল সাক্সেনার গলায়, আপনি যা চান তাই দেব। দশ হাজার, পনের— চল্লিশ পর্যন্ত উঠতে রাজী আছি। অন্ততঃ রাজার কাছে আমার মুখটা থাকুক।

হরিবাবু অটল অনড়। বার বার মুখে একই কথা, এ বিড়াল হাতছাড়া করার নয়।

এবার মিঃ সাক্সেনা হো হো করে হাসলেন। আমাদের দুজনের একই বিজনেস, জীবজন্তু সাপ্লাই করি। সেমসাইড গেম খেলে কী লাভ হরিবাবু? ফিসফিস করে বলেন, বেড়ালটা জেনুইন তো? আসল স্যায়েমিজ ক্যাট না অন্য কিছু? আমার কাছে লুকিয়ে কি লাভ?

ক্ষেপে লাল হরিবাবু। আমার ব্যবসায় সততা আছে মিঃ সাক্সেনা, ঘোলকে দুধ বলে চালাই না। ওয়েট আ মিনিট, প্লীজ।

টেলিফোন তুলে চারতলায় কথা বলেন। নিচে নেমে এল বাহাদুর। হরিবাবুর কাজের লোক। সঙ্গে সেই স্যায়েমিজ ক্যাট, আদরের নাম শ্যামা। টেবিলে ছেড়ে দিল।

সাক্সেনার চোখে বিস্ময়। ইয়েস ইট ইজ জেনুইন। আসল স্যায়েমিজ। আদর করে বিড়ালের গায়ে হাত বোলান। নরম মসৃণ শরীর, তুলতুলে গা। চোখ দুটো বন্ধ করে সোহাগের আবেশে গর-গর করে শ্যামা। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে সুতোর মতো গায়ের নরম পশম লোম দেখতে থাকেন সাক্সেনা। দু-একটা পশম হাতে উঠে আসে।

হরিশঙ্কর সাহার রাগ বাড়ে। গায়ের লোম দু-একটা নিয়ে যান সাক্সেনাজী। পরে পরীক্ষা করে জানাবেন বিড়ালটা ঠিক কিনা। হ্যারি কোম্পানি ধাপ্পা দেয় না। শ্যামা কিন্তু বিক্রির জন্যে নয়।

মন খারাপ হয়ে গেল সাক্সেনার। আমারই লাক খারাপ। বড় শ্বাস ফেলেন। থাক, শ্যামা আপনারই থাকুক। আজ উঠি হরিবাবু। কাল দিল্লীতে অনেক কাজ। এক ডজন পায়রার অর্ডার দেওয়া আছে। সেগুলো কুয়েতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

হরিবাবু বলেন, পায়রার জন্যে দিল্লী কেন, যে কোনো ধরনের

মাইক্রোস্কোপের তলায় যেমন দেখায়

(১) মানুষের চুল (২) বিড়ালের লোম (৩) পশমের সুতো

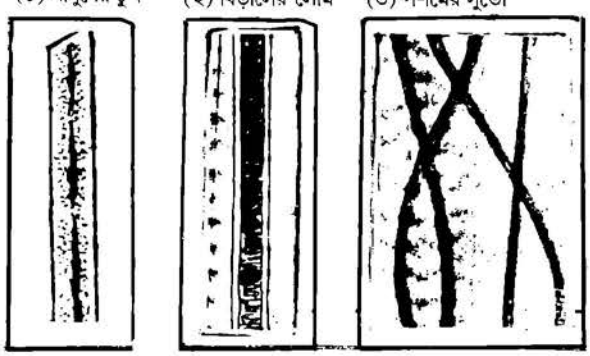

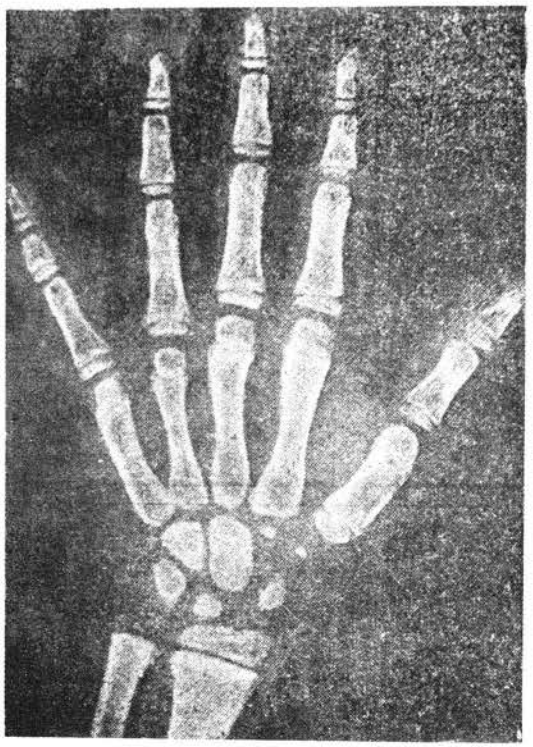

এক্সরেতে সঠিক বয়েস ধরা পড়ে— ছবিটা নিহত এক বালকের, বয়েস প্রায় নয়।

পায়রা আমার কাছেই পাবেন।

না হরিবাবু, পাবো না। আমার শিক্ষিত পায়রার দরকার। ডাকহরকরা পায়রা। পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে দিলে উড়ে যায়, পৌঁছে যায় ঠিক জায়গায়। ডাক দেওয়া নেওয়া করে। গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী আর ফ্রান্সের যুদ্ধে পায়রা দারুণ কাজ করেছিল। নিয়মিত খবর পৌঁছে দিত শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে। নেপোলিয়নের অনেক পায়রা ছিল ঠিক এরকমই। ভারতে কোথাও কোথাও এখনও ডাক পৌঁছে দেয় পায়রা। ট্রেনিং চাই হরিবাবু। এ সবই ট্রেনড পায়রা।

লছমনপ্রসাদের কথা শুনে অবাক হয়ে যান হরিশঙ্কর। ঠিকই বলেছেন সাক্সেনা। পায়রাদের শেখানো চাট্টিখানি কথা নাকি! কিন্তু এ পায়রা সাক্সেনার কেন দরকার বুঝতে পারেন না।

সাক্সেনা বলেন, ঐ যে বলেছিলাম রাজার শখ, ঠিক তাই। গণ্ডগ্রামে মাঝে মধ্যে ছুটি কাটাতে যান আমার বন্ধু রাজাসাহেব। সেখানে বিজ্ঞানের যন্ত্রণা নেই, গাড়ি নেই, লাইট নেই। অরণ্যের পাশে সাধারণ কুটিরে রাজা থাকেন। দিন রাত বিশ্রাম নেন। তখন রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ বলতে পায়রা। ওরা পোস্টম্যানের কাজ করে। ছোট্ট থলিতে পায়ে চিঠি বাঁধা থাকে, শহরে উড়ে যায়, আবার অনেক দূর সেই রাজধানী থেকে খবর নিয়ে ফিরে আসে।

লছমনপ্রসাদ সাক্সেনা আরেকটা সিগ্রেট ধরান। ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে থাকেন।

সাক্সেনার হাসি দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় হরিবাবুর। আচ্ছা, সাক্সেনা ভেবেছটা কি? হ্যারি এন্ড কোম্পানি এত বড় প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের পায়রা এখানে নেই বুঝি? দিল্লীতে শুধু মেলে?

বলেন, আমার কাছে বেস্ট কোয়ালিটির শিক্ষিত পায়রা পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারকমে দোতলায় কথা বলেন হরিবাবু। ওখানে জীবজন্তুতে ভর্তি। খাঁচা ভর্তি পায়রা নিয়ে নেমে এল বাহাদুর।

দেখি দেখি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মিঃ সাক্সেনার। খাঁচা থেকে একটা পায়রা বার করেন। ঠোঁট দেখেন, চোখ আর পা দেখে, গলায় হাত বুলোন। না হরিবাবু, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। গলায় ছোট্ট ছোট্ট ঘুঙুর ঘণ্টা বাঁধা যাবে না।

তার মানে?

মানে আপনিও জানেন হরিবাবু। ঘুঙুর গলায় বাঁধা না থাকলে শিকারী বাজ পেছনে লাগে। ওদের মেরে ফেলে। বাতাসে ঘুঙুরের শব্দে বাজপাখি ভয় পায়—পালায়।

সোল্লাসে মিঃ সাক্সেনার হাত দুটো চেপে ধরেন হরিবাবু। গুড, ভেরী গুড। আপনি পরীক্ষায় পাশ। দেখতে চাইছিলাম জেনুইন লোক কিনা, পাখি সম্বন্ধে আইডিয়া কেমন? একটু বাজালাম। প্লীজ ডোন্ট মাইন্ড। অপরাধ নেবেন না।

না, মোটেই না। অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েন মিঃ সাক্সেনা। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি এই আর কি। আমি চলি ডালে ডালে, আপনি মশাই পাতায় পাতায়।

পকেট থেকে পাসপোর্ট বার করেন। দেখে নিন হরিবাবু, পাসপোর্ট। আমার ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট। ভাল জাতের পায়রা দিন, হংকং বাংলাদেশ ঢাকায় নিয়ে ছেড়ে দিলে যাতে কলকাতায় আসতে পারে। আমার আপনার কমন ফ্রেন্ড ডায়মন্ড মার্চেন্ট গুপ্তাজীর কাছ থেকে সবই শুনেছি। বারাসাতের কাছে পায়রাকুঠিটা আপনার। ওখানেই পায়রাগুলো ফিরবে হংকং থেকে, ঢাকা থেকে চিঠি নিয়ে। আবার ফিরে যাবে দরকার মতো। কি ঠিক বলিনি?

পায়রাকুঠি...বারাসাত...গুপ্তাজী...অ্যাক্সিডেন্ট...ঝলসানো ... মৃতদেহ...হঠাৎ কি ভেবে শিউরে ওঠেন যেন হরিবাবু। অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, না না।

অ্যাক্সিডেন্ট না মার্ডার? দুর্ঘটনায় মৃত্যু না খুন? বিখ্যাত ডায়মণ্ড মার্চেন্ট শিউনন্দন গুপ্তার কেসটা যেন অদ্ভুত। ঝলসানো মৃতদেহ, দোমড়ানো গাড়ির মধ্যে দলা পাকানো ডেডবডি। সাদা চোখে মনে হয় দুর্ঘটনা। সত্যি কি তাই?

আর অত রাতে বারাসাতের ভাঙা পোড়োবাড়ির কাছে কেন গেছলেন গুপ্তা সাহেব? ঐ বাড়িটাকে সকলে বলে পায়রাকুঠি। শ'য়ে শ'য়ে পায়রার আস্তানা। মালিক হ্যারি এন্ড কোম্পানির হরিশঙ্কর সাহা।

হরিবাবুর অফিসে সেদিন সাতসকালেই এসে হাজির রতনবাবু। রতনলাল মুখার্জি। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পুলিশ অফিসার।

পুলিশ! পুলিশ কেন? দোকান না খুলতে খুলতেই যতসব ঝুট ঝামেলা। হরিবাবু হতবাক।

ওয়াকিটকি আর টেপ রেকর্ডারটা টেবিলে রেখে চেয়ারে বসলেন রতনবাবু। বললেন, আপনার বন্ধু মিঃ গুপ্তা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই হরিবাবু। সরি টু ডিসটার্ব ইউ। আপনি জানেন কি না জানি না। কেসটা অ্যাকসিডেন্ট নয়, মার্ডার।

মার্ডার! খুন! আকাশ থেকে পড়েন হরিবাবু। কি বলছেন আপনি? খুনী কে?

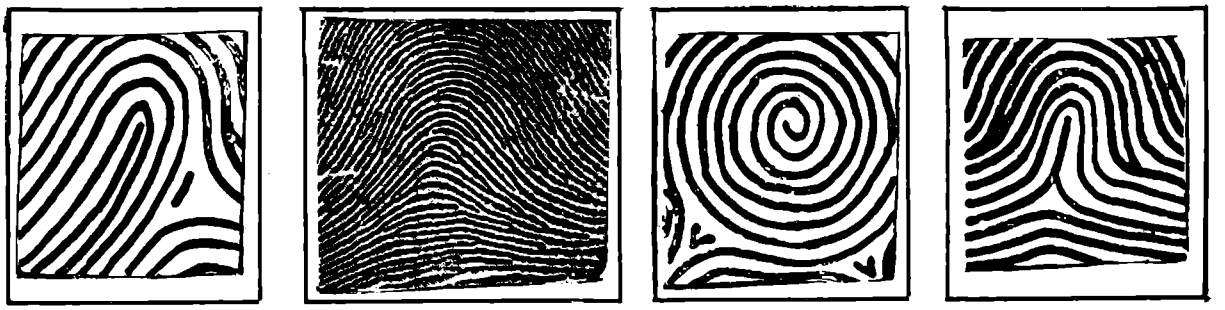

আঙুলের ছাপ থেকে অপরাধী ধরা যায়। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মেলে না

টেবিলের গ্লাসে জল ঢাকা ছিল। হরিবাবু জলে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন। কেমন যেন নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

ততক্ষণে টেপরেকর্ডারটা চালু করে দিয়েছেন রতনবাবু। ওয়াকি টকি অন করে বললেন, মিঃ সাক্সেনা প্লীজ। আপনি একবার আসুন। ওভার।

হাতে একটা ভাঁজ করা কালো কোট আর কালো রঙের ব্রিফ কেস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ সাক্সেনা। টেবিলে ব্রিফকেসের উপর কোটটা রেখে রতনবাবুর পাশের চেয়ারে বসলেন।

আজ আবার সাক্সেনা কেন এল? কি দরকার? ভেবে কূলকিনারা পান না হরিবাবু। বলে উঠলেন, আপনি অদ্ভুত লোক দেখছি। পুলিশ নিয়ে যাচাই করতে এসেছেন, স্যায়েমিজ ক্যাট আসল কিনা, ডাক-হরকরা পায়রাগুলো নকল কিনা?

হাসেন সাক্সেনা। না, না হরিবাবু, ঘাবড়াবেন না। আপনার সবই আসল। আমি মানুষটা কিন্তু নকল। আমার নাম লছমনপ্রসাদ সাক্সেনা নয়, আমি আমি—বলতে বলতে মুখ থেকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর মাথার পরচুলা খুলে ফেললেন। আমি ভারত সরকারের গোয়েন্দা অফিসার, আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে বিদেশে হীরে জহরৎ পাচার করার অভিযোগ ছিল সেজন্য ছদ্মবেশে দিল্লী থেকে এসেছিলাম। আপনার কাছে অ্যানিমেল সাপ্লায়ার সাজতে হয়েছিল। ধরতে পারেননি। আমার আসল নামটা আর বললাম না, সাক্সেনা বলেই এখন জানুন না কেন।

চোখ মুখ কেমন যেন ভাবলেশহীন হরিবাবুর। গলা শুকিয়ে কাঠ।

সাক্সেনা বললেন, হীরে পাচার করার অদ্ভুত এক কায়দা বার করেছিলেন গুপ্তা সাহেব। বাংলাদেশ, হংকং, শ্রীলঙ্কা থেকেও হীরে আসতো। পায়রার পায়ে বাঁধা থাকতো ছোট্ট থলি, তার মধ্যে হীরে। কলকাতার পায়রা ঠিক চলে আসতো দিক গুনে, পথ চিনে। আপনার পায়রাকুঠিতে।

রতনবাবু বললেন, কাল রাতেই পায়রাকুঠি আমরা সার্চ করেছি হরিবাবু। সাক্সেনাজী সঙ্গে ছিলেন। অত পায়রার মধ্যেও গলায় ঘুঙুর বাঁধা পায়রা চিনতে অসুবিধা হয়নি আমাদের। ছ'টা হীরে উদ্ধার করেছি। প্রতিমাসে এই হীরে কালেক্ট করতেই গুপ্তাজী আসতেন। আপনার বন্ধু মারা যাবার পর এই ব্যবসাটা পুরোই এখন আপনার। মাস ছয়েক আগে মিঃ গুপ্তার সঙ্গে আপনি ছিলেন, ঠিক তার শেষ দুর্ভাগ্যজনক দিনে।

ফোঁস করে উঠলেন হরিবাবু, মিথ্যে কথা। গত বছরখানেক ধরে গুপ্তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

আমাদের কাছে কিন্তু অন্য খবর আছে হরিবাবু। খুনের দিনে মিঃ গুপ্তার সঙ্গে এক গাড়িতে বেরিয়েছিলেন। তখন গভীর রাত। বারাসাতের পায়রাকুঠির দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন গুপ্তাজী। আপনি পাশে বসে। পায়রাকুঠির কাছে খুন হয়েছিলেন আপনার বন্ধু।

খুন খুন খুন— উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন হরিবাবু। টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললেন, মিথ্যে সাজান মামলায়, সাজান কেসে আমাকে জড়াতে চান কেন আপনারা? কী উদ্দেশ্য আপনাদের?

সাজান মামলা, সাজান কেস! এবার হো হো করে হেসে উঠলেন সাক্সেনা—অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু, পোড়া ঝলসানো মৃতদেহ—এগুলো সাজান হয়েছিল হরিবাবু, লোকের চোখে খুনটা ধামাচাপা দেবার জন্য। আপনাকে কিন্তু সাজান কেসে আমরা জড়াচ্ছি না। কী হয়েছিল শুনবেন সেদিন? মিঃ গুপ্তার সঙ্গেই খুনী ছিল, সঙ্গে ছিল গুপ্তাজীর ব্রিফকেস—ডায়মন্ড মানে মণিমুক্তোয় ভর্তি। গুপ্তাজীকে এক অসতর্ক মুহূর্তে গলা টিপে খুন করা হয় পায়রাকুঠির পাশে। ব্রিফকেস খুলে সব হীরে হাতিয়ে নেয় খুনী। তারপর কি হলো জানেন? গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গাছের দিকে সজোরে চালিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে খুনী। মস্ত বড় গাছটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গিয়েছিল আপনাদের ফিয়েট গাড়িটা। আগুন ধরে জ্বলে উঠেছিল দাউ দাউ করে। লোকে দেখতে পেল ঝলসানো, পোড়া মৃতদেহ।

মুখে কথা নেই হরিবাবুর। এসব যেন কিছুই শুনছিলেন না। চোখে অর্থহীন এক শূন্য দৃষ্টি।

মিঃ সাক্সেনা টেবিল থেকে কালো ব্রিফকেসটা নিয়ে ডালা খুলে হরিবাবুর দিকে মেলে ধরেন। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, এই ব্রিফকেসটা আপনি নিশ্চয়ই চেনেন হরিবাবু। ফায়ার প্রুফ ব্রিফকেস গাড়িতে ছিল। এটা পোড়েনি। আর এর ভেতরেই খুনীর আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি।

হরিবাবু চুপ।

এবার নিজের পাসপোর্টটা বার করে দেখালেন মিঃ সাক্সেনা। এটা নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন, আমার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট—নকল। এটা একটা বিশেষ কাগজে তৈরি। আপনি কাল এটা হাতে নিয়ে আমার ফটো দেখছিলেন। আপনার আঙুলের ছাপ এই পাসপোর্ট থেকে পেয়েছি।

হরিবাবু মিইয়ে যাওয়া গলায় বললেন, আঙুলের ছাপ পেয়েছেন তাতে হয়েছে কি? কি লাভ আপনার?

একটা হিমশীতল দৃষ্টি মেলে ধরেন মিঃ সাক্সেনা। আপনার আঙুলের ছাপের সঙ্গে খুনীর আঙুলের ছাপ মিলে গেছে হরিবাবু।

পৃথিবীতে দুটো ছাপ কখনও এক হয় না, মেলে না। জন্ম থেকেই আমরা আলাদা আলাদা ছাপ নিয়েই বেড়ে উঠি।

একটানা কথা বলে থামলেন মিঃ সাক্সেনা, গোয়েন্দা অফিসার। ঘরে সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা। ফস করে লাইটারে সিগ্রেট ধরান সাক্সেনাজী। বাঁকা হাসি হাসেন। এর পরেও বলে দিতে হবে খুনী কে? আপনি কি বলেন একবার শুনতে চাই হরিবাবু।

চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে হরিবাবুর। আর্তনাদ করে ওঠেন, তার মানে বলতে চান আমিই খুনী?

এবার মুখ খোলেন রতনবাবু। না, আমরা বলবার কে? যা বলবার আদালত বলবেন, জজসাহেব বলবেন। টেবিলে রাখা ব্রিফকেসের সঙ্গে কালো কোটটা সামনে ধরেন রতনবাবু, এটা নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন। আপনার বন্ধুর কোট। মিঃ গুপ্তার ফ্ল্যাট সার্চ করে আমরা পেয়েছি। এই দেখুন এই বোতামটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটা সাদা পশমের মতো সুতো। ফরেনসিক এক্সপার্টরা কী বলেছে জানেন। এটা সুতো নয়, দুর্লভ এক বেড়াল, স্যায়েমিজ ক্যাটের গায়ের লোম। বিড়ালটা আপনার বন্ধুরও খুব প্রিয় ছিল। উনি প্রায়ই এখানে আসতেন। কোটের লোম তার প্রমাণ। এই নরম লোমই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল হরিবাবু। এই সূত্র ধরেই এগিয়েছি। মিঃ সাক্সেনা সেজে গোয়েন্দা অফিসার কাল আপনার কাছে এসেছিলেন। কুয়েতের রাজার গল্পে পায়রার কথায় বোকা বনে গিয়েছেন।

হরিবাবু গর্জে উঠলেন, চোখ দুটো রাগে জ্বলছিল, মিঃ সাক্সেনা একজন ঠগ, জোচ্চর, প্রতারক—আমি মামলা করবো। মিথ্যে পরিচয় দিয়েছেন, উনি ধাপ্পাবাজ।

চুপ করুন হরিশঙ্করবাবু, ধমকে উঠলেন পুলিশ অফিসার রতনলাল মুখার্জি। ছিঃ ছিঃ, নিজের বিজনেস পার্টনারকে হীরে জহরতের লোভে খুন করতে আপনার বাধল না মশাই? ধর্মের কল বাতাসে নড়ে হরিবাবু। চলুন এখন থানায় চলুন, বাকিটা আদালতে বলবেন। মহামান্য বিচারক জীমূত গুপ্ত নয়তো ভবেন বেরা সাহেবের কাছে এখন আপনার কেস—এঁরা দুঁদে জজ সাহেব। যা বলবার কাল সেখানে বলবেন।

তার মানে? লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হরিবাবু। পেছনের দরজার দিকে সরে গেলেন।

সাক্সেনার হাতে চকচকে রিভলবার। পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই মিঃ হরিশঙ্কর সাহা। সারা বাড়ি পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট—টেপ রেকর্ডারে আপনার সব কথাই আমরা ধরে রেখেছি।

টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিলেন পুলিশ অফিসার রতনবাবু।

এবার অন্য কথায় আসি। হাজার বছর ধরে আঙুল বা হাতের ছাপ দলিল দস্তাবেজে গুরুত্ব পেয়ে আসছে। এর কারণ কেউ জানতো না। পৃথিবীতে সব মানুষেরই আঙুলের ছাপ আলাদা—অনেক গবেষণার পর এ কথা আবিষ্কার করেছিলেন স্যার উইলিয়াম হারসেল সেই ১৮৭৭ সালে। তখন তিনি এই বাংলাদেশের হুগলি জেলার বড় আই সি এস অফিসার। এই ছাপ থেকে অপরাধী ধরবার কৃতিত্ব কিন্তু সর্বপ্রথম কলকাতার পুলিশের। হ্যাঁ, সারা বিশ্বে কলকাতাই ফার্স্ট। ভাবলে গর্ব হয়।

শুধু ছাপ নয়, সমাজের শান্তি রক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা। তাঁদের সাহায্যে ধরা পড়ছে খুন থেকে খুনী। এক্সরে করে বলে দেওয়া যায় অপরাধীর আসল বয়েস, খুন, হত্যা না আত্মহত্যা, স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক মৃত্যু—সবই নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে বিশেষজ্ঞের চোখে। পোস্টমর্টেম অথবা শব-ব্যবচ্ছেদ রিপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসে আশ্চর্য সব অজানা তথ্য। জানা যায় অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুটা সত্যি সত্যি দুর্ঘটনা না সাজানো ঘটনা?

শুধু কি তাই? একটা ছোট সরু পশমের মতো সুতো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখে বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন আসলে সেটা কি। সেটা কি সত্যিকারের পশম, সুতো, মানুষের চুল না অন্য কোনো পশুর লোম। পশু হলে কোন পশু? বাঘ, সিংহ, কুকুর না দুর্লভ কোনো প্রাণীর, যেমনটা দেখেছি সেই গুপ্তা মার্ডার কেসের স্যায়েমিজ ক্যাটের বেলায়। এসব ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়।

পৃথিবীর যত বয়স বাড়ছে, বিজ্ঞান তত এগোচ্ছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যেন অপরাধ। অপরাধী আগের চেয়ে এই যুগে বেশি করে ধরা পড়ছে। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। উপনিষদ বলছেন, 'মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্'। লোভ করো না, ধনে আকাঙ্ক্ষা রেখো না। এ সম্পদ কার? তোমার নয়। সেজন্যেই হয়তো আমরা বলি, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'।*

* ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক

ব্যাঙের বিয়ে

ধূর্জটি চন্দ

এক যে ছিল বুড়ি, তার ছিল এক বুড়ো,
খেতে বসে লাগলো ঝগড়া নিয়ে মাছের মুড়ো।
বুড়ো বললো, 'আমি খাব', বুড়ি বললো, 'আমি'
কথায় কথায় হাতাহাতি ভাঙলো চশমা দামী।
বুড়ির ছোঁড়া ঢিলের লক্ষ্য এবার বুড়োর ঠ্যাং,
যেই না লাগা হাঁটু থেকে বেরিয়ে এলো ব্যাঙ।
ব্যাঙ বেরিয়েই বললো, 'আমার বিয়ের কনে কই?'
অবাক বুড়ি বিস্ময়ে কয়, 'দাঁড়িয়ে আছে অই!'
ব্যাং থপথপ চললো দূরের গরীববাবুর বাড়ি
তাঁর নাকি এক কন্যা আছে বিয়ের যোগ্য ভারি!
ব্যাঙ বাবাজী খুব হেঁকে কয়, 'কোথায় বিয়ের কনে?
থাকলে পরে এক্ষুণি যাই নিয়ে আমার সনে।'

ব্যাঙবাবাজীর বায়না শুনে গরীববাবুর কান্না
ব্যাঙের হাতে মেয়ে দিতে মোটেই তিনি চান না।
তাই না শুনে ব্যাঙবাবাজীর চোখ ছাপিয়ে জল
এক লহমায় আকাশে মেঘ, নামে বর্ষার ঢল।
এমন তুমুল বৃষ্টি জেনো কেউ দেখেনি আগে
গরীববাবুর মনে তখন একটা প্রশ্ন জাগে—
ব্যাঙকে ডেকে বলেন তিনি,'যাও নিয়ে যাও মেয়ে'
যেই না বলা রোদের প্লাবন নামল আকাশ বেয়ে।
বুড়িকে ব্যাঙ প্রণামী দেয় দুটো মাছের মুড়ো,
ঝগড়াটগড়া শিকেয় তুলে খুশি বুড়ি ও বুড়ো।
ভররোদ্দুরে বৃষ্টি হলে সেই থেকে সব জানে
ব্যাঙের বিয়ে হচ্ছে কোথাও, কেউ মানে, না মানে।

ছবি : সুফি

গাঁজাখুরি গল্প নয়

লীলা মজুমদার

॥ এক ॥

গোড়াতেই বলে রাখি গল্পের কোনো সত্যি মিথ্যা হয় না। সব গল্পই সত্যি তা আমাদের চেনা-দেখার মধ্যে হোক বা না হোক। আজ না হোক, তবু ১০০ বছর কিংবা ১০০০ বছর পরে যে হবে না, তাই বা কে বলবে? মোট কথা দাদু বলতেন এ সবই খাঁটি সত্যি।

তাঁর মুখে আমরা স্বর্গের গল্পও শুনেছি। নিশ্চয় বানানো এবং গাঁজাখুরি। কিন্তু যদি অমন জায়গা এই দুনিয়ার কোথাও থেকে থাকে আর হাতে খানিকটা সময় পাই, তা হলে খুঁজে দেখতে দোষ কি? কাঁহাতক রোজ রোজ শুধু বাড়ি আর স্কুল, আবার স্কুল আর বাড়ি!

বুঝতেই পারছ এ হলো বেশ কিছুদিন আগের কথা, যদিও তারিখটা ঠিক বলতে পারছি না। কোনো একটা ঐতিহাসিক ঘটনার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে, একটা সমাজোন্নয়ন প্রকল্প থেকে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সেই ঘটনার অকুস্থলে মিনি-মাগ্না নিয়ে যাওয়া হবে।

যাত্রীশালায় ১০ দিন থাকা হবে এবং তারি মধ্যে নিজের হাতের তেলোর মতো ঐ জায়গাটাকে চিনে রাখতে হবে। আরো বলা হলো, ঐ জায়গার ইতিহাস, ভূগোল, সেখানকার জীবনযাত্রা, লোক-কথা, অধিবাসীদের মনের কথা, সব জেনে আসতে হবে। তারপর ফিরে এসে প্রত্যেককে একটি করে বিবৃতি লিখতে হবে এবং ছয়জন সেরা লেখককে উপঢৌকন দেওয়া হবে। জান বোধ হয় উপঢৌকন মানে পারিতোষিক+উপহার।

দেখতে দেখতে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। চারুলতা, নন্দিতা, মিনতি আর কাদম্বিনী দিদিদের সঙ্গে যাবে রূপা, চাঁপা, গীতা, সীমা, ডলি, মিলি। ওদিকে হেরম্ব স্যার আর গোবিন্দ স্যারের সঙ্গে থাকবে ভূতো, ট্যাঁপা, জনি, ডিকি, কালু, নালু।

বসন্তকাল তখন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, শীত চলে গেছে, কিন্তু গরম পড়তে কিছু দেরি আছে। মামুলি পাহাড়-চড়ুয়াদের ভিড় জমতেও কিছু দেরি আছে। তারা যাবে অনেক উঁচুতে এবং অন্য পথে। তাদের হলো গিয়ে বড়লোকি ব্যাপার। আর এরা যাবে তার চাইতে আলাদা পথে, অন্য চুড়োর আড়ালে, কোনো এক রহস্যময় স্থানে, সায়েবসুবোরা যার কথা এখনো শোনেনি, এমন এক স্থানে। গোবিন্দ স্যারের ঠাকুরদা সেখানকার একজন বুড়ো লামার ভক্ত ছিলেন। তাঁর ডাইরিতে সেখানে যাবার পথ আঁকা আছে। সেখানে নাকি শান্তি আছে, শঙ্কা নেই। আরো কথা আছে।

আপনিই বা এই পথে এসেছিলেন কেন?

ওঁর বাড়ি তিব্বতে; ধর্ম বৌদ্ধ; কর্ম দুনিয়ার যত সব মানমন্দিরে; এই পাহাড়ের খাঁজে একটা নতুন মান-মন্দির হবে, তার অবস্থান ঠিক করতে এসেছেন—'

কাদম্বিনী দিদিমণি অবাক হয়ে বললেন, 'কি করে জানলি?' ভূতো ট্যাঁপা বলল, 'যে ভাবে সব কিছু জানতে হয়। ওঁকে জিগ্যেস করে।' কাদম্বিনী দিদিমণি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এতক্ষণ তো সবাই ছিলি কালা-বোবা, এখন যে বড় মুখে খই ফুটছে?'

ডলি মিলি বলল, 'একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য, জায়গার গুণ!' দিদিমণিরা বোবা বনে গেলেন। এরা তো ভারি বাচাল বনে গেছে!

এই সময়ে অতিথিশালার বুড়ো লামা এসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'খাবার দেওয়া হয়েছে। সেবা করতে আজ্ঞা হয়।'

সরু লম্বা বারান্দায় লম্বা লম্বা কাঠের বেঞ্চি পাতা। তার সামনে লম্বা কাঠের টেবিল। টেবিলে চাদর নেই। বড় বড় কাঠের বাটিতে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে চাল ডাল তরকারি গুঁড়ো-মসলা দিয়ে রান্না অতি সুস্বাদু খিচুড়ি ঢালা রয়েছে। চিনে মাটির চামচ দিয়ে খেতে হবে। চিনে মাটির পেয়ালায় চিনি ছাড়া গরম চা।

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'এখানকার লোকে বলে চিনি দিলেই চায়ের স্বাদ নষ্ট হয়।'

অনেকেরই অন্য মত। কিন্তু ক্লান্তিতে, শীতে, কেউ তর্ক করল না। আলাদা ঘরে ছেলেরা মেয়েরা বেড্ ব্যাগ পেতেই ঘুম।

॥ চার ॥

প্রাতঃরাশ শেষ করে গুম্ফার অতিথিরা সবে মাত্র উঠে রোদে ভরা পুবের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছাগল-চরুয়া ছেলেমেয়ের দল এসে হাজির। তারা যে খবর দিল সেটি খুব আশাপ্রদ নয়।

বড় রাস্তায় নাকি এমনি ধস নেমেছে যে, সেদিন তো নয়ই, পনেরো দিনের আগে কোনো গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে কি না সন্দেহ। ট্রাকগুলোও কোনো আঘাটায় আটকাল, নাকি গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পেরেছে, তাই বা কে জানে! আসলে এ সময়ে এই পথে আসাই ভুল।

কাদম্বিনী দিদিমণি উষ্ণকণ্ঠে কাশ্যপকে বললেন, 'আপনিই বা এই পথে এসেছিলেন কেন? আপনি তো বিশেষজ্ঞ। আপনি কিছু টের পাননি?'

ডঃ কাশ্যপ হো হো করে হেসে বললেন, 'সত্যি বলছি, আমার কোনো দোষ নেই। আমি গত দু'দিন ধরেই এই দিকে আছি। ও দিকে এখনো পা দিইনি। আমার কাজ মানমন্দিরের জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে দেখা। এমন জায়গা যেটা সাধারণত দুর্যোগের হাতের বাইরে থাকে। এই গুম্ফাটি পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে। দুর্যোগ আসে উত্তর থেকে। এই সব গুম্ফার বয়স হাজার বছরের বেশি। এরা এতটুকু টস্কায়নি। মোটরের রাস্তা পাহাড়ের উত্তর ঢাল ঘেঁষে চলেছে, যাতে সারা পথ কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ উপভোগ করা যায়। বাঃ রে! তার দাম দিতে হবে না! আমি একটু বেরসিক মানুষ দিদিমণি!'

সকলে হেসে ফেলল। 'এতও জানেন আপনি!' গোবিন্দ স্যার হেসে ফেললেন, 'ওঁর পৈত্রিক নিবাস এই গুম্ফার ওপাশে। উনি জানবেন না তো কে জানবে? হাজার বছরের বেশি ওঁর পূর্বপুরুষরা এখানকার বাসিন্দা।'

নন্দিতাদি অবাক হয়ে বললেন, 'তার আগে?' 'তার আগে ওঁরা বঙ্গভূমিতেই থাকতেন। হিন্দু রাজারা বৌদ্ধদের উপর খুব সদয় ছিলেন না। তাই রাতারাতি দেশত্যাগী হতে হয়েছিল। এই খুদে অধিত্যকায় ওঁরা নিরাপদে ছিলেন। চারদিকে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ওপার থেকে কিছু মালুম দেয় না। ডঃ কাশ্যপের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ জায়গায় বেশ কিছুদিন বন্দী হয়ে থাকলেও ওঁর আপত্তি নেই। কারণ এটি মানমন্দিরের পক্ষে আদর্শ জায়গা।'

বাস্তবিকই তাই। ছেলেমেয়েরা সবাই বিজ্ঞান পড়ে। নানা মানমন্দির তারা দেখেছে। বাস্তবিকই অদ্ভুত। নিজের দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে, দূর-দিগন্তের রহস্য স্পষ্ট করে দেখতে পাবে!

কাদম্বিনী দিদি বললেন, 'ভাগ্যিস দেখা যায়। তা না হলে এই পৃথিবীটার সব গলি-ঘুঁজি আর মাথার উপরকার আকাশটার সব তারা নক্ষত্র ইত্যাদি নিজের হাতের তেলোর মতো চেনা হয়ে গেলে, জীবনটা ভারি একঘেয়ে ব্যাপার হয়ে উঠবে! এমন কি সব কিছু ঘড়ি ধরে চলে, এতটুকু বৈচিত্র্য নেই। একটা পাঁজি খুলে বসলেই দেখা যায় তাতে সব লেখা আছে! ভেবেও

হাঁপ ধরে যায়!'

এ কথা শুনে ডঃ কাশ্যপ খুব হাসলেন। 'কি হলো দিদিমণি? দুনিয়ার সব চেনাজানা হয়ে গেছে মনে করে হতাশ হচ্ছেন বুঝি? ভয় নেই। আরো আছে। বইতে পড়েছি একবার স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা ঐ রকম কোনো মহাপুরুষ হিমালয়ের কোনো পাহাড়চুড়োয় তুমুল বরফ-ঝড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে যখন প্রাণের আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, ঠিক তখনি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রসন্ন মুখ, ফরসা রং, গেরুয়াধারী একজন সাধু নেমে এসে, তাঁকে হাত ধরে তুলে, প্রায় কোলপাঁজা করে, পথ দেখিয়ে, নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে, মৃদু হেসে, আবার বরফ-ঝড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছিলেন। কই, কোনো বিজ্ঞানের বইতে তো তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় না। এই পুরনো পৃথিবীটাতেই আমাদের এখনো অনেক চিনবার জানবার বাকি আছে।'

ছেলেমেয়েগুলো তখন তাঁকে পেয়ে বসল। 'আরো বলুন, দাদা, আরো রহস্যের কথা বলুন।'

ডঃ কাশ্যপ হাসলেন, 'তোদের বইতে তো অনেক কথা লেখা আছে। এই সুন্দর পৃথিবীটা নাকি আসলে সূর্যের জ্বলন্ত গা থেকে ছিটকে আসা একটা স্ফুলিঙ্গ বই তো নয়। বেরিয়ে এসেও কে জানে কেন সূর্যের আকর্ষণের বাইরে যেতে পারেনি। সেই ইস্তক কেবলই তার চারদিকে ঘুরছে। কখনো একটু কাছে আসছে, আবার নিয়ম ধরে কখনো দূরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মনে হয় একই বেগে, একই পথে, ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে একবার ঘুরে আবার পুরনো জায়গায় ফিরে আসছে। আর শুধু পৃথিবীটাই নয়, রাশি রাশি গ্রহ, শত শত উপগ্রহ সূর্যের চারদিকে কে জানে কবে থেকে দণ্ড পল ব্যতিক্রম না করে কেবলি ঘুরছে, কেন কে জানে।

তোমরা তো বিজ্ঞান পড়। বলতে পার এই সব নিয়ম কে বেঁধে দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল? শুধু তাই নয়; নানা রকম গাছ-গাছড়ার কথা পড় তোমরা। তাদের বিপত্তার জন্য কে এত রোঁয়া, কাঁটা, বিষের ব্যবস্থা করেছিল? প্রকৃতি? সে আবার কে? তাকে কেউ দেখেছে?

না দেখলেও এটা বোঝা যায় যে সে বড় দয়ালু। তা না হলে পিঁপড়েদের, উই-পোকাদের, মশা-মাছিদের নিরাপত্তার এমন সব সুন্দর ব্যবস্থা করে দিত না। জান, জোর বৃষ্টি পড়বার আগেই মাটির তলার বাসার বাসিন্দা পিঁপড়েরা ডিম মুখে করে দেয়াল বেয়ে, গাছ বেয়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেয়। কে তাদের এ বুদ্ধি দেয়?

একটা মৌচাকে দুটো রানী মৌমাছি জন্মালে, ওরা মানুষদের মতো খ্যাঁচাখেঁচি করে না। একজন দলবল ডিম ইত্যাদি নিয়ে উড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় চাক বাঁধে।

যেদিকে তাকাই, দেখি শুধু প্রশ্ন। তার উত্তর সাধারণ বিজ্ঞান দিতে পারে না। পরমাজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে, তাই দিয়ে চেষ্টা করা যায়।' এই অবধি বলে কাশ্যপ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থামলেন। বড়রা সব চুপ। ছেলেমেয়েগুলো ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, 'ও দাদা, অমন দুঃখ করবেন না। আমাদের পথ দেখিয়ে দিন, আমরা সব কাজ করে দেব। নিশ্চয় দেব।'

ডঃ কাশ্যপ ম্লান হেসে বললেন, 'আমাদের কাজের জন্য যে অনেক লক্ষ টাকা লাগবে, সে কোথায় পাবি? সরকার তার অর্ধেক দেবে। বাকিটা আমাদের যোগাড় করে নিতে হবে। কোথা থেকে যোগাড় হবে? আমরা কেউ তো বড়লোক নই। একটা মানমন্দির হবে ঐ টিলাটার মাথায়। পুবমুখী একটা মহাবিদ্যালয় আর ওপাশে একটা যাত্রীনিবাস। স্থানীয় গ্রামের লোকরা আমাদের প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী এনে দেবে। পাহাড়ে খাঁজে খাঁজে ওদের গাঁ আছে। ঢালের ওপিঠে পায়ে-চলা পথ দিয়ে ওরা পাহাড়তলিতে নেমে যায়। এদিককার লোকরা নিচে চাষবাস করে। সোনেরা নদীর জল শীতকালেও জমে না।

পাথরের চাঁই দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে দেবে এ-দেশের ঝানু কারিগররা। এখানকার এই গুম্ফাটা ঐ নিয়মেই এদের পূর্বপুরুষরা তৈরি করেছিলেন। হাজার বছরেও ওর গায়ে একটা আঁচড় পড়েনি। চারদিকের পাহাড়ে বরফ জমে শীতকালে। কিন্তু এখানে বরফ পড়ে না। আমাদের ঐ ছোট সোনেরা নদীটার জল বারো মাস একটু গরম মতো থাকে। এ নদীর জল কখনো জমে না। মনে হয় ওর উৎস হলো পৃথিবীর গায়ের একটা খাঁজের মধ্যেকার ছোট একটা ফাটলে। স্রোতের জল ছয় ঘণ্টা ধরে কমতে থাকে; কিন্তু শুকিয়ে যাবার আগে আবার ছয় ঘণ্টা ধরে বাড়তে থাকে। ভাবি নদীটার উৎস যেখানে, সেখানে গিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি।—'

তাই শুনে ছেলেমেয়েগুলো লাফিয়ে উঠল, 'আমরাও যাব দাদা, আমাদেরও নিয়ে চলুন।' একটু হেসে ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'এখানকার গাঁয়ের লোকরা বিদেশীদের হাতে অনেক কষ্ট পেয়ে পেয়ে এখন আর কাউকে সহজে ঢুকতে দেয় না। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ওদের গাঁয়ের পথে বিদেশীদের যাওয়া নিষেধ। বিষাক্ত তীর-ধনুক নিয়ে অব্যর্থ তীরন্দাজরা আড়াল থেকে অষ্ট প্রহর পাহারা দেয়। কোনো বিদেশী পার পায় না। প্রাচীন গুম্ফাটির শুনেছি মেলা ধনদৌলত। ওঁরা নানা জায়গায় অনাথ-আশ্রম, অবৈতনিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদির যাবতীয় খরচ দেন। যতই দেন, ততই নাকি ওঁদের ধন বেড়ে যায়।

গুজব শুনেছি উঁচু শৃঙ্গের আড়ালে ওঁদের লুকনো ঘাঁটি আছে; সেখানে ছোট প্লেন নামে। মন্দিরের পায়ের কাছে গরম জলের উৎস। তাতে কাউকে নামতে দেয় না। কিন্তু পাইপে করে নিয়ে তার জলে অনেকগুলো কুণ্ড ভরা থাকে। সেখান থেকে জল নিয়ে স্নান করে কত রুগী সেরে উঠেছে।'

গোবিন্দ স্যার বললেন, 'এ্যাঁ! কে বলেছে এত কথা?' ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'ইউরোপের সব চাইতে নামকরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি এখানে নিজে এসে দেখে গেছেন। —সে কথা থাক, এখন ছাগল-চরুয়ারা এলে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করা যেত।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে গেল। তাদের দিকে তাকিয়ে

এগিয়ে এসে বলল, আমি, স্যার।

ম্লান হেসে কাশ্যপ বললেন, 'কি রে বাপজানরা, আমাদের মানমন্দির আর যাত্রীনিবাস আর মহাবিদ্যালয়ের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কোথায় পাওয়া যায় জানিস? কাজ আছে, কর্মী আছে, খরচার টাকা নেই!'

ছাগল-চরুয়ারা বলল, 'কেন? সরকার আপনাদের মটর-গাড়ি দেয়, তাহলে টাকা দেবে না কেন?'

কাশ্যপ বললেন, 'ওদের টাকায় কুলোচ্ছে না। বল না একটা উপায় যদি জানিস!'

ছাগল-চরুয়ারা একবাক্যে বলে উঠল, 'পদম্‌বাহাদুর গুরুং জানে, স্যার।'

ডঃ কাশ্যপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'পদম্‌বাহাদুর? কে পদম্‌বাহাদুর গুরুং?'

ওদের দল থেকে একজন বেঁটে, ফরসা, হাসিমুখ, ট্যারা-চোখ ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি, স্যার।'

।। পাঁচ ।।

ডঃ কাশ্যপ এক গাল হেসে পদম্‌বাহাদুরের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তুই সব জানিস বুঝি? এতটুকু মানুষটি এত কথা শিখবার সময় পেলি কি করে? কোথায় থাকিস? তোর গার্জিয়ান কে?'

পাহাড়ের খাঁজের দিকে ছোট্ট একটা ফরসা আঙুল দেখিয়ে পদম্ হিন্দী ভাষায় বলল, 'শিউমন্দিরের আশ্রমে থাকি স্যার। আমার বুড়ো-দাদু ওখানকার ঘন্টিদার। ওঁর কাছে গেলে, যা কিছু চাইবেন সব পাবেন। আমি ওঁকে বলে দেব।'

ছেলেটার মিষ্টি কথা শুনে সবাই গলে গেল। গোবিন্দ স্যার সব ছেলেপুলেকে বেজায় ভালোবাসেন। পদম্‌বাহাদুরের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'মানমন্দিরের জন্য অনেক অনেক টাকা লাগবে যে বাপ্। তিনি সাধু মানুষ, কোত্থেকে দেবেন?'

পদম্ এক গাল হেসে বলল, 'কেন? শিউবাবার কাছে চেয়ে নেবেন।'

'সে কি রে? শিউবাবা টাকাকড়ি দেবেন?'

পদম্ জিব কেটে বলল, 'ছি! ছি! না, না, টাকাকড়ি দেওতারা ছোঁন না। ধন-রত্নও না। তাছাড়া টাকা-কড়ি মণি-মাণিক্যের তো তাঁর দরকার নেই। তিনি আপনাদের পাইয়ে দেবেন। ঠিক পথে চললে সবাইকে যেমন পাইয়ে দেন।'

কাদম্বিনী দিদিমণি অবাক হলেন, 'ভালো লোক খারাপ লোক, সবাইকেই দেন। তাঁর কাছে সবাই সমান। তবে নিয়ম মানতে হবে।'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'তা নিয়মটা তো তিনি বলে দেবেন। তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে চল।'

পদম্ গম্ভীরমুখে বলল, 'তা তো হয় না। যারা কিছু চাইতে আসে, বুড়ো-দাদু তাদের সব দেন, কিন্তু দেখা দেন না।'

'তাহলে নিয়মগুলো কি করে জানব?'

পদম্ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন, আমি বলে দিচ্ছি। এই আমাদের ঝাউবনের ঝরনার ধারে যে শিউতলা আছে, সেখানে আপনাদের মাত্র একজনকে নিয়ে যেতে পারি। আমার সঙ্গে এই পাহাড়তলির ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে ঝরনা তলায় যেতে হবে। সেখানে নালার ধারে একটা মস্ত কালো পাথর আছে। তার উপর চব্বিশ ঘণ্টা উপোস করে বসে কেবলি যার যে নামে খুশি দেবতাকে ডাকতে হবে। তবে তাঁর মন গলবে।

আরো বলি পহরে পহরে একবার করে শিউতলার শিবলিঙ্গের মাথায় আকাশ-গঙ্গার জল নামে—কিছু বললেন, স্যার?'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'তার মানে ঐ কালো পাথরের উপর পাহাড়চুড়ো থেকে ঢল নামে?'

পদম্ বলল, 'যেমন বুড়ো-দাদু শিখিয়েছেন তেমনি বলছি। তার বেশি জানিও না। শিউতলায় কারো সঙ্গে আমাদের কারোর যাওয়াও বারণ। তাকে একা যেতে হবে। আমি উপর থেকে দেখব।

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'আমি নিজে যাব। কি কি করতে হবে?'

'ঐ যে বললাম, চব্বিশ ঘণ্টা উপোস করে শিউতলায় বসে কেবলি তাঁকে ডাকতে হবে। পহরে পহরে একবার ঐ চ্যাপ্টা কালো পাথরের উপর আকাশ-গঙ্গার জল নামে। কিন্তু সাবধান—'

'কিসের সাবধান?'

'সৎকাজের জন্য সাধু মানুষরা ডাকলে, জলের সঙ্গে সোনার দানা, মণি-মাণিক্য জলের সঙ্গে পড়ে আর দুষ্ট লোকরা ডাকলে কেউটে সাপ পড়ে। এ আমার নিজের চোখে দেখা, স্যার।'

গোবিন্দ স্যার বললেন, 'কি করে বোঝা যায় কে সাধু আর কে দুশমন?'

এক গাল হেসে পদম্ বলল, 'কেন, মণি পড়লে বুঝব সাধু লোক আর সাপ পড়লে দুশমন। আপনি যাবেন, দাদা?'

গোবিন্দ স্যার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'ইয়ে আমি যে দরকার হলে মাঝে-মাঝে মিছে কথা বলি আর সাপ দেখলে আমার হিক্কা ওঠে!'

ডঃ কাশ্যপ এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি যাব। এঁদের পনেরো দিনের মধ্যে অভিযান শেষ করে তার বিবরণ লিখে দিতে হবে। নইলে সরকারি সাহায্য পাবে না।'

কাদম্বিনী দিদিমণি রেগে বললেন, 'না দেয় তো আমি নিজে টাকাটা দিয়ে দেব। আমরা অতিথিশালায় অপেক্ষা করব।'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, '—ইয়ে তাহলে তো খুব ভালো হয়। কিন্তু আমাদের যদি একটু দেরি হয়, ততক্ষণ কি করবেন?'

কাদম্বিনীদিদি হাসলেন। গোবিন্দ স্যার হেসে বললেন, 'আমাদের শুধু ভ্রমণ করে বেড়ালেই চলবে না। কি দেখলাম, কি শুনলাম, কি শিখলাম, যৌথভাবে তার একটা বিবরণী লিখতে হবে। ভ্রমণের সময় শেষ, এবার খুঁটিনাটি, দূরত্ব, দৃশ্য, স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য দিয়ে রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলা হবে।

আমাদের জন্য ভাববেন না, দাদা। যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এবার আপনার নিজের কাজটিতে কৃতকার্য হলেই, এ অভিযান সার্থক হবে।'

একটা কথা বলা হয়নি। এ বিবৃতিটি বাংলায় লেখা হলেও, এঁদের সব কথাবার্তা হচ্ছিল হিন্দিতে। সেটাই স্বাভাবিক। হিন্দি ভাষাকে অবশ্য-পাঠ্য করার এই একটা মস্ত সুবিধা। সারা ভারত জুড়ে সব কাজকর্মের সুবিধা হয়েছে। অবিশ্যি আমাদের পশ্চিম-বাংলার দল তাদের বিবৃতি বাংলায় লিখে রাখছিল। পরে নাকি ইংরিজি আর হিন্দিতে নিজেরাই অনুবাদ করে রাখবে।

আড়াই দিনেই এদের কাজ সারা আর তার পরদিনই সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত ক্লান্ত ডঃ কাশ্যপ পাহাড়-চড়ার লাঠিতে ভর দিয়ে, পা দুটোকে যেন টেনে-টেনে পান্থশালায় এসে পৌঁছলেন। চোখে মুখে সাফল্যের আনন্দ; পিঠের হ্যাভারস্যাকটা মনে হলো ঠাসা।

একবার বললেন, 'ইউরেকা!' তারপরেই কাটা কলাগাছের মতো তক্তাপোশে লম্বা হলেন আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে কাদা। কাদম্বিনীদিদি তাঁর নিজের কম্বলটি এনে তাঁর গা ঢাকা দিয়ে দিলেন। ছেলেদের একজন তাঁর পায়ের জুতো খুলে দিল। আসলে উপস্থিত সকলে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কাদম্বিনীদিদি চোখ পাকিয়ে বললেন, 'নিজের থেকে যখন উঠবেন, তখন সব শুনো। মনে রেখো এ কাহিনী কিন্তু আমাদের ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে পড়ছে না।'

হেরম্ব স্যার স্বল্পভাষী মানুষ। তিনি পর্যন্ত প্রসন্নভাবে বললেন, 'এটা আমাদের ফাউ। আমাদের পাওনার উপর বাড়তি লাভ।'

বিশ্বাস কর আর নাই কর, ডঃ কাশ্যপ এক টানা আট ঘণ্টা ঘুমোলেন। মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু নাক ডাকালেন; বার তিনেক এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরলেন। পুবের স্কাইলাইট দিয়ে চোখে আলো পড়তেই, তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কি সর্বনাশ! তোদের না দেরি হয়ে যায়!'

রূপা, চাঁপা, গীতা, সীমা, ডলি, মিলি, ভূতো, ট্যাঁপা, জনি, ডিকি, কালু ও নালু এক বাক্যে বলল, 'হয়নি দেরি। ডাক-জোয়ান আমাদের রিপোর্ট নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। অত ঘুমোও কেন?'

ডঃ কাশ্যপ বললেন, 'সব কথা হয়তো বলা যাবে না; এঁদের কথা দিয়েছি বলব না। কিন্তু আমার জ্ঞাতব্য যা যা দরকার, তার সমাধান হয়ে গেছে। স্নান করে, খেয়ে যতখানি পারি বলব।'

হেরম্ব স্যার, গোবিন্দ স্যারও এমনি হুড়ো দিতে লাগলেন যে ছেলেমেয়েরাও উঠে পড়তে বাধ্য হলো।

সন্ধ্যাবেলা চিমনিতে আগুন জ্বললে, সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গল্প শুনল। শুধু তাই নয়। হ্যাভারস্যাক খুলে ডঃ কাশ্যপ তাঁর পাওয়া সোনার গয়না, সোনার শিবলিঙ্গ, নানা রকম দামী রত্ন, মণি, মোহরের থলিটা দেখালেন।'

ভাঙা গলায় কাশ্যপ বললেন, 'আর আমাকে হাত পেতে বেড়াতে হবে না। এই দিয়েই মান-মন্দির, পরীক্ষাগার, অতিথিশালা সব হয়ে যাবে। একটা বিশ্ব-সংস্থা সে সমস্ত চালাবার সব খরচ দেবেন।'

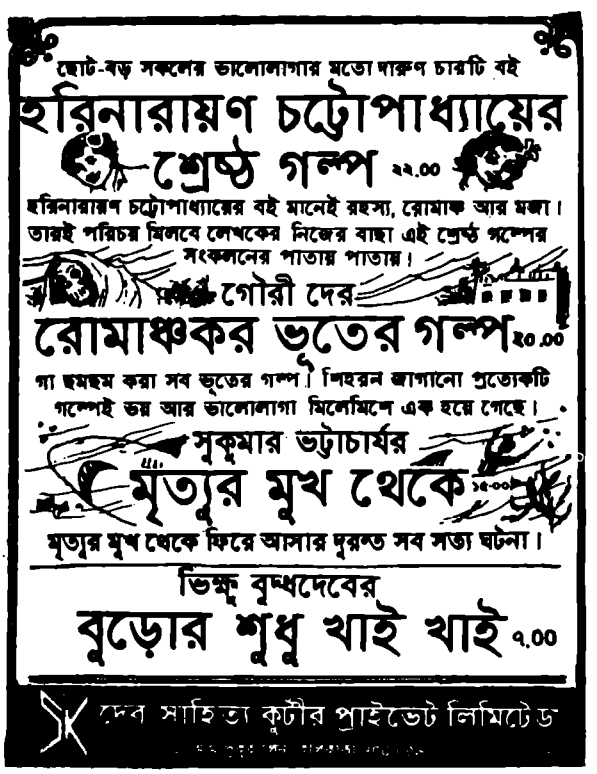

মিনতি দিদি বললেন, 'শিবঠাকুর কিংবা অন্য কোনো দেবতা মানুষের হাতে গড়া গয়নাগাঁটি কাউকে এমনি দেন এ কথা বিজ্ঞান মানবে না। ভগবান বুদ্ধি দিতে পারেন। নিজেদের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিকরা বিদ্যা অর্জন করতে পারেন, কিন্তু কাজ চালাবার খরচপত্র এভাবে হাতে তুলে দেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

ডঃ কাশ্যপ হেসে ফেললেন। বললেন, 'ঘণ্টাখানেক হাত জোড় করে ধ্যান করার পর স্পষ্ট দেখলাম, চ্যাপ্টা কালো শিবলিঙ্গের উপর ঝরঝর করে পাহাড়ের গায়ের ফাটল দিয়ে গরম জল পড়ল। ধারাটা কমে এল। তারপর থেমে গেল। তখন চেয়ে দেখি শিবলিঙ্গের উপর এই সব ধন-রত্ন পড়ে আছে। আর নেপথ্য থেকে পদম্ আমাকে ডাকছে। তখন দেবতার দেওয়া ধনরত্ন কুড়িয়ে, পদম্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে, ওদের দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য কিছু টাকা দিয়ে, ঐ পাহাড়ি পথ ধরে চলে এলাম। ওরাও হাসিমুখে বিদায় দিয়ে, ছাগল নিয়ে চলে গেল।'

'তারপর?'

'ওরা চলে গেলে পর, আমি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আরো অনেকটা উঠলাম। জানই তো আমার দেশ-বিদেশের পাহাড় চড়ার ট্রেনিং আছে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ঐ গরম জলের ঝরনা, পাহাড় কুরে কুরে আরো অনেক উঁচু থেকে অদৃশ্যভাবে নেমেছে। হয়তো এই রকম আরো কুণ্ড আছে। কুণ্ড মানেই তীর্থস্থান। তীর্থস্থান মানেই যাত্রী। তাদের মধ্যে অনেক ধনী লোক থাকেন। তাঁরা দেবতাকে সোনা-দানা ঘুষ দিয়ে খুশি করতে চান। সেই দানের জিনিস স্রোতের সঙ্গে নেমে আসে নিচের কুণ্ড অবধি। সেখানে হয়তো কোনো ভক্তের কপাল খুলে যায়। আরো উপরে আরো ফাটল আছে, কুণ্ড আছে। সেখানেও কেউ কেউ আমার মতো ধন পেয়ে যায়। কুণ্ডগুলো অনেকটা দূরে দূরে আর রক্ষীরা এত সাবধান যে কেউ বাইরের লোকের কাছে কিছু প্রকাশ করে না। স্থানীয় লোক নিয়ে তাদের কারবার।

গরম-জলের ধারাটা স্বাভাবিক। দুনিয়াতে এমন আরো আছে। যে শক্তিতে ভূ-গর্ভের তাপে পৃথিবীর বুকের জল বাষ্পে পরিণত হয়ে উপর দিকে ঠেলে বেরুতে চায় আর তার ফলে কোথাও আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়; কোথাও বা গরম জলের ঝর্ণা হয়। কোথাও ভিতরেই আলোড়ন করে, ভূমিকম্প হয়; আর কোথাও এই রকম কিছুক্ষণ পর পর ফোয়ারার মতো ফাটল দিয়ে গরম জল বাইরে বেরিয়ে আসে।

এখানে মনে হয় পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে মাটি কুরে কুরে পাহাড়ের চুড়োর কাছের গরম জল অদৃশ্য থেকে নিচে নামতে থাকে আর যেখানে নরম মাটি পায়, খানিকটা জল সেখানে কুণ্ডের মতো বেরিয়ে পড়ে। উপরের জল যতবার খানিকটা জমে ততবার ঐ সব ফাটল দিয়ে ঝরে পড়ে। আর জলের সঙ্গে সঙ্গে আরো উপরের কুণ্ডে যাত্রীদের দেওয়া ধনরত্নের খানিকটা বেরিয়ে আসে।

কুণ্ডের রক্ষীরা ব্যাপারটা গোপন রাখে। কারো সঙ্গে কারো জানাশোনাও নেই তাই রহস্যটা রহস্যই থেকে যায়।

এই ব্যাপার আমার মন বুঝে গেলে, আমি আবার নেমে এলাম। আমার যেটুকু দরকার, বিধাতা সেটুকু পাইয়ে দিয়েছেন।'

তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন ডঃ কাশ্যপ।

বিকেলে ধসের মাটি সরানোর কাজ শেষ হলো। পদম্ খবর দিল ট্রাক এসে গেছে।

ছবি : রাহুল মজুমদার

পূজা ঃ ১৪০০ সাল

রবিদাস সাহারায়

চোদ্দশ' সাল এসে গেছে, হেঁকে বলেন শ্রীশঙ্কর,
"শোন দুর্গা, মর্ত্যলোকের অবস্থাটা ভয়ঙ্কর।
বড় বড় শহরেতে হচ্ছে ভীষণ বিস্ফোরণ,
গোলাগুলি-হানাহানি—মরছে মানুষ অকারণ।
কাজেই তুমি বন্ধ করো মর্ত্যে এবার যাওয়াটা,
যাক না মারা পাঁচটি দিনের বাপের বাড়ির খাওয়াটা।"
কার্তিক আর গণেশ বলে, করে বেজায় মুখ বেজার,
"নন্দী যাবে ভৃঙ্গি যাবে, ভয়টা কেন রইবে আর?"
বলেন শিব, "ওখানে সব ছেলে থাকে ড্রাগে মেতে,
নন্দীরাও করবে লাইন ওদের দলে ভিড়ে যেতে।
গিয়েও সেথা লাভ হবে না, সব জিনিসের বাড়ছে দাম,
ভোগের বেলায় অষ্টরম্ভা, করবে ভড়ং-ধুমধাম!
মেয়েদেরও অবস্থাটা এবার মোটেই ভালো নয়,
আত্মঘাতী হচ্ছে নারী, লাঞ্ছনারও বিষম ভয়।
কালো টাকার কেলেঙ্কারী, বিদ্যা সেথায় বিপনন,
লক্ষ্মী সরস্বতীকে তাই যেতেই করে দাও বারণ।"
দুর্গা বলেন, "দাঁড়াও আমি বঙ্গদেশের হালটা দেখি,
মিছিল করে যাচ্ছে কারা, ফেস্টুনেতে লেখা একি!
'ড্রাগের নেশা সর্বনাশা, তাড়াতাড়ি এসব তাড়াও,
নারীরা সব কোমর বেঁধে অন্যায়কে রুখে দাঁড়াও।'
সবাই সেথা জোট বেঁধেছে, গুণ্ডা দমন করতে হবে,
আমরা যাবো সদলবলে, পূজা কেন বন্ধ রবে?
আমার ছেলেমেয়ে ওরা, মন্দ কি আর হতে পারে?
তুমিও দেখি মিছিমিছি চাপাও দোষ ওদের ঘাড়ে!"

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

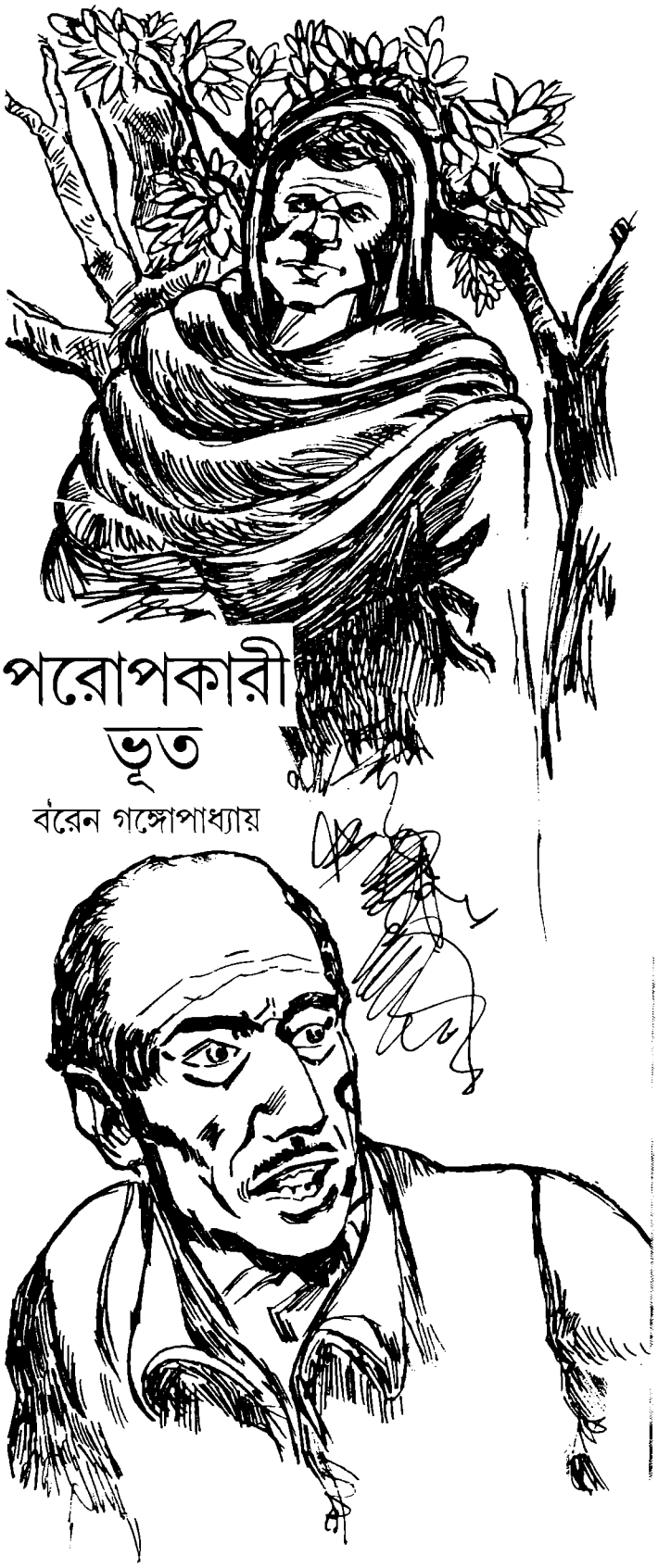

পরোপকারী ভূত

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গাড়ি ছ'ঘণ্টা লেট। অর্থাৎ কিনা সন্ধ্যে সাতটার সময় যেখানে নামার কথা, সেখানে নামতে হলো রাত একটায়। তিনু ডাক্তার ভেবেছিলেন, কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে রিকশাভ্যানে উঠে বসবেন, একান্তই যদি রিকশাভ্যান না পাওয়া যায় তো গোরুর গাড়িই করবেন। কিন্তু হা কপাল, কোথায় কুলি। সারা স্টেশনে একটাও জনমানবের চিহ্ন নেই। অগত্যা ভারী স্যুটকেসটা টানাটানি করে নিজেই প্ল্যাটফরমে নামালেন।

এ কি প্ল্যাটফরম রে বাবা! এ যে মোরাম বিছানো মাটি। এদিকে ওদিকে দু-চারটে ঝাপড়ানো কৃষ্ণচূড়া কি রাধাচূড়ার গাছ। বেশ খানিকটা দূরে স্টেশনমাস্টারের ঘরের সামনে আলো জ্বলছে। সারা প্ল্যাটফরমে আর কোথাও কোনো আলোর বালাই নেই। আজ আবার কি তিথি চলছে কে জানে, চাঁদ-ফাঁদ কিছুই নেই। অমাবস্যা হবে হয়তো। মনে মনে ভীষণ বিরক্তই হচ্ছিলেন তিনু ডাক্তার। এই বয়সে আর এসব পোষায়?

কিন্তু উপায়ই বা কি! চাকরি রাখতে হলে সবই করতে হয়। রঘুনাথপুরের হেলথ সেন্টারের দায়িত্ব দিয়ে ওঁকে বদলি করা হয়েছে। হয় রঘুনাথপুরে গিয়ে জয়েন করো, নইলে চাকরি ছেড়ে কেটে পড়।

চাকরি ছাড়া কি সোজা কথা! খাব কি! এইসব সাত-পাঁচ ভেবেই জয়েন করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনু ডাক্তার। আর ট্রেনটাও যেন ওঁর সঙ্গে শত্রুতা করল। ছ' ঘণ্টা লেট হওয়ার কি আর দিন পায় না।

মনে পড়ল, কলকাতা থেকে যখন উনি রওনা দেন, অফিস থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল, রঘুনাথপুর দারুণ চমৎকার জায়গা। একবার গেলে দেখবেন, এদিকে আর আসতেই ইচ্ছে করবে না। ওখানে আপনার জন্য ফার্নিশড্ কোয়ার্টার। চব্বিশ ঘণ্টা আলো, জল। হেলথ সেন্টারটা অবশ্য স্টেশন থেকে তিন চার কিলোমিটার দূরে। তা রিকশাভ্যান পাবেন। একান্তই যদি রিকশাভ্যান না পান তো গোরুর গাড়ি অঢেল। আপনি মানে, ডাক্তারবাবু এসেছেন শুনলে দেখবেন কেমন খাতির করে আপনাকে নিয়ে যায়।

এখন মনে হচ্ছে, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কেন ডাক্তারবাবুরা থাকতে চান না। তা কি আর করা যাবে, এসে যখন পড়েছেনই, হেলথ সেন্টার আর কোয়ার্টারটা না দেখে ফেরেন কি করে। তা ছাড়া ফিরব বললেই তো ফেরা চলে না, ফিরতি ট্রেন কাল দুপুর দুটোর আগে নয়।

চারপাশে একবার ভাল করে দেখে নিলেন তিনু ডাক্তার। লোকজন তো দূরের কথা শেয়াল কুকুরেরও দেখা নেই। ভাবলেন, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকারও তো মানে হয় না, যাই একবার স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকেই এগোই। অন্তত রাতটা ওঁর ওখানেই গল্পসল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে সবে দু'পা মাত্র এগিয়েছেন, আর অমনি পেছন থেকে কার গলা, এই যে মশাই, শুনছেন?

কিছুটা যেন চমকেই উঠেছিলেন ডাক্তারবাবু। কে রে বাবা, কে ডাকে। ভুল শুনলাম না তো!

স্যুটকেসটা আবার মাটিতে রেখে পিছন ফিরে তাকালেন। তাকিয়েই অবাক, কম্বল মুড়ি দেওয়া একটা লোক। আশ্চর্য, এ আবার এল কোত্থেকে!

ডাক্তারবাবু বললেন, আমাকে ডাকছেন?

আপনি ছাড়া আর আছেটা কে এখানে যে ডাকব?

লোকটা এগিয়ে এল, আপনিই তো নতুন ডাক্তারবাবু, তাই না?

তিনকড়ি যে আজকের এই ট্রেনেই এখানে আসবেন এটা কারও জানার কথা নয়। তাহলে লোকটা জানল কি করে, না কি আন্দাজে ঢিল মারল। কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি?

আজ্ঞে আমি আপনার কম্পাউন্ডার। মানে রঘুনাথপুর হেলথ সেন্টারের কম্পাউন্ডার।

তিনু ডাক্তার যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। যাক বাবা, নিজের লোক বলতে তবু একজনকে পাওয়া গেল। বললেন, ট্রেন থেকে নেমে যে কি বিপদেই পড়েছিলাম, কি বলব? তা আমি যে এই ট্রেনেই আসব, জানলেন কি করে?

লোকটা আরও এগিয়ে এসে একটু হাসল, খবর ঠিক পেয়ে গেছি স্যার, সে সব পরেই জানতে পারবেন, এখন চলুন, রাতটা আমার বাড়িতেই কাটিয়ে—

আপনার বাড়ি!

এই দেখুন, আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন! আমি স্যার সামান্য একজন কম্পাউন্ডার। আপনি ডাক্তার আর আমি কম্পাউন্ডার।

না, তা না। আচ্ছা কি নাম তোমার?

আজ্ঞে আমি, মানে আমার নাম ধনঞ্জয় বেরা। আপনি স্যার ধনা বলেই ডাকবেন।

তিনু ডাক্তারের মনে পড়ল, হ্যাঁ ধনঞ্জয় নামটাই বলে দিয়েছিল কলকাতা থেকে। বললেন, হ্যাঁ ধনঞ্জয়ই বলে দিয়েছিল ওরা। তা ভাই ধনঞ্জয়, এত রাতে এই ভারি স্যুটকেস নিয়ে কোথাও যাওয়াটা কি ঠিক হবে। স্টেশনমাস্টারের ঘরেই বসে কাটিয়ে দেওয়া যায় না? কাল সকালে না হয়—

আপনি স্যার মিছিমিছি ভাবছেন, আমি যখন এসে পড়েছি, বাকিটা আমাকেই ভাবতে দিন।

বলেই ধনঞ্জয় ডাক্তারবাবুর স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিল। চলুন স্যার। মিনিট দশেকের রাস্তা। রাতটা স্যার আমার ওখানেই কাটিয়ে—

তিনু ডাক্তার দেখলেন, ধনঞ্জয় স্যুটকেস মাথায় তুলে হাঁটতে শুরু করেছে। অতএব ওঁকেও হাঁটতে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে পাশাপাশি এসে তিনু ডাক্তার ধনঞ্জয়ের দিকে তাকালেন, এত রাতে কারও বাড়ি গিয়ে ওঠাটা কি ঠিক হবে! আমি বলি কি, আমার তো ওখানে কোয়ার্টার আছেই। সেখানেই যাওয়া যায় না?

ধনঞ্জয় বলল, স্যার রিকশাভ্যান বা গোরুর গাড়ি যদি পেতাম হেলথ সেন্টারের কাছে আপনার কোয়ার্টারেই চলে যাওয়া যেত। এত রাতে এতটা পথ স্যার আপনি হাঁটতে পারবেন না। আমার বাড়ি তো কাছেই, ওখানে আজকের রাতটা কেবল কাটিয়ে, কাল স্যার আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

তিনু ডাক্তার একটু অবাক হন। হেলথ সেন্টারে কি তোমার কোনো কোয়ার্টার নেই? তুমি কি এত দূর থেকেই যাতায়াত করো নাকি!

না স্যার। কোয়ার্টার থাকবে না কেন, আছে। তবে আমি তো এদিককারই ছেলে। আমার আদি বাড়িও এখানেই। আপনি চলুন না স্যার, গেলেই সব দেখতে পারবেন।

আবার দু'জনে হাঁটতে থাকে। কাঁচা মাটির রাস্তা। দু'পাশে ধান জমি। আবার কখনও-সখনও বিরাট বিরাট গাছ। গাছের ছায়ার নিচ দিয়ে হাঁটতে কেমন যেন গা ছমছম করে।

ধনঞ্জয় বলল, স্যার, ওই যে আমার বাড়ি। গরিবের আস্তানা স্যার।

একটু অবাক হয়ে তাকালেন তিনু ডাক্তার। দূর থেকে বাড়িটাকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। কেমন যেন ভাঙাচোরা দৈন্য দশা। আশ্চর্য, ওখানে কোনো লোক থাকতে পারে নাকি!

বললেন, তুমি ছাড়া আর কে থাকে ওখানে? তোমার ছেলেমেয়ে, বউ?

না স্যার। ওসব কোনো বালাই নেই। বিয়েই করিনি।

বলো কি হে, সংসার না করে কিভাবে বেঁচে আছ? অ্যাঁ?

সে সব স্যার অনেক কথা। রঘুনাথপুরের হেলথ সেন্টারে যখন এসেছেন সবই জানতে পারবেন। আসুন এদিকে, এদিকে।

বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। কি বিশ্রী রাস্তা রে বাবা। এ রাস্তায় কখনও হাঁটা যায়!

তোমার বাড়ি অবধি কোনো রাস্তা নেই? তোমরা কি এইভাবেই চলাফেরা করো নাকি?

না স্যার। শর্টকাট করার জন্যই এদিকে যাচ্ছি। রাস্তা ধরে গেলে পথটা অনেকখানি ঘুরতে হতো। আসুন না স্যার। আর একটু তো মাত্র পথ।

তিনু ডাক্তার কি আর করেন, ধনঞ্জয়ের পিছন পিছন হাঁটা ছাড়া এখন আর উপায়ও নেই।

যতই এগোন, বাড়ির চেহারাটাও তত স্পষ্ট হতে থাকে। এ যে একেবারে ভুতুড়ে বাড়িরে বাবা! কোন মান্ধাতার আমলের বাড়ি কে জানে? এখানে যে কেউ বাস করতে পারে ভাবাই যায় না।

হ্যাঁ হে ধনঞ্জয়, এ বাড়িতে তুমি একা থাক! ভয় করে না?

আজ্ঞে, ভয় কি? আসলে স্যার, পয়সাকড়ির অভাব, বাড়িটা যে সারাই করে নেব, তা আর হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া স্যার, আমি একা মানুষ। কোনো রকমে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেই হয়ে যায়।

বাড়িটার একদম কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা। তিনু ডাক্তার দেখলেন দেয়াল ফুঁড়ে বট অশ্বত্থ গজিয়ে গেছে। বিশ্বাসই হয় না, এখানে কখনও সখনও ধনঞ্জয় এসে রাত কাটিয়ে যায়। বারান্দা ভর্তি ছাগলের নাদি আর ময়লা। কত দিন যে কেউ এখানে ঝাঁটপাট দেয়নি তা দেখলেই বোঝা যায়।

আসুন স্যার। গরিবের বাড়িতে একটা রাত কাটিয়ে যাবেন।

বারান্দায় উঠে মাথা থেকে স্যুটকেসটা নামায় ধনঞ্জয়। এ বাড়ি স্যার আজ থেকে যে কত যুগ আগের তার হিসেবই নেই। এখন অভিশপ্ত বাড়ির মতো হয়ে রয়েছে।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তা, এখানে থাকার মতো তোমার কেউ নেই?

ধনঞ্জয় একটু হাসল, থাকবে না কেন স্যার। তবে আমার ভাই-টাইরা কেউ আর গ্রামে থাকতে চায় না। চাকরিবাকরি যোগাড় করে সবাই এখন শহরের বাসিন্দা।

বলতে বলতে দরজা খোলার জন্য হাত বাড়ায় ধনঞ্জয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা মচমচ করে শব্দ।

তিনু ডাক্তার হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। সে কি হে, দরজায় তালা লাগিয়ে বেরওনি। চুরির ভয় নেই বুঝি এদিকে?

ধনঞ্জয় একটু হাসল, চোর কোন দেশে নেই স্যার। আসলে চোরও জানে এ ঘরে ঢুকে কিছুই পাবে না। যাক গে, আসুন স্যার। একটা মাত্র রাত তো, একটু কষ্ট করে কাটিয়ে দিন। কাল আপনাকে রঘুনাথপুরের কোয়ার্টারে পৌঁছে দেব।

ধনঞ্জয় ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। তাকিয়ে রইলেন তিনু ডাক্তার। ঘরের ভেতর জম্পেশ অন্ধকার। যতক্ষণ না আলো জ্বালান হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুই বোঝার উপায় নেই।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল, ধনঞ্জয়ের আর কোনো সাড়াশব্দই নেই।

তিনু ডাক্তার ডাকলেন, ও ধনঞ্জয় কোথায় তুমি? আলোটা জ্বালো। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে।

ঘরের ভিতর থেকেই ধনঞ্জয় উত্তর দিল, আমার কাছে তো দেশলাই নেই স্যার। আপনার কাছে যদি থাকে একটু বার করুন না।

দেশলাই! তিনু ডাক্তার বিড়ি সিগারেট খান না যে দেশলাই থাকবে। এই সময় মনে পড়লো, সঙ্গে একটা টর্চ নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল। কি ভুলই হয়ে গেছে, তা বলার নয়।

আমার কাছেও তো দেশলাই নেই ধনঞ্জয়। কি মুশকিল হলো বলো দেখি।

আপনি ঘরে ঢুকুন না স্যার। একটা রাতের তো ব্যাপার। এখানে খাট আছে শুয়ে পড়ুন। ভোর হতে আর কতটুকুই বা বাকি।

তিনু ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। নিরেট অন্ধকার। ঘরের ভিতর কোথায় খাট আর কোথায় কি, কিছুই বোঝার উপায় নেই।

একটা আলো যোগাড় করা যায় না ধনঞ্জয়? আশেপাশে তোমার জানাশোনা বাড়ি নেই?

থাকবে না কেন স্যার। গ্রাম দেশে কেউ অচেনা থাকে না, সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু স্যার, এত রাতে ডাকাডাকি করাটা কি ঠিক হবে?

বিপদে যখন পড়েছি, না ডেকেই বা উপায় কি! একটু দেখ না হে, আলো ছাড়া কি থাকা যায়।

ঠিক আছে, দেখছি স্যার। আপনি এই খাটে এসে বসুন তো।

কোথায় খাট? কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যে।

ঠিক আছে স্যার, আমার হাত ধরে এগিয়ে আসুন।

শীতল একটা হাতের স্পর্শ পেলেন তিনু ডাক্তার। হাত না যেন বরফের একটা টুকরো।

তোমার হাতটা তো বরফের মতো ঠাণ্ডা হে।

না স্যার, ও কিছু না, আসুন এদিকে, এই যে খাট।

সত্যি সত্যি একটা খাটই। তিনু ডাক্তারের মনে হলো বেশ গদি পাতা। একপাশে বসলেন।

এবার আপনি শুয়ে পড়তে পারেন স্যার। আমি আলো পাই কিনা দেখি।

একটু তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু। একা একা এরকম একটা ঘরে থাকব, বুঝলে না!

আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। আপনি বিশ্রাম করুন। রাতও আর খুব বেশি নেই স্যার। একটু পরেই হয়তো পাখির ডাক শুনতে পাবেন।

ধনঞ্জয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর তখুনি তিনু ডাক্তারের মনে হলো ধনঞ্জয়ের হাতটা অত ঠাণ্ডা হলো কি করে? জীবন্ত মানুষের হাত কি অত ঠাণ্ডা হতে পারে! আশ্চর্য!

ঘরের ভিতর স্তব্ধ হয়েই বসে রইলেন তিনু ডাক্তার। কি কুক্ষণেই যে এই রঘুনাথপুরে ডাক্তারি করতে এলাম, এখন ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি।

অনেকক্ষণ ঠায় বসে রইলেন তিনু ডাক্তার। ধনঞ্জয় সেই যে আলো আনতে গেল তো গেলই।

তবে কি—না, তা কি করে হয়। জলজ্যান্ত মানুষটা ওঁকে এখানে নিয়ে এলো। তাছাড়া ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডারের কথা তো কলকাতা থেকেও বলে দেওয়া হয়েছিল।

বিছানায় একটু কাত হয়ে শুয়েই পড়লেন তিনু ডাক্তার। আবোল-তাবোল ভেবে তো লাভ নেই, যা কপালে আছে হবেই। আর যতক্ষণ না ভোর হচ্ছে ততক্ষণ কিই বা আর করা যাবে।

ক্রমে ক্রমে আরও বেশ খানিকটা সময় চলে গেল। ধনঞ্জয়ের কোনো পাত্তাই নেই। তিনু ডাক্তারও নরম বিছানা পেয়ে এক সময় ঘুমিয়েই পড়লেন।

ঘুম ভাঙল যখন তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসলেন তিনু ডাক্তার। দরজাটা হাঁ করা, খোলা। বিছানার একপাশে ওঁরই স্যুটকেসটা।

আশ্চর্য! ধনঞ্জয় কোথায় গেল? রাতে কি ও ফেরেনি নাকি!

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনু ডাক্তার। দূরে রাস্তায় গোরুর গাড়ি যাচ্ছে। ঝাঁকামুটে মাথায় কিছু কিছু লোকও চলাচল করছে।

কি যে করবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। বাড়িটার চেহারা সত্যি ভাবা যায় না। এখানে কোনো মানুষ থাকতে পারে নাকি! আশ্চর্য!

নাহ, একটু এগিয়ে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করা দরকার। তিনু ডাক্তার হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলেন রাস্তার ধারে, এই যে দাদা, শুনছেন?

মাঝারি বয়সের এক ভদ্রলোক দাঁড়ালেন, আপনি!

আমি রঘুনাথপুর হেলথ সেন্টারে যাব। কাল রাত একটার সময় ট্রেন থেকে নেমেছি।

লোকটা কেমন আপাদমস্তক দেখে নেয় তিনু ডাক্তারের। তা, এখানে এলেন কি করে?

না মানে, ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার আমাকে এখানে নিয়ে এলো। ওই যে বাড়িটা দেখছেন, ওখানে আমাকে বিশ্রাম করতে বলে কোথায় যে গেল, আর ওর টিকিই পেলাম না।

ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার আপনাকে নিয়ে এসেছে। আপনি গাঁজাটাজা খাননি তো মশাই?

আজ্ঞে! আমি তিনকড়ি ডাক্তার। হেলথ সেন্টারে বদলি হয়ে এখানে এসেছি। গাঁজা খেয়েছি বলছেন কেন?

ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার তো পরশুদিন মারা গেছে। রেলে কাটা পড়ে।

অ্যাঁ!

অ্যাঁ কি! সেই ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার আপনাকে এখানে নিয়ে এলো বলছিলেন না, তাই!

তিনু ডাক্তারের বুকের ভেতর কেমন কাঁপুনি শুরু হলো এ সময়। ধনঞ্জয় কম্পাউন্ডার মারা গেছে! কবে মারা গেছে বললেন?

পরশু।

কিন্তু ও যে কাল আমাকে এখানে নিয়ে এলো। আমার কষ্ট হবে ভেবেই ও আমাকে ও ঘরে রাতে শুতে বলেছিল।

লোকটা কেমন হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিনু ডাক্তারের দিকে। তিনু ডাক্তারও বুঝে উঠতে পারছিলেন না এ কি করে সম্ভব!

ছবি : রাজা সরকার

লুকোচুরি

শৈলেন দত্ত

টুকি....

মিতুল কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেল। কি আশ্চর্য! কে বলল কথাটা? মিতুল আর দিদিভাই পুতুল মাঠে খেলতে এসে মাঝে মাঝে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ঠিক অমনি সুরেই তো বলে ওঠে—টু...কি! কিন্তু আজ তো পুতুল আসেনি। বাবার সঙ্গে মিতুল একাই এসেছে মাঠে।

টুকি!

ঐ তো আবার স্পষ্ট শুনলো কথাটা। মিতুল তাহলে ভুল শোনেনি।

মিতুল চোখ তুলে তাকাল। দেখে মস্ত একটা প্রজাপতি ওর চোখের সামনে আলতো হাওয়ায় ভাসছে, নাচছে, উড়ছে। ভারি সুন্দর প্রজাপতিটা। দুটি ডানায় রামধনু রঙ, যেন তুলি দিয়ে আঁকা। মিতুলের বড়ো ইচ্ছে ওটা ধরে, দিদিভাইকে নিয়ে গিয়ে দেখায়। কিন্তু পারছে না। ছোট্ট হাত দু'টি বাড়াতেই হারিয়ে যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে লুকোচ্ছে। আর তখুনি দিদিভাই-এর কণ্ঠস্বর কানে বেজে উঠছে, দুয়ো পারে না, মিতুল ধরতে পারে না।

বাবা ওর কাণ্ড দেখে একগাল হেসে বললেন, প্রজাপতিটা তোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

কথাটা কিন্তু মনে ধরেনি মিতুলের। প্রজাপতি আবার লুকোচুরি খেলতে পারে নাকি!

কি আশ্চর্য! ভোলামামা ঠিক পরের দিনই এসে হাজির মিতুলদের নবাবগঞ্জের বাড়িতে। এসেই বললেন, গরমের ছুটি পড়ে গেল। তাই চলে এলাম।

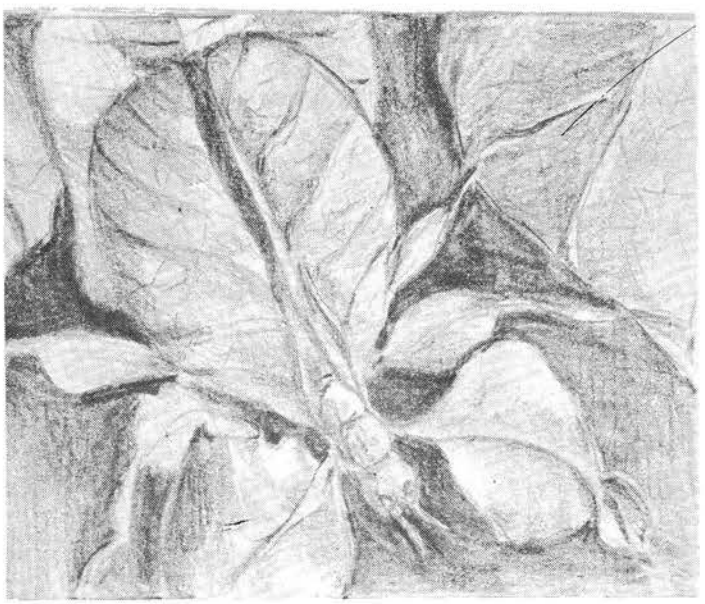

পত্র-কীটটা দেখতে ঠিক পাতার মতো।

ঝুটো চোখের জন্য শুঁয়োপোকাকে দেখায় সাপের মতো।

ভোলামামা কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রাণীতত্ত্ববিদ। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। মস্ত মাথা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। চোখে পুরু চশমা। একমুখ দাড়ি গোঁফ। পায়ে চটি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। কাঁধে একটা বড়সড় কাপড়ের ব্যাগ, তাতে ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, আর নোটবুক। কখনো পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের ছবি তুলছেন, কখনো টেপে পাখির স্বর, জীবজন্তুর ডাক তুলে নিচ্ছেন। বন্যপ্রাণীর অদ্ভুত প্রকৃতির ওপর ওঁর গবেষণাপত্রটি এবার সরকারী খেতাব পেয়েছে। সায়েন্স কলেজের ছাত্ররা ওঁর নাম দিয়েছে এ যুগের ডারউইন। কলেজে খুব নামডাক ওঁর। কিন্তু মিতুলদের কাছে একেবারে মাই ডিয়ার।

বাগানের গেট দিয়ে ভোলামামাকে ঢুকতে দেখেই পুতুল চিৎকার করে উঠল, মিতুল দেখে যা কে আসছে!

পুতুল মিতুল দুটিতে মিলে টানাটানি শুরু করে দিল, চলো গল্প বলতে হবে। আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না।

রবিবারের সকাল। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে বাগানের গাছপালায় আলো-ছায়ার লুকোচুরি। পাখি ডাকছে। ফড়িং, প্রজাপতি ঘাসে ঘাসে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মামা, প্রজাপতিরা লুকোচুরি খেলতে পারে? মিতুলের প্রশ্ন। বার-বারান্দায় খোলা হাওয়ায় মাটিতে মাদুর বিছিয়ে তিনজন গিয়ে বসার পরই গল্পের আসর শুরু হয়ে গেল।

পারে মানে? ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে তোরা পারবি? এই আছে দেখবি হাতের নাগালের মধ্যে, আবার পরক্ষণেই উধাও। ধরা না

দিলে শত চেষ্টা করেও খুঁজে পাবি না। বড়ো ওস্তাদ খেলুড়ে ওরা।

পুতুল মিতুলের পিঠে একটা চিমটি কেটে কানে কানে বলল, কি এখন বিশ্বাস হলো তো?

মা-র দেওয়া গরম পাঁপর ভাজায় কামড় দিয়ে, চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভোলামামা শুরু করলেন, তাহলে আজ পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তুর লুকোচুরি পর্বই হোক। আসলে পোকামাকড় থেকে শুরু করে তাবৎ জীবজগৎ প্রকৃতির পরিবেশের আড়ালে আবডালে হরবখত লুকোচুরি খেলে চলেছে। আর এই লুকোচুরি ওরা খেলে নানাভাবে, নানা কৌশলে। কখনো আত্মরক্ষার জন্যে, কখনো খাদ্যসংগ্রহের জন্যে। বলতে পারিস এটা ওদের টিকে থাকার দায়ে, বেঁচে থাকার দায়ে করা।

ভোলামামা ওঁর ঝোলা থেকে কয়েকটা ছবি বার করে ওদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। গিরগিটি থেকে শুরু করে প্রজাপতি, ফড়িং, ব্যাঙ, হরিণ, খরগোশ, সাপ, বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, কিসের ছবি ছিল না তাঁর কাছে! কিন্তু বন্য পরিবেশের সঙ্গে ওরা এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে যে ভালো করে নজর না করলে চেনার একেবারে উপায় নেই।

খরগোশের সাদা লোম ওদেরকে মেরু অঞ্চলের বরফের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে রাখে, মামা ছবিগুলো দেখাতে দেখাতে আবার শুরু করলেন। হাল্‌কা বাদামী রঙের গায়ে চাকা চাকা দাগওয়ালা হরিণ শিকারী পশুর সন্ধান পেলে অনায়াসে পরিবেশের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। টানা টানা দাগওয়ালা বাঘ গায়ের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে জঙ্গলের লম্বা লম্বা হলুদ ঘাসের মধ্যে শিকারের সন্ধানে লুকিয়ে থাকে। আবার মানুষ-শিকারীর নিশানা থেকে বাঁচার জন্যেও লুকোচুরি খেলে। আর গিরগিটি তো বহুরূপী। ক্ষণে ক্ষণে দেহের রঙ পালটিয়ে ওরা আরণ্যক পরিবেশের সঙ্গে অনায়াসে খাপ খাইয়ে নেয়। ওদের আলাদা করে চেনা খুব কঠিন হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে কীট পতঙ্গেরা তো আরও ধূর্ত, আরো কুশলী।

ওরাও লুকোচুরি খেলে? মিতুল চোখ দুটো বড় বড় করে মামার দিকে চাইল।

তেলেভাজা শেষ। চায়ে শেষ চুমুকটা দিয়ে মামা বললেন, নিশ্চয়। পোকামাকড়দের লুকোবার জায়গাগুলো হলো নুড়ি-পাথর, পত্রহীন আগাছা, কাঁটা, ঝোপঝাড়। ভারতবর্ষের পত্র-প্রজাপতি নামে এক ধরনের প্রজাপতি পৃথিবীবিখ্যাত। দেখে বোঝার উপায় নেই ওরা প্রজাপতি না গাছের পাতা। ডানা মেলে যখন বসে থাকে গাছের পাতার সবুজ রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে তখন মনে হয় বুঝি একটা পাতাই রয়েছে। রঙ, দাগ, শিরা-উপশিরা হুবহু পাতারই মতো দেখায়।

ভোলামামা ঐ প্রজাপতির একটা ছবি তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

আবার কোনো কোনো পত্রকীটের মাথাটা ক্ষুদে কুমীরের মতো, বলে আরও দুটো ছবি ভোলামামা বার করলেন। এটা কিসের ছবি বল দেখি?

মিতুল মাথা নাড়ল। পুতুল বলল, ঠিক ধরতে পারছি না।

শুঁয়োপোকা। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ, মাথার ওপর দুটো ঝুটো চোখের মতো দাগ রয়েছে। অনেকটা সাপের মতো দেখায়। তাই এই ঝুটো চোখ দু'টি নিয়ে ওরা শিকারীকে ভয় দেখায়। আমিও প্রথমটা ধরতে পারিনি। বই পড়ে জেনেছি। আবার পেঁচার মতো গোল গোল চোখবিশিষ্ট একরকম প্রজাপতি দেখা যায়। ঐ চোখ দিয়ে ওরা দেহের প্রধান অংশগুলোকে শিকারীর কাছ থেকে আড়াল করে নিজেদের সহজেই রক্ষা করে।

বাদুড়রা রাতের অভিযানে বেরিয়ে কি শিকার করে বলতে পারিস? মামা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন।

পুতুল অনেকক্ষণ মাথা চুলকিয়েও কিছু বলতে পারল না।

মথ। কিন্তু এই মথরাও কম ধূর্ত নয়, মামা বললেন। বাদুড় শিকারে বেরিয়ে একরকম কর্কশ শব্দ করে। কিছু কিছু মথ পা ঘষে ঘষে ঐ শব্দ অনুকরণ করে সাড়া দেয়। বাদুড় শব্দটা শুনতে পায়, মথদের সনাক্তও করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানিস ঐ শব্দ শুনে বাদুড়রা আর মথদের কাছে এগোয় না। পোকামাকড়-খেকো পাখিরা আবার হলুদ বা কালো ডোরা কাটা দাগ দেখলে কামড়ের ভয়ে ঐ জাতীয় পোকামাকড়দের ধারে কাছে এগোয় না। অতএব গায়ে হলুদ বা কালো দাগ থাকলেই হলো, পোকামাকড়রা পাখিদের শিকার থেকে রক্ষে পায়।

রক্ষণাত্মক রঙ ধারণ করে অনেক প্রাণী আত্মরক্ষা করে থাকে। সবুজ ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঙকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। আবার বাদামী রঙের সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদের মধ্যে বসবাসকারী সামুদ্রিক জন্তুদের সকলেরই আত্মরক্ষার জন্য বাদামী রঙ হয়। মাছের রূপালী আঁশ ওদের পাখি বা জলের তলদেশের শিকারী প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

আলোকের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ওদের রক্ষা করে তাই না? মিতুল যেন রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে।

ভেরি গুড, ভেরি গুড! মামা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে উঠলেন। বললেন, এই না হলে আমার ভাগ্নী। জলের উপরিভাগ আয়নার মতো ঝকঝকে। জলের মাছের রূপালী আঁশ ঐ ঝকমকে ধাতব-সদৃশ পটভূমির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

পেঁচার মতো গোল চোখবিশিষ্ট প্রজাপতি

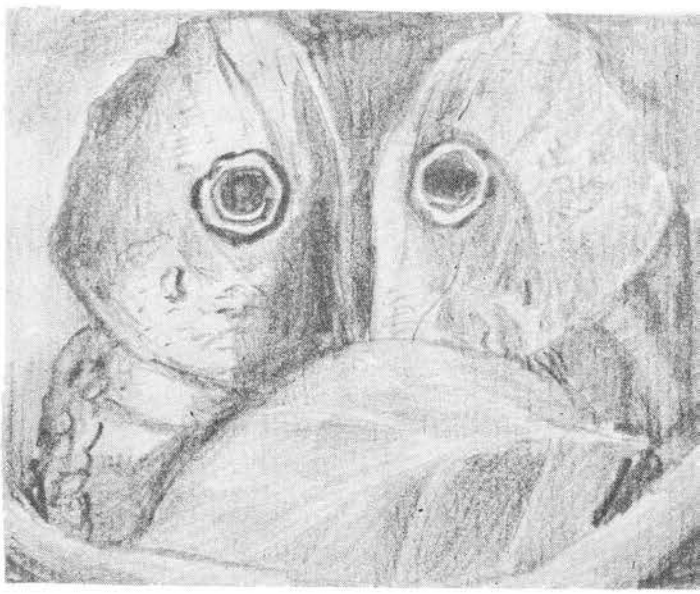

মামার স্টক যেন ফুরোতেই চায় না। একটা ছবি দেখিয়ে মামা বললেন, এটা কি বল তো?

একটা পাতা তো। ছেঁড়া পাতা। মিতুল বলে উঠল।

মোটেই না। কমা-প্রজাপতি। অদ্ভুত আকৃতির এই প্রজাপতির ডানাগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ডানা মুড়ে পাতার ওপরে বসে থাকলে মনে হয় একটা ছিন্নপত্র ঝুলছে।

মামা, সেদিন কি হয়েছিল জানো? দিদিভাই বাগানে লাউশাক তুলতে গিয়ে সাপ সাপ বলে ছুটে পালিয়ে এলো। গিয়ে দেখি সত্যিই লাউডগার মতো দেখতে একটা সাপ লাউডগার মধ্যে ঝুলছে। অবিকল লাউডগা!

মামা মিতুলের পিঠ চাপড়ে বললেন, ঠিকই দেখেছিস। ওরা লাউডগার সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে চেনার উপায় থাকে না।

জোনাকিরা আবার জ্বলে-নিভে ওদের সঙ্গীদের কাছে ডাকে। নানাভাবে আলোর বার্তা পাঠায়। এই কারসাজিটা ফোটুরিস নামক একপ্রকার পুরুষ-পতঙ্গ আয়ত্ত করে নিয়ে ঐ জাতীয় মেয়ে-পতঙ্গ ফোটিনাসকে কাছে ডাকে। আর কাছে এলে মিতালি না পাতিয়ে ধরে খেয়ে ফেলে।

কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীদের পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্যে বা আত্মরক্ষার জন্যে এইভাবে লুকোচুরি খেলা দেখে মানুষও আত্মরক্ষার ও বাঁচার তাগিদে ওদের কাছ থেকে অনেক কলাকৌশল শিখে নিয়েছে। মামা এবার প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে মানুষের জগতে ফিরে এলেন।

সৈনিকদের খাকি রঙের পোশাক, যুদ্ধজাহাজের ধূসরবর্ণ সবই শত্রুদের বোকা বানাবার জন্য। ওই একই কারণে যুদ্ধের বিমানগুলো বাদামী ঘন সবুজ বা বেগুনী রঙের করা হয়। বিমানের পেটের কাছটা ফিকে নীল, সাদা বা গোলাপী করা হয় যাতে আকাশের রঙের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় আর মাটির শত্রুদের কাছে অদৃশ্য থাকে। রাতের বোমারু বিমানের রঙ কালো করে দেওয়া হয়।

যে কোনো অবস্থায় একটা আদর্শ রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা হলো দর্পণের মতো তলের সৃষ্টি করা। ঐ তল পরিবেশকে প্রতিফলিত করতে পারে। ফলে বস্তুটা নিজে আড়াল হয়ে যায়, দূর থেকে ওকে সনাক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা জেপলিন বিমানগুলোকে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়াম মোড়কে ঢেকে দেয়। ফলে বিমানগুলো আকাশ ও মেঘরাজি প্রতিফলিত করে শত্রুদের চোখে ধোঁকা দেয়। সত্যি বলতে কি প্রকৃতি-রাজ্যের লুকোচুরি খেলা থেকে মানুষের নতুন নতুন কলাকৌশল শেখার কথা বলে শেষ করা যায় না।

আর শেষ করে কাজ নেই। আচমকা মার গলা শুনে পুতুল মিতুল চেয়ে দেখে ইতিমধ্যে কখন মা চুপিসাড়ে এসে তাদের আসরে বসে পড়েছেন। বললেন, ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য আছে কি? উঠে পড়ো, স্নান করে আমায় উদ্ধার করা হোক।

ভোলামামা মিতুল আর পুতুলকে হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, হ্যাঁ অনেকক্ষণ ধরে বকছি। পেটে ছুঁচো ডন মারছে। তারপর দিদির ভালো-মন্দ ব্যবস্থা আছে। চল, চল, স্নানটা তড়িঘড়ি সেরে আসি।

ছবি: রাহুল মজুমদার

অসম ছড়া

সঞ্জীবকুমার দে

যাচ্ছেন বউ হাঁটিতে
কোথায় রে?
গৌহাটি-তে।
কর্তা আছেন নওগাঁ!
যাও কি কবা
কও গা!
চোর ধরেছে শিলচরে,
চোট পেয়েছে
কিল চড়ে!
যা নিয়ে যা দিসপুরে,
জেল হাজতেই
দিস্ পুরে!!
তিন দারোগা ডুমডুমায়
রাতদিন কী
ঘুম ঘুমায়!
থাকলে তারা ডিগবয়ে
আসতো না ঘুম
ঠিক ভয়ে!!

যাচ্ছি আমি রঙ্গিয়ায়,
তুই হবি ঠিক
সঙ্গী, আয়।
তারপরে যাই নলবাড়ি।
খুব হয়েছে,
চল বাড়ি!

হায় বেচারা

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

তেঁতুল গাছের মগডালেতে দুঃখে আছে মামদো,
বললে আমায়, পাঁই নে খেঁতে, কষ্ট ভীষণ, কাঁম দোঁ!
চোখের কোলে জল ছিলো
কেঁদেকেটেই বলছিলো...
বেহ্মদত্যি কঁঙ্কাটা সবাই মাঁরে হুঁয়ারকি,
চুঁপ করে সব সহ্য করি, করবো বলুন কী আঁর, কিঁ?
চোখের কোলে জল ছিলো
সে সব কথাই বলছিলো...

হায় বেচারা, দিলাম তাকে অনেক অনেক সান্ত্বনা,
বললে, আঁমি একলা থাঁকি, কেঁউ আঁমাকে মাঁনতো নাঁ!
চোখের কোলে জল ছিলো
দুখের কথাই বলছিলো...

ধরলে জানি কাজ হবে ঠিক বিখ্যাত সেই মা'র পিসে,
তাকে ধরেই ঢুকিয়ে দেবো সর্ষে-গুদাম সার্ভিসে!

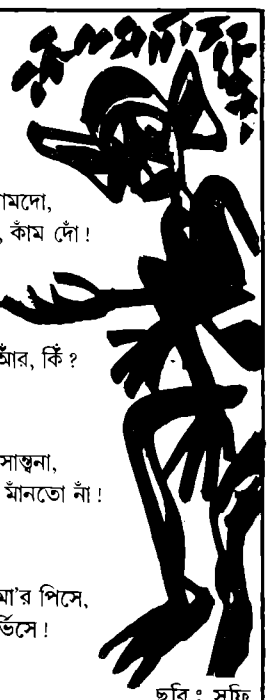

ছবি: সুফি

যা হয় না

কমল লাহিড়ী

ঘরের মধ্যে কয়েকবার অস্থিরভাবে পায়চারি করে শেষে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সোমনাথ। সুজাতা এখনও ঠাকুরঘরে বসে আছে। নার্সিংহোম থেকে বাড়ি এসে বাইরের ঘরে কিছুক্ষণ বসেছিল সোমনাথ। কাজের মেয়েটির কাছে শুনেছে, সুজাতা পুজো করছে। অশান্ত মনটা এখন কিছুটা শান্ত। তবুও কি যে হবে সে তো অজানা। ডাক্তার মুখার্জী ফর্মটা দিয়ে হাসিমুখে বললেন, নিন, সই করে দিন সোমনাথবাবু। ভয়ের কিছু নেই, ইনভেস্টিগেশান সব ঠিকমতো হয়ে গেছে। অপারেশানটাই আমাদের শেষ চেষ্টা। মনে হয়, প্রবীর ভালো হয়ে যাবে এবার।

কাঁপা কাঁপা হাতে ফর্মটা নিয়ে অনেককিছু চিন্তা করেছে সোমনাথ। কিন্তু একমাত্র ছেলে প্রবীরের সুস্থ হয়ে ওঠার কথাটা মনে হতে আর দেরি করেনি। নির্দেশমতো সই করে ডাক্তার মুখার্জীর হাতেই ফর্মটা ফেরৎ দিয়েছে। কালই প্রবীরের অপারেশান। কথাটা সুজাতাকে না জানানো অবধি মন ঠিক হচ্ছে না।

সোমনাথ আর সুজাতার একমাত্র সন্তান প্রবীর। সুস্থ সবল ছেলে। বছর চারেক আগে হঠাৎ বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে কপালের কাছটা কেটে যায়। ডানপায়ের হাঁটুতেও চোট লাগে। রাত্রেই প্রচণ্ড জ্বর আসে। আর সেই জ্বরই হলো কাল। একনাগাড়ে প্রায় দেড় মাস জ্বরে ভুগে প্রবীর যখন মোটামুটি একটু সুস্থ হলো, তখন থেকে এই উপসর্গ দেখা দিল।

হাঁটতে পারছে না প্রবীর। বিছানা থেকে নিচে নামতেও কষ্ট। কেউ না ধরলে হাঁটাচলা করতে পারে না। সব সময় পায়ে একটা যন্ত্রণা। আবার শুরু হলো চিকিৎসা। চেনাজানা থেকে শুরু করে যে যা বলেছে সব করেছে সোমনাথ, কিন্তু প্রবীরের সুস্থ হয়ে ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। বরং দিনের পর দিন কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওর বয়সী ছেলেরা যখন মাঠে বল নিয়ে খেলছে ও তখন বিছানায় শুয়ে কাঁদছে।

বহু চিকিৎসাতেও প্রবীরের হাঁটুর যন্ত্রণা কমছে না। মাঝে মাঝে রাত্রে তো প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে। সোমনাথ সরকারি চাকুরে। অফিস থেকে লোন নিয়ে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসার ত্রুটি রাখেনি। সুজাতাও ঠাকুর দেবতার কাছে মানত করে পুজো দিয়ে ক্লান্ত। ছেলে তো সেরে উঠছে না কিছুতেই!

ছোটবেলা থেকে প্রবীরও ঠাকুরবিশ্বাসী। বিশেষ করে কৃষ্ণঠাকুর ওর খুব প্রিয়। মাথার কাছে একটা বড় শ্রীকৃষ্ণের ছবি বাঁধানো আছে। প্রতিদিন মালা পরিয়ে ধূপধুনো জ্বেলে দেয় সুজাতা।

অনেক চেষ্টা করেও যখন প্রবীরের সুস্থতা ফিরে আসছে না ঠিক তখনই ডাঃ মুখার্জীর নার্সিংহোমের কথা জানতে পারল সোমনাথ। এখানে নাকি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা হয়। আর অপারেশানেও ডাঃ মুখার্জীর খুব সুনাম। একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য প্রবীরকে এখানে ভর্তি করিয়েছে সোমনাথ। সুজাতার অবশ্যি মত ছিল না। কি হবে শুধু শুধু কাটা ছেঁড়া করে। তার চেয়ে ভগবান যা করেন তাই হোক। কিন্তু সোমনাথ অনেক বুঝিয়ে সুজাতাকে রাজী করিয়েছে।

আজ দু'সপ্তাহ প্রবীর বাড়ি ছাড়া। সুজাতা সোমনাথ নিয়ম করে দু'বেলা নার্সিংহোমে আসে। অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছে সোমনাথ। দিন তিনেক আগে একবার ডাঃ মুখার্জী অপারেশানের কথাটা বলেছিলেন। তবে তার আগে একটা কি যেন পরীক্ষা করে নিতে হবে। তা সে পরীক্ষাও হয়ে গেছে, অপারেশানই করতে হবে।

সব কথাগুলো মাথার মধ্যে আর একবার আলোড়ন শুরু করল। বেলাও হয়েছে। আজ রাত্রিতে সুজাতা নার্সিংহোমে থাকবে। দরজা পেরিয়ে বারান্দায় পা রাখতে সুজাতার সঙ্গে মুখোমুখি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুজাতা তাকাতে সোমনাথ বলে, ঘরে এস, কথা আছে।

বেলা তো অনেক হয়েছে, তুমি স্নান করবে না!

হ্যাঁ করব। আর শোন, তুমিও তৈরি হয়ে নাও। একটু বিশ্রাম করে বেরুব।

কোথায়?

বাঃ, খোকার কাছে যেতে হবে না।

খোকা কেমন আছে আজ?

ভাল। আজ জানলে, ডাঃ মুখার্জী বললেন, ছোট্ট একটা অপারেশান করে দিলেই খোকা আবার আগের মতো হাঁটতে পারবে।

অ-পা-রে-শা-ন। সুজাতা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে।

সোমনাথ ওর কাছে এসে মাথায় হাত রেখে বলে, হ্যাঁ, একটা ছোট্ট অপারেশান করতেই হবে। আর তাহলে আমাদের প্রবীর সুস্থ হয়ে যাবে।

ঠিক বলছ?

ডাঃ মুখার্জী তো তাই বললেন।

কিন্তু খোকার ওই শরীর। কাটা ছেঁড়া সহ্য করতে পারবে কি?

সুজাতার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বলে, কেন মিথ্যে ভয় করছ। ঠাকুর তো আছেন। তাছাড়া খোকা তো বারবার বলছে কৃষ্ণঠাকুর নাকি ওকে বলেছেন, এবার ও ঠিক সুস্থ হয়ে যাবে।

সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সুজাতা। মনে মনে শুধু শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণতি জানায়। সুজাতাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে আরও কিছু সময় যায়। তারপর ওরা দু'জনে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নেয়। দুপুরে খাওয়ার পর প্রবীরের কয়েকটা জামা প্যান্ট আর জলখাবারের টিফিন ক্যারিয়ার গুছিয়ে নেয় সুজাতা। একটা ভালো ধূপকাঠির প্যাকেটও ব্যাগে ভরে। প্রবীরের বায়না সবচেয়ে ভালো গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি চাই। বিছানায় শুয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে ধূপকাঠি দেখায় প্রবীর। নার্সিংহোমের নার্স-আয়া ওরা সবাই খুব ভালোবাসে প্রবীরকে। প্রতিদিন এখানেও ফুল এনে দেয়। বালিশের পাশেই শ্রীকৃষ্ণের একটা ছবি রেখে দিয়েছে প্রবীর।

নার্সিংহোমে এসে সুজাতা প্রবীরের কাছে বসে। সোমনাথ ডাক্তার মুখার্জীর কাছে যায়। প্রবীরকে খেতে দিয়ে সুজাতা বলে, এবার তুই সত্যি ভাল হয়ে যাবি খোকা।

হ্যাঁ, হবই তো। কৃষ্ণঠাকুর তো কাল রাত্রে আমাকে বলে গেল আমি ঠিক হাঁটতে পারব। জান মা, কাল আমি খুব বকেছি ঠাকুরকে। শুধু শুধু আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি তো রোজ প্রণাম করি, ফল দিই, ধূপকাঠি জ্বেলে দিই। তবুও আমাকে ভালো করছে না। তবে হ্যাঁ, কাল কথা দিয়েছে।

দশ বছরের ছেলের মুখে এই কথা শুনে সুজাতা বলে, কি সব আবোল-তাবোল বকছিস। এখানে ঠাকুর তোর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে!

হ্যাঁ মা, তুমি বিশ্বাস কর। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি তো বাঁশীর সুর শুনে জেগে যাই। কৃষ্ণঠাকুর আমার মাথার কাছে বসে বাঁশী বাজায়। আমার সঙ্গে কথা বলে।

ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে যায় সুজাতা। আবার ভাবে কি জানি, ছেলেটা তো ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর পাগল। নার্সিংহোমের কয়েকজনও বলেছে মাঝে মাঝে রাত্রে ও নাকি নিজের মনে কথা বলে। সুজাতার মনে অজানা একটা ভয় বাসা বাঁধে।

মনের ভাব প্রকাশ না করে সুজাতা ছেলেকে অন্য কথা বলে ভোলাতে চেষ্টা করে এবার। খাবারও খাইয়ে দেয়। এর মধ্যেই সোমনাথ আসে। প্রবীরের কাছে বসে বলে, তুই এবার বাড়ি যাবি খোকা। আর সাতদিনের মধ্যে তোর ছুটি হয়ে যাবে। এখন শুধু— কথাটা আর শেষ করে না। সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলে, ডাঃ মুখার্জী বলেছেন, তুমি ইচ্ছে করলে আজ এখানে থাকতে পার। কথাটা বাড়িতে একবার বলেছিল সুজাতা। তাই ও খুশি হয়।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়। সুজাতা আর প্রবীরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আরও একবার ডাঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে কিছুটা চিন্তান্বিত মনে বাড়ি ফিরে আসে সোমনাথ।

রাত্রির ব্যস্ততা শুরু হয়। নার্স এসে প্রবীরকে ওষুধ খাইয়ে যায়। সুজাতা পাশের ঘরে থাকবে। সোমনাথ বাইরের দোকানে সুজাতার খাওয়ার কথা বলে গেছে।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়। সুজাতা প্রবীরকে দেখে নিজের জায়গায় চলে যায়। বারবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানায়।

ঘরের মধ্যে মৃদু নীল আলো জ্বলছে। কর্তব্যরত নার্স মেয়েটি কিছুক্ষণ বই পড়ে ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। রোগীরাও সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন। হঠাৎ এমন সময় বাঁশীর সুর শুনে ঘুম ভেঙে যায় প্রবীরের। কয়েকদিন হলো তো এমনিই হচ্ছে। বিছানায় পাশ ফিরে শোয় প্রবীর। বাঁশীর সুর ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। আর শুয়ে থাকতে পারে না প্রবীর। ধীরে ধীরে হাত দিয়ে দুই পা ধরে বিছানায় বসে। আর ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্ করে নূপুরের শব্দ হয়। কে যেন নূপুর পায়ে হাঁটছে। বিস্ফারিত চোখে প্রবীর সামনের দিকে তাকায়। কিন্তু কই, কেউ তো নেই! অথচ স্পষ্ট বাঁশীর সুর আর নূপুরের ধ্বনি কানে বাজছে। ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলে প্রবীর। আপন মনে বলে, আমাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ পাও ঠাকুর। তুমি যদি সত্যি দয়াল হরি হও, তাহলে আমার সামনে এসে কথা বল।

প্রবীরের আকুতিভরা কথা শেষ হতেই দরজার সামনে একটা উজ্জ্বল আলোর জ্যোতি ভেসে ওঠে। আর বড় বড় চোখে প্রবীর দেখে ওর ছবির শ্রীকৃষ্ণ জ্যান্ত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে মিটি-মিটি হাসছে। দুই চোখ রগড়ে প্রবীর বলে, অতদূরে কেন ঠাকুর, তুমি আমার কাছে এস।

একটা মধুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, আমি যাব না, তুই আমার কাছে আয়।

প্রবীর কান্নাভেজা গলায় বলে, তুমি তো জান, আমি হাঁটতে পারি না। পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা।

ঠিক পারবি। বিছানা থেকে নাম, নিচে নেমে আয়।

না-না, আমি পারব না ঠাকুর।

আমি বলছি পারবি। এই তো আমি হাত বাড়িয়েছি। আয়, নেমে আয়, নেমে আয়।

বার বার একই কথা ভেসে আসে। প্রবীরের মনেও যেন এতক্ষণে কিছুটা সাহস এসেছে। মনের মধ্যে একটা আলোড়নও শুরু হয়েছে। কৃষ্ণঠাকুর নিজে যখন বার বার বলছে নেমে আসার কথা, দেখাই যাক না। মাথার মধ্যে হাজারটা ঢাকের শব্দ শুরু হয়েছে। শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে আর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে প্রবীর ধীরে ধীরে একটা পা ঠেলে নিচে নামায়, তারপর আর একটা।

হ্যাঁ, এই তো, এবার নিচে নাম—। আবার আদেশের সুর ভেসে ওঠে। প্রবীর লক্ষ্য ঠিক রেখে দুই পা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়। অবাক কাণ্ড! পায়ে কোনো যন্ত্রণা তো নেই। দুই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রবীর। আলোর জ্যোতির রেখা ঘুরে যায়। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আবার বলে, ঠিক হয়েছে এবার হাঁটতে শুরু কর।

মনের ভয় এখন আর একটুও নেই। ঠাকুরের নির্দেশমতো এবার প্রবীর ঘরের মধ্যে হাঁটতে থাকে। দীর্ঘ কটা বছর যে ও বিছানায় শুয়ে ছিল সে কথা মনেই পড়ে না। হাঁটতে হাঁটতে সারা ঘর ঘুরে বেড়ায়। বাঁশীর সুরও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। আর দরজার দিকে এগিয়ে যায় নূপুরের শব্দ। প্রবীর প্রায় দৌড়ে দরজার সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, না না, তুমি যেও না ঠাকুর, তুমি যেও না। দাঁড়াও।

প্রবীরের চিৎকারের শব্দে নার্সের ঘুম ভেঙে যায়। আরও অনেকেই জেগে ওঠে। প্রবীরকে দরজার সামনে দেখে ভয়ে হতবাক হয়ে যায় নার্স। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। ঘরের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়। নার্সটি চিৎকার করে অন্য সবাইকে ডাকে। পাশের ঘর থেকে ভয়ার্ত চোখে ছুটে আসে সুজাতা।

সবার বিস্ময়ভরা চোখের সামনে মায়ের দিকে এগিয়ে যায় প্রবীর। দুই হাতে প্রবীরকে জড়িয়ে ধরে সুজাতা। ঘটনার আকস্মিকতায় কারও মুখে আর কথা যোগায় না। রাতও প্রায় শেষ হতে চলেছে। প্রবীরকে ঘিরে সবাই কথা বলছে। এ যে সত্যি ভাবা যায় না! কাল যার অপারেশান, দীর্ঘকাল যে ছেলেটি পায়ে ব্যথা নিয়ে শয্যাশায়ী ছিল সে কিনা দিব্যি হাঁটছে! এ তো সত্যি ঈশ্বরের করুণা। অঘটনই ঘটল।

ভোরেই ডাঃ মুখার্জী সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন। বিজ্ঞান আজ এই অলৌকিক ঘটনার কাছে মূক হয়ে গেছে। প্রবীরের পা বার বার পরীক্ষা করে ডাঃ মুখার্জীও বিস্মিত হয়ে যান। ছেলেটির পায়ের হাড়ের ও লিগামেন্টের রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। হাঁটতে কিছুই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। একবার প্রবীরের দিকে আর একবার শ্রীকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে ডাঃ মুখার্জী ধীর শান্ত পদক্ষেপে নিজের চেম্বারে ঢুকে যান। প্রবীর কিন্তু সবাইকে হাসি হাসি মুখে কাল রাত্রির ঘটনা বলে চলেছে।

একসময় সোমনাথও এসে যায়। বাইরে গুঞ্জন শুনেছিল। নার্সিংহোমে ঢুকে প্রবীরের ঘরে এসে সোমনাথও কথা বলতে পারে না। আনন্দে কেঁদে ফেলে। প্রবীরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। বাবা-মা'র হাত ধরে সবার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রবীর ডাঃ মুখার্জীর ঘরের দিকে এগিয়ে যায় এবার।

ছবি ঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সত্য ঘটনা অবলম্বনে

দুলালের গল্প

নবনীতা দেবসেন

দুলালকে সবাই 'দুলাল চোর' বলে ডাকে। অথচ বেচারা দুলাল যে চোর, তা কিন্তু নয়। দুলালের মা নেই, বাবা আবার বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে উঠে গেছেন। দুলাল তাই বুড়োবুড়ি দাদু-দিদিমার কাছেই থাকে। দুলালকে 'দুলাল চোর' বলে ডাকায় দুলালের মনে কত কষ্ট! ওর দাদু অন্ধ, ঘুঁটেকুড়ুনী দিদিমার পরিশ্রমের অন্ত নেই, আবার মনেও খুব কষ্ট। দুলাল দুষ্টু, ওর চুরির ধরনটা নতুন কিছুই নয়। গাঁসুদ্ধু সব ছেলেপুলেই অমনটা করে থাকে। আম পাকলো তো আমগাছে ঢিল মারছে, পেয়ারাগাছে উঠে ডাঁশা পেয়ারা খাচ্ছে। কে না করে এ কম্মো? তা বলে তাদের কেউ তো চোর বলে না। বলে দুলালকে। কেননা পিন্টুকে চোর বললেই পিন্টুর পিসি কোমর বেঁধে তেড়ে এসে ঝগড়া করবে; গাবুকে চোর বললে গাবুর বাবা লাঠি নিয়ে মারতে আসবে; কানাইকে চোর বললে কানাইয়ের দিদি বঁটি নিয়ে তেড়ে আসবে। দুলালের বুড়ো দাদু-দিদিমার ঝগড়াটে স্বভাব নয়। তাঁরা জানেন তাঁদের দুলাল চোর নয়। দুলাল বাগাল। মানে রাখাল। মিত্তিরবাড়ির গরু চরায়। ওই মিত্তিরবাড়িই অমন বিচ্ছিরি নাম দিয়েছে ওর, অথচ মিত্তিরবাড়ির যে কোনো ফাইফরমাস খাটতে হলেই চাই দুলালকে। "এ্যাই দুলাল চোর" ওদের ডাকই এই—"যা তো হাট থেকে একজোড়া লাল গামছা কিনে আনবি। এই নে চোদ্দ টাকা।" দুলাল এসে দু'টাকা ফেরৎ দেয়, বহুৎ দর কষাকষি করে বারো টাকাতে কিনেছে। তবু কেন সে চোর? যে জন্যে কেষ্টঠাকুর মাখনচোর। যখন খুব ছোট ছিল, কী মনে করে একবার গরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খেয়েছিল দুলাল। মিত্তিরদের পুকুরঘাটে তখন বাসন মাজছিল বুড়ো বাসনাদি, সে দেখতে পেয়েই চীৎকার শুরু করে দিলে—"কী চোর ছেলে রে বাবা। গরুর বাঁট থেকে দুধ চুরি করে খাচ্ছে? কী লুভিষ্টি! কী চোর!" সেই শেষ। দুলাল জীবনে তার মায়ের দুধও খায়নি, জন্ম দিতে গিয়েই তো মা স্বর্গে চলে গেলেন। গরুর দুধ সেই ছোট্ট বয়েসে খেয়েছে কিনা মনে নেই। হঠাৎ কী যে খেয়াল হলো, পুকুরধারে মাঠের মধ্যে বাসনাদির সামনেই তো দুলাল মজা করে দুধটা খেয়েছিল, ব্যাপারটা যে এত মন্দ, তা বোঝেনি। চোর কি লোকজন সাক্ষী রেখে চুরি করে? তবু সেই থেকে দুলালের নাম হয়ে গেল 'দুলাল চোর'। বাসনাদি বললে—"সাপে এসে বাঁট থেকে দুধ চুরি করে খায় শুনেছি, তা বলে মানুষে খায় জন্মে শুনিনি বাবু। এ ছেলে কি মানুষ, না সাপ?" মিত্তিরবাড়ির বড়মা বাসনাদির মুখে একথা শুনেও দুলালকে ছাড়িয়ে দেননি। কেবল বললেন—"আর অমন করিসনি বাবা। দুধ খাবি, তা আমাকে বললেই পারতিস? চাঁদি গরুর বাঁটটা এঁটো করে দিলি? ভাগ্যিস তোকে চাট মারেনি।" বাঃ বাঃ— বাছুরে খেলে বাঁট এঁটো হয় না, আর দুলাল খেলেই হয়? আর চাঁদি গরু চাট মারবেই বা কেন? দুলালকে সে খুবই ভালোবাসে। কিন্তু লাজুক দুলাল এসব কথা কিছুই বলেনি। মা জননীর কথার উত্তরে চুপ করে ছিল। বাসনাদি সেই থেকে 'দুলাল চোর' নামটা চালু করে দিলে। আর দুলালের ভীষণ অভিমান হলো কেউ তাতে কোনো আপত্তি করলে না দেখে। উলটে যেন একটা মজার কথা বলেছে এমনি ভাব। দুলালের মুখখানা দেখলেই মায়া হয়। মিত্তিরগিন্নি ওকে মোটামুটি স্নেহ করেন তা দুলালও জানে। কথায় কথায় মুড়িটা চিঁড়েটা দেন। কিন্তু দুধ তো কোনোদিন দেননি। তাছাড়া 'দুলাল চোর' নামটা? কৈ আপত্তি তো করলেন না?

মিত্তিরবাড়ির মেজছেলের বিয়ে। মহাধুমধাম। সাত দিন ধরে বাজি পুড়েছে। ভিয়েন বসেছে। গাঁয়ের লোকের বাড়ি রান্না বন্ধ। মিত্তিরবাড়ির ঘরে ঘরে লোক। মেয়েরা সব এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। জামাইরা এসেছে। আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ি ভরপুর। বাসনাদি একা বাসন মেজে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে এখন তার অনেক অ্যাসিসট্যান্ট। কাঞ্চনদি, বীণাদি, মনুদি, বিন্দুদি, লক্ষ্মীদি। দুলালেরও কাজ বেড়েছে। জামাইবাবুদের ফরমাস, দিদিমণিদের ফরমাস, দুলালের ছোট ছোট পা দুটোই যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে ছুটোছুটি করতে করতে। নতুবা আনন্দের ঢেউ। হঠাৎ একটা ভীষণ গণ্ডগোল শুরু হয়েছে বলে মনে হলো। কী ব্যাপার? বড়বৌদির বোন এসেছেন কলকাতা শহর থেকে, বিলেতফেরত বড়দাদাবাবুর ভায়রাভাই সমেত। তাদেরই কী একটা গণ্ডগোল বেধেছে। দুলাল অত বোঝে না, তার অত ভাবনাচিন্তা করবার সময়ও নেই। সে শুধু দেখল বাসনাদির ওপর খুব চোটপাট

হচ্ছে। নতুন লোকেরা অন্য অন্য বাসন মাজছে, রুপোর বাসন সবই বাসনাদির হেপাজতে। তারই মধ্যে কী যেন একটা হারিয়েছে।

সবাই বলছে হারায়নি, বাসনা চুরি করেছে। ওটা মাজবার কী ছিল? ওটা তো বাসন নয়, তা ছাড়া ওটা রুপোরও নয়। ওটা সোনার তৈরি সিগারেট কেস। বড়দাদাবাবুর সেই বিলেতফেরত ভায়রাভাইয়ের জিনিস। রুপোর থালাভর্তি পান সিগারেট রাখা ছিল, বড়দাদাবাবুর ভায়রাভাই নাকি মনের ভুলে ঐ থালার ওপরেই রেখে দিয়েছেন নিজের সিগারেট কেসটা। তারপর সেটি হাওয়া।

বিয়েবাড়িসুদ্ধু ভীষণ ফিস্‌ফাস্। দুলাল পর্যন্ত জেনে গেল যে সবাই বলছে বাসনাদিই কিছু একটা করেছে। ওই পান সিগারেটের রুপোর বড় থালাটা তো বাসনাদিই মেজেছিল।

বাসনাদি কিন্তু কেবল কাঁদছে, আর মাথা কুটছে, আর বলছে, অমন কৌটো সে চোখেও দ্যাখেনি। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, বাড়িসুদ্ধু তোলপাড়। চৌকির তলা, সিন্দুকের পেছন, কিছু বাদ পড়ল না। কিন্তু সোনার সিগারেটের কৌটো হাওয়া তো হাওয়াই। সে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এত গয়নাগাঁটি থাকতে কিনা কুটুমের একটা শৌখিন জিনিসে লোভ? বাসনার যদি চুরি করারই ইচ্ছে ছিল, তা গয়নার কি অভাব ছিল ঘরে? বড়দাদাবাবুর ভায়রাভায়ের জিনিসটা চুরি করলে? বিয়েবাড়িসুদ্ধু লোক বাসনাদিকে ছি ছি করতে লাগলো। বড়মা বললেন, "বাসনা, ব্যাপার যাই হোক না কেন, এর পর তোমাকে রাখা চলে না। লোকে ভয় পাচ্ছে।" বাসনাদি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বিয়েবাড়ির মজাটাই তার মাটি।

দুলালের মনে কষ্ট হলো। যদি বাসনাদি চুরি না করে থাকে? তাহলে মিছিমিছি চোর বদনামের যে কত দুঃখু তা দুলাল জানে। বিয়েবাড়ির হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বাসনাদির কথা কারুর মনেই রইলো না। বড়দাদাবাবুর ভায়রাভাই বাসনাদিকে পুলিশে দিতে চাইছিলেন, বড়মা বললেন, "ওসব হবে না। আমি বাবা তোমার ওই কৌটোটা ফের গড়িয়ে দেব।"

দুলাল, গাবু আর পিন্টু গরু চরায়। রোজ ভোরে উঠে ওরা মাঠে যায়। গরু চরাতে গিয়ে হঠাৎ কী একটা সাদামতন জিনিস দেখতে পেল দুলাল। ঝোপের মধ্যে। একখানা রুমাল পড়ে আছে। কেউ হয়তো সকালে পুকুরপাড়ে মাঠে এসেছিল? রুমালটা তুলে নিয়েই দুলাল তাতে সুন্দর একটা গন্ধ পেল। তারপরই দ্যাখে একটা চৌকো চ্যাপ্টা সোনার বাক্স ঘাসের ওপর পড়ে আছে। আর শিশিরভেজা একটা দেশলাই। আরে? এইটেই বড়দাদাবাবুর সেই ভায়রাভায়ের কৌটোটা নয় তো? বাসনাদি সেই যেটা চুরি করেছে?

—"গাবু! পিন্টু!" দুলাল চেঁচায় তক্ষুণি। "দেখে যা!" গাবু, পিন্টু এসে পড়ল। "দ্যাখ্ তো এটা কী?" সত্যিই তো? সোনার কৌটোই তো বটে। ভোমরাভুমরী কি এমন কৌটোতে থাকে? আহা, কী সুন্দর দেখতে!

—"চল্ চল্, মিত্তিরবাড়ি চল্, রুমালসুদ্ধু কৌটোটা ফিরিয়ে দিইগে। মাঠে জল ফিরতে এসে নিশ্চয় উনি বাক্স, রুমাল, দেশলাই-টেশলাই সমস্ত ফেলে গেছেন। শহুরে মানুষ তো, মাঠে যাওয়া তো অমন অভ্যেস নেই!" রুমালে জড়ানো দেশলাই আর সোনার বাক্স নিয়ে দুলাল রাজার মতো পা ফেলে ফেলে হাজির হলো সোজা বড়মার কাছে। "বড়মা, বড়মা, এই দ্যাখোদিকিনি আমরা মাঠে কী কুড়িয়ে পেয়েছি!" বিয়েবাড়ি যদিও শেষ, তবু আত্মীয়-কুটুম্ব সবাই তখনও যায়নি। বড়মার তো গালে হাত! বললেন—"হ্যাঁরে দুলাল, তোরা এসব কোথায় পেলি?" দুলাল, গাবু, আর পিন্টু একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে শেষে বলেই ফেললো, মাঠে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়ে কেউ এগুলো ফেলে এসেছিলেন মনে হয়। দেশলাই, রুমাল, সোনার সিগারেট কৌটো সবই কদিন ধরে পড়েছিল নিশ্চয় মাঠে, শিশিরভেজা হয়ে। ওরা আজ দেখতে পেয়েছে।

বড়দাদাবাবুরা তখনও আছেন, সোনার সিগারেট কৌটো হারিয়ে রাগে মট্‌মট্ করতে করতে ভায়রাভাইমশাই কলকাতায় চলে গেলে কি হবে! বৌদিদিমণি বললেন, "হ্যাঁ, এই রুমালও তারই, আর ঐ কৌটোও তার।" বৌদিদি তো হেসেই অস্থির। "সাহেব মানুষ, মাঠে গিয়ে ক'টা জিনিস সামলাবে বলো তো? তার কি ওসব অভ্যেস আছে?" বড়মা বললেন, "দশটা জিনিস সামলাতে পারেনি, সেটা দোষের নয়। তা বলে পানের থালাতে সোনার কৌটো রেখেছি বলে বাড়ি মাথায় করলে, আমরা মিছিমিছি বাসনাকে ছাড়িয়ে দিলুম কুটুমভরা বাড়িতে—চোর বদনাম দিয়ে। বিনা অপরাধে একটা লোককে চোর বদনাম দেওয়াটা কি ঠিক হলো?"

দুলাল মনে মনে ভাবলে, কৈ তার বেলায় তো বড়মার এ কথাটা মনে হয়নি। বড়মা দুলালকেই পাঠালেন বাসনাদির বাড়িতে।

ক'দিনে মনের দুঃখে চোর অপবাদে বাসনাদির চেহারা খুব করুণ হয়ে গেছে। দুলাল গাবু পিন্টুর সঙ্গে বড়মার কাছে এলো। কৌটোটা দেখলো। কোনো কথাই বললে না।

বড়মা বললেন—"তোমাকে অন্যায় অপবাদ দিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছিলুম বাসনা, মনে দুঃখু নিও না—তুমি আবার আজ থেকে যেমন ছিলে তেমনি থাকবে।" বাসনাদি এবার হঠাৎ দুলালকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লে।

"এ আমারই দোষ মা। আমার অন্যায়ের ফল। ক'দিন ধরেই আমার দুলালের কথা মনে পড়েছে। মা-মরা ছেলেটা একটু দুধের বাঁটে মুখ দেছলো, সেই থেকে 'দুলাল চোর' নাম চালু হয়ে গেল। ভগবান আমাকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন বড়মা। আমার মস্ত অপরাধ হয়েছিল।"

দুলালও বাসনাদির বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে এই ফাঁকে একটু কেঁদে নিলে। এটা অবিশ্যি দুঃখের কান্না নয়। আহ্লাদের।

ছবি: সুফি

গোঁফের চোপ্

দীপঙ্কর বিশ্বাস

Zoo-এর হাতি বললে চোপ্
রাখবো আমি বিশাল গোঁফ।
গোঁফ ছিল বীর সাজাহানের
নাদির শা আর খাঞ্জা খানের।

শীল, শিঙি আর সিন্ধুঘোটক
সবার আছে গোঁফের চটক।
সিংহ, চিতা, শেয়াল, পুষি
গোঁফ রেখে ভাই সবাই খুশি।
করতে যাচাই গোঁফের মান
প্রশ্ন আছে কয়েক খান।

গোঁফ ছিল কি দুর্যোধনের?
সজারু আর ইস্কাপনের?
গোঁফ রাখে কি ইস্টিশন?
হিস্টরি আর মিষ্টি পান?
জবাব পেলেই আজ এখনি
ঝুলিয়ে দেব গোঁফের বেণী।

ছবি ঃ রাহুল মজুমদার

বনবিবির দরগা

মঞ্জিল সেন

নৌকোটা বেশ বড়ই। মোট দশজন ছিল নৌকোয়, দাঁড়ি-মাঝি ছাড়াই। দশজনের সবাই মউলি, মানে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করা যাদের পেশা। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল পাকা মউলি, ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বলে দিতে পারে ধারে কাছে চাক আছে কিনা। মৌমাছি দেখে তার অনুসরণ করে মউলিরা, ওই মৌমাছিই তাদের পৌঁছে দেয় চাকের কাছে। সুন্দরবনে মৌচাকের যেন আড়ত, একটা মৌচাকের আশেপাশে আরও অনেক চাক থাকে, মৌমাছিরা বোধহয় কাছাকাছি চাক বাঁধাই পছন্দ করে। তবে সব সময় নয়।

চাক ভাঙবার পর টপটপ করে মধু যাতে ঝরে পড়ে না যায় তাই গামলা, বড় টিন, হাঁড়ি এসব সঙ্গে থাকে মউলিদের, তার মধ্যে জমা হয় মধু। চাক যদি বেশি উঁচুতে না হয় তবে শুকনো ডাল-পাতা জড়ো করে গাছের নিচে আগুন ধরিয়ে দেয় মউলিরা। প্লাস্টিক কিংবা অন্য কোনো আবরণে নিজেদের ঢেকে রাখে যাতে ধোঁয়ায় চাক ছেড়ে বেরিয়ে তাদের দংশন করতে না পারে মৌমাছি। মৌমাছির দংশনে বড় জ্বালা। তবে সেই যে বলে না, 'জলেতে না ডুবিলে কেহ শেখে না সাঁতার', তেমনি মৌমাছির হুলের খোঁচা না খেলে পাকা মউলিও হওয়া যায় না।

চাক যদি বেশ উঁচুতে হয় তবে একটা লম্বা বাঁশের আগায় বেশ করে খড় জড়িয়ে তা পাট বা পাটের দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। তারপর কেরোসিনের ছিটে দিয়ে আগুন ধরালেই হলো। ধোঁয়া সমেত ওই আগুনে-বাঁশ চাকের তলায় ধরলেই মৌমাছিরা পালাতে শুরু করে। ওরা ফিরে আসার আগেই দু-একজন মগডালে উঠে পড়ে চাকটাকে সাবধানে ভেঙে দড়ি বাঁধা এক পাত্রের মধ্যে ভরে ফেলে, তারপর নামিয়ে দেয় দড়িটা। চাক ভাঙা সেই মধুর আস্বাদই আলাদা, যেন অমৃত সুধা, একটু বেশি খেলে মন ফুরফুর করে, আবেশ আসে।

কাজটা যেমন সহজ নয় তেমন বিপজ্জনকও বটে। জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রত্যেক বছরই কেউ না কেউ বাঘের পেটে যায়। বনবিবির নাম স্মরণ করেও রক্ষা পায় না মউলিরা।

দুদিন হলো ওরা এখানে নৌকো ভিড়িয়েছে। দুপাশে গভীর বন। বড় নদী থেকে একটা সরু খাল এসে ঢুকেছে এখানে। সুন্দরবনে এমন অসংখ্য খাল। এই খাল দিয়ে বনের গভীরে চলে যায় নৌকো। এইসব বনে ঢুকতে বনবিভাগের পারমিট লাগে। সবার কাছেই যে পারমিট থাকে এমন নয়, লুকিয়ে-চুরিয়ে অনেকে বনে ঢোকে, মধু চুরি করে চম্পট দেয়। তবে পেট্রোলবাবুদের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই, মালসুদ্ধু সবাইকে চালান দেবে সদরে। পারমিট থাকলেও মধুর ভাগ দিতে হয় সরকারি বাবুদের।

ওদের কাছে অবিশ্যি পারমিট ছিল। বনবিভাগ থেকে ভাড়া করা একটা বন্দুকও ছিল দলের সঙ্গে। শুধু বাঘের ভয়ই নয়, অন্য একটা ভয়ও আছে। কয়েকটা ডাকাতি হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে। ডাকাত মানে জলদস্যু। বড় নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ষণ্ডা-মার্কা সব চেহারা, সঙ্গে থাকে মারাত্মক সব অস্ত্র। কখনও কখনও খালের মুখে লুকিয়ে থাকে, শিকার দেখলেই সাঁসাঁ করে এসে চড়াও হয় শিকারের ওপর, সব কিছু লুঠ করে নেয়। শুধু এখানকার জলদস্যুই নয়, নদী দিয়ে বাংলাদেশ থেকেও জলদস্যুরা এসে হানা দেয়।

আজ নিয়ে দশ দিন ওদের নদীতে কেটেছে। প্রথম কয়েকদিন ওরা এ-জঙ্গল ও-জঙ্গল নিষ্ফল ঘুরেছে, চাকের সন্ধান পায়নি। দু'দিন হলো ওরা এ দিকটায় এসেছে। খালটা বেশি চওড়া নয়, একটা বড় নৌকো ঢুকতে পারে। অনেকটা ঢোকার পর মৌমাছির দেখা ওরা পেয়েছিল। একটা দুটো নয়, এক ঝাঁক মৌমাছি, বোধহয় মধু আহরণে বেরিয়েছে। ওরা তাদের ওপর নজর রেখেছিল। ওদের সঙ্গে দড়ি-দড়া, ঝুড়ি, বাসনপত্তর ছাড়াও ছিল দা-কুড়াল, লাঠি, এমনকি টাঙ্গি পর্যন্ত বাদ যায়নি। এ তো আর যে সে বন নয়, সুন্দরবন। পদে পদে বিপদ, ঝোপ-ঝাড়ে কোথায় হলুদ ডোরা কাটা সাক্ষাৎ যম লুকিয়ে আছে কে জানে। জঙ্গলে ঢুকবার আগে বনবিবির দরগায় পুজো দিতে ওরা ভোলেনি, কিন্তু তবু কি রক্ষে আছে।

তা, সেই মৌমাছি-ঝাঁকের অনুসরণ করে ওরা চাকের সন্ধান পেয়েছিল, একটা দুটো নয় বেশ কয়েকটা। যা পাত্র সঙ্গে ছিল সব ভরে গেল। ওরা নৌকোয় ফিরে এল। চাকভর্তি পাত্তরগুলো নৌকোয় মাঝিদের এবং ওদের একজনের পাহারায় রেখে আবার হাঁড়ি, কলসি নিয়ে ওরা জঙ্গলে গেল দ্বিতীয় খেপের জন্য। মধু সংগ্রহ করতে করতেই বেলা পড়ে এল। জঙ্গলে থাকা আর নিরাপদ নয় দেখে ওরা নৌকোয় ফিরে চলল। পরদিন আরেকবার যাওয়া যাবে। এদিকে ভাঁটা পড়েছে, নৌকোকে সরিয়ে নিতে হয়েছে অনেকখানি। জল সরে যাওয়ায় ময়দা গোলার মতো থিকথিক করছে কাদা, হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়, তাই ভেঙে অনেকটা হেঁটে সবাইকে নৌকোয় উঠতে হলো। যা মধু পাওয়া গেছে, আবার কাল যা পাওয়া যাবে, তাতে পেট্রোলবাবুদের দিয়ে থুয়েও প্রত্যেকের তিন-চারশ টাকা লাভ থাকবে। এবারের যাত্রা খুব শুভ।

পরদিন সকাল সকাল পান্তাভাত খেয়ে ওরা আবার জঙ্গলের ভেতর ঢুকল। দু'দলে ভাগ হয়ে ওরা এগুচ্ছিল। সামনের দলে চারজন আর তাদের কয়েক হাত পেছনে সার বেঁধে পাঁচজন। চারদিকে নজর রাখতে রাখতে ওরা এগোচ্ছিল। বড়েমিঞার ভয়েই এই সাবধানতা। পেছনের সারিতে ছিল করিম শেখ, দলের নেতা। তার কাছেই ছিল বন্দুক। মধু পেয়ে সবাই খুশি, মাঝে মাঝে তাই আনন্দের আতিশয্যটা প্রকাশ না করে পারছিল না। করিম শেখ ওদের হুঁশিয়ার করে বলল, 'চুপ যা, গপ্প করার অনেক সময় পাবি। জঙ্গলের টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত বড়েমিঞার কানে যায়। কোন ঝোপ-ঝাড়ে এসে লুইকে থাকবে কে জানে!'

করিমের কথায় ওরা সাবধান হয়ে গেল। বড়েমিঞার নামে ভয় পায় না এমন মানুষ সুন্দরবন অঞ্চলে আছে কিনা সন্দেহ। তবে বাঘও কম ধূর্ত নয়। সে জানে জঙ্গলে যারা আসে, চারপাশে তারা নজর রাখে, তাই সামনের দিক থেকে সে আক্রমণ করে না, করে পেছন থেকে, যে দিকটায় নজর থাকে কম। মানুষ তো আর পেছন ফিরে হাঁটে না। ধূর্ত বাঘ সামনে থাকলেও ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে পেছন দিকে চলে যায়। তার জন্য তাকে হয়তো অনেকটা ঘুর পথে আসতে হয়, কিন্তু বাঘের পক্ষে সেই দূরত্ব কিছুই নয়।

ওরা গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে পড়েছিল, হঠাৎ কয়েকটা গাছে এক দল বানরের মধ্যে যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, তারপরই সব চুপচাপ। এমনকি পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ কোন জাদুমন্ত্রবলে বনে একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। অতি বড় সাহসীরও বুক না কেঁপে পারে না।

করিম শেখ চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই দাঁইড়ে যা, হাতের অস্তর নিয়ে জঙ্গলের দিকে তাইকে গোল হয়ে দাঁইড়ে পড়। সব গায়ে গায়ে লাইগে থাকবি। বড়েমিঞা ধারে কাছেই ঘাপটি মাইরে আছে। আগু-পিছু, আশ-পাশ সব দিকে লজর রাখিস। সবাই একসাথে রুইখে দাঁড়ালে বড়েমিঞার সাধ্যি নাই কিছু করে। ডরাস না কিন্তুক, তবেই সব্বনাশ।'

দলের বেশির ভাগই পুরনো মউলি, এই প্রথম জঙ্গলে আসেনি, বড়েমিঞার সঙ্গে সাক্ষাৎও যে দু-একবার হয়নি এমন নয়। তবু বড়ে-মিঞা, বড়েমিঞাই। সবাই ঘন হয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে যা পেরেছে হাতে নিয়েছে, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলোচ্ছে।

চারদিক নিস্তব্ধ। বানরগুলো যেন মূক হয়ে গেছে। পাখি ডাকছে না। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। মউলিদের বুকের ভেতর দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। বড়েমিঞা বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করে, যাকে ধরে তাকে মুখে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতেই সরে পড়ে। তার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, নয়তো একজনের মৃত্যু নিশ্চিত। করিমের হাতে ছিল বন্দুক। তার হাতের নিশানাও ভালো। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সুন্দরবনের জঙ্গলে জঙ্গলে সেই উঠতি বয়স থেকে তার কেটেছে। বড়েমিঞার মুখোমুখি কয়েকবারই হয়েছে সে। বাঁ কাঁধে বাঘের থাবার একটা বিচ্ছিরি ক্ষত এখনও যেন জ্বলজ্বল করে। এত বয়স হয়েছে, কিন্তু পাকানো দড়ির মতো শরীর, বুক টানটান করে হাঁটে, সাহসের অভাব নেই।

সে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে চারদিকের ঝোপ-ঝাড়ে সতর্ক দৃষ্টি বোলাচ্ছিল। না, কিছু চোখে পড়ছে না। তারপরই হঠাৎ তার মনে হলো বাঁ দিকে একটা হেঁতালের ঝোপের কয়েকটা পাতা যেন নড়ে উঠল। কোনো শব্দ নেই, হাওয়ায়ও নড়তে পারে পাতা। কিন্তু করিম পোড়খাওয়া মানুষ, সুন্দরবনের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখে। কই, আর কোনো ঝোপের পাতা নড়েনি তো! বড়েমিঞা ওই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে, কোনো সন্দেহ নেই। জায়গাটা তাক করে সে গুলি ছুঁড়ল। প্রচণ্ড এক গর্জন, তারপরই ঝোপ-ঝাড় তোলপাড় করে শূন্যে একটা ডোরাকাটা হলুদের ঝিলিক খেলে গেল। শুরু হলো বানরদের কিচিরমিচির। বড়েমিঞা পিটটান দিয়েছে, হয়তো বা আহতও হয়েছে। আহত বাঘ প্রতিশোধ নেবার জন্য আরও হিংস্র হয়ে ওঠে।

মউলির দল জঙ্গলে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে করে ফিরে চলল। একদিনে যা মধু তারা পেয়েছে তাই বা কম কিসে! কখনও কখনও মধু না পেয়েও তাদের ফিরতে হয়েছে। আবার এক হাঁটু কাদা ভেঙে তাদের নৌকোয় উঠতে হলো। সকাল ন'টার আগে জোয়ার আসবে না। ছ'ঘণ্টা অন্তর চলে জোয়ার ভাঁটার খেলা।

এখন ভাঁটা চলছে, জল নেমে গেছে, আর কাদায় কিলবিল করছে ছোট ছোট লাল কাঁকড়া। নৌকোয় যারা ছিল তারা বসে না থেকে পটাপট সেই কাঁকড়া ভরেছে ঝুড়িতে। পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে কষে দারুণ হবে খেতে। মউলির দল পায়ের কাদা ধুয়ে নৌকোয় উঠল। ওই কাদা

পেরনো যাদের অভ্যেস নেই তাদের হয় বেহাল অবস্থা। ভুস করে নরম পাঁকে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়, তাকে টেনে তুলতে না তুলতেই অন্য পা ডোবে। এইভাবে এগোতে হয়, পা ভারি হয়ে ওঠে। পথও কম নয়। ভাঁটা মানেই তো জলের উলটো গতি, অনেকটা সরে যায়। নৌকো যাতে সেই কাদায় আটকে না যায়, তাই জল সরার সঙ্গে সঙ্গে নৌকোকেও সরিয়ে নিতে হয়।

শুরু হয়ে গেল রান্না। মউলিদের সঙ্গে চাল, আনাজপাতি ছিল। এসব নিয়েই মধুর খোঁজে বেরুতে হয়, নইলে জঙ্গলে খাবে কি! নদীর জল লোনা, তাই খাবার জলও সঙ্গে নিতে হয়। আজ অবিশ্যি রীতিমতো ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে, কাঁকড়ার চচ্চড়ির সঙ্গে এক থালা ভাত উড়িয়ে দেবে এক একজন। পেঁয়াজ রসুনের গন্ধে সবার খিদেটা যেন চনমন করে উঠছে।

জোয়ার আসতেই নৌকো দুলে উঠল, মাঝিরাও ছেড়ে দিল নৌকো। ওরা সবাই আশপাশ গ্রাম থেকে এসেছে। সরকারিবাবুদের সঙ্গে কাজকর্ম চুকিয়ে গাঁয়ে ফিরতে ফিরতে বেলা পড়ে যাবে।

বড় নদীতে এসে পড়ল নৌকো। প্রায় আধঘণ্টা পর মাঝিদের নজরে পড়ল উল্টো দিক থেকে একটা ছিপ তীরগতিতে ওদের দিকেই আসছে। তাতে আটজন দাঁড়ি। বেশ লম্বা নৌকো। ছিপে যারা ছিল তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মাঝিদের কেমন সন্দেহ হলো। মউলির দলকে মাঝিরা হুঁশিয়ার করে দিল।

করিম বলল, 'গতিক সুবিধের নয় মনে হতিছে, জলডাকাত নয় তো!'

ততক্ষণে সবাই ছইয়ের ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। করিমের নির্দেশে তারা লাঠি, কুড়ুল, দা, যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। করিমের হাতে বন্দুক। ধারে কাছে নৌকো চোখে পড়ে না।

ছিপটা একটু দূরে থাকতেই একজন চোঙা মুখে হাঁক দিয়ে বলল, 'নৌকো থামাও নয়তো গুলি করব।'

সঙ্গে সঙ্গে ছিপের সামনের দিকে চারজন লোক এসে দাঁড়ালো। মাথায় গামছা বাঁধা, প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। তাদের পেছনে আরও লোক, সবাই সশস্ত্র। কারও হাতে বোমা, কারও হাতে রাম-দা, কারও হাতে লাঠি। দলেও অনেক ভারি। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া মানে মৃত্যু ডেকে আনা।

নৌকো থামাতে হলো। ছিপটা নৌকোর পাশে এসে ভিড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গলুই থেকে জলদস্যুরা লাফিয়ে উঠে এল নৌকোয়। মাঝিদের হুকুম করল ছিপের পেছন পেছন নৌকো চালাবার। নদীর তীর ঘেঁষে বেশ কিছুটা যাবার পর একটা খাঁড়ির ভেতর ঢুকল ছিপটা। দুপাশে জঙ্গল। জঙ্গলের ধারে একটা দ্বীপের পাশে ছিপ আর নৌকোটা থামল। এমন ছোট ছোট অনেক দ্বীপ আছে সুন্দরবনে। বসতিহীন। এমন নির্জন অঞ্চলে নৌকো নিয়ে অনায়াসে গা ঢাকা দেওয়া যায়। জলদস্যুরা বোধহয় এই জায়গাটা তাদের সাময়িক আস্তানা হিসাবে বেছে নিয়েছে। নৌকোর সব জিনিসপত্তর, এমনকি চাকভর্তি পাত্রগুলো পর্যন্ত লুঠ করল ডাকাতরা। শুধু তাই নয়, গপগপ করে তারা খেল নৌকোর মাঝিদের রান্না করা ভাত আর সেই কাঁকড়ার চচ্চড়ি। মউলিদের আর মাঝিদের পেটে পড়ল না একটা দানাও।

করিম আর তার সঙ্গী সাথীদের বুক ফেটে কান্না আসতে চাইছিল। কত কষ্টে কিছু টাকা-পয়সা যোগাড় করে তারা মধু সংগ্রহ করতে এসেছিল। যা মধু পাওয়া গিয়েছিল তাতে খাই-খরচা মিটিয়েও বেশ লাভ হতো। এখন ফিরতে হবে খালি হাতে। এমনকি যা চাল-ডাল সঙ্গে এনেছিল তাও লুঠে নিয়েছে ডাকাতরা। এ যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। কিন্তু তাদের কপালে যে আরও দুঃখ আর দুর্ভোগ ছিল তা তখনো তারা ভাবতেও পারেনি।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে জলদস্যুদের সর্দার করিমকে তার ছিপে ডেকে পাঠালো। করিম যে মউলি দলের নেতা সেটা আগেই জেনে নিয়েছিল দস্যুসর্দার।

দস্যুসর্দার পেট পুরে খেয়ে আধ শোয়া অবস্থায় আয়েস করছিল। করিম সামনে এসে দাঁড়াতেই সর্দার বলল, 'তোমাদের মুক্তিপণ দিতে হবে যে।'

'মুক্তিপণ! সেটা আবার কি?' করিম ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

'আরে তোমরা তো এখন আমাদের বন্দী', সর্দার মুখে একটা পান পুরল, 'ছাড়া পেতে হলে কিছু দক্ষিণা দিতে হবে না? মানে তোমাদের মুক্তির জন্য টাকা চাই আমার, জন পিছু দু'হাজার টাকা।'

'দু'..হা..জা..র!' করিম যেন বিশ্বাস করতে পারে না, 'আমরা গরিব মানুষ', সে বলল, 'দু-দশ টাকার মুখই আমরা দেখতে পাই না, দু'হাজার টাকা পাব কোথায়?'

'ওসব ছেঁদো কথায় আমি ভুলব না', সর্দার পান চিবুতে চিবুতে বলল, 'শোন, তোমাদের মধ্যে দু'জনকে আমরা কোনো ঘাটে ছেড়ে দিয়ে আসব। বাকিরা এখানেই থাকবে। আজ থেকে ঠিক সাত দিন পরে রাত বারোটায় ওই ঘাটে তারা টাকা নিয়ে অপেক্ষা করবে। একজনের মাথায় লাল গামছা বাঁধা থাকবে, আমাদের লোকের চিনতে সুবিধে হবে। তাদের হাতেই দিতে হবে টাকা। যদি থানা পুলিশ কর তবে যারা এখানে থাকবে তাদের কেউ বাঁচবে না। খুন করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেব। ওই ঘাটে আমাদের অন্য লোকও থাকবে, বেগড়বাই দেখলেই তারা আমাকে এসে খবর দেবে। বুঝেছ?'

'কিন্তু অত টাকা আমরা পাব কোথায়!' করিম অসহায় কণ্ঠে বলল, 'ধারকর্জ করে বনে এয়েছিলাম। আমরা গরিব মানুষ।'

'বললাম তো, সেটা তোমার ব্যাপার। টাকা যদি না পাই তবে তোমাদের এই জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যাব। নৌকো ডুবিয়ে দেব। জঙ্গলে সবাই বাঘের পেটে যাবে, ভোজের উচ্ছব পড়ে যাবে ওদের মধ্যে।'

করিমের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এ কি বিপদে পড়ল তারা! এত টাকা কোথা থেকে যোগাড় হবে! জনা প্রতি দু'হাজার, তার মানে মোট কুড়ি হাজার।

নৌকোয় ফিরে এসে সবাইকে দুঃসংবাদটা দিল করিম। ডাকাতদের দাবি শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সবাই। মরে গেলেও অত টাকা ওরা যোগাড় করতে পারবে না, শেষ পর্যন্ত হয়তো বাঘের পেটেই যেতে হবে। এ দিকটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা, তাই বোধহয় এখানে ঘাঁটি গেড়েছে জলডাকাতরা। নিরস্ত্র অবস্থায় দল বেঁধে থাকলেও জঙ্গল নিরাপদ নয়। এক এক করে তুলে নিয়ে যাবে বড়েমিঞা।

সন্ধ্যের মুখে ডাকাতরা ছিপ আর নৌকো দুটোকেই নদীর যেখান থেকে খাল শুরু হয়েছে সেখানে সরিয়ে নিয়ে এল। ভেতরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, মানুষের গন্ধে গন্ধে বাঘ এসে পড়তে পারে। খালের মুখও যে খুব নিরাপদ তা নয়, তবে চট করে নৌকো নদীতে সরিয়ে নেওয়া যায় এই ভরসা। খাল দিয়ে ভেতরে ঢুকলে সেই সুযোগটা থাকে না।

ভোর রাতে ওদের দুজনকে নিয়ে রওনা হবে, এই কথা বলে

দিয়েছিল ডাকাতদের সর্দার। ওদের চাল-ডাল দিয়েই রাত্রে খিচুড়ি রান্না হলো। দয়া করে রাত্রে ওদের খেতে দিল ডাকাতরা তবে মাত্র দু'হাতা করে। ওদের মতো খেটে খাওয়া, উপোসী মানুষের কাছে দু'হাতা খিচুড়ি খিদেটাই শুধু বাড়িয়ে দিল।

অত বিপদের মধ্যেও মউলির দল সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। শুধু করিমের চোখে ঘুম নেই। সে এই দলের নেতা, সবার দায়িত্ব তার ওপর, এই চিন্তায় তার ঘুম আসছিল না। দলের সবচেয়ে যে ছোট তার নাম হারাধন, বয়স কুড়ি/বাইশ। এই দ্বিতীয়বার সে সুন্দরবনে এসেছে। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ছেলেটার মা নৌকো ছাড়বার আগে করিমের হাত দুটো ধরে অনুনয় করে বলেছিল ছেলের ওপর নজর রাখতে, যেন কোনো বিপদ আপদ না ঘটে। মায়ের কাতর মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

ডাকাতরা ছিপের সঙ্গে নৌকোটা বেঁধে রেখেছে। দু'জন পালা করে ছিপে পাহারা দিচ্ছে। এখন জোয়ার চলছে, রাত তিনটেয় শুরু হবে ভাঁটা। নৌকো হেলছে দুলছে, ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ এসে ধাক্কা মারছে নৌকোর গায়ে। এখন যদি নৌকো ছাড়া যেত তবে স্রোতের মুখে তরতর করে এগিয়ে যেত।

বিবি বাচ্চার কথাও মনে পড়ছে করিমের। এ জন্মে তাদের সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না। আসবার সময় ছোট মেয়ে হাসিনা আবদার ধরেছিল তার জন্য আব্বাজান যেন একটা বাঘের বাচ্চা ধরে নিয়ে আসে। সেই বাঘের পেটেই যেতে হবে সবাইকে। এই ডাকাতদের কথা ও শুনেছে। যারা গরিব মানুষদের সব কিছু লুঠ করে তাদের কাছে দয়া-মায়া আশা করা মিথ্যে।

আকাশে চাঁদটা থালার মতো দেখাচ্ছে, আর দুদিন পরেই পূর্ণিমা। ছিপের দুধারের গলুইয়ে দু'জন ডাকাত বসে বসে ঢুলছে, তাদের বোধহয় পাহারা দেবার পালা। ছিপটা নদী আর খালের মুখে, তার পেছনে নৌকোটা।

দড়িটা কেটে দিলে কেমন হয়! নিঃশব্দে ওরা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে যাবে। মরতে তো হবেই, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! করিম আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে দলের লোকজনদের জাগালো, তারপর খুলে বলল নিজের মতলবটা। পাহারাদাররা ঢুলছে। দড়ি কেটে দিলে ছিপটা একটু বেশি দুলে উঠবে, তা সেটা ওরা টের নাও পেতে পারে। ওদের সব অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল ডাকাতরা। শুধু আনাজ-পত্তর কাটবার জন্য একটা ছোট বঁটি ছিল। সেটাই নিয়ে এল একজন।

ঠিক তখুনি ভীষণ চমকে উঠল করিম। আলো-আঁধারিতে ওর দেখতে ভুল হয়নি। একটা নয়, দুটো মাথা ভাসছে জলে। বিরাট মাথা। নিঃশব্দে জল কেটে এগিয়ে আসছে দুটো বাঘ। ছিপটার দিকেই আসছে সাঁতার কেটে। জলে এতটুকু আলোড়ন নেই। আতঙ্কে করিমের শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল, মুখ দিয়ে কথা সরছে না। আশ্চর্য! ও ছাড়া আর কেউ লক্ষ্য করেনি ব্যাপারটা। বাঘ দুটো ছিপে উঠল। ছিপের সঙ্গে সঙ্গে ওদের নৌকোটাও খুব জোরে দুলে উঠল। একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল ছিপ থেকে। তারপরই শুরু হলো ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি। প্রাণভয়ে ছিপের মানুষরা ঝুপ-ঝাপ নদীর জলে লাফিয়ে পড়ছে।

হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরে এল করিমের। সঙ্গীর হাত থেকে বঁটিটা ছিনিয়ে নিয়ে কেটে দিল দড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে সরে গেল নৌকোটা। করিমকে আর কিছু বলতে হলো না, মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় বাইতে শুরু করে দিল। বাঁচার আশায় তাদের শরীরে যেন দ্বিগুণ বল এসে ভর করেছে। স্রোতের মুখে নৌকো তরতরিয়ে এগিয়ে চলল।

যখন প্রথম ভোরের আলো ফুটল, তখন ভাঁটা এসে গেছে কিন্তু নৌকো সেই খালের মুখ থেকে অনেক দূরে। টহলদারী একটা মোটর বোট আসছিল, ওদের থামতে বলল, জিগ্যেস করল কোথাকার নৌকো, কোথায় যাচ্ছে? ওদের ভাগ্য ভালো। পেট্রোল বোটের যিনি কমান্ডার তাঁকে আগে থেকেই চিনত করিম। পারমিটের ব্যাপারে কয়েকবারই তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল করিমকে। ভদ্রলোকের নাম মিঃ দত্ত, আগে আর্মিতে ছিলেন, সৎ আর সাহসী বলে সুনাম আছে।

করিম তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তিনি শুনে বললেন, 'আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, এই জলদস্যুদের উপদ্রবে আমরা নাজেহাল হয়ে পড়েছি। কয়েকদিন আগে একটা মাছধরা নৌকো কেঁদুয়া দ্বীপের জঙ্গলে আটকে রেখেছিল। এগারোজন জেলে ছিল সেই নৌকোয়। সেখানেও টাকা চেয়েছিল ওদের মুক্তির জন্য। আমরা অনেক কষ্টে ওদের ঘাঁটির খোঁজ পেয়ে সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি। তোমরা যদি ওদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য কর তবে সরকার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে।'

করিম সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। মিঃ দত্ত ওদের খাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর নৌকোটাকে মোটরবোটের পেছনে বেঁধে করিমের নির্দেশমতো মোটরবোটের মুখ ঘোরালেন। শক্তিশালী মোটরবোট, বেশ জোরেই জল কেটে এগোচ্ছিল। তীর ঘেঁষেই যাচ্ছিল মোটরবোট। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে খালের মুখে ছিপটা চোখে পড়ল করিমের। ও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওই যে হুজুর, ওই দ্যাখেন। জন-মনিষ্যি চোখে পড়তিছে না।'

'তা হোক', অফিসার বললেন, 'সাবধানের মার নেই। ওরা জলদস্যু, ঘাপটি মেরেও থাকতে পারে।'

তিনি তাঁর লোকজনকে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললেন। মোটরবোটে ছিল পনের জন লোক আর বন্দুক ছিল সাতটা।

ছিপের একটু দূরে বোট থামিয়ে মিঃ দত্ত শূন্যে দু'বার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলেন। কিন্তু ছিপের মধ্যে কোনো নড়া-চড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বাঘের ভয়ে কেউ বোধহয় আর ছিপে ফিরে আসেনি। মোটরবোট এগিয়ে গেল। ছিপে কেউ নেই। লোকগুলো গেল কোথায়! যারা নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল তারা কি কুমীর আর কামটের মুখে পড়েছে, না নদীতে ভেসে গেছে! বাঘের হাতেও নিশ্চয়ই দু-চারজন মারা পড়েছে। যারা বেঁচেছে হয় অন্য দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে কিংবা কোনো নৌকো তাদের তুলে নিয়েছে।

ছিপ থেকে ডাকাতদের বন্দুক আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হলো। করিমের ভাড়া করা বন্দুকটাও তার মধ্যে ছিল। আর পাওয়া গেল চাকভর্তি সব পাত্র। করিমের আর আনন্দ ধরে না। আল্লা মেহেরবানি করেছেন। ওদের কোনো ক্ষতি হয়নি, খালি হাতে ফিরতে হবে না।

মিঃ দত্ত বললেন, 'সরকারের পাওনা ভাগটা মকুব করে দিলাম, যা তোমাদের ধকল গেছে, ওটা পুরস্কার বলে ধরে নাও।' তারপর হেসে বললেন, 'বড়েমিঞাই তোমাদের এ যাত্রায় রক্ষা করল করিম শেখ।'

'তা হুজুর একশবার', করিম একগাল হেসে বলল, 'বনবিবির দরগায় আরেকবার সিন্নি চড়াব।'

ছবি ঃ রাজা সরকার

ভয়ঙ্কর সেই রাতে

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা ছিল। ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছিল। কৃষ্ণনগর থেকে বেথুয়াডহরী যাবো বলে আগেই ঠিক ছিল। বিকেলের বাসে ঐ দিনই রওনা হলাম বেথুয়াডহরীতে। জানলার ধারেই জায়গা পেয়েছিলাম বলে, মেঘলা দিনের উড়ন্ত মেঘ দেখতে দেখতে বেশ আরামের সঙ্গেই চলেছি। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি তখনও পড়ছে। বিষণ্ণ বিকেল বিদায় নিয়ে সন্ধ্যে নেমে এল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে যাত্রী-বোঝাই বাস উড়ন্ত গতিতে চলেছে সোজা রাস্তা ধরে। আচমকা কোথা থেকে আছড়ে পড়লো ঝড় আর সেই সঙ্গে সিংহের গর্জনের মতো গুরু-গম্ভীর মেঘের আওয়াজ, বিদ্যুতের ঝলকানি এবং মুষলধারে বৃষ্টি। হুড়মুড় করে সবাই জানলাগুলো বন্ধ করে দিল। আমিও আমার জানলা বন্ধ করে দিয়ে, ঝড়বৃষ্টি আর মেঘের ডাক শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম, বাস থেকে নামবার সময়ও যদি এইভাবে ঝড়বৃষ্টি হয় তাহলে অজানা, অচেনা জায়গায় গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাবো।

বাসের চলার গতি ঝড়ের দাপটে কমাতে বাধ্য হয়েছে ড্রাইভার। বাসে বসেই বুঝতে পারছি, যে কোনো সময়ই বাস আটকে যেতে পারে রাস্তায়, কারণ এই ঝড়ে দু-চারটে গাছ উপড়ে গিয়ে রাস্তা আটকেও দিতে পারে। কিন্তু চওড়া রাস্তা বলেই, দু-একটা গাছ রাস্তায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও পাশ কাটিয়ে বাস বেশ মন্থর গতিতে চলতে লাগলো। যাত্রীদের মধ্যে কেউ ঘুমোচ্ছে, গান গাইছে আর আমার পাশের সিটে মায়ের বুক জড়িয়ে একটা হ্যাংলা মতো ছেলে সমানে কেঁদে চলেছে।

বেথুয়াডহরীর মোড়ে কে নামবেন, বলে কন্ডাকটার হাঁক দিল।

আমি ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়ালাম এবং একটু পরেই একমাত্র আমি একাই বাস থেকে নামলাম। বাস চলে যাবার পর অন্ধকারের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, জনমানবহীন জায়গায় একটা সজনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একমাত্র জীবন্ত প্রাণী আমি। জায়গাটাতে যেন শ্মশানের নীরবতা। সজনে গাছের ফাঁক দিয়ে অঝোরে বৃষ্টির জল আমাকে সম্পূর্ণভাবে ভিজিয়ে দিল আর ভিজে জামা-কাপড় পরে কাঁপতে শুরু করলাম। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে রিকশা স্ট্যান্ড পেরিয়ে আমাকে মাস্টারমশাই শচীন দত্তর বাড়িতে পৌঁছতে হবে। চিঠি দিয়ে আমার আসবার কথা আগে জানিয়েও দিয়েছিলাম। বাসটা যে দিকে এগিয়ে গেল, সেই দিকেই আমি এগিয়ে চললাম।

বিদ্যুতের চমক ছিটকে পড়েই পর পর দুটো বাজ পড়লো কাছাকাছি। কাঁপুনিটা আরও বেড়ে গেল, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে ব্রিফকেসটা মাথায় চাপিয়ে এক হাঁটু জলের মধ্যে কোনোরকমে এগিয়ে চললাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আমারই চলার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা পেঁচার কর্কশ শব্দে সমস্ত পরিবেশটাকে কেমন যেন থমথমে করে দিল। আমার মনে হতে লাগলো আমার সঙ্গে আরও কেউ যেন হেঁটে চলেছে আমারই পাশাপাশি। আমি এগিয়ে চললাম।

বিদ্যুতের ঝিলিক চমকে উঠলো আবার। সেই ক্ষণস্থায়ী আলোর মধ্যে আমি দেখলাম অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন

আমারই অপেক্ষায়। সমস্ত দেহটা ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং আমি সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম যে, আমার জীবনটা শেষ হয়ে আসছে। আমি আমার প্রিয়জনদের কাছে আর হয়তো ফিরে যেতে পারবো না। কাঁপুনিটা সেই মুহূর্তে অসম্ভবভাবে বেড়ে গেল আর আমার বেশ মনে আছে আমি তখন ছোট ছেলের মতো মা বলে ডেকে উঠে ভয়ে কুঁকড়ে এক হাঁটু জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। সেই স্বরটা আজ আর আমার মনে নেই কিন্তু ওই অবস্থার মধ্যে শুনতে পেলাম কে যেন বলে উঠলো, ভয় নেই, আমি আপনার পাশেই আছি।

তাড়াতাড়ি মনে সাহস এনে উঠে পড়ে বললাম, কে কথা বললেন, আমার কাছে আসুন, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কোথাও এতটুকুও কোনো শব্দ নেই, আমি সেই নির্জন প্রান্তরে একা এবং অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে শুধু আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজ শুনতে পেলাম। ফস্ করে ঠিক আওয়াজ হয়ে, রংমশালের মতো আলো ছড়িয়ে একটু দূরে বিদ্যুতের তার মনে হলো ছিটকে পড়লো। আবার আমি দেখলাম সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন আমারই অপেক্ষায়।

রাত কত জানি না। মাথার ওপর দিয়ে আবার একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। সেই মুহূর্তে আবার শুনতে পেলাম, ভয় নেই,

সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না।

দৈববাণীর মতো কথাগুলো কানে পৌঁছতেই, আমি যেন ফিরে পেলাম অসীম সাহস আর শক্তি। সেই মুহূর্তে সমস্ত ভয়, জড়তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম ক্ষিপ্রগতিতে। প্রতিটি মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমার সামনে, পেছনে বা পাশে থেকে কে যেন অনুসরণ করে চলেছে। আমি চলেছি নির্ভয়ে, কিন্তু আবার আমাকে থামতে হলো সেই দৈববাণীর আদেশে।

দাঁড়ান আর এক পা-ও এগোবেন না। সামনেই আছে একটা খাল, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে ঘুরেই একটা সাঁকো পাবেন, সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে ওপারে চলে যান। আমিও যাচ্ছি।

দম দেওয়া পুতুলের মতো আমি বাঁদিকে ঘুরেই হাতড়াতে হাতড়াতে একটা বাঁশের ওপর হাত পড়তেই বুঝলাম সাঁকো এবং কোনোরকমে সন্তর্পণে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলে গেলাম ওপারে। একটা চাপা গর্জন কোথা থেকে ভেসে এল এবং গর্জনটা একটু পরেই কান্নায় পরিণত হলো। আমি আবার ভয় পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম।

এবারে ধমকের সুরে আদেশ হলো, এখুনি সামনের দিকে চলে যান, নইলে আমার সাধ্য নেই যে, আপনাকে বাঁচাবো। নিমেষে ছুটে চললাম সামনের দিকে এবং কিছুদূর গিয়ে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে, ক্লান্ত দেহ নিয়ে সেইখানেই বসে পড়লাম। বৃষ্টি আর ঝড়ের দাপট আর নেই। কাঁপুনিটা আরও বেড়েছে। সমস্ত শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। বসে পড়েছি বলেই হয়তো উঠতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যেতে তো আমাকে হবেই। সমস্ত ক্লান্তি আর যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। জানি না আরও কত পথ আমায় হাঁটতে হবে। কি ভাবেই বা যাবো। বিদ্যুতের সেই ঝলকানি আলোও নেই যে, খুঁজে পাবো সেই ছায়ামূর্তি বন্ধুকে।

আমার খুব কাছ থেকেই স্পষ্ট শুনলাম, ভয় নেই আমি কাছেই আছি। এই মাঠ পার করে দিয়েই আমি ফিরবো। আমারও ফেরার সময় হয়ে এসেছে। সামনের দিকে আরও কিছুটা গেলেই শহরের রাস্তা। এই পথ দিয়ে কেউ আসে না আর এলে ফিরে যায় না। কাকুকে বলবেন, শানু সেদিন কোনো দোষ করেনি, শানু ভালো আছে।

কিভাবে শহরের রাস্তায় সেদিন পৌঁছেছিলাম আজ আর মনে নেই। মাস্টারমশাই অর্থাৎ শচীন দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনেছিলাম, একজন দোকানদার আমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আমার মুখে মাস্টারমশাইয়ের নাম শুনে পৌঁছে দিয়েছিল তাঁর বাড়িতে।

মাস্টারমশাই আমার মুখে সমস্ত কিছু শুনে বলেছিলেন, সেই বাসের কন্ডাকটার ভুল করে যে জায়গাটায় নামিয়ে দিয়েছিল সেটা বাজার থেকে অনেক দূরে এবং ওদিকে লোকবসতি নেই। আসলে ওই জায়গার চারপাশে ভাগাড় এবং স্থানীয় শ্মশান। পরাণ মণ্ডলের খাল এখানকার সবাই চেনে এবং এই নামটা শুনে সকলেই আঁতকে ওঠে। জীবিত অবস্থায় কেউ ওই খাল পেরিয়ে আসতে পারেনি। আপনার ভাগ্য ভালো বলেই বেঁচে গেলেন।

আমি বললাম, সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি তাই হয়তো আমাকে খালে নামতে নিষেধ করে একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে বলেছিল।

মাস্টারমশাই বললেন, সেই ছায়ামূর্তিকে আপনি দেখেছিলেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। মাঠ পেরিয়ে শহরের রাস্তায় পৌঁছবার আগে সে বলেছিল, কাকুকে বলবেন, শানু সেদিন কোনো দোষ করেনি, শানু ভালো আছে।

মাস্টারমশাই চিৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠে বললেন, শানু এই কথা বলেছে? বলেই আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি শানুকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যাবার সময় ও বলেছিল, কাকু আমি কোনো দোষ করিনি, ওরা মিথ্যে করে লাগিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম।

মাস্টারমশাই বললেন, শানু আমার দাদার ছেলে। ও যখন খুবই ছোট্ট তখন আমার দাদা মারা যান। সেই থেকে শানুকে আমি ছেলের মতো করে মানুষ করেছি। সঙ্গ দোষে ও মাঝখানে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। একদিন ওরই অন্তরঙ্গ দুজন বন্ধু এসে আমার কাছে বেশ কিছু অভিযোগ করে। আমি আর কোনো কিছু বিবেচনা না করে প্রকাশ্য রাস্তায় দু-চার ঘা চড়-থাপ্পড় মেরে বলেছিলাম, আর বাড়ি ঢুকবি না। শানু আমার কথা শুনেছিল, শানু আর বাড়ি ঢোকেনি। দু-দিন কোনো খোঁজ না পেয়ে পাগলের মতো চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে ওকে যখন পেলাম, তখন ওর শরীরের অনেকটা অংশই শকুনে খেয়ে গেছে। একটা গাছের ডালের ফাঁকে ওর দেহটা এমনভাবে আটকে ছিল যে, মনে হয়েছিল কেউ যেন জোর করে ওকে আটকে রেখেছে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ ছিল শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু। বিশ্বাস হয় না তবুও ঘটনা শোনা যায়। অবিশ্বাস করারও উপায় নেই কারণ আমি জ্বলন্ত প্রমাণ। কাকুর কাছে যারো এই সংবাদ শানু হয়তো জেনেছিল তার অশরীরী আত্মা নিয়ে এবং আমার যে মৃত্যু ঘটতে পারে সেটাও সে জানতো। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় সে মনেপ্রাণে তার কাকুকে এতই ভালোবাসতো যে কাকুর অতিথিকে সে বাঁচিয়েছে। শানুর মৃত্যুটা আজও ওখানকার লোকেরা মনে করে অস্বাভাবিক এবং রহস্যময়।

ছবি : সৃফি

পুজোর ছড়া

জ্যোতিভূষণ চাকী

প্রকৃতি সে কী যে খুশি
শরৎকে পেয়ে,
কাশবনে গুন্‌গুন্—
ফেরে গান গেয়ে
সাড়া পড়ে গেছে ওই
কুমোর পাড়ায়,
ঢাকী ভাই খুশি হয়ে
ঢাকটি সারায়।

দোকানী পসারী যত
সাজায় দোকান,
সাজো সাজো করে আজ
সারা মন প্রাণ।

ছোটদের খুশিটার
নেই কো ঠিকানা,
প্রজাপতিটির মতো
মেলে যেন ডানা।
পাতায় পাতায় ওই
সোনা ঝিকিমিকি,
লেখকমশাই ভাবে
কী লিখি কী লিখি।

অকশন

গৌরী দে

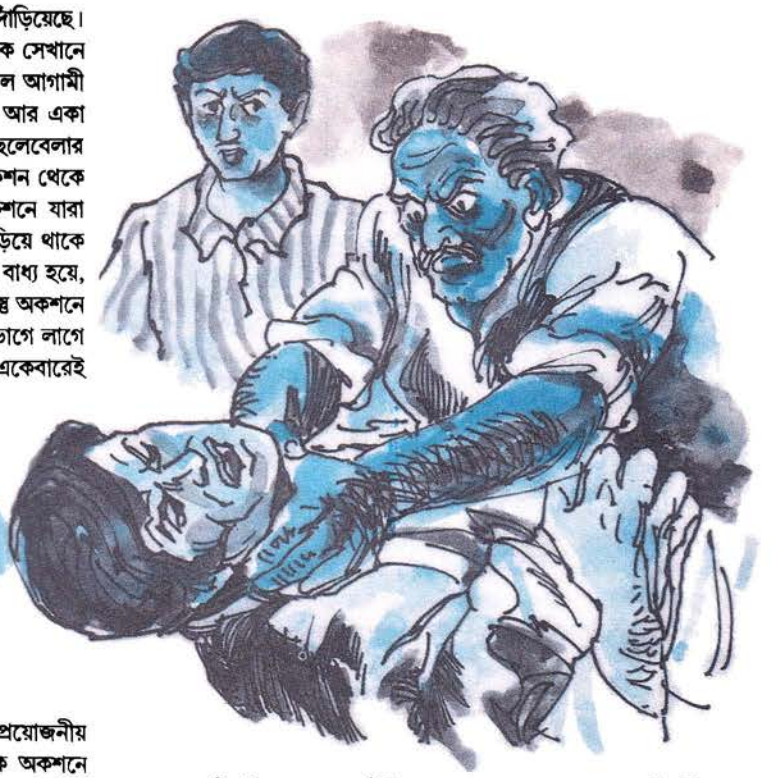

অকশনে জিনিস কেনা বিশ্বজিতের একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেদিন যেখানেই অকশন হোক না কেন বিশ্বজিৎকে সেখানে দেখা যাবেই। এবারও কাগজ দেখে সে ঠিক করল আগামী রবিবার নিউ পার্ক এক্সচেঞ্জের অকশনে যাবে। কিন্তু এবার আর একা যাবে না, বন্ধু রজতকে নিয়ে যাবে। রজত বিশ্বজিতের খুব ছেলেবেলার বন্ধু। ওদের মধ্যে মতের অমিল বড় একটা হয় না। কিন্তু অকশন থেকে জিনিস কেনার একেবারে বিপক্ষে রজত। ওর ধারণা অকশনে যারা জিনিস বিক্রির জন্যে দেয় তাদের জীবনের বহু দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে থাকে ঐ জিনিসগুলোর মধ্যে। কেউ হয়তো অভাবে পড়ে, কেউবা বাধ্য হয়ে, আবার কেউবা দেনা শোধের জন্যে বাধ্য হয়ে তাদের প্রিয়বস্তু অকশনে দেয়। এসব জিনিসের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস থাকে বলে এগুলো ভোগে লাগে না, যে নেয় তার। বিশ্বজিৎ কিন্তু রজতের এ থিয়োরি একেবারেই মানতে রাজী নয়। তার ধারণা পুরনো সেকেলে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিজেরা বিক্রি করতে পারে না বলেই লোকে অকশনে দেয়। জিনিসগুলো বিক্রি হলে তার টাকা পেয়ে জিনিসগুলোর মালিক বেশ খুশিই হয়। তাছাড়া সে নিজে ইতিমধ্যে একটা ইজিচেয়ার, একটা ডিভান, আর একটা মেহগনি কাঠের টেবিল কিনেছে। কই সে তো দিব্যি ভোগ করছে, উল্টে কত কম দামে সে পেয়েছে। রজতকে শুনিয়ে বলতে লাগল বিশ্বজিৎ,'যত সব সংস্কার। যত বাড়াবে বেড়েই চলবে, এসব পুরুষমানুষের মানায় না।' শুনতে শুনতে রজতের মনে হলো, দেখাই যাক না একটা কিনে। সত্যিই তো ব্যাপারটা পুরোটাই তার মনের ভ্রম আর সংস্কার হতে পারে। মনে মনে ও ঠিক করল, বিশ্বজিৎ ওকে যেতে বললে আর অস্বীকার করবে না। কিন্তু নিজে থেকে বলা যাবে না। বিশ্বজিৎ হাসবে, ঠাট্টা করবে, বলবে,'এতদিনে বাবুর সুবুদ্ধি হলো।'রজত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কতক্ষণে বিশ্বজিতের ডাক আসবে।

রবিবার সকালে এসে হাজির বিশ্বজিৎ। বলল, 'আজ আর কোনো কথা শুনব না রজত। অকশনে তোকে নিয়ে যাবই আজ।' মনে মনে খুশি হলেও রজত এমন ভাব দেখালো যেন নিরুপায় হয়েই মত দিচ্ছে। বলল, 'বেশ চল, তবে আমি কিন্তু কিছু কিনব না আগেই বলে রাখছি।' বিশ্বজিৎ রজতের পিঠে এক চাপড় মেরে বলে ওঠে, 'চল চল, জিনিস না কিনিস, যেতে দোষ কি?'

অকশনের পর দুই বন্ধু এদিক-ওদিক ঘুরে সিনেমা দেখে রাত ৯টা নাগাদ যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

বিশ্বজিৎ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, খেয়ালে চলে। টাকা-পয়সা ওর কাছে কিছু নয়। আজ অকশনে কিছু না ভেবেই চট করে কিনে বসল পঞ্চাশ বছর আগেকার বুক পকেটে রাখার সোনার ঘড়ি। ঘড়িটার মাথার সঙ্গে একটা সোনার জল করা সরু চেন। সামনেটা দরজা দেওয়া। খোলাপরা করা যায়। ঢাকা দিয়ে দিলে যেন বড় একটা মেয়েদের লকেট। আগেকার রুপোর টাকার সাইজ, গোল, ফুলো ফুলো। বিশ্বজিৎ কানে ঠেকিয়ে শুনল চমৎকার চলছে, টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্। কাজের লোক কার্ত্তিক এসে খবর দিল, টেবিলে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। মা ডাকছেন। বিশ্বজিৎ খেতে বসল, টেবিলের ওপর ঘড়িটাকে রাখল। খেতে খেতে বারবার সে দেখতে লাগল ঘড়িটাকে। মনে হলো ঘড়িটা যেন কি শোনাতে চায় তাকে। অতীত ইতিহাস না তার সুখের কাহিনী? অন্যদিনের মতো আজ খাবার টেবিলে মায়ের সঙ্গে গল্প তেমন জমলো না।

শোবার সময়ও বিশ্বজিৎ ঘড়িটাকে নিজের মাথার বালিশের তলায় রেখে দিল। তারপর কি মনে হতে, ওটাকে টেনে বার করে দম দিল, কানে লাগিয়ে শুনল। তারপর বাঁ পাশ ফিরে ডান হাতটা ঘড়ির ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

আজ প্রথম রজত অকশন থেকে একটা জিনিস কিনেছে। বিলিতি জিনিস। কালো চামড়ার চকচকে বুট জুতোটা রজতের খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া জুতোটা পরলে মনেই হয় না ওটা অন্য কারও, মনে হয় জুতোটা বুঝি তার পায়ের মাপেই করা। খুব অবাক হয় রজত মনে মনে। অকশনের জিনিসকে সে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেনি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভুল করেছে। বিশেষ করে এমন সুন্দর সাহেবী জুতোটা সে যদি না পেত, তাহলে হয়তো তার নিজের অভিজ্ঞতায় অনেকটাই ঘাটতি থেকে যেত। রজত আবার জুতোটার দিকে তাকালো। অনেকটা বর্ষায় ব্যবহার করার 'গামবুটের' মতো। অন্য জুতোর চেয়ে ওপরের দিকে কিছুটা উঁচু, আর কত দাম কম। ভাবতে ভাবতে রজত হঠাৎ দেখল, মা এসে দাঁড়িয়েছেন। রজত ভাবল রাতে খাবারের জন্য মা বুঝি ডাকতে এসেছেন। কিন্তু তা নয়। মা বললেন, 'বাবা,একবার একটু মিষ্টির দোকানে যেতে হবে।'

রজত ঘড়িটা একবার দেখে নিল রাত প্রায় সাড়ে নটা বাজতে চলল। রজত অবাক হয়ে বলল, 'এত রাতে দোকানে?'

মা একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'কি করব বল বাবা, বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেছি। তোমার ঠাকুর্দার হঠাৎ পেটটা গণ্ডগোল করছে। আমি জানতাম না। এইমাত্র আমায় বললেন, এক গ্লাস ঘোলের শরবত ছাড়া উনি আর কিছু খাবেন না। এদিকে বাড়িতে দই নেই। কিন্তু সে কথা বলারও উপায় নেই। চেনো তো তোমার ঠাকুর্দাকে। বললে হয়তো রাগ করে দিন সাতেক খাওয়াই বন্ধ করে দেবেন। কিছু বলা যায় না।'

রজত গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠাকুর্দা মনে করেন, এখনও তিনি সেই জমিদারই রয়েছেন। দশটা চাকর যেন বসে আছে তাঁর হুকুম তামিল করতে।'

'চুপ কর, শুনতে পেলে দুঃখ পাবেন।' মা এক ধমকে ছেলেকে চুপ করিয়ে দিলেন। একটু রাগ করেই বলে উঠলেন, 'মানুষটার জন্যে তোমাদের মায়া হওয়া উচিত। ভাবো তো কি অবস্থা থেকে তিনি আজ কি অবস্থায় পৌঁছেছেন। অত জমিজমা, ভেড়ি সব চলে গেল সরকারের হাতে। এরপরও কি আর মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারে?'

রজত আর কথা বাড়াতে দেয় না মাকে, বলে, 'ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি নন্দীর দোকান থেকে এখুনি দই এনে দিচ্ছি।'

মা খুশি হয়ে ছেলের মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে একটু আদর করে, ভেতরে চলে গেলেন। মা চলে যেতে রজত উঠল। জামা পরল, চুল আঁচড়াল, পকেটে পয়সা রাখল, তারপর চটিতে পা ঢুকিয়েই থমকে দাঁড়াল। খাটের নিচে রাখা নতুন জুতোটা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। রজত মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সদ্য কেনা জুতোটা লক্ষ্য করে। খাটের ওপর বসে, চটিটা খুলে খুব যত্ন করে পরল জুতোটা। কিন্তু বিপদ হলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতেই। ডানদিকে নন্দীর দোকান, কিন্তু কিছুতে সে ডানদিকে একপাও যেতে পারল না—যতবার যেতে চায় ততবার কে যেন তাকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে দেয়। রজতের গা ছমছম করে, এইজন্যে ও অকশন থেকে কিছু কিনতে যেত না। বিশ্বজিতের ওপর প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল।

রজত বাড়ি ফিরে এলো। যা কখনও করেনি, তাই করল। মাকে মিথ্যে কথা বলল। বলল, 'দই নেই ফুরিয়ে গেছে।' মা একটু অবাক হলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না। মা কি ভাবলেন, সে কথা ভাবার মতো মন নেই আজ রজতের। তার মাথায় এক চিন্তা 'জুতো'। রজত ঠিক করল কাল সকালেই বিশ্বজিতের সঙ্গে সে ফোনে যোগাযোগ করে একটা ব্যবস্থা করবে।

মাথার বালিশের সমান্তরাল করে খাটের নিচে রজত জুতোজোড়া সাজিয়ে রাখল। তারপর বালিশে মাথা দিয়ে জুতোর কথাই ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। স্বপ্নে দেখল, এক সত্তর বছরের বৃদ্ধকে। টেবিলে বসে কি সব লেখালেখি করছেন। ওয়েল ড্রেসড। পায়ে কালচে হলুদ মোজা আর বুট জুতো। ঠিক যেন এটাই, যেটা রজত আজ কিনেছে। এছাড়া খুব অবাক হয়ে গেল রজত যখন দেখল বৃদ্ধের বুক পকেটে একটা ঘড়ির মাথার সঙ্গে বাঁধা সোনার চেন, ঐ চেনটাই গিয়ে আটকেছে বোতামঘরের সঙ্গে, তখন কেন জানি রজতের মনে হলো ঐ ঘড়িটাই আজ কিনেছে বিশ্বজিৎ। হঠাৎ চমকে উঠল রজত। টেবিলের ওপর মাথা রেখে বসে আছেন বৃদ্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছেন, নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন! ঠিক এই সময় পেছন দিক থেকে একটি ছেলে হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। লক্ষ্য ঐ বৃদ্ধ। রজত চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান'! দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটা জোরে জোরে রাত বারোটার সংকেত জানিয়ে দিল। রজতের মনে হলো তার গলার স্বর বৃদ্ধ শুনতে পাননি। আবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। বছর একুশের ঐ ছেলেটি ততক্ষণে লোহার রডটা বসিয়ে দিয়েছে বৃদ্ধের মাথায়। প্রচণ্ড ধাক্কায় চেয়ার থেকে ছিটকে পড়লেন বৃদ্ধ। ছড়িয়ে গেল তাঁর চশমা আর ঘড়ি।

ওদিকে বিশ্বজিৎ ঠিক এই এক স্বপ্নই দেখল। তারপর ঘুম ভেঙে ঘড়ির দিকে দেখতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঘড়িটা ঠিক রাত ১২টা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ তার পরিষ্কার মনে আছে ঠিক রাত এগারোটায় সে নিজে হাতে দম দিয়েছিল। আবার দম দিল। না, সামান্যই খরচ হয়েছে। তাহলে? এখন তো ঘড়ি বেশ চলছে আবার। স্বপ্নের সঙ্গে ঘড়ি বন্ধ হবার যেন কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে হলো তার। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে সে রজতের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো। ঘড়ির গল্প শেষ হতে রজত তার জুতোর ব্যাপারটা বলল। অনেক পরামর্শ করে ওরা ঠিক করল, ঠিক তিনদিন ওরা দেখবে তারপর এর রহস্য খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে।

পরপর তিন দিন বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করল ঘড়ি রাত বারোটায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর রজত জুতো পরলেই কে যেন তাকে জোর করে কোথাও নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ভয়ে সে আর জুতোটা পরেনি।

ঠিক তিন দিন বাদে ওরা দুজনে পরামর্শ করে বেরিয়ে পড়ল ঠিক রাত দশটায়। রজতের পায়ে সেই জুতো, বিশ্বজিতের বুকে ঘড়ি। বিশ্বজিৎ নিজেকে ছেড়ে দিল রজতের হাতে। আর রজত প্রতিবারের মতো আজও লক্ষ্য করল সে চলছে না, জুতোটা তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেশি দূর যেতে হলো না। প্রায় আধ মাইলের মতো হাঁটাপথে আসার পর একটা সরু কানাগলির সামনে রজত দাঁড়িয়ে পড়ল। গলিতে ঢোকার মুখেই লোহার গেটওলা বিরাট বাড়ি। দেখে মনে হয় খুব পয়সাওলা লোকের। কিন্তু এখন ভূতের বাড়ির মতো অন্ধকার। বাইরের গেটের কাছে এক দরোয়ান গোছের লোক খৈনি টিপছে। ভেতরে বিরাট কম্পাউন্ডের এদিক ওদিক মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কিছু ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালা। বিশ্বজিৎ দেখল রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। ওদের দেখে হুংকার দেয় দরোয়ান, 'কৌন হ্যায়?'

বিশ্বজিৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'এ বাড়িতে কে থাকেন?'

দরোয়ান ভ্রু কুঁচকে পালটা প্রশ্ন করে, 'আপনি কাকে চান?'

একটু দ্বিধায় পড়ে বিশ্বজিৎ। কি বলবে? নাম তো জানে না। রজত হঠাৎ বিশ্বজিতের হাত ধরে টানে। ও যেন কেমন বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। বিশ্বজিৎ দেখল রজতের মাথায় কিছু যেন পাকা চুল, মুখের চামড়ায় একটু বয়সের ছাপ। বিশ্বজিৎ আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা হবে?'

'বাড়ির মালিক? কি নাম আছে বলুন—তবে তো।' দরোয়ান বলল।

বিশ্বজিৎ জানে নাম বলতে পারবে না, তাই রজতকে পথের দিকে টানে ফিরে যাবার জন্যে। রজত হঠাৎ অমানুষিক শক্তি পায়। একঝটকায় বিশ্বজিৎকে সরিয়ে দরোয়ানের সামনে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, 'হীরাসিং। হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও।'

রজতের গলা অনেক সরু। কিন্তু আশ্চর্য এ গলা যেমন ভারী তেমন তাতে কড়া হুকুমের সুর। বিশ্বজিৎ চমকে ওঠে। এ কার গলা? তবে কি জুতো আর ঘড়ির অশরীরী মালিক রজতকে মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করছেন? বিশ্বজিৎ ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দরোয়ান হীরাসিং লম্বা স্যালুট দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বড় সাহেব!'

'হ্যাঁরে ব্যাটা হিমাংশুর চামচে, তোকেও শেষ করব।'

দরোয়ান নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। রজত বিশ্বজিতের হাত ধরল। বিশ্বজিতের মনে হলো রজতের গায়ে এখন হাজার হাতির বল। কোনো

প্রতিবাদ না করে ও যা বলে তাই করাই ভাল।

রজত বিশ্বজিৎকে টেনে নিয়ে চলল তিন তলায়, চারদিক অন্ধকার। একটা ঘরে আলো জ্বলছে। দরজার তলা দিয়ে আলো এসে পড়ছে বাইরে। বন্ধ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা মারল রজত। ভেতর থেকে রাগত স্বরে কে যেন বলল, 'কে এত রাতে? বদ্‌মাইশি করার জায়গা পাওনি?'

রজত চিৎকার করল, 'খোল, দরজা খোল, আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সাতাশ-আটাশ বছরের এক যুবক। মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ। পরক্ষণেই রজতকে দেখে তার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। চিৎকার করে ওঠে, 'কে আপনি? কাকে চাই?'

রজত সে কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। দরজাটা পায়ের এক ধাক্কায় পুরো খুলে ফেলল। তারপর নিমেষের মধ্যে ঘরে ঢুকে হিমাংশুর গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। চাপা ক্রোধ ফুটে বেরলো রজতের গলা দিয়ে। বলল, 'আজ তোকে আমি শেষ করে ফেলবো। পথের ছেলেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিলুম। তাই বুঝি এত বছর পরে বিষয় সম্পত্তির লোভে আমাকে খুন করতে তোর এতটুকু সংকোচ হলো না। তোকে প্রাণে না মারলেও চরম শাস্তি দেব।'

এতক্ষণ বিশ্বজিৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল হিমাংশুকে। খুব চেনা মুখ। কোথায় যেন সে দেখেছে। কিন্তু কিছু কিনারা করার আগেই রজতের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তার ধস্তাধস্তি, মারপিট। বিশ্বজিৎ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রজতের ওপর। অতিকষ্টে ওদের দুজনকে আলাদা করে ঘুরে দাঁড়াতেই মনে পড়ল প্রতিরাতে স্বপ্নে দেখা দৃশ্যটার কথা। এক বৃদ্ধকে খুন করছে একটি ছেলে। হ্যাঁ, ঐ ছেলের সঙ্গে এইমাত্র দেখা হিমাংশুর যথেষ্ট মিল আছে বটে।

এবার সব ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সামনের দেওয়ালে টাঙানো বাড়ির মালিকের বিরাট অয়েল পেন্টিংটার দিকে আর একবার চাইল বিশ্বজিৎ। পায়ে রজতের পরে থাকা ঐ জুতো! পরনে স্যুট আর বুকের কাছে বোতামঘর থেকে পকেটের দিকে উঁকি মারছে সরু চকমকে একটা চেন। বিশ্বজিৎ জানে এটা আর কিছু নয় তার পাওয়া অকশনের ঘড়িটা। দুয়ে দুয়ে চারের মতো মিলে গেল যখন, বিশ্বজিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না এ বাড়ির মালিকের অতৃপ্ত আত্মা ভর করেছে, হিমাংশুর ওপর শুধু প্রতিহিংসা নেবার জন্যে।

রজত কিন্তু তখনও আগের রজতে ফিরে যায়নি। ইতিমধ্যেই বিশ্বজিতের হাত ছাড়িয়ে, মশারির দড়ি ছিঁড়ে হিমাংশুকে বেঁধে ফেলেছে সে। কিন্তু হিমাংশুর মুখটা অত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? কি দেখছে ও একদৃষ্টে রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে? হঠাৎ হিমাংশু খুব ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি...আপনি কে?'

বিশ্বজিৎকে অবাক করে ভারিক্কি গলায় রজত বলল, 'চিনতে পারছিস না, না? ভাবছিস মরে ভূত হয়ে গেছে। মরিনি বুঝলি? অত সহজে তোকে ছেড়ে দেবো? পুলিশের কাছে সব স্বীকার করে ধরা দে হিমাংশু, নয়তো তোর ঘাড় মটকে তবে যাব, বুঝলি? অকৃতজ্ঞ, বেইমান।'

হিমাংশু মৃগীরোগীর মতো ছটফট করে উঠল, দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করল। পারল না। তখন অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, 'জ্যাঠাবাবু, আমি অন্যায় করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন জ্যাঠাবাবু, ক্ষমা করুন। কী যে হয়েছিল আমার। ভেবেছিলুম আপনার অত বিষয়সম্পত্তি সবই তো আমার হবে। কিন্তু এখন একটা পয়সা হাতে পাই না। তাই...'

'তাই আমাকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে সবকিছুর মালিক হয়ে যেতে চেয়েছিলি, তাই না?' হিমাংশুর জ্যাঠাবাবু চাপা রাগে গর্‌গর্‌ করে ওঠেন।

বিশ্বজিতের সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসছে ভয়ে। এখুনি কিছু করা দরকার। মনে পড়ল ওর নিজের পিসেমশাইয়ের কথা। উনি তো পুলিশ সুপার। নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। বিশ্বজিৎ ঘড়ি দেখল। ঠিক রাত বারোটা। এত রাতে পিসেমশাইকে বিরক্ত করতেও লজ্জা করল, কিন্তু এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ দেখতে পেল না ও।

আধঘণ্টার মধ্যে দুজন কনস্টেবল সঙ্গে করে ভ্যান নিয়ে পিসেমশাই হাজির। বিশ্বজিতের এই আধঘণ্টা যে কি করে কেটেছে তা বলে দরকার নেই। একদিকে খুনী আসামী অন্যদিকে এক অশরীরী আত্মা।

পিসেমশাই ঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বোলালেন তারপর বিশ্বজিৎকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ব্রাভো মাই বয়। তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করলে। পুলিশ এই কেসটার কোনো সূত্র পাচ্ছিল না। নিখুঁত হত্যা পরিকল্পনা। অথচ অনেক চেষ্টা করেও হিমাংশুকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করাতে পারিনি।'

বিশ্বজিৎ বলতে যাচ্ছিল, 'আমি না। রজতের মধ্যে দিয়ে তো...'

তার আগেই রজত একদম স্বাভাবিক গলায় বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল, 'বিশ্বজিৎ। এটা কাদের বাড়ি রে? এরা সব কারা? পুলিশ এসেছে কেন? কি হয়েছে?'

বিশ্বজিত বুঝল রজতকে এখন কিছু বলা যাবে না। তাছাড়া পুলিশকেও এই গল্প বললে হাসতে হাসতে উড়িয়ে দেবে। তাই বলতে গিয়েও পিসেমশাইকে রজতের কথা কিচ্ছু বলল না। মনে মনে শুধু জুতো আর ঘড়িকে ধন্যবাদ জানালো।

কিন্তু অন্যদিকে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। বারোটার ঘর পেরিয়ে ঘড়িটা আজ দিব্যি টিক্‌টিক্‌ করে এগিয়ে চলেছে, বন্ধ হয়নি।

ছবি : সুফি

সুভাষিতানি

সুখেন্দু ভট্টাচার্য

কক্ষণো খেও না হে টক দই উচ্ছে,
বেছে-বুছে তাই খাবে শ্রীমুখে যা রুচছে।
কাজিয়ায় যাওয়া নয় গুণ্ডোর সঙ্গে,
লেগে যাবে ধুলো ভাই ননীমাখা অঙ্গে।
অন্যায় দেখে যদি বুক করে টনটন,
চোখ বুজে পিছু ফিরে দেবে দূর হন্টন।

বরং চালিও ঘুঁষি যত খুশি বালিশে,
যাবে না বালিশ জেনো ফৌজদারি নালিশে।
মানবে না লঘুগুরু কিছুতেই ভাইরে—
আঘাত করার চেয়ে সুখ আর নাই রে!
বইখাতা খুলবে না টিভি চালু থাকলে,
সাড়া দেওয়া অনুচিত বুড়োবুড়ি ডাকলে।

এইসব মেনে যদি ঠিকমতো চলবে—
'সোনা ছেলে' 'সোনা মেয়ে' সক্কলে বলবে।।

ছবি : সুফি

ঘরে ফেরা

আরতি বসু

চোখের জলে ভাসছে দশ হাজার মানুষ। তারা সবাই এখন বন্দী। ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার তাদের সব্বাইকে ধরে এনেছেন জেরুজালেম থেকে। সুস্থ সবল একটি মানুষও আর নেই সেখানে। পড়ে আছে শুধু শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর অসুস্থ অক্ষমেরা। কেমন করে বাঁচবে তারা? কে তাদের দেখবে? ভাবতে ভাবতে বন্দী মানুষগুলি মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষেপে ওঠে। গালমন্দ করে নেবুকাডনেজারকে, হাত-পায়ের শেকল ভাঙার চেষ্টাও করে কেউ কেউ। তখন নির্দয়ভাবে চাবুক চালায় প্রহরীরা। বন্দীদের পিঠ ফেটে রক্ত ঝরে। নতুন করে চোখের জলের ধারা বয়ে যায়।

এত দুঃখেও চোখে জল নেই একটি কিশোরের। তার নাম ড্যানিয়েল। অসম্ভব মনের জোর তার, হাসিমুখে সহ্য করে সব অত্যাচার। সেই যে ছোট্টবেলায় মা-ঠাকুমাদের

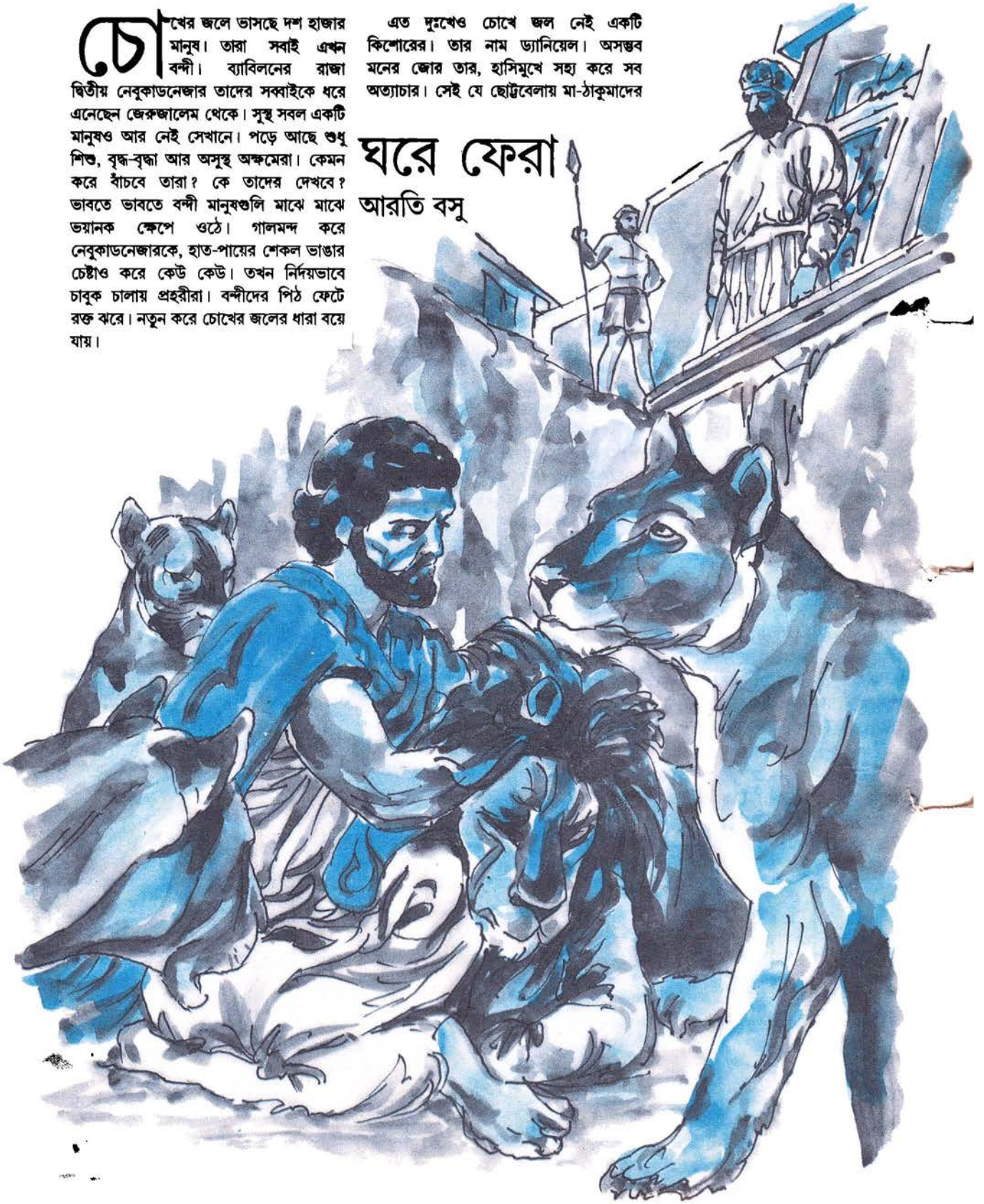

কাছে শুনেছে ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো অন্যায় চলে না, সে কথা সে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে, আর সেই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করে তার তিন বন্ধু হানানিয়, মিশায়েল, অ্যাজারিয়কে। প্রথম দিকে একটু অধৈর্য হলেও আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেছে বন্ধুরা। একটা জিনিস তারা বুঝতে পারে না। দেশের এমন একটা বিপদ যে আসতে পারে তা কি তাদের রাজা একটুও বুঝতে পারেননি? তাহলে তিনি কেমন রাজা? তাছাড়া, কোনো চেষ্টাই তো তিনি করলেন না ব্যাবিলনের রাজাকে আটকাতে। যেই নেবুকাডনেজারের সৈন্যরা জেরুজালেম ঘিরে বসল অমনি তিনি ছেলেমেয়ে, দাসদাসী, অমাত্য-পরিজন সবাইকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে ফেললেন। শুধু কি তাই, রাশি রাশি সোনাদানা, মণিমুক্তো উপহার দিলেন শত্রুকে। যে দেশে একসময় শৌল, ডেভিড, সলোমনের মতো বীর রাজারা ছিলেন সে দেশের রাজা এত ভীরু! কে জানে তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে তিনি হার স্বীকার করলেই নেবুকাডনেজার খুশি হয়ে ফিরে যাবেন। রক্ষা পাবে জেরুজালেম। কিন্তু তা আর হলো কই? সারা জেরুজালেম ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে এসেছে নেবুকাডনেজারের সৈন্যরা। রাজা সলোমনের তৈরি অমন সুন্দর মন্দিরটা পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। সেখান থেকে লুঠপাট করে এনেছে সোনারুপোর বাসন, সিন্দুক কত কি! এমন কেন হলো?

বন্দীদের মধ্যে যারা একটু বয়স্ক তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কী বলব বল, আমাদের অতবড় ইজরায়েলী জাতটা শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি করতে করতেই শেষ হয়ে গেল। সলোমনের পর তেমন কোনো বুদ্ধিমান রাজাই এলেন না। একমাত্র রাজা আহাব কিছুটা ঠেকাতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ তলানি এসে ঠেকেছি রাজা যিহূদার দলের আমরা কয়েক হাজার ইহুদী। তাতেও কি রাজাদের হুঁশ আছে? নিজেদের ভোগসুখ নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত। সাধারণ মানুষও আর আগের মতো ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলে না। পাপে ভরে গেছে দেশ। তার শাস্তি তো পেতেই হবে।

এইসব শুনে ড্যানিয়েলরা ঠিক করে, তারা খুব শান্তভাবে থাকবে। যুদ্ধ করার ক্ষমতা যখন নেই তখন বুদ্ধির জোরেই শত্রুদের বশ করতে হবে। ঘাবড়ে গেলে চলবে না। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারালেও চলবে না। বড়রা বলেছেন ঈশ্বর অবিশ্বাসী আর পাপীদের সাহায্য করেন না। সুতরাং তাঁর ওপর ভরসা রেখে তারা অপেক্ষা করবে সুদিনের জন্যে। জেরুজালেমে তারা ফিরবেই একদিন না একদিন। ফিরতেই হবে।

সুদিনের জন্যে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না ড্যানিয়েলদের। হঠাৎ একদিন রাজার এক অমাত্য অ্যাশপানেজ এসে হাজির। রাজা নেবুকাডনেজার নাকি হুকুম করেছেন ইহুদী বন্দীদের মধ্যে থেকে ভাল ঘরের কয়েকজন ছেলেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে। সেখানে তাদের ভালোমন্দ খাওয়াতে হবে, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এমন ভাবে তাদের তৈরি করে দিতে হবে যেন তারা ব্যাবিলনের রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্রদের মতোই রাজসভায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। হুকুম শুনে অ্যাশপানেজ প্রথমে খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। এ আবার কী অদ্ভুত খেয়াল! যুদ্ধে জিতে বন্দী করে যাদের আনা হয় তাদের তো দাস হয়েই চিরকাল থাকার কথা। তা না, এখন তাদেরই ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে পাঁচজনের একজন করে তুলতে হবে। কেন, ব্যাবিলনে কি ছেলের অভাব? কিন্তু উপায়ই বা কী? রাজার হুকুম! গজগজ করতে করতে অ্যাশপানেজ কয়েকজনকে বেছে নিলেন। তার মধ্যে প্রথম চারজনই হলো ড্যানিয়েল, হানানিয়, মিশায়েল আর অ্যাজারিয়।

রাজবাড়িতে পৌঁছে অ্যাশপানেজ প্রথমেই ওদের নামগুলো পালটে দিলেন। ড্যানিয়েল হলো বেলথেজার, হানানিয় শদ্রক, মিশায়েল মেশাক আব অ্যাজারিয় হলো আবেদনেগো। নাম বদলে ড্যানিয়েলরা মোটেই কোনো আপত্তি করলো না। কারণ ওরা ঠিক করেই এসেছে কোনো ব্যাপারে অবাধ্যতা করবে না। দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। খেতে বসে কিন্তু ড্যানিয়েল তার অবাধ্যতা না করার সংকল্প বজায় রাখতে পারল না। তাদের খেতে দেওয়া হয়েছিল মাংস ও মদ,ব্যাবিলনের রাজারা যা খান। ড্যানিয়েল খাবার সরিয়ে দিয়ে অ্যাশপানেজকে বলল, আমরা এসব খাই না। এসব আমাদের খেতে নেই।

অ্যাশপানেজ বললেন, এসব খাবে না তো কী খাবে?

ড্যানিয়েল বলল, আমাদের শুধু একটু সবজি দিন আর জল দিন। তাহলেই হবে।

অ্যাশপানেজ বললেন, তোমরা কি চাও আমার মুণ্ডুখানা উড়ে যাক? অন্য যারা এসেছে তারা তো মাংস খেতে, মদ খেতে আপত্তি করছে না? তোমাদের এত আপত্তি কেন? সবজি খেয়ে থাকবে! তারপর রাজা যখন দেখবেন শুধু সবজি খাইয়ে খাইয়ে তোমাদের আমি পাকানো দড়ি করে ফেলেছি তখন অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখেছ? না বাপু, ও সবজি-টবজি খাওয়া চলবে না।

ড্যানিয়েল খুব বিনীতভাবে বলল, না না, আমরা আপনাকে বিপদে ফেলতে চাই না মোটেই। এক কাজ করুন, দশটা দিন আমাদের সবজি খেয়ে থাকতে দিন। দশ দিন পরে দেখবেন কাদের স্বাস্থ্য বেশি ভাল হয়েছে।

খুব অনিচ্ছার সঙ্গে ড্যানিয়েলের প্রস্তাবে রাজী হলেন অ্যাশপানেজ। দশ দিন পর কিন্তু দেখা গেল ড্যানিয়েলরাই অন্যদের থেকে অনেক বেশি সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে। শুধু শরীর স্বাস্থ্যের দিক দিয়েই নয়, লেখাপড়াতেও ড্যানিয়েলদের মাথাই সবচেয়ে পরিষ্কার। যা পড়ানো হয় টপটপ সেগুলো শিখে ফেলে। এর মধ্যে ড্যানিয়েলের আবার একটা বিশেষ গুণ দেখা গেল। কেমন করে যেন সে স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার বিদ্যাটা আয়ত্ত করে ফেলেছে। প্রায় পুরোহিত জ্যোতিষীদের মতো তার ব্যাখ্যাও অদ্ভুতভাবে ফলে যায়।

ঠিক এক বছর পর রাজা নেবুকাডনেজার সমস্ত ইজরায়েলী ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। ডেকে পাঠিয়ে দর্শন থেকে শুরু করে রাজনীতি পর্যন্ত নানা বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন করতে শুরু করলেন তাদের। সকলেই মোটামুটি উত্তর দিল। তবে সবচেয়ে ভালো উত্তর দিল ড্যানিয়েলরা। রাজা খুশি হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন ওদের ওপর। এইবার কিন্তু ব্যাবিলনের মন্ত্রী-টন্ত্রীরা খুব চটে গেলেন। উড়ে এসে জুড়ে বসা কে-ই বা সহ্য করতে পারে? ওদিকে ড্যানিয়েলরা তখন রাজ্য পরিচালনার খুঁটিনাটি কাজ শেখার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি। দেশে ফিরে জেরুজালেমকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারবে তারা।

মোটামুটি নির্বিঘ্নে কাটল একটা বছর। তারপর হঠাৎ আবার এক বিপত্তি। কী নাকি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে ভীষণ হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছেন নেবুকাডনেজার। ভোর হতে না হতেই মন্ত্রীদের তলব—জ্যোতিষী ডাক, পুরোহিত ডাক। তারা এসে বলুক আমার স্বপ্নের অর্থ কী? এলেন সবাই। কিন্তু ততক্ষণে রাজা স্বপ্নটাই ভুলে বসে আছেন। পণ্ডিতরা মাথা চুলকে বললেন, মহারাজ, স্বপ্নটাই যদি না বলেন...

রেগে আগুন হয়ে রাজা বললেন, অপদার্থের দল! আমি ভুলে গেছি বলে তোমরাও পারবে না? শীগগির বল আমি কী স্বপ্ন দেখেছি। যদি পার তবেই বুঝব তার ব্যাখ্যা করতে পারবে তোমরা।

পণ্ডিতরা তখন খুব বিনীতভাবে বললেন, এ কাজ কি মানুষে পারে মহারাজ? এ কাজ পারেন শুধু দেবতারা।

রাজার রাগ আরও বাড়ল। সেনাপতিকে ডেকে বললেন, এদের কাউকে আমার দরকার নেই। মেরে ফেল সব ক'টাকে।

সারা ব্যাবিলন জুড়ে হৈচৈ উঠল—কোথায় ড্যানিয়েল? তাকেই মার সবার আগে। সে-ই সকলের মাথায় এই স্বপ্নব্যাখ্যার ভূত ঢুকিয়েছে। বুজরুক কোথাকার।

গোলমাল ড্যানিয়েলদেরও কানে গেল। সেনাপতির কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জেনে নিয়ে তারা চারজনই প্রার্থনা করতে লাগল ঈশ্বরের কাছে। একমাত্র তিনি যদি তাদের বুদ্ধি দেন, দূরদৃষ্টি দেন তবেই তারা রক্ষা পাবে এ বিপদে। নয়তো আর কোনোদিনই তাদের জেরুজালেমে ফেরা হবে না। ঐ সব পণ্ডিতদের মতো মরতে হবে আজই।

ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনলেন। দিব্যজ্ঞান দিলেন ড্যানিয়েলকে। ড্যানিয়েল তখন সেনাপতির সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ আপনি আপনার রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বোধহয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। তাই স্বপ্নের মধ্যে সেই উদ্বিগ্নতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

নেবুকাডনেজার খুশি হয়ে বললেন, ঠিক বলেছ তুমি। বড় চিন্তায় আছি। কী যে হবে এরপর? আশেপাশে এতগুলো রাজ্য মাথাচাড়া দিচ্ছে!

ড্যানিয়েল বলল, ঠিক এটাই দেখেছেন আপনি স্বপ্নে। আপনি দেখেছেন একটি বিরাট মূর্তি আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটি সোনার, বুক এবং হাত রুপোর, পেট এবং পায়ের হাঁটু অবধি লোহার, তার নিচের অংশ মাটির। হঠাৎ কোথা থেকে একটি পাথর এসে ঐ মূর্তিকে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাটি, লোহা, সোনা, রুপো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল আর সেই পাথরটি দেখতে দেখতে এক মহাপর্বত হয়ে দাঁড়াল।

নেবুকাডনেজার আশ্চর্য হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো আমি এই স্বপ্নই দেখেছি। কিন্তু এর অর্থ কি?

ড্যানিয়েল বলল, মহারাজ, আপনি ভয় পাবেন না, কারণ ঈশ্বর আপনার ওপরই পৃথিবীর ভার দিয়েছেন। আপনিই সেই মূর্তির সোনার মাথা। তবে আপনার রাজ্যের আশেপাশে আরও চারটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাদের লোহার মতো দৃঢ়তা যেমন থাকবে তেমনি দুর্বলতাও থাকবে কিছু। সেই সময় আর একটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে আপনাকেই প্রতিষ্ঠা করবে। এ শুধু স্বপ্ন নয় মহারাজ, এ ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রাজা। উপহার-টুপহার তো অনেক দিলেনই, সেইসঙ্গে ড্যানিয়েলকে বসালেন নিজের রাজসভায়, সমস্ত পণ্ডিতদের মাথার ওপরে। ড্যানিয়েলের জন্য পদোন্নতি হলো তার তিন বন্ধুরও।

দিন যায়, বছর যায়। ড্যানিয়েলদের সুখ-সৌভাগ্য দেখে হিংসেয় যাদের বুক জ্বলে তারা আবার একটু একটু করে মাথাচাড়া দিতে থাকে। রাজামশাইকে সদাসর্বদা খোশামোদ করে তারা।

—মহারাজ, আপনি হলেন দেবতাদের চেয়েও বড়।

—আপনার তেজ সূর্যের চাইতেও বেশি।

—রাজ্যে আপনার একটা স্বর্ণমূর্তি স্থাপন করা উচিত। এত বড় রাজা আপনি, একটা স্বর্ণমূর্তি থাকবে না আপনার?

—ইহুদীগুলো কী ঈশ্বর ঈশ্বর করে, আসল ঈশ্বর তো আপনি।

দিনের পর দিন একই কথা শুনতে শুনতে রাজা নেবুকাডনেজারের মন দুর্বল হয়ে পড়ল। অহঙ্কারে চাপা পড়ল বিচারবুদ্ধি। নিজের প্রকাণ্ড এক স্বর্ণমূর্তি গড়িয়ে হুকুম দিলেন, রাজ্যের প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন সব কাজের আগে প্রণাম জানাবে ঐ মূর্তিকে। যে এই আদেশ অমান্য করবে তাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।

তুরী ভেরী বাজিয়ে ব্যাবিলনে রাজার স্বর্ণমূর্তির পুজো শুরু হলো। ড্যানিয়েল তখন ছিল না ব্যাবিলনে। বন্ধুরা ছিল। রাজার আদেশ তারা শুনল কিন্তু কান দিল না। প্রতিদিন যেমন ঈশ্বরের উপাসনা করছিল তেমনি করে যেতে লাগল। রাজার কাছে খবর পৌঁছতে দেরি হলো না। তাদের ডেকে পাঠিয়ে ধমক দিলেন রাজা, ভালোয় ভালোয় আমার মূর্তিকে প্রণাম কর নতুবা পুড়ে মরতে হবে।

মৃদু হেসে হানানিয় বলল, আগুনকে আমরা ভয় পাই না মহারাজ। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করছেন।

কী এত বড় কথা? সেনাপতি, জ্বালাও আগুন। তারমধ্যে হাত-পা বেঁধে ফেলে দাও এই বেয়াদপ তিনটেকে। দেখি কেমন করে ওদের ঈশ্বর ওদের রক্ষা করেন।

ব্যাবিলনবাসীরা খুব উৎসাহ নিয়ে দেখতে এল তিনটে ইহুদীর ঔদ্ধত্যের পরিণাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! সবার চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কেমন হেঁটে বেড়াচ্ছে ওরা! আগুন ওদের স্পর্শ করছে বলে মনেও হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ওদের সঙ্গে আগুনের মধ্যে হাঁটছে আরও একজন। কী সুন্দর চেহারা তার। কী সুন্দর পোশাক!

বিস্ময়ে মুখে একটি কথাও ফুটছে না কারও। অনেকক্ষণ পর রাজা বললেন, আগুন নেভাও। ওদের আসতে দাও আমার সামনে।

নিভিয়ে ফেলা হলো আগুন। হানানিয়, মিশায়েল আর অ্যাজারিয় হাসিমুখে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মাথার একগাছি চুল কি পোশাকের একগাছি সুতো অবধি পোড়েনি। আগুনের মধ্যে থেকে নয় তারা যেন সুগন্ধি জলে স্নান করে উঠে এসেছে। এত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাদের। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, আগুন তোমাদের পোড়াতে পারল না কেন? কোন শক্তিতে তোমরা আগুনকেও হারিয়ে দিলে?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে হানানিয় বলল, আমাদের কোনো শক্তিই নেই মহারাজ। ঈশ্বর আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন তাই বেঁচে আছি।

রাজা বললেন, তোমরা তো তিনজন কিন্তু আগুনের মধ্যে আর একজনকে দেখলাম। সে কে?

হানানিয় বলল, তিনি স্বর্গের দূত। ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের সাহস দিতে।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল, সব মিথ্যে কথা মহারাজ। ওদের একটা কথাও আপনি বিশ্বাস করবেন না। ওরা নিশ্চয়ই জাদু জানে। ওদের ঈশ্বর আসলে শয়তান।

রাজা কিন্তু ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। ফিরে পেয়েছেন নিজের বিচারবুদ্ধি। এই তিন কিশোর তো ড্যানিয়েলেরই বন্ধু। এদের চোখেও তারই মতো সততা আর বুদ্ধির দীপ্তি। এরা কি জাদুকর হতে পারে? কক্ষণো না। ভুল তাঁরই হয়েছে। মানুষ হয়ে তিনি দেবতার মতো পুজো পেতে চেয়েছেন। কঠিন কণ্ঠে নেবুকাডনেজার তখন ঘোষণা করলেন, আমার হুকুম আজ থেকে কেউ এদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করবে না। যদি কেউ করে তবে তাকে টুকরো টুকরো করে টাইগ্রিসের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। ওরা ওদের ঈশ্বরকে ইচ্ছামতো পুজো করবে তাতে কেউ ওদের কোনোরকম বাধা দেবে না।

শুধু এতেই তৃপ্ত হলেন না নেবুকাডনেজার। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁর

রাজ্যের তিনটি প্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন ওদের ওপর।

কেটে গেলো আরও অনেকগুলো বছর। হাতে পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় একদিন যারা জেরুজালেম থেকে ব্যাবিলনে এসেছিল এখন তারা অনেক সম্মানের সঙ্গে বাস করছে ব্যাবিলনে। ড্যানিয়েলরা এনে দিয়েছে এই সম্মান। দুঃখ শুধু একটাই, এখনও তাদের জেরুজালেমে ফেরা হলো না। রাজা নেবুকাডনেজার বেঁচে থাকলে হয়তো এতদিনে তারা ফিরে পেত নিজেদের দেশ। তাঁর ছেলেও বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। ব্যাবিলন দখল করে নিয়েছে পারসিকরা। তবে আশা একটাই যে ড্যানিয়েলকে পারস্যরাজ দারিয়ুসও খুবই ভালবাসেন। তিনি এতই নির্ভর করেন তার ওপর যে জেরুজালেমে যেতে দেবার কথা চিন্তাও করেন না। একশ কুড়িটা প্রদেশের প্রদেশপালদের মাথার ওপর বসিয়ে রেখেছেন ড্যানিয়েলকে। শীগগিরই হয়তো প্রধানমন্ত্রী করে নেবেন।

ব্যাপারটা পারসিকদের কাছে মোটেই সুখকর নয়। ড্যানিয়েলের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না তারা। কত চেষ্টা করে তার কাজে ভুল ধরার, যাতে রাজার কাছে তার নামে নালিশ করা যায়। কিন্তু ইহুদীটা যে একটা ভুলও করে না! অনেক ভেবেচিন্তে কয়েকজন মন্ত্রী একটা মতলব ঠাওরাল। রাজাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা আদেশপত্রে সই করিয়ে নিল তারা। তারপর রাজ্যের সর্বত্র ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিল, আজ থেকে আগামী তিরিশ দিন যার যা প্রার্থনা আছে সব জানাবে রাজার উদ্দেশে। এ আদেশ যে মানবে না তাকে ফেলে দেওয়া হবে সিংহের মুখে।

এটা আসলে পারসিকদের মধ্যে প্রচলিত একটা প্রথা। মন্ত্রীরা সেই প্রথাকেই আইনে পরিণত করে ড্যানিয়েলকে ফাঁদে ফেলতে চাইল। কারণ, তারা খুব ভাল করেই জানে ড্যানিয়েলের কাছে তার ধর্মই সবচেয়ে বড়। ওদিকে ড্যানিয়েল রাজার আদেশ শুনেও শুনল না। পারসিক মন্ত্রীরা তার বাড়ি গিয়ে দেখল যে সে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করছে। তাদের আনন্দ আর ধরে না। ছুটতে ছুটতে গিয়ে তারা দারিয়ুসকে বলল, মহারাজ, ড্যানিয়েল আইন ভঙ্গ করেছে। তাকে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হোক।

চমকে উঠলেন দারিয়ুস। এ কি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন তিনি। ড্যানিয়েল ধর্মে ইহুদী, কিন্তু বাস তো করে পারসিক রাজ্যে। এ রাজ্যে কেউ আইন ভাঙলে স্বয়ং রাজারও তাকে ক্ষমা করার অধিকার নেই। কি আর করেন, মন্ত্রীদের আইনমতো কাজ করার অনুমতি দিয়ে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। সেদিন তিনি খেতে পারলেন না, ঘুমোতে পারলেন না। সারাটা রাত অস্থির পায়ে পায়চারি করে কাটল। কী হবে ড্যানিয়েলের? বিনা দোষে সিংহের মুখে প্রাণ দেবে? না, তা হয় না। দারিয়ুস নিজের অজান্তেই বলে উঠলেন, ড্যানিয়েল, তোমার ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।

ভোর হতে না হতেই দারিয়ুস ছুটলেন সিংহের গহ্বরের কাছে। ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন, ড্যানিয়েল, ড্যানিয়েল, তুমি কি বেঁচে আছ? ড্যানিয়েল সাড়া দিল গহ্বরের ভেতর থেকে, হ্যাঁ, মহারাজ, আমি বেঁচে আছি। ঈশ্বর তাঁর দূত পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ, আমি নির্দোষ। আপনাকে আমি কখনোই অসম্মান করিনি মহারাজ।

ভীষণ খুশি হলেন দারিয়ুস। বললেন, আমি জানি ড্যানিয়েল তুমি কখনো আমাকে অসম্মান করতে পারো না। কোনো অন্যায় করতে পারো না তুমি। হিংসার বশে তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে আমার মন্ত্রীরা। এর শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

ড্যানিয়েলকে তুলে আনা হলো সিংহের গহ্বর থেকে এবং রাজার আদেশে সেই গহ্বরে ফেলে দেওয়া হলো ঈর্ষ্যাপরায়ণ কুচক্রী মন্ত্রীদের।

এরপর ইহুদীদের আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ড্যানিয়েল তার পরিশ্রম আর ধৈর্য দিয়ে গোটা জাতটার ভাগ্য বদলে দিয়েছিল। রাজা দারিয়ুস তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে সসম্মানে মুক্তি দিলেন তাদের। সুখে-দুঃখে সত্তরটা বছর ব্যাবিলনে কাটিয়ে ঘরে ফিরে গেল ইহুদীরা।

[বাইবেলের পুরাতন নিয়ম থেকে]

ছবি : সুফি

রসারক সুনির্মল বসু

রামের গাছে আম পেকেছে শ্যাম খাবে তার ফল
পুকুর কাটে চন্দ্র ভায়া নন্দ খাবেন জল
দাদা, করবি কি আর বল।
হাঁদুর ক্ষেতের ফসলগুলি খাঁদুর ঘরে যায়
যদুর গরুর দুধ যা হলো মধু ঘোষাল খায়
দাদারে করবি কি, হায়।

রহিমচাষী গোলার পরে ধান তুলেছে ঐ
মহিম ভায়া দিচ্ছে যে তার পাকা ধানে মই
দাদা, করিস নে হৈচৈ।
রামুর পোষা নধর-পাঁঠা আশু লাগায় ভোজ
পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার চলছে খেলা রোজ
দাদা, কেমন মজা বোঝ।
সাহিত্যিকে লিখছে লেখা ভাঁড়ার তাদের ফাঁক
গ্রন্থবণিক ব্যাঙ্কে টাকা তুলছে লাখে লাখ
দাদা, চুপটি করে থাক।

ছবি : সুফি

পাতালঘরের রহস্য

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিছানার ওপর উঠে বসলো মোমা। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটছে। কান্নার শব্দটা ও এখনো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। আর সেই চাপা হাসি, চাবুকের শব্দ...

ও অবাক হয়ে চারপাশে তাকালো। না কারো ঘুম তো ভাঙেনি। মিউ, বুয়া, বাবুদাদা, রাজাদাদা সক্কলে ঘুমোচ্ছে। কিকিটাও আলমারির ওপর বসে বসে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য! ওদের ঘুম ভাঙলো না কেন? ওরা কি কিচ্ছু শুনতে পায়নি? ভীষণ অবাক হয় মোমা। তাহলে কি ও স্বপ্ন দেখলো? হয়তো তাই! শুয়ে পড়লো মোমা।

ঘরে হ্যারিকেনের মৃদু আলো। সার সার মশারি ফেলা সেই বড় ঘরটার মধ্যে। বাইরে নিকষ অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে নারকেল গাছগুলোকে মাথা নাড়তে দেখতে পেলো। অন্ধকারের মধ্যেও অনেক কিছু পরিষ্কার দেখা যায়। তারাদেরও যে আলো আছে, মোমা এর আগে কোনোদিন বুঝতে পারেনি। তারার আলোয় অস্পষ্ট হলেও অনেক কিছুই দেখা যায়। মোমার মন থেকে সেই ভয় ভয় ভাবটা যায়নি। সকলেই ঘুমোচ্ছে, জেগে সে শুধু একা। কথাটা মনে হতেই ভয় করে ওঠে মোমার। ও তাড়াতাড়ি চোখ বোজে। তারপর কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝতেও পারেনি।

হঠাৎ একটা খসখস শব্দে মোমার ঘুম ভেঙে যায়। জানলার দিকে তাকাতেই ভয়ে আঁতকে ওঠে সে। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দর সঙ্গে ভূ...ভূ...বলে কাতরে ওঠে।

ঘুম ভেঙে যায় বাবুর। মশারি সরিয়ে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে এগিয়ে যায় মোমার দিকে। মোমা তখনো ভূ... ভূ... বলে গোঁগাঁচ্ছে।

বাবু ঠেলা দেয় ওকে, এই মোমা... মোমা—কী হয়েছে তোর... এই... এই...

বাবুর গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় মিউ-এর, বুয়ার। মিউ তাড়াতাড়ি গ্লাস থেকে খানিকটা জল নিয়ে ঝাপটা দেয় মোমার চোখে-মুখে। বুয়া ততক্ষণে হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিকি গা-ঝাপটা দিয়ে বলে উঠলো, কি হচ্ছেটা কি?

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা লাগায় সস্মিত

ফিরে পায় মোমা। আতঙ্কিত চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলে, ভূত, ভূত...

কোথায় ?

আঙুল তুলে জানলাটা দেখিয়ে দেয় মোমা। বাবু এগিয়ে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ে। দোতলা ঘর। বাইরে গাছপালা ছাড়া আর কিছু ওর চোখে পড়ে না। কয়েকটা তরুণ নারকেল গাছের মাথা জানলা বরাবর উঠে এসেছে। অল্প হাওয়ায় বড় বড় পাতাগুলো সামান্য দুলছে। বাবুর মনে হলো, মোমা বোধহয় এইসব দেখেই ভয় পেয়েছে। মোমার দিকে ফিরে বাবু বললো, তুই কীরে, গাছপালার ডালটাল দেখেই ভয় পেলি ?

না, না—মোমা প্রতিবাদ করে ওঠে, আমি স্পষ্ট একটা মুখ দেখেছি।

মুখটা মানুষের নয় ভূতের, বুঝলি কি করে ?

মোমার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। বলে, মানুষের মুখ ওরকম হতে পারে না। দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, নাক নেই। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে। উঃ, কী বীভৎস! তা ছাড়া...

তাছাড়া কি ?

আমি যে চাপা কান্না আর হাসির শব্দও শুনেছি...

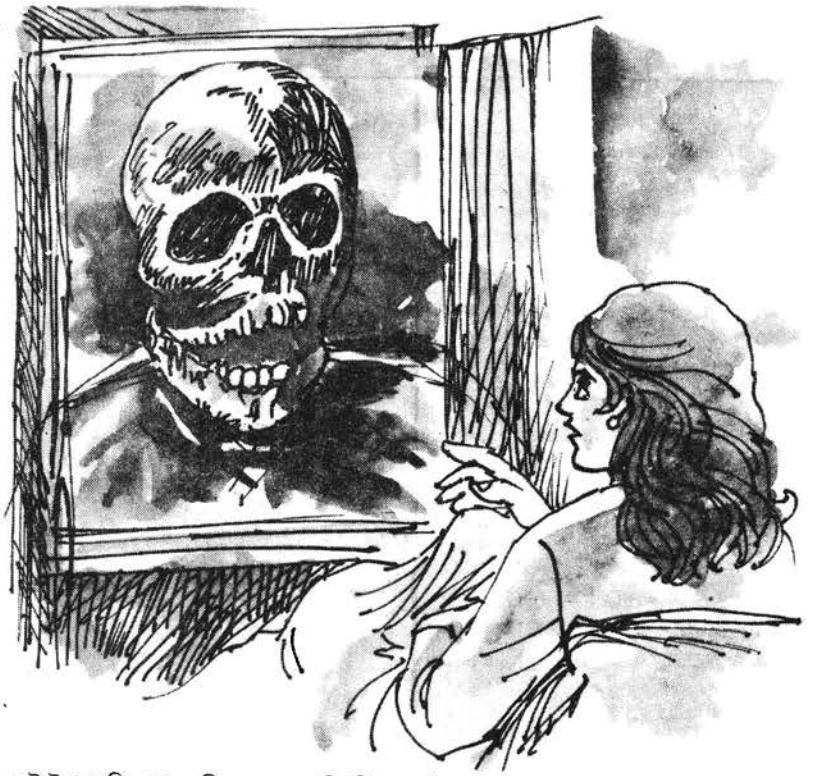

মোমার কথা শেষ হলো না, হেসে উঠলো বাবু। বললো, তুই আগে থেকেই ভূতের ভয় পেয়ে বসে আছিস। আমরা কেউ কিছু শুনলাম না, দেখলাম না—সবকিছু শুধু তুই শুনলি, তুই-ই দেখলি। সাধে কি তোকে আমি ভীতুর ডিম বলি! শুয়ে পড় দেখি। সবে সাড়ে তিনটে। আরো খানিকক্ষণ ঘুমোনো যাবে।

বাবু গিয়ে নিজের বিছানায় উঠে মশারি গুঁজে নিলো। বুয়া আলো কমিয়ে দিয়েছে। মিউ মোমার মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, ঘুমিয়ে পড় মোমা। কাল সক্কালবেলায় নদীর ধারে যাবো।

মিউ-এর কথায় শুয়ে পড়লো মোমা। ওর চোখে-মুখে তখনো ভয় ভয় ভাব। মিউ-এর

চোখ এড়ায়নি তা। বললো, ভয় কীরে। আমরা তো আছি।

মোমা কিছু বললো না। মনে হলো মিউ-এর কথায় একটু সাহস পেয়েছে। মিউ গিয়ে শুয়ে পড়লো। মোমাও চেষ্টা করলো ঘুমিয়ে পড়তে।

ওদের ঘুম যখন ভাঙলো ততোক্ষণে সকালের সোনালী রোদ পুবের জানলা দিয়ে এসে ঘরে হানা দিয়েছে। ঘরের সামনে বিশাল ছাদ। ওরা এক এক করে এসে দাঁড়ালো ছাদে। পুবের দিকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে। ইছামতী নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। বিশাল চওড়া নদীর ওপারটা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নদীর ধারের গাছ-গাছালির মাথার ওপর সূর্যদেব উঠে বসে আছেন। সকালের নতুন সূর্যের সোনালী আভা এসে পড়েছে নদীর জলের ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায়। রোদটা বহমান জলের ওপর তিরতির করে কাঁপছে। কী সুন্দর যে দেখতে লাগছে! ভেসে আসছে হাজারো পাখির ডাক। ছাদের পাশেই একটা আমগাছের ডালের ওপর বসে আছে কিকি। ওর বসার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, চট করে ওখান থেকে নড়বে না সে। বাঁ দিকটায় মস্তবড় পুজোর দালান। গোল গোল ইঁটে তৈরি। হেস্টিংসের সময়ে তৈরি। অন্তত সাড়ে তিনতলা সমান উঁচু।

ওরা যখন পুজোর দালানটা দেখছিলো তখনই এসে হাজির হলো হরিদা। হরিদা এ বাড়ির কেয়ারটেকার। সত্তরের ওপর বয়েস। বলিষ্ঠ গড়ন। জন্ম থেকেই এ বাড়িতে আছে। আগে যখন পুজো হতো তখন কলকাতা থেকে সকলে আসতো। বাড়ি গমগম করতো। পুজো বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন। আজকাল আর কেউ আসে না। মিউরা এসেছে কয়েক বছর পরে। আগে খবর দেওয়া হয়েছিলো। তাই হরিদা ওপরের ঘট-টর পরিষ্কার করে, রাত্তিরের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। হরিদা ওদের ছাদের ওপর দেখে বললো, অ দাদাবাবু-দিদিমণিরা, তোমরা সকালে কি খাবে? চা করে আনবো?

চা পরে হবে হরিদা, আগে বলো দেখি দালানের পাশে ঐ ভাঙা ঘরগুলোয় কি ছিলো?

হরিদা ছাদের উত্তর দিকটায় এগিয়ে গিয়ে ওদের কাছাকাছি দাঁড়ালো। তারপর একটা দীর্ঘ- নিঃশ্বাস ফেলে বললো, কি ছিলো আর আজ কি হয়েছে। ঐ যে দেখছো একদম শেষের ভাঙা ঘরটা—ওটা ছিলো নারায়ণের ঘর। পুজোর এক মাস আগে ওখানে ঘট বসতো। রোজ পুজো হতো। ওর লাগোয়া ঘরটা ছিলো নৈবেদ্য-ঘর। ওখানে সারা বছরের গঙ্গাজল রাখা থাকতো বড় বড় কলসিতে। একটা একটা কলসি মানুষ-সমান উঁচু। পুজোর জিনিসপত্তর, ফলমূলও থাকতো ওখানে। ওখান থেকেই নৈবেদ্য বারকোশে সাজিয়ে দালানে আনা হতো। ঘরের পাশে বেলগাছটা দেখতে পাচ্ছো? ঐ হচ্ছে বোধনগাছ। দুর্গাপুজোর বোধন হতো ওখানে।

কথা থামিয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে হরিদা দুহাত তুলে নমস্কার করলো। মিউ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, নমস্কার করলে কেন?

করবো না? তোমরা আঙুল তুলে দেখালে যে। কখনো আঙুল তুলে ও গাছ দেখাবে না।

ঐ গাছে উনি আছেন তো!

হরিদার কথার মধ্যে রহস্যের জাল। বাবু বলে উঠলো, কে আছেন হরিদা, বলো না!

কে আবার, তিনি—ঐ যে ফর্সা রং, ইয়া চেহারা, গলায় মোটা পৈতে, পায়ে খড়ম। প্রত্যেক অমাবস্যার দিন রাত্তিরে গাছ থেকে নেমে দালানে আসেন। ওঁর পায়ের খড়মের আওয়াজ কতো লোকে শুনেছে...

তাহলে বোধহয় তিনিই কাল জানলায় এসেছিলেন। মোমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো।

তিনি এসেছিলেন না মুণ্ডু। তুই তো বললি মড়ার খুলি দেখেছিস!

হরিদা ওদের কথা বুঝতে চেষ্টা করছিলো। ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছিলো কাল রাত্তিরে?

কিছু না হরিদা। মোমাটা বড্ড ভীতু। নতুন জায়গায় এসেই ও ভূত দেখে ফেললো! সব ওর মনের ভুল।

ওরা খেয়াল করেনি, হরিদার মুখ-চোখের চেহারা বদলে গেছে। আস্তে আস্তে বললো, হেসো না। এ মোটেই হাসির কথা নয়। এ বাড়ি নিয়ে কতো কথা শোনা যায় জানো। লোকে তো এটাকে এখন ভুতুড়ে বাড়ি বলে। রাত্তিরে এদিকে তো কেউ আসেই না। অনেকেই অনেক কিছু দেখেছে।

তুমি কোনোদিন কিছু দেখেছো হরিদা?

না, আমি...আমি কি করে দেখবো। বুড়ো মানুষ। সন্ধ্যে হলেই একটু আফিম খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

তাই বলো। ভূতের বাড়িতে থাকার দিব্যি ওষুধ।

ওরা হেসে উঠলো। মোমা শুধু থমথমে মুখে বলে উঠলো, তোরা হাসছিস?

তবে কি কাঁদবো?

কাঁদতে হবে না, তার চেয়ে বরং চল একবার নদীর ধারটা ঘুরে আসি। হরিদা, আমরা ঘুরে এসে চা-টা খাবো।

ওরা হৈহৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়লো। সকালবেলায় রাস্তাঘাট ফাঁকা। জোড়া বলদ আর লাঙল নিয়ে দু-একজন চাষী চাষ করতে বিলের দিকে যাচ্ছে। গাছ-গাছালির পাতার ওপর দিয়ে বাতাস বওয়ার ঝিরঝির শব্দ ওদের কানে আসে। কিকি এসে বসেছে মিউ-এর কাঁধে। পাড়ার দু-তিনটে নেড়িকুকুর ওদের পেছনে পেছনে লেজ নাড়তে নাড়তে চলেছে। ওদের বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল পেরিয়ে আর একটু গেলেই নদীর ধার। এখানে ওখানে দু-একটা জেলেদের বাড়ি। জেলেপাড়াটা শ্মশানঘাটের পাশে। এরা পাড়া-ছুট জেলে। নদীর পাশে বিশাল ভেড়ি। প্রায় হাসনাবাদের কাটা খালের মুখ পর্যন্ত। কাঁটা খাল বললে আজ আর কেউ মানবে না। বিশাল নদী হয়ে গেছে। ভেড়ির কোল বেয়ে ধানখেত। মাইলের পর মাইল। সেই হাসনাবাদ পর্যন্ত। বিলটার মধ্যিখান দিয়ে চলে গেছে বড় খাল। বড় খালের জল মিষ্টি। তবে বেশির ভাগ সময় থাকে না। দূরে হাসনাবাদের ধানকলের চিমনি দেখা যায়। বেশ লাগে দেখতে। নদীর ধারে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা ফিরে আসে।

ওদের দেখে হরিদাও ওপরে উঠে এলো। ওরা বেরিয়ে যেতেই ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিলো। হরিদার কথা, চুরির ভয় নেই। তবু সাবধান থাকতে তো দোষ নেই। হরিদা ট্যাঁক থেকে চাবিটা বের করে তালা খুলে দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করলো। ওরা এক এক করে ঘরে ঢুকলো। তারপরই ভয়ে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো। ওদের চিৎকারে হরিদা

হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠে এলো।

সারা ঘর তছনছ। ব্যাগগুলো খোলা। বিছানা ওল্টানো-পাল্টানো। ওরা হাঁ করে তাকিয়েছিলো। হরিদা ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো, এ কী! এ কী করে হলো? ঘর তো বন্ধ ছিলো। তোমরা চলে গেলেই আমি নিজে তালা লাগিয়ে নিচে নেমেছি।

হরিদার পেছনে পেছনে ওরা ঘুরে ঘুরে দেখলো। ছাদে যাবার দরজা বন্ধই আছে। জানলা দিয়ে কারো ঢোকা অসম্ভব। শিক লাগানো। তাহলে যেই এসব করুক সে ঢুকলো কোথা দিয়ে?

ওরা কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। ভয়ে মোমার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বলে উঠলো, এ নির্ঘাৎ ভূতে করেছে...

অন্য সময় হলে মিউ তাড়া দিতো। বাবু, রাজারা হেসে উঠতো। কিন্তু এখন কেউ কিছু বললো না। আসলে ব্যাপারটা ওদের ঠিক মাথায় ঢুকছে না। ভূত-টুতের ভয় ওদের ততোটা নেই। ওরা এও জানে, ভূতে আর যাই করুক, এইসব জিনিসপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে না। এর পেছনে নির্ঘাৎ একটা কোনো ব্যাপার আছে। কিন্তু কেন? ওরা তো কারো বাড়াভাতে ছাই দেয়নি। নিজেদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এতে তো কারো আপত্তি করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

মোমা বললো, চল ভাই আমরা ফিরে যাই। ট্রেন আছে, বাস আছে, ফিরে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। এখানে নিশ্চয়ই ভূত আছে। শুনলি না হরিদা বললো, লোকে এটাকে ভূতের বাড়ি বলে। তাছাড়া কাল রাত্তিরে আমি নিজের কানে কান্না শুনেছি, হাসি শুনেছি। ওসব কি মানুষের হতে পারে?

মিউ আর মোমা সব গুছিয়ে নিচ্ছিলো। ওদের জিনিসপত্তর সারা ঘরময় ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। মিউ মোমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুই চুপ করবি? বকর-বকর করবি তো দক্ষিণবাড়ির সামনে গিয়ে তোকে বাসে তুলে দেবো। কলকাতায় চলে যাবি। আমরা এখন আর এখান থেকে নড়ছি না। বকবক না করে বাইরে গিয়ে একবার দ্যাখ তো কিকি কোথায়!

আমি এখানে। বাইরের টানা বিশাল ঢাকা বারান্দা থেকে কিকি উত্তর দিলো।

একটু পরেই হরিদা এলো অনেকটা মুড়ি, নারকেল আর নাড়ু নিয়ে। নারকেলগুলো টুকরো টুকরো করে কাটা।

মুড়ির পরিমাণ দেখে রাজা আঁতকে উঠলো। অতো মুড়ি কে খাবে হরিদা? কমাও, কমাও...

খেয়েই দেখো না কিরকম মিষ্টি। নারকেল দিয়ে খেতে শুরু করো, দেখবে কখন ফুরিয়ে গেছে।

বাবু এগিয়ে এক মুঠো মুড়ি গালে ফেলে চিবোতে চিবোতে বললো, ফার্স্ট ক্লাশ...

হরিদা বললো, মুড়ি খেয়ে নিচে এসো। পুকুরঘাটে বসে চা খেতে খেতে মাছ ধরা দেখো।

দারুণ! জাল ফেলবে?

হ্যাঁ, সনাতন আসছে জাল নিয়ে।

বাবু বললো, হরিদা, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখবো।

নিশ্চয়ই। মাছ ধরার পর দেখাবোখন। যাই দেখি আবার পাঁচি এলো কিনা!

পাঁচি কে?

তোমরা চিনবে না। মা ঠাকরুন চেনেন। ও রান্না করবে।

হরিদা চলে গেলো। মুড়ি-টুড়ি খেয়ে একটু পরেই ওরা নিচে নেমে এলো। গিয়ে বসলো পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটে। দুপাশে সিমেন্টের তৈরি হেলানো বেঞ্চি। তার সামনে চাতাল। তারপর ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। সনাতন চাতালে বসে জাল ঠিক করছিলো। পুকুরের চারপাশে গাছ-গাছালিতে ভরা বাগান। নারকেল গাছই বেশি। কাঁদি কাঁদি ডাব ধরে আছে। ঝুনোও আছে। আম, জাম, কাঁঠাল গাছও অনেক। একটা আমগাছ বেড় দিয়ে পান-গাছ লতিয়ে উঠেছে ওপরে। হরিদার পান কিনতে হয় না। এ পাশে ফাঁকা জায়গায় শাক আর লঙ্কা ফলেছে।

ততোক্ষণে সনাতন জাল ফেলেছে। দু-তিনবার জায়গা বদল করে জাল ফেলার পর আড়াই-তিন কিলো ওজনের একটা পোনা মাছ উঠে এলো। চাতালের ওপর মাছটাকে ফেলতেই লেজ ঝাপটাতে লাগলো। চকচক করছে আঁশগুলো। পেটের দিকটায় লালচে আভা। হরিদা খুব খুশি। ওদের কিন্তু ভালো লাগছিলো না। মিউ বললো, চল আমরা পুজোর দালানের দিকটা দেখে আসি।

'সেই ভালো' বলে বাবু বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। বিশাল ঘরটা চেয়ার টেবিল আর সোফায় ঠাসা। আগে এই ঘরটাকে বৈঠকখানা ঘর বলা হতো। ঘরটার পুব দিকে টানা বারান্দা চলে গেছে পুজোর দালান পর্যন্ত। তার সামনেই মস্তবড় চক। চকের ঠিক মধ্যিখানে চৌকো একটা জায়গা বালিতে ভরা। বাবু বললো, দুর্গাপুজোর সময় এখানে বলিদান হতো।

মিউ হেসে বললো, ছাগল-টাগল নয় কিন্তু, চালকুমড়ো আর আখ বলি দেওয়া হতো।

কথা বলতে বলতে ওরা পুজোর দালানে এসে দাঁড়ালো। ছাদটা পড়ে গেছে। বিশাল পুজোমণ্ডপের ওপরে খোলা আকাশ। একসময় দুর্গাপুজো, কালীপুজো হতো এখানে। তা ছাড়া থিয়েটার-টিয়েটার তো লেগেই থাকতো। সারা বছর গমগম করতো।

বাবু দালানের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে সামনের চকটা দেখিয়ে বললো, জানিস এই চকটার তলায় অনেকগুলো ঘর। আমরা পাতালঘর বলতাম।

মাটির তলায় ঘর?

হ্যাঁ! সে যুগে তো খুব ডাকাতি হতো। তাই ডাকাত পড়লে সোনা-দানা নিয়ে সকলে গিয়ে পাতালঘরে আশ্রয় নিতেন। তবে দুষ্টু লোকরা বলে, অবাধ্য প্রজাদের ওখানে গুম করা হতো। নিচে নাকি অনেক নরকঙ্কাল আছে।

বাবুর কথা শুনে মোমার মুখ শুকিয়ে গেলো। বললো, কী সাংঘাতিক! এটা তো দেখছি সত্যি সত্যিই ভূতের বাড়ি। মিউ ভাই, চল আজই আমরা ফিরে যাই।

মিউ ছাদের দিকে তাকিয়েছিলো। অনেকক্ষণ থেকে ওর মনে হচ্ছিলো ওদের কেউ লক্ষ্য করছে। হঠাৎ ছাদের দিকে নজর যেতেই মনে হলো, কেউ যেন সরে গেলো। কে হতে পারে? হরিদা নয়, পাঁচিদি নয়, সনাতন তো হতেই পারে না। তাহলে কে? ওরা তো ছাদের ঘরেই আছে। মিউ-এর দেখাদেখি অন্যরাও ছাদের দিকে তাকিয়েছিলো। কিন্তু কারো কিছু চোখে পড়লো না।

পুজোর দালান থেকে নেমে এসে নারায়ণের ঘরের পাশ দিয়ে বোধনতলায় এলো। মিউ মোমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই দ্যাখ সেই বেলগাছটা। হরিদার ব্রহ্মদত্যি এই গাছে থাকেন। হ্যাঁরে, খড়ম পায় দিয়ে কি করে ওঁরা গাছে ওঠেন রে?

ওঁদের নিয়ে ঠাট্টা করিস না মিউ। মনে রাখিস, পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে যার বিন্দুবিসর্গও আমরা জানি না।

ওদের কথায় বাবুর কান ছিলো না। ও দেখছিলো একটা পায়-চলা পথ বোধনতলার পাশ দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। কেউ এখান দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে। তাই পায়-চলার ঐ দাগ। কিন্তু কে বা কারা? হরিদা কি জানে? বাবুর মাথায় হাজার চিন্তা এসে ভিড় করে। কাল রাত্তিরে মোমা ভূত দেখেছে। আজ ওদের তালা দেওয়া ঘরে ঢুকে ওদের জিনিসপত্তর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। এখন আবার একজন ছাদের ওপর থেকে ওদের ওপর নজর রাখছে। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন একটু গোলমেলে। বাবু রহস্যের গন্ধ পায়। ওর মুখে ফুটে ওঠে হাল্কা হাসি।

ঠিক তক্ষুণি কিকি উড়ে এসে বসে মিউ-এর কাঁধে। বাবু পায়-চলা পথটা ধরে এগিয়ে যায়। পেছনে ওরা। নারায়ণ ঘরের পেছনের ভাঙা ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে পথটা গিয়ে শেষ হয়েছে ওদের বাড়ির একটা দরজার সামনে। বাবু জানে দরজার পরই একটা লম্বা গলি। গলিটা দিয়ে এগিয়ে গেলে বাঁ দিকের বড় ঘরটাতেই পাতালঘরে যাবার সিঁড়ি। সিমেন্ট দিয়ে অবশ্য সিঁড়ির মুখটা বন্ধ। দেখলে কিছু বোঝার উপায় নেই। ঘরটাও সবসময় তালাবন্ধ থাকে। বাবু জানে, ঐ ঘরের চাবি সবসময় হরিদার ট্যাঁকে গোঁজা থাকে। হরিদা ন মাসে-ছ মাসে একদিন দরজা খুলে ঘরটা পরিষ্কার করে।

বাবুর মনটা খুঁতখুঁত করে। ওর মনে হয়, ওসব ভূতটুতের ব্যাপারটা ধাপ্পা। আসলে পুরো ব্যাপারটার পেছনে একটা বড় কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু কি সেই রহস্য?

দুই

সন্ধ্যেবেলায় ওরা ছাদের ওপর মাদুর পেতে বসেছিলো। রাজা টানটান হয়ে শুয়ে। জোরে হাওয়া দিচ্ছে। চাঁদ উঠবে শেষ রাত্তিরে। চারদিকটা অন্ধকার। আকাশভরা তারা। তারাদেরও যে আলোর জোর আছে, গ্রামে এলে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তারাদের আলো থাকায় অন্ধকারটা নিকষকালো নয়। তার ওপর আবার অজস্র জোনাকির চিকমিচি। আর ঝিঁঝিঁ

পোকার একটানা ডাক কানে আসছে।

রাজা জিজ্ঞেস করলো, বাবু, পাতালঘরে নামা যায় না?

যাবে না কেন—সিঁড়ি-টিড়ি সবই আছে, কিন্তু বড্ড সাপ ওখানে।

মিউ বললো, ওখানে নামার কথা ভেবো না রাজাদাদা। পঞ্চাশ-ষাট বছরের বেশি কেউ ওখানে নামেনি। তবে মোমা যদি চায় নামতে পারে।

দরকার নেই বাবা, আমি বলে কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছি। এই ভূতের বাড়িতে আমার একদম ভালো লাগছে না।

আমাদের সঙ্গে থেকে থেকেও তোর যে আজো কেন ভয় কাটলো না জানি নে।

বুয়া বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো? কি?

কিকির এখানে এসে এতো ভালো লাগছে যে একবারও মিউকে পড়তে বসতে বলেনি।

ওরা সক্কলে হেসে উঠলো। তক্ষুণি হরিদা এসে হাজির হলো। বললো, অতো হাসির কি হলো?

বাবু ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললো, ওরা বলছিলো তোমার ব্রহ্মদত্যিটা যদি এখন এখানে খড়ম পায় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হয়...

ওরকম কথা একদম বলতে নেই। হরিদা দুহাত জোড় করে অজানার উদ্দেশে প্রণাম জানালো। তারপর বললো, তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো না!

সবে আটটা বেজেছে। এতো তাড়াতাড়ি কেউ খায় নাকি? অন্তত নটা বাজুক। তা হরিদা, আমাদের একটা ভূতের গল্প বলো না?

এখন থাক। কাল বলবো। এই রাত্তিরবেলায় ওঁদের কথা না বলাই ভালো। ঘুমের ঘোরে ভয়টয় পাবে শেষকালে।

হরিদা, আমাদের বাড়িটার ভুতুড়ে বাড়ি নাম হলো কেন?

তা হবে নাই-বা কেন বলো! তেনারা সত্যিই আছেন তো! ও তরফে দুজন আছেন—এ তরফে... না থাক, এসব কথা বলাবলি করতে নেই।

হরিদা কথা বাড়ালো না, নিচে নেমে গেলো।

খেয়েদেয়ে উঠে ওরা অনেকক্ষণ গল্প করলো। ক্যাসেটে মাইকেল জ্যাকসনের গান শুনলো। হরিদা ততোক্ষণে মশারি-টশারি টানিয়ে দিয়ে গেছে। যাবার আগে বলে গেছে, এবার কিন্তু আমি শুয়ে পড়বো। ডাকলে আর সাড়া পাবে না।

বাবু হেসে বললো, জানি।

বাবুর কথায় অন্যরা যখন হাসছিলো তখন মোমা শুকনো মুখে আস্তে আস্তে বললো, আমি কিন্তু জানলার ধারে শোব না।

কেন রে, তোর ভয় করছে? যদি ঐ নারকেল গাছের মাথায় বসে তোকে ভূতে ঢিল মারে...

ভালো হচ্ছে না কিন্তু মিউ। সকাল থেকে বলছি চল ফিরে যাই, তো আমার কথা তোরা শুনলিই না। এই ভূতের বাড়ি...

এই, আমাদের বাড়িকে ভূতের বাড়ি বলবি নে। আমরা কি ভূত?

সকলেই তো বলে। যাক গে, আমি আজ জানলার ধারে শুচ্ছি না।

কথা শেষ করার আগেই মোমা উঠে পড়ে ঘরের কোণের দিকে বুয়ার বিছানার কাছে চলে গেলো। বললো, বুয়া, আমি তোর জায়গায় শুচ্ছি—তুই আমার বিছানায় শো।

বুয়া হেসে বললো, তুমি শোও মোমাদিদি। ভূত যদি আসে আমি আলাপ করে নেবো।

বুয়ার খুব সাহস। হবে নাই বা কেন? ও তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। ও বেদেদের মেয়ে*। দলের সঙ্গে একসময় ও তো পথে পথে ঘুরে বেড়াতো। যেখানে সেখানে থাকতো। ভয়ডর বলে কোনো জিনিস ওর মধ্যে নেই। তবে এই ক'বছর মিউদের বাড়িতে বাড়ির মেয়ের মতো থেকে ওর হাবভাব, চাল-চলন সব বদলে গেছে। ওকে দেখে এখন আর বোঝার উপায় নেই যে ও আর পাঁচটা বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়।

কেল্লারহস্য দ্রষ্টব্য

রাত বাড়ছিলো। ওরা আর দেরি করলো না। শুয়ে পড়লো। বাবু বললো, কাল ভোরবেলায় আমরা কিন্তু নদীর ধারে যাবো।

তখন কতো রাত কে জানে, একটা খসখস শব্দে বাবুর ঘুম ভেঙে গেলো। ওর মনে হলো ওপাশে জানলায় কিছুর যেন আবছা ছায়া। ঘরের মধ্যেটা অন্ধকার। হ্যারিকেনটা টিমটিম করে জ্বলছে। তার ওপর ঘরে এতোগুলো মশারি থাকায় অন্ধকারটা রীতিমতো গাঢ় হয়ে উঠেছে। বাবু মাথার পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিলো। মশারি তুলে বাইরে বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে আলমারির কাছে এলো। দেখলো কিকি জ্বলজ্বল করে ওর দিকে তাকিয়ে। হাতটা বাড়িয়ে দিতেই কিকি উড়ে এসে ওর হাতে বসলো। কিকিকে নিয়ে বাবু এগিয়ে গেলো পশ্চিমের দরজার দিকে। খুব সাবধানে খিলটা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ালো। কাঁপা গলায় কিকিকে বললো, উড়ে যা। ঐ জানলার পাশে যদি কেউ থাকে তাকে অ্যাটাক করবি...

কিকি উড়ে গেলো। বাবু পা টিপে টিপে ঘরের পাশ দিয়ে ঐ জানলার কাছাকাছি রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। জানলার নিচেটা রাস্তার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে পরিষ্কার কিছু দেখতে না পেলেও ওর মনে হলো জানলার কাছে কিছু একটা উড়ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কিকি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। বাবুও টর্চটা জ্বেলে দিলো। বাবু পরিষ্কার দেখতে পেলো একটা লম্বা বাঁশের মাথার দিকটার কাছে ক্রসের মতো আর একটা ছোট কাঠ বেঁধে একটা সাদা পাঞ্জাবি পরানো আর বাঁশের মাথার ওপর বসানো হয়েছে একটা মড়ার মাথার খুলি। কিকি গিয়ে খুলিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সেটা ধাক্কা সামলাতে না পেরে নিচে পড়ে গেলো। বাবু টর্চটা নিচের দিকে ফেলতেই দেখলো, একটা লোক ছুটে ওপাশে চলে গেলো।

বাবু হাঁপ ছেড়ে নিজের মনে বললো, এই তাহলে ভূত!

কিকি ততোক্ষণে উড়ে এসে বসেছে বাবুর কাঁধের ওপর। বাবু ওকে নিয়ে ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়তেই তার কানে ভেসে এলো চাপা কান্নার শব্দ। বাবু কান পেতে শুনতে লাগলো। বুঝলো, কাল রাত্তিরে মোমা এই কান্নার শব্দই শুনেছে। ওরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলো। এখন বুঝছে মোমা ঠিকই শুনেছে। হ্যাঁ, ঠিকই—চাপা কান্নার পাশাপাশি ভেসে আসে হাসির শব্দ। তার মধ্যে কেউ যেন কাউকে চাবুক মারছে। তারপর সব চুপ।

বাবু তাকালো কিকির দিকে। কিকি নির্বিকারভাবে বসে আছে। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বাবুর মনে হলো, এই কান্না আর হাসির শব্দের সঙ্গে ভূতের ভয় দেখানোর নির্ঘাৎ কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ওদের কেন ভয় দেখাতে চাইছে? ওরা তো এখানে থাকতে আসেনি! দু-চার দিন থেকেই চলে যাবে। তার মানে যারা ভয় দেখাতে চাইছে তারা চায় না ওরা দু-চার দিনও এখানে থাকুক। কিন্তু কেন?

এই 'কেন'র উত্তর খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে বাবু একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলায় উঠে পড়লো ওরা। আকাশে দু-চারটে তারা টিমটিম করে জ্বলছে। গাছ-গাছালির তলায় চাপা অন্ধকার। নদীর ধার বাড়ি থেকে একটুখানি। তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওরা পৌঁছে গেলো। পুব আকাশটা ফর্সা হতে শুরু করেছে। নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মাঝনদীতে জেলেরা জাল ফেলছে। ওপারটা বাংলাদেশ। শ্মশানঘাটের ঠিক উল্টো দিকে নদীর ধারেই ছিলো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় খানসেনারা বাড়িটা ভেঙে পিলবক্স বানিয়েছিলো। ওরা গিয়ে বসেছিলো নদীর ধারের সিমেন্টের টানা বেঞ্চিটার ওপর।

পুব আকাশটা আস্তে আস্তে রাঙা হয়ে উঠছে। তার আভা গিয়ে পড়েছে নদীর ছোট্ট ছোট্ট ঢেউগুলোর মাথায়। কী সুন্দর যে দেখতে লাগছে! নদীর ধার থেকে ওদের বাড়ির ছাদটা পরিষ্কার দেখা যায়। একটুখানি তো! মিউ তাকিয়েছিলো ছাদের দিকে। বাবু আগেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলো। মিউকে চাপা গলায় বললো, ওদিকে অতো তাকাস নে। ওরা যেন বুঝতে না পারে ওদের নজর রাখার ব্যাপারটা আমরা ধরে ফেলেছি।

ব্যাপারটা কি বলো তো বাবুদাদা?

ঠিক বুঝতে পারছি নে। তবে গোলমেলে। যারাই এর পেছনে থাকুক তারা চায় না আমরা এখানে থাকি।

কিন্তু কেন? আমাদের বাড়িতে আমরা এসেছি। যতোদিন খুশি থাকবো তাতে কার কী?

সেইটাই তো প্রশ্ন। বাবু সংক্ষেপে রাত্তিরের ঘটনার কথা মিউকে বললো।

মোমা তাহলে ভুল শোনেনি, ভুল দেখেনি।

হুঁ!

কি করবে এখন?

তাই তো ভাবছি। ওরা যদি ভেবে থাকে ভয় দেখিয়ে আমাদের এখান থেকে তাড়াবে তাহলে ভীষণ ভুল করবে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো।

ঠিক বলেছো বাবুদাদা। আমাদেরই বাড়ি থেকে ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াবে, আমরা তা মেনে নেবো? কভি নেহি।

রাজা পেছন থেকে ওদের কথা শুনছিলো। হঠাৎ বলে উঠলো, আজ থেকেই লড়াই শুরু।

বাবু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, চেঁচাস নে, চেঁচাস নে। মোমা আর বুয়াকে এক্ষুণি কিছু জানাবার দরকার নেই।

পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলোর সঙ্গে ওদের ভাব হয়ে গিয়েছিলো। তিন-চারটে কুকুর ওদের পেছনে পেছনে নদীর ধারে এসেছে। কিকি তো একটা কুকুরের পিঠে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

ততোক্ষণে সূর্য উঠে পড়েছে। একটা লালচে-হলুদ রঙের মস্তবড় থালা তখন পুব আকাশে গাছ-গাছালির মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে। তার ছটায় আলোয় আলো হয়ে উঠছে চারদিক।

শুরু হলো একটা নতুন দিন। ওরা ফিরে চললো বাড়ির দিকে। বাবু ঠিক করে ফেলেছে, পুরো বাড়িটা আজ ভালো করে দেখবে। ওর মন বলছে, এই বাড়ির মধ্যেই একটা দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে। তারাই চাইছে না, ওরা এখানে থাকুক। ওসব ভূত-টুত সব বাজে। সন্ধ্যেবেলায় হরিদা শুয়ে পড়ে। একবার শুলে ওর আর হুঁশ থাকে না। তখন পুরো বাড়িটাই চলে যায় ওদের কব্জায়। ভূতের ভয় দেখিয়ে ওরা সাধারণ মানুষকে এ বাড়ির আশেপাশে আসতে দেয় না। লোকের মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়েও পড়েছে—এটা ভূতের বাড়ি। সেই অপবাদটা সামনে রেখে ওরা যে আড়ালে থেকে কি করছে কে জানে! এই রহস্য ওরা ভেদ করবেই। বাবুর মনটা দৃঢ় হয়ে ওঠে। ওদের বাড়ির এই ভুতুড়ে অপবাদ ও ঘুচোবেই।

কিকি চলেছে মিউ-এর কাঁধে বসে। আর পেছনে পেছনে আসছে কুকুরগুলো। মিউ-এর সঙ্গে ওদের খুব ভাব হয়ে গেছে। মিউ যে ওদের ভাষা বুঝতে পারে। ওদের বুঝোতেও পারে। কুকুরগুলো তাই মিউ-এর পেছন ছাড়ছে না। কিকির সঙ্গেও ওদের দিব্যি ভাব হয়ে গেছে।

তিন

ব্রেকফাস্ট সেরেই ওরা বাড়িটা ঘুরে দেখতে বেরোলো। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বাড়িটা বিশাল। শরিকে শরিকে ভাগ হয়ে গেছে। মধ্যে দিয়ে অবশ্য পুরো বাড়িটাই ঘোরা যায়। কেউই ধরতে গেলে থাকে না। চাকর-বাকরের হাতে সব ছাড়া। গোটা দুই-তিন

পুকুর, বাগান সবই আছে। প্রচুর ফল-পাকুড় হয়। হরিদা অবশ্য নিয়ম করে ফল, নারকেল, মাছ-টাছ পাঠায়। অন্যরা পাঠায় কিনা তা অবশ্য বাবুরা জানে না। তবে বাবু-মিউরা যে এসেছে এ কথা সকলেই জানে। তাই ওরা যখন বাড়িটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটছিলো তখন সকলেই এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে কথা বললো। ডাবটাব খেতে বললো। পুরো বাড়িটা ঘুরতে ঘুরতে বাবু বললো, আমি আসলে আমাদের বাড়ির চারপাশটা ভালোভাবে দেখতে চাই। পাতালঘরের মধ্যে-বাইরেটা লক্ষ্য করতে চাই। তাই ঘুরছি যাতে চট করে না কেউ সন্দেহ করে। এ কথা তো ঠিক পুরো ব্যাপারটার পেছনে নির্ঘাৎ দুষ্টচক্র আছে। তারা সাংঘাতিক কিছু করছে বলে আমার মনে হয়।

বাবুরা ঘুরে এলো বাড়ির পেছনে। কম্পাউন্ড ওয়ালের ঠিক বাইরে কয়েকটা ডোবা আছে। একটা কাঠ-বাদাম গাছ আছে। ওরা বোধনতলার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো নদীর ধারের দিকে। সেখান থেকে ওদের বাড়ির পেছনের অংশটা পরিষ্কার দেখা যায়। বাবু চারদিকটা লক্ষ্য করলো। না, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রোদ্দুরটা বেশ কড়া। বেশিক্ষণ রোদে ঘুরতে ভালো লাগলো না। ওরা পেছন দিক দিয়ে গিয়ে খিড়কির দরজার কড়া নাড়তে লাগলো। খিড়কির দরজার পাশেই রান্নাঘর। হরিদা নিশ্চয়ই সেখানে আছে। শুনতে পাবে তো? ওরা আরো জোরে জোরে কড়া নাড়লো। বাবু যা দেখার দেখে নিয়েছে। এখান দিয়ে লোক চলাচল করে। এ দরজা নিয়মিত খোলা-বন্ধ করা হয়। হরিদা কি এদিক দিয়ে কোথাও যায়?

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বিরক্ত মুখে গজগজ করতে করতে এসে হরিদা ওদের দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেলো। বললো, তোমরা এদিক দিয়ে?

নদীর ধারে গিয়েছিলাম। শর্টকাট করে এখান দিয়ে চলে এলাম।

যাও যাও, ওপরে গিয়ে ধাতস্থ হও। আমি ঠাণ্ডা জল নিয়ে যাচ্ছি। রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে যে!

হরিদা, ঐ ঘরটা একটু খুলে দাও না, ওদের পাতালঘরে যাবার সিঁড়িটা দেখাবো।

ও ঘরে যাবার কি দরকার? ও ঘরের দরজা খুলতে আমার ভয় করে। সাপ আছে। প্রায়ই ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনি।

তা হোক চলো!

দাঁড়াও, তাহলে লাঠি নিয়ে আসি।

ওরা বারান্দা দিয়ে উঠে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হরিদা একটা লাঠি নিয়ে এলো। কোমর থেকে চাবির গোঁজেটা বের করে তালা খুলতে খুলতে বললো, আমি আগে ঢুকবো। জানলা খুলে দেবো। ঘরে আলো ঢুকলে তবে তোমরা আসবে।

চাবি খুলে হরিদা ঘরের মধ্যে ঢুকে জানলা খুলে দিতেই অন্ধকার ঘরটার মধ্যে এক ঝলক আলো যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো। বাবুরাও এক এক করে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। তবে কোণের দিকটায় বোধহয় অনেকদিন ঝাঁট পড়েনি। তাই ধুলোটুলো জমে আছে। বাবু এগিয়ে গেলো সেইদিকেই। ওদের ডেকে একটা জায়গা দেখালো। এমনিতে বোঝার কোনো উপায় নেই, ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে পাথরের একটা স্ল্যাব বসানো আছে চৌকো জায়গাটার ওপর। স্ল্যাবটার মধ্যিখানে একটা ফুটো। বাবু সেই ফুটোটা দেখিয়ে বললো, ঐ কোণে দ্যাখ লোহার শিক রাখা আছে। ঐ ফুটোর মধ্যে শিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে স্ল্যাবটা টেনে তুলতে হয়।

ওরা যখন মন দিয়ে স্ল্যাবটা দেখছিলো বাবু তখন চাপা গলায় মিউকে বললো, ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ আছে দেখেছিস। জুতো পরা, খালি পা—দুই-ই আছে।

মিউ বললো, ঘরটার মধ্যে নিয়মিত লোক আসে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু!

আসে কি করে?

ওরা এগিয়ে গেলো একটা জানলার কাছে। জানলাটায় শিক নেই। সব জানলাতেই আছে, কিন্তু এটায় নেই কেন?

হরিদা, এই জানলায় শিক ছিলো না?

ছিলোই তো!

নেই যে!

হরিদা অবাক হয়ে এগিয়ে এলো। চারদিকটা দেখে বললো, আমি শেষ যেদিন ঘরটা পরিষ্কার করতে এসেছিলাম সেদিনও তো ছিলো!

তোমার ঠিক মনে আছে?

আছেই তো!

বাবু কথা বাড়ালো না। জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরেটা দেখলো। যা ভেবেছে ঠিক তাই। জানলা দিয়ে যাওয়া-আসা করার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ওপাশ থেকে মোমার গলা ভেসে এলো, হরিদা, এটা তোল না, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামি...

হরিদা আঁতকে উঠলো। ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, চলো দেখি এবার বাইরে। বলে কিনা নিচে নামবে। সিঁড়িতে পা দিলে আর দেখতে হবে না। সাপ তেড়ে আসবে।

কথা বলতে বলতে হরিদা জানলা বন্ধ করার জন্যে এগিয়ে গেলো। বললো, যাও তোমরা বাইরে যাও।

বাবু ওদের ডাকলো। এক এক করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। চললো দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। ওপরে উঠে দরজা খুলে বাবু ছাদে এলো। ঠা-ঠা রোদ। তবে রোদের ঝাঁঝ ততোটা নেই। বাবু চারদিকটা ভালো করে লক্ষ্য করলো। ওর খালি মনে হচ্ছে, কেউ ওদের ওপর নজর রাখছে। কিন্তু কে? কোথা থেকে?

ছাদের উত্তর-পুব কোণে নিচে নামার আর একটা সিঁড়ি আছে। ঐ সিঁড়িটা নিচে পাতাল-ঘরের পাশে পুজোর দালানে যাবার দরজার কাছে গিয়ে পড়েছে। ছাদে সিঁড়ির দরজাটা সব-সময় বন্ধ থাকে। নিচে কি খোলা? দেখার দরকার। বাবু ছুটে নিচে নেমে গেলো। মিউ বুঝলো, বাবুদাদা নির্ঘাৎ কিছু দেখেছে। এখন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পরে ও নিজেই বলবে। একটু পরেই বাবু ফিরে এলো। ও যা আন্দাজ করেছিলো তাই ঠিক। ওপাশের সিঁড়ির দরজা খোলা। ওদিক দিয়ে লোক ওঠা-নামা করে। বাবু রান্নাঘরে গিয়ে হরিদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলো। বাবুর কথা শুনে হরিদা আকাশ থেকে পড়ে। বললো, ওদিকটা বন্ধ রাখা হয়েছে। ওদিক দিয়ে কেউ ওপরে যাওয়া আসা করে না।

বাবু ওপরে গিয়ে দেখলো, একটা বল আর তক্তা যোগাড় করে ওরা ছাদের ওপর ক্রিকেট খেলছে।

সারাটা দিন হৈহৈ করে কেটে গেলো। বিকেলবেলাতেও ওরা নদীর ধারে বেড়াতে গেলো। জেলেপাড়ার একটা নৌকো নিয়ে ওদের বেড়ানোর ইচ্ছে। হরিদা বলেছে, হরেনকে খবর দেবে। হরেনের নৌকো আছে। ওই ওদের নিয়ে যাবে।

রাত্তিরবেলায় খেয়েদেয়ে ওরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। ভোরবেলায় উঠে আবার নদীর ধারে যাবে। আজ সূর্য ওঠা দেখতে যা ভালো লেগেছে না, ওরা ঠিক করে ফেলেছে যে কদিন এখানে আছে রোজ ভোরবেলায় নদীর ধারে যাবে। কিকি আলমারির ওপর বসে আছে। মোমা একটু চুপচাপ। ও আসলে বড্ড ভয় পেয়ে আছে। গুণ্ডা, বদমাশদের ভয় এক জিনিস আর ভূতের ভয় আর এক জিনিস। ভূত-টুতদের কখনো ঘাঁটাতে আছে! বাবুদাদারা তো মানেই না ভূত আছে। অথচ ও সেদিন

নিজের চোখে দেখেছে।

রাত তখন কতো কে জানে, একটা শব্দে বাবুর ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হলো পুজোর দালানের দিক থেকে আসছে। কে খড়ম পায় দিয়ে হাঁটছে। বাবুর সারা শরীরটা শিরশির করে উঠলো। মনে হলো ওর দেহটা যেন ভীষণ ভারী হয়ে উঠেছে। ও কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো। মন্ত্রপাঠের আওয়াজও আসছে। কেউ যেন খড়ম পায় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন্ত্রপাঠ করছেন। বাবু আস্তে আস্তে ডাকলো, রাজা, এই রাজা...

কি?

শুনতে পাচ্ছিস?

হুঁ!

চল বাইরে গিয়ে দেখি।

তোর ভয় করছে না?

না! বাবু বিছানার ওপর উঠে বসলো। মশারি তুলে বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেলো ছাদের দরজার দিকে। সাবধানে খিলটা খুললো, যাতে একটুও শব্দ না হয়। মোমার ঘুম ভেঙে গেলে আর দেখতে হবে না! হৈচৈ লাগিয়ে দেবে। রাজাও বাবুর পেছনে পেছনে ছাদে এসে দাঁড়ালো। পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে গেলো উত্তর দিকের রেলিং-এর দিকে। ওখান থেকে ছাদটা পরিষ্কার দেখা যায়। ভয় করছে ওদের দুজনেরই। ব্রহ্মদৈত্য নাকি? হরিদার বর্ণনার কথা মনে পড়লো। লম্বা চওড়া চেহারা, ফর্সা রং, গলায় ধপধপে পৈতে, পায় খড়ম। খড়মের শব্দ নাকি অনেকেই শুনেছে। ওরাও এখন শুনছে। সত্যিই কি ব্রহ্মদৈত্য? কিন্তু আজ তো অমাবস্যা নয়। পশ্চিমাকাশে এক ফালি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে যে! তাহলে? ভয়-ভয় ভাবটা ঝেড়ে ফেলে ওরা গিয়ে রেলিং-এর ধারে দাঁড়ালো।

চোখের সামনে বিশাল দালান। মধ্যেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো-আঁধারে সামনের দিকটার খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। বাবু আর রাজার মনে হলো কেউ যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাজার গায় কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তাহলে তো মিথ্যে নয়। ও তো দেখতে পাচ্ছে লম্বা চওড়া চেহারার একটা লোকের আদল—খড়ম পায় দালানের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাজার সমস্ত শরীরটার মধ্যে তোলপাড় হয়ে উঠলো। হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। ভয় ভয় ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলছে রাজাকে। ঠিক তক্ষুণি বাবুর গলা রাজার কানে এলো, ভয় পাসনে বাবু। খেয়াল করলে বুঝতে পারবি খড়মের শব্দটা দালান থেকে আসছে না। মন্ত্রপাঠও হচ্ছে না। খড়মের শব্দটা আমাদের কাছাকাছি কোথা থেকে আসছে।

ওরে বাবা রে! ব্রহ্মদত্যি এগিয়ে আসছে। এবার আমাদের ধরবে।

রাজা আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না। কোনো রকমে ছুটে ঘরে ঢুকে গিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো মিউ, মোমা আর বুয়ার। হৈচৈ শুরু হয়ে গেলো ঘরের মধ্যে। খড়মের শব্দটা তখনো শোনা যাচ্ছে। মোমা ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। বাবু

এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের দরজায়। মিউকে ডেকে চাপা গলায় বললো, কিকিকে নিয়ে আয় তো!

কিকিকে ডাকতেই সে এসে বসলো মিউ-এর কাঁধে। দরজার কাছে আসতেই বাবু বললো, মিউ কিকিকে বল, দালানে উড়ে গিয়ে লোকটাকে অ্যাটাক করতে, রাজা টর্চটা দে...

রাজা টর্চটা এনে বাবুর হাতে দিয়েই নিজের বিছানায় গিয়ে বসলো। বাবু আর মিউ এগিয়ে গেলো রেলিং-এর দিকে। কিকি ততোক্ষণে উড়ে গেছে দালানে। বাবু টর্চের জোরালো আলো ফেললো দালানে, কিকিও সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার মুখের ওপর।

ওরে বাবা রে... মরে গেছি রে।

চাপা চিৎকার ভেসে এলো দালান থেকে। তারপরই ঠকাস ঠকাস করে শব্দ। আর কারো ছুটে যাওয়ার আওয়াজ। বাবু বললো, পা থেকে খড়মটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লোকটা ছুটে পালালো...

এই তাহলে হরিদার ব্রহ্মদত্যি!

মিউ-এর কথা শুনে বাবু হাসলো। বললো, ঘরে চল। বাইরে বেশিক্ষণ থাকা এখন বোধহয় উচিত নয়।

ঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মিউ জিজ্ঞেস করলো, কেন উচিত নয়?

ওরা বুঝে গেছে ওদের কারসাজি আমরা ধরে ফেলেছি।

কিকি ততোক্ষণে ফিরে এসে আলমারির মাথায় বসে পড়েছে। রাজা, মোমা আর বুয়া ঘরের মধ্যে বসেছিলো। ওদের চোখেমুখে আতঙ্ক। মোমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা ব্রহ্মদৈত্য দেখলে?

ব্রহ্মদৈত্য না মুণ্ডু। সব দুষ্টু লোকের ব্যাপার। লোককে ভয় দেখাবার কারসাজি।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা হাসির শব্দে ওরা চমকে উঠলো। ভয়ের চোটে মোমা জড়িয়ে ধরেছে বুয়াকে। পরমুহূর্তে খ্যানখেনে গলার স্বর ভেসে এল—

তোঁরা নিজেদের বঁড় চাঁলাক ভাঁবছিস নাঁ? ভাঁলো চাঁস তোঁ পাঁলা। নঁইলে এঁক এঁকজঁনকে ধঁরে চিঁবিয়ে খাঁবো...

বুয়াকে জড়িয়ে ধরে মোমা ঠকঠক করে কাঁপছে। আর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছে। মিউ তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর চোখেমুখে জলের ঝাপট দিলো। একটু ধাতস্থ হয়ে মোমা কেঁদে ফেললো। বললো, আমায় কাল তোরা বাসে তুলে দিস। আমি চলে যাবো। এই ভূতের বাড়িতে আর থাকবো না।

বাবু বললো, ঠিক আছে। কাল সকালেই তুই ফিরে যাস। যাবার আগে তোকে একটা জিনিস দেখাবো। মনে করে সেটা দেখে যাস। এবার তুই ঘুমো। ভূত আজ রাত্তিরে আর আসবে না।

ঠিক বলছো বাবুদাদা?

হ্যাঁ! তুই নিশ্চিন্তে ঘুমো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর বাবু আর মিউ তন্নতন্ন করে ঘরটা খুঁজতে শুরু করলো। রাত্তিরেই মিউকে বাবু চুপিচুপি কথাটা বলে রেখেছিলো। বাবু বলেছিলো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘরের মধ্যে কোথাও একটা ছোট্ট এমপ্লিফায়ার লুকোনো আছে।

মোমা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি এতো খুঁজছো? আজ তো কলকাতায় যাবো। জিনিসপত্তর গুছোবে না?

মোমার চোখে-মুখে আতঙ্কের ভাবটা তখনো কাটেনি। ও আর একমুহূর্তও এই বাড়িতে থাকতে রাজী নয়। বাবু ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। বললো, কি খুঁজছি শুনবি?

কি?

তোর ভূতের ভয়টা যাতে একদম কেটে যায় তার ব্যবস্থা করছি। জিনিসটা যদি খুঁজে পাই

তাহলে বুঝতে পারবি, পুরো ব্যাপারটাই সাজানো।

মোমা আর কিছু বললো না। চুপ করে গেলো। মিউ আলমারির মাথায় উঠে ঘরের মধ্যে থেকে ঘুলঘুলিগুলো দেখছে। সবগুলোর মধ্যেই পায়রার বাসা। কিন্তু একটার মধ্যে ছোট্ট একটা কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে। কি হতে পারে? বাবুকে ডাকলো মিউ, বাবুদাদা, এটা কি দ্যাখো তো!

বাবু এসে ঘড়াঞ্চির ওপর উঠে ভালো করে দেখে বললো, যা ভেবেছি। এইটাই তো এমপ্লিফায়ার। রেডিও-টিভির মতো ছোট্ট। মোমা দেখবি তো ওপরে উঠে আয়। তোর ভূতের গলা টের পাবি। কিকি কাল রাত্তিরে গিয়ে ব্রহ্মদৈত্যর মুখে আঁচড়ে দিয়ে এসেছে। এখনো পুজোর দালানে গেলে খড়ম জোড়া খুঁজে পাবি।

কী বলছো তুমি—ভূত নয়?

মোটেই না। তুই নিজে দেখে যা। ছাদে চল, তোকে তারটাও দেখাচ্ছি। তারটা কেটে দিলে তোর ভূতের গলা আর শুনতে পাবি না। আমি অবশ্য কাটতে চাই না। ভূত আরো কি বলে শুনতে চাই। তোর যদি বেশি ভয় করে তাহলে কেটে দেবো।

সত্যি বলছো ভূত নয়?

মোমার বিশ্বাস হয় না। বাবু নিচে নেমে এসে বললো, যা তুই ওপরে উঠে এমপ্লিফায়ারটা দেখে আয়।

মোমার মুখ থেকে ভয়-ভয় ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যায়। বলে, ওরা আমাদের ভূতের ভয় দেখাচ্ছে কেন? ওরা কারা?

সেইটাই তো জানতে চাই। এর মধ্যে নির্ঘাৎ কোনো গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। এর পেছনে যারাই থাক তারা চায় না আমরা এখানে থাকি। কিন্তু তুই যা লাগিয়েছিস তাতে দেখছি সব ফেলেটেলে ভূতের ভয়ে আমাদের কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

এতোক্ষণে মোমার মুখে হাসি ফুটলো। বললো, না, না, আর আমি ভয় পাবো না। এভাবে আমাদের বোকা বানানো যাবে না, কি বল মিউ? আমি কলকাতায় ফিরে যাবার কথা আর বলবো না।

আর ভয় পাবি না তো?

না!

হরিদা এসে হাজির হলো। বললো, কি হলো তোমরা নিচে নামছো না যে! হরেন এসে বসে আছে সেই কখন থেকে।

হরেন কে হরিদা?

ও, তোমরা তো জানো না। শঙ্করীদিদির বাবা। ওর নৌকো আছে। নৌকোয় চড়বে বলেছিলে তাই ওকে খবর দিয়েছিলাম।

কি মজা! ওরা হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর সক্কলে দুমদাম করে নেমে এলো নিচে। হরেন বসেছিলো রান্নাঘরের বারান্দায়। চা খাচ্ছিলো। বলিষ্ঠ চেহারা। কুচকুচে কালো গায়ের রং। বাবু বললো, হরেনদাদা, আমাদের এক্ষুণি নৌকোয় চড়াবে?

তা চড়াতি পারি। ভাটা পড়েছে। ওদিকি গেলি টান পড়বে না।

তাহলে চলো না!

বসো, বসো! আগে খেয়ে নাও।

হরিদা ওদের হাতে পরোটা বেগুনভাজা আর সন্দেশের প্লেট তুলে দিলো। আর দিলো এক গ্লাস করে দুধ! হরেনকেও দিলো।

দুধ খাবো না হরিদা।

হরিদা কথাটা কানেই তুললো না। নিজের কাজ করতে লাগলো। ওরা বুঝলো আপত্তি করে কোনো লাভ হবে না।

খেয়েদেয়ে ওরা নদীর ধারে এলো। সবে ভাটা লেগেছে। জল বেশি নিচে নামেনি। তাই নৌকোয় চড়তে ওদের খুব একটা কাদা মাখতে হলো না। ওরা নদীতে নেমে চটপট নৌকোয় উঠে পা ধুয়ে নিলো। হরেন নৌকো ছেড়ে দিলো। নৌকো এগিয়ে চললো শ্মশানঘাট পেরিয়ে হাসনাবাদের কাটা খালের দিকে।

বাবু বললো, হরেনদাদা, হাসনাবাদে যাওয়া যায় না?

কেন যাবে না! যাবা?

চলো না, ক'টা জিনিস কিনবো।

কাটাখালের মুখে এসে ডানদিকে ঘুরে ওদের নৌকো চললো হাসনাবাদের দিকে। এখন আর কেউ একে কাটা খাল বলবে না। মস্ত চওড়া নদী হয়ে গেছে এককালের খালটা। লোকে এখন নদীই বলে। নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি করে সুন্দরবন পর্যন্ত রেললাইন টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে। দেখতে দেখতে বাজার পেরিয়ে ওরা এসে গেলো হাসনাবাদের ঘাটে। হরেন বললো, বেশি দেরি করো না। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।

থানা যাবার শর্টকাট পথটা ওরা চিনতো। মাছের বাজারের পাশ দিয়ে এসে, মার্টিন কোম্পানির পুরোনো স্টেশনের জায়গাটা পেছনে রেখে ওরা থানায় চলে এলো। বড়বাবু অফিসেই ছিলেন। জঙ্গল রহস্যের সুবাদে ওদের চিনতেন। একমুখ হেসে ওদের অভ্যর্থনা জানালেন। উনি ভেবেছিলেন, ওরা বোধহয় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বললেন, কবে এলে? কি খাবে বলো?

বাবু বললো, খাবার সময় নেই। আমাদের এক্ষুণি নৌকোয় ফিরতে হবে। ভয় হচ্ছে আমাদের ওপর কেউ নজর রাখছে কিনা!

কেন, কি হয়েছে?

বাবু বিস্তারিতভাবে সব কথা বলে বললো, আমার মনে হচ্ছে এর পেছনে একটা বিরাট চক্র কাজ করছে। আমাদের বাড়িতেই সম্ভবত ঘাঁটি বানিয়েছে। পাতালঘরে কিনা বলতে পারবো না। তবে পাতালঘরে যে ওরা নিয়মিত যায় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

বড়বাবুকে ভীষণ চিন্তিত দেখালো। বললেন, তোমাদের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করছি। লালবাজারে কমলবাবুর সঙ্গেও কথা বলবো। তোমরা সাবধানে থেকো। একটা ব্যাপার তো পরিষ্কার, ওরা চায় না তোমরা ওখানে থাকো। কিন্তু কেন? বোম্বাই আর কলকাতার বিস্ফোরণের পর খুব কড়াকড়ি চলছে। স্মাগলিংও একটু কমেছে। তাই ভাবছি, ব্যাপারটা কি হতে পারে!

বাবু বললো, আমরা উঠে পড়ছি। আর দেরি করা সংগত হবে না। তবে আমার খালি মনে হচ্ছে কোনো অদৃশ্য চোখ আমাদের ওপর নজর রাখছে। আমরা যখন নৌকোয় ছিলাম তখনো এ কথা মনে হয়েছিলো। এখনো হচ্ছে।

স্ট্রেঞ্জ...বড়বাবু একটু অবাক হয়েই কথাটা বললেন। অন্য কেউ এরকম কথা বললে হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এদের তিনি চেনেন। আজেবাজে কথা বলার ছেলেমেয়ে এরা নয়। তার ওপর কমলবাবুর রিলেটিভ এরা...

ওরা উঠে পড়লো। ঘাটে ফেরার পথে খানিকটা ফল আর মিষ্টি কিনলো। যাতে ওরা কোথায় গিয়েছিলো তাই নিয়ে কেউ জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে।

হাসনাবাদের ঘাট থেকে নিয়মিত লঞ্চ ছাড়ে। সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় যায়। গোসবাতেও যায়। তাই জেটি করা আছে। ওদের দেখে হরেন জেটিতে নৌকোটা লাগালো। ওরা এক এক করে নৌকোয় গিয়ে উঠলো। ওদের হাতের ফল-মিষ্টি দেখে হরেন বললো, অনেক কিছু কিনেছো দেখছি!

এই নাও তোমার জন্যেও আছে।

মিউ খানিকটা ফল আর মিষ্টি এগিয়ে দিলো। তখনো ভাটা চলছে। স্রোতের উল্টো দিকে চলতে হচ্ছে হরেনকে। তাই নৌকো চলছে খুব আস্তে আস্তে। হরেন বললো, ওপাশটায় গিয়ে পাল তুলে দেবো। তখন একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে।

জোয়ার আসার কতো দেরি হরেনদাদা? রাজা জিজ্ঞেস করলো।

অনেক দেরি ভাই। চিন্তা করার কিছু নেই। বাতাস আছে তো, একটু পরেই পাল তুলে দেবো। তখন দেখবে এই নৌকো কেমন ছোটে। তা তোমরা কদিন আছো?

ফিরে যাবার সময় হয়ে এলো হরেনদাদা। আর বড়জোর দু-একদিন। স্কুল খুললেই পরীক্ষা তো! না হলে আরো কিছুদিন থাকতাম। তার ওপর...

তার ওপর কি? হরেন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে।

রাত্তিরে বড্ড ভয় করছে। খড়মের শব্দ শুনছি। কান্নার আওয়াজ, হাসি, আরো কতো কী! কলকাতায় থেকে থেকে আমাদের সাহস কমে গেছে। তাই দু-একদিনের মধ্যেই আমরা ফিরে যাবো। ফেরার কথা জানিয়ে আজ তো বাড়িতে চিঠিও দিয়ে দিয়েছি।

ঠিকই করেছো! তোমাদের বাড়িটা ভালো নয়।

নৌকোর পাশাপাশি দুটো শুশুক যাচ্ছিলো। একবার ভেসে উঠছে, পরমুহূর্তে ডুব মারছে। বেশ লাগে ওদের খেলা। হাসনাবাদের পুরোনো বাজার পেছনে ফেলে ওদের নৌকোটা টাকীর দিকে এগিয়ে যায়। দূরে ইছামতী নদী দেখা যাচ্ছে। আরো অনেক দূরে বাংলাদেশের আবছা সীমা, গাছ-গাছালির রেখা। হরেন ততোক্ষণে পাল তুলে দিয়েছে। নৌকোটাও বাতাসের টানে হুহু করে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে গেলে মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা ঘোষবাবুর ঘাটে পৌঁছে যাবে। বেলা বাড়ছে। আর দেরি হলে হরিদা ভাববে।

মিউ বাবুদাদার কথায় একটু অবাক হয়েছে। হরেনদাদাকে কেন যে মিথ্যে কথা বললো বাবুদাদা কে জানে? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। ওরা তো সত্যি সত্যি দু-একদিনের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে না। মোমা ভয় পাচ্ছিলো। আজ সকালে ওকে সবকিছু দেখিয়ে বুঝিয়ে রাজী করানো হয়েছে। তবু বাবুদাদা বললো, দু-একদিনের মধ্যেই ওরা কলকাতায় ফিরে যাবে।

দেখতে দেখতে ওরা পৌঁছে গেলো ঘোষবাবুর ঘাটে। সেখান থেকে বাড়ি তো দু-এক মিনিটের পথ।

ফল আর মিষ্টি পেয়ে হরিদা খুব খুশি হয়ে বললো, যাক বাবা—আজ বিকেলের খাবারের চিন্তা গেলো।

ওপরের ঘরে গিয়ে বাবু মিউকে ডেকে বললো, তুই কুকুরগুলোকে দিয়ে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে পারবি?

কোথায়?

পাতালঘরের জানলার পেছনে। ওরা পাঁচিলের ওপারেও থাকতে পারে। কেউ এলেই যেন ডাকতে শুরু করে।

তারপর মোমার দিকে তাকিয়ে বললো, মোমা, আজো যদি ভূতে কথা বলে তাহলে কি তুই ভয় পাবি? ঠিক করে বল ভয় পেলে তারটা কেটে দেবো। না হলে ভূতের গলা টেপ করে নেবো। কি বলে শুনতে চাই।

তারটা পেয়েছো তো?

হ্যাঁ। ঘুলঘুলির তলা দিয়ে সরু তারটা

এমনভাবে আছে যে চট করে দেখা যাবে না। আমার চোখকে অবশ্য ফাঁকি দিতে পারেনি।

ওদের চান-টান আগেই হয়ে গিয়েছিলো। হরিদা খেতে ডাকলো।

চার

রাত তখন কত কে জানে! কুকুরগুলো হঠাৎ বিশ্রীভাবে ডেকে উঠলো। বাবু আর মিউ তৈরি হয়েই ছিলো। ওরা ছাদে গিয়ে পুব দিকের রেলিং ধরে দাঁড়ালো। ওদিকটায় গাছটাছ বেশি থাকায় অন্ধকারটা জমাট বেঁধে আছে। চোখ বেশিদূর যায় না। ওরা নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কুকুরগুলো আর ডাকছে না। কিন্তু পাতালে যাবার সিঁড়ির ঘর থেকে একটা হাল্কা আলোর রেখা জানলার ফাঁক গলে নিচের বারান্দায় এসে পড়েছে। বাবু আর মিউ আলোটাই লক্ষ্য করছিলো। বাবু চাপা গলায় বললো, ঘরে লোক আছে বুঝতে পারছিস?

আলো জ্বলছে যখন নিশ্চয়ই লোক আছে। আমরা এখন কি করবো বাবুদাদা? মিউ জিজ্ঞেস করলো।

মিউ-এর কথার উত্তর দিতে যেতেই বাবুর মনে হলো দুটো সবল হাত ওকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মিউ-এর দিকে তাকাতেই দেখলো তারও এক অবস্থা। ওরা চিৎকার করার সময়ই পেলো না। ওদের মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে একটা লোক চাপা গলায় বলে উঠলো, বড় বাড় বেড়েছে না, থানায় যাওয়া হয়েছিলো! যা এদের নিয়ে যা। ঘরে যে তিনটে ছেলেমেয়ে ঘুমোচ্ছে তাদেরও নিয়ে আয়। সব কটাকে শেষ করে দেবো।

লোক দুটো ওদের সিঁড়ি অবধি টেনে আনলো। তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে নিচে নেমে এসে ঢুকলো তালাবন্ধ ঘরটাতে। হরিদার বন্ধ-করা তালা বন্ধই রইলো, ওদের সে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো জানলা দিয়ে। পাতালঘরে যাবার সিঁড়ির ঢেকে রাখা সিমেন্টের স্ল্যাবটা সরানোই ছিলো। ওদের নিয়ে লোকটা সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেলো। ওরা চোখ গোল গোল করে সব দেখছিলো। এতোকাল ওরা শুনে এসেছে পাতালঘরে শুধু সাপ আর সাপ। সিঁড়িতে পা দেবার উপায় নেই। ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসবে। কিন্তু কোথায় কি! নিচে তো দিব্যি আলো-টালো আছে। তা ছাড়া পাতালে এতোগুলো যে ঘর আছে তাও ওরা জানতো না। বাবু সবকিছু লক্ষ্য করলেও ভাবছিলো অন্য কথা। ওরা যে থানায় গিয়েছিলো লোকটা তা জানলো কি করে? ওর যে মনে হয়েছিলো, একটা অদৃশ্য চোখ সবসময় ওদের ওপর নজর রাখছে এ কথাটা তাহলে ঠিক!

একটু পরে মোমা, বুয়া আর রাজাকেও ওরা ধরে আনলো। বাবু-মিউ-এর মতো ওদেরও হাত-পা বাঁধা। তবে মুখে রুমাল গোঁজা নেই।

খানিক পরে একটা লোক এসে ঘরে ঢুকলো। মুখ অদ্ভুত। বাবু বুঝলো মুখোস-পরা। বাবু আর মিউ-এর মুখ থেকে রুমাল দুটো টেনে বের করে নিলো। বাবু দেখলো লোকটার হাতে একটা উল্কি। খুব চেনা মনে হলো। কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায়? কিছুতেই মনে করতে পারলো না বাবু।

লোকটা ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠলো, তোমাদের কৌতূহল বড় বেশি। পাতালঘর দেখতে চেয়েছিলে? এবার সারাজীবন ধরে দ্যাখো। কেউ তোমাদের বাঁচাতে আসবে না। একটু থেমে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, থানায় গিয়েছিলে কেন?

লোকটার গলার স্বর বাবুর পরিচিত মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছে মনে করতে পারছে না অবশ্য। ওদের চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা

ধমকে উঠলো, চুপ করে আছো কেন, বলো থানায় কেন গিয়েছিলে?

ফোন করার জন্যে।

থানা থেকে ফোন করতে? কোথায়? থানার বড়বাবুকে চেনো?

বাড়িতে ফোন করতে। কাল না হয় পরশু আমরা কলকাতায় ফিরবো সেই কথা জানাতে।

আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলে না? বড়বাবুকে চেনো?

হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই পরিচয় আছে।

মুখোস-পরা সত্ত্বেও বাবুর মনে হলো লোকটা অন্যদের সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। আর কথা বাড়ালো না লোকটা। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঘরের দরজা বন্ধ করলো। ওদের পায়ের শব্দে মনে হলো, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওরা একটা ঘরে ঢুকলো।

বাবু চাপা গলায় বললো, লোকটাকে চিনতে পেরেছিস মিউ?

খুব চেনা গলা—কিন্তু কে?

হাতের উল্কিটা লক্ষ্য করিসনি?

তাই তো...তাই তো...আজ সকালেই দেখেছি।

হ্যাঁ, হরেনদাদা! আজ সকালে নৌকো করে আমাদের হাসনাবাদে নিয়ে গিয়েছিলো। হাতের উল্কিটা তখন দেখেছিলাম। গলাটাও চেনা হয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু হরেনদা—এখানে?

সেইটাই তো বিস্ময়। শুনেছিলাম ওর ছেলে শম্ভু ওপার থেকে জিনিস-টিনিস আনতো।

তার মানে স্মাগলিং-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো।

হ্যাঁ! কিন্তু হরেনদাদাদের ব্যাপারটা কি? লম্বা লোকটাকে লক্ষ্য করেছিস? ওর মুখে টাটকা ক্ষত, অনেক জায়গায় কেটে-কুটে গেছে।

দেখেছি।

মনে হচ্ছে ও-ই ব্রহ্মদৈত্য সাজতো। কিকি কাল ওকে ভালোমতো শিক্ষা দিয়েছে।

আচ্ছা কিকি কোথায়? মিউ উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

মনে হচ্ছে ওপরেই আছে।

ভালোই হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস। লোকগুলোর কাছে লাইট মেশিনগান রয়েছে। প্রায় সকলেই সশস্ত্র!

অনেকগুলো পায়ের এগিয়ে আসার শব্দে ওরা চুপ করে গেলো। মুখোস-পরা লোকগুলো এসে ঘরে ঢুকলো। ওদের ধারণা ঠিক হলে হরেনই ওদের লিডার। সে বললো, আমরা বেরুচ্ছি। তোরা দুজন পাহারায় থাকবি। এদের বাঁধন খুলে দে। এখান থেকে পালাবার কোনো উপায় নেই। বেগড়বাই করলে একেবারে ফিনিস করে দিবি। দুপুরে খেতে দিস।

আমাদের এখানে আনলেন কেন?

তোমাদের কৌতূহল যে বড্ড বেশি। পাতালঘর দেখতে চেয়েছিলে না—তাই দেখো। শম্ভু, ওরা যদি ঘুরে দেখে দেখতে দিস। জীবনে তো আর সূর্যের মুখ দেখবে না। এখানে না খেয়ে না হয় সাপের কামড়ে মরবে। পাতালঘর দেখার শখ ঘুচে যাবে—হাঃ হাঃ হাঃ...

ওরা চলে গেলো। বাবুরা বুঝলো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ওরা সিঁড়ির স্ল্যাব বন্ধ করে জানলা দিয়ে বাইরে চলে যাবে।

হঠাৎ মিউ বললো, শম্ভুদাদা, তুমি শঙ্করীদিদির ভাই না?

চুপ, একটাও কথা নয়। শম্ভু ওপাশে সরে গিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে বসলো।

বাবু বললো, আমাদের বাঁধনটা খুলে দাও না। একটু হেঁটেচলে বেড়াই।

শম্ভু কথা বললো না। এগিয়ে এসে এক এক করে ওদের বাঁধন খুলে দিলো। ভয়ে মোমার মুখ চোখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বললো, পরশু থেকে তোদের বলছি, চল ফিরে যাই। আমার কথা শুনলি নে। এবার এই পাতালঘরে মরে পড়ে থাকতে হবে আমাদের!

বাবু উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝেড়ে বললো, শম্ভুদাদা, আমরা একটু ঘুরেফিরে বেড়াতে পারি?

আমায় শম্ভুদাদা বলবে না। যা ইচ্ছে করো। শম্ভু কথা বাড়ালো না। অন্য লোকটা সিঁড়ির মুখে বসেছিলো। শম্ভু গিয়ে তার পাশে বসলো। বাবুরাও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বাবু চাপা গলায় বললো, ভয় পাসনে। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। কিকি বাইরে আছে, ও আমাদের খুঁজে বের করবেই। কটা বেজেছে রে?

মিউ-এর হাতে ঘড়ি ছিলো। বললো, পাঁচটা বাজে। সবে ভোর হচ্ছে।

এখানে এতো আলো জ্বলছে কি করে! আমাদের বাড়িতে তো ইলেকট্রিক নেই। অথচ এখানে।...

মনে হচ্ছে জেনারেটার আছে। রাজা বললো।

তাই হবে।

ওরা ঘুরে ঘুরে পাতালঘরগুলো দেখছিলো। বিশাল জায়গা। ঠাকুরদালানের পুরো চকটার নিচে তো এই পাতালঘর। কতকগুলো খুপরি খুপরি ঘর, অন্যগুলো বড়। রান্নাঘর, বাথরুম সব আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? এখানে হচ্ছে কি? ওরা বুঝতে পারে না। ঘুরতে ঘুরতে একটা কোণের দিকে এসে ওরা থমকে দাঁড়ালো। বিশাল একটা ঘর ঠাসা কাঠের বাক্সে। বাক্সগুলোর গায় সাংকেতিক চিহ্ন আর কিছু লেখা। বাবু এগিয়ে গেলো। তারপরই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, সর্বনাশ...

কি বাবুদাদা, কি হয়েছে? মিউ এগিয়ে এলো।

পড়ে দ্যাখ...! বাবু আঙুল তুলে দেখালো।

মিউ-এর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেলো। বললো, এ কী, এ যে আর ডি এক্স!

শুধু তাই নয়, আরো কতো এক্সপ্লোসিভ আছে দ্যাখ। বম্বে ব্লাস্টের চেয়ে হাজার গুণ মারাত্মক আরও বেশি ক্ষতি এ দিয়ে করা যাবে। বৌবাজারের বিস্ফোরণ তো এর কাছে কিছু না। কিন্তু এগুলো এখানে কেন? নিশ্চয়ই এদের একটা বিরাট ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা আছে।

কি হবে বাবুদাদা? মোমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো।

মিউ, ওদের লিডারের সঙ্গে ক'জন বাইরে গেছে বলতে পারিস?

লিডার মানে যাকে আমরা হরেনদাদা ভাবছি সে তো?

হ্যাঁ!

চারজন। লিডারকে ধরলে অবশ্য পাঁচজন।

পাঁচজন আর এখানে দুজন আছে। মানে মোট সাতজন।

কি করবে বাবুদাদা? আমরাই বা এখান থেকে বেরুবো কি করে?

বুঝতে পারছিনে কি করবো। কিছু একটা করতেই হবে। ওদের হাতে অস্ত্র আছে। আমরা ওদের সঙ্গে কিছুতেই লড়তে পারবো না। অথচ সারা দেশ জুড়ে একটা ধ্বংসলীলা ঘটানোর জন্যে যে ওরা তৈরি হচ্ছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। না হলে এতো আর. ডি. এক্স-সহ এক্সপ্লোসিভ ওরা যোগাড় করে আনতো না। এখনই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখন যদি কমলদা এখানে থাকতো। কমলদা তো জানেও না যে আমরা এখানে এসেছি। কমলদাকে যে খবর দেবো সে উপায়ও এখন আর নেই। এক যদি থানার ও. সি কমলদার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তো আলাদা।

মিউ বললো, এখানে তো বেশি কিছু রিস্কও নেওয়া যাবে না। গোলাগুলি চললে আর দেখতে হবে না। বিস্ফোরণ ঘটলে গোটা

গ্রামটাই উড়ে যাবে।

রাজা এতোক্ষণ চুপচাপ ছিলো। এবার বললো, যে লোকদুটো আমাদের পাহারায় আছে আগে চল ওদের কব্জা করি। তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

যে ঘরটায় ওদের প্রথম রাখা হয়েছিলো সেই ঘরে ওরা ফিরে এলো। সিঁড়ি ঘরটার খুব কাছেই। ঘরে ঢুকে ওরা দেখলো, মেশিনগান দুটো মাটিতে নামিয়ে রেখে ওরা ঘুমোচ্ছে। বাবু আর মিউ দেরি করলো না। পা টিপে টিপে ওদের কাছে গিয়ে অস্ত্রদুটো তুলে এনে ঘরে এক কোণে লুকিয়ে রাখলো। তারপর খানিকটা দড়ি আর ন্যাকড়া যোগাড় করে ওরা ঘুমন্ত লোকদুটোর কাছে এগিয়ে গেলো। বাবু আর মিউ ঝাঁপিয়ে পড়লো একজনের ওপর, রাজা, মোমা আর বুয়া পড়লো অন্য লোকটার ওপর। কি হচ্ছে বোঝার আগেই বাবু আর রাজার জোরালো ঘুঁষি গিয়ে পড়তে লাগলো ওদের মুখে। একটা লোক উঠে দাঁড়াতে গেলেই বাবু হাঁটু দিয়ে তার তলপেটে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলো। মরে গেছি বলে তলপেট চেপে লোকটা বসে পড়তেই মিউ দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে ফেললো।

অন্য লোকটা তখন লড়ছে। ও প্রথমে অস্ত্র খুঁজেছিলো। না পেয়ে হাত আর পা চালাতে শুরু করলো। কিন্তু ঐ লোকটাকে কব্জা করার পর বাবু আর মিউও গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিলো। পাঁচটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে লড়াই যে মোটেই সহজ নয়, লোকটা তা বুঝতে পারলেও কিন্তু হাল ছাড়লো না। বাবু লাফিয়ে পড়ে ওর মুখে ঘুঁষি মারলো, দুসুম...লোকটা পাল্টা ঘুঁষি চালাতেই রাজা নিচু হয়ে গিয়ে ওর পেটে টুঁ মারলো। সঙ্গে সঙ্গে মিউ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর পা দুটো টেনে ধরতেই লোকটা দুম করে মেঝেতে পড়ে গেলো। মোমা আর বুয়া সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটো পা বেঁধে ফেললো। হাত দুটোও পিঠের দিকে টেনে এনে বাঁধা হলো। অন্য লোকটাকেও একইভাবে বেঁধে ওরা দুজনের মুখে অনেকটা করে ন্যাকড়া গুঁজে দিলো। তারপর ধরাধরি করে একজন একজন করে নিয়ে গিয়ে এক্সপ্লোসিভের বাক্সগুলোর পেছনে লোক দুটোকে এমনভাবে রেখে এলো যাতে চট করে কারো নজরে না পড়ে।

ওরা আর দেরি করলো না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে স্ল্যাবটা সরানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু আসল কায়দাটা ওরা জানে না। তাই খুলতে পারলো না। ভেবেছিলো পাঁচজনে মিলে ঠেলাঠেলি করলে খুলে যাবে। তা হলো না। মুখ শুকিয়ে ওরা এক এক করে নিচে নেমে এলো। এবার ওরা কি করবে? এখান থেকে বেরুতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ঘরে ঢুকে বাবু বললো, হঠাৎ যদি লোকগুলো এখন এসে যায় তাহলে কি হবে?

আমরা ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকবো। মিউ বললো।

তা তো হলো, কিন্তু ওরা এসেই লোক দুটোকে খোঁজাখুঁজি করবে। না পেলে তো আমাদেরই চেপে ধরবে।

আমরা কি জানি! আমরা তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমোবার আগে দেখেছিলাম লোক দুটো সিঁড়ির ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছে। এই কথাটাই কিন্তু বলতে হবে। আমরা সকলেই এক কথা বলবো। সাবধান, আমাদের কথায় ওদের মনে যেন কোনোরকম সন্দেহ না জাগে। ওরা যেন বিশ্বাস করে লোক দুটো স্ল্যাব খুলে এখান থেকে পালিয়ে গেছে।

কিন্তু তারপর কি হবে? আমরা এখান থেকে বেরুবো কি করে? আমরা কি এখান থেকে কোনোদিন বেরুতে পারবো না? মোমার গলায় হতাশার সুর।

বাবু বললো, অতো ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? দ্যাখ না কি হয়।

কি করা যায় বল তো বাবু! রাজার জিজ্ঞাসা।

আমরা যদি কোনোভাবে সিঁড়ির মুখটা খুলতে পারতাম! ঐ কায়দাটাই শেখার দরকার সবার আগে। কিন্তু এখন আমি ভাবছি লোক দুটোকে না দেখলে ওদের কি রিঅ্যাকশান হবে! আমাদের পক্ষে সেটা ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। এখন চুপচাপ থাক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

রাত্তিরে ওদের ঘুম হয়নি। শরীর আর মনের ওপর দিয়ে ধকলও গেছে খুব। চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় সত্যিই ওরা ঘুমিয়ে পড়লো। পাতালঘরে নেমে এলো নিস্তব্ধতা। শুধু জেনারেটার চলার খুব চাপা একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। খানিক পরে ওরা যখন ঘুমিয়ে কাদা, সর্দারের সঙ্গে নেমে এলো তিনটে লোক। একজনের হাতে অনেক খাবার-দাবার। আর একজনের হাতে ফ্লাস্ক।

পাহারাদার দুটোকে না দেখে ওরা অবাক হলো। এদের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো পাঁচটা ছেলেমেয়েই ঘুমোচ্ছে।

পাঁচ

সকালে ওদের ঘরে না দেখে হরিদা ভেবেছিলো ওরা নদীর ধারে গেছে। কিন্তু বেলা বাড়ছে, ওরা ফিরলো না। দশটা বেজে গেলো তাও ফিরলো না। এতো দেরি তো ওরা করে না। অন্যদিন নদীর ধারে গেলে ওকে বলে যায়। আজ তো তাও যায়নি। সে তো উঠেছে অনেক ভোরে। তার আগেই কি ওরা নদীর ধারে গেছে! কিন্তু এখনো এলো না কেন? ছোটাছুটি শুরু করে দিলো হরিদা। নদীর ধারে গিয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই। হরেনকে ডাকতে গেলো। হরেন বাড়ি নেই। ওর নৌকোটা অবশ্য ঘাটে বাঁধা। হরিদা ভেবে পাচ্ছে না কি করবে, ভেবে পাচ্ছে না ছেলেমেয়েগুলো না বলে-কয়ে কোথায় গেলো।

বেলা গড়িয়ে দুপুর। কিকি উড়ে এসে বসলো হরিদার সামনে। বললো, ওদের ধরে নিয়ে গেছে।

কে?

দুষ্টু লোক।

কখন?

কাল রাত্তিরে। কিকি উড়ে গিয়ে একটা গাছে বসলো।

পাখিটা কথা বলে হরিদা তা জানতো। কিন্তু তাই বলে এইরকম পরিষ্কার কথা বলে তা ভাবতে পারেনি। ও বুঝতে পারছিলো না পাখির কথা বিশ্বাস করবে কি করবে না। কিন্তু বেলা বারোটা বেজে গেছে, এখনো ওরা ফেরেনি, হরিদা আর দেরি করলো না। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের ডেকে সব কথা বললো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ওদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো। একটা সাইকেল নিয়ে দুজনে গেলো হাসনাবাদে পুলিশে খবর দিতে।

খবরটা শুনেই ও.সি. ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—বিশেষ করে পাখির কথা শুনে। কিকিকে তো তিনি আগে থেকেই জানেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লালবাজারে ফোন করলেন। ভাগ্য ভালো কমলদা তখন লালবাজারেই ছিলেন। ও.সি. বাবুদের তাঁর কাছে আসা, তাঁকে ওরা যা যা বলেছিলো সেখান থেকে আরম্ভ করে আজ ভোরে ওদের বেপাত্তা হয়ে যাওয়া, কিকির কথা সবই খুলে বললেন।

কমলদা বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত সিরিয়াস। আমরা খবর পেয়েছি বর্ডারে কোথাও প্রচুর এক্সপ্লোসিভ এসেছে। এই ব্যাপারে আপনাকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিলো। আমার মনে হচ্ছে ওদের বেপাত্তা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে। আপনি এখন ওখানে চলে যান। সাবধান,

কোনো রিস্ক নেবেন না। প্লেন ড্রেসে আর্মড পুলিশ নিয়ে যান। আপনিও প্লেন ড্রেসে থাকবেন। ওরা যেন কোনোভাবে সন্দেহ না করে। আমি বম্ব স্কোয়াড আর কম্যান্ডো নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাচ্ছি। হেলিকপ্টারে যাবো। ল্যান্ড করবো বড় মাঠে। আমরাও কেউ ইউনিফর্মে থাকবো না। দেখবেন হেলিকপ্টার ল্যান্ড-করা নিয়ে যেন কোনো ঝামেলা না হয়।

ও.সি. ছেলে দুটিকে ফিরে যেতে বলে নিজে তৈরি হয়ে নিলেন। সঙ্গে নিলেন প্লেন ড্রেসের চারজন পুলিশ। পেট্রল পাম্পের মালিক হাবুবাবুর মারুতিটা নিয়ে চললেন টাকী ঘোষ পাড়ায়। যাবার আগে বি.এস.এফ-এর অফিসারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে রিকোয়েস্ট করলেন, লঞ্চ নিয়ে তখনই টাকীর ঘাটে যেতে। সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটাও জানিয়ে দিলেন তাঁকে।

পুলিশ মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এতো গোপনে হলো যে কেউ বিন্দুবিসর্গও টের পেলো না। ও.সি. টাকী ফাঁড়িতে এসে হেলিকপ্টার আসার খবর দিয়ে বড় মাঠে পুলিশ পোস্টিং করে সোজা চলে গেলেন দক্ষিণবাড়ির দিককার ঘাটে। দেখলেন বি.এস.এফ-এর লঞ্চ এসে গেছে। এবার নিশ্চিন্ত মনে তিনি চললেন ঘোষ পাড়ায়। তাঁকে দেখে তখন কেউ ভাবতেও পারবে না যে তিনি থানার ও.সি.। মনে হবে একজন ট্যুরিস্ট। গাড়ি নিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন।

পাতালঘরে তখন বাবুরা কান পেতে শুনছে দুষ্টু লোকগুলোর কথা। হরেনের কথা এ ঘরে পরিষ্কার শোনা গেলো, আজ রাত্তিরে বড়কর্তা আসবে। হেলিকপ্টার নামবে চকে। এক্সপ্লোসিভ আর আর ডি এক্সের ক'টা বাক্স তুলে দিতে হবে। কলকাতায় নিয়ে যাবে ওগুলো। কলকাতার ইমপর্ট্যান্ট কয়েকটা জায়গা একই দিনে একই সময় উড়িয়ে দেবার প্ল্যান আছে। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে এনে মুশকিল হয়েছে। ওদের নিয়ে কি করবো বুঝতে পারছি না। এক কাজ করা যাক, দ্যাখ তো বড়কর্তাকে ধরা যায় কিনা।

এর পর খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে অন্য একটা গলা ভেসে এলো।

ধরতে পারছি নে তো সর্দার। তারটা ছিঁড়ে গেছে নাকি?... পেয়েছি... পেয়েছি... কথা বলো সর্দার।

স্যার, আজ রাত্তিরে... হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা থাকছে...আমরা দু-তিন মিনিটের মধ্যেই লোড করে দেবো।... একটা মুশকিল হয়েছে স্যার... পাঁচটা ছেলেমেয়ে এই বাড়িতে এসেছিলো, তাদের বড় বেশি কৌতূহল দেখে তাদের তুলে এনে পাতালে রেখেছি...কি করবো ওদের নিয়ে...ও কে স্যার... ওভার...

সর্দার স্যার কি বললেন?

কিসের?

ঐ ছেলেমেয়েগুলোর ব্যাপারে?

ফিনিশ করে দিতে বললেন।

কথাটা কানে যেতেই বাবুর বুক কেঁপে উঠলো। মুখ শুকিয়ে গেলো মিউ আর রাজার। মোমার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করলো। বুয়া কিছু বলতে যাচ্ছিলো। তাকে ইশারায় চুপ করিয়ে দিলো বাবু। তখনই ও ঘর থেকে হরেনের গলা ভেসে এলো, ওরা দুজন কোথায় গেলো বল তো! এতোক্ষণে তো ফিরে আসা উচিত। আমাদের আবার এক্ষুণি বেরুতে হবে। শোন তুই ওদের পাহারায় থাক। ঘুম থেকে উঠলে ওদের খেতে দিস। আর তো কোনোদিন খাবে না। দেখিস শেষবারের মতো ভালো করে যেন খেয়ে নেয়। চল আমরা যাই।

বাবুরা বসেছিলো। চটপট শুয়ে পড়ে ঘুমের ভান করলো। সর্দার এ ঘরে একবার উঁকি দিয়ে চারজনকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলো। অন্য লোকটা মেশিনগানটা কাঁধে নিয়ে পায়চারি করতে লাগলো। একটু পরেই বাবু, মিউ, রাজা আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসলো। মোমা আর বুয়াকেও ডাকলো ওরা। ওদের উঠতে দেখে লোকটা খাবারগুলো এনে ওদের সামনে রেখে বললো, খেয়ে নাও, পেট ভরে খেয়ে নাও।

আপনিও খান না! মিউ আস্তে আস্তে বললো।

বুয়া একটা পাতায় চারটে লুচি, তরকারি আর মিষ্টি সাজিয়ে লোকটাকে দিলো। লোকটা খাবার নিয়ে পাশের ঘরে যেতেই বাবু চাপা গলায় বললো, এটাকেও ধরতে হবে।

হঠাৎ কিকি এসে মিউ-এর কাঁধে বসলো। মিউ ওর গায় হাত বুলিয়ে দিতেই ও কিছু বলতে যাচ্ছিলো। বাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করার ইশারা করলো। কিকি এসব খুব বোঝে। বাবু বললো, লোকটা এখন খাচ্ছে, চল এই ফাঁকে ওকে অ্যাটাক করি। কিকি, তুই আগে গিয়ে ওর মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বি। বুয়া, তুই ওর মেশিনগানটা সরিয়ে নিবি।

ওরা একসঙ্গে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো। লোকটা তখন খাচ্ছিলো। ওদের দেখে বললো, খাওয়া হয়ে গেলো? এখানে কেন... আপনি খাচ্ছেন কিনা দেখতে...

মিউ-এর কথা শেষ হলো না, কিকি ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার মুখের ওপর। এঁটো হাত দিয়ে মুখটা আড়াল করতে চেষ্টা করলো লোকটা। বুয়া সেই ফাঁকে পেছন দিক থেকে মেশিনগানটা সরিয়ে নিলো। বাবু লাফিয়ে পড়ে লোকটার মুখে দুম করে ঘুঁষি মারলো।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে লোকটা উঠে দাঁড়াতেই মিউ নিচু হয়ে লোকটার দু পা দড়ি দিয়ে জড়িয়ে দিয়ে মোমার দিকে দড়ির একটা দিক ছুঁড়ে দিয়ে বললো, খুব জোরে টান। নিজেও দড়ির এ প্রান্ত ধরে টানতে লাগলো। আচমকা পায় টান পড়ায় লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। রাজা আর বাবু লোকটার হাত দুটো পেছনে টেনে এনে বেঁধে ফেললো। পা দুটোও শক্ত করে বাঁধা হলো। তারপর খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে লোকটার মুখে গুঁজে দিলো ওরা। কিকির নখের আঁচড়ে লোকটার মুখের অনেক জায়গায় কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। ওরা আর দেরি করলো না। লোকটাকে নিয়ে গিয়ে অন্য দুজনের কাছে শুইয়ে দিলো। তিনজনকে একটু দূরে দূরে শুইয়ে কয়েকটা বাক্স নামিয়ে একজনকে আর একজনের থেকে আড়াল করে দিলো, পাছে কাছাকাছি এসে ওরা কোনোভাবে নিজেদের মুক্ত করে বসে।

রইলো বাকী চার। লোকটাকে রেখে নিজেদের ঘরের দিকে আসতে আসতে বাবু নিজের মনে বললো।

চলো এবার খেয়ে নেওয়া যাক। বড্ড খিদে পেয়েছে।

ওরা এসে চটপট খেয়ে নিলো।

মিউ বললো, বাবুদাদা, জেনারেটারটা যেখানে চলছে চলো সেখানে যাই। জেনারেটারের ধোঁয়া কোথা দিয়ে বাইরে যাচ্ছে, সেটা দেখা দরকার। তাহলে হয়তো বাইরে বেরুবার একটা ক্লু পাওয়া যাবে।

মোমা বললো, যা করার তাড়াতাড়ি করো বাবুদাদা। ওরা আমাদের ফিনিশ করে দেবে বলেছে। আমার ভীষণ ভয় করছে।

কথা বলতে বলতে জেনারেটারের শব্দ ধরে ওরা জেনারেটার ঘরে এসে হাজির হলো। ঘরে বিশেষ ধোঁয়া নেই। তার মানে ধোঁয়াটা কোনোভাবে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথা দিয়ে? ওরা লক্ষ্য করেছিলো একটা চিমনি ওপরে উঠে গেছে। মিউ কিকিকে বললো, দ্যাখ তো ওখান দিয়ে তুই বাইরে যেতে পারিস কিনা। কিকি উড়ে গেলো। ওপরে উঠে চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিচে নেমে এলো। জানালো, বাইরে যাবার কোনো

উপায় নেই। তবে চিমনিটা মনে হচ্ছে বাইরে গেছে।

মিউ বললো, আমি একবার শুনেছিলাম পুবদিকে একটা ট্যানেল আছে। নদীর সাঁড়াসাঁড়ির বান এলে জল সেখান দিয়ে দেউড়িতে, চকে এসে ঢোকে। আমার মনে আছে, আমি একবার জল আসতে দেখেছিলাম। ঐখানে নাকি কি একটা স্কাই-লাইটের ব্যবস্থা আছে পাতালঘরে আলো ঢোকার জন্যে।

চল তো দেখি। বাবুর কথা শেষ হলো না, রাজা বলে উঠলো, পুব দিক বুঝবি কি করে?

কেন সিঁড়ির ডানদিকটা পুব আর এইদিকটা পশ্চিম হবে—এ তো সোজা অঙ্ক।

ওরা অন্যদিকে চললো। ডি.আর.এক্স আর এক্সপ্লোসিভের বাক্সগুলো যেখানে ছিলো সেদিকটা পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে গেলো। বেশ খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর মনে হলো, একটা জায়গা দিয়ে সামান্য আলোর ইশারা। অনেকটা উঁচু থেকে সামান্য একটু আলো আসছে। কিকি ওপরে উঠে গেলো। ওখান দিয়ে যে বাইরে যাবার পথ নেই সেটা ওরা জানতো। বাবু বললো, কোনোভাবে যদি জায়গাটা ভাঙা যেতো তাহলে হতো!

রাজা বললো, ওদের মেশিনগান এনে গুলি করে ভাঙা যায় না?

পাগল নাকি? এক্সপ্লোসিভে জায়গাটা ভর্তি। বাবু বললো।

কি করবে তাহলে? মিউ-এর জিজ্ঞাসা।

চল আমরা যেখানে ছিলাম সেই ঘরের দিকে যাওয়া যাক। যা করার এখন ভেবেচিন্তে করতে হবে। কটা বেজেছে রে?

মিউ-এর হাতে ঘড়ি ছিলো। দেখে বললো, পৌনে চারটে...

সে কীরে! তাহলে তো হাতে আর সময় নেই। ওরা যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। হেলিকপ্টার নামার সময় তো সন্ধ্যে সাতটা!

বাবু একটু চুপ করে থাকলো। কিছু ভাবলো। বললো, আমার মনে হয় ওরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামবে তখনই অ্যাটাক করতে হবে। ওখানে আমরা ঘাপটি মেরে বসে থাকবো। সিঁড়ির মুখটা ওদের কিছুতেই বন্ধ করতে দেবো না। মিউ, তুই কিকিকে বুঝিয়ে দে ও যেন উড়ে বাইরে গিয়ে কুকুরগুলোকে ডেকে আনে। কুকুরগুলো তো সব পাঁচিলের ধারেই আছে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এইটুকু রিস্ক আমাদের নিতেই হবে।

কিন্তু জানলা যদি ওরা বন্ধ করে দিয়ে আসে? রাজার কথা শেষ হবার আগেই বাবু বললো, আমাদের কেউ গিয়ে জানলা খুলে দিয়ে আসবে। চল আমরা যে যার পজিশান নিই।

মিউ বললো, ঐ তিনটে লোকের মুখোসগুলো পরে নিলে হয় না?

মন্দ বলিসনি। তাহলে ওরা চট করে চিনতে পারবে না। তা ওদের মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দেবার সময় মুখোসগুলো কোথায় ফেলা হয়েছে?

বুয়া বললো, আমি রেখে দিয়েছি। আনছি।

একটু পরেই বুয়া তিনটে মুখোস আনলো। বাবু আর রাজা একটা করে পরলো। একটু বড় হচ্ছে ঠিকই। পেছন থেকে বেঁধে নেওয়ায় আর অসুবিধে হলো না। তিনটি মেয়ের মধ্যে বুয়া সব থেকে লম্বা। তাই তৃতীয় মুখোসটা বুয়াকে পরানো হলো। মুখের দিকে তাকালে ওদের আর চেনার উপায় নেই। কিন্তু পোশাক বুঝিয়ে দিচ্ছে ওরা করা। অবশ্য আলো-আঁধারিতে চট করে কিছু বোঝা যাবে না—সেইটাই সুবিধে।

বেলা গড়িয়ে যায়। সময় যতো কাটে ওরা মনে মনে ততো বেশি অশান্ত হয়ে ওঠে। ওরা ভালোভাবেই জানে, একটা কিছু করতে না পারলে আজই ওদের শেষ দিন। হার ওরা মানবে না। মরতে হয় মরবে। কিন্তু লড়ে যাবে। মোমা যে ভীতু মেয়ে সেও পর্যন্ত উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে। হয় এসপার, না হয় ওসপার। ওরা এটা ভালোভাবেই জানে, লোকগুলো আর যাই করুক গুলি চালাবে না। পাঁচটা ছেলেমেয়ে সকাল থেকে নিখোঁজ। ওদের খোঁজাখুঁজি চলছেই। বাড়িতেও নিশ্চয়ই অনেক লোক। পুলিশও আসতে পারে। এর মধ্যে পাতালঘরে গুলি চালালে তার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়বেই। তা ছাড়া এতো এক্সপ্লোসিভ যেখানে রাখা আছে সেখানে গুলি চালাতে নিশ্চয়ই ইতস্তত করবে দুষ্টু লোকগুলো। সেই সুযোগটাই ওরা নেবে। কিন্তু যাদের জন্যে প্রতীক্ষা, তারা আসছে কই! সময় যে বয়ে যাচ্ছে! সময় যতো কাটছে ওদের টেনশান ততোই বাড়ছে।

সন্ধ্যে ছটা নাগাদ সিঁড়িমুখ থেকে চাপা শব্দ এলো। তারপর মুখটা ধীরে ধীরে খুলে গেলো। ওরা দেখলো সর্দার মুখে মুখোসটা লাগাতে লাগাতে নেমে আসছে। তার পেছনে দুজন একইভাবে মুখে মুখোস লাগাচ্ছে। কিকিকে আগে থেকেই বোঝানো ছিলো। ও হঠাৎ সর্দারের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দু চোখে নখ ফুটিয়ে দিলো। উঃ বলে শব্দ করে সর্দার কিকিকে সরাতে চেষ্টা করতে মিউ পেছন থেকে তার দু পা চেপে ধরে টান মারতেই সর্দার মুখ থুবড়ে মেঝেতে পড়লো। রাজা লাফিয়ে উঠে মুখোস টান মেরে খুলে সর্দারের মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিয়ে তাকে চটপট বেঁধে ফেললো। বাবু তখন সিঁড়ির ওপর লড়ছে।

দুসুম...দুসুম শব্দ আসছে। কিকি ততোক্ষণে আর একজনের চোখে নখ ফুটিয়ে দিয়েছে। সে অন্ধের মতো এগিয়ে আসছে। রাজা তার মুখে জোরে ঘুঁষি মারলো। জেনারেটার ঘরে ছোট্ট একটা লাঠি পেয়েছিলো মিউ। সেটা ওর হাতেই ছিলো। লাঠিটা দিয়ে লোকটাকে পেটাতে পেটাতে শুইয়ে ফেলতেই মোমা আর বুয়া তাকে বেঁধে ফেলে মুখোস সরিয়ে তার মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিলো। বাবু তখনো অন্য লোকটার সঙ্গে লড়ছে সিঁড়ির ওপর। রাজা আর দেরি করলো না। সিঁড়ি বেয়ে কয়েক পা উঠেই আচমকা লোকটার দুটো পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিতেই লোকটা সিঁড়ির ওপর চিৎ হয়ে পড়লো। রাজা তার দু পা ধরে টেনে নিচে নামিয়ে আনলো। সিঁড়িতে পড়ে আর টেনে নিচে নামানোর সময় লোকটার মাথায় আঘাত লেগেছিলো। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে বেঁধে ফেলতে কোনো অসুবিধে হলো না। লোকটাকে হাঁ করিয়ে তার মুখেও ঠুসে ন্যাকড়া গুঁজে দেওয়া হলো।

বাবু আস্তে আস্তে বললো, রইলো বাকী এক...

রাজা বললো, চল এই তিনটেকেও এক এক করে সেখানে রেখে আসি।

লোক তিনটেকে শুইয়ে রেখে এসে ওরা সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালো। ওদের হাতে তখন আরো তিনটে মুখোস। মিউ আর মোমা একটা করে পরে নিলো। মিউ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে জানলা খুলতেই তিনটে কুকুর লাফিয়ে নেমে এলো। তাদের পেছনে এলো কিকি। মিউ জানলা বন্ধ করে দিয়ে নিচে নেমে এসে বললো, সাড়ে ছটা বেজে গেছে। এবার আমাদের রেডি হতে হবে। সাতটার সময় হেলিকপ্টার আসবে।

মোমা বললো, সিঁড়ির মুখ যখন খোলা, ওপরে গিয়ে পুলিশ ডেকে আনলে হতো না?

সে সময় আর নেই। এখন তাড়াতাড়ি কয়েকটা বাক্স যোগাড় করতে হবে।

বুয়া বললো, জেনারেটারের পাশে কয়েকটা কাঠের বাক্স পড়ে আছে দেখেছি।

যা নিয়ে আয়।

মিউ আর মোমাও বুয়ার সঙ্গে চললো। একটু পরেই ওরা ছটা বাক্স নিয়ে এলো।

বাবু বললো, খালি বাক্সই খুব ভারী

এমনভাবে আমরা দুজন করে বয়ে নিয়ে যাবো। মিউ, তুই কিকি আর কুকুরগুলোকে বুঝিয়ে দে ওরা চকের চারপাশে ওত পেতে থাকবে। আমরা বাক্সগুলো হেলিকপ্টারে তুলে দিয়েই মেশিনগান বাগিয়ে ধরে ওদের নেমে আসতে বাধ্য করবো। তখন ওরা নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কইবে না। ওরা অস্ত্র তুলে নেবার আগেই কিকি আর কুকুরগুলোকে ওদের খেল দেখাতে হবে। মিউ, তুই আমার সঙ্গে আয়। কিকি আর কুকুরগুলোও আসবে।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো। ঘরের ওপাশের দরজা খুলে বাইরে এসে পুজোর দালানের দিককার দরজা খুললো। কিকি আর কুকুরগুলোকে মিউ ততোক্ষণে সব বুঝিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার তখনো গাঢ় হয়নি। কিন্তু চারপাশে গাছ-গাছালি আর প্রকাণ্ড উঁচু পুজোর দালানের জন্যে চকটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার। হঠাৎ কিকি মিউ-এর কাঁধ থেকে পুজোর দালানের দিকে উড়ে গেলো। একটু পরেই উড়ে এসে মিউ-এর কাঁধে বসে বললো, দালানে চারটে প্যাঁচা আছে। আমি ওদেরও কাজে লাগানোর চেষ্টা করবো। তোমরা যাও। কুকুরগুলো চারটে থামের আড়ালে গিয়ে ওত পেতে বসে আছে। কিকি উড়ে গেছে পুজোর দালানে। বাবু আর মিউ আর দেরি করলো না। ফিরে এলো পাতালঘরে।

তখন সাতটা বাজতে পনেরো। আর মাত্র পনেরো মিনিট। তারপরই হেলিকপ্টার আসবে। ওরা নিচে নেমে আসতেই পাশের ঘর থেকে পিপ্ পিপ্ পিপ্ শব্দ আসতে শুরু করলো। ওরা উঁকি মেরে দেখলো একটা ট্রান্সমিটার। নির্ঘাৎ ওদের কর্তা কনট্যাক্ট করতে চেষ্টা করছে। উপায় নেই। ওরা ওর বিন্দুবিসর্গও জানে না। খানিকক্ষণ পিপ্ পিপ্ করে শব্দটাও বন্ধ হয়ে গেলো।

কোনো ঝামেলা হবে না তো? রাজা বললো।

মনে হয় না। ওরা ভাববে যন্ত্রটায় কোনো গোলমাল হয়েছে। তাই সাড়া দেয়নি। মিউ, কটা বেজেছে রে?

সাতটা বাজতে সাত!

রাজা, তুই বুয়াকে নিয়ে মেশিনগানগুলো নিয়ে আয়। আর সকলেই একটা করে মুখোস পরে নে।

মেশিনগান নিয়ে কি হবে, আমরা তো চালাতেই জানি নে!

চালাবো কেন, আমরা তো ভয় দেখাবো!

রাজা সবার হাতে একটা করে মেশিনগান তুলে দিলো।

মিউ জিজ্ঞেস করলো, সঞ্জয় দত্তর কাছে কি এই মেশিনগান ছিলো?

তুই কিচ্ছু জানিস নে। সেটা তো একটা রাইফেল। অনেক বড়, অনেক ভারী। এটা মেশিনগান। একে এল.এম.জি. বলে। সৈন্যদের কাছে থাকে। ব্ল্যাক ক্যাটদের কাছেও থাকে।

মিউ বললো, চলো এবার ওপরে যেতে হবে। সাতটা বাজতে পাঁচ।

ওরা পাঁচজন মুখোস পরেছে মুখে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে মেশিনগান। হাতে বাক্সগুলো নিয়ে ওরা ওপরে উঠে দালানের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এলো। নদীর দিক থেকে আসছে। চকটা তখন বেশ অন্ধকার। একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ওদের চোখ সয়ে গেলো। কিকি হঠাৎ উড়ে এসে বসলো মিউ-এর কাঁধে। বললো, আমরা রেডি। চারটে প্যাঁচাও আছে আমাদের সঙ্গে।

মিউ বললো, শীগগির তোর জায়গায় চলে যা। ঐ দ্যাখ হেলিকপ্টার এসে গেছে।

ওদের বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পিটছে। একটু এদিক ওদিক হলে আর দেখতে হবে না। ওদের ঝাঁঝরা করে দেবে গুলি করে। বাবুর মনে হলো, এতো বড় ঝুঁকিটা না নিলেই হতো। যদি কিছু হয়ে যায়। ওরা তো পাতালঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো। দুষ্টু লোক কটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হতো। আর. ডি. এক্স, এক্সপ্লোসিভের ব্যবস্থা পুলিশই করতো। একবার বাবুর মনে হলো সকলকে ডেকে নিয়ে ওখান থেকে চলে যায়। পরমুহূর্তে ওর শরীরটা টানটান হয়ে উঠলো। যারা দেশের এতো বড় ক্ষতি করতে যাচ্ছে তাদের এইভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। পালের গোদাটাকে ধরতেই হবে।

হেলিকপ্টারটা ততোক্ষণে মাথার ওপর চক্কর দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। আলো এসে পড়েছে চকের ওপর।

বাবু বললো, রেডি, ভয় পাস নে। আমরা এমন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বো যে ওরা কিচ্ছু বুঝতেই পারবে না।

হেলিকপ্টারটা নামতেই ওরা ধরাধরি করে কাঠের বাক্স নিয়ে এগিয়ে গেলো।

হেলিকপ্টার থেকে কর্তা চাপা গলায় বললো, কুইক, হাওয়া ভালো বলে মনে হচ্ছে না।

ওরা বাক্সগুলো নিয়ে যেতেই হেলিকপ্টার থেকে তিনজন নেমে এলো সেগুলো তোলার জন্যে।

তখনই বাবু শিস দিয়ে উঠে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। থতমত খেয়ে ওরা কাঁধ থেকে মেশিনগান নিতে গেলেই কিকি আর চারটে প্যাঁচা এসে ওদের আক্রমণ করলো। বড়কর্তা পকেট থেকে রিভলভার বের করেছিলো। একটা কুকুর এসে তার হাতের কব্জি এতো জোরে কামড়ে ধরলো যে রিভলভারটা মাটিতে পড়ে গেলো। কিকি আর প্যাঁচাদের আক্রমণে ওদের চোখ-মুখ ততোক্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। ঐ অবস্থায় একটা লোক পালাতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর গিয়ে তার বুকের ওপর দু পা তুলে দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়লো। কিকি গিয়ে ওর মুখ আঁচড়ে দিতেই লোকটা হোয়াট অ্যা হেল বলে চিৎকার করে উঠে দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো।

ঠিক তখনই দেখা গেলো এপাশ ওপাশ থেকে অস্ত্রধারী ক'জন লোক ছুটে আসছে।

সর্বনাশ! এবার কী হবে! এরা যে কুড়ি-পঁচিশজন...

বাবুর কথা শেষ হলো না, কমলদার গলা ভেসে এলো, সাবধান, কেউ গুলি চালাবে না!

কমলদা! বাবু, রাজা, মিউ একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো।

কোথায় তোরা?

এই তো দুষ্টু লোকগুলোকে ধরে আছি। এদের হাতে শীগগির হ্যান্ডকাফ পরাও।

কিন্তু তোরা কই?

এই তো!

হঠাৎ ওদের মনে পড়লো, ওদের তো চেনার উপায় নেই। ওদের মুখে যে মুখোস।

বাবু বললো, মুখোসগুলো খুলে ফেল!

ওরা মুখোস খুলতেই কমলদা হাসিমুখে এগিয়ে এসে ওদের জড়িয়ে ধরলেন।

লোক তিনটের হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে পুলিশের লোকরা কমলদার নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

বাবু বললো, আরো পাঁচটা আছে!

সে কী! কোথায়? কমলদা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

পাতালঘরে! সেখানে আর. ডি. এক্স.আর এক্সপ্লোসিভ ভরা।

কী বলছিস?

চলো এক্ষুণি দেখতে পাবে!

দাঁড়া আলোর ব্যবস্থা করি। বম্ব স্কোয়াডের লোকদের ডাকি।

কমলদার নির্দেশে দেউড়ির বিশাল দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। হাসনাবাদ থানার ও.সি. এসে স্যালুট করে দাঁড়াতেই কমলদা বললেন,

বম্ব স্কোয়াডের লোকদের আসতে বলুন।

ওদিকে লোক তিনটেকে নিয়ে গাড়িতে তোলা হয়েছে। বাবু আগেই দেখিয়ে দিয়েছে ওদের নেতা কে! গাড়ির চারদিকে রাইফেল নিয়ে কম্যান্ডোরা দাঁড়িয়ে। তাদেরই ক'জনকে ডেকে নিলেন কমলদা। বাবুকে বললেন, এবার চল পাতালঘরে যাওয়া যাক।

মিউ বললো, যাবার আগে আমার কম্যান্ডোদের দ্যাখো!

কই কই!

মিউ ডাকতেই চারটে কুকুর, চারটে প্যাঁচা এগিয়ে এলো। কিকি তো মিউ-এর কাঁধেই বসেছিলো।

বাবু বললো, এরা না থাকলে ওদের ধরা তো দূরের কথা, আমরা বোধহয় এতোক্ষণ বেঁচেও থাকতাম না।

কমলদা সঙ্গে সঙ্গে ও.সি.-কে বললেন, এক্ষুণি এদের জন্যে মাংসর ব্যবস্থা করুন। ওরাও আমাদের সঙ্গে মাংসভাত খাবে।

প্যাঁচাগুলোর সঙ্গে মিউ-এর কি কথা হলো কে জানে—ওরা উড়ে গেলো পুজোর দালানে।

কমলদা যেতে যেতে বললেন, আলো লাগবে না বলছিস!

না, নিচে জেনারেটার চলছে।

থমকে দাঁড়ালেন কমলদা। বললেন, তার মানে এসব কাণ্ড এখানে অনেকদিন ধরে চলছে!

হ্যাঁ, ভূতের ভয় দেখিয়ে। ব্রহ্মদৈত্যের খড়মের আওয়াজ শুনিয়ে ওরা এমন অবস্থা করেছিলো যে সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়ির ধারে-কাছে কেউ আসে না। আর হরিদা বুড়ো-মানুষ। সন্ধ্যেবেলায় আফিম খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে...

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো। নিচেয় অন্ধকার নেই। জেনারেটারের মৃদু আওয়াজ আসছে। ওরা সকলকে নিয়ে এগিয়ে গেলো যেখানে লোক ক'টাকে ওরা বেঁধে রেখেছে। তার আগেই কমলদা দেখতে পেয়েছেন এক্সপ্লোসিভের বাক্সগুলো। তাঁর নির্দেশে বম্ব স্কোয়াডের লোকজন কাজ শুরু করে দিলো। ব্ল্যাক ক্যাটরা গিয়ে লোকগুলোকে টেনে আনলো।

বাবু বললো, কমলদা, এখানে ছজন আছে। ওদের দলে কিন্তু সাতজন ছিলো। সে আর...

বাবুর কথা শেষ হলো না, কমলদা বললেন, একটা লোক ধরা পড়েছে। সে কিছুতেই মুখ খোলেনি। তার হাবভাব, কথাবার্তা শুনে বোঝা গেছে সে বিদেশী। সেই তাহলে তোমাদের সেভেনথ ম্যান।

তাই হবে।

কমলদা ঘুরে ঘুরে পুরো পাতালঘর দেখলেন। তারপর ওদের নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোরা মুখোসগুলো কোথায় পেয়েছিলি?

ঐ লোকগুলোর মুখে ছিলো। আমরা খুলে নিয়ে পরেছিলাম। মুখোস পরা না থাকলে হেলিকপ্টারের লোকগুলো যে আমাদের চিনে ফেলতো। ঐ কর্তাই তো নির্দেশ দিয়েছিলো আমাদের মেরে ফেলতে।

তোরা বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলি!

আমরা কোথায় নিলাম। ওরাই তো আমাদের ধরে এনেছিলো।

হরিদা ততোক্ষণে তালা খুলে দরজা খুলে দিয়েছে। ওরা সেখান দিয়ে এসে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। হরিদাকে ডেকে কমলদা বললেন, একটু ভালো করে চা করো

তো!

এই ছেলেমেয়েগুলো যে সারাদিন কিছু খায়নি! সে খেয়াল আছে।

তাই তো, তাই তো! কমলদা লজ্জা পেলেন। কমলদার নির্দেশে তক্ষুণি একজন পুলিশ অফিসার জিপ নিয়ে ছুটলেন খাবার কিনে আনতে।

কমলদা বললেন, হরিদা, বড়বাবুকে বলেছি মাংস আনতে। ভালো করে মাংস রাঁধো। আমরা রাত্তিরে খেয়েই চলে যাবো। তোমার দাদাবাবু, দিদিমণিরাও আমার সঙ্গে যাবে।

সেই ভালো! যা কাণ্ড হলো! আমি তো ভেবে ভেবে সারা। কিছু হলে বাবুর মার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারতাম না।

বাইরে তখন পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কলকাতা থেকে গাড়িভর্তি ফোর্স এসেছিলো। তার ওপর পুরো টাকী বুঝি ভেঙে পড়েছে। ততোক্ষণে পাঁচটি দামাল ছেলেমেয়ের কীর্তি পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে কিকির কথা। সকলেই ওদের দেখতে চায়।

কমলদা বললেন, খেয়েদেয়ে আমরা হেলিকপ্টারে করে কলকাতায় ফিরে যাবো।

দুষ্টু লোকগুলোর কি হবে?

কমলদা হাসলেন। বললেন, দশটা দুষ্টু লোককে নিয়ে আর একটা হেলিকপ্টার খানিকক্ষণ আগেই উড়ে গেছে।

অতো এক্সপ্লোসিভ, আর.ডি.এক্স—ওসবের কি হবে?

বম্ব স্কোয়াডের দায়িত্ব ওটা। নিচে গেলে দেখতে পাবি ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এতো এক্সপ্লোসিভ—ইচ্ছে করলে তো ওরা পুরো কলকাতা উড়িয়ে দিতে পারতো!

তা পারতো।

শোন কমলদা, ওদের কিছু কথা আমরা শুনেছি। ওদের প্ল্যান ছিলো হাওড়া ব্রিজ, বিদ্যাসাগর সেতু, হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন, রাইটার্স বিল্ডিং থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ইমপর্ট্যান্ট জায়গাগুলো একই সঙ্গে একই দিনে উড়িয়ে দেবার। সেইজন্যেই আজ হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছিলো এক্সপ্লোসিভ নিয়ে

যাওয়ার জন্যে।

কমলদা গম্ভীরভাবে শুনলেন বাবুর কথা। বললেন, ওদের প্ল্যান যে এতো সাংঘাতিক ছিলো তা জানতাম না। তবে আমাদের কাছে খবর ছিলো বর্ডারের কাছে কোথাও ওরা এক্সপ্লোসিভ জমা করেছে। সেটা যে তোদেরই বাড়িতে তা ভাবতেও পারিনি। ভাগ্যিস তোরা বেড়াতে এসেছিলি। না হলে কি সর্বনাশ হয়ে যেতো বল দেখি!

কমলদা ঘরে এসে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, আজ যা ধকল গেলো না! যখনই খবর পেলাম তোরা পাঁচ মূর্তি নিখোঁজ তখনই বুঝেছিলাম সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

মিউ জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি হেলিকপ্টারের শব্দে পুজোর দালানের চকে এসেছিলে?

না রে! ট্রান্সমিটারে ওরা ওদের আসার খবর দিয়েছিলো। আমরা সেটা ক্যাচ করতে পেরেছিলাম। বি. এস. এফ-এর স্টিমারটাও পেরেছিলো। হেলিকপ্টার আসার আগেই আমরা পোজিশান নিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, ওরা বোধহয় তোদের তুলে নিয়ে যেতে এসেছে। এতো বড় ব্যাপার ভাবতে পারিনি কিন্তু। তারপর কিকির চিৎকার, প্যাঁচা, কুকুর আর তোদের লড়াই দেখে তোদের চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু মুখোসের জন্যে অসুবিধে হচ্ছিলো। তাই গুলি চালাতে নিষেধ করেছিলাম।

কথা বলতে বলতে ওরা ওদের ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে।

হরিদা এসে খেতে ডাকলো।

কমলদার সঙ্গে যে কজন অফিসার এসেছিলেন তাঁরাও এসে খেতে বসলেন। হরিদা দুর্দান্ত মাংস রেঁধেছিলো। সবাই পেট পুরে মাংস আর ভাত খেলেন। ওরা পাঁচজন তখন যেন হাওয়ায় ভাসছে। কতো বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার হলো।

খেতে খেতে কমলদা বললেন, কাল সি.এম. প্রেস কনফারেন্স ডাকবেন। তোরা পাঁচজন সেখানে থাকবি। রিপোর্টারদের বলবি তোদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে ওরা ওদের ব্যাগট্যাগ হাতে নিয়ে কমলদার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো। কিকি বসেছিলো মিউ-এর কাঁধে।

বাইরে তখন গিজগিজ করছে লোক। ওদের দেখে সকলে হৈহৈ করে উঠলো। সকলেই ওদের কথা শুনতে চায়। ওদের আরো ভালো করে দেখতে চায়।

ওরা জিপে উঠতে উঠতে একজনের মন্তব্য শুনলো, ছেলেমেয়েগুলোকে রোজ দেখতাম—কিন্তু ওরা এমন বাহাদুর তা তো ভাবতে পারিনি।

আর একজন চিৎকার করে উঠলো, আবার এসো কিন্তু।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে জিপ ছুটে চললো বড় মাঠের দিকে। ওখানে ওদের কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে হেলিকপ্টার রেডি হয়ে আছে।

মোমা বললো, হেলিকপ্টারে উঠবো, ভয় করবে না তো?

মিউ গম্ভীর হয়ে বললো, তুই না একটা ভীতুর ডিম...

সকলে হেসে উঠলো।

ছবি : সুফি

ছবি : সুফি

বসন্ত বিদায়

জ্যোতির্ময় মজুমদার

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার অ্যাটলান্টা প্রদেশের কোনো এক গোপনীয় স্থানে এক মারাত্মক খুনে আসামী ফাঁসির দিন গুনছে। ইনি কোনো সাধারণ হত্যাকারী নন, জেলের বাইরে যখন ছিলেন তখন কয়েক কোটি, আঞ্জে হ্যাঁ, কয়েক কোটি মানুষকে ইনি হত্যা করেছেন। আর যতদিন মানবসভ্যতা আছে ততদিন ধরেই হয়তো এ হত্যাকাণ্ড চলেছে। আর এই হত্যাকারীকে কোনো সাধারণ জেলে রাখা হয়নি। রাখা হয়েছে এক তালাবন্ধ রেফ্রিজারেটরের মধ্যে। ইনি বা এঁরা ডুবে আছেন তরল নাইট্রোজেনের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়)। আর সব রয়েছে এক তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে। বুঝতেই পারছো ইনি কোনো মানুষ নন, এত খুন করেও এর কোনো অনুশোচনা নেই বা আসন্ন মৃত্যু নিয়েও কোনো মাথাব্যথা নেই (মাথাই নেই তো মাথাব্যথা)! এই মারাত্মক বস্তুটি হচ্ছে ভ্যারিওলা (VARIOLA) বা সেই ভাইরাস যা থেকে গুটিবসন্ত বা বসন্ত রোগের (small pox) সৃষ্টি হতো। মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগের মধ্যে অন্যতম এই বসন্ত রোগ এখন সত্যিই ইতিহাস আর তা ইহলোক ত্যাগ করার জন্য অপেক্ষা করছে অ্যাটলান্টার সেন্টার ফর ডিজিজ্ কন্ট্রোলের (Centre for Disease Control, সংক্ষেপে সি ডি সি) ল্যাবরেটরিতে।

আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে সারা পৃথিবী জুড়ে বসন্তের প্রতিষেধক বা টিকা দেওয়ার এক বিশাল অভিযান চালানো হয় আর তারই ফলে এ রোগের বিনাশ ঘটে। ১৯৭৯ সালের ৯ ডিসেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation বা W.H.O) একটি গোষ্ঠী সুইট্জারল্যান্ড-এর জেনেভা শহরে মিলিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বসন্ত রোগের অবলুপ্তির কথা বিশ্ববাসীকে জানায়। লালরঙের সীলমোহর করা এক কাগজে তারা লেখেন **"আমরা যারা বিশ্বব্যাপী বসন্ত রোগ নির্মূল করার কমিশনের সদস্যরা এতদ্বারা প্রমাণিত করিলাম যে বসন্ত রোগ সমগ্র পৃথিবী হইতে নির্মূল করা হইয়াছে।"**

ব্যস, বসন্ত রোগের তো এখানেই ইতি অথচ ঠিক সেই কারণেই কিছু অভাবনীয় প্রশ্ন অনেকের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। যুদ্ধ তো জেতা হলো কিন্তু যুদ্ধবন্দী হিসেবে যে লক্ষ লক্ষ বসন্ত রোগের ভাইরাস বা ভ্যারিওলা তামাম দুনিয়ার নানা ল্যাবরেটরিতে বন্দী হয়ে রয়েছে তাদের কি দশা হবে? এইসব ভাইরাস নিয়ে এখন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় না ঠিকই কিন্তু তাই বলে ভাইরাসগুলো তো আর নিরীহ, ভালমানুষ হয়ে পড়েনি, তারা এখনও মারাত্মক। আর এখন তো কেউ বসন্তের টিকাও নিচ্ছে না, ঠিক এসময় যদি কোনো দুর্ঘটনায় এরা সব ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে আসে বা কোনো দেশ যদি এই ভাইরাসদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে?

এসব ভয়ানক সম্ভাবনার কথা মনে রেখে বসন্ত-বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধুমাত্র প্রতিষেধক দিয়ে পৃথিবী থেকে বসন্তকে নির্মূল করাই যথেষ্ট হবে না, ল্যাবরেটরিতে যা ভাইরাস রয়ে গেলো তাও নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়। আমাদের ইতিহাসে কোনো প্রাণী বা বীজাণুকে ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণ বিনাশ করার ঘটনাও এই প্রথম।

এ সম্ভাবনার কথা মনে করে স্বাস্থ্যকর্মীরা তো উল্লসিত কিন্তু কিছু বিজ্ঞানী আবার চিন্তিতও বটে। যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্রামক ব্যাধি বিভাগের জিওর্জিও তরিগিয়ানী (Giorgio Torrigiani) মনে করেন কোনো জীবাণুকে চিরকালের মতন নিশ্চিহ্ন করাটা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখা বাকি থেকে যাবে। এরকম হাড়বজ্জাত ভাইরাসকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্তটাও তাই এত সহজে নেওয়া যায়নি এবং সেজন্যই ভ্যারিওলা এতদিন টিকে আছে। তবে সব ঠিকঠাক হলে আগামী ডিসেম্বরে এই ভাইরাসের মহানির্বাণ ঘটবে আর তার সঙ্গেই ঘটবে মানব ইতিহাসের এক নাটকীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি।

বসন্ত রোগ প্রাচীনতম সংক্রামক ব্যাধিগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশেই ১০০০ খ্রীঃ পূঃ সালে এ রোগের বর্ণনা পাওয়া গেছে। মধ্যযুগে বসন্ত সমস্ত ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে, তার বহু লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিম গোলার্ধে অর্থাৎ আমেরিকায় কলম্বাস পৌঁছানোর পর (১৪৯২ খ্রীস্টাব্দ) এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে আর ৪০ বছরের মধ্যেই ২,০০,০০০ স্থানীয় অধিবাসী বা ইঙ্কারা সাবাড়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইওরোপে গড়ে বছরে প্রায় চার লক্ষের মতন লোক এ রোগের শিকার হচ্ছিলেন। আর খোদ লন্ডনে শতকরা দশটির মৃত্যুর কারণ ছিল এই বসন্ত। আর এতেও বসন্ত রোগের ভয়াবহতা বোঝানো গেলো না, কারণ এ রোগে যত জন মারা যেত আক্রান্ত হতো তার থেকেও বেশি।

অসুখটা খুব ভয়ানক ছিল ঠিকই, কিন্তু এর শুরুটা নেহাৎই সাধারণভাবে হতো। এ রোগের ভাইরাস হাওয়াতে ছড়িয়ে পড়ত আর হতভাগ্য রোগীর শ্বাসের মাধ্যমে তার শরীরে প্রবেশ করত। প্রথম দু'সপ্তাহ কিছুই হতো না, তার পরেই তেড়ে জ্বর আসত, সঙ্গে থাকত মাথাব্যথা, পিঠেব্যথা, গা শিরশির ভাব আর বমি। দু'তিন দিন পর যখন এই লক্ষণগুলো মিলিয়ে আসত ঠিক তখনই সর্বনেশে গুটি বা ফুসকুড়িগুলো সারা শরীরে বেরিয়ে আসত। প্রথমে বেরোত জিভে আর মাড়িতে, তারপর কপালে মুখে আর খুবই দ্রুতভাবে ছড়িয়ে পড়ত হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে। গুটিগুলো জলীয় পদার্থে ভরে উঠত আর আস্তে আস্তে তা বেশ শক্ত হয়ে উঠত। এই প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক অসুখে রোগী অনেক সময় চোখ খুলতে পারতেন না। আর চেহারা হয়ে উঠত বীভৎস। রোগের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পাবার দশ থেকে ষোলো দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হতো। আর যদি রোগী বেঁচে উঠতেন, তাহলে চিরজীবন গায়ে ফুটো ফুটো দাগ নিয়ে বেঁচে থাকতে হতো। প্রায়ই তিনি অন্ধ হয়ে যেতেন। এ রোগ এমনই আতঙ্ক ছড়াতো যে মৃতদেহ দাহ করবার লোক পাওয়া যেত না। বসন্ত সত্যিই ছিল রোদনভরা।

প্রাচীন আফ্রিকা ও এশিয়ায় বসন্তের জন্য আলাদা দেব-দেবীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমাদের বাংলাদেশে মা শীতলা ছিলেন এ রোগের দেবী। ফ্রান্সে সেন্ট নিকায়েস ছিলেন এ রোগের প্যাট্রন সেন্ট। উদ্ভট সব চিকিৎসাপদ্ধতিও ছিল এ রোগ সারাবার, যেমন লাল আলোতে রোগীকে রাখা হতো। বলা বাহুল্য আশানুরূপ ফল কখনই পাওয়া যেতো না।

কিন্তু বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বা প্রতিরোধ করার যথার্থ চেষ্টার ইতিহাসও বেশ প্রাচীন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঈজিপ্সীয়রা লক্ষ্য করে যে বসন্ত রোগীর গুটির রস যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তির হাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে তার বসন্ত রোগ হয় ঠিকই, কিন্তু অল্পের উপর ভুগে সে সেরে ওঠে, গায়ে দাগও থাকে না। আসলে এই ভাইরাস শ্বাসের মাধ্যমে ঢুকলেই সর্বনাশ, তখন ফল হয় মারাত্মক কিন্তু চামড়ার মাধ্যমে ঢুকলে তেমন কিছু হয় না। এ ব্যাপারটা তুর্কীরাও জানতে পারে ১৭০০ সাল নাগাদ। কন্স্ট্যান্টিনোপলস্থিত ব্রিটিশ রাজদূতের স্ত্রী লেডী মেরী ওর্টলে মন্টাগু এ পদ্ধতি শিখে আসেন আর ১৭২১ সালে লন্ডনে নিজের চার

বছরের মেয়েকে সাফল্যের সঙ্গে টিকা দেন।

এ পদ্ধতির কয়েকটা ঝামেলাও ছিল। যেমন ধর, তোমাকে রোগীর পুঁজ থেকে টিকা দেওয়া হলো। এবার তোমাকে একেবারে আলাদা থাকতে হবে। তোমার হয়তো মারাত্মক ধরনের বসন্ত হবে না কিন্তু ধর তোমার কাছাকাছি যদি কেউ এসে শ্বাসের সাহায্যে ঐ ভাইরাস গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তার বারোটা বাজল, সে বেচারার পুরো মাত্রাতেই বসন্ত হবে। দ্বিতীয়ত, তুমি যে পুঁজ থেকে ভাইরাস শরীরে নিলে তা যদি মারাত্মক ধরনের হয় তাহলে স্বয়ং তোমার অবস্থাও খুব ভালো হবে না।

ইংলন্ডের গ্লস্টারশায়ারের ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার ১৭৯০ সাল নাগাদ একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। গ্রামের গোয়ালা বা গোয়ালিনীদের কোনো বসন্ত রোগ হয় না। তারা বলত, "আমরা তো জানি আমাদের বসন্ত হয় না কারণ আমাদের কাউ পক্স আগেই হয়ে গেছে।" গরুদের বাঁটে এক ধরনের ফুস্কুড়ি হয় আর দুধ দোয়ানোর সময় গোয়ালাদের ছোঁয়াচ লেগে ঐ কাউ পক্স হয়। এটা বসন্ত রোগেরই সুলভ সংস্করণ বলতে পারো।

জেনার সাহেব দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম আর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, ঐ গোয়ালাদের কথাটা অনেকাংশেই সত্যি। কাউ পক্সের ভাইরাস বসন্তের ভাইরাস বা ভ্যারিওলার সমগোত্রীয়। সে জন্য কেউ যদি কাউ পক্সের ভাইরাস থেকে তৈরি টিকা নেয় সে বসন্ত রোগের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা অর্জন করে। আর এবার আর আলাদা থাকার দরকার পড়ে না। এই প্রথম এক বাস্তবিক টিকা বা ভ্যাকসিন তৈরি হলো বসন্তরোগের বিরুদ্ধে। এখন যে টিকা দেওয়া হতো (অবশ্য শেষ দশ পনেরো বছর আর দেওয়া হয় না) সেই ভ্যাকসিনিয়ার পূর্বসূরী ছিল জেনার সাহেবের টিকা। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, এডওয়ার্ড জেনারের আমলে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা প্যারাসাইট এসব কি কেউ জানত না। মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হয়েছিল আরো পরে আর ১৮৮৭ সালে প্রথম বসন্ত রোগ বা স্মল পক্স-এর ভাইরাসের চাক্ষুষ দর্শন সম্ভব হয়।

শুরু হলো বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। নতুন রোগী আর মৃত্যুর হার ক্রমেই কমে আসতে শুরু করল। সুসংবদ্ধভাবে টিকা দেওয়ার অভিযান চালানোর ফলে ইংলন্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর চীনে যথাক্রমে ১৯৪০, ১৯৫০ আর ১৯৬০ সালে বসন্ত রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে ১৮৯০ সাল নাগাদ টিকা দেওয়া শুরু হয় আর ক্রমে সমস্ত শিশুদের এই টিকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। শেষ বসন্ত রোগীকে ১৯৭৫ সালে বিহারে পাওয়া যায়। শীতলা দেবী অবশেষে ক্ষান্ত হন। গত দশ বছর আর টিকা দেওয়া হয় না। এই সমস্ত আশাব্যঞ্জক ঘটনা লক্ষ্য করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ষাটের দশকের মাঝামাঝি ঠিক করেন সারা পৃথিবী থেকেই এ রোগকে নির্বাসন দিতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব পড়ল ডোনাল্ড হেন্ডারসনের উপর। ভদ্রলোক মার্কিন নাগরিক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য মহৎ, কর্মপদ্ধতিও সহজ। নতুন রোগীর সন্ধান পাওয়া মাত্র তার আশেপাশের যারা সম্ভবত সংক্রামিত হয়েছে তাদের টিকা দেওয়া। জলাতঙ্ক রোগের মতন বসন্ত রোগের একটা মস্ত সুবিধে আছে, সেটা হলো সংক্রামিত হবার পরেও টিকা নিলে তা কার্যকর হয়। তবে অসুখের লক্ষণগুলো প্রকাশ পাবার পর টিকা দিলে অবশ্য কোনো কাজ হয় না। আর এও দেখা গেল যে একজন বসন্ত রোগীর থেকে গড়ে এক থেকে পাঁচজনের ছোঁয়াচ লাগতে পারে। কিন্তু এদের এই প্রকল্প সার্থক হবে কিনা তাতে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন।

কিছুদিন আগেই ম্যালেরিয়া নির্মূল করার পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে, কারণ মশারা এমন ধড়িবাজ যে তারা ডিডিটি বা ম্যালাথিওন জাতীয় কীটনাশক বেমালুম হজম করতে শিখে গেছে। তাদের বংশবৃদ্ধি ঠেকানো যায়নি। তাই বসন্ত রোগের বেলায় তৃতীয় বিশ্ব উৎসাহ দেখালেও উন্নত দেশগুলো তেমন গা করছিল না, কাজেই পুরো প্রকল্পটা অর্থাভাবে ধুঁকছিল।

হেন্ডারসন জানাচ্ছেন—'বসন্ত রোগ খতম হতে যখন মাত্র দুবছর বাকি অর্থাৎ ১৯৭৫ সালেও আমাদের পয়সাকড়ি বিশেষ ছিল না। আর আচ্ছা ঝামেলা বাধল বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া আর সোমালিয়া নিয়ে। তিনটে দেশেই দারুণ গণ্ডগোল। বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হলো, সোমালিয়া ইথিওপিয়াকে আক্রমণ করে বসলো অথচ এই দেশগুলোতেই স্মল পক্স বা বসন্ত তার শেষ যুদ্ধ চালাচ্ছে।'

ইউনাইটেড নেশনস্ (UNO) ইতিমধ্যে আবার ইথিওপিয়াকে এক বিপজ্জনক দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন সে দেশে এই বসন্ত- নির্মূল বাহিনীই বলতে গেলে একমাত্র বিদেশী দল যাঁরা সবকিছু তুচ্ছ করে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিলেন। এঁরা এই আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের একেবারে অন্তঃস্থলে হেলিকপ্টারে, গাধায় চেপে, কখনো স্রেফ পায়ে হেঁটে নতুন নতুন রোগী খুঁজে বেড়াতে লাগলেন আর তাদের পরিচিতদের টিকা দিতে লাগলেন। মুশকিল হয়েছিল যাযাবর বা বেদেদের (NOMADS) খুঁজে বার করতে। অবশেষে ইথিওপিয়ার হাইল্যান্ডে অর্থাৎ উঁচু মালভূমি থেকে বসন্ত রোগ বিদায় নিল।

কিন্তু নোমাড বা যাযাবররা আচ্ছা জ্বালিয়েছিল, তাদের মধ্যে বসন্ত রোগ আর যেন শেষই হয় না। রোগীদের সংখ্যা খুব বেশি নয় কিন্তু অসুখটা নাছোড়বান্দার মতন যাচ্ছিল না।

যুদ্ধের ডামাডোলে কিছু কর্মী বেপাত্তা হয়ে গেলো। আবার সোমালী বিদ্রোহীরা এঁদের হেলিকপ্টারটা দখল করে মুক্তিপণ দাবি করে বসলো। মজার কথা এই হেলিকপ্টারের ক্যানাডিয়ান পাইলট চমৎকার টিকা দিতে শিখে গিয়েছিলেন। তাঁকে আর হেলিকপ্টার উদ্ধার করতে যে কদিন সময় লাগলো সেই ফাঁকে তিনি সব বিদ্রোহীদের ঝপাঝপ টীকা দিয়ে দিলেন। শেষ ক'বছর খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, কর্মীরা কেউই ছুটি নেননি কারণ এক সপ্তাহ দেরি মানেই এ সমস্ত দেশে আবার গোলমাল আর লক্ষ্য পূর্ণ হতে আরও দেরি।

এঁদের প্রচণ্ড ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম অবশেষে সফল হলো। পৃথিবীর শেষ বসন্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল সোমালিয়ায়, সেদিন ছাব্বিশে অক্টোবর, ১৯৭৭। আলী মো মালিন বলে এক ২৩ বছর বয়সী হাসপাতালের রাঁধুনীর সর্বাঙ্গে গুটি বেরোল। দশদিন আগে দু'জন যাযাবর বা বেদের থেকেই তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। সুখের বিষয় মালিন চটপট সেরে ওঠে।

হেন্ডারসন বলেন, 'এরপর চার সপ্তাহ কেটে গেলো আর কোনো নতুন রোগীর খবর নেই। তারপর ছ সপ্তাহ, তারপর আট সপ্তাহ অবশেষে কয়েক মাস নির্বিঘ্নে কাটলো। এরপর আমরা জানাতে বাধ্য হলাম যে বসন্ত রোগ বিদায় নিয়েছে। আমাদের দু' বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিপদ-আপদের ঝুঁকি, হাজার রকমের গুজব সব অতিক্রম করে সফল।'

গুজব কিন্তু যাই যাই করেও যায় না। ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার এক রিপোর্টার আমাজনের গভীর অরণ্যে একদল আদিবাসীদের আবিষ্কার করলেন তারা নাকি গত ত্রিশ বছরে সভ্য মানুষের সংস্পর্শে আসেনি এবং একজন বসন্তে আক্রান্ত। পরে জানা গেলো সেটা চিকেন পক্স (জল বসন্ত) আসল স্মল পক্স বা বসন্ত নয়। ১৯৭৯ সাল নাগাদ ঘোর সন্দেহবাতিক অবিশ্বাসীরাও মেনে নিল

যে বসন্তের ভাইরাস প্রকৃতিতে আর নেই। সেন্টার ফর ডিজিজ্ কন্ট্রোলের (সি ডি সি) ওয়ালটার ডাওড্‌ল্ জানাচ্ছেন 'আজকালকার এই দ্রুত সংবাদ বিনিময়ের যুগে অর্থাৎ ফ্যাক্স, টেলেক্স আর স্যাটিলাইট কমিউনিকেশনের যুগে কোথাও বসন্ত হলে সে খবর হু হু করে ছড়িয়ে পড়বে। খবর যখন নেই তখন বসন্তও নেই।'

১৯৭৮ সালে বসন্ত রোগ নাটকীয়ভাবে ফিরে আসে আর তা কোনো তৃতীয় বিশ্বের গভীর জঙ্গলের মধ্যে নয় খোদ ইংলন্ডে বার্মিংহাম শহরে। এ শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের এক কর্মী জ্যানেট পার্কার-এর ১১ আগস্ট জ্বর হয় আর ১৫ আগস্ট গায়ে ফুসকুড়ির মতন সব গুটি বেরিয়ে আসে। দশ দিনের মধ্যে বোঝা যায় তা বসন্ত, আর ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তদন্তে জানা যায় যে এখানেই বসন্তরোগের রিসার্চের জন্য একটা ল্যাবরেটরি ছিলো আর তা থেকেই কোনো ভাইরাস ছাড়া পেয়ে পার্কারকে আক্রান্ত করে।

দুর্ঘটনার জের এখানেই থামলো না,পার্কার-এর সত্তর বয়সী বাবার হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়। জ্যানেট-এর মাও বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন তবে তিনি সেরে ওঠেন। আরও এক মর্মান্তিক ঘটনা অপেক্ষা করেছিল। ঐ স্মল পক্স ল্যাবরেটরির বিভাগীয় প্রধান হেনরী নেডসন আত্মহত্যা করেন। এ-সমস্ত ঘটনায় খবর - কাগজ আর টেলিভিশনে তুমুল হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন সত্যিই কি বসন্ত বিদায় নিয়েছে নাকি সে আরো ভয়ঙ্কর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছে।

বার্মিংহ্যাম দুর্ঘটনার পর সবাই নড়েচড়ে বসলো। বোঝা গেলো বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব আর প্রকৃতি থেকে হবে না, হবে ল্যাবরেটরিগুলো থেকে যেখানে ভ্যারিওলা বা বসন্তের ভাইরাস রেফ্রিজারেটরে জমিয়ে রাখা আছে।

আশির দশকের গোড়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীর সব দেশের সরকারকে অনুরোধ করেন, তাদের ল্যাবরেটরিতে যত বসন্তের ভাইরাস-এর নমুনা আছে তা হয় যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাটলান্টায় সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল(সি ডি সি) নয়তো রাশিয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ভাইরাল প্রিপারেশন-এ পাঠিয়ে দিতে। এটাও সন্দেহ করার কারণ ছিল যে পৃথিবীর কিছু দেশ গোপনে বসন্তের ভাইরাস দিয়ে কিছু বায়োলজিক্যাল অস্ত্র বানাবার চেষ্টা করছে।

জাপান, হল্যান্ড আর ইংলন্ড তাদের ভাইরাসের স্যাম্পল অতি সন্তর্পণে অ্যাটলান্টায় পাঠিয়ে দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৮৩ সালে তাদের সংরক্ষিত ভাইরাস নষ্ট করে ফেলে। এখন মস্কোয় আছে ভাইরাসের একশ রকমের নমুনা আর সি ডি সি-তে চারশো রকমের।

বার্মিংহামের ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রত্যেকটি রিসার্চ সংস্থাকে বলেছেন তাদের পুরনো সমস্ত ফ্রীজার বা অ্যাম্পুল বা ভায়াল তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে আর যেখানে এই ভয়ঙ্কর বীজাণু সংরক্ষিত থাকত তা যেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বীজাণুমুক্ত করা হয়। ১৯৮৫ সালে লন্ডনে হঠাৎ রহস্যজনকভাবে পাঁচ-ছটা অ্যাম্পুলের আবির্ভাব হয়। এগুলো ১৯৫২ সালের তৈরি। তার মধ্যে ভ্যারিওলা আছে এই সন্দেহে তৎক্ষণাৎ সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়।

সত্যি বলতে কি এই ভাইরাস নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ কিছু হচ্ছিল না বা প্রয়োজনও নেই। এখন বৈজ্ঞানিকরা যা করছেন তা হলো জেনেটিক সিকুইয়েন্সিং বা জেনেটিক ম্যাপিং অর্থাৎ এই ভাইরাসের ক্ষুদ্রতম অংশেও ডি এন এ-গুলো যে ক্রমান্বয়ে রয়েছে তারই একটা ম্যাপ তৈরি করা এবং তার নকল রেখে দেওয়া। এ কাজ হচ্ছে অত্যন্ত সাবধানে। অ্যাটলান্টার বৈজ্ঞানিকরা স্পেশস্যুট ধরনের জামা পরে কাজ করেন এমনকি এয়ারকন্ডিশনিং-এর হাওয়া অবধি ছেঁকে পরীক্ষা করা হয় যাতে কোনোরকম দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে। ভ্যারিওলা ভাইরাস বেশ পেল্লায় সাইজের (অন্যান্য ভাইরাসের তুলনায়)। ভ্যারিওলার একটি genome অর্থাৎ ক্রোমোজোমের অংশে প্রায় ১,৭৫,০০০ অংশে যুক্ত (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভাষায় Building blocks)। এ সমস্ত কাজই ডিসেম্বর ১৯৯৩-এর আগে শেষ করতে হবে। রাশিয়ান ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা যৌথভাবে কাজ করছেন।

এই কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে জ্যান্ত ভাইরাসের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। কোথাও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তার ভাইরাসের জেনেটিক সিকুয়েন্স-এর সঙ্গে এ মিলিয়ে দেখলেই মিল বা অমিল বোঝা যাবে আর প্রতিষেধকও তৈরি করা যাবে। তা ছাড়া ভ্যাকসিনিয়া ভ্যাকসিন যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে।

অবশেষে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে কোনো একদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়ায় একইসঙ্গে সমস্ত ভাইরাসের স্যাম্পল ধ্বংস করা হবে। সমস্ত অ্যাম্পুলগুলো একটা টিনের মধ্যে জড়ো করে বিশেষ এক ধরনের চুল্লীতে ২৬৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা অবধি গরম করলেই সব ভাইরাসই শেষ। আর তার সঙ্গে শেষ হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য অধ্যায়, এই প্রথম পৃথিবী থেকে এক জঘন্য ভয়ঙ্কর রোগকে চিরতরে নির্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য এর জন্য কেউই একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না।

রূপকথার মন

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

মনটি কি চায় আজ মায়া হয়ে উঠতে?
নেই-ফুলবাগানের ফুল হয়ে ফুটতে?
কল্পনা-ভোমরারা ফুর-ফুর উড়ছে
ভুলের নেশায় মেতে ভুলে ভুলে ঘুরছে,
বদলিয়ে গেছে যেন সত্যের রূপটাই
চোখের ভুবনভরা মিথ্যেরই রোশনাই।

যা যেমন — নয়ন কি তেমনটি দেখছে?
খেয়ালের খুশ্-এ সব ভাঙছে ও বেঁকছে।
চিন্তারা হারিয়েছে তাল মান যুক্তি
বিচারের ছক থেকে ভাবনার মুক্তি।

উচিত যা ঘটছে না, উল্টোটা ঘটছে
পরোয়াও নেই কারো কে খুশী, কে চটছে।
ছিঁড়ে যায় সুস্থির নিয়মের নোঙ্গর
জ্যামিতিক বাঁধা ঘাট, প্রচলিত বন্দর।

রঙিলা খুশির পাল তুলে মন-নৌকায়
নিরুদ্দেশের নীলে কুহকের চিল্কায়
কূল আর অকূলের কোথাও না পৌঁছে
হারাতেই সুখ আজ দিক্‌ভুল মৌজে।

উড়ন্ত নাওটির রাশ টেনে ধরবার
সাধও নেই, সাধ্যও নেই কিছু করবার:
ঢেউ-ভাঙা বাতাসের হাসি-মায়া-কান্না
অবাকের ঝিল্‌মিল্—হীরে মোতি পান্না।

চেতনার চোখে মেখে স্বপ্নের অঞ্জন
কুড়িয়ে আকাশ-ফুল মনোমালা গ্রন্থন:
আজ বুঝি সে মালার ডোর-হারা গ্রন্থির
দোল-খাওয়া অস্থির এলোমেলো ভ্রান্তির।

হৃদয়-চোঁয়ানো কোনো অভাবিত গন্ধ
অদ্ভুত রূপ-রাগ, আজগুবি ছন্দ,
আনন্দ কুরঝুর, ফুরফুর পাখনার
উচ্ছল চঞ্চল টল্‌মল্ ভাবনার

তালগোল পাকানোর উদ্ভট স্বপ্নে
ডুব-ডুব খেলতেই সুখ এই লগ্নে!

হাঁদা-ভোঁদার

লেমোনেডের বোতল

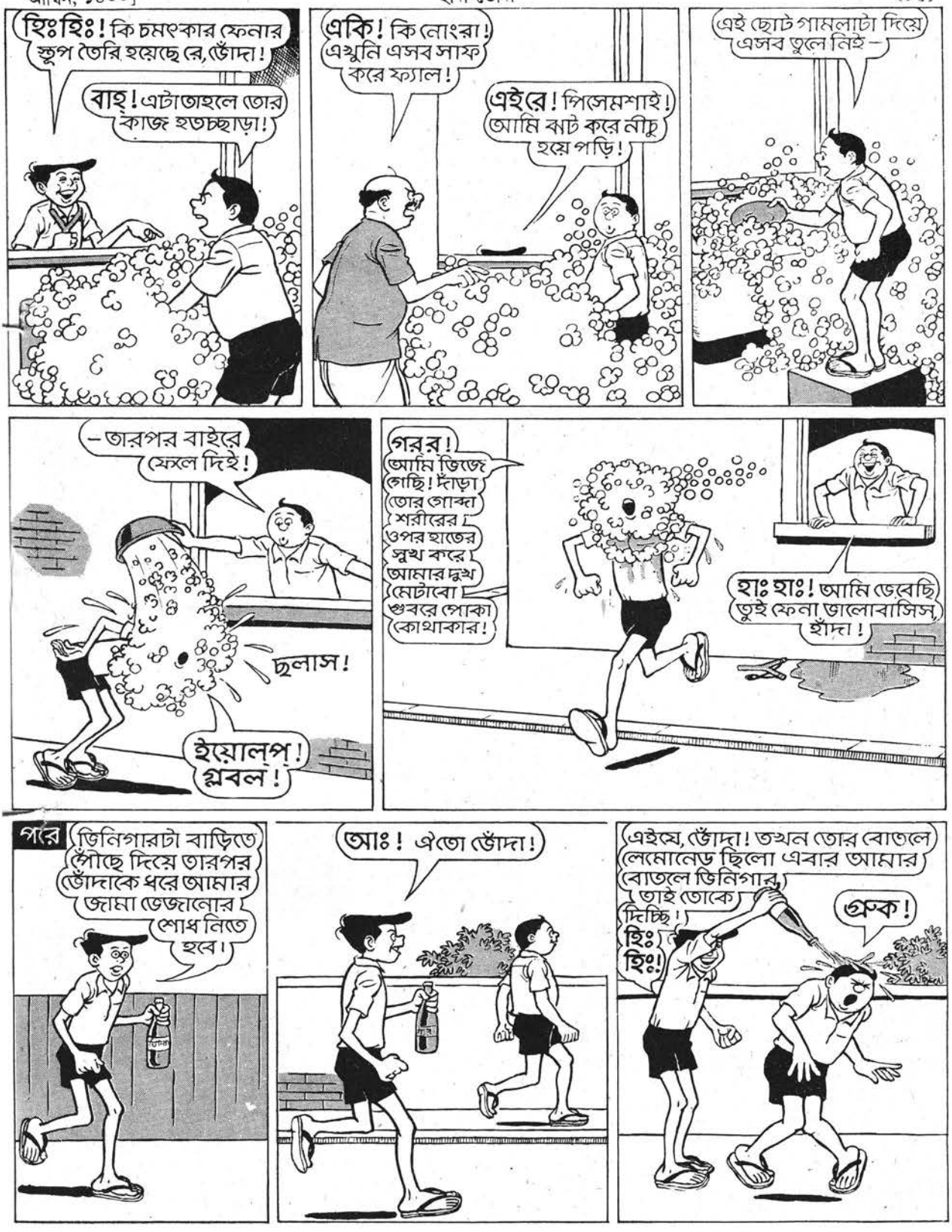
হিঃহিঃ! কি চমৎকার ফেনার স্তূপ তৈরি হয়েছে রে, ভোঁদা!
বাহ্! এটা তাহলে তোর কাজ হতচ্ছাড়া!
একি! কি নোংরা! এখুনি এসব সাফ করে ফ্যাল!
এইরে! পিসেমশাই! আমি ঝট করে নীচু হয়ে পড়ি!
এই ছোট গামলাটা দিয়ে এসব তুলে নিই –
– তারপর বাইরে ফেলে দিই!
ছলাস!
ইয়োল্প্!
গ্লবল!
গরর! আমি ভিজে গেছি! দাঁড়া তোর গোব্দা শরীরের ওপর হাতের সুখ করে আমার দুখ মেটাবো শুবরে পোকা কোথাকার!
হাঃ হাঃ! আমি জেনেছি তুই ফেনা ভালোবাসিস, হাঁদা!
পরে
ডিনিগারটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর ভোঁদাকে ধরে আমার জামা ভেজানোর শোধ নিতে হবে।
আঃ! ঐতো ভোঁদা!
এইযে, ভোঁদা! তখন তোর বোতলে লেমোনেড ছিলো এবার আমার বোতলে ডিনিগার, তাই তোকে দিচ্ছি!
হিঃ হিঃ!
গ্লক!

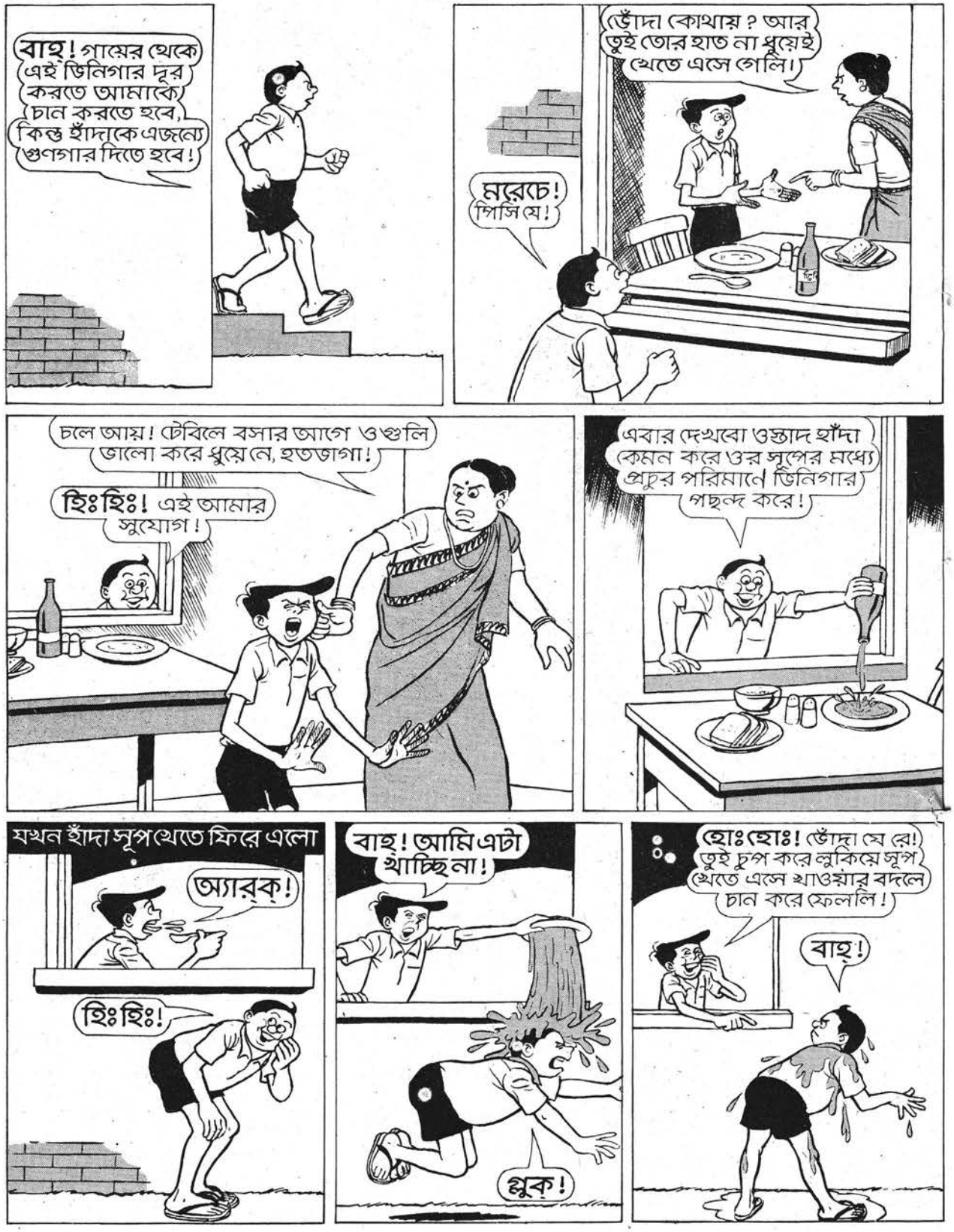
বাহ্! গায়ের থেকে এই ডিনিগার দূর করতে আমাকে চান করতে হবে, কিন্তু হাঁদাকে এজন্যে গুণগার দিতে হবে!
ভোঁদা কোথায়? আর তুই তোর হাত না ধুয়েই খেতে এসে গেলি।
মরেচে! গিসি যে!
চলে আয়! টেবিলে বসার আগে ওগুলি ভালো করে ধুয়ে নে, হতভাগা!
হিঃহিঃ! এই আমার সুযোগ!
এবার দেখবো ওস্তাদ হাঁদা কেমন করে ওর সূপের মধ্যে প্রচুর পরিমানে ডিনিগার পছন্দ করে!
যখন হাঁদা সূপ খেতে ফিরে এলো
অ্যারক্!
হিঃহিঃ!
বাহ্! আমি এটা খাচ্ছি না!
গ্লুক্!
হোঃহোঃ! ভোঁদা যে রে! তুই চুপ করে লুকিয়ে সূপ খেতে এসে খাওয়ার বদলে চান করে ফেললি!
বাহ্!

আমি টি-পট নিয়ে আসি! এক কাপ চায়ে নিশ্চয়ই ডিনিগারের এই স্বাদটা চলে যাবে!
চিনি রাখার জায়গায় আমি নুন দিয়ে রাখি। তারপর মুখচুন করার আরো ব্যবস্থা করছি।
এবার আমি চুপিসাড়ে ঘুরে সামনের দরজায় গিয়ে পিসেমশাইয়ের সন্ধান করি।
এখানে জানালার নীচে খুবই অদ্ভুত একটা ফুল ফুটে আছে। আপনি কি এসে দেখে বলবেন ওটা কি ফুল?
ইতিমধ্যে হাঁদা যখন ফিরলো
চার-পাঁচ-ছয়! আমি আমার চায়ে প্রচুর চিনি ভালোবাসি!
ওয়াক!
কোন ফুলটা?
এইটা!
বাহ! আমি আর কোনভাবেই এটা খাচ্ছি না!
গ্লক্!
সপাৎ! সপাৎ! ওরে গেছিরে! মরে গেলুম রে!
হাঃহাঃ! বেত্রাঘাতের পর এবার নিশ্চয়ই ওর ক্ষতস্থানে নুন দিয়ে মর্দ্দন চলছে!

প্রাণের প্রদীপ

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ঘটনাটা যে সময়ের তখন তোমরা অনেকেই জন্মাওনি। একে ঘটনা না বলে বলব দুর্ঘটনা, যা আজও ঘটেছে। রাসবিহারীর মোড়ের কাছে মা কালী কাফেতে নিয়মিত আড্ডা বসত আমাদের।

কাফের মালিক ঘোঁতা। বয়স কত ছিল জানতাম না। তবে প্রায় কুড়ি বছর ধরে তাকে প্রায় একই রকম দেখেছি। বেঁটে, গাট্টাগোট্টা, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। ধপধপে সাদা চুল। যেন একটা মূর্তিমান নেগেটিভ ফিল্মের ছবি। একটু রূঢ়ভাষী হলেও মনটা কিন্তু বড় ভালো ছিল তার। কালীভক্ত বলে দোকানের নাম দিয়েছিল 'মা কালী কাফে'। এমন কিছু আহামরি ছিল না আমাদের মা কালী কাফে। একটা মাঝারি মাপের ঘর। ঢুকতেই বাঁদিকে চা ইত্যাদি করার ব্যবস্থা। সামনে একটা লম্বা বড় টেবিল। তার দুপাশে দুটো বেঞ্চি। একসঙ্গে ঠেসাঠেসি করে দশজনের বেশি বসা যেত না। সামনের দেয়ালে ছিল বিরাট একটা মা কালীর ছবি। ঘোঁতা প্রতিদিন মায়ের ছবিতে জবা ফুলের মালা পরিয়ে দিত। শনি মঙ্গলবার ভোরবেলা কালীঘাটে পুজো দিয়ে এসে পরাতো প্রসাদী মালা।

ঘোঁতার দোকানে চা, অমলেট, টোস্ট ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না। মধ্যে মধ্যে ঘুগনি করত। কিন্তু ঘোঁতার চা, অমলেট আর টোস্টের আস্বাদ ছিল অপূর্ব। আমরা যেদিন মাইনে পেতাম সেদিন অমলেট টোস্ট খেতাম, না হলে প্রথমে এক কাপ চা আর তারপর ডবল হাফ্ চায়ের কাপ নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা স্রেফ আড্ডা দিতাম। ঘোঁতা আপত্তি করত না। সময়টা ১৯৪৭ সাল।

একদিন দেখি পুরোনো 'বয়' নকুলের বদলে একটা দশ-বারো বছরের ফুটফুটে ছেলে ঘোঁতার দোকানে চা দিচ্ছে।

নকুল কোথায়? জিজ্ঞেস করি। ঘোঁতা চা করতে করতে বলে, রেজিগনেশন দিয়ে চলে গেছে। ভজা—ঘোঁতার ডাক শুনে সেই ছেলেটা লাফ দিয়ে ঘোঁতার কাছে এল, তারপর চটপট আমাদের চায়ের কাপগুলো এনে টেবিলে রাখল।

একে কোথা থেকে পেলে? বন্ধু বিনয় জানতে চাইল। ঘোঁতা জবাব দিল, আমার শালা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভজা তখন আগের খাওয়া কাপ-ডিশগুলো পাশের কলটায় ধুচ্ছে। ঘোঁতা তাকে সাবধান করে, আস্তে আস্তে ধো। একটা কাপ-ডিশ ভাঙলে মাথা ভেঙে দেব।

ভজার চোখে-মুখে কথা। হাসতে হাসতে বলে, আমার মাথা খুব শক্ত, যা দিয়ে ভাঙবে সেটাই ভেঙে যাবে।

আমরা সবাই হেসে উঠি ওর কথা শুনে। ক'দিনেই ছেলেটার ওপর মায়া পড়ে গেল আমাদের। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তোর বাবা-মা কোথায় থাকে রে?

গম্ভীরভাবে ভজা উত্তর দিল, বাবা নেই।

ভাইবোন?

নেই।

থাকিস কোথায়?

এখানে।

ঘোঁতা বলল, ও এখানেই থাকে। এখানেই শোয়।

ভজা বলল, ঘোঁতাদা বাড়ি থেকে রুটি-তরকারি পাঠিয়ে দেয়। দিনের বেলায় ঘোঁতাদার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসি, বৌদি খুব ভালো।

বৌদি তো ভালো হবেই, দাঁত কিড়মিড় করে ঘোঁতা বলে। ফাই-ফরমাস খেটে দিয়ে আমার ওয়াইফটিকে হাত করে ফেলেছেন বাবু এরই মধ্যে।

ঘোঁতার রাগ হলে মধ্যে মধ্যে ইংরিজি বলে। আমরা তখন হাসি চেপে ওকে আরও রাগাই। ভজাও ব্যাপারটা বুঝে ফেলে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ছেলেটা খুব হাসি-খুশি। কিন্তু ওর একটা বড় দোষ ছিল, বড্ড বকশিস চাইত। প্রতিদিন আমরা তো কয়েক কাপ চা খেতাম। তবুও মৌরীর ডিশটা এগিয়ে চায়ের দামটা গুনে বলত, বাবু, আরো কিছু ফেলুন।

কেন?

মাথা নিচু করে ভজা বলত, বকশিস।

আমরা বলতাম, আরে আমরা তো প্রতিদিনের দেড় কাপ চায়ের খদ্দের। আমরা কি বকশিস দেব?

কেন দেবে না?

যারা নতুন খদ্দের, অমলেট-টোস্ট-চা খাবে, তাদের কাছে বকশিস নিবি।

ভজা মাথা নিচু করে কাপগুলো নিয়ে নিত, মাঝে মাঝে মায়াও হতো ওর মুখ দেখে। তখন দু-পয়সা, চার পয়সার দিন। আমি তাই দিতাম ভজাকে।

আমাকে পয়সা দিতে দেখলে ঘোঁতা ধমকাত, বকশিস চাইছে তো! ছোঁড়াটা মহা হ্যাংলা।

এইরকম হাসি-ঠাট্টা করে দিন কাটালেও ভেতরে ভেতরে আমাদের সকলেরই মন ভার। গোটা দেশের যা পরিস্থিতি তাতে যে কোনো সময় ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। দু-দুটো দাঙ্গার স্মৃতি সবারই বুকের মধ্যে দগদগ করছে। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল কলকাতায়। দাবানলের মতো সেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল নোয়াখালি ও বিহারে। শান্তি ফিরিয়ে আনতে মহাত্মা গান্ধী ছুটে গিয়েছিলেন নোয়াখালি। তখনকার মতো চাপা পড়লেও '৪৭-এ আগুন আবার জ্বলে উঠল কলকাতায়। গান্ধীজী ছুটে এলেন আবার। বেলেঘাটার একটি বাড়িতে থেকে অনশন আরম্ভ করলেন। বললেন, হিন্দু-মুসলমানে এই হানাহানি যদি না বন্ধ হয় তবে আমৃত্যু তিনি অনশনে থাকবেন। তাঁর অনশন এবং নেহরু প্রমুখ নেতাদের আবেদনে দাঙ্গা বন্ধ হলো। দেশ বিভাগের মূল্যে একদিন স্বাধীনতাও এল। কিন্তু দেশের বাতাবরণে আগের মতো নির্মলতা ও সুস্থির ভাব আর রইল না। আমাদের ঐ মা কালী কাফের আড্ডাতেও তাই প্রায়ই এসে পড়ত ঐ সব কথা। কিছুদিন পর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, যখনই আমরা দাঙ্গার কথা আলোচনা করি তখনই ভজার হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ও যেন কান খাড়া করে আমাদের কথা শুনতে চায়। ঘোঁতার বকুনি ধমকানি সত্ত্বেও বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ও কি কিছু বলতে চায়? নাকি ওর শিশুহৃদয়ে কোনো গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে ঐ ভয়ঙ্কর দাঙ্গা? শেষে ওকে একদিন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে ভজা, তুই কি দাঙ্গা দেখেছিস?

ভজা যেন বলার সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কাপ-ডিশ ধোয়া বন্ধ করে আমাদের সামনে মাটিতে ধপ করে বসে পড়ে বলে উঠল, দেখেছি বৈকি বাবু। এই নিজের চোখে দেখেছি। আমার এক দূর-সম্পর্কের মামাকে তো এই দাঙ্গায় প্রায় মেরেই ফেলেছিল। দা দিয়ে কুপিয়েছিল গো। খালি গলাটাই যা কাটতে বাকি ছিল।

তুই কি করছিলি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যেই গলাটা কাটতে যাবে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, ভজা বলে। কিন্তু গুণ্ডাগুলো আমায় মারতে মারতে পাশের ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখে দিল। তাপ্পর গুণ্ডাগুলো মামুর গলাটা কাটতে যাচ্ছে এমন সময়—

পুলিশ এল বুঝি? গজেন বলে।

না।

তবে?

কয়েকজন স্বদেশী লোক মুখে চোঙ লাগিয়ে দূর থেকে বলেন, গান্ধীজী কাল থেকে খাচ্ছেন না, তোমরা খুনোখুনি মারপিট না থামালে উনি না খেয়ে মরবেন।

এই কথা শুনে যে গুণ্ডাটা মামুর গলা কাটতে যাচ্ছিল, তার হাত থেকে দা-টা পড়ে গেল। তারা মামুকে ফেলে পালিয়ে গেল। আর একদল এসে মামুকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। একজন এসে আমার বাঁধন খুলে দিল। তারপরে আমি মামুকে খুঁজতে বেরোলাম।

পেলি?

হ্যাঁ। ভজা কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

তোরা কি জাত?

ঘোঁতা বলে, বলছে তো বামুন। মুখুজ্যে টাইটেল।

দিন যায়, ভজার বকশিস চাওয়ার হ্যাংলামি ক্রমেই বাড়ছে। যেদিন টোস্ট বা অমলেট খাই সেদিন চার আনাতেও ও খুশি নয়। আরও পাঁচটা পয়সা চায়। মাঝে মাঝে আমরাও খুব বিরক্ত বোধ করি।

একদিন ঘোঁতার দোকানে গিয়ে দেখি ঘোঁতা ওর কান ধরে তড়পাচ্ছে, তুই রোজ রাত্তিরে কোথায় পালাস?

ভজা গোঁজ হয়ে মাথা হেঁট করে থাকে, কিছু বলে না।

শুনলাম সামনের পান-সিগারেটের দোকানদার ওর দোকানটা রাত্রে অনেকক্ষণ খোলা রাখে। সে-ই নাকি বলেছে, ঘোঁতা ভজাকে দোকান বন্ধ করতে বলে যাওয়ার পর ও প্রথমে দোকানের ভেতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে শোয়, তারপর একটু পরে দরজা খুলে বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে যায়। কখন ফেরে দোকানদার জানে না।

কোথায় যাস? ঘোঁতা ভজার কানটা কষকষিয়ে চিমটের মতন ধরে নাড়তে লাগল।

ভজা সভয়ে বলল, মেটিয়াবুরুজ।

মেটিয়াবুরুজ! গজেন সভয়ে বলে, সব্বনাশ!

আমি ধমকে বললাম, কি করতে যাস?

ভজা চুপ করে থাকে।

বল, ঘোঁতা বলে।

ভজা নির্বাক।

বল, ঘোঁতা ঠাস ঠাস করে ওর দু-গালে কয়েকটা চড় মারে।

বলব না। ভজা দাঁতে দাঁত চেপে বলে।

গজেন বলে, ঘোঁতাদা, কেসটা ভালো ঠেকছে না। স্মাগলারের খপ্পরে পড়েনি তো? তা যদি হয় তাহলে তো তুমিও জড়িয়ে পড়বে।

ভীষণ রাগে ঘোঁতা উনুনের কাছ থেকে খুনতিটা এনে ওকে যেই মারতে যাবে আমি বাধা দিয়ে বলি, মারটার করে লাভ নেই। ভজাকে বললাম, তুই যেখানে যাস সেখানে আমাদের নিয়ে চল।

গোলমাল শুনে আশেপাশের কয়েকজনও এসে গেছে। ওদের মধ্যে একজন বুদ্ধি দিল পুলিশকে খবর দিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ।

আমরা থানায় খবর দিয়ে ভজাকে নিয়ে মেটিয়াবুরুজ রওনা হলাম।

মেটিয়াবুরুজে খুবই কম এসেছি। মুসলমানের বস্তিই বেশি। অনেক রকম দোকান। ভজা আমাদের একটা ঘিঞ্জি পাড়ায় নিয়ে এল। আমাদের সঙ্গে পুলিশ দেখে স্থানীয় লোকেরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। ভজাকে দেখলাম অনেকেই চেনে। ভজা আমাদের একটা প্রায় অন্ধকার গলিতে ঢোকাল, তারপর কিছুদূর এগিয়ে ডাইনে আর একটা ওর থেকে সরু ব্লাইন্ড লেনে ঢুকিয়ে তার একদম শেষ প্রান্তের ঘরটায়

নিয়ে এল। এটাকে ঠিক ঘর বলা যায় না। কোনো রকমে টিন-কাঠ দিয়ে জোড়াতালি মেরে পায়রার খোপের মতো একটা আস্তানা তৈরি করা হয়েছে। ঘরের ঝাঁপিটা খুলতেই অন্ধকার ঘর থেকে একজন বলে ওঠে, কে?

ভজা বলে, আমি ভজু।

এখন! কি ব্যাপার?

এরা তোমায় দেখতে এসেছে।

কারা?

পুলিশ অফিসার বলে, তুমি কে?

আমি মকবুল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে উত্তর আসে।

আমাদের সঙ্গে মেটিয়াবুরুজের কয়েকজন মাতব্বর টাইপের মুসলমানও এসেছিল। বলল, ও মকবুল মিঞা। আগে লরি চালাত, দাঙ্গায় গুণ্ডারা ওর হাত-পা কেটে জখম করে দিয়ে গেছে।

ভজাকে দেখিয়ে ঘোঁতা বলে, এর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কি?

সম্বন্ধ কি জানি না, তবে ও প্রতিদিন রাত্রে এসে ওকে খাবার দিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ঘষটাতে ঘষটাতে মকবুল বেরিয়ে এসেছে। একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি। ডান হাতটা কাঁধের নিচে থেকে নেই। বাঁ পা-টাও হাঁটুর নিচে এসে শেষ হয়ে গেছে।

এ তোমার কে? ভাগ্নে? ঘোঁতা প্রশ্ন করে।

মকবুল সজল নয়নে বল, ও আমার কেউ নয় বাবু। কিন্তু ও-ই আমার সব।

তারপর মকবুলের মুখ থেকে শুনলাম এক আশ্চর্য কাহিনী। ভজার বাবা কমল মুখুজ্যে ছিলেন এখানকার বহুদিনের বাসিন্দা। ওঁর একটা স্টেশনারী দোকান ছিল। মকবুলের বাড়ির পাশেই থাকতেন। মকবুল তখন লরির ড্রাইভার। তার বিরাট দাপট। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এ রায়ট লাগল। ১৭ আগস্ট মকবুল লরি নিয়ে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই গুণ্ডারা এল ভজার বাবার দোকান লুঠ করতে। কমলবাবু বাধা দিতে গেলে গুণ্ডারা তাঁকে খুন করে। ইতিমধ্যে মকবুলও ফিরে আসে। দু-তিন দিন সে ভজার মা আর ভজাকে আগলে রাখে। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে মুসলমানদের পাড়ায় হিন্দুদের আর হিন্দুদের পাড়ায় মুসলমানদের থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন মকবুল তার লরিতে করে ভজা আর তার মাকে বাগবাজারে ভজার কাকার বাড়িতে দিয়ে আসে। ভজার কাকার অবস্থা মন্দ নয়। কাকীমার তো ভজার মাকে পেটভাতা রাঁধুনি আর ভজাকে চাকর পেয়ে সুবিধেই হলো। গ্যালিফ স্ট্রিট ট্রাম ডিপোর পেছনে কাকার একটা ল্যাম্পের কারখানা ছিল। ওঁদের দুটি ছেলেমেয়ে। অবস্থা একটু শান্ত হতে মকবুল যেত ভজা আর ভজার মার খোঁজ নিতে। ফেরার সময় ভজার হাতে লুকিয়ে কিছু টাকাও দিয়ে আসত।

বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ইসলামপুরের লোক এই মকবুল। বাবা-মা মারা যাবার পর ইসলামপুরের পাট চুকিয়ে মেটিয়াবুরুজে চলে আসে। বিয়েও করেছিল এখানে। বিবি মারা যাবার পর অনেকে বলেছিল আবার বিয়ে করতে কিন্তু মকবুল শোনেনি। প্রতিদিন রাত্রে গোস্ত-রুটি খেয়ে লরিটাকে গ্যারেজ করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরত। ফিরে অগোছালো বিছানায় কোনোক্রমে ধড়াস করে শুয়ে পড়ত। কোনো কোনোদিন দরজা বন্ধ করতেও ভুলে যেত। কমলবাবু পাশেই থাকতেন, উনিই এক-একদিন মকবুলকে জোর করে উঠিয়ে দরজাটা বন্ধ করাতেন। এমনি একদিন দরজাটা বন্ধ করাতে গিয়ে মকবুলের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তারপর উনি আর ওঁর স্ত্রী সারারাত ধরে কপালে জলপট্টি দিয়ে গায়ে মাথায় হাওয়া করেন। ভোরবেলা মকবুল ঘুম থেকে উঠে ওঁদের দেখে তো অবাক। তখনও গা-হাত-পায়ে ব্যথা। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সেবার বেশ কয়েকদিন জ্বরে ভুগেছিল সে। সেই সময় ভজার মা-বাবা ঘরের ছেলের মতো করে মকবুলের সেবা করেছিলেন। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, পথ্য দেওয়া—সব ওঁরাই করেছিলেন।

এই ঘটনার পর মকবুলের সঙ্গে ভজাদের সম্পর্ক হয়ে উঠল ঠিক আত্মীয়ের মতন। ভাই দ্বিতীয়ার দিন ভজার মা সন্দেশ, রসগোল্লা সিঙাড়া, নিমকি সাজিয়ে মকবুলের সামনে রেখে বললেন, খান।

কেন? মকবুল অবাক হয়ে যায়।

আজ তো ভাইফোঁটা, ভজার মা বলেন।

ভাইকে ফোঁটা না দিলে আমি খাব কেন? মকবুল গম্ভীর হয়ে বলে।

ভজার মা তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন দূর্বা-চন্দন গুছিয়ে আনতে। সব যোগাড় করে ফিরে এসে দেখেন মকবুল নেই। অবাক হয়ে যান তিনি। কোথায় গেল মানুষটা? বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না তাঁকে। একটু পরেই মকবুল ঘরে ঢুকল হাতে একটা শাড়ির প্যাকেট নিয়ে। সেদিন ভজার মার হাতে ফোঁটা নিতে নিতে মকবুলের দুই চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

সেসব কথা কিছুই ভোলেনি মকবুল।

ভজার সঙ্গে দেখা করতে এসে একদিন মকবুল ভজার কাকাকে বলল, ভজাকে আপনি স্কুলে ভর্তি করে দিন, যা খরচ লাগে আমি দেব।

তুমি দেবে কেন? ভজার কাকার আত্মসম্মানে ঘা লাগে।

মকবুল বলল, ভজা আমার ভাগ্নের মতন।

দরজার আড়াল থেকে মকবুলের কথা শুনছিলেন ভজার কাকীমা। চতুর মহিলা কাকাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন ভজার পড়ার খরচ নিতে। অগত্যা কাকাও রাজী হয়ে গেলেন। এর পর প্রতিমাসে মকবুল ভজার পড়ার টাকা দিত। কিন্তু ভজাকে ওঁরা স্কুলে ভর্তি করলেন না। কারখানায় আর বাড়িতে খাটাতে লাগলেন। মকবুল কিছু জিজ্ঞেস করলে কাকা নানা অজুহাত দেখাতেন, অমুক স্কুলে চেষ্টা করেছিলাম, সেখানে হলো না, অন্য স্কুল দেখছি। মকবুল বুদ্ধিমান। টাকা দেওয়া বন্ধ করে সে ভজাকে বলল, তুই কিছু ভাবিস না, বড় হ, তোকে আমি ড্রাইভার করে দেব। ভজার মাও দেখলেন কাকা-কাকীমা ছেলেটাকে বিনা পয়সায় খাটাচ্ছে। এর থেকে অন্য কোথাও লাগলে মাইনেটা অন্তত ভজা পেত। পাশেই থাকত ঘোঁতার শালা। মানুষটা ভাল দেখে ভজার মা তাকেই একটা কাজ খুঁজে দিতে বললেন। ঘোঁতার শালা ভজাকে এনে ভর্তি করেছিল ভগ্নীপতির দোকানে।

ইতিমধ্যে আবার রায়ট লাগল কলকাতায়। সেই সময় একদিন মকবুল বাগবাজারে ভজাকে টাকা দিয়ে ফিরছিল, এমন সময় গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করে।

সে ইতিহাস আমরা ভজার মুখে আগেই শুনেছি। মকবুলের প্রাণটা বেঁচেছিল শুধু গান্ধীজীর জন্য।

মেটিয়াবুরুজের ঐ এঁদো ব্লাইন্ড লেনে এই অসাধারণ কাহিনী শুনে আমরা কেমন নির্বাক হয়ে গেলাম। মকবুল বলে চলেছিল, আমি ভজাকে বলি, তুই তো পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাস। আমার জন্য রোজ খাবার আনলে তোর থাকবে কি? তখন ও হতভাগা কি বলে জানেন? বলে, মামু, বাবুরা খুশি হয়ে আমায় বকশিস দেয়। সেই বকশিসের টাকায় আমি তোমার খাবার কিনে আনি। আপনারা কি সেই বাবু? আপনাদের সেলাম বাবু, সেলাম!

আমরা যেন ছোট হতে হতে মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম। ঘোঁতা আমাদের মান রাখল। বলল, আমি ভজার মাইনে ডবল করে দেব। তোমার খাবার ব্যবস্থাও করে যাচ্ছি।

কয়েকটা দিন বেশ কেটে গেল। মকবুল মিঞার খাবার বন্দোবস্ত ওখানকার স্থানীয় হোটেলে ঘোঁতা ঠিক করে দিয়েছে। তারা দু-বেলা খাবার আর চা-জলখাবার দেবে। যা লাগবে ঘোঁতা অর্ধেক দেবে। আমরা সবাই অর্ধেক দেব।

এই ব্যবস্থায় আমরাও বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম। ভজা কিন্তু রোজ একবার করে তার মকবুল মামুকে দেখে আসে।

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর এল। দিল্লীতে মহাত্মাজীকে হত্যা করেছে নাথুরাম গডসে। একটা অঘটনের আশঙ্কা ছিলই সবার মনে। কিন্তু তা যে এমন মর্মান্তিক হবে ভাবিনি। আমরা ভেঙে পড়লাম। মনে হলো আমরা যেন হেরে গেছি। সব বন্ধ। দু-তিন দিন পরে ঘোঁতা তার দোকান খুলল। খদ্দেরদের বললে, বারো দিন এখানে ডিম-টোস্ট বিক্রি হবে না। শুধু চা পাবেন। ভজাও কি রকম মুষড়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ মেটিয়াবুরুজ থেকে একটা লোক হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, এখানে ভজা কাজ করে?

হ্যাঁ। আমরা সবাই একসঙ্গে বলি।

ও যেন ওর মাকে নিয়ে মকবুল মিঞার সঙ্গে দেখা করে। ওর অবস্থা খুব খারাপ।

কি হয়েছে?

গেলেই দেখতে পাবে।

ভজা আর ভজার মাকে নিয়ে আমরা যখন মেটিয়াবুরুজে মকবুলের ডেরায় গেলাম, তখন তার শ্বাস উঠেছে। শুনলাম মহাত্মাজীর হত্যার খবর শোনার পর ও খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি জলস্পর্শও করেনি। ভজাকে একথা বলতে বারণ করেছিল। সবাই কত অনুরোধ করেছে কিন্তু মকবুলের ঐ এক কথা—যে মহাত্মা আমাদের প্রাণ বাঁচাতে দিনের পর দিন উপোস করেছেন, তাঁকে আমরা খুন করলাম! আমিও আজ থেকে কিছু না খেয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

ভজা 'মামু' বলে মকবুলের মুখের কাছে সরবতের গেলাসটা এগিয়ে দিল। মামু, খাও! মকবুল মুখটা ঘুরিয়ে নিল। অ্যাম্বুলেন্স যখন এল তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

মকবুলের নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে আছে। তার বুকে মাথা রেখে ভজা ফোঁপাচ্ছে। ভজার মা মকবুলের ডান পায়ে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদছেন। ঐ অন্ধ গলিটার যেন চোখ খুলে গেছে। লোকে লোকারণ্য। সবার চোখে জল। যেন ঐ গলিতে একটা মহৎ প্রাণ তার সমস্ত শ্রদ্ধা-ভালবাসারূপ হব্য দিয়ে সবার প্রাণের প্রদীপগুলি জ্বেলে দিয়ে নির্বাপিত হলো।

ছবি ঃ রাজা সরকার

আয়না

জাপানী রূপকথায় আছে, একদিন ভোরবেলায় সূর্যদেবতা নাকি কোনো কারণে খুব রেগে যান। রেগে গিয়ে তিনি নিজেকে এক গুহার মধ্যে লুকিয়ে ফেলেন। আর তখুনি সারা পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এল। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী সূর্যের রাগ ভাঙাবার জন্য নানান চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হলো না। অবশেষে কোনো উপায় না দেখে গুহার সামনে একটা চকচকে রুপোর আয়না ধরা হলো। রুপোর আয়নায় নিজের রাগী রাগী বিচ্ছিরি মুখখানা দেখে সূর্যদেব নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এটা কি সত্যিই তাঁর মুখ? ভালোভাবে নিজেকে দেখার জন্য আস্তে আস্তে গুহার ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আর যেই না তিনি বাইরে বেরিয়ে এসেছেন অমনি গুহার মুখ সবাই মিলে পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিল। সূর্যদেব আর ভেতরে ঢুকতে পারেন না। সেই থেকে সূর্য জাপানের আকাশে আজও রয়েছেন।

আয়না নিয়ে এরকম অনেক গল্পকথা ছড়িয়ে আছে দেশে দেশে। চসারের ক্যান্টারবেরি গল্পমালায় আছে টারটারীর রাজা কাম্বুস্কানের এমন একটা আয়না ছিল যা দেখে তিনি আগে থেকেই বলে দিতে পারতেন ভবিষ্যতে কি ঘটবে। রেনার্ড দি ফক্সের কাছেও এমন এক ধরনের আয়না ছিল যা দিয়ে তিনি এক মাইল দূরের জিনিস দেখতে পেতেন। আইরিশ সাহিত্যিক অলিভার গোল্ডস্মিথ তাঁর গল্পে এক আশ্চর্য চীনা আয়নার কথা উল্লেখ করেছেন যার সাহায্যে যে কোনো মানুষের মন ও সেই মুহূর্তে সে কি ভাবছে তা বলে দেওয়া যেত। শোনা যায়, জাপানীরা দুষ্কৃতকারীদের অপরাধের হদিস পাওয়ার জন্য যখন জিজ্ঞাসাবাদ করত তখন তাদের মুখের সামনে আয়না ধরত। সত্যি কথা বা মিথ্যে কথা বলার সময় মুখের যে পরিবর্তন হতো তা তারা আয়নার মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করত।

নিজের মুখটা কিরকম দেখতে তা জানাই যেত না যদি আয়নার আবিষ্কার না হতো। জলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখে মানুষ প্রথম জানতে পারে তাকে কি রকম দেখতে। তারপর নানা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তারা একদিন আয়না আবিষ্কার করে ফেলে। আয়নার ভেতর আলো প্রবেশ করলে আলোর চরিত্রে কি কি ধরনের পরিবর্তন আসে তা প্রাচীন গ্রীক গণিতজ্ঞ ইউক্লিড সূত্রাকারে লিখে রাখেন। শোনা যায়, আর্কিমিডিস নাকি এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই অবতল আয়না তৈরি করেন। রোমান রণতরী যখন সিরাকাস আক্রমণের জন্যে এগিয়ে আসছিল তখন তিনি আয়নার ওপর সূর্যের আলো কেন্দ্রীভূত করে কোনো অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াই তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী ফারাসে লাইটহাউসের মাথায় একটা বিশাল আয়না লাগান যাতে শত্রুপক্ষের জাহাজকে এক মাইল দূর থেকে চেনা যায়। ১৬৬৮ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন টেলিস্কোপ তৈরি করেন। পৃথিবীর সব থেকে বড় ও নিখুঁত আয়না লাগানো আছে ক্যালিফোর্নিয়ার পালামোর পাহাড়ের মাথায় ২০০ ইঞ্চি হেল টেলিস্কোপের মধ্যে। এর ওজন প্রায় সাড়ে চোদ্দ টন। আর সূক্ষ্মতা হলো দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে অগণিত আলোকবর্ষ দূরে যেসব মহাজাগতিক বস্তু রয়েছে তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুব সহজেই দেখতে পান।

দেখা না-দেখা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

যে দিনটার দিকে কয়েক সপ্তাহ ধরে সকলে তাকিয়েছিল অনেক আশা আর আনন্দ নিয়ে, সেই দিনটা যে শেষ পর্যন্ত এই রকম হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানতো? আর তার সঙ্গে যে জড়িয়ে যাবে এমন একটা রহস্য, তাই বা কে ভেবেছিল?

তমাল গঙ্গোপাধ্যায় যে এ বছর সাহিত্যের জন্য সরকারি পুরস্কার পাচ্ছেন, সে-কথা ঘোষণা করা হয়েছিল এপ্রিল মাসে। তারপর যা হয়ে থাকে—এসেছে অনেক অভিনন্দন, অজস্র ফুল আর অঢেল শুভকামনা। তমালবাবুর বাড়ির লোকজন—তাঁর মা, স্ত্রী আর দুই ছেলেও মেতে উঠেছে আনন্দে। তমাল যে লেখক হিসেবে বেশ নাম করেছেন তা বাড়ির লোকেরা খুব ভালোভাবেই জানে। তবু আজ পর্যন্ত সাহিত্য রচনার জন্য কোনো পুরস্কার তিনি পাননি।

দূরদর্শনে সন্ধ্যের সংবাদে খবরটা প্রথমটা শোনে অন্তু। সেই ছুটে এসে মাকে বলে, জানো মা, এইমাত্র টিভিতে বললো, বাবা এই বছর সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছে।

মা তখন আলমারি খুলে কী একটা বার করছিলেন। বললেন, তাই নাকি রে? ঠিক শুনেছিস?

কেন ঠিক শুনবো না? আমি ঠিকই শুনেছি—তমাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঐ নামে তো আর কোনো লেখক নেই।

এ-বিষয়ে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটুকুও কেটে গেল তমালবাবু বাড়ি ফেরার পর। তাঁর মুখে দেখা গেল হাসি আর হাতে দেখা গেল সেই বিখ্যাত দোকানের পেস্ট্রির বাক্স। মন খুশি থাকলে ওই দোকানের পেস্ট্রিই কিনে আনেন তিনি।

সেদিন সুসংবাদটা শুনে এসেছিলেন খবরের কাগজের অফিস থেকে। একটা উপন্যাসের কিস্তি জমা দিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই একজন রিপোর্টার এসে বলেছিল, তমালদা, কনগ্র্যাচুলেশনস্...

তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল দিন গোনার পালা। কবে আসবে সেই বিশেষ দিনটি যেদিন তমালবাবুর হাতে সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেবেন মাননীয় মন্ত্রী, কাগজে-কাগজে খবর বেরোবে, দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে উঠবে ছবি...

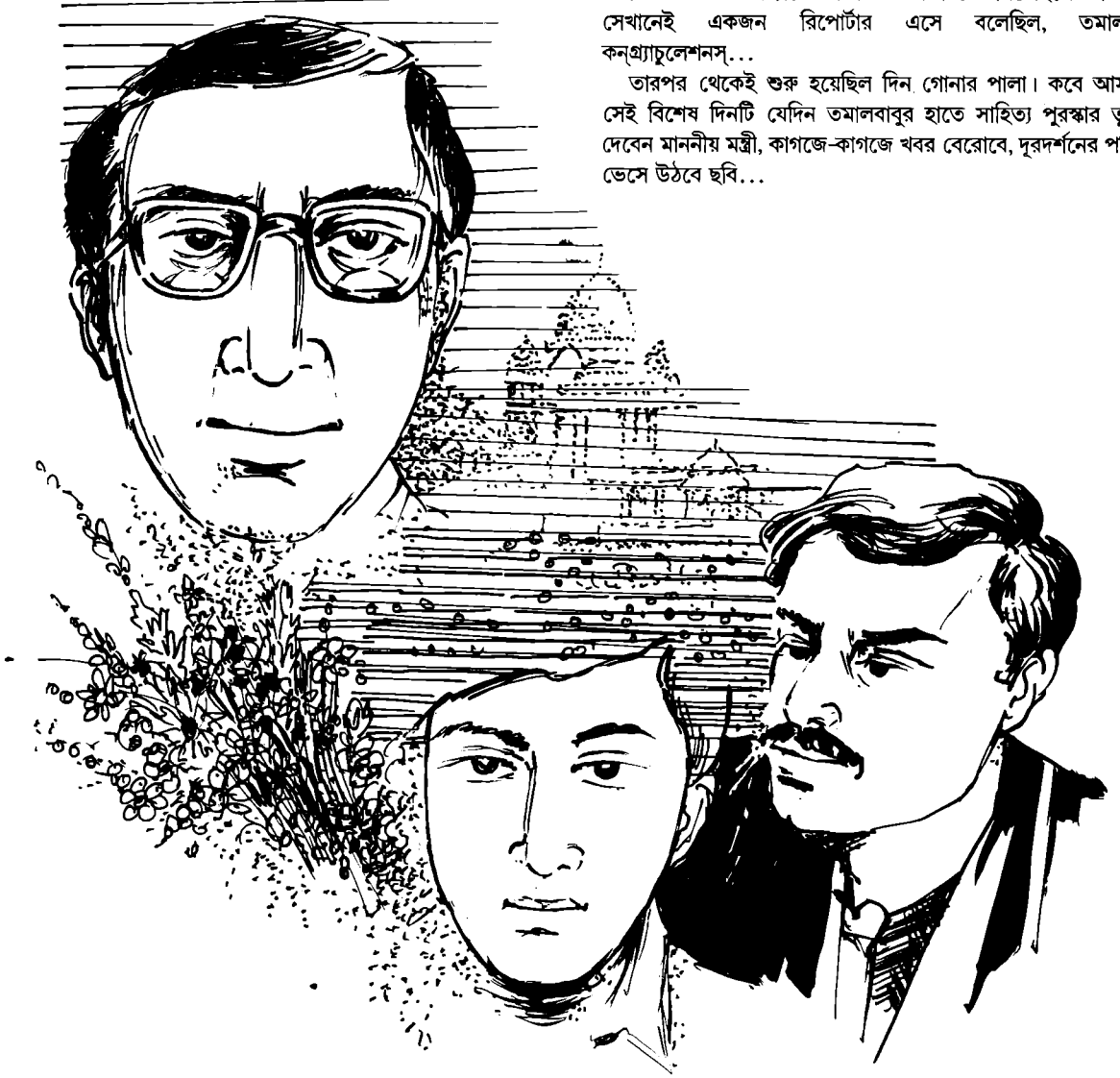

দিনটা সত্যি সত্যিই একদিন এলো, কিন্তু কীভাবে যে এলো! কাগজে-কাগজে খবর বেরোলো ঠিকই, কিন্তু সেই খবরের জন্যই কি আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছিল তমালবাবুর বাড়ির লোকজন?

'সাহিত্য বাসরে বোমা, লেখক গুরুতর জখম'— এমন একটা শিরোনাম যে পরের দিনের কাগজে বেরোতে পারে তা কি কেউ ভেবেছিল? পুরস্কার নিয়ে বাড়ি ফিরবেন, তারপরে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হবে ভালো রকম, কতো কী রান্না করেছিলেন তমালবাবুর মা আর স্ত্রী মিলে। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেল—তমাল ভর্তি হলেন নার্সিংহোমে।

কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন মা আর স্ত্রী। কান্না এসে গেল অন্তু আর সন্তুরও। কিন্তু অন্তুকে দেখে মনে হলো সে যেন ভালো করে কাঁদতেও পারছে না, কেমন চমকে চমকে উঠছে মাঝে মাঝে।

এই ধরনের ঘটনা ঘটলে যা হয়ে থাকে এখানেও সেইসব হতে লাগলো। অর্থাৎ পুলিশি তদন্ত। তমালবাবুকে লক্ষ্য করে কে বোমা ছুঁড়তে পারে? কেনই বা ছুঁড়বে? তিনি একজন সুপরিচিত লেখক। তাঁর কি কোনো শত্রু আছে? ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো এইসব প্রশ্ন।

তমালবাবুর চোট লেগেছিল মাথায়। প্রাণে বেঁচে গেলেও জখম হয়েছিলেন রীতিমতো। জ্ঞান আসেনি পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। তাই পুলিশ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। কিন্তু পুলিশের লোক এসেছিল বাড়িতে। জেরা করেছিল তমালবাবুর স্ত্রীকে।

আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়? আপনাদের কি মনে হয়েছিল সেদিন এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে?

এইসব প্রশ্ন শুনছিল অন্তু মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আর ভয়ে হিম হয়ে যাচ্ছিল তার শরীর। পুরস্কারের আগের দিন সে বাবাকে যা বলেছিল...

তমালবাবু একটু সামলে ওঠার পর তাঁকেও উত্তর দিতে হচ্ছিল এইসব প্রশ্নের। পুলিশ অফিসারটি ছিলেন রসিক। বললেন, লেখকদের মধ্যে রেষারেষি আছে শুনেছি মশাই, কিন্তু তাই বলে বোমা! আপনি তো আরও বিখ্যাত হয়ে গেলেন তমালবাবু!

তমাল তখন বলেছিলেন, বোমাটা আমাকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়েছিল, এ কথা ধরে নিচ্ছেন কেন? মঞ্চে তো আরও গণ্যমান্য লোকেরা ছিলেন।

তা ছিলেন, তা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কারা? বৃদ্ধ এক সাহিত্যিক জ্ঞানশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জনপ্রিয় এক মন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর এক বিচারপতি। এঁদের কেউই তো আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারেন না। তবে ওই দিকটাও যে আমরা ভেবে দেখছি না তা নয়। কিন্তু যেহেতু বোমাতে জখম হয়েছেন আপনি...

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর বিমল দাস। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ মশাই, শুনলুম নাকি সেদিন ঐ বিশেষ চেয়ারটায় বসতে আপনি বেশ আপত্তি করেছিলেন। আপনি কি আগে থেকে কোনো কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন নাকি?

তমালবাবুর শরীর তখনও বেশ দুর্বল। বিরক্ত লাগছিল এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে। তবু কথা বলতে হয়। পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন: আঁচ করতে পেরেছিলাম মানে?

মানে আর কি? মানে হলো, আপনার কি মনে হয়েছিল, ঐ জায়গাটায় বসলে আপনার... কোনো... বিপদ হতে পারে?

ঐ জায়গাটায় বসলে আমার কোনো বিপদ...। কথাগুলো যেন নিজের মনে বলতে বলতে থেমে গেলেন তমালবাবু। তারপর তাকিয়ে রইলেন বিমল দাসের মুখের দিকে।

জখম হওয়ার পর থেকে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়েই ছিলেন। আগের সব কথা ঠিকমতো মনেও পড়ছিল না। হঠাৎ পুলিশ অফিসারের কথা শুনে কী যেন একটা ব্যাপার মনে ভেসে উঠতে লাগলো।

কী হলো, মনে পড়ছে কিছু? তমালবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু যেন অধৈর্য হয়ে ওঠেন বিমল দাস।

তমাল চোখ বুঁজে থাকেন, তারপর যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন, আমার ছেলে আগের দিন...

বিমল দাস কৌতূহলী হয়ে উঠে চেয়ারটাকে এগিয়ে নিয়ে আসেন।

কী বললেন? আগের দিন আপনার ছেলের সঙ্গে কিছু গোলমাল হয়েছিল? সেই বোমা ছুঁড়েছে বলে আপনার মনে হয়? কী নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল? সব খুলে বলুন তো মশাই!

পরপর প্রশ্নগুলো শুনে তমালবাবুর যেন ঘোর কেটে যায়। বলে ওঠেন, কী সব আজেবাজে বকছেন? আমার ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হতে যাবে কেন আর সেই বা বোমা ছুঁড়তে যাবে কেন? তার মাত্র তের বছর বয়স। ক্লাস সেভেনে পড়ে।

তবে যে আপনি বিড়বিড় করে বলছিলেন আপনার ছেলে আগের দিন...

সে অন্য একটা কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তাই। ছেলেদের সঙ্গে আমার কখনও ঝগড়া হয় না। আর তের বছরের ছেলে সাহিত্য সভায় ঢুকে বোমা মারবে, এ-কথাই আপনার মনে হলো কী করে?

বিমল দাস একটু চুপ করে থেকে বললেন, দেখুন লেখক মশাই, আমাদের চাকরিটাই বিশ্রী ধরনের। কোনো সম্ভাবনাই আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। সে যাই হোক, আমার আসল প্রশ্নটার উত্তর তো আমি পেলাম না।

আসল প্রশ্ন আবার কী?

ঐ যে সেদিন সাহিত্য সভায় আপনি ঐ বিশেষ চেয়ারটায় বসতে আপত্তি করেছিলেন কেন?

প্রশ্নটা শুনে আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন তমালবাবু। তারপর একটু যেন ঢোক গিলে বললেন, না না, আপত্তি করতে যাবো কেন? ঐ চেয়ারটা যেখানে ছিল তার ঠিক সামনেই টেবিলের উপরে দেখি ফুলের বিরাট তোড়া। ভাবছিলাম, ঐখানে বসলে আমিও লোক দেখতে পাবো না, লোকেরাও আমাকে দেখতে পাবে না...

ছবি ওঠার সময়েও ঢাকা পড়ে যেতে পারে আপনার মুখটা। তমালবাবুর বাক্যটা নিজেই সম্পূর্ণ করে দিলেন ইন্সপেক্টর বিমল দাস, তারপর জোরে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকেও। বলে গেলেন আবার আসবেন।

বিমল দাস হাসতে হাসতে চলে গেলেন, তমালবাবুর কিন্তু হাসি আসছিল না। পুলিশ ইন্সপেক্টরকে না হয় বানিয়ে একটা কিছু বলে দেওয়া গেল, কিন্তু অন্তুর কথাটা তিনি ভুলতে পারছেন না। অথচ সে কথাটা তো পুলিশকে বলাও যায় না। ঐটুকু ছেলেকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হতে পারে।

সাহিত্যসভায় সেদিন তমালবাবুর জন্য চেয়ার নির্দিষ্ট হয়েছিল ঠিক মন্ত্রীর পাশে। মঞ্চে ছিল পাঁচটি চেয়ার। বাঁদিক থেকে ধরলে প্রথমে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক জ্ঞানশঙ্কর, তারপর উপাচার্য অনিমেষ চৌধুরী, তমালবাবু, মন্ত্রীমশাই এবং একেবারে ডান দিকে হাইকোর্টের এক বিচারপতি।

মঞ্চ যিনি তদারকি করছিলেন সেই ভদ্রলোক তমালবাবুকে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন। তমালবাবুও বসতে যাচ্ছিলেন,

তারপর হঠাৎ ঐ ফুলের বিরাট তোড়াটার দিকে চোখ পড়তেই তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল অন্তুর কথাগুলো...

বাবা, তুমি কাল যে চেয়ারটায় বসবে তার সামনে টেবিলের উপরে দেখবে ফুলের একটা বিরাট তোড়া। তুমি চেয়ারটায় বসবে না, একটু দূরে বসবে, বুঝলে?

তমালবাবু তখন লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। সাধারণত লেখার সময় কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না। তবু অন্তু বোধহয় ব্যাপারটা জরুরি ভেবেই বলতে এসেছিল।

লেখা থেকে মুখ তুলে তমালবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন রে, ঐ চেয়ারটায় বসলে কী হবে?

না, তুমি বসবে না। তুমি একটু দূরে বসবে।

কেন বলবি তো? ওরা যেখানটায় বসতে বলবে সেখানেই তো বসতে হবে?

না, তুমি একটু দূরে বসবে। আমার ভয় করছে...

যা যা এখন, পরে দেখা যাবে। আমি লেখাটা সেরে নিই।

ছোট ছেলের কথায় তেমন আর আমল দেননি তমালবাবু। লেখা শেষ করার তাগাদা ছিল।

তবু সভায় পৌঁছে মনে পড়ে গিয়েছিল অন্তুর কথাটা। চেষ্টা করেছিলেন ফুলের তোড়ার কাছ থেকে একটু দূরে বসতে। কিন্তু সভার যাঁরা আয়োজন করেছিলেন তাঁদের কথাও তো শুনতে হবে। তাই নির্দিষ্ট চেয়ারটাতেই বসেছিলেন। আর যখন উদ্যোক্তাদের একজন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছেন তখনই তাঁর মনে হলো কী যেন একটা এসে পড়লো তাঁর উপর, বিকট শব্দ হলো...তারপর আর কিছু মনে নেই।

পুলিশ ইন্সপেক্টর বিমল দাস চলে যাওয়ার পর তমালবাবুর আবার মনে পড়ে গেল অন্তুর কথাটা। স্ত্রী এসেছিলেন তাঁকে একটা ওষুধ খাওয়াতে। তাঁকে বললেন, অন্তুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তো।

অন্তুর মা বললেন, ও তো এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। ফিরলে বলবো। কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথা বলবো ভাবছিলাম অন্তু সম্পর্কে।

কী কথা?

সেই সেদিনের সাহিত্যসভার পর থেকে কেমন যেন হয়ে আছে অন্তু। খুব বেশি কথা-টথা বলছে না। মাঝে মাঝে যেন ভয় পাচ্ছে।

কেন বলো তো?

তা তো ঠিক জানি না।

তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। সাহিত্যসভার আগের দিন অন্তু আমাকে বলেছিল, বাবা তুমি ফুলের তোড়ার সামনে বসবে না, আমার ভয় করছে...

অন্তুর মা অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? আমায় তো আগে বলোনি? কেন বলেছিল অন্তু ও কথা?

তা তখন আর আমি জিজ্ঞেস করিনি, লেখার তাড়া ছিল।

লেখার তাড়া তো তোমার সর্বদাই। এত বড় কথাটা তুমি আমাকে বললে না? আর অন্তু, যখন বলেছিল ঐ জায়গাটায় বসো না, তখন তুমি বসতে গেলে কেন? যদি না বসতে তা হলে তোমার গায়ে বোমাটা নিশ্চয়ই লাগতো না। কিন্তু আমি ভাবছি অন্তু ঐ কথাটা বললো কেন?

এই প্রশ্নের জবাব পাওয়ার জন্য অন্তুর অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইল না। স্কুল থেকে ফিরতেই তাকে বাবার কাছে নিয়ে এলেন মা।

তমালবাবু প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন স্কুল আর পড়াশোনার কথা। তারপর বললেন, অন্তু সেদিন তুই আমাকে কেন বলেছিলি ফুলের তোড়ার ঠিক সামনে না বসতে?

অন্তু চুপ করে রইল প্রশ্ন শুনে।

কী রে উত্তর দে। অন্তুর মা বললেন।

অন্তু থেমে থেমে বললো, আমার ভয় করছিল।

ভয় করছিল? কেন?

আমি যে দেখতে পাচ্ছিলুম...

কী দেখতে পাচ্ছিলি?

দেখতে পাচ্ছিলুম বাবার গায়ে কী একটা যেন এসে পড়ছে, বাবা চিৎকার করে উঠছে, রক্ত, চেঁচামেচি, গোলমাল...

কী করে দেখতে পেলি? দেখা যায় নাকি?

হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। তুমি চেয়ারে বসে আছ, সামনে ফুলের তোড়া...

আর কাকে দেখতে পেয়েছিলি? কৌতূহল বেড়ে যায় তমালবাবুর।

আরও লোক দেখেছিলুম। কিন্তু তাদের চিনি না। তোমাকে চিনতে পারছিলাম স্পষ্ট।

কই, সেদিন এত কথা তো আমাকে বলিসনি?

তুমি তো শুনলে না, আমায় চলে যেতে বললে। অন্তুর গলায় অনুযোগের সুর।

মা ওকে কাছে টেনে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি কোনো স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছিলি?

অন্তু বললে, স্বপ্ন নয়, আমি তখন টেবিলে বসে পড়ছিলুম। তখনই দেখতে পেয়েছিলুম।

তুই তাহলে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখিস? একটু হাসতে চেষ্টা করলেন তমালবাবু। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।

এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো। একটু পরে ঘরে ঢুকলেন বীরেশ্বর ঘোষ। তমালবাবুর বন্ধু। উনিও লেখক, তবে শখের। আসল পেশা ওকালতি। কিন্তু নানা বিষয়ে আগ্রহ। সেইসব বিষয়েই মাঝে মাঝে লেখেন পত্র-পত্রিকায়। বিয়ে-থা করেননি।

ঘরে ঢুকে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হে তমাল? তারপরে বাবা-মা-ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর যেন কী একটা মনে হলো। বললেন, কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমাদের? এনিথিং সিরিয়াস।

না, না, সিরিয়াস আবার কী। বসো, বসো। আমি তো একটু ভালোই আছি। তোমার খবর কী বলো।

চেয়ারে বসতে বসতে বীরেশ্বর বললেন, খবর তো এখন তুমি। লেখক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলে, এখন আবার বোমার আঘাতে খ্যাতিমান। কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে? পুলিশ হদিস করতে পারলে কিছু?

তমাল বললেন, হদিস করতে পারেনি নিশ্চয়ই। তাহলে কি আর আমাকে জেরা করতে আসতো? এসে যতো প্রশ্ন করছে আবোল-তাবোল।

বীরেশ্বরের কথার উত্তর দিতে-দিতেই একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল তমালের মনে। অন্তুর ঐ কথাটা কি বলবেন বীরেশ্বরকে? বলা কি উচিত হবে? অন্তু আবার ঝামেলায় পড়বে না তো? অবশ্য বীরেশ্বর তাঁর বহুদিনের বন্ধু। প্রায় ভাইয়েরই মতো। ওঁকে বোধহয় বলা যায়।

তবু দ্বিধা যেতে চায় না। অন্তুর মা যখন চা আনতে গেলেন তখন শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন কথাটা।

বীরেশ্বর সব শুনে একটা সিগারেট ধরালেন। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অন্তুকে কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এমন কি তুমি আরও কিছু দেখেছ কখনও?

আরও কিছু মানে? অন্তু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে।

এই যেমন ভবিষ্যতে কিছু ঘটবে, সেটা তুমি আগে থেকেই দেখে ফেললে?

অন্তু চুপ করে আছে দেখে বীরেশ্বর বললেন, ভয় কি। বল না?

অন্তু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, হ্যাঁ, আমি দেখতে পাই মাঝে মাঝে।

কী রকম দেখতে পাও?

আমি একদিন দেখতে পেয়েছিলুম বিলকু সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছে।

বিলকু আমার স্কুলের বন্ধু। ভালো নাম অনির্বাণ।

তুমি দেখতে পেয়েছিলে বিলকু ডুবে যাচ্ছে? বীরেশ্বরের চোখে কৌতূহল।

হ্যাঁ, আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আমি বলেছিলুম বিলকুকে, তুই আজ ডুবে যাবি। বিলকু শুনে আমায় ভেঙচেছিল। কিন্তু পরদিন স্কুলে গিয়ে শুনলুম বিলকু সত্যিই ডুবে গেছে।

অন্তুর মা এ-কথা শুনে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছুদিন আগে ওর এক বন্ধু লেকের জলে ডুবে গেছে বলেছিল বটে অন্তু। কিন্তু ও যে আগে থেকে দেখতে পেয়েছিল কিছু এমন কথা তো বলেনি।

এই কথা বলে অন্তুর মা ওর দিকে তাকালেন। অন্তু মায়ের কাছে এগিয়ে এসে বললো, ভয় করছিল, তাই বলিনি।

বীরেশ্বর বললেন, ঠিক আছে, ভয় তো পেতেই পারে। ওকে এখন নিয়ে যান এখান থেকে। পরে আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো।

অন্তু মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বীরেশ্বর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তমাল, ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু।

তমাল যেন কেমন ধাঁধায় পড়ে গেছেন। বীরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বুঝলে ব্যাপারটা? ও কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে?

না হে না, এটা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা নয়।

তবে এটা কী?

বলতে পারো ভবিষ্যৎ দর্শন। ভবিষ্যতের ঘটনা অনেকে দেখতে পায়।

তবে আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হতে চলেছে? সাহিত্য-স্রষ্টার পুত্র ভবিষ্যৎদ্রষ্টা! তমালের মুখে ফুটে উঠলো হাসি।

না হে না, হাসির ব্যাপার নয়। এমন 'কেস্' আগেও পাওয়া গেছে। হল্যান্ডের সেই জেরার্ড ক্রয়সেটের গল্প শোননি?

গল্প? গল্প শুনে লাভ কী?

না হে না, গল্প নয়। একেবারে সত্যি ঘটনা। বছর কুড়ি-বাইশ আগে অবধিও বেঁচে ছিলেন ভদ্রলোক। তিনি এমনিভাবেই দেখতে পেতেন ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে। বহুক্ষেত্রেই মিলে গেছে একেবারে হুবহু।

তমাল যেন এবার একটু আগ্রহী হয়ে উঠেছেন মনে হলো। বললেন, তাই নাকি?

বীরেশ্বর বললেন, হ্যাঁ, নানা মামলায় পুলিশকেও সাহায্য করেছেন। সব সময়েই যে সফল হয়েছেন তা নয়, তবে অনেক সময়ে পুলিশকে যুগিয়েছেন দামী সূত্র। বিশেষ করে হারানো মানুষ খুঁজে বার করার ব্যাপারে তাঁর ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা।

কেমন করে হলো সেই ক্ষমতা?

সেটাই তো জানা কঠিন। ইউট্রেখট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক, উইলিয়াম টেনাহ্যাফ নাম বোধহয়, ক্রয়সেটকে অনেকদিন ধরে নজরে রেখেছেন, পরীক্ষা করেছেন তাঁকে। তাঁর সেই গবেষণার ফলাফল তিনি লিখেও রেখেছেন। সেইসব কাগজপত্র রয়েছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই।

তমাল চুপ করে শুনছিলেন। তিনি লেখক মানুষ। বিচিত্র কোনোকিছুর কথা শুনলেই তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে তাঁর নিজের ছেলে যদি এমন একটা ক্ষমতার অধিকারী হয় তবে তো তাঁর আগ্রহী হয়ে ওঠারই কথা।

বীরেশ্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তমাল, অন্তুকে এ ব্যাপারে এখন আর কিছু বলো না। আমি পরশু এসে ওর সঙ্গে কথা বলবো।

পরশু মানে রবিবার। তমাল তো এখন শয্যাবন্দি। রোজই ছুটি। কিন্তু বীরেশ্বর ব্যস্ত আইনজীবী। রবিবারে হাতে খানিকটা সময় পাবেন। সেদিন আসবেন।

এলেনও তাই। এসেই ডেকে পাঠালেন অন্তুকে। তমালকে বললেন, তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি একটু আলাদাভাবে কথা বলবো অন্তুর সঙ্গে।

তমাল বললেন, নিশ্চয়ই। তুমি ওকে নিয়ে ওর পড়ার ঘরে চলে যাও।

অন্তুর পড়ার ঘরটা বেশ সাজানো। নানা রকম ছবি দেওয়ালে। ওর আরও ছোট বয়সের কিছু খেলনা। ব্যাট বল।

বীরেশ্বর বললেন, অন্তু, তুমি যে বলছ তুমি আগে থেকেই দেখতে পাও কী ঘটবে, তা তুমি ঠিক কীভাবে দেখতে পাও এই সব ঘটনা?

অন্তু কখনও বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে এইভাবে একা একা কথা বলেনি। তাই ওর একটু ভয় ভয় করছিল।

বীরেশ্বর বললেন, ভয় নেই অন্তু, আমায় বলো না?

অন্তুর গলা যেন কাঁপতে লাগলো। বললে, কাকু আমি ঠিক জানি না। যখন আমি দেখতে পাই তখন দেখি কিছু দূরে চোখের সামনে কী যেন গুঁড়ো গুঁড়ো ভাসছে। সেই গুঁড়োগুলো আস্তে আস্তে লাইনের মতো হয়ে ওঠে, তারপর মানুষের মতো দেখতে হয়, ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া...

প্রায়ই কি দেখো?

না, মাঝে মাঝে দেখি।

শুধু কি খারাপ জিনিসই দেখো!—এই যেমন বোমা ফাটছে, কিংবা কেউ ডুবে যাচ্ছে?

না, শুধু খারাপ কেন, ভালো জিনিসও দেখি।

যেমন? জানতে চান বীরেশ্বর।

গত পুজোর ছুটিতে আমি গিয়েছিলুম ছোটপিসির বাড়ি মহিষাদলে। সেখানে একদিন ছোটপিসির মেয়ে রুমকি হারিয়ে গেল। বাড়িতে হৈচৈ। আমি পিসিকে বললাম, ভয় নেই, আমি দেখতে পাচ্ছি রুমকি এখন একটা মাঠের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পিসির বাড়ির পিছনে একটা বাগান, তার পিছনে একটা মস্ত মাঠ। সেই মাঠ দিয়ে ছুটতে ছুটতে রুমকি ঢুকে পড়েছে একটা চালাঘরের মধ্যে। আর সেখানে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারপর সেখানেই কি পাওয়া গেল রুমকিকে?

অন্তু মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা-বাবা শুনেছেন এই গল্প?

না বোধহয়। পিসি তো পুজোর পর আসেনি আমাদের বাড়িতে। পিসেমশাইয়ের ভাই আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

অন্তুকে নিয়ে তমালের ঘরে ফিরে এলেন বীরেশ্বর। তারপর অন্তুকে বললেন, তুমি এখন যাও।

অন্তু বেরিয়ে গেলে বীরেশ্বর বললেন, সেদিন তুমি ওর কথাটায় আরও একটু বেশি গুরুত্ব দিলে পারতে।

তমাল মুখে একটু হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, কী করে বুঝব বলো? আমি ভেবেছি ওটা অন্তুর কোনো ছেলেমানুষি। সে যাক, আমি এখন ভাবছি, এই ব্যাপারটা পুলিশে জানাবো কিনা? তোমার ওকালতি বুদ্ধি কী বলে?

বীরেশ্বর বললেন, না না, এখনই কিছু জানাবার দরকার নেই। আমাকে ভাবতে দাও একটু।

তা তুমি ভাবো। কিন্তু সেদিন সভায় বোমাটা কে ছুঁড়লো আর কেন ছুঁড়লো সেটা তো জানা দরকার?

কাগজে যতদূর বেরিয়েছে, খুব সম্ভব কিছু উগ্রপন্থী ঐ মন্ত্রীমশাইকে তাক করে বোমা ছুঁড়েছিল। উগ্রপন্থীদের ওঁর ওপর বিশেষ রাগ আছে শোনা যাচ্ছে। একসময় উনি নাকি খুব উগ্রপন্থীদের পিটিয়েছিলেন।

এই কথা বলতে বলতে বীরেশ্বর হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর বললেন, কিছু মনে করো না তমাল, আমি অন্তুকে আর একটু বিরক্ত করবো। ওকে একবার ডাকি।

বীরেশ্বরই অন্তু বলে ডাকলেন। অন্তু এলে তাকে নিয়ে গেলেন আবার পড়ার ঘরে। তারপর কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা অন্তু, সেদিন তুমি দেখলে তোমার বাবা ফুলের তোড়ার সামনে বসে আছেন, তারপর কী যেন একটা এসে পড়লো, রক্ত, গোলমাল, হৈ-চৈ...তাই তো?

হ্যাঁ। অন্তু নিচু গলায় জবাব দিলে।

কিন্তু অন্তু, একটা কথা বলো তো?

কী কথা?

তুমি যখন এত কিছু দেখলে তখন বোমাটা কে ছুঁড়লো সেটা কি দেখতে পাওনি?

না কাকু, সেটা আমি দেখতে পাইনি।

কেন? কেন দেখতে পেলে না? বীরেশ্বর যেন বেশ একটু জোর গলাতেই প্রশ্ন করলেন।

কেমন যেন একটু ভয় পেয়ে গেল অন্তু বীরেশ্বরের গলার স্বরে। চুপ করে রইলো।

বলো, অন্তু বলো। মনে করতে চেষ্টা করো।

আমি পারবো না কাকু।

কেন পারবে না? চেষ্টা করো অন্তু।

না, কাকু পারবো না। যে ছুঁড়েছিল বোমাটা তাকে নিশ্চয়ই আমি আগে কখনও দেখিনি।

তাতে কী হয়েছে। যা ঘটেনি তা তো তুমি দেখতে পাও?

হ্যাঁ, তা পাই। কিন্তু যাকে আমি কখনও দেখিনি তাকে এইভাবে দেখতে পাই না। সেদিনের সভায় আমি শুধু বাবাকে দেখতে পেয়েছিলুম, আর কাউকে দেখতে পাইনি।

বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তুমি তো কোনোদিন রবীন্দ্র সদনে যাওনি। ঐ জায়গাটা তুমি দেখতে পেলে কী করে?

অন্তু আবার একটু চুপ করে রইলো।

বীরেশ্বর বললেন, বলো অন্তু?

হ্যাঁ কাকু, যাকে আগে কখনও দেখিনি তাকে আমি এইভাবে দেখতে পাই না, কিন্তু যেখানে আমি কখনও যাইনি সেই জায়গাটা কিন্তু দেখতে পাই।

যেমন?

যেমন পিসির মেয়ে রুমকি যে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল সেই মাঠটা আমি কখনও দেখিনি, সে যে চালাঘরটার মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেটাও আমি আগে কখনও...

বলতে বলতে কথা যেন আটকে গেল অন্তুর। সামনের দিকে সে চেয়ে রইলো শূন্য দৃষ্টিতে...

কী হলো অন্তু? বীরেশ্বর এগিয়ে এলেন অন্তুর দিকে।

অন্তু যেন ঘোরের মাথায় বলে যেতে লাগলো, কাকু, আবার চোখের সামনে সেইরকম দেখতে পাচ্ছি। কী যেন গুঁড়ো গুঁড়ো ভাসছে...সেই গুঁড়ো আস্তে আস্তে লাইনের মতো হয়ে উঠছে...তুমি, আমি, মা, বাবা, দাদা...কতো দূরে... অনেক দূরে...শুধু জল...সামনে শুধু জল...আমরা একটা লঞ্চে উঠছি...জল পেরিয়ে যাচ্ছি...ডাঙা...পাহাড়...কাকু, আমরা কোথায় যাচ্ছি...

বলতে বলতে অন্তু সরে এলো বীরেশ্বরের কাছে। বীরেশ্বর ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে অন্তু, ঠিক আছে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? চলো, তোমার বাবার কাছে যাই।

বীরেশ্বর অন্তুর হাত ধরে নিয়ে এলেন, তমাল যে ঘরে শুয়েছিলেন সেখানে। তমাল ওদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, বীরেশ্বর, কী কথা হলো তোমাদের দু'জনের?

বীরেশ্বর বললেন, সে অনেক কথা, পরে তোমায় বলবো, আজ আমি পালাই।

তমাল বললেন, পালাবে কেন? এখানেই দুটি ঝোলভাত খেয়ে যাও না। তোমার সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্র করার আছে।

ষড়যন্ত্র? আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, বীরেশ্বর। কন্যাকুমারীটা আমার এতদিনেও যাওয়া হয়নি। কন্যাকুমারী, সমুদ্র, বিবেকানন্দ রক। ভাবছি শরীরটা একটু সামলে উঠলে বেরিয়ে পড়বো। পুরস্কার বাবদ কিছু টাকা তো পাওয়া গেছে। তুমি যাবে নাকি?

তমালের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বীরেশ্বর চেয়ে দেখলেন অন্তুর দিকে। বীরেশ্বরের চোখে চোখ পড়তে মুখটা নিচে নামিয়ে নিল অন্তু।

বীরেশ্বর হেসে বললেন, যাবো মানে? আমরা তো চলেই গেছি... জল...শুধু জল...আমরা একটা লঞ্চে উঠছি...

তমাল একটু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার হে বীরেশ্বর, তুমিও আমার পুত্রের মতো ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে উঠলে নাকি!

ছবি: প্রণবকুমার হাজরা

রাজার সঙ্গে

প্রসূন ব্যানার্জী

আজ তোমাদের এক রাজার গল্প শোনাব। এ রাজা কিন্তু কোনো দেশের রাজা নন, ইনি ফুটবলের রাজা। তাঁর নাম কি জানো? এডসন ডি নাসিমেন্টো। চিনতে পারলে না তো? আসলে ঐ নামে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারবে না। কিন্তু যদি তাঁর ডাকনামটা বলি তাহলে সারা পৃথিবীর ছোট বড়—সক্কলে এক নিমেষে চিনে নেবে। তিনি আর কেউ নন, বলের রাজা পেলে। তোমরা তো এখন টিভিতে বিশ্বের বড় বড় সব খেলোয়াড়দের খেলা হামেশাই দেখতে পাও। মারাদোনা, গুলিট, লিনেকার, ম্যাথাউস, আরও কত সব নাম-করা খেলোয়াড়ের খেলাই না তোমরা দেখছো, ওঁরা কেউ হয়তো মন্ত্রী, কেউ হয়তো সেনাপতি, কেউ বা উজীর—রাজা কিন্তু কেউ নন। রাজা ঐ একজনই—পেলে।

তা এই ফুটবলের রাজা একবার আমাদের দেশে এসেছিলেন। সেই ১৯৭৭ সালে। একটাই ম্যাচ খেলেছিলেন মোহনবাগানের সঙ্গে। পেলের দলের নাম ছিল কসমস। কলকাতায় আসার আগে জাপানে কসমস ৩-১ গোলে আর চীনে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল সেখানকার সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দল দুটিকে। এবার কসমস খেলবে কলকাতার ইডেন উদ্যানে মোহনবাগানের সঙ্গে। আমি তখন মোহনবাগানে খেলি। একটু-আধটু নামও হয়েছে। রাস্তাঘাটে আমাদের দেখলেই সকলে পেলের কথা জিজ্ঞেস করছেন। কিন্তু কি বলব তাঁদের? আসলে আমাদের মনেও যে ঝড় বইছে। রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলে যেমন বুকের মধ্যেটা গুড়গুড় করে তেমনি বলের রাজার মুখোমুখি হব, তাঁর সঙ্গে খেলব এই কথাটা ভাবতেই কেমন যেন ভয় ভয় করছে। আমরা জানতাম আমাদের জীবনে এ এক পরম পাওয়া।

যাই হোক, পেলে যেদিন এলেন সকলের সঙ্গে আমিও দমদম বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম তাঁকে রিসিভ করতে। প্লেন তিন ঘণ্টা লেট ছিল। বিমানবন্দরে হাজার হাজার মানুষ তখন পেলেকে একবার দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে। রাত দুটোর সময় এয়ার ইন্ডিয়ার বিশাল প্লেনটা ল্যান্ড করলো। আমরা তখন টারম্যাকে প্লেনের কাছে চলে গেছি। দেখলাম কিনগিয়া, আলবার্তো প্লেন থেকে নেমে আসছেন। নেমে এলেন অন্যরাও। আর সবশেষে হাসিমুখে বাইরে বেরিয়ে এসে হাত নাড়লেন পেলে। আমরা বিমানবন্দর থেকে পেলেকে নিয়ে যখন বেরোলাম তখন রাত প্রায় আড়াইটে। রাস্তার দুধারে তখন অনেক লোক। তারা শুধু একবার পেলেকে দেখতে চায়।

পরের দিনটা যে কি করে কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। ওদিকে টিকিটের জন্যে প্রচণ্ড হাহাকার চলছে কিন্তু আমরা কোথায় পাব টিকিট?

খেলার দিন সকাল থেকে ভীষণ টেনশান। পেলের বিরুদ্ধে খেলব কথাটা মনে হতেই কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। আমার চোখেমুখেও বোধহয় সেই ভাবটা ধরা পড়েছিল। তাই দেখে মা বললেন, ভয় পাচ্ছিস কেন? নিজের মতন খেলবি। মার কথা আমার কাছে বেদবাক্য। তাই মনে অনেক জোর পেলাম। আমরা তখন শিয়ালদার রেল কোয়ার্টারে থাকি। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ক্লাবে যাব বলে যখন বেরোলাম তখন দেখি রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক। সকলেই চলেছেন ইডেনের দিকে। মনে হলো এত লোককে জায়গা দিতে হলে কম করেও কুড়ি পঁচিশটা ইডেন গার্ডেন লাগবে। কোনওরকমে সেদিন মোহনবাগান তাঁবুতে পৌঁছেছিলাম। গিয়ে দেখা করলাম দাদার সঙ্গে। আমার দাদা পি কে ব্যানার্জী তখন মোহনবাগানের কোচ। আমায় দেখে দাদা বললেন, অত হাঁপাচ্ছিস কেন? যা, একটু রেস্ট নে। বেলা আড়াইটে নাগাদ আমরা ইডেনের পথ ধরলাম। সত্যি কথা বলতে কি ইডেন আর আমাদের ক্লাব তো রাস্তার এপার ওপার। কিন্তু ঐটুকু পথ পার হতেই সেদিন অনেক সময় লেগেছিল। আমাদের দেখে সকলে বলতে লাগলেন, বেশি গোল খাস না। ক্লাবের সম্মান তোদের হাতে।

ড্রেসিংরুমে আমরা ওয়ার্মআপ করছি আর ভাবছি পাশের ঘরেই পেলে আছেন। একটা ফুটো দিয়ে আমি পেলের ওয়ার্মআপ দেখার চেষ্টা করছিলাম। দেখতে পেয়ে দাদা খুব বকলেন। তারপরেই দাদা আমাদের তাঁর সেই বিখ্যাত 'ভোকাল টনিক' দিতে শুরু করলেন। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে আমরা তেতে উঠলাম। এরপরই আমরা বল নিয়ে নেমে পড়লাম মাঠে।

কর্দমাক্ত ইডেন, ভীষণ পিছল। আমাদেরই দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। ওদিকে যে তখন আর এক কাণ্ড হয়ে গেছে আমরা তার বিন্দুবিসর্গও জানি না। আসলে পেলের দুটো পা-ই অনেক টাকায় বীমা করা ছিল। পেলে যেখানেই খেলতে যেতেন বীমা কোম্পানির একজন অফিসার তাঁর পেছনে পেছনে যেতেন। ইডেনের অবস্থা দেখে ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন। তিনি পেলেকে গিয়ে বললেন, এই মাঠে তুমি খেলতে পারবে না। পেলে নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন, হাজার হাজার ফুটবল-অনুরাগী আমার খেলা দেখতে এসেছেন। এ দেশের মানুষ ফুটবল খেলাকে এত ভালোবাসে! আর আমি তোমাদের ঐ সামান্য কটা ডলারের জন্যে খেলব না? তা কি হতে পারে? ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, এই মাঠে খেলে তুমি যদি চোট পাও তাহলে কিন্তু আমার কোম্পানি একটা পয়সাও দেবে না। পেলে আর কথা বাড়ালেন না। নেমে পড়লেন মাঠে।

পেলে খেললেনও, ঐ মাঠে তাঁর পক্ষে যতটা খেলা সম্ভব ততটাই। একবার ওয়ান ইনটু ওয়ান-এ আমাদের গোলরক্ষক শিবাজী ব্যানার্জীকে পেলেন। গোলের চান্স ছিল ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। শিবাজী ঝাঁপিয়ে পড়ল বলটা ধরার জন্যে। পেলে পা চালালে গোল পেতেন। কিন্তু তা না করে তিনি শিবাজীকে টপকে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের শিক্ষা দিলেন যে কাউকে আঘাত করার নাম ফুটবল নয়। মানুষকে আনন্দ দেওয়াই ফুটবল খেলার ধর্ম। যাই হোক, কসমসের সঙ্গে আমরা লড়তে লাগলাম সমানে সমান তালে। আমরা এগিয়ে গেলাম ২-১ গোলে। হাবিব আর শ্যাম থাপা গোল দুটো করেছিল। এমন সময় কসমস একটা পেনাল্টি পেল। ওটা পেনাল্টি হতেই পারে না। আমরা রেফারিকে সে কথা বললাম। হঠাৎ পেলে এসে আমাদের বললেন, ইউ হ্যাভ ওয়ান। দিস ইজ নো পেনাল্টি। বাট দিস ইজ অ্যান এগজিবিশন ম্যাচ। সো...। রাজার মুখের ওপর কথা বলা চলে না। তাই আমরাও চুপ করে গেলাম। পেনাল্টি থেকে কসমস গোলটা শোধ করে দিল। খেলাও শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে।

খেলার পর আমি আর গৌতম সরকার পেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। পেলের একজন সিকিউরিটি গার্ড এসেছিল। বিরাট চেহারা তার। হাতে পিস্তল। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই আমাদের ঘরে ঢুকতে দেবে না। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন পেলে। আমাদের দিকে একপলক তাকিয়েই বললেন, ইউ আর নাম্বার সেভেন অ্যান্ড নাম্বার ফোরটিন। কাম উইথ মি। আমাদের দুজনকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ওঁর সঙ্গে ফুটবল খেলা নিয়ে অনেক কথা হলো। চলে আসার আগে আমরা ওঁর অটোগ্রাফ চাইলাম। উনি একটা সাদা কাগজে সই করে আমাদের দিলেন। আমি বললাম, আরও ভালো করে লিখে দিন। উনি ওঁর ছাপানো কার্ডে বড় বড় করে নাম সই করে আমাদের হাতে দিলেন। দুঃখের কথা কি জানো সেদিন রাত্তিরেই মোহনবাগান ক্লাবের ডিনারে সেই অমূল্য কার্ডটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। এ দুঃখ আমার কোনোদিনই যাবে না। তবে ওঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে অনেকগুলো ছবি তুলেছিলাম। সেগুলো আছে। এই যা রক্ষে।

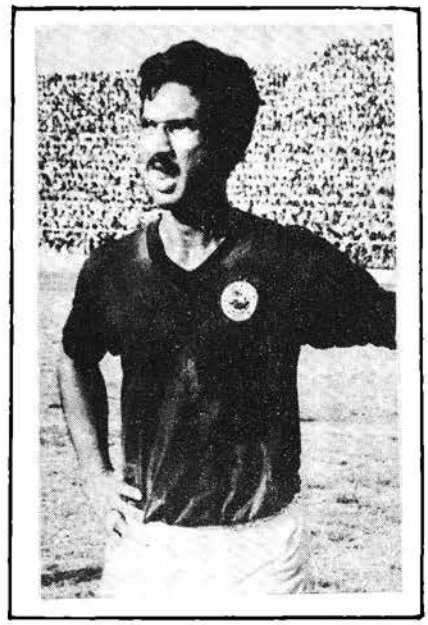

খেলতে খেলতে

গৌতম সরকার

আমরা তখন উত্তর কলকাতার বরানগরে থাকি। পাড়ার আর পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে আমিও বলের পেছনে ছুটতাম। রবারের বল—অনেক সময় সে বলও ফুটো হয়ে যেত। তখন বাতাবি লেবুর মরশুম হলে এবাড়ি বা ওবাড়ি থেকে লেবু পেড়ে আনতাম। তারপর তাই দিয়েই চলত আমাদের মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ। সে যে কী উৎসাহ, সে যে কী উদ্দীপনা তা লিখে বোঝাতে পারব না। ঐ খেলায় গোল দিয়ে যে শিহরন অনুভব করেছি পরে বড় বড় ম্যাচে দারুণ খেলেও তা করিনি। আমি জানি তোমাদেরও ঠিক তাই-ই হয়। তবে আজকাল সুযোগ সুবিধে অবশ্য অনেক বেশি। তাই হয়তো তোমাদের আর লেবুর বল নিয়ে খেলতে হয় না। যাই হোক, পাড়ার গলিতে আর বাড়ির সামনের ছোট্ট মাঠটায় দিব্যি দিন কেটে যাচ্ছিল। বাড়িতে অবশ্য বাবা-মার কড়া শাসন। বই নিয়ে বসতেই হতো। তা পড়তাম। বাড়ির কাছেই রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলাম। মহারাজদের চোখ আমার মতন দুষ্টু ছেলেদের ওপরে একটু বেশিই থাকত। তাই ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। বাড়িতে বাবা, স্কুলে মহারাজরা ঘাড় ধরে পড়িয়ে নিতেন। এইরকমই এক দিন পাড়ার মাঠে খেলছি, খেলার সময় তো আমাদের জ্ঞান-টান থাকে না, তাই খেয়ালই করিনি অনিলদা দাঁড়িয়ে আছেন মাঠের পাশে। পুরো নাম অনিল ভাদুড়ী, ফুটবল ছাড়া আর কিছুই জানতেন না অনিলদা। খেলার পর আমায় ডেকে বললেন, কাল বিকেলে তুই আমার সঙ্গে দেখা করিস। পরদিন স্কুল থেকে ফিরে রবারের বলটা নিয়ে মাঠের দিকে ছুটতে ছুটতেই মনে পড়ল অনিলদার কথা। বলটা এক বন্ধুকে দিয়ে আমি গিয়ে হাজির হলাম অনিলদার

বাড়ি। তারপর ওঁর হাত ধরে বরানগর স্পোর্টিং ক্লাবে।

সেখানে আমার খেলা দেখে ওঁরা আমাকে দলে নিয়ে নিলেন। কিন্তু এখানে আমি খেলব কি করে? আমার তো বুট নেই! আমাদের পাড়ার বৃদ্ধ ফুটবলরসিক রাজেন কাপুর পকেট থেকে পনেরো টাকা দিয়ে বললেন, যা, একটা বুট কিনে নিয়ে আয়। তখন আর আমায় পায় কে। কিন্তু বুট পরে প্রথমদিকে খেলতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। তারপরই সব ঠিক হয়ে গেল। বরানগর ক্লাবে-আমি বছর খানেক খেলেছিলাম। তারপর বীরেন দাস আমায় নিয়ে গেলেন জোড়াবাগান ক্লাবে। এই সময় হিন্দুস্থান ব্যায়ামাগারের ডাকে দমদম এয়ার পোর্ট মাঠে খেলতে গেলাম, নামকরা সব খেলোয়াড়ে ঠাসা একটি শক্তিশালী ক্লাবের বিরুদ্ধে। সেই দলের ক্যাপটেন ছিলেন নামকরা খেলোয়াড় অসীম মৌলিক। ঐ ম্যাচটাই আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। সেদিন খেলা দেখতে এসেছিলেন অমল সেনগুপ্ত। তিনি আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে ইস্টার্ন রেলে সই করালেন। সেই আমার প্রথম ডিভিশনে খেলার হাতেখড়ি। রেল দলের কোচের কাছে ফুটবল খেলার তালিম নিতে নিতে ডাক পেলাম জুনিয়ার বেঙ্গলের ট্রায়ালে। এখানে এসে আমি একজন সত্যিকারের ভালো বন্ধু পেলাম। সেই বন্ধুটির নাম কী জানো? সে আর কেউ নয়, তার নাম সুধীর কর্মকার।

ওদিকে দেখতে দেখতে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষায় পাশ করে ভর্তি হলাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সালে ইস্টার্ন রেল ছেড়ে এলাম খিদিরপুরে। সেখানে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে আমার নবজন্ম হলো। আমাদের স্যার অচ্যুৎ ব্যানার্জী বদলে দিলেন আমার জীবনের মোড়। হাতে করে তৈরি করলেন আমাকে। সেবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমি খুব ভাল খেলেছিলাম। স্যার বলেছিলেন, এবার দেখবি বড় ক্লাবগুলো তোকে নিয়ে টানাটানি করবে। কিন্তু পরের বছর কেউ আমায় ডাকল না। স্যার বললেন, মন খারাপ করছিস কেন? সবুরে মেওয়া ফলে। আর এক বছর যখন সুযোগ পেলি তখন জানপ্রাণ দিয়ে খিদিরপুরের জন্যে লড়ে যা। করলামও তাই, ফলও পেলাম হাতে হাতে। পরের বছর ডাক এল ইস্টবেঙ্গলের কাছ থেকে। প্রদীপদা—পি কে ব্যানার্জী ইস্টবেঙ্গলের কোচ। তাঁর নেতৃত্বে লাল হলুদ জার্সি গায়ে দিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিলাম। এরই মধ্যে কখন যে নামকরা খেলোয়াড় হয়ে গেছি তা বুঝতেও পারিনি। পরে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে যখন মোহনবাগানে এলাম তখন সেখানে পেলাম আর এক ধরনের উত্তেজনা। সবুজ মেরুন জার্সির আকর্ষণই আলাদা। এর দাম যে কত বেশি তা বুঝেছিলাম যেদিন প্রথম এই জার্সি গায়ে দিলাম। সমস্ত শরীরে শিহরন বয়ে গেল। মনে পড়ল ১৯১১ সালে এই জার্সি গায়ে দিয়েই এগারো জন বীর বাঙালী ব্রিটিশ ফৌজী দল ইস্টইয়র্ককে হারিয়ে আই এফ এ শীল্ড জয় করেছিল।

১৯৭২ থেকে ১৯৮৫, দীর্ঘ এই তেরো বছর ধরে কলকাতা ময়দানের বড় দুই দলে খেলার সময় বাংলার অধিনায়ক হিসেবে জিতে এনেছি সন্তোষ ট্রফি। আবার কখনো ভারতের হয়ে খেলতে গেছি তেহেরানের এশিয়ান গেমসে, মারডেকা ফুটবলে কিংবা অন্য কোনো প্রতিযোগিতায়। সত্তরের দশকটা ছিল ভারতীয় ফুটবলের সোনালী সময়। এই সময় শ্যাম থাপা, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুধীর কর্মকার, পিন্টু চৌধুরী, প্রসূন ব্যানার্জী, মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, হাবিবদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়েছি। খেলেছি মজিদ বাসকারের মতন দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে। আর কোচ হিসেবে যাঁদের পেয়েছি তাঁরাও কোনোদিক দিয়ে কম ছিলেন না। অচ্যুৎ ব্যানার্জী, বাঘা সোম, প্রদীপ ব্যানার্জীর মতো কোচদের কাছে খেলা শেখার সুযোগ পাবার সৌভাগ্য খুব কম খেলোয়াড়ের জীবনেই আসে। এ ছাড়া বিশ্বের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়কেও খুব কাছ থেকে দেখেছি। এঁদের মধ্যে আছেন পেলে, ইউসোবিও, ববি চার্লটন এবং ববি মূরের মতন ডাকসাইটে খেলোয়াড়রা।

থাক এ সব কথা। আমার মতন তোমরা যারা ছোটবেলায় রবারের বল কিংবা বাতাবি লেবু নিয়ে খেলছ তাদের শুধু একটা কথাই বলব, খেলা আর পড়াশুনো পাশাপাশি চালিয়ে যাও। দেখবে সফল একদিন না একদিন হবেই।

আনন্দই ভবিষ্যতের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন

দিব্যেন্দু বড়ুয়া

আজকাল আমাকে হামেশাই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ছোট বড় সকলেই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, দাবা খেলায় পরবর্তী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন কে? আমি সকলকেই একটি নাম বলি, বলি আমার বন্ধু বিশ্বনাথন আনন্দই পরবর্তী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। আমার কথা শুনে প্রায় সকলেই খুব অবাক হন। তা অবাক হবার কথাই বটে। হাজার হলেও ভারতের একটি ছেলে এবং অত অল্প বয়সে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবার পথে এগিয়ে চলেছে এই কথাটা আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্বাস করতে চান না। শুধু আমি কেন, বিশ্বের যে কোনো দেশের নামকরা কোনো দাবা খেলোয়াড়কে জিজ্ঞেস করলে

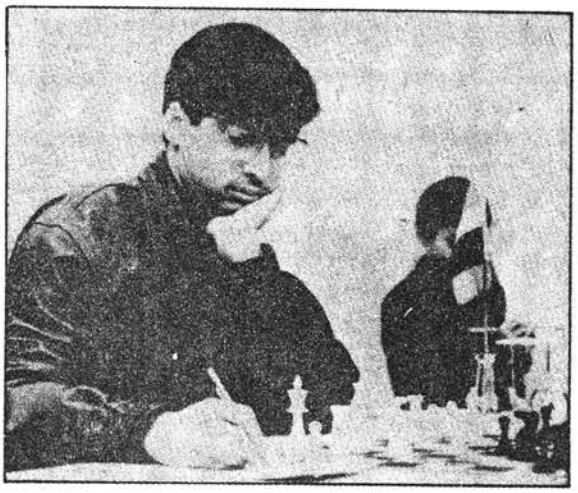

তিনি কিন্তু আনন্দর নামই বলবেন। আসলে গ্যারী কাসপারভের পর বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হিসেবে যে ক'জনের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে সবথেকে এগিয়ে আছে আমার এই প্রিয় বন্ধুটিই। আমেরিকার গাটা কামস্কি, ইউক্রেনের ইভানোচুক আর রাশিয়ার ক্রামনিকের স্থান আনন্দর ঠিক পেছনে। অবশ্য পশ্চিমের এক দাবাড়ু নাইজেল শর্ট সম্প্রতি চ্যালেঞ্জার হিসেবে শিরোনামে উঠে এসেছেন। তবে আমরা যারা দাবা খেলি, তারা ভালোভাবেই জানি যে শর্ট খেলোয়াড় হিসেবে তেমন প্রতিভাবান নন। তাই কাসপারভ সহজেই শর্টের বিরুদ্ধে জিতে যাবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় অনেকগুলো নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আলাদা আলাদা ক্রীড়া-কাঠামো এখনও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে শর্ট তাঁর রুশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছেন। কাসপারভকে খেতাবচ্যুত করার নানারকম চেষ্টাই তো চলছে। কিন্তু সারা বিশ্ব জানে কাসপারভ কত বড় খেলোয়াড়! এখন দাবার খেতাবী লড়াইকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট গোলমাল হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে কেউ জানে না। আমার খারাপ লাগছে শর্টের কথা ভেবে। বেচারা অনেক কষ্ট করে ফাইনালে উঠেছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী হয়।

এ বছর অবশ্য দাবার দুনিয়ায় খুব হৈচৈ হয়েছিল ববি ফিশারের ফিরে আসা আর প্যাসকির সঙ্গে তার লড়াইটিকে কেন্দ্র করে। ফিশারের ফিরে আসাটা নিঃসন্দেহে দারুণ ব্যাপার, কারণ আজ দাবা খেলা যে এত জনপ্রিয় তার পেছনে ফিশারের অবদান ভুলে যাবার নয়। সত্তরের দশকে দাবা খেলা সাংঘাতিকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল ফিশার আর প্যাসকির খেতাবী লড়াইকে কেন্দ্র করে। দাবা জগতে ববি ফিশারই প্রথম পশ্চিমী দাবাড়ু, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য ভেঙে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ৬-০, ৬-০ স্কোরে কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমি-ফাইনালে জেতা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। ফিশারের পর আর কেউ তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেননি। আসলে অত আক্রমণাত্মক খেলা সত্যিই বিস্ময়কর। তাই বিশ্বের যে কোনো দাবাড়ুর কাছে ফিশারই সবচেয়ে প্রিয় খেলোয়াড়। আজ হয়তো কাসপারভ কিংবা বিশ্বের প্রথম কুড়ি জন দাবাড়ু অতি সহজেই ফিশারকে হারিয়ে দেবেন। তাই বলে ফিশারের প্রতিভাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আজকের দাবা কম্পিউটারাইজড গেম। দাবা খেলায় গ্রুপ ওয়ার্ক বা সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। তাই দীর্ঘদিন খেলার বাইরে থাকায় ফিশারের পক্ষে আজকের সামনের সারির দাবাড়ুদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হবে না।

এই যে গ্রুপ ওয়ার্কের কথা বলছি, এই একটা জায়গাতেই আনন্দ কাসপারভের চেয়ে পিছিয়ে। আজকের দিনে গ্রুপ ওয়ার্ক ছাড়া বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হওয়া খুবই কষ্টকর। কারণ খেলোয়াড়কেই যদি প্রতিপক্ষের ভুল আবিষ্কার করতে হয়, পরের দিনের খেলার জন্যে নীতি নির্ধারণ করতে হয় এবং অমীমাংসিত খেলার জন্যে রাত্তিরবেলা ভাবনাচিন্তা করতে হয় তাহলে খেলোয়াড়টি সত্যিই ভীষণ মুশকিলে পড়ে যায়। খেলোয়াড়টি তখন যেমন মানসিক বিশ্রাম নিতে পারবে না, তেমনি পারবে না পরের দিনের খেলার প্রস্তুতি নিতে। এই জন্যই দরকার সহায়ক একজন গ্র্যান্ডমাস্টার আর অন্যসব কাজের জন্য লোকজন, যারা একসঙ্গে খেতাবী লড়াইয়ে ব্যস্ত দাবাড়ুকে সাহায্য করবে। রাশিয়া বা অন্য দেশের খেলোয়াড়রা এই সুবিধাটা খুব ভালোভাবে পান। আনন্দ কিন্তু এ থেকে বঞ্চিত। আসলে এই সহায়ক দল রাখতে গেলে যে বিশাল পরিমাণ টাকার দরকার তা একা ওর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

আজ অবধি সে ভালো স্পনসারও পায়নি। অনেকের ধারণা আনন্দ দাবা খেলে অনেক টাকাই রোজগার করে। যত টাকাই সে রোজগার করুক না কেন, সহায়ক দল রাখার পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। আজকাল এই সহায়ক দল ছাড়া চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করা খুবই কঠিন। এই একটি বিষয় ছাড়া আনন্দ কিন্তু অন্য সবদিক দিয়ে তার সমসাময়িক খেলোয়াড়দের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কাসপারভ, ইভানোচুক, কামস্কির সঙ্গে তার যতবার খেলা হয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ সময়েই কিন্তু আনন্দ জিতেছে। ফলে একদিকে যেমন আনন্দের রেকর্ড এঁদের তুলনায় ভাল, তেমনি মানসিক দিক দিয়েও সে এঁদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।

এ ছাড়া আনন্দ অন্য সব দেশের খেলোয়াড়দের মতো ছকে বাঁধা খেলা খেলতে একদম ভালোবাসে না। তার খেলায় বৈচিত্র্য অনেক বেশি। উদ্ভাবনী শক্তির দিক দিয়েও সে অনেকের চেয়েই এগিয়ে। তাই এ মুহূর্তে সারা বিশ্বের সামনের সারির দাবাড়ুদের নজর আনন্দের ওপর।

১৯৯৬ সালে দাবার পরবর্তী বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। সেই প্রতিযোগিতায় আনন্দের সাফল্য নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে গবেষণা চলছে। এলোরেটিং ও অন্য সব টুর্নামেন্টের ফলাফলের দিক থেকেও আনন্দ এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা দাবাড়ু। কাসপারভের বিরুদ্ধে সুবিধেজনক অবস্থায় থেকেও হেরে গিয়েছিল সহায়ক দলের অভাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৯৬ সালে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না এবং আমার বন্ধু বিশ্বনাথন আনন্দ বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হবে। সবশেষে বাংলার কয়েকজন তরুণ প্রতিভার কথা বলছি। আমার মনে হয় সূর্যশেখর, নীলোৎপল, জয়দেব, শঙ্কর রায়, শুভ্রজিৎ, রক্তিম, অনিরুদ্ধরা দাবা খেলায় বাংলাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তবে তার জন্যে তাদের পরিশ্রম করতে হবে, ভাবতে হবে, অনুশীলন করে করে নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে।

খেলতে হলে

রাজু মুখার্জী

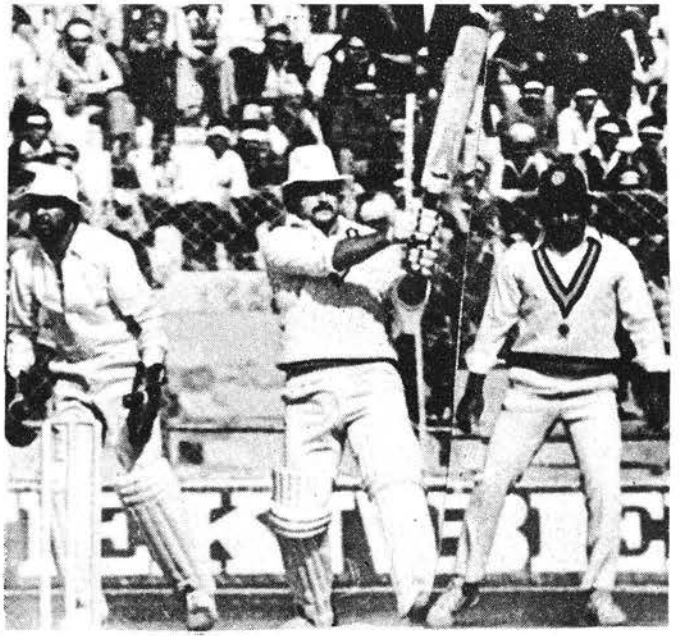

ক্রিকেট খেলা এখন দারুণ জনপ্রিয়। সুনীল গাভাসকার, কপিলদেবের পর এখন শচীন তেন্ডুলকার, বিনোদ কাম্বলি, অনিল কুম্বলেরা ছোটদের হার্ট থ্রব। আজ তাই ছোটদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা শেখার আগ্রহ অসম্ভব বেড়ে গেছে। স্কুলে স্কুলে খেলা শেখানোর হিড়িক পড়েছে। অবশ্য তার একটা কারণও আছে। সি এ বি-র স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলাগুলো আজকাল রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

গত পাঁচ বছর ধরে লক্ষ্য করছি, সারা কলকাতা জুড়ে ছোটদের ক্রিকেট খেলা শেখাবার শিবির বসছে। ছোটদের মধ্যেও খেলা শেখার ব্যাপারে এমন উৎসাহ উদ্দীপনা আগে দেখিনি। মনে হয়, এতে বাংলার ক্রিকেটের মঙ্গলই হবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একটা কথা বলতে হচ্ছে যাঁরা ছোটদের খেলা শেখাতে আসছেন তাঁদের বেশির ভাগেরই সে যোগ্যতা নেই। তাঁদের ক্রিকেট খেলার কলাকৌশল জানা থাকতে পারে, কিন্তু একটি ছোট ছেলেকে খেলা শেখাতে গেলে যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা, যে ক্রিকেট সেন্স থাকার দরকার তা নেই। ফলে তাঁদের পক্ষে সত্যিকারের ভালো খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করা এবং তাদের দরকার মতো তালিম দেওয়া সম্ভব হয় না। এতে মঙ্গলের বদলে কিন্তু অমঙ্গলই হয় বেশি।

আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি এবার। আমি নিজে এখন এই রাজ্যের অনূর্ধ্ব ষোল বছর বয়স্ক খেলোয়াড়দের কোচ। আমার কোচিং সেন্টারে সারা বাংলার উঠতি খেলোয়াড়রা আসে। তাদের অবশ্য ট্রায়াল ম্যাচ খেলতে হয়। আমি অবাক হয়ে দেখেছি এদের বেশির ভাগেরই ক্রিকেট খেলার আইন-কানুনের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই। এজন্যে অবশ্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তাদের কোচরা কখনও ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেননি বা আলোচনা করেননি। ফলে এই ব্যাপারে তারা অন্ধকারেই রয়ে গেছে। সম্প্রতি আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ক্রিকেট কোচকে দেখেছি যিনি নো-বল আইনটাই ভালো করে জানেন না। আমরা যারা ছোটদের হাতে করে গড়ে পিটে নেব, তারাই যদি এই সব ব্যাপারে অজ্ঞ হই, তাহলে ছোটরা আমাদের কাছ থেকে কী শিখবে?

আজকাল ক্রিকেট খেলা আর শুধু খেলা নয়। যুগের সঙ্গে তাল দিয়ে এই খেলার খোল-নলচে বদলে গেছে। এখনকার ভারতীয় ক্রিকেট দলে রমাকান্ত আরচেকারের ছাত্র শচীন তেন্ডুলকার, বিনোদ কাম্বলি, প্রবীণ আমরে-রা চুটিয়ে খেলছে। আরচেকার মস্ত বড় কোচ। তাঁর খেলা শেখানোর ধরনটাই আলাদা। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের দিকটাতেও তিনি প্রচণ্ড জোর দেন। একটি ছেলে হয়তো শারীরিক দিক দিয়ে খুবই সক্ষম, কিন্তু মানসিক ক্ষেত্রে সে হয়তো খুবই দুর্বল। কোচের দায়িত্ব তাঁর ছাত্রের এই দুর্বলতা সমূলে উৎপাটন করা। দুর্বল মন নিয়ে আর যাই হোক খেলাধূলা করা যায় না। ক্রিকেট তো একেবারেই না। আরচেকার স্যার খেলোয়াড়দের খুব বেশি করে মনের ওপর জোর দেন।

আমার ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন যেভাবে খেলতে তোমার সুবিধে, অনায়াসেই খেলতে পার, সেইভাবেই খেলবে। ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার বা স্টান্স নেওয়ার ব্যাপারে এই কথাটি বারবার এসে যায়। কেউ হয়তো বলেন, দাঁড়াবার সময় দু পায়ের মধ্যে ছ'ইঞ্চি ফাঁক রাখতে হবে। কিন্তু যাকে বলা হচ্ছে সে কিন্তু অনুভব করছে ঠিক ছ'ইঞ্চি ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়ে খেলতে গেলে তার খেলা আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে। ছ'ইঞ্চির একটু বেশি বা কম হলে তার সুবিধা হয়। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সুবিধার দিকটাই বেশি করে দেখা দরকার। অনেক কেতাবী কোচ আছেন যাঁরা যেহেতু বইতে আছে দাঁড়াবার সময় ব্যাটসম্যানের দু'পায়ের ব্যবধান ছ'ইঞ্চি থাকবে সেহেতু তাঁরা শিক্ষার্থীকে বাধ্য করেন ঐভাবে দাঁড়াতে। এতে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিই হয়।

ব্যাট তোলা বা ব্যাক লিফ্‌ট্‌-এর ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। তবে ব্যাক লিফ্‌ট্‌-এর ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকতেই হবে। ব্যাক লিফ্‌ট্‌ ভালো না হলে দক্ষ ব্যাটসম্যান কিছুতেই হওয়া যায় না।

যারা বোলার হতে চাও, তাদের সবার আগে শিখতে হবে বল ধরার কায়দা। আমি অনেক ছেলেকে দেখেছি যারা অনায়াসে ভারি সুন্দরভাবে বল ঘোরাতে পারে। কোচের দায়িত্ব হচ্ছে সেই ছেলেটির এই স্বাভাবিক ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। ধরা যাক ছেলেটি শুধু কব্জীর মোচড়ে বল ঘোরাচ্ছে। কোচ তখন চেষ্টা করবেন, কব্জীর সঙ্গে সঙ্গে তার আঙুলগুলোকেও কাজে লাগাতে। আসলে শিক্ষার্থীকে ভালোভাবে বুঝতে, চিনতে এবং তার ক্ষমতা যাচাই করে নিতে না পারলে কোচের পক্ষে তাকে কিছুতেই নিজের মতো করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

সবশেষে তোমরা যারা খেলা শিখতে চাও, তাদের বলি, খেলোয়াড় হওয়ার প্রথম ধাপ কিন্তু নিজেকে সুস্থ এবং সবল রাখা। তার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। বাড়িতে যা হয় তাই দিয়েই পেট ভরে খেতে হবে, রোজ কোচের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে, আর বড়দের শ্রদ্ধা করতে হবে। পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে কিন্তু চলবে না। আজকের খেলাধূলা তা সে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, টেবিল টেনিস যাই হোক না কেন অত্যন্ত সায়েন্টিফিক হয়ে গেছে। হিসেবনিকেশ, স্ট্র্যাটেজি ছাড়া এক পা-ও এগোনো যায় না। সেইজন্যে অনেকে আবার কম্পিউটারকেও কাজে লাগাচ্ছে। তোমরা যখন বড় হয়ে খেলবে তখন হয়তো প্রতি পদে পদে এই কম্পিউটারকেই কাজে লাগাতে হবে। এবার বুঝতে পারছ তো কেন বলেছি পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে চলবে না!

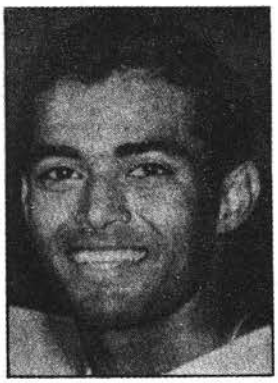

স্বপ্ন দেখছেন লিয়েন্ডার

তপন দাম

ভারতের একজন তরুণ টেনিস খেলোয়াড় সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড আর ফ্রান্সের সেরা খেলোয়াড়দের একে একে সে হারিয়েছে ডেভিস কাপের আসরে। ডেভিস কাপে দুর্দান্ত খেললেও কলকাতার ছেলে লিয়েন্ডার পেজ কেন যে সার্কিট আর গ্রাঁ পি টেনিসে তেমন ভালো খেলতে পারে না তাই নিয়ে এখন ভারতের টেনিস বিশেষজ্ঞরা চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে লেকতেঁ আর রচকে যেভাবে খেলে হারিয়েছে সেই খেলা ধরে রাখতে পারলে লিয়েন্ডার উইম্বলডনেও অনেকদূর এগোতে পারতো। তার বদলে তাকে বিশ্রীভাবে হেরে উইম্বলডনের যোগ্যতা অর্জনের লড়াই থেকেই সরে আসতে হয়েছে।

লিয়েন্ডার পেজ খেলোয়াড় বাড়ির ছেলে। ওর বাবা ডঃ ভেস পেজ ভারতের জাতীয় হকি দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। আর মা জেনিফার ছিলেন ভারতীয় বাস্কেটবল দলের নেত্রী। লিয়েন্ডার পেজ যে একদিন টেনিস খেলোয়াড় হবে ছোটবেলায় তাকে দেখে কেউ তা ভাবতেও পারেনি। ছেলেবেলা থেকেই লিয়েন্ডার বাবার পেছনে পেছনে একটা হকি স্টিক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ওর গায়ে থাকত মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মতন জার্সি। ছোটবেলায় লিয়েন্ডার মাঠে এসে ঘুরত খেলোয়াড়দের কাঁধে কাঁধে। বাবা যখন মাঠে হকি স্টিক নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতেন লিয়েন্ডারও তখন একটা বড়সড় স্টিক নিয়ে মাঠের বাইরে বলের পিছনে ছুটতো। সেই সময় সকলেই ভেবেছিলেন লিয়েন্ডারও হকি খেলোয়াড় হবে নয়তো মায়ের মতো বাস্কেটবলের দিকে ঝুঁকবে।

ডঃ ভেস পেজ কলকাতার সাউথ ক্লাবের মেম্বার। তাই তিনি ক্লাবে যেতেন। তাঁর হাত ধরে লিয়েন্ডারও যেত সাউথ ক্লাবে। সেখানেই একদিন সে হাতে তুলে নিল টেনিস র‍্যাকেট। বাবার মতন হকি খেলোয়াড় কিংবা মায়ের মতো বাস্কেটবল খেলোয়াড় না হয়ে সে নিজেকে তৈরি করতে লাগল টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে। তারপর একদিন মাদ্রাজে গিয়ে বিজয় অমৃতরাজের কোচিং স্কুল ব্যাট-এ ভর্তি হলো সে। সেখান থেকে ১৯৯০ সালে লন্ডনে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো জুনিয়র উইম্বলডনে। এরপর লিয়েন্ডার ইউ এস ওপেন টেনিসেও জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভারতের আর কোনো খেলোয়াড়ের ভাগ্যে এ সম্মান জোটেনি।

ফ্রান্সকে হারিয়ে দেশে ফিরে আসার পর লিয়েন্ডারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডেভিস কাপে এত ভালো খেললেও অন্য প্রতিযোগিতায় তুমি কেন সুবিধে করতে পারছ না? উত্তরে লিয়েন্ডার বলেছিল, একজন সব সময়ের কোচ পেলে আমার খুব সুবিধে হয়। তবে আমি যেখানেই খেলব তাঁকেও সেখানে আমার সঙ্গে যেতে হবে, থাকতে হবে।

তা কোচ রাখছ না কেন?

ম্লান হয়ে যায় লিয়েন্ডারের মুখ। আস্তে আস্তে বলে, অত টাকা কোথায় পাব?

জিজ্ঞেস করলাম, সব সময়ের কোচ পেলে তোমার বাড়তি সুবিধে কি হবে?

লিয়েন্ডার বলল, খেলা ছাড়া তাহলে আর কিছুই আমাকে ভাবতে হবে না। খেলার স্ট্র্যাটেজি, প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের দুর্বলতার খোঁজখবর, কোর্টের চরিত্র সবই তো আমি কোচ মারফৎ জেনে যাব। খেলব তাঁর নির্দেশ মতো। এখন আমি সার্কিট টেনিসে গিয়ে থই পাই না। যেভাবে খেলা উচিত তা বুঝতে না পারার জন্যেই আমাকে হার মানতে হয়।

প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বপ্ন কি?

লাজুক হেসে লিয়েন্ডার বলল, আমি একটাই স্বপ্ন দেখি। সে স্বপ্ন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হবার। তারপর আস্তে আস্তে বলল, স্বপ্ন দেখায় তো কোনো দোষ নেই?

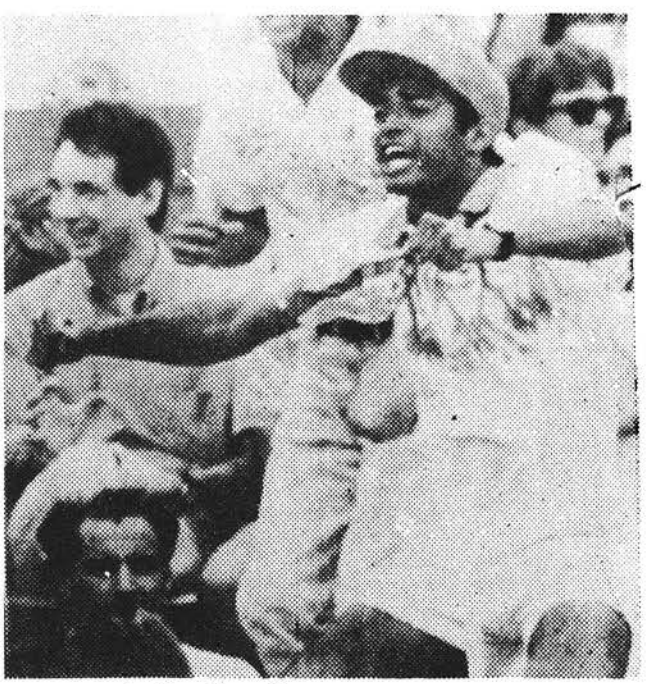

রমেশ জয় পেতেই লাফিয়ে উঠলেন লিয়েন্ডার।

ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেটটা কোথায়?
ক্যাচ!
ক্রীড়া কৌতুক
সুচি
অভিযোগ

ভোরপাতায়

নতুন ধাঁধা

১। মাথায় চরণ
শেষেও চরণ
উল্টে যদি দাও
সবটা মিলে খুঁজলে তাকে
বনের মাঝে পাও।

—প্রসূন ও পাপিয়া চক্রবর্তী
হাইলাকান্দি, আসাম

২। আগাগোড়া বুনে যাও
মাথা কেটে ভয়ে পালাও
আবার বিচার তুমি করে দাও।

—চন্দন ও শমিত খাঁ
হলদিয়া, মেদিনীপুর

৩। মাথা কাটা কার?
পেট কাটা সার
চেহারায় রয়
নিরাকার নয়।

—দেবাশিস সাহা
বারাসত, উঃ ২৪-পরগনা

৪। নেশার জিনিস সামনে রেখে
পড়ে আছে নিষ্প্রাণ
সবটা দিয়ে তৈরি করে
যা খুশি বাজান।

—মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

উত্তর: ১ চাকাম। ২ চাকাম। ৩ তবলা। ৪ ঢাকাম। ৫ : চতুর্থ ধাঁধা

নতুন শব্দমালা

এটি তৈরি করেছেন নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

পাশাপাশি :

১। দুর্গাকে যে মূর্তিতে দেখি
৬। এটা বেশি হলেই পকেটে টান
৭। ভালো অর্থে রুপো
৯। তারের এ যন্ত্রে ঘাট নেই
১০। লাউ-এর আসল নাম
১১। শরতের শেষে খেজুরের—
১৩। পুজোয় এই বস্ত্র পরতে হয়
১৪। দুর্গার জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলাসনে
১৬। তপস্যারত হিমালয়-কন্যার এই নাম হলো
১৮। গণেশের ইঁদুরটি দীর্ঘকায় নয়
১৯। যে নামে মহাদেবের ভয়ঙ্কর রূপই বোঝায়
২১। পঞ্চপ্রদীপে নিত্য হয় দেবীর —
২২। বীর্যের অপর শব্দ

ওপর-নিচ :

১। শুক্লবর্ণ বা সাদা
২। হোমের উপকরণ
৩। কালো পাখি
৪। মেঘ
৫। বেলপাতায় কেউ কেউ এতো নাম লেখে
৮। গণেশের স্ত্রী
১০। বাংলা উপসর্গ
১২। দুর্গার আর এক কন্যা
১৫। দুর্গার অপর নাম
১৭। পবননন্দন
২০। দেবীর কাছে যা প্রার্থনা করি

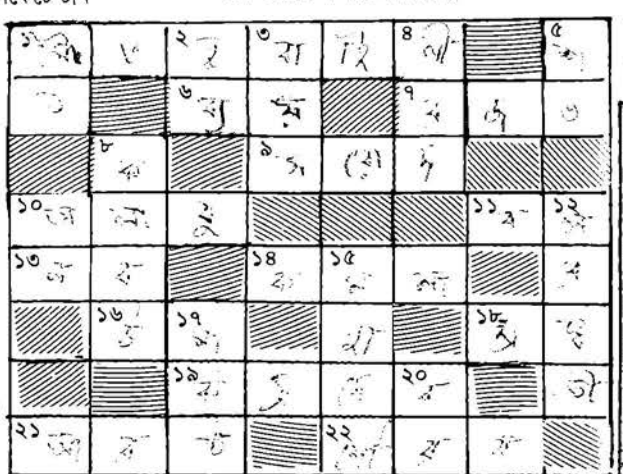

নতুন শব্দমালার উত্তর

পাশাপাশি :
১. দিগম্বরী ৬. বাঘ ৭. রুপো ৯. সাতার
১০. লাউ ১১. রস ১৩. শাড়ি ১৪. কমলা
১৬. উমা ১৮. ইঁদুর ১৯. ক্রন্দসী ২১. আরতি
২২. বীর্য

ওপর-নিচ :
১. দিতে ২. হবি ৩. বায়স ৪. নীরদ ৫. পত্র
৮. কলাবউ ১০. অন ১২. সরস্বতী ১৫.
মহাদেবী ১৭. মারুতি ২০. বর

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং কামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

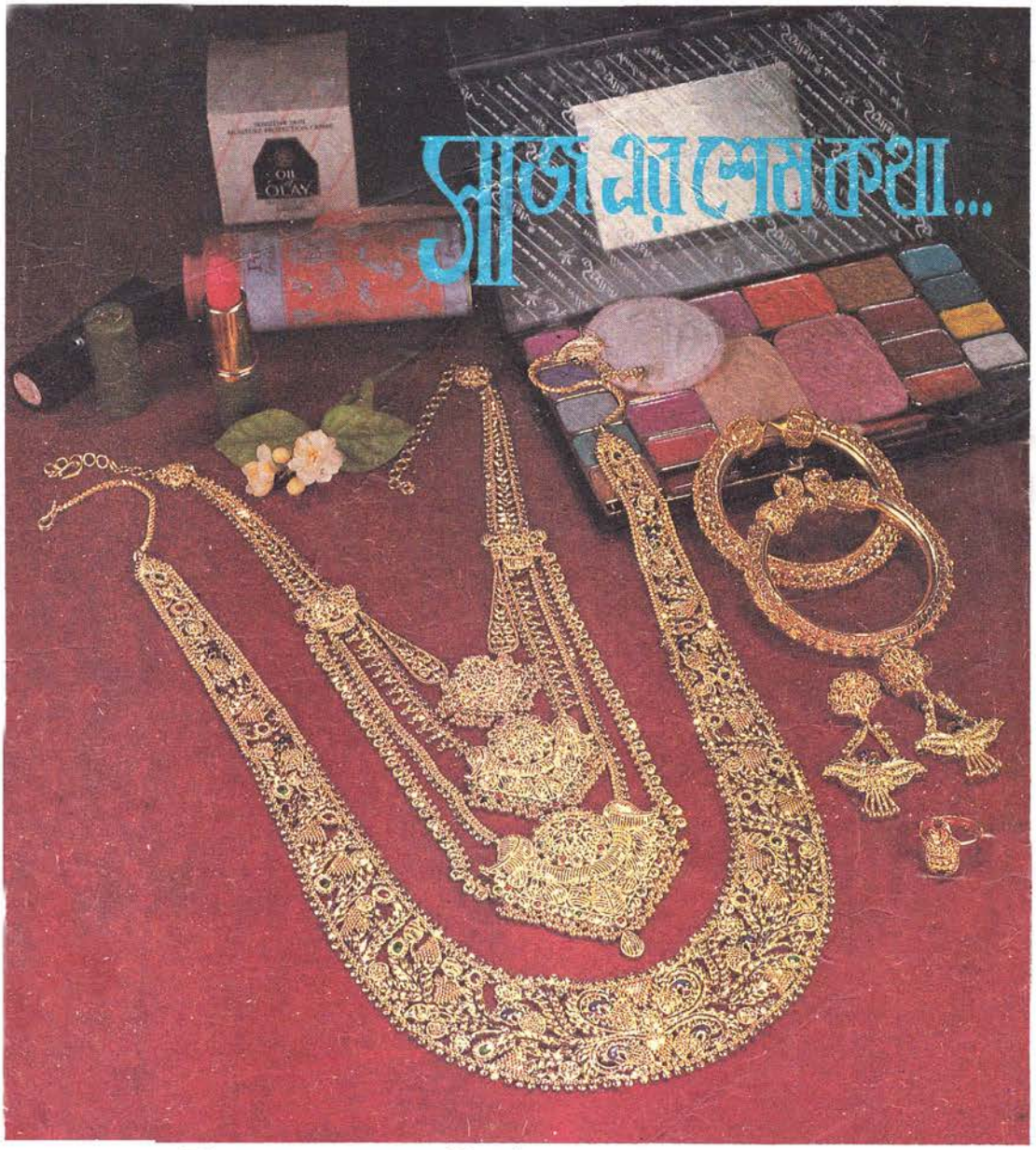

সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৭০/২, বি, বি, গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ফোন : ৩২-২১৩৯/৩১-৪৫৮৫

সেনকো জুয়েলারী প্যালেস
১১৮, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯, (লেক মার্কেটের নিকট) ফোন : ৭৬-৪৬২৫/২২২৫/৬০৬৫/৬১২৪

নিউ সেনকো জুয়েলারী হাউস
১৯৫/১, রাস বিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯, ফোন : ৪৪০-৪৬৯৫

Eve's

কিছু আজও
হার মানে, যার কাছে

শালিমার
নারকোল তেল
বহু যুগ ধরে এক বিশ্বস্ত নাম

শালিমার কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড